আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্বিজয়তাম্বিপশ্চিতা-
মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারী-সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত

—*—

দ্বাবিংশ বর্ষ—১৩৩৬

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ সরস্বতী

বার্ষিক মূল্য—২।০ প্রতি সংখ্যা—।০

যোরহাট
সারস্বত মঠস্থ—"যোগমায়া প্রিণ্টিং-ওয়ার্কচ্" হইতে
ব্রহ্মচারী সতীশ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচী

(বর্ণমালা অনুসারে)

২২শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

বৈশাখ—১৩৩৬

সমষ্টি সং ২২৯ — ১ম সংখ্যা

বামদেবস্য পন্থাঃ

—※—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৫।২৫-২৬

—*—

[ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—ঋষিদেবতে তত্র তত্র জ্ঞাতব্যে]

ইন্দ্র উবাচ

অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো
যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।
অতশ্চিদা জনিষীষ্ট প্রবৃদ্ধো
মা মাতরম্ অমুয়া পত্তবে কঃ॥

এসেছে এ পথে সবে, জানে সবে—এ তো পুরাতন—
বিশ্বের দেবতা যত এ পথেই লভেছে জনম।
তাই বলি, পূর্ণকাল হয়েছে তো, এসো এইবার—
মা তোমার আছে পড়ে—মৃত্যু কেন ঘটাবে তাহার?

বামদেব উবাচ

নাহমতো নিরয়া দুর্গহৈতৎ
তিরশ্চতাং পার্শ্বান্নির্গমাণি।
বহূনি মে অকৃতা কর্ত্ত্বানি
যুধ্যৈ ত্বেন সং ত্বেন পৃচ্ছৈ ॥

যাব না ও পথে আমি, ও যে মোর অতি অসহন ;
তেরচা বিদারি পাশ বাহিরিব, এই মোর পণ !
অপরে করেনি যা, হেন কত কাজ পড়ে মোর—
লড়িব বা কারু সাথে—কারু সাথে কথা হবে জোর !

পরায়তীং মাতরমন্বচষ্ট
ন নানুগান্যনু নূ গমানি।
ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ
শতধন্যং চম্বোঃ সুতস্য ॥

বলেছেন ইন্দ্র বটে, মৃত্যু কেন ঘটাব মাতার ;—
না—না—এই পথে যাব, ওই পথ নহে তো আমার !
পাষাণফলকে পিষি বহু ব্যয়ে রাখিল নিঙারি,—
ত্বষ্টার সে সোম তুমি, বল ইন্দ্র, পিও নাই কাড়ি ?

কিং স ঋধক্ কৃণবদ্যং সহস্রং
মাসো জভার শরদশ্চ পূর্ব্বীঃ।

অদিতিরুবাচ

নহী ন্বস্য প্রতিমানমস্তি
অন্তর্জাতেষূত যে জনিত্বাঃ ॥

"বর্ষ মাস শত শত গত, তবু চাহি পুত্রমুখ,
বাসবে ধরেছ গর্ভে, সে কি তোরে দেয় নাই দুখ ?"
"না—না—ও কি কথা বাছা ! ওর সনে তুলা হয় কারো ?
জন্মেছে বা জনমিবে অমনটী ভেবেছ কি আরো ?

অবদ্যমিব মন্যমানা গুহাকর্-
ইন্দ্রং মাতা বীর্য্যেণা ন্যৃষ্টং।
অথোদস্থাৎ স্বয়মৎকং বসান
আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ ॥

গরবিণী ইন্দ্রমাতা মহাবীর্য্য লভিয়া তনয়
রেখেছে লুকায়ে ভাবি—"এ কথা তো বলিবার নয় !"
দিব্যতেজে ঝলমলি ইন্দ্র কিন্তু দাঁড়ালো নিডর,
দ্যুলোক ভূলোক দুই পূর্ণ করি—জনমিলে পর !

এতা অর্ষন্ত্যললাভবন্তীঃ
ঋতাবরীব সংক্রোশমানাঃ।
এতা বি পৃচ্ছ কিমেতা ভনন্তি
কমাপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি ॥*

ছলকিয়া দুই কূল ভরা বুকে হর্ষে কলকলি,
মুখরা মেয়ের মত তটিনীরা ওই যায় চলি।—
ওদের শুধাও দেখি, কি কথায় ওরা মাতোয়ারা ?
মেঘে যে বেঁধেছে জল, তারেই বা গলাইল কারা ?

(ক্রমশঃ)

* অত্রেয়মাখ্যায়িকা—

গর্ভস্থো জ্ঞানসম্পন্নো বামদেবো মহামুনিঃ।
মতিং চক্রে ন জায়েয়াং যোনিদেশাৎ তু মাতৃতঃ ॥
কিন্তু পার্শ্বাদিতশ্চেতি জ্ঞাত্বা নু জননী ত্বিদং।
দধ্যৌ শান্ত্যৈ শচীং দেবীমদিতিমিন্দ্রমাতরম্ ॥
অদিতিস্ত্বিন্দ্রসহিতা গর্ভিণীমভ্যগাদ্ বনে।
অদিতীন্দ্রবামদেবাঃ সংবাদমথ চক্রিরে ॥

নববর্ষে

—:*:—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ—যিনি এই ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোককে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসমুদয়কে বিকসিত করেন, আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে একীভূত হইয়া আবার তাঁহাকেই ধ্যান করি, সেই ধ্যানের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত মঙ্গলের দিকে প্রেরণ করুন, তাঁহার প্রেরণায় তাঁহার দিকে চলিয়া আমরা যেন তাঁহাকেই প্রাপ্ত হই। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে অসম্পূর্ণতার, অভাবের ক্রন্দনে আমাদিগের বক্ষ আন্দোলিত হইতেছে, জগৎ ঘুরিয়াও যাহার পরিপূরণ হয় না, এবার নিজের দিকে ফিরিয়া আপনার মাঝে আপনি সংহত হইয়া দেহমনবুদ্ধি সমস্ত তাঁহার দিকে, যিনি সকলের ঈশ্বর সেই সর্ব্বাধিদেবতার দিকে উন্মুখ করিতে চাহিতেছি। তিনি আমাদের তাঁহার সেই শাশ্বত সত্যের দিকে লইয়া যান—তাঁহার প্রেরণায় এই জগতের প্রত্যেকটী কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমাদের বুদ্ধি, প্রচেষ্টা সমস্তকে তাঁহার দিকে চালিত করুন। তবেই আমরা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া সম্পূর্ণ হইতে পারিব। আমরা অক্ষয় অমর হইব।

জগতের নিখিল আনন্দ-জ্যোতিঃ সর্ব্বদাই সেই অধিদেবতা হইতে আমাদের দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, প্রতিনিয়তই আমাদিগকে তিনি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার শক্তির প্রেরণা দিয়া প্রতিনিঃশ্বাসে আবার এই জগতের কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, কিন্তু তাঁহার সেই সমগ্ররূপ ভুলিয়া আপন স্বার্থ নিয়া যখন আমরা আমাদের বিরাট্‌রূপকে খণ্ডিত করি, সঙ্কীর্ণতা দিয়া দৃষ্টিকে আবদ্ধ করি, তখনই দুঃখদৈন্য আমাদিগকে পাইয়া বসে, তাহাদের প্রভাবে আমরা স্বরূপ বিস্মৃত হই—দেবতাকে দূরে সরাইয়া দেই।

আজিকার এই নববর্ষ-দিনে শ্রীগুরুচরণে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া করপুটে আমরা এই প্রার্থনাই করি যেন তাঁর সেই আনন্দরূপকে আমরা ভুলিয়া না যাই; ভূমাকে না ভুলিলে ভয় আমাদের কাছেও ঘেঁসিবে না। দুঃখ-দৈন্য আনন্দবেদনার বিপরীত দিকে। বিরাট্ আনন্দকে যিনি পাইয়াছেন, ভয় তাঁহার ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই আনন্দময়ের প্রকাশ দেখিয়া আমরা যেন কোনও অবস্থাকেই ভয় না করি। আজিকার প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণে অভিস্নাত হইয়া আমরা এই আনন্দের দীক্ষাই তাঁহার নিকটে লইব। তাঁহার এই শুভ্র জ্যোতিঃস্পর্শে আমাদের দেহমনের সমস্ত পুরাতন কালিমা ধুইয়া মুছিয়া নূতন জীবনের সঞ্চার করুক।

সমস্ত আকাশে বাতাসে মিশিয়া যেই দেবতা কত নূতন আশার আলোকসজ্জায় আমাদিগকে ধরা দিতে আসিয়াছেন, আজ পুরাতনের ব্যর্থতার অনুযোগ দিয়া তাঁহার সেই অভিনন্দনকে আমরা ব্যথিত করিয়া তুলিব না, প্রাচীনের সে ছিন্ন বসনকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আজ এই নবালোকে আমরা নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহার দেওয়া নূতন দৃষ্টি দিয়া এই জগৎ অবলোকন করিব—জীর্ণপত্র-পরিত্যক্ত নব কিশলয়ে সুশোভিত দীপ্তশীর্ষ বৃক্ষরাজির মত আজ আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার আনন্দজ্যোতিঃতে দীপ্ত হইয়া উন্নত হৃদয়ে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইব, যিনি আমাদের মাঝে আজ

এমন করিয়া সকলকে নূতন করিয়া নববেশে ধরা দিয়াছেন। তরুণ তপনের সোণালী কিরণে আমাদের ললাটে আজ যে জয়তিলক তিনি আঁকিয়া দিতেছেন, তাঁহার ভুবনে আমাদের প্রত্যেকের ভবনে তাঁহার সে শক্তির লীলা মুঞ্জরিত হইবে। লতায়-পাতায় ফুলে ফলে প্রতি হৃদয়ে আজ যে মিলনের নিবিড় আনন্দ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, এই একাত্মবোধকে যদি আমরা লোক-লোকান্তরে ব্যাপ্ত করিয়া অবিচ্ছেদ্যরূপে অনুভব করি, গ্রহ গ্রহান্তরের আবর্ত্তনের মাঝে সেই আনন্দেরই বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভব করি, সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের মাঝে এই আনন্দেরই দ্যোতনা দেখিতে পারি, তবেই আমরা সর্ব্বব্যাপ্ত সেই বিশ্বস্রষ্টার সাথে একীভূত হইয়া অমর হইতে পারিব—আমাদের এই আনন্দধারা আবহমান কাল অটুট রহিবে।

আনন্দের প্রথম বিকাশ দেখি, আমার অস্তিত্ব-উপলব্ধিতে। আমি আছি, এই জগৎ আছে, তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য-সুষমা আমার নিকট প্রকটিত। আমার চতুর্দ্দিকে যে অহরহঃ ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে, তাহাতে আমি আছি, এই চেতনাকে আরও উদ্বুদ্ধ করিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা হয় আমার অনুভূতিতে। প্রতিক্ষণের ধ্বংসাবশেষে আবার যে জগৎ ফুটিয়া উঠে, মরণে অবগাহন করিয়া যে আবার এই সুন্দর শ্যামল ধরিত্রীর পবিত্র অঙ্কে উদ্ভাসিত হই, সে আমারই সংস্কারে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন মরণের ভিতর দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অহরহঃ সৃজন-প্রলয় যিনি করেন, ঋত ও সত্যরূপে আমাদেরই তিনি সমষ্টিস্বরূপ। তাঁহার ভিতর দিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ মরিয়াও যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ রূপে আবার জীবনে ফুটিয়া উঠি। আমাদের সাথে সাথে এই শ্যামলা ধরণীর বুক উজ্জ্বল করিয়া চিরকাল ধরিয়া চন্দ্র সূর্য্যের উদ্ভব হইতেছে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ সমস্ত ভুবনই পুনঃ পুনঃ নব কলেবরে বিকশিত হইতেছে। একমাত্র তিনি যখন আমাদিগকে সংহৃত করিয়া আপনার মাঝে আপনি বিভোর থাকেন, তখন তাঁহার তৃপ্তি হয় না; তখন তপঃ দ্বারা তাপ উৎপন্ন করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার ভিতর হইতে প্রকটিত করেন—নহিলে যে তাঁহার লীলার সুখ হয় না—তাই সেই ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির সৃজনলীলায় আমাদেরও বিশিষ্ট অধিকার রহিয়াছে। এই ধরণীর সুষমা ব্যর্থ হয় বুঝি—যদি দ্রষ্টা কেহ না থাকে!

আজ যে নবারুণের আলোকমালা আমাদিগকে কোন্ এক অনির্ব্বচনীয় সুধাস্বাদের সন্ধান দিতেছে, তাহা সেই পরমাধিপতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেশ্বরেরই প্রেরণা। প্রতি নিমেষোন্মেষের মাঝে তাঁহার সেই প্রেরণাকে অনুভব করিয়া তারপর এই জগতের যে কোনও কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিব, তাহার মাঝেই সিদ্ধি-স্বরূপে তাঁহাকে পাইব। প্রতি মুহূর্ত্তের এই উপলব্ধিতে আমাদের মাঝে যে আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইবে, শক্তির যে বিপুল আবেগ মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবাহিত হইবে, আমাদের এই নববর্ষে বর্ষদেবতার ভক্তি-পূজার তাই মহা বরমাল্য। জীবনের নিত্য নূতন রসায়ন তাহাই।

আজ সেই দেবতার ভাবসুবাসে আমোদিত এই সুন্দর ভুবনে তাঁহার যে গম্ভীর আনন্দ আমরা অন্তরে অনুভব করিতেছি, যে পুলক-শিহরণে আজ হৃদয়মন পরিপূরিত, তাঁহার সে স্মৃতিকে আমরা অভাবের নিদারুণ তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিব না। প্রতি উষায় জীবনদেবতার অর্ঘ্য-স্বরূপে সাজাইয়া আমাদের প্রত্যেকটী ভাব তাঁহাকে নিবেদন করিব। দৈনিক প্রতি কর্ম্মের ভিতর দিয়া তিনি গোপন থাকিয়া যাহা কিছু আমাদিগকে প্রদান করিবেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার এই বাহিরে ব্যক্ত বিরাট্ রূপকে আমরা পূজা করিব। আমাদের অন্তরের সুষমা দিয়া আমাদের আবেষ্টনীর মাঝে পরম

কুৎসিৎকেও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তাঁহার পূজার যোগ্য করিয়া লইব। এমনি করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তাঁহারই সামগ্রীতে যদি আমার ছাপ না দিয়া তাঁহার অভিসারে প্রত্যেকটী বস্তু সার্থক করিতে পারি, তবেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। অর্দ্ধমুকুলিত এই যে আমাদের জীবন-কোরকগুলি ইহারা যদি তাঁহার এই আলোকস্পর্শে উদ্ভিন্ন হইতে না পারিল, তবে যে তাঁহারও তৃপ্তি নাই। প্রতি দিবসের ক্লান্তি অবলম্বন করিয়া যখন রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকার আমাদিগকে আবৃত করে, তখন তিনিও যে সেই অবসরে আমাদের নূতন চেতনার আয়োজনে তৎপর থাকেন। প্রতি প্রভাতের প্রথম আলোর রশ্মিই যে তিনি আশীর্বাদরূপে আমাদের মস্তকে বর্ষণ করিয়া মুদ্রিত নয়নকে খুলিয়া দেন!

নব বৎসরের এই নূতন দিবসে যে সঙ্কল্প নিয়া আমরা জীবনপথে যাত্রা সুরু করিব, সেই চলার পথে আমাদের একমাত্র অবলম্বন তাঁহার অমোঘ আশীর্বাদ। স্বার্থান্ধ হইয়া যখন মুক্তির পথ খুঁজিব, আপন প্রবৃত্তির ইন্ধনেই নিজকে নিযুক্ত রাখিব, তখনই পরস্পর আমাদের স্বার্থের সংঘর্ষে মরণের বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে; নতুবা বিশ্বময় আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, সমস্তই সেই বিশ্বনিয়ন্তার আনন্দ-লীলার উপকরণ। তাঁহার আনন্দের দ্যোতক এই জগতের মাঝ হইতে দুঃখের কারণ বলিয়া আমরা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা আমাদেরই গ্রহণের ভঙ্গীদোষে দুঃখময় হয়; নতুবা মূলতঃ সমস্তই আনন্দেরই সঞ্চারক। মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলিয়া ধরিয়া অশুভ আখ্যা দেই, তাই তাহার আলিঙ্গন আমাদের নিকট ভয়ঙ্কর রূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু আজ যে নূতন জীবনে নবীন চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, মৃত্যুর কোলেই কি তার জন্ম নয়? শীতের মরণেই কি প্রাণ-মন মোহনকারী বসন্তের শুভাগমন নয়? মৃত্যুর কোলে বসিয়া এইরূপে যদি আমরা তাহাকে মঙ্গলকামী দেবতার আশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের আনন্দকে বিক্ষত করে কার সাধ্য! আমরা যে আনন্দময়ের সঙ্গে একাত্মরূপে এই নিখিল আনন্দের চিরন্তন দ্রষ্টা।

প্রতিদিবসের কর্ম্মের গ্লানি যখন আমাদের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া তোলে, আপনার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে আপনি বধির হই, তখন এই বর্ষারম্ভে সৃষ্টির প্রথম আনন্দকে ভুলিয়া যাই। নেত্র-সন্নিপাতে এই বিচিত্র ভুবনের মনোমুগ্ধকর অতুলন সৌন্দর্য্য ছবি তখনও কিন্তু প্রসারিত থাকে, কিন্তু চক্ষু তখন অন্ধ হয় বলিয়া দেখিতে পাই না। দেবতার অভয় আশীর্ব্বাণী গগনের রৌদ্রঝলকের সাথে, প্রান্তরের শ্যামল তৃণ-বল্লরীর মাঝে নগরের অগণিত জনকোলাহলে সর্ব্বত্রই ঘোষিত হয়—শুনিতে পাই না কেবল আপন চীৎকারে বধির হতভাগ্যের দল আমরা! দেবতার সে রূপ আমাদের কাছে রুদ্র হইলেও তিনি কিন্তু দক্ষিণ হইয়া তখনও আমাদিগকে পোষণ করেন। আপনার মাঝে কুণ্ডলীকৃত স্বার্থের ফণা উদ্যত করিয়া যখন অপরকে দংশন করিতে যাই, মাত্র তখনই না তিনি রুদ্ররূপে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং রূপে দেখা দেন! কিন্তু তখনও প্রার্থনা করিতে হইবে—

> অসতো মা সদ্‌গময়,
> তমসো মা জ্যোতির্গময়,
> মৃত্যো র্মামৃতং গময়!
> আবিরাবির্ম্ময়েধি—
> রুদ্রং যত্তে দাক্ষিণং মুখং
> তেন মাং পাহি নিত্যং!

—ওগো দেবতা, তুমি আমায় অসৎ হইতে সত্যে প্রতিষ্ঠা কর, আমায় এই অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে তোমার জ্ঞানের জ্যোতিঃসমুদ্রে লইয়া যাও—আমার এই অহঙ্কারের উদ্যত ফণা আজ যে আমারই মৃত্যু

ডাকিয়া আনিয়াছে, তুমি তাহাকে দূর কর—আমায় অমৃতের সন্ধান দাও—যে অমৃতে দেহের ক্ষুধা, ইন্দ্রিয় ক্ষুধা বা মনের ক্ষুধা—আত্মার বুভুক্ষা সমস্ত পূরণ হইয়া আমাকে অমরার রাজ্যে উপনীত করে! ওগো জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মাঝেও এই ভুবনব্যাপী আনন্দময় রূপে প্রকাশিত হও। তোমার ঐ রুদ্রমধুর মূর্ত্তিতে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও—তুমি আমাকে পালন কর।

জীবনের অন্ধকারকে এইরূপে দেবতার আশীর্ব্বাদে অতিক্রম করিয়া যখন প্রথম উষার কিরণ আমাদের ললাট পবিত্র করে, তখন আমরা সেই উদ্বোধন-মন্ত্রে সমস্ত দিবসের কর্ম্মে আপনাকে উৎসর্গ করিব, যাহা ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল—

> অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
> ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
> সচ্চিদানন্দরূপোঽহং,
> নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

—যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছেন, ব্রহ্মস্বরূপ সেই দেবতাই আমি। অহরহঃ বিক্ষোভের তাড়নায় যতই আমাকে টলাইতে চেষ্টা করুক, কিছুতেই আমাকে আমার এই স্বরূপ হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমি কিছুতেই শোকের ভাগী নহি। চৈতন্যময় আনন্দরূপ যে সত্তা, শাশ্বত মুক্তস্বভাববিশিষ্ট সেই পরম সত্যই আমার স্বরূপ!

এই বিরাট্ অনুভূতিতে সমাহিত হইয়া সমস্ত লোক হইতে লোকান্তরে আমাদের আনন্দ-সত্তা পরিব্যাপ্ত দেখিব। সেই ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির অঙ্গদ্যুতিতে দ্যুতিমান্ এই সূর্য্য প্রতি প্রভাতে আমাদিগকে তাঁহার বার্ত্তা স্মরণ করাইয়া উদ্বুদ্ধ করিবে। আমরা তাহার অমরকিরণ স্পর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই পরম বিধাতাকে নমস্কার করিয়া সমস্ত হৃদয় নিবেদন করিয়া বলিব—

> লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব,
> শ্রীকান্ত বিষ্ণো, ভবদাজ্ঞয়ৈব।
> প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
> সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

—হে সমস্ত লোকাধিপতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দেবতা আমার, সমস্ত সৌন্দর্য্যশ্রীর তুমিই একমাত্র স্বামী; হে বিষ্ণু, তোমার প্রেরণায় তোমার জগতের এই মঙ্গল উষায় আমি তোমারই প্রীতির উদ্দেশ্যে সংসারযাত্রায় আপনাকে অনুবর্ত্তন করিতেছি, দেখিও তোমার নয়নই যেন আমাকে পিছন হইতে সর্ব্বকর্ম্মে প্রেরণা দেয়—অন্তে যেন তোমাতেই লয় হইতে পারি।

প্রতিদিবসের কর্ম্মের বোঝা বহিয়া দীর্ঘ বৎসরের শেষে জীবন-সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যদি এই দেবতার প্রেরণা বহন করিয়া যাইতে পারি—বলিতে পারি, "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ; ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।—ওগো, আমি ধর্ম্ম কি তাহা জানি, কিন্তু কৈ তাহাতে তো প্রবৃত্তি হয় না, আবার অধর্ম্ম কি, তাহাও তো জানিতেছি, কিন্তু তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত যে হইতে পারি না—তাই আমার সমস্ত বালাই তোমায় দিয়া দিতেছি, হে হৃষিকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া যাহা করাও, আমি যেন তাহাই করিয়া যাই—" তাহা হইলে আর ভাবনা নাই। সেই বিরাট্ বিশ্বরূপী দেবতার মাঝে ক্ষুদ্র বেষ্টনীর পরিসমাপ্তি করিলে সমস্তই আলোয় আলোময় হইয়া যাইবে। রূপে রূপে প্রতিরূপং বভূব—যে তিনি, একের সঙ্কোচে যেমন এই অনুপম সৃষ্টির একটুখানি খুঁৎ

হয়, একের প্রসারেও আবার তাহা অক্ষত থাকে। তাই আমরা এককে অবলম্বন করিয়া বহুত্বে পৌঁছাই, আমাকে ব্যাপ্ত করিয়া ভূমায় পৌঁছাই। আবার সমষ্টির মাঝে কেন্দ্রস্বরূপে একজনকে পাই —সমগ্র বিশ্বের প্রতীকরূপে তাহার দেবতাকে দেখি। এই ব্যষ্টি সমষ্টি জড়াজড়ি হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। সেই এক দেবতা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়া সমগ্ররূপে এক দেবতা কর্তৃক বিধৃত রহিয়াছে, আবার পরিণামে তাঁহাতেই সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সেই একের প্রেরণা অবলম্বন করিয়া আজ এই উন্মুক্ত গগনে আশার কিরণে আমাদের জীবনের মুহূর্তগুলি সার্থক করিতে প্রয়াস পাইব। নববর্ষের ঊষার সঙ্গে যেই বার্তা বহন করিয়া প্রভাত আলো আমাদিগকে জাগাইয়া দিতেছে. তাহা আমরা প্রতিক্ষণে স্মরণ করিব। আমরা জানিব, এই আলোকস্নাত গ্রহোপগ্রহবেষ্টিত বিচিত্র বসুন্ধরা, স্থূলের আড়ালে তাহার পরিচালক সূক্ষ্মের আবাসভূমি ঐ ভুবর্লোক সমস্ত রকমের ভোগভূমি সেই স্বর্লোক অথবা বিশ্বময় যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষে বা কল্পনায় অনুভব করি, সমস্ত সেই বিশ্বদেবতা হইতে আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত যিনি এমন করিয়া আমাদের মাঝে বিরাট্‌রূপে ধরা দিতেছেন, সেই বিশ্বপ্রসবিতার যে অখণ্ড জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এই জগৎ আজ এমন মহিমাময়, বিশ্বের সকলের সাথে একপ্রাণ হইয়া আমরা সেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডধারক মহাজ্যোতিঃকে আবাহন করি। নববর্ষের নবানুরাগে আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহার ভাবে অনুরঞ্জিত হউক্—মঙ্গলের দিকে, তাঁহার দিকে প্রধাবিত হউক্ তাই প্রাণ নিঙারিয়া আবার প্রার্থনা করি—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

ওঁ শান্তিঃ

কালবৈশাখী

—*—

সুখ-দুঃখের ঝড় এসে প্রত্যেকের জীবনকেই এক একবার ওলট্-পালট্ করে ঝাঁকি দিয়ে যায়, আর তাতে মানুষ খাঁটী হয়ে ওঠে, অসত্য ঝরে যায়। মিথ্যা মান-অভিমান নিয়ে এক এক সময় আমরা অসম্ভব রকমে বেড়ে ওঠি—অপরকে আহত করে, অবজ্ঞা করে, এই যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করি, এর ঝড় যখন তুমুল শব্দে চারিদিক অন্ধকার করে, সমস্ত আশা-ভরসাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে প্রলয়ের সৃষ্টি করে, তখনই বুঝি আমিই একমাত্র নিছক সত্য—আমাকে আশ্রয় করে যে মায়া-মরীচিকার সৃষ্টি, এ সবই মিথ্যা!

নাবিকের সাহস পরীক্ষা হয় প্রবল ঝড়ের মাঝেই। সহস্র পরস্পরবিরোধী ঘূর্ণাবর্তে সমুদ্রে যখন উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, প্রাণভয়ে যাত্রীদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সুদক্ষ নাবিক কম্পাসের কাঁটার দিকে চেয়ে তখনও নির্ভয়ে সাগর-বক্ষ দিয়ে জাহাজখানিকে নিয়ে পড়ে ভিড়ায়। এই যে দুরন্ত সাহস, প্রাণে অপরিসীম বল, নাবিককে গৌরবান্বিত করে তুলে এ দুটো শক্তিতেই। সমস্ত বিভীষিকাকে ভ্রূক্ষেপ না করে, এই যে দুর্জয় শক্তি—সাধক-জীবনের কামনার ধন যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা এ-ই। গাঢ় অন্ধকারে সকলের পথ রুদ্ধ—সাধকের কিন্তু

বিশ্রাম নেই. সে এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়েই স্বর্গের সোনালী পথ দেখতে পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে যায়—আর কেবল অবিশ্রান্ত গতিতে চলে। কোথায় কাল-বৈশাখী আর কোথায় কি, তার ভাবের নেশাই যে আর সকলকে পরাজিত করে দেয়।

সত্য-মিথ্যায় মিলিত অদ্ভুত জীবন আমাদের। রূপ, রস, সৌন্দর্য্য কত মিথ্যা দুর্ব্বল উপকরণ নিয়ে আমাদের গৌরব। কত অজস্র মুকুল দেখেছিলাম, কই এখন তো দেখছি, যারা খাঁটী তারাই টিকে গিয়েছে—তাদেরই পরিণতি হবে, তারা সুপক্ক হয়ে মানুষকে তৃপ্তি দিবে, আর যারা সব শাখাকে আশ্রয় করে কেবল শোভা বর্দ্ধন করেছিল, তারা যে মিথ্যা। গাছ থেকে কোন ফল ঝরে পড়ে—যারা গাছের শাখাকে সত্যি করে আশ্রয় করেনি, ঝড়-বৃষ্টির যত প্রকোপ তাদের ওপর দিয়েই বয়ে যায়, তারাই কেবল মাটীতে ঝড়ে পড়ে।

বসন্তের ছোঁয়াচ পেয়ে অফুরন্ত প্রাণ নিয়ে সবাই বিকসিত হয়ে ওঠে। কত মিথ্যা, কত ভেজাল থাকে তার মাঝে, কে যায় তখন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য থেকে খুঁটে খুঁটে অসুন্দর আর কদর্য্যকে বের করতে? তার পরই আসে কাল বৈশাখী—সত্য-পরীক্ষার জলন্ত শক্তি। সবকে নাস্তানাবুদ করে তারপর তার বিশ্রাম। গাছগুলো হেলে-দুলে বলতে থাকে "আর না, আর না"—তবু কি সেই রুদ্র-দেবতা কারও অনুনয়-বিনয় শুনে, কারও কাতর-কণ্ঠের অস্ফুট আর্ত্তনাদ কি তাকে স্পর্শ করে? – তার পরীক্ষা নেওয়া যতক্ষণ না শেষ হবে, এমনি করে তিনি সবাইকে ঝাঁকিয়ে মারেন। ঋতুরাজ বসন্ত কেবল সৌন্দর্য্যকেই ভালবাসেন—সত্যকে নয়। উপভোগের মত্ততা নিয়েই উনি চলে যান – পরিণামের কথা ভাবেন কম। তাই এর পরই রুদ্র-দেবতার আগমন, তিনি চান সত্যকে—অস্থায়ী সৌন্দর্য্যের প্রলোভন তাঁর মাঝে নেই। শেষ পর্য্যন্ত যে কয়টাই থাকে, তাদের নিয়েই আমি থাকব—এই হল তার অন্তরের কথা। আড়ম্বর থেকে, মিথ্যা সৌন্দর্য্য থেকে, সত্য-নিষ্কাসন করাই তার ধর্ম্ম। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার আবেগেই তার প্রলয়ঙ্করী শক্তির লীলা। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবু, অসময়ে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য চলতে থাকুক—তবু আমি চাই সত্য, এই হল তার নূতন বাণী।

যারা দুর্ব্বল, তারা ভয় করে, আর যারা সবল, পরীক্ষা দেবার দরুণ তারা প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এমনি করে কালবৈশাখীর নাম শুনে হর্ষ-বিষাদের এক অপরূপ চমৎকার দৃশ্য ফুটে ওঠে। কেউ বা ঝড়ের নাম শুনলে আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, আর কারও প্রাণ বা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। পরীক্ষা দেবার এই তো সুবর্ণ সুযোগ।

আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত কিনা, ঝড় এসে আমাদের কাছ থেকে এই পরীক্ষা নিয়ে যায়। আমাদের ভিত্তি পাকা কিনা বারবার নেড়ে-চেড়ে দেখে যায়। এই পরীক্ষার শেষ নেই, যতদিন জীবন ততদিন এ ঝড়-তুফান থাকবেই। একবার গলদ থেকে, আবর্জ্জনা থেকে মুক্ত হলেই যে আজীবন মুক্ত হয়ে থাকা যায় তা নয়, নূতন নূতন কত গলদের সৃষ্টি হচ্ছে। কালবৈশাখী আর কিছুই নয়—দুর্ব্বলের কাছে বিভীষিকা, আর সাধকের হচ্ছে প্রাণের অভীষ্ট-দেবতা।

যারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, ঝড়ের প্রকোপ তাদের উপরই বেশী। গর্ব্বকে, ঔদ্ধত্যকে নিষ্পেষণ করাই তার আসল কাজ। বড় বড় গাছগুলো যাদের শির খুব উন্নত তাদেরই দেখছি আজ দুর্দ্দশা বেশী। আমরা যে শক্তি নিয়ে বড়াই করি, এর ওপরেও যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, এ সব ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাই।

বিধাতার প্রচণ্ড-শক্তির বড় একটা নিদর্শনই হল ঝড়। রুদ্র-দেবতার অন্তরে মায়া-মমতার লেশও নাই, যন্ত্রণামথিত হৃদয়ের করুণ বিলাপোচ্ছ্বাস আর

হাহাকার তাকে একটুও স্পর্শ করে না, কারও কথা শুন্‌বে না, কারও ধার ধার্‌বে না, সে তার আপন খেয়াল-খুসীতে চল্‌বেই! তার মনে কোন সঙ্কল্প নেই বলেই বুঝি, একা তার প্রতাপে সমস্ত জগৎ প্রকম্পিত!

কোন কিছুর ঠিক নেই, এই হয়ত সুনির্ম্মল আকাশ, সমস্ত পৃথিবীময় রোদে ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে, হঠাৎ দেখি ঘোর অন্ধকার—জগৎ আচ্ছন্ন, যেন প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা। অজানা বিভীষিকা একদিকে যেমন মানুষকে ভীত করে, তেমনি আবার সতর্কও করে।

চোর, দস্যু, লুণ্ঠনকারী কত কিছুর ভয় রয়েছে মানুষের, তবু মানুষ এ ভয়ের মাঝেও নির্ভয়ে অর্থসঞ্চয় করে। এখানেই মানুষের একটি বিশেষ ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া। বিনা লড়াইয়ে সে আত্মসমর্পণ করাকে অপমান করে। যুদ্ধ করে মরণ, এ তো গৌরবের। মহাশক্তির তুলনায় আমার শক্তি হয় তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আমার শক্তিই বা কম কিসে?

ঝড় হবে বলেই মানুষ আচ্ছা করে শক্ত খুটি পোঁতে। ভূমিকম্প হবে বলে কি মানুষ দালান তোলে না? যাতে দালান ভূমিসাৎ না হয় তার দরুণ পাকা ভিত্তি, শক্ত শক্ত কড়ি-বর্গা দিয়ে আগে থেকেই মানুষ গঠনকে সুদৃঢ় করে তোলে। দৃশ্য অদৃশ্য কত কিছুর ভয়ই তো রয়েছে—মানুষ কি তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে?

সমস্ত বিক্ষোভ গিয়ে প্রশান্তিতে লয় হয়, আবার সেই প্রশান্তি হতেই প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা। ঝড়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে যায়, গুমটে গাছের একটী পাতাও নড়ে না—এমন স্থৈর্য্যের মাঝে যে এত চঞ্চলতা রয়েছে কে জানে? তার পরেই শুনি শাঁ শাঁ শব্দে প্রকৃতির উষ্ণ নিশ্বাস সমস্ত জগৎকে কাঁপিয়ে তুল্‌ছে। এমনি করে আবহমান কাল ধরে সৃষ্টি আর প্রলয়ের এক অপরূপ আনাগোনা চলছে। প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ রহস্য কি, এত অনুসন্ধানেও মানুষ আজ পর্য্যন্ত একটা সঠিক খবর পেলে না!

এসব জেনে শুনেও নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মাঝে গিয়ে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করাও তার মনের একটা একান্ত সাধ। এক দিকে ঝড়ে, তুফানে বন্যায় মানুষকে নিরাশ্রয় করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কত অসংখ্য লোকের প্রাণনাশও হচ্ছে—তবুও মানুষের মনের অতৃপ্ত উদ্যম কিছুতেই নিঃশেষে লোপ পাচ্ছে না। কোথাও শূন্য স্থান পড়ে নাই জগতে, একদিকে প্রলয়, অন্যদিকে সৃষ্টি,—এক দিকে পতন, অন্য দিকে উত্থান!

বাহির থেকে বড় রকমের একটা আঘাত না পেলে অনেক সময় মূঢ় চিত্ত সজাগ হয় না। বিলাসে মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, বাহিরের আঘাত এসে তাকে সজাগ করে দিয়ে যায় তখন। বসন্তের কর্ম্মহীন আনন্দোচ্ছ্বাসে মানুষ পাগল হয়ে যায়, বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখেই তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে—সব বিলিয়ে দিয়ে একেবারে ফতুর হতে বসে—তখনই আসে ঊর্দ্ধলোক থেকে রুদ্র দেবতার নিদারুণ অভিশাপ। সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়; আর মানুষ তখন কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করতে থাকে। কঠোর কর্ম্মজীবীর উদ্দেশ্যহীন আনন্দের বিলাস বিধাতার প্রাণে সহ্য হয় না। তাই মানুষ যখনই স্বার্থপর হয়ে আরাম করতে চায়, তখনই বাহির থেকে আঘাত পায়।

বহু দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির মত সমস্ত বাধাকে বিদীর্ণ করে একদিন স্বরূপ বিকাশ কর্‌বেই। গভীর নিস্তব্ধতাই গভীর আশঙ্কার নিদর্শন। প্রলয়ের

পূর্ব্বে প্রকৃতি স্তব্ধ—নীরব ভাষায় তার অন্তর্বেদনা প্রকাশ করে, কিন্তু তখন কেউ কর্ণপাতও করে না—নেশার আমেজেই বিভোর, কে কার কথা শুনে? এই আমোদের মাঝেই কতদিক থেকে অপ্রত্যাশিত বাধা এসে ধাক্কা দেয়, তখনও আমরা ভাবের নেশায় অসংখ্য আশার সরিষা-ফুলই দেখতে থাকি! এ যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, সব বুঝ্ছি, শুন্ছি, দেখ্ছি, অথচ আবেশ—ঘোরতর মত্ততা!

ভোগ চায় মানুষ, প্রকৃতি তার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে মায়াজাল বিস্তার করে একেবারে মানুষের চেতনা বিলুপ্ত করে দেয়। এ কিন্তু পরীক্ষা—পুরুষ অটল বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত কিনা প্রকৃতি মোহিনী রূপ ধরে তার পরীক্ষা নিয়ে যায়। জল-দেবতা কাঠুরিয়াকে স্বর্ণ-কুঠারই দেখিয়েছিল, কিন্তু তাঁর মনোগত অভিপ্রায় এ ছিল না, প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে কাঠুরিয়া স্বর্ণ-কুঠারই নিয়ে যাক্। দেবতার উদ্দেশ্য যা খাটী তার দিকে মানুষের অদম্য আকর্ষণ হোক। শাসন মানি না বলেই তো শাসন উগ্র হয়ে এসে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে আমাদের। একি সহজ জড়ত্ব, প্রলয়-পিনাকের তুমুল শব্দ শুনে তবে আমাদের চৈতন্য হয়। জড়ত্ব-বিধ্বংসকারী ঝড়েরও প্রয়োজন, তা না হলে আমি যে কি তাও যে আমার জানতে ইচ্ছা হয় না। ঘুমায় মানুষ জাগবার দরুণ—ক্লান্তি অপনোদন অভিপ্রায়ে। চেতন জীব অচেতন হয়ে কতক্ষণ থাকৃতে পারে?

ক্ষতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঝড় মানুষের অশেষ ক্ষতি করে দিয়ে যায়, কিন্তু ঝড়ের পর যখন আবার প্রকৃতি দেবীর অফুরন্ত স্নিগ্ধ হাসির রেখা জগতের কালিমাকে অপসারিত করে দেয়, তখন মনে হয় ঝড় আসুক—আর অন্ধকারে যে আমাকেও আমি দেখতে পাই না, এর চেয়ে বড় বিভীষিকা কি থাকৃতে পারে জগতে? বুকের মাঝে অসংখ্য ঝড় বয়ে যায়, কিন্তু আমাকে যখন আমি জানতে পাই, তখন কি আর সেই ব্যথার স্মৃতিই উজ্জ্বল থাকে? ঝড়-ঝাপ্টা খেয়ে যে আমি নূতন মানুষ হয়ে যাই তখন।

সুন্দর

মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠেছে কার সে হাসি ওই!
শুভ্র কিরণ ছড়িয়ে যেন ফুল বাগানে জুই!
গন্ধে মদির উতল হাওয়ায়,
কোকিলারে কি গান গাওয়ায়—
অঙ্গদ্যুতি কাহার বা এ এমন জ্যোছনায়!
স্নিগ্ধ সমীর মধুর স্পর্শ,
জাগায় হৃদয়ে বিপুল হর্ষ—
আকাশভরা তারার ফুল ওই কার সে বিছানায়?
ভুবনভরা ফুল ফুটে রয়,
(তাঁর) চরণ-তলের পথ বুঝি হয়—
নাম্‌তে ধরায় তবুও বুঝি কতই লাগে হায়।
হৃদয় আমার আজকে এমন
কার লাগিবা করছে কেমন—
আপ্‌নারে চায় বিলিয়ে দিতে কার সে রাঙা পায়

——):*:(——

তীর্থরামের গৃহস্থালী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আত্মানুসন্ধিৎসার তীব্র আবেগে আন্দোলিত হইয়া হিমাচলবিহারী তাপস তীর্থরাম বলিতেছেন—

"হে গঙ্গা, তোমার বুকে তুমি ও কি অমৃত লুকাইয়া রাখিয়াছ, যাহার দরুণ তোমার বারিবিন্দুপানে ব্রহ্মবিদ্যার পুষ্টি হয়? হিমাচল, তোমার মাঝে আছে এ কোন্ মহিমা, যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যাকে গিরিজা বলিয়া আমরা জানি?......হে ভগবান্, আমার এমন সময় কখন আসিবে, যখন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবল উন্মাদনায় রামের সমস্ত বিকার ভাসিয়া যাইবে, রাগ-দ্বেষ স্বপ্নেও তাহার হৃদয় ছুঁইয়া যাইবে না? অতীতকাল যেমন একেবারেই অতীত হইয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না, তেমনি করিয়া পাপ ও শোক কবে আমার কাছে একেবারে অতীত হইয়া যাইবে? তুরীয় অবস্থা যদি শুধু পুঁথির বচন না হয় তো সে কি—সে কি?

এই আবেগ হৃদয়ে লইয়া নগ্নশিরে, নগ্ন চরণে, নগ্ন-শরীরে তীর্থরাম একখানা উপনিষদ্ মাত্র হাতে লইয়া হিমাচলের বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন আর গাহিতেন—

ইশক্‌কা মন্সব লিখা
জিস্ দিন্ মেরী তক্‌দীরমেঁ,
আহ্‌কী নক্‌দী মিলী
সহরা মিলা জাগীরমেঁ।

—আমার কপালে প্রেমের লিখন যেদিন পড়িয়াছে সেই দিন হইতে আমি পুঁজি পাইয়াছি "হায়-হায়" আর জায়গীর পাইয়াছি অরণ্য!

—২

ইতিপূর্ব্বের নিবন্ধে তীর্থরামের এই সংসার-বিরক্তির মনস্তত্ত্বের একটা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ আমরা দিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া আমরা তীর্থরামের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির দুইটী স্থলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—একটীতে তাঁহার প্রকৃতি-প্রীতি, আর একটিতে তাঁহার শাস্ত্র-জিজ্ঞাসা।

বহিঃপ্রকৃতির মুগ্ধতার প্রতি তীর্থরামের অনুরাগ যে কত প্রবল ছিল, তাহা আমাদের কাহারো অবিদিত নহে। এই অনুরাগের সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক-জীবনের উন্মেষের যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। সৃষ্টিমাধুর্য্য দেখিয়া স্রষ্টাকে স্মরণে পড়া—আমাদের আধ্যাত্মিকতার একটা পরিচিত রূপ। কিন্তু ইহার মাঝেও আমরা গলদ ঢুকাইয়া ফেলি। ধর্ম্মের যে একটা সহজ সরল রূপ রহিয়াছে, নানা আচারের জটিলতায়, কিম্বা নানা সংস্কারের আবিলতায় তাহা আমাদের চোখের আড়াল হইয়া পড়ে। শিশুর নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে বিস্ময় ও আনন্দে মিশিয়া জগৎ যেমন মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠে, তেমন করিয়া যেন আর আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠিতে চাহে না; অথচ আমরা বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি অন্ধ হইয়াও আধ্যাত্মিকতার দাবী করি। বাস্তবিক আনন্দের, সৌন্দর্য্যের উপাসক যে, অকারণ অবারণ আনন্দের শিহরণ দিয়া যে সত্য-স্বরূপকে চিনিয়া লইতে চায়, তাঁহারই রচিত এই অনবদ্য আনন্দের মেলাকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে কি বলিয়া? প্রকৃতির যাহা কিছু উদার, যাহা কিছু বিচিত্র, যাহা কিছু বিরাট্, তাহাই কি তাহার হৃদয়ে সত্যসুন্দরের আভাস ফুটাইয়া তুলিবে না?

কিন্তু এই দেখা চোখের দেখা না হইয়া প্রাণের দেখা হওয়া চাই। অনাবিল ইন্দ্রিয়প্রীতিরও জীবনে একটা স্থান আছে বটে, কিন্তু তাহাই তো জীবনের সবখানি নয়। একটা নকল প্রকৃতি-প্রীতিতে আমরা দিন দিন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। জ্যোছনা দেখিয়া আমরা এলাইয়া পড়ি, মলয়-বাতাসে শিহরিয়া উঠি, নবকিশলয়ের শ্যামল মায়া চোখে বুলাইয়া লই—তারপর ভাবে বিভোর হইয়া কবিতা লিখি আর তাহারই উত্তেজনাকে অধ্যাত্মপ্রসাদ বলিয়া জাহির করি। ভগবান্‌কে খুব সস্তায় বহিঃপ্রকৃতির মাঝে দেখিয়া ফেলা আমাদের একটা বাতিক হইয়া উঠিতেছে। বহিঃপ্রকৃতির প্রতি অন্ধ থাকিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাণহীন আচারের অনুবর্ত্তন করা যেমন এদিককার বাড়াবাড়ি, তেমনি আবার অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল বাহিরটাকে লইয়া মাতামাতি করাটাও আর একদিককার বাড়াবাড়ি। চাই দুইয়ের মাঝে সামঞ্জস্য। আমি ভিতরে খুঁজিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাকে যেমন বাহিরে প্রতিফলিত দেখিব, তেমনি বাইরে যাহা পাইতেছি, তাহাকেও ভিতরের অনুভব দিয়া রসাইয়া লইব, তবেই না আমার দর্শন সম্পূর্ণ হইবে! প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে গাঁথিয়া লইব একটী অন্তর্গূঢ় অখণ্ড অনুভবের সূত্র দিয়া;—স্থূল দর্শনকে শুধু সূক্ষ্ম ভাব-বিলাসদ্বারা নয়, নিখিল-বিশ্বের বীজভূত কারণ-প্রত্যয় দ্বারা মণ্ডিত করিয়া লইতে পারিলে তবেই প্রকৃতি-প্রীতি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত হইবে। ইংলণ্ডযাত্রী জাহাজের ডেকে স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অকূল সমুদ্রের মাঝে সূর্য্যাস্ত হইতেছে—স্বামীজী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছেন; শুধু স্বামীজী নয়, আরও কতজন তাঁহারই মত সে দৃশ্য দেখিয়া বিভোর হইয়া যাইতেছে। সূর্য্য ডুবিয়া গেলে পর ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীজী বলিলেন, "এই রূপ দেখিয়াই মনে পড়ে, যাঁহার রূপের একটী কণামাত্র লইয়া এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি, তিনি যে কত সুন্দর—কত সুন্দর!" একই রূপ কাহারও চিত্তে জাগায় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বিলাস, রূপের অভিঘাত নাড়ীমণ্ডলীতে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি মাত্র করিয়া আড়ালে সরিয়া যায়; আবার কাহারও মাঝে সেই রূপই অন্তরাবৃত্ত হইয়া ফুটাইয়া তোলে তুরীয়-চেতনার আশ্রিত অখণ্ড-রসের অনুভূতি। এই শেষের দেখাতেই প্রকৃতি-প্রীতি অধ্যাত্মজীবনের অপরিহার্য্য অবলম্বন হইয়া দেখা দেয়।

তীর্থরামের মাঝে এই ভাবটী গভীর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) প্রকৃতিতেও অনুভব করিয়াছিলেন দ্রষ্টার নিরপেক্ষ একটা চেতনা—উত্তেজনা ও বেদনায় স্পন্দমান। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই আধ্যাত্মিকতা অনেককেই আবিষ্ট করিয়াছে, আমাদের দেশের অতি-আধুনিক তারুণ্যমদমত্ত ভাব-বিলাসের দরুণও উহা যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। কিন্তু তীর্থরাম বৈদান্তিকের মত প্রকৃতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আত্মপ্রাণ দিয়া; আর সে প্রকৃতি শুধু মানুষের চোখে দেখা বহিঃপ্রকৃতি নয়, সে নিখিল মানব-মনের অন্তঃপুরচারিণীও বটে। এই সুগভীর আত্মানুভব দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই তীর্থরামের উচ্ছ্বসিত প্রকৃতি বন্দনায় এমন একটা সুস্থ বীর্য্যশালী আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা আজকালকার মেকীর বাজারে একান্তই দুর্লভ।

আর একটী কথা শাস্ত্র-জিজ্ঞাসা। তীর্থরাম বলিতেছেন, "তুরীয়াবস্থা যদি শুধু পুঁথির বচন না হয় তো—সে কি?" অধ্যাত্মশাস্ত্রে এমন অনেক কথাই থাকে, যাহা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহিত খাপ খায় না। এই কথাগুলি লইয়া আমরা কি করিব? সাধারণতঃ এই সম্পর্কে আমরা দুই প্রকার মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। একদল বলেন, শাস্ত্র

অভ্রান্ত, যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বুঝি আর না বুঝি, সমস্তই সত্য। কিন্তু সমস্তই সত্য হইলেই যা আমার যে কি লাভ হইল, এই কথা কেহ খতাইয়া দেখিতে চান না। আর এক শ্রেণীর লোক, কোনও পুথির শাসন একেবারেই মানিতে চাহেন না, তাঁহাদের মতে শাস্ত্র অপরিণত মস্তিষ্কের স্বপ্ন-বিকার মাত্র। ইহাঁদের সহিত তর্ক করিয়া শাস্ত্র বুঝাইতে যাওয়াও বিড়ম্বনা, কারণ বাজিকরের সদ্য আঁটী পুঁতিয়া আমগাছে আম ফলানোর মত ইহাঁরা চান হাতে হাতে ফল!

এই দুইপ্রকার মনোবৃত্তির কোনটাই শ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে যাহা কিছু লেখা. তাহা সবই সত্য, কিম্বা সবই মিথ্যা, এ কথা জোর করিয়া অবশ্য বলা চলে না। শাস্ত্রের মাঝে, সত্যের সঙ্গে মিথ্যারও সংমিশ্রণ অনেক স্থলে ঘটিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা উচিত যে শাস্ত্র আজগুবি কতকগুলি রূপকথারই সমষ্টিমাত্র নয়, উহা মানুষেরই নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার একটা পঞ্জী। যেখানে এই অভিজ্ঞতাগুলিকে যাচাই করিয়া লইবার পথ খোলা রহিয়াছে, পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবার দিশারী রহিয়াছে, সেখানে কয়জন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সাহস করিয়া সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার জন্য আগাইয়া যান? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক একটা Hypothesis খাড়া করিয়া তার উপর সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও যে তীব্র ও একাগ্র সাধনা করে, সে বৈজ্ঞানিক সাহস আমাদের কোথায়? আমরা হয় চোখ বুজিয়া সব বিশ্বাস করি, না হয় তো নাক সিঁটকাইয়া উড়াইয়া দিই, সাহস করিয়া কেহ জলে নামিতে চাহি না।

শ্রীমৎ বিজয় গোস্বামী এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। একবার একজন কথক ভাগবত পাঠ করিবার পূর্ব্বে গৌরবন্দনা পাঠ করিতেছিলেন। সভায় একজন তেজস্বী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আপনি ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোক না পড়িয়া গৌরবন্দনা পড়িতেছেন যে? ভাগবতে কি গৌর-বন্দনা লেখা আছে?" পাঠক বিনীতভাবে বলিলেন, "না থাকিলে কি আমি মিছামিছি পড়িতেছি?" পণ্ডিত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ও সব চালাকীর কথা শুনিতে চাই না। আমাকে দেখাইয়া দিন, কোথায় গৌরবন্দনা লেখা আছে?" পাঠক বলিলেন, "এই যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের অক্ষরে গৌরবন্দনা লেখা দেখিতেছি, ইচ্ছা হয় দেখিয়া যাইতে পারেন।" পণ্ডিত কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পাঠক বলিলেন, "দেখিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। আমি যে ভাবে আপনাকে চলিতে বলিব, আপনি সেই ভাবে চলিতে রাজী আছেন কি? তাহা হইলে আপনাকে আমি গৌরবন্দনা দেখাইতে দিতে পারি।" পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শোনা যায়, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার একাগ্র সাধনা ফলে ইষ্টলাভ করিয়াছিলেন।

এই কাহিনীটীর মূল্য যাহাই হউক না কেন, সত্যের জন্য যে এই প্রবল পিপাসা, বস্তু লাভ করিবার দরুণ অজ্ঞাত রহস্যের সাগরে দুঃসাহসীর মত ঝাঁপাইয়া পড়া, এইটী না থাকিলে হাবার মত সমস্তই সমস্তই মানিয়া লইয়া কিম্বা বিজ্ঞের মত সমস্তই তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়া কি কিছু লাভ আছে? তীর্থরামের ব্যাকুল শাস্ত্রজিজ্ঞাসায় একটু-খানি সংশয়ের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা নিন্দনীয় তো নহেই, বরং সত্যলাভের পথে চিত্তকে উত্তেজিত করিবার পক্ষে উহা একটা রসায়ন।

সকল পথ ঘুরিয়াও বুদ্ধদেব যখন সত্যের সন্ধান পাইলেন না, তখন বোধিদ্রুমের মূলে আসন পাতিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই আসনে বসিয়া আমার শরীর শুকাইয়া যায় তো যাক্, কিন্তু সত্যলাভ না

করিয়া আর উঠিব না।" পাতঞ্জল বলেন, "তীব্র-সংবেগানাম্ আসন্নঃ"—যাহাদের তীব্র মনোবেগ, তাহাদের চিত্ত স্থির হইতে বেশী বিলম্ব হয় না। রামকৃষ্ণদেবও এই উপলক্ষ্যে বলিতেন, "জেদ থাকা চাই, নইলে হয় না। 'বনত্ বনত্ বনী যাই'—হ'তে হ'তে হয়ে যাবে—ও কোন কাজের কথাই নয়—ও যেন চিঁড়ের ফলার।" তীর্থরামের মনেও এই সংবেগের আন্দোলন আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহার মনোবৃত্তি চিরকালই একটু বেশী পরিমাণে তীব্র ছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। হৃদয়ের এই তীব্র উচ্ছ্বাস শুধু ভাব-প্রবণতা নয়, ইহার পেছনে আছে একটা স্থির লক্ষ্যের প্রেরণা। যাহারা ভাবপ্রবণ, তাহারা খড়ের আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই নিবিয়া যায়। কিন্তু তীর্থরাম দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেই থাকিতেন। একটি অবান্তর উদাহরণে আমরা এই তীব্র মনোবেগের পরিচয় তাঁহার নিজ মুখেই পাইয়াছিলাম, সম্ভবতঃ পাঠকের তাহা স্মরণে আছে। বাড়ীতে বসিয়া তীর্থরাম আঁক কষিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই আঁক মিলিতেছে না। দিন গেল, রাত্রিও যায় যায়, তবুও আঁক মিলে না। তীর্থরাম ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আজ হয় এই রাত্রি-প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আঁক মিলিবে, নয়ত গলায় ছুরী দিব। রাত পোহাইয়া গেল, আঁক মিলিল না। তীর্থরামের যে কথা সেই কাজ। ছাতের উপর গিয়া গলায় ছুরী বসাইয়া দিতে যাইবেন, এমন সময় দেখিলেন অঙ্কের সমাধানটী আগুনের অক্ষরে তাঁহার সম্মুখে আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে !

একটা অঙ্ক মিলাইবার দরুণ যে গলায় ছুরী দিতে যায়, তাহাকে লোকে পাগল ছাড়া আর কি বলিবে ? অনেকে হয়ত ইহার মাঝে আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধও খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু এই ধরণের একবগ্গা মানুষগুলিই জীবনে সিদ্ধির সাক্ষাৎ পায়—এখন সে সিদ্ধি আঁককষার সিদ্ধিই হউক, আর ভগবান পাওয়ার সিদ্ধিই হউক। চাই তীব্র মনোবেগ—ওইটুকুই পুঁজি। এখন এই পুঁজিকে যে ব্যবসাতেই খাটাও না কেন, তাহাতেই লাভ। আঁটসাঁট শূন্য চিঁড়ের ফলারীরা যত সাত্ত্বিকতার ভড়ংই করুক না কেন, তাহাদের উপর ভরসা করা বৃথা।

একবার তীর্থরাম এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি এই—

"ব্যস্! হয় রাজসিংহাসন, নয় তো চিতা! মাতা-পিতা, তোমাদের পুত্র আজ হইতে আর তোমাদের কাছে আসিবে না। বিদ্যার্থিগণ, তোমাদের বিদ্যাগুরুকে আর তোমরা দেখিতে পাইবে না। পত্নী, তোমার বন্ধন আর কতদিন আঁকড়িয়া থাকিব? ছাগমাতা আর কতদিন তাহার শাবককে আগলাইয়া থাকিবে? হয় রাম সমস্ত সম্বন্ধের ডুরী ছিঁড়িয়া যাইবে, নয় তো তোমরা যত কিছু আশা করিয়া রহিয়াছ, তাহা নির্ম্মূল করিয়া দিবে। হয় রামের এই আনন্দপ্রবাহে ঘর-দুয়ার ভাসিয়া যাইবে, নয়ত এই শরীর গঙ্গার খরস্রোতে সঁপিয়া দিব, চিরকালের দরুণ ইহার হিসাব-নিকাশ হইয়া যাইবে। মরিলে তো সকলের অস্থিই গঙ্গায় পড়ে। কিন্তু রামের যদি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ না হয়, দেহাত্মবোধের গন্ধটুকুও যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এই দেহ জীবন্ত অবস্থাতেই গঙ্গার তরঙ্গে ডালি দিব, মাছেরা ইহার সদ্ব্যবহার করিবে।

জিস্‌কো শোহরত ভী তরসতী হো
রহ রুস্বাই হৈ ঔর্,

হোশ্ ভী জিস্‌পর ফড়ক জায়েঁ
রহ সোদা ঔর্ হৈ।
বন কে পর্‌বানা তেরা আয়া হুঁ
মৈঁ ঐ শমা-এ-তূ-র্,
বাত রহ ফির্ ছিড় ন জায়ে
যহ তকাকা ঔর হৈ।
দেখ্‌না! জৌকে-তকল্লম!
যহাঁ কোঈ ভূসা নহীঁ,
জো মেরী আঁখোঁ মেঁ ফিরতা হৈ
রহ শীশা ঔর্ হৈ।
য়ূঁ তো ঐ সম্যাদ!
আজাদী মেঁ হৈঁ লাখোঁ মজে
দাম কে নীচে ফড়্‌কনে কা
তমাশা ঔর্ হৈ।
জান্ দেতা হূঁ তড়প কর
কূচা-এ-উলফৎ মেঁ মৈঁ,
দেখ লো তুম ভী কোঈ
দমকা তমাশা ঔর্ হৈ।

ভেস্ বদলে মহফিলে-অগয়ার মেঁ বৈঠে হৈঁ হম্
রহ সমঝতে হৈঁ যহ্ কোঈ ওপরা সা ঔর হৈ।

মান-অপমানের ধাঁধা যাহার আছে, সে এক শ্রেণীর; আর যাহার সম্বন্ধে দেহজ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত উবিয়া যায়, সে আর এক চীজ্। হে অচলসম বহ্নি-জ্বালা, আমি তোমার পতঙ্গ, তোমার কাছে আসিয়াছি; দেখিও যেন আমার সেই আগেকার দশা না হয়; আজকার ব্যাপার কিছু অন্য ধরণের। হে নিরভিমানী বাণী, এ তো ফাঁকি নয়; আমার চোখের সামনে যাহা নাচিয়া ফিরিতেছে, এ আলো অন্য ধরণের। ওগো শিকারী, স্বাধীন হইয়া বেড়ানোর মাঝে লাখো আনন্দ আছে স্বীকার করি; কিন্তু প্রেমের ডুরীতে বাঁধা পড়িয়া যে ছটফট্ করা—এ আর কিছু। তোমার প্রেমের পথে চলিতে চলিতে আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইতেছে, আমি সমস্ত প্রাণ তোমাকে সঁপিয়া দিয়াছি; তুমি শুধু এইটুকু বুঝিয়া লও, এই প্রেমের খেলা অন্য ধরণের। এই দ্বন্দ্বময় সংসারে আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বসিয়া আছি; তাহাতেই আমার বঁধু বুঝি ভাবিয়াছ—এ বুঝি সে নয়, আর কেউ? (ক্রমশঃ)

সহজ মানুষ

অলৌকিকদর্শনের জন্যও মানুষের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যা দেখ্‌তে পাচ্ছি তাতে যেন পুরাপুরি সাধ মিটেও মিট্‌ছে না। এই যে অদৃষ্ট লোকের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ, একদিক দিয়ে এ হচ্ছে আমারই ব্যাপ্তি—আমারই অব্যক্ত অংশের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। খুব বড় কথা বটে, কিন্তু অনেকের ক্ষুদ্র আধারই ভূমার পরিকল্পনায় প্রশান্ত থাকে না, হয় বেশী ভাবের সঞ্চারে দিশেহারা হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, নয় তো ভাবের আতিশয্যে উন্মত্তবৎ আচরণ করে। তাই ভেবে-চিন্তে দেখেছি, বুদ্ধদেবের আবিষ্কৃত মধ্যপন্থার চেয়ে আর সুগম পন্থা নেই। কিন্তু এমনি মুস্কিল—এ সহজ কথাটা মানুষ প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। এমনও শুনেছি, গুরু একটা কিম্ভূত-কিমাকার সাধন দিলে না বলে রাগ করে অভিমান নিয়ে, অবিশ্বাসের মোহে কেউ কেউ উৎকট যোগীর আশ্রয় নিতে গিয়েছেন। পরে যখন তাদের মুখেই তাদের পরি-

ণামের করুণ কাহিনী শুনি তখন ব্যথাও লাগে আবার ঘৃণাও জন্মে। তারা আশ্রয় নিতে আসে না, অনুকূল অনুমোদন চায়।

ভাবের সাধন-সিদ্ধ বাহন চাই। এই সেদিনও বিশ্ব-বিশ্রুত বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ আর ভক্ত-প্রবর গিরীশচন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট প্রার্থনা করে সমাধি পেয়েছিলেন। তারপর শক্তি সঞ্চারের ফলে একটু কিছু হতে না হতেই দুজনেই একেবারে অস্থির হয়ে ওঠেন, আর বলেন—"ওগো ঠাকুর! তোমার সমাধি আমাদের লাগে না, এখনও যে আমাদের সংসার, ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র রয়েছে।" গীতাতেও দেখ্‌তে পাই অর্জ্জুনের মনে এরূপ একটা অলৌকিক দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল, শেষে বিশ্ব-রূপ দর্শন করে অর্জ্জুনের কিরূপ অবস্থা হয়েছিল একটী শ্লোকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার উপর অর্জ্জুনের প্রতি তো একটু বিশেষ কৃপাই করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; কেননা যোগৈশ্বর্য্য দেখাবার পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও অর্জ্জুন কম্পমান, কৃতাঞ্জলি, ভীত-ভীত, সগদ্গদ বাক্যে বল্‌ছেন—

> অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
> ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
> তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
> প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

—হে দেব! তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে আমি পরম পরিতৃপ্ত, পরন্তু ভয়ে আমার হৃদয় ব্যথিত; অতএব তোমার সেই পূর্ব্বরূপ আমাকে প্রদর্শন করাও। হে দেবেশ. হে জগদাধার, প্রসন্ন হও। এই বলেও অর্জ্জুনের চিত্ত প্রশান্ত হল না, তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার মানুষরূপে অবতরণ কর্‌লেন, সেই রূপ সন্দর্শনে ভীতির ভাব দূরীভূত হল। অর্জ্জুন বল্‌লেন—

> দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
> ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

—হে জনার্দ্দন! তোমার এই প্রশান্ত মানব-মূর্ত্তি দর্শনে আমি সুস্থ-চিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম। ঐশ্বর্য্য দর্শনে অর্জ্জুন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, সেই বিরাট্ রূপ দর্শনের মত ইন্দ্রিয়শক্তি তাঁর ভিতর আদৌ ছিল না। দেহের সংস্কারের ঊর্দ্ধে গতি হলেই, জীবাত্মার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কেননা জীবের মাঝে যে বদ্ধ-সংস্কারই প্রবল। এতদিনের আবাসভূমি পরিত্যাগে সহজেই একটা অস্বস্তির ভাব আসে। অথচ সেই বিরাট্-রূপ অবলোকন কর্‌তে হলে দেহ-জ্ঞানকে অতিক্রম করে তুরীয়-লোকে উঠ্‌তে হয়। এই ঊর্দ্ধগতির ক্রিয়া সাধন-সিদ্ধ দেহ ছাড়া সহ্য হয় না—তাই ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য আধার ব্রহ্মচারী-ব্রত অবলম্বন থেকেই তৈরী হতে থাকে। এই হঠাৎ চাওয়া আর হঠাৎ পাওয়ার অফুরন্ত বেগ সকলের ইন্দ্রিয়শক্তি ধারণ করতে সক্ষম হয় না। তাই অনুভূতির যোগ্য আধার চাই। ব্রহ্মানুভূতির দরুণ ব্রাহ্মী তনু চাই। আধার-শুদ্ধির প্রতি এত দৃষ্টি আর্য্য-ঋষিরা অনর্থক করেন নি। কেনোপনিষদের শান্তি পাঠে ইন্দ্রিয় সমূহের আপ্যায়ন-মন্ত্র রয়েছে। এর তাৎপর্য্য কি?—না, ইন্দ্রিয়াতীত মহাশক্তিকে অনুভবের ভিতর পেতে হলে, ইন্দ্রিয়শক্তির অসীম পরিপুষ্টি চাই—তা না হলে সেই অমিত তেজ ধারণে অসমর্থ হয়ে ইন্দ্রিয়-শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই প্রপন্ন শিষ্যের প্রতি এত কঠোর পরীক্ষা—তাকে শুধু স্বচ্ছ করে তোলার অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ গুরু যা দেবেন তা যেন ধারণ করতে শিষ্য সক্ষম হয়। আত্ম-সমর্পণ—দাসমনোবৃত্তি নয়, নিজকে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে যোগ্য করে তোলা। যতটুকু হজম করতে সক্ষম না হব, তার চেয়ে বেশীও খেতে চাই; সেটা কিন্তু প্রাণের চাওয়া নয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের লালসা মাত্র। মাঝে মাঝে সহজ কথাটা ভুলে গিয়ে আমরা সেই "অতি"র প্রলোভনে পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। আমাদের মন চায় সেই অসীমের পরশ; কিন্তু দেহ হয় তার

পরিপন্থী। তাই যুগপৎ দেহ-মন, অন্তর এবং বাহিরের পরিশুদ্ধি চাই। তাঁর দান যেন আমাদের আধারের অপবিত্রতায় অবজ্ঞাত না হয়—তাই সাধক প্রলোভনকে তার তপঃশক্তি দিয়ে প্রশমিত করে চাইবে ঠিক অন্তরের চাওয়া।

ঐশ্বর্য্যের দিকও একটা রয়েছে, কিন্তু তাতে আত্যন্তিক পরিতৃপ্তি আসে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব তাই বলেছিলেন—"মা! আমি অষ্টৈশ্বর্য্য চাই না—আমি কেবল চাই তোমাকে! অবশ্য উপাধি আর ঐশ্বর্য্যের মায়া সকল সাধকই অতিক্রম করে উঠতে পারেন না—কিন্তু একদিন না একদিন সত্য-বস্তু লাভের পিপাসায় সমস্ত আবরণের কুহেলিকা তার কাছ থেকে দূরীভূত হয়ই হয়। তা না হলে যে জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় না। সহজ দৃষ্টান্ত দিয়েই তো বুঝি, রাজাকে যদি রাজ-পোষাক পরে অহরহঃ রাজসিংহাসনেই থাকৃতে হয়, আপনজনের সঙ্গে ঠিক সাধারণ ব্যবহার করবার অবকাশ না ঘটে ওঠে, তবে সেই রাজত্বগিরিও যে কণ্টক হয়ে উঠবে। উপাধি তো পরস্পরের স্নেহসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে আমাদের। জননীকে স্থূলে পেয়ে আমাদের যে সহজ অনাবিল আনন্দ, তার তুলনায় সাধন-জগতের ইষ্টদেবীকে দেখে কি ছেলের মত আমাদের হৃদয় আহ্লাদে আটখানা হয়? সে দেখা যে সহজ দেখা নয়, তাই তার মাঝে ভয় রয়েছে, সঙ্কোচ রয়েছে, অলৌকিকত্বের মোহ রয়েছে—ডাকা মাত্র মা হাজির হলেও তাতে যেন সম্পূর্ণ তুষ্টি লাভ হয় না। এই যে স্থূল চোখ দিয়ে যে মাকে দেখছি, তিনি কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে কিম্ভূত-কিমাকার বর দেন না, তবু তো দেখছি এই মায়ের প্রতিই আমাদের আন্তরিক টান। সহজ-সম্বন্ধের যে একটা গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে, মায়ে-ছেলের স্নেহ-জড়িত আচরণেই তা ফুটে ওঠে।

অর্জ্জুনের ভিতর প্রথমেই সেই গভীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়নি, তাই প্রথমে ঐশ্বর্য্য-পিপাসাই তার মাঝে প্রবল হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণও আপত্তি করলেন না—খুব বিশ্বরূপ দেখিয়ে নিলেন—তারপর এল অর্জ্জুনের ভিতর সহজ মানুষের সহজ-প্রীতি। এই হচ্ছে খাঁটী সম্বন্ধ। রূপও রয়েছে জগতে, কিন্তু রূপের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে গেলে আর অরূপকে দেখা হয় না। পরিপূর্ণ আস্বাদনের মাঝে ঐশ্বর্য্য বাদ যাবে না, কিন্তু সাধক-জীবনে প্রথমেই এর প্রতি মজে গেলে সত্য বস্তু হতে বঞ্চিত হতে হয়। ভাগ্য ভাল যার সহজেই বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, তা না হলে তো কেবল জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহ।

সাধনায় অপার্থিব বিভূতি লাভ হয়। কিন্তু এ বিভূতির অত্যাশ্চর্য্য লীলা-খেলা না দেখিয়ে, জগতের নর-নারীকে বিমুগ্ধ না করেও, সহজ কথায়, সহজ-পন্থায় কাম-কলুষিত জীবনে এক অদ্ভুত বিপর্য্যয় ঘটানো যায়—এর আদর্শ দেখিয়েছেন, বুদ্ধদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ। ভিক্ষুদের উপদেশ দেওয়ার সময় দশবল বলতেন, "আত্মা কিম্বা ভগবান্ নাই বা মানলে, কিন্তু পঞ্চশীল পালন করে চল—জীবন পবিত্র হয়ে যাবে।" ব্রহ্মের কথা কিম্বা আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করলেই তিনি মৌনাবলম্বন করতেন—উপদেশ দিতেন শুধু শীল পালন করে চল। আর যুগাবতার পরমহংস-দেব উপদেশ দিলেন শুধু দুটো কথা; আর কিছু ত্যাগের প্রয়োজন নেই—শুধু কাম-কাঞ্চন পরিত্যাগের কথা। ত্যাগ বৈরাগ্যের আগুনে কামনার বীজ বিদগ্ধ হয়ে গেলে, অমাবস্যা রাত্রে চণ্ডালের মৃতদেহ ছাড়াও কেমনে সহজ-সিদ্ধি লাভ হতে পারে, এর স্পষ্ট নির্দ্দেশ পেয়েছি ঐ মহাপুরুষের কাছ থেকেই। সত্য যেমন সহজ—সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষও তেমনি সহজ—কোথায়ও তাঁদের মাঝে অলৌকিকত্ব নেই।

অলৌকিকত্ব দিয়ে সাধুত্বের পরিমাপ হয় না, কিন্তু এ মোহটা এখনো অনেকের মাঝে রয়েছে। সত্যের অনুচর বিভূতি কিন্তু আসলের চেয়ে নকলের

মর্য্যাদাটাই করি আমরা বেশী। মা তো কোনদিন ছেলেকে বিভূতি দেখায় না, অথচ মায়ের উপর কি করে ছেলে জীবন-মরণের ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্তে ধূলো-খেলায় মনের আনন্দে দিন কাটিয়ে দেয়? তা হলে তো দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনকে অতিক্রম করেও মানুষে মানুষে একটা সহজ সত্যিকার সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সহজ-সত্যের সন্ধান মানুষই তো মানুষকে বলে দেবে।

লক্ষ্য করতে হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রগতির দিকে। অলৌকিক দর্শনে তোমার চিত্তের কতটুকু স্থায়ী ঊর্দ্ধ পরিণাম হল, তাই হবে লক্ষ্যের বিষয়। রামও বলা কাপড়ও তোলা—এ তো বড় ভয়ানক অবস্থা। একদিন হয় তো একটা আচমকা সমাধিই লেগে যেতে পারে, কিন্তু সেটা বিদ্যুতের মত চমক দিয়েই সমস্ত অন্ধকার করে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। এ তো তোমার সত্যিকার লাভ নয়!

বুদ্ধদেবের বিশেষত্বই তিনি, মানবের আত্মশক্তিকে প্রচার করেছিলেন। তিনি যাগ মানেন নি, যজ্ঞ মানেন নি, দেবতা মানেন নি; কিন্তু মানবকে বড় করে দেখেছিলেন। মানব যে শুধু দৈবাধীন নয়, এ স্বাধীনতার মন্ত্র তিনিই ঘোষণা করেছিলেন। মানুষকে শ্রদ্ধা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে মহীয়ান্ করে তোলার সঙ্কেত তিনিই শিখিয়েছিলেন। ঋষির অনুভূতির তাৎপর্য্যই হচ্ছে এই—দেবতা দূরে নাই, মন্দিরে নাই, রয়েছেন আমাদের অন্তরে। তাই সজীব-সচেতন মানব-চিত্তই দেবতার মন্দির!

বৈদিক যুগের গুরু-শিষ্যের মাঝেও ছিল এ সহজ সম্বন্ধ। তাই কেউ বা খেতের আলি বেঁধে, কেউ বা একপাল গরু চরিয়েই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। কোথাও তো একটু অলৌকিক ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। এমনি করে গুরুর সহজ নির্দ্দেশকে প্রাণপণে প্রতিপালন করে, নিজের অভিমানকে খর্ব্ব করে দৈনন্দিন সাধনায় যে বিশুদ্ধি তাদের হত, এর চেয়ে আত্মগঠনের সুদৃঢ় সহজ-পন্থা আর কি হতে পারে? আসল কথা হচ্ছে শ্রদ্ধা উপার্জ্জন। নির্দ্দেশ মেনে চলার অবিচলিত বীর্য্য থাকা চাই। চিত্ত যতই হতে লাগ্‌ল, ততই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ জটিল হয়ে উঠ্‌ল। কেবল সাধন-প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন!

আত্ম-শক্তির উপর শ্রদ্ধা যত কমে এল, ততই দৈবী শক্তির মহিমা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। তাই ক্রমশঃ মানুষ হয়ে গেল ছোট, আর দেবতা হয়ে গেল বড়—মানুষ হল পূজক আর দেবতা হল পূজ্য। কিন্তু বৈদিকযুগের মানুষ আর দেবতার সম্বন্ধ কিন্তু পরস্পর-সাপেক্ষ। কেউ কারও চেয়ে বড়ও নয়, তাই কেউ কারও সেবকও নয়। ঋষিরা যজ্ঞ করতেন, তাতে দেবতাদের পুষ্টি হত; আবার দেবতারাও বারি-বর্ষণ করে মর্ত্ত্যবাসীর পুষ্টি বিধান করতেন। এমনি করে একটা সহজ আদান-প্রদানের ভাব বর্ত্তমান ছিল।

স্বানুভব চাই—শুধু একজনার কথায়, এক মুহূর্ত্তের অলৌকিক দর্শনে, গলদ রেখে বাহিরের প্রলেপ দিয়ে জীবনকে আশ্চর্য্যময় করে তুলতে পারলেই মনুষ্যত্বের সাধনা হল না। অন্তরের সত্যকে বাহিরে প্রতিফলিত করে দেখা, ব্যষ্টি-জীবনের আত্মানুভূতিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত করে তোলা—এ-ও একটা চরম কথা রয়েছে; কিন্তু সবের আগে চাই আত্মশুদ্ধি—আত্মতৃপ্তি। বিভূতি দিয়ে নয়, অলৌকিক দর্শন দিয়ে নয়—সাধন-লব্ধ শুদ্ধ-চেতনা দিয়ে একজনকে কল্যাণের পথে প্রচোদিত করাই ঋষিযুগের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের বিশেষত্ব। তাতে বাজে কথা নেই, বাজে আড়ম্বর নেই—শুধু মানুষের প্রতি মানুষের অসীম শ্রদ্ধা।

অনুভবের বিভিন্ন ধারা রয়েছে—কিন্তু সত্য এক। বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন লোকের ভিতর দিয়েও সত্যকে যাচাই করে নেবার পৌরুষ জেগে ওঠে—কিন্তু এ সব

পরীক্ষারও একটা সময় রয়েছে, আগে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ঋষিদের অপর্য্যাপ্ত তপঃশক্তি যোগে, তপে, কত গুপ্ত সাধনায় আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু তাঁরা কথনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সব জায়গাতেই দেখতে পাই, জীবনের মলিনতাকে দৈনন্দিন সাধনা দিয়ে নির্ম্মল করাই ঋষি জীবনের সহজ প্রেরণা। তাই সাধনা ছিল নিত্যসহচর।

সত্যের মাঝে যত গলদ আর প্রবঞ্চনা ঢুক্‌ল ততই সত্যের পেটেণ্ট-রূপ প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল। তখন শুন্‌তে লাগ্‌লাম, রাতারাতি সাধু হওয়া যায়, একদিনের বা অল্প সময়ের সাধনাতেই চরম সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু ভাবের পর তাদের অসম্ভব অভাব দেখে, আর সে কথায় শ্রদ্ধা নেই। আত্ম-চেষ্টায়, আত্ম-সাধনার ফলে যা পাই, তাই আমার খাঁটী লাভ—মানে তাকে আমার জীবনের সঙ্গে নিবিড় করে অনুভব কর্‌তে পারি। আমাকে যিনি ব্যাপ্ত করে রয়েছেন, তিনিই তো আমার আত্মা, তাঁর সঙ্গে তো আমার বিরোধ হয় না—তিনি তো অতিথি নন, আমারই আপন জন! আমি যাকে সহ্য করতে পার্‌ব না, তিনি বড় হলেও আমার কাছে পর, তাই কামনা করেও তাকে প্রত্যাখ্যান করি। অর্জ্জুনের মনে পরিশেষে সেই সহজ-ভাব এসেছিল বলেই বলেছিলেন—“আর তোমার বিশ্বরূপের জগদুদ্ভাসিত জ্যোতিঃ সহ্য কর্‌তে পারছি না, আবার আমার কাছে সহজ মানুষটী হয়ে দাঁড়াও।” এই সহজ কথাটীই সত্যিকার অনুভবের কথা।

আশীষ

—※—

কে আজ এসেছ ভবে নূতনের লয়ে আশীর্ব্বাদ—
মুছে দিতে অতীতের দৈন্য যত দুঃখ-অবসাদ!
এসেছ কি জীবনের নব বার্ত্তা লয়ে—
ফুল-ফল গন্ধে তারি সজীবতা বয়ে?
নাহি জানি রহস্যের তোমার এ ভবনে—
কোন্ গীতি শুনাইবে এ মোর জীবনে;
কোন্ সে বারতা যাহে যাচি দিবানিশি—
তোমা সনে কতটুকু রহিয়াছে মিশি?
নাহি চাহি সে সবার আজি কোন লেখ,
চাহি শুধু আজি এই বজ্রসম রেখ—
আমার এ বক্ষের মাঝে যেই বহ্নিশিখা,
ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাহে যাহা লিখা—
আজিকে উদার অই আলোক সম্পাতে,
আকাশে বাতাসে ওই শুষ্ক তরুসাথে—
যেই নবীনতা আজ তোমার আসরে,
করুক তাহাই দীপ্ত আমার বাসরে;—
আমার যা কিছু হোক্ বিশ্বে প্রসারিত-
তোমার অসীমে মোরে কর অবারিত।
আমার বুকের রক্তে নাচুক ধরণী,
ধরণীর বুকে ভাসি ক্ষুদ্র এ তরণী—
চলুক তোমার সাথে সেই দিব্য পথে,
যেথা হতে নামিয়াছ এই স্বর্ণরথে।
আমা লয়ে ব্যাপ্ত কর আকাশের গ্রহ—
অনন্তে তোমার সনে এক করে লহ!
নিত্য নব নব রূপে নামি এ ধরায়,
দীপ্ত করি, পূর্ণ করি যেন দিন যায়!

চশ্মা

—:*:—

মানুষ মানুষকে যাচাই করে নিতে চায়, অপরকে না জান্তে পার্লে বুঝি তার শান্তি হয় না। মানুষের কোন্খানটায় এ স্পর্দ্ধা, তা যদি সে জান্ত, তাহলে আর নিজকে ছেড়ে পরকে যাচাই কর্তে সে যেত না। যার দরুণ সে অপরকে যাচাই কর্তে যায়, সে কেবল ভুয়ো। অপরের মাঝে যাই থাক্, নিজকে বুঝাই হল সব চেয়ে কঠিন দায়িত্ব। নিজের ক্রটী-টুকু ধরাই হচ্ছে সব চেয়ে শেয়ানার কাজ। বাস্তবিক আমরা নিজের ভুল-ক্রটীর বিষয়ে অজ্ঞ বলেই পরকে যাচাই কর্তে যাই। এইখানে বুঝতে হবে, অপরকে নিয়ে মাতামাতি করার মূলে রয়েছে হয় বোকামী নয় ত নিজেরই ক্ষুদ্র স্বার্থ। কথাটা অবশ্য ঘোরালো হয়ে পড়ল।

বিচার করে মনস্তত্ত্ব ধরে দেখ—মানুষ কোন্ জায়গায় খাঁটী। আমরা আয়নার মধ্য দিয়ে কাকে দেখ্তে পাই?—নিজের প্রতিবিম্বটাকেই তো! মনটাকেও আয়না ছাড়া আর কি বল্তে পারি? কখনো নিজের প্রতিবিম্বই অপরের মাঝে দেখি, কখনো বা অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ি—খাঁটী তত্ত্ববস্তু তো আমাদের বুদ্ধিতে ভাসে না।

মানুষ নিজে যেখানে খাঁটি, সেখানে অপরকে যাচাই কর্বার তার কিছু নাই। সেখানে আপনি খাঁটী-ভেজাল ধরা পড়ে—নিজের অভিমানের বালাই আর থাকে না। আমরা অপরকে যে বিশ্বাস করি না—এর মূলে হল নিজের অভিমানের বালাই। এই অভিমানের ঝক্মারী হতেই অবিশ্বাসের পাটোয়ারী বুদ্ধিটী প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু আসলে অপরকে ঠকাতে গিয়ে আমরা ঠকে আসি নিজেই।

আমাদের দেখতে হবে—অবিশ্বাসের বা সন্দেহের গোড়াটী কোথায়। মানুষ গোড়ার দিকটী ছেড়ে অন্যত্র চিকিৎসা চালায় বলেই বোধ হয় অপরের ভালর চেয়ে মন্দের বোঝাটা বেশী করে বুঝতে থাকে। আমি বলি, মানুষকে শুধু মানুষ দেখাটাই ভুল—মানুষ যে আসলে ব্রহ্ম!

আমরা যার কাছে যা প্রত্যাশা করি, প্রকা-রান্তরে তাই পেয়ে থাকি। মানুষকে যদি কেবল ভাল আর মন্দ এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেল্তে চাই, তাহলেই ভুল হল—কেননা মানুষ একটী অদ্ভুত রহস্য, সে যুগপৎ ভাল এবং মন্দে বিচিত্র। যে জন্য আজ অপরের কাছ থেকে ভাল ফলের প্রত্যাশা কর্ছি, তার কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নিজের কাছ থেকে না নিয়ে কর্ম্ম কর্ছি বলেই এত হট্টগোলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ওইটুকু পাটোয়ারীর বুঝি আর জায়গা মিলে না! তাই মানুষ কাজের ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে ঘুরে মরে, পরকেও কষ্ট দেয়।

যদি ঠকেও যাও, তবু মানুষকে বিশ্বাস করেই চল্তে হবে। কেননা এইটুকু জোর গলায় বল্তে পারি, অতি অধমের মধ্যেও একটু না একটু ভাল থাক্বেই, যেটাকে অবলম্বন করে সে তার খাঁটি জায়গায় নিজকে পৌছিয়ে দিতে পার্বে। ভাল-মন্দের বোধটুকু সবাইর মধ্যেই আছে, তা এখন স্বার্থের দিক দিয়েই হোক আর নিঃস্বার্থই হোক্। আর এ-ও বল্তে পারি, মানুষ মানুষকে বুঝবার মত হৃদয় নিয়েই জন্মেছে। যদি হৃদয় না থাক্ত তো তাকে মনুষ্যদেহে আস্তে হত না। মানুষ মানুষকে বেশ বুঝ্তে পারে। নিজের ভাল-মন্দের দরদে অপরের সুখ-দুঃখও ভেসে না উঠে যাবে কোথায়? মানুষের এ বোধটুকু আছে বলেই ভাবের ঘরে চুরী কর্তে গিয়ে তাকে থম্কে দাঁড়াতে হয়;—কর্ম্মে তার যাই ফুটুক না কেন।

মানুষ পরকে ভাল করবার দরুণ যে রকম প্রচেষ্টা দেখায়, তার সিকি-ভাগের এক ভাগও যদি নিজের জীবনে আগে খাটিয়ে অপরকে বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ত, তাহলেই খাঁটী কাজ হত। কি জন্য যে এ হয়ে ওঠে না—প্রত্যেকের অন্তর্য্যামীই তা জানেন।

গুরুগিরি কর্‌বার সাধ সকলেরই—কিন্তু চেলা জোটে কই? এই হল মহারহস্য। গোটা জগৎটাই এক মহারহস্য দিয়ে ঘেরা। মানুষের মধ্যে এ রহস্য থেকেই যাবে—ভাঙ্গবার সময় বুঝি আর হবে না। বহির্দৃষ্টিতে মানুষকে দেখ্‌লে বাস্তবিক সে খাঁটী; কিন্তু একবার অন্তরে তলিয়ে গিয়ে দেখ, তুমি কোন্ জায়গায় খাঁটী। বাহির দিয়ে অন্তরকে ঘেরাও করে রেখেছ বলেই তুমি স্পর্দ্ধা নিয়ে কাজ করতে যাও। উজ্জ্বল অলঙ্কারটাকে মানুষ প্রশংসা করে থাকে; কিন্তু উজ্জ্বলতার ওপারের যে খাঁটী মানুষটী, তার কথা কয়জনে ভাবে? তাই বুঝি মানুষের অলঙ্কার পর্‌তে বাধে না!

আমাদের মধ্যে অপরের প্রতি সাবধানের মার-টুকুর তো ত্রুটী হয় বলে মনে হয় না। অপরের পক্ষে ঐটুকুই তো যথেষ্ট। যেটুকু সচেতন ছিল, সেটুকুও সচেতন করে দিচ্ছি। এটুকু যদি নিজের প্রতি সচেতন হতাম, তাহলে আর অপরকে দোষী সাব্যস্থ কর্‌তে আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতাম না।

বাস্তবিক চুরী বাইরে কি ভিতরে?—আমি বলি বাইরেও—ভিতরেও। আমার মধ্যে আছে, তাই অপরকে চুরি কর্‌তে দেখ্‌ছি। আমার মধ্যে যদি স্বার্থের ভাব না থাকৃত, তাহলে বোধ হয় অপরের ত্রুটীটাও সহজ ভাবেই ধরে নিতে পার্‌তাম। অবশ্য কথাটা খুব কড়া। কেননা যা বল্‌তে চাচ্ছি, তা সহজ ভাবে মেনে নেওয়া চলে না। নিজের চেয়ে অপরের দোষ-গুণের প্রতি যদি আমার লক্ষ্য থাকে, সেখানে সহজ বলি কি করে? সহজ যেখানে, সেখানে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে পারে না। সেখানে অপরের প্রতি অতিসজাগ দৃষ্টি দিতেও মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে। শুধু এই বলি—কর্ত্তব্যগুলো ঠিকমত হতে থাক্; অনুভবের মাধুরী তার মাঝ থেকেই ঝরে পড়বে। এতে অপরের ক্ষোভের কারণ না হয়ে লোভটাই বেশী হবে; সে লোভ সহজ সত্যের প্রতি লোভ! সার হচ্ছে—যদি খাঁটী দেখা দেখ্‌তে চাও, এই জগতের বহুরূপে সেই বহুরূপী—বিশ্বরূপীকে দেখ, তবেই আর অকল্যাণ থাকৃবে না।

অন্তরাত্মন্

পরম বস্তুকে আমার মাঝে একান্ত নিবিড়ভাবে চাইলেও বাইরেও তাঁর বিকাশ আমরা দেখতে চাই। আমার অন্তরের আধফোটা ফুলটী পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠুক, আবার তার সুবাস বাইরেও ছড়িয়ে পড়ুক, নইলে যেন তৃপ্তি হয় না। অন্তরের সত্যপুরুষ এই যে "অহং বহু স্যাম্"—মন্ত্র জপ করছেন, তাইতেই এ জগতের বহিঃপ্রকাশ। সংহত বীজাকারে যে ব্রহ্ম মানুষের প্রতি শ্বাসে শ্বাসে ধ্বনিত হচ্ছেন, ব্যষ্টির জীবনসত্তাতেই তা আবদ্ধ নয়, সমষ্টিজগতের সমস্ত কলরোল একসঙ্গে শুধু "ওঁ" এই মহাধ্বনিতে পর্য্যবসিত। ব্যষ্টিরূপী জীবাত্মার সমষ্টি-স্বরূপ পরমাত্মার মাঝে আপনাকে ব্যক্ত করতে এমনি

স্বাভাবিকই প্রচেষ্টা চল্‌ছে। নদী বইতে সুরু করলেই কোনও না কোনও আকারে তা গিয়ে সাগরে পড়বেই, এ কথা যেমন ধ্রুব, ব্যষ্টির সমষ্টির মাঝে যে আত্মবিকাশ বা আত্মবিসর্জ্জন, তাও তেমনি একান্ত সত্য। ভক্ত সমষ্টিরূপ ভগবানে যে আত্মসমর্পণ করেন, অথবা জ্ঞানী যে আপনাকে ব্রহ্মময় উপলব্ধি করেন. উভয়ই এই ব্যষ্টি-সমষ্টির যোগ। আমার প্রাণের যে অহরহঃ কান্না, তার মূলেও এই যোগই একমাত্র কারণ। আমার মাঝে যেটুকু আমি অপূর্ণ দেখছি, অথচ প্রাণপণ করেও যেন তাকে ভরে তুল্‌তে পার্‌ছি না ; এই যে একান্ত অশক্তির বোধ, এতেই আমাদের পূর্ণের দিকে প্রেরণা দেয়। জীবনের মহৎ বস্তুকে লক্ষ্য করে যে দিন থেকে আমরা যাত্রা সুরু করেছি, বাধা-বিপত্তির দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতে আজ দৃষ্টি অবরুদ্ধ হলেও সেইদিন থেকেই আমরা অজ্ঞাতে তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়ে চল্‌ছি। যাত্রার কথা মনে নাই, চলার বেগও বুঝ্‌তে পারি না, তাই মনে হয় আমাকে নিয়ে আমি বুঝি সেই একজায়গাতেই থেমে আছি। কিন্তু যিনি টান্‌ছেন, তাঁকে যদি বিশ্বাস করি তবে আর আপনার উপর এই অবিশ্বাস থাকতে পারে না। মুহূর্ত্তের বিফলতার আবেগে যে কতখানি পথ এগিয়ে দিয়ে যায়, আকুলতাকে তীব্র হতে তীব্র করে তিনি যে কতখানি টেনে নিচ্ছেন, তা তো এখন বুঝব না—তাঁর দিকে যে স্রোত দেখে গা ঢেলে দিয়েছি, সে তো আঁধার গহন ঠেলেই সাগরে যাবে, সেখানে পৌছালে তবে না চির আনন্দ, চির আলোকের সন্ধান পাব ?

এমনি করে চল্‌তে চল্‌তে অন্তরের প্রজ্ঞাতে বাহিরকে যেদিন আলোময় বোধ হবে, সেই দিনই আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। অন্তরে আশার দীপটাকে বাইরের ঝঞ্ঝায় যখনই নিবে যাবার উপক্রম হয়, আমরা তখনই এলিয়ে পড়ি। কিন্তু তাকে যদি সূর্য্য করে তুল্‌তে পারি, তবে দেখব বাইরের এই ঝটিকা তাকে নিবিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা—বরং সে আছে বলেই বাইরের জগৎ আমার কাছে দৃশ্য বলে বোধ হচ্ছে আর ঝটিকার অস্তিত্বও তাই মেনে নিচ্ছি। সূর্য্য না থাক্‌লে জগৎও থাক্‌ত না, আমিও থাক্‌তাম না—ঝড়-বাতাস থাক্ বা না থাক্ তা আমার আমলেই আস্‌ত না। যে সূর্য্য আমাদের প্রত্যেককে জীবিত রাখছেন, তিনি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন, তাঁর জ্যোতি অখণ্ড চরাচরকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে বলেই জগৎ সজীব। বাইরের স্থূল ইন্দ্রিয়ের শক্তি সসীম, তাই সীমাবদ্ধ দৃশ্যের মাঝে আমরা তাঁকে যতটুকু দেখি, ততটুকুই আলোকিত মনে হয়, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে তাঁকে আমরা আরও বহুদূরে লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত দেখি। কাজেই অন্তরের সেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের জ্যোতিতে সমস্ত চরাচর আলোকিত হবার কল্পনা ব্যর্থ নয়। হাতের কাছে যেটুকু ধর্‌তে ছুঁতে পাই, তাই যখন জগতের সীমা নয়, জগতের পরিধি কল্পনা কর্‌তে গিয়ে, যেমন যা দেখিনি, আস্বাদন করিনি, তবুও বলি এই আমার বাড়ী-ঘর, গ্রাম-নগর প্রভৃতি আমার পরিচিত স্থানটুকুই জগৎ নয়—এর বাইরেও জগতের অতি বৃহৎ রূপের কথা বহুদর্শীর কাছে শুনে বিশ্বাস করি, তেমনি এই স্থূল-জগতের উদ্ভাসক মহা-সূর্য্য যে আমাদের অন্তরে আবৃত রয়েছেন, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁদের কথায় আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। আমাদের মাঝে আশা-আনন্দ, উৎসাহ প্রভৃতির যা কিছু দীপ্তি বাইরে প্রকাশ পায়, তা সেই আবৃত সূর্য্যেরই দু'একটী রশ্মি মাত্র। যেখানে যা কিছু সৎ, যা কিছু উজ্জ্বল দেখব, বুঝতে হবে সেই উজ্জ্বলতার, সেই দীপ্তির পরিসমাপ্তি ও মূল সেখানেই নয়। আরও সূক্ষ্মে, ব্যাপক হয়ে এমন কোনও শক্তি কোথায়ও লুক্কায়িত রয়েছে যে, যাঁর ছিটাফোঁটা মাত্র বাইরে এসে আমাদিগকে মহাশক্তিমন্ত করে

জগতের সাম্‌নে তুলে ধরে। সেই অন্তর্নিহিত মহাশক্তির আধার বা পরম সূর্য্যই হচ্ছেন আত্মা। তিনিই সর্ব্বব্যাপক।

আমরা বড় হই কিসে? মানুষ একজন আর একজন হতে বড় হয় কি দিয়ে? অন্তরের ব্যাপকতাই তার মূল। সামান্য কৃষককে আমরা একজন দেশ-নেতার চেয়ে ছোট বলি কেন? তার কারণ, একজন কৃষকের চিন্তা মাত্র তার নিজের ও পরিবার-প্রতিবেশী-দের বাইরে বড় ছড়ায় না, আত্মোদর পূরণ ও পরিবার প্রতিপালনেই তার প্রায় সমষ্টিমনঃশক্তি ব্যয় হয়ে যায়, বাকী যেটুকু থাকে, তা দিয়ে হয়ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব বা পাড়া প্রতিবেশী-দের মাঝে জায়গা করে নিতেই নিঃশেষ হয়। আর একজন দেশ-নেতার চিন্তা শুধু আপনাতেই আবদ্ধ থাকে না, সমগ্র দেশ নিয়ে তিনি ভাবেন, সমস্ত দেশময় তাঁর মন ছড়িয়ে পড়ে। এম্‌নি আবার শুধু স্থূল নিয়ে যার চিন্তা, তার ব্যাপ্তি এই স্থূল জগৎ নিয়েই; সূক্ষ্মের রাজ্য পর্য্যন্ত সে আর বাড়ছে না। এমনি অন্তরের ব্যাপকতাই মানুষকে ছোট বড় করে।

কিন্তু আত্মা সর্ব্বব্যাপক, তাই তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা আসেন, অর্থাৎ যাঁরা অন্তর্ম্মুখী হন, তাঁদের পরিধি এই জগৎ ছাড়িয়েও বহুদূর বিস্তৃত হয়, তাই তাঁরা সব চেয়ে বড় হন। সর্ব্বশক্তির মূলাধার আত্মার কাছ থেকে অপরে, যে যে-শক্তিকে আরা-ধন করে, তিনি তাকে সেই শক্তি দিয়ে শক্তিমান্ করে দেন, সাধারণের তুলনায় তাকে সেই বিষয়ে বড় করে দেন; কিন্তু যিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মার আরাধনা করেন, তিনি সবা হতে বড়। তাই নিষ্কিঞ্চন উলঙ্গ সাধু স্বামী ভাস্করানন্দের পায়ে কত মহারাজাধিরাজের মস্তক বিলুণ্ঠিত হত। এখনও লক্ষপতি গৃহীর নিকট একজন কৌপীনৈকসম্বল সম্বল সাধুর কত সম্মান!

বড় বস্তুকে লক্ষ্য করে চল্‌লে রাস্তার ছোট বড় অনেক বাধা চোখেই লাগে না। লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় পূর্ব্বে যা দুঃসাধ্য ছিল, তাও অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। আবার সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যবাদীর পক্ষে যা পাপ বলে পরিগণিত, আদর্শের ব্যাপকতায় অপরের পক্ষে তা অনেক সময়ে আমলেই আসে না। নরহত্যার মত ভীষণ যে পাপ, তাও শুধু ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বশে যেখানে সংঘটিত হয়, সেখানেই পাপ বলে ধরা হয়। কিন্তু বিরাট্ একটা দেশের জন্য, সমাজ বা জাতির জন্য, যুদ্ধস্থলে সৈন্য রূপে একটা কেন, শত শত নরহত্যাতেও পাপ স্পর্শে না। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজে সারথি রূপে অর্জ্জুনের রথ হাঁকাচ্ছেন, আর তাঁকে উদ্বুদ্ধ কর্‌ছেন। বল্‌ছেন—"ওঠো, মার, শত্রু নিধন কর, তোমার পক্ষে এটাই ধর্ম্ম, এই কর্ম্ম না করাই তোমরে পক্ষে অধর্ম্ম।"

আমাদের মনে এখানে মহা সংশয় আস্‌তে পারে, যে এ কিরূপে সম্ভব হয়? গীতায় বারবার বল-ছেন, "মার, এতে দোষ নাই, আত্মাকে যিনি জানেন, তিনি মেরেও হন্তা হন না, মরেও হত হন না" ইত্যাদি। আমরা পাপ-পুণ্যের একটা সংস্কার মনে খাড়া করে নিয়েছি, তাই তার সঙ্গে না মিল্‌লেই মনটা খুঁৎখুঁৎ করে। শেষে আর কোনও মীমাংসা না পেয়ে যেহেতু ভগবান্ বলেছেন কাজেই তা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। কিন্তু বিচার করলে ভগবদ্ভক্তি তাতে আরও বাড়ে বই কমে না। পাপ কি?—যা আমা-দের মনকে সঙ্কুচিত করে, যাতে আমরা ছোট হয়ে যাই। আর পুণ্য—যাতে আমরা আরও বিকশিত হতে পারি, বড় হতে পারি। যার প্রাণে সেই মহামানবের বিরাট্ ভাব এসে মাতোয়ারা করে তুলেছে, সেই বীর যোদ্ধা ক্ষত্রিয়ের মনে যুদ্ধ হতে বিরত হতেই স্বভাবতঃ একটা সঙ্কোচভাব আসে। আপনার জীবনের সেই দুর্ব্বলতা তখন যে কোনও

শোভন যুক্তিতে মন ভুলাক না কেন, সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বেই। আজীবন যে ধর্ম্ম দ্বারা মন শিক্ষিত হয়ে আসছে, সাময়িক তা হতে বিরত হওয়ার ভাব যতই এখন তার মনকে প্রবোধ দিক্ না কেন, আসলে মানুষটা তখন ছোট হয়ে গেছে। তাই অর্জ্জুনের সেই অবস্থায় অমন পরম মৈত্রী, পরম-বৈষ্ণবের ভাব দেখেও ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভুলুলেন না। তাঁকে স্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে আবার স্বধর্ম্মে স্থিত করলেন।

আবার অপর দিক থেকে দেখালেন যে সেই বিরাট্ আত্মাকে যিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর ব্যষ্টির বা সঙ্কোচের ভাব আর স্থান পেতে পারে না। তাই তিনি তখন নিজের দেহপাত হলেও যেমন ভ্রূক্ষেপ করেন না, পরের দেহপাতেও তেমনি উদাসীন। সেখানে কোনও রকম ইতস্ততঃ এলেই বুঝতে হবে যে তাঁর সেই বিরাট্ ভাবের বিচ্যুতি হয়েছে। নতুবা তার এত করে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংকীর্ণ বিচার এসে আপন কর্ম্মের বেলায় ভুল হত না।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥

—যদি কোনও ব্যক্তি নিরন্তর আমার ভজনা করে, সে যদি পরম দুরাচার-সম্পন্নও হয়, তবু তাকে সাধু বলেই মনে করতে হবে, সেই ব্যক্তিই স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। এ কথা শ্রীভগবানের ভক্তের ওপর বিশেষ টান বলে যে তার ওপর পক্ষপাতযুক্ত হয়ে বলছেন, তা নয়। সেই বিরাট্ভাবে যাঁর মন-প্রাণ সর্ব্বদা ভাবিত হয়ে থাকে, এ জগতের সমস্ত নিয়মের উর্দ্ধে তিনি চলে যান। সমরসসম্পন্ন এক দিব্য ভাবের অনুপ্রেরণা ছাড়া বাইরের খুটিনাটী বিশেষ করে তলিয়ে দেখ্বার মত অবস্থা তাঁর আর থাকে না। অহরহঃ তিনি যে বিরাট্ আদর্শে ভাবিত হয়ে থাকেন, সেখানে এ জগৎ অতি তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু মজা এই যে সে অবস্থায় তাঁদের দ্বারা জগতের হিত বই অহিত কিছুই নিষ্পন্ন হয় না। রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব বলতেন "বেতালে পা পড়ে না।"

কাজেই জগতের সঙ্গে তাঁদের ভাবের সাময়িক অমিল হলেও ক্রমশঃ তা মিল হয়ে আসে। বিশেষ যা কিছু তখন তাঁদের জীবনে ঘটে, তখন তা যদিও জগতের চোখে বিসদৃশ হয়, তবুও তা যে জগতের পরম ইষ্ট-সাধক, তা পরে প্রমাণিত হয়। জগতের সঙ্গে মিলিয়ে চলার দায় তখন থাকে না, জগতই তাঁদের সঙ্গে এক পরম মঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়ে মিলে যায়। তা হলেই আমরা দেখি বাইরে জগতের সঙ্গে মিলিয়ে চল্বার, বা বাইরে কিছু ফুটিয়ে তুল্বার অভিমান করেন যিনি সাধক, তিনিই; সিদ্ধের সেটা আপনি হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাব আমাদের পেয়ে বসবে, তার ওপর আমাদের ক্ষমতা না থাক্বে—ততক্ষণ বুঝ্তে হবে ভাব আমরা পাইনি এখনও। অর্থাৎ ভাবের যে প্রতিষ্ঠা, তা এখনও আমাদের মাঝে হয় নি। ভাবই আমাদের পেয়ে গ্রাস করেছে, আমরা ভাবকে পেয়ে গ্রাস করিনি। আদর্শের দিকে যতই আমরা আকৃষ্ট হব, তার মহত্ত্ব ততই আমাদের হৃদয়ে অনুভূত হবে, আর জগতের অর্থও ততই ব্যাপক হতে থাক্বে। সঙ্গে সঙ্গে সে আদর্শ আমাদের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে ছাপিয়ে জগতে উপচে পড়বে। মোট কথা, যখন কিছু দিবার বা ফুটিয়ে তুল্বার অভিমান থাক্বে না, তখনই খাঁটি দেওয়া সুরু হবে। তার আগে শুধু সাধকের নিজের মাঝে অন্তরাত্মাকে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর করে তোলাই জীবনের একমাত্র কর্ম্ম। বাইরে ছড়াবার গরজ সাধকের নয়।

বিচিকিৎসা

——:*:——

সংশয়ই অস্তিত্বের প্রমাণ। দার্শনিকপ্রবর ডেকার্ট বলেছেন—"Philosophy begins on doubt—সংশয় হইতেই দর্শনের উৎপত্তি।" জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে যিনিই যত অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিয়াছেন, তার মূলেই রহিয়াছে সংশয়—জিজ্ঞাসা। ব্যক্তিগত সংশয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া সার্ব্বজনীন কল্যাণকর মৌলিক গবেষণা অনেকের মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত হইতে দেখা গিয়াছে। বড় বড় মনীষীরা এই সংশয় ভঞ্জনের দরুণ কত আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কারও কারও বা জীবনই বিসর্জ্জন দিতে হয়; আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা চোখে দেখি, কাণে শুনি, মুখে কথা বলি, এর মাঝে কোন বিশেষত্বই নাই—কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের দেখা-শুনা, কথাবার্ত্তার মাঝে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে; শুধু তাঁরা দেখেন না, তাৎপর্য্য জানিবার দরুণ তাঁহাদের ভিতর একটা অদম্য উৎসাহ রহিয়াছে। ইহাকেই বলে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা বৃত্তি। সবল জাতি, আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি যাহাদের ভিতর রহিয়াছে, স্বভাবতঃই তাহারা প্রকৃতির আইনকে দুর্ব্বল ছেলের মত অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে চায় না। সবটার মাঝেই তাহাদের "কেন" প্রশ্ন জাগে। এখানে যাহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিব, তাহার মনেও এই "কেন" কিম্বা শাস্ত্রজিজ্ঞাসার তীব্র আবেগ সঞ্জাত হইয়াছিল। চিরকাল লোকে নিয়মের দাসানুদাস হইয়া চলে, শুভমুহূর্ত্তে এমন মনীষীরা জগতে আসেন, যাঁহারা চিরপ্রচলিত সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এক নূতন পথের সন্ধান মানুষকে দিয়া যান। তাঁহাদের মনেও প্রথমে এই "কেন" কথাটাই জাগে। গাছ হইতে ফল পড়ে, ইহা আমরা রোজই দেখিয়া আসিতেছি; কিন্তু এখানেই পাশ্চাত্য দার্শনিক নিউটনের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, ফল কেন মাটীতে পড়ে?" এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসার ফলেই তিনি জগতে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গেলেন। জগদীশ বসুর কথা এমন লোক নাই যিনি না জানেন, আর বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার কি সুনাম আর কি সুযশ, তাহা সকলেরই বিদিত—কিন্তু তাঁহাকেও এই বিনাতারে টেলিগ্রাফ এবং গাছের প্রাণ সম্বন্ধে কম গবেষণা করিতে হয় নাই;—খাওয়া নাই, ঘুম নাই, এইভাবে প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া তবে এক নূতন রাজ্যের জ্ঞান সংগ্রহ করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাহির হইতে বড় একটা সাহায্য পান নাই, কেবলমাত্র সংশয়ের পর সংশয় হইতে নিশ্চিত প্রমাণে গিয়া পৌছিয়াছেন। যাঁহারাই জগতে নূতন কোন কিছু আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর লক্ষ্য করিলে প্রথমেই তীব্র সংবেগ দেখা যায়, তাঁহারা খুব এক জেদী ধরণের লোক হন। আপন প্রতিজ্ঞা হইতে কোনও প্রলোভন তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। উপনিষদেও আমরা এমন একটী তত্ত্বজিজ্ঞাসু বালকের কথা পাই—তাহার নাম নচিকেতা। নচিকেতার পিতা বাজশ্রবা মুনি "বিশ্বজিৎ" নামে এক প্রকাণ্ড যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পিতা জরাজীর্ণ গোসকল ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ-দক্ষিণা স্বরূপ দান করিতেছেন দেখিয়া নচিকেতার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। মনে মনে ভাবিল, এইসকল জরাজীর্ণ গোদানে পিতার কি ফল হইবে? তাই—

> স উবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
> দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥

—বার বার, একবার নয়, দুইবার নয়, তৃতীয় বার যখন নচিকেতা পিতাকে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া

বিরক্ত আরম্ভ করিয়া দিল, তখন বাজশ্রবা মুনি বলিলেন—"যাও, তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করিলাম।" পিতা কি পুত্রের এমন অকল্যাণ কামনা করিতে পারেন? কিন্তু জেদী ছেলে নচিকেতা এই কথাটীকেই প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ যমভবনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। অসম্ভব কার্য্য করিতে হইলেই প্রাণে অসীম বল এবং অপর্য্যাপ্ত সাহস চাই। নচিকেতার কিন্তু দুটী গুণই পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান ছিল। যাইতে যাইতে নচিকেতা যমের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যমের সঙ্গে প্রথমেই সাক্ষাৎ হইল না। তিন দিন না খাইয়া নচিকেতা যমের বাড়ীতে পড়িয়া রহিল। যম আসিয়া নচিকেতার এরূপ দুরবস্থা এবং অতিথিসৎকারে ক্রটী হইয়াছে জানিয়া প্রণাম করিয়া নচিকেতাকে তিনটী বর দিতে চাহিলেন। বুদ্ধিমান্ ছেলে নচিকেতা এক একটী করিয়া বর আদায় করিয়া লইল। প্রথম বরে বলিল—"আমার পিতা গৌতম যেন শান্তসংকল্প হন এবং আমার প্রতি তাঁহার যে ক্রোধ তাহা যেন প্রশমিত হয় আর আমি এখান হইতে ফিরিয়া গেলে যেন আমাকে চিনিতে পারেন।" আর দ্বিতীয় বর হইতেছে—"স্বর্গ-সাধন অগ্নিতত্ত্বের উপদেশ।" এই দুইটী বর শুনিয়া যম বলিলেন—তথাস্তু। কিন্তু তৃতীয়বার নচিকেতা যাহা প্রার্থনা করিয়া বসিলেন, তাহাতে যমকে শুদ্ধ নিয়া টানাটানি। কত মনভুলানো কথা, কত ভোগের প্রলোভন দেখান হইল, নচিকেতা কিছুতেই ভুলিল না। জেদী ছেলের মত একবার যাহা সে চাহিয়া বসিয়াছে, স্বয়ং যমও অন্য কিছু দিয়া তাহাকে বাগ মানাইতে পারিলেন না। তাহার শেষ বরটী এই—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।

—মানুষ মরিলে পর কেহ কেহ বলেন আত্মার পরলোক প্রাপ্তি হয়, আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার পরলোকগমন নাই; এই সর্ব্বজনবিদিত সংশয় সম্বন্ধে আপনার নিকট হইতে মীমাংসা চাই—ইহাই আমার তৃতীয় বর। সংশয় অনেকের মনেই জাগে, কিন্তু তাহার প্রতিবিধান করিবার মত আপ্রাণ চেষ্টা সকলের মাঝে থাকে না। মানুষ মরণশীল এই কথা সকলেই জানে, কিন্তু মরিয়া মানুষের কি গতি হয়, সেই তত্ত্ব জানিবার দরুণ সাধনা কয়জনার ভিতর উদ্দীপিত হয়?

মৃত্যুভয়টা ঋষিযুগে খুব কম ছিল, তাই মৃত্যুতত্ত্ব জানিবার দরুণ জীবনকে বিপন্ন করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইত না। যাহা কিছুই হউক না, জানিবার দরুণ এই সব কিছুতেই ঝাঁপাইয়া পড়ার ভাবটা ঐ যুগে খুব প্রবল ছিল। নচিকেতাও সেই যুগের ঋষির ছেলেই ছিল, ঋষিদের কঠোর তপস্যার তীব্র-সংবেগ তাহার মাঝেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। নচিকেতা হাবা ছেলে ছিল না, তাহার মাঝে জ্ঞান-পিপাসা খুব প্রবল ছিল। ভীরু ছেলে হ'লে পিতার সেই কথা হয়ত গ্রাহ্যই করিত না, কিন্তু নচিকেতা ছিল অসীম সাহসী, তাই মৃত্যুতত্ত্ব জানিবার অভিপ্রায়ে মৃত্যুর অধিপতি যম-রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত। যমকে মানুষ ভয় করে—যমের কথা শুনিলে মানুষের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কিন্তু দুঃসাহসী নচিকেতা তাহার কাছেই গিয়া হাজির। যমরাজের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহাকে রুক্ষ-সূক্ষ্ম, নিষ্ঠুর একটা জমকালো অদ্ভুত জানোয়ার বলিয়া মনে হয়। তাহার যে আবার একটা হৃদয় আছে, মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতে জানে এটা কিন্তু ভুলেও মনে আসে না। কিন্তু নচিকেতার সঙ্গে যমরাজের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে মনে হয়—বাহিরেই শুধু কঠোরতা কিন্তু অন্তর তাঁহার কোমলতায় পরিপূর্ণ। যম দেখিলেন

শুধু নচিকেতা কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহে, তত্ত্ব জানিবে তবে ছাড়িবে। তাই নচিকেতাকে যোগ্য অধিকারী বিবেচনা করিয়া ব্রহ্ম-প্রতীক্ ওম্ মন্ত্র দ্বারা দীক্ষিত করিয়া নিলেন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে আত্মা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া শেষে এই শ্লোকটা বলিলেন —

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জাতৃণ হইতে যেরূপ মধ্যের ডগটি বাহির করেন, তেমনি ধৈর্য্যসহকারে অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিবে—তাঁহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় বলিয়া জানিবে। শুধু আত্মাকে নয়—আত্মাকে কেমন করিয়া লাভ করা যায়, তাহার সঙ্কেতও নচিকেতাকে বলিয়া দিলেন। আত্মা যে অজর, অমর, নিত্য—এ শিক্ষাও যমরাজের নিকট হইতেই নচিকেতা লাভ করিলেন।

সত্যকে পাওয়ার আকুলতাই হইল সাধক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। বিবেকানন্দও একদিন ঘোর সংশয়ে পতিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর আছেন কি নাই, ইহাই তাঁহার কাছে একদিন বড় সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন কি যে তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা—শেষে একদিন দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে গিয়া যুগাবতার পরমহংসদেবের নিকট সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন। তাঁহাকেও কি কম পরীক্ষা করিয়াছিলেন বিবেকানন্দ? পরে যখন পরমহংসদেব বলিলেন, "এই যেমন ঘর-বাড়ী আর এই তোকে স্থূল চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তেমনি ভগবান্‌কেও এই স্থূল চোখ দিয়ে দেখা যায়।" শুধু মুখের কথা নয়, পরমহংসদেব যখন সাক্ষাৎ মায়ের সঙ্গে দর্শন করাইয়া দিলেন, তখন বিবেকানন্দের সংশয় নিরসন হইল। ভগবান্‌কে জানিবার দরুণ এরূপ তীব্র আবেগও সকলের প্রাণে আসে না, তাই পথনির্দ্দেশকও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না। কিন্তু এ কথা ঠিক, সংশয় যেমন রহিয়াছে, তেমনি তাহার একটা মীমাংসাস্থলও রহিয়াছে।

সত্যকে প্রয়োজনে খাটানো যায়; ইহাই হইল Pragmatic view of Truth, ন্যায়ের অর্থক্রিয়াকারিত্ব। এই দিক দিয়া ভারতীয় তন্ত্র-সাধনার মাঝে যথেষ্ট গুপ্ত রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ইষ্টকে দিয়া ঘরের বেড়া বাঁধানো, পাথর বহাইয়া লওয়া—এই সব কিন্তু তন্ত্রসাধক রামপ্রসাদ, ব্রহ্মানন্দ গিরি ইঁহারাই করিয়াছিলেন। শক্তির আরাধনায় জগতে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। সত্যের জোরে মানুষের ভিতর অসীম তেজ জাগে। আদিম যুগের বিশেষত্বই এইখানে—তখন মানুষের অপর্য্যাপ্ত মানসিক এবং শারীরিক বল ছিল। সকলের সুখ-দুঃখের বেদনা নিজ প্রাণে অনুভব করিয়া সেই বেদনা অপনোদন করিবার জন্য আত্মত্যাগের জ্বলন্ত প্রেরণা প্রত্যেকের প্রাণেই প্রদীপ্ত থাকিত। সত্যকে জানিবার, অনুভব করিবার এমন আপ্রাণ চেষ্টা আর কিন্তু দেখা যায় না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার সংযোগ রহিয়াছে, এইখানেই তাহার পরিচয় পাই—যখন দেখি, আত্মতৃপ্তি ছাড়াও জগতের প্রতি তাঁহাদের একটা গভীরতর স্নেহ এবং সহানুভূতির ধারা স্বতঃই বর্ষিত হইতে থাকে। সমস্যার তীব্রতার দাহনে প্রত্যেকের হৃদয়ই প্রপীড়িত হয়; অনেকের বা শক্তিই থাকে না যে সে একটু লড়াই করিয়া দেখে। কিন্তু এমনও মহান্ পুরুষ জগতে অবতীর্ণ হন, যাঁহার বুকের উপর দিয়া সমস্ত সুখ-দুঃখের তুফান নির্ঝঞ্ঝাটে বহিয়া যায়; সকলের হইয়াই যেন তাঁহাদের সাধনা—সকলের দরুণই যেন তাঁহাদের মরণ। শুধু আত্মমুক্তি নহে,

পরের জন্যও এইভাবে নিঃস্বার্থ প্রাণ কাঁদা—এ কি কম কথা? নিজকে অতিক্রম করিয়া কয়জনের দৃষ্টি সমষ্টির দিকে ধাবিত হয়?

ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্ব্বল, সঙ্কল্প অপরিস্ফুট, তাহাদ্বারা জগতের কোন বড় কাজ হয় না। তাহারা আসে জগতে কেবল অসুবিধা আর উপকরণের অভাব দেখাইতে। এটা কেন হইল না, ওটা কেন হইল না, এই তাহাদের অনুযোগ। শক্তিবন্তের মত যাহা পাইয়াছি তাহার ভিতর দিয়াই জীবনকে সার্থক করিয়া তোলা তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। সংশয়ের মধ্য দিয়া চিরপ্রচলিত সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া পারিপার্শ্বিকের অদৃশ্য আকর্ষণের মোহকে নির্জ্জিত করিয়া কয়জন নূতন পথের সন্ধান দিতে পারেন? কাজেই পথপ্রদর্শক জগতে দুর্লভ—পথহারা পথিকের সংখ্যাই বেশী। শুধু নিজের বুকের বোঝার আসান নয়, সকলের দুঃখ যিনি মোচন করেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারি?

এই যে একজনের ভিতর দিয়া সকলের হৃদয়ের সমস্যা এবং সমাধান পাই তিনিই হইলেন আর সকলের গুরু। তিনি আমার সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত বলিয়াই তাঁহার কাছে এমন আকুল-হৃদয়ে ছুটিয়া যাই। তাঁহার নিকট হইতে আশ্বাস পাই—তিনি বলেন, "আমিও দেখ, এই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই অনবদ্য সুখের সন্ধান পাইয়াছি।" যখন দেখি, তাঁহার অনুভূতির সঙ্গে আমার হৃদয়ের ব্যথা মিলিয়া যায়, তখনই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তিনি আমার মনের কথা বুঝেন, এইখানেই তো তিনি গুরু।

কতকগুলি সমস্যা আছে ব্যক্তিগত জীবনের। কিন্তু মরিলে পর কি হয়, এই সমস্যা সকলের মাঝেই রহিয়াছে। এই দিক দিয়া নচিকেতা জগতের গুরু। অসম্ভবের রাজ্যে প্রথমে যিনি সম্ভবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাকে যে কত বাধা-বিপত্তি, লোকাপবাদ তাচ্ছিল্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই যে সকল আকর্ষণকে ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগতির অফুরন্ত বেগ—ইহাই হইল মানবের প্রাণ-শক্তি। জাতির দুর্ব্বলতার পরিচয় পাই তখনই, যখন আর প্রাণশক্তির স্ফুরণ দেখি না। যাহা পাইলাম তাহাকে যাচাই না করিয়া অবনতশিরে গ্রহণ করা বৈদিক যুগের ঋষিদের ধাত ছিল না। অহরহঃই প্রকৃতির পরিণাম ঘটিতেছে, কাজেই নূতন কিছু পাইবার কিম্বা জানিবার আছেই এবং থাকিবেই। এখন চাই প্রকৃতির দ্বারে আঘাত—আপন গুপ্ত রহস্য আপনি সে খুলিয়া দিবে।

বিনিময়

—:*:—

সাগর, খাল, বিল, নদী, পুকুর সব শুকুচ্ছে, সব জল শুষে গিয়ে মেঘ হয়ে বৃষ্টিরূপে আবার তা ধরায় নেমে আসছে! রাজা প্রজার কাছ থেকে কর নিচ্ছেন, আবার তা তাদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধা-রূপে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিবেশী, ভাই-বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা অসময়ে সাহায্য নেই, আবার আমাদের সুসময়ে তাদের তা নানা আকারে প্রত্যর্পণ করি; জগৎভরা এমনি আদান-প্রদানের ভাব না থাকলে দুনিয়া অচল হয়ে যেত। চন্দ্র-সূর্য্য, ইন্দ্র-বরুণ, পৃথিবী-স্বর্গ, মানুষ-দেবতা প্রভৃতি প্রত্যেকের মাঝে

পরস্পর এই বিনিময় বা একের ওপর অপরে অনেকখানি নির্ভর করেই সৃষ্টিকর্তার এই নিখিল সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে অক্ষত রেখেছে। আর মানুষ এ জগতের সর্ব্বত্র তো বিচরণ করছেই, অধিকন্তু ক্ষুদ্র হয়েও এই বিনিময়ের জোরে এমন কোনও স্থান নেই যেখানে গিয়ে তার চিন্তা নিয়ে একটা ধাক্কা না দিয়েছে। পুরাকালে যখন মানুষের প্রথম মনুষ্যত্বের বিকাশ হল, তখন তাদের যে পরিচয় আমরা বেদাদি গ্রন্থে পাই, তাতে দেখি, এই জগতে থেকেও মানুষ আপন শক্তিতে দেবতাকে পর্য্যন্ত এখানে টেনে এনে তাঁর শক্তির সাহায্য নিয়ে আপন প্রয়োজন সম্পন্ন করে নিয়েছে।

হিন্দুর যাগ-যজ্ঞাদি সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের মাঝেই আমরা দেবতার সঙ্গে তাঁদের একটা সহজ যোগের পরিচয় পাই। সেই প্রাচীন বেদের যুগ হতে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে দেবতার নিকট হতে এই দেওয়া-নেওয়ার ভাবটা বিদ্যমান। হিন্দুকে যারা পৌত্তলিক বলে গাল দিয়ে এ সমস্ত উড়িয়ে দেন, তাদের কাছে এই সমস্ত ব্রত-পার্ব্বণাদি নিরর্থক কতকগুলি কুসংস্কার বলে মনে হলেও একদিন কিন্তু এই সংস্কার নিয়ে হিন্দুর এক বিরাট্ সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল। আর হিন্দুর দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি যা কিছু জগতের পরম আশা-ভরসার উজ্জল রত্ন-স্বরূপ, সে সমস্ত এই সংস্কারকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাই হিন্দু আজও এ সমস্তের মাঝে এক নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পায়। আর তার দানের দিক দিয়ে তো কথাই নাই। জগতকে সে এই সমস্তের মাঝ হতে এমন কিছু দিয়েছে ও দিচ্ছে যে সমস্ত পৃথিবীর মহা মহা মনীষীরাও তাকে এখনও নূতন সত্য বলে পরম আগ্রহভরে মেনে নিচ্ছেন। হিন্দুর এই দেবতা-তত্ত্বকে আশ্রয় করে পাশ্চাত্যজগতের সার্ ওলিভার লজ্, প্রমুখ বিজ্ঞমণ্ডলী আজকাল যে সমস্ত গবেষণা করছেন, তাতে সুধীবৃন্দ চমৎকৃত হচ্ছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এর মূলে যে সেই হিন্দুর প্রাচীন তথাকথিত কুসংস্কারই, সে কথা আশা করি বিস্মৃত হবেন না। সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদরা হিন্দুর রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তিকল্পনাকে আজ আর নেহাৎ উড়িয়ে দিতে পারছেন না। এ সমস্ত বিষয়ে হিন্দুর যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তার কাছে বর্ত্তমান সভ্যজগৎ বহুদিন পাঠ নিতে পারবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় এই দেবতা সম্বন্ধে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে,

> দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
> পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

—যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর, সেই দেবতাগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর।

প্রাচীন কালের সেই যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদের নিকট হতে বর লাভ করার ভাবটী যেমন এখানে রয়েছে, তেমনি আবার দেবতারাও যে আমাদের কাছে কিছু প্রত্যাশী, অন্ততঃ আমাদের দ্বারা তাঁদের তুষ্টিকর কিছু না হলে যে শুধুই তাঁরা দেন না, আবার তাঁদের কাছ থেকে কিছু পেয়েই যে আমরা কেবল ভোগের দ্বারাই তা সমাধা করি না, তা দিয়ে আবার দেবতাদেরই পূজা করতে হয়—এই ভাবটী সুস্পষ্ট। মানুষ যা কিছু পায়, তা যদি শুধুই ভোগে নিঃশেষ করে, 'আগ' তুলে ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য কিছু না রাখে, তবে তার আশু পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার তাদের এই উদ্বৃত্ত অংশের উপর নির্ভর করেই সমষ্টি মানবের মঙ্গল নির্দ্ধারিত হয়। আমাদের কষ্টোপার্জ্জিত বিত্তের সবটুকু যদি ভোগেই পর্য্যবসিত করি, ত্যাগের দ্বারা পবিত্র ভাবে তাকে জগদ্ধিতায় কিছু নিবেদন না করি, তবে এমন ভোগ-পরায়ণ আত্মকেন্দ্রিক জাতির অস্তিত্বও শীঘ্রই লোপ পাবে। তাই আমাদের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই পরে বলছেন—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥

—যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাগণ তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করবেন। তাঁদের দেওয়া এই ভোগ যে আবার দেবতাদিগকে নিবেদন না করে ভোগ করে সে চোর।

তা হলেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদ্বারা যেমন তেমন করে অর্জ্জিত হলেই তাকে নিছক উপভোগ করবার দাবী আমার নাই। আমার এই সঞ্চয়ের মূলে আরও অনেক ভাগী মহাজন রয়েছেন। প্রকৃত অধিকারী তাঁরাই। আমি মানুষ বলে খেটেখুটে কেবল তার ভাণ্ডারী মাত্র হতে পেরেছি। এই জন্য হিন্দুর নিয়ম যে, দৈনিক দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ সমাধা না করে কেহ স্বীয় উদর পূরণ করতে পারবে না।

আমরা মানুষ। সমস্ত পৃথিবী হতে নিজকে বিচ্যুত করে যখন আপনার দিকে তাকাই, তখন আমরা প্রত্যেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। কিন্তু যখন এই বিরাট্ পৃথিবীর মাঝে অনন্ত অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মাঝখানে কেন্দ্র-স্বরূপ এই মানুষের উপলব্ধি হয়, তখন যে আর এর পরিধি খুঁজে পাই না, সমস্ত শক্তির আহরণকারী মানুষের দায়িত্বও তখন কত দূরদূরান্তে বিস্তৃত, তা ভেবে অবাক্ হই। এই স্থূল-জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, আমার পার্শ্ববর্ত্তী সহকর্ম্মী হতে আরম্ভ করে পরিবারবর্গ, প্রতিবেশী, গ্রাম, নগর, দেশ, মহাদেশ সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেকের যেমন আমার ওপর দাবী আছে, তেমনি, এই আলো-বাতাস ভূমি জল প্রভৃতির সূক্ষ্মদেবতার, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পিতৃ-পিতামহগণের, ঋষি-সমাজের, দেবতাসমূহের, আগত অনাগত সমস্ত প্রাণীবর্গেরও আমার ওপর দাবী রয়েছে। এ দাবীর দায় এমনি মজার জিনিষ যে যতই আপনাকে দায়ী করা যায়, দানের মহৎ ইচ্ছা সঞ্চয়ের প্রবল শক্তি ও আগ্রহ ততই যেন বর্দ্ধিত হয়। এই দাবী মিটাতে গিয়ে আপনাকে আরও আমরা মহান্ হতে মহত্তর করে নিতে থাকি। কাজেই এ দানে অতৃপ্তি নাই, আছে এক পরম মধুর অনাবিল আনন্দ। এ দানে অভাবের দারুণ নিপীড়নই বাড়িয়ে তোলে না—এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির ঐশ্বর্য্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে মিলিত এক অনাস্বাদিত নূতন রসে মানুষ মাতাল হয়ে থাকে।

এই অদ্ভুত দান শুধু কেবল অন্ন দিয়ে নয়, এ জগতে এসে ধরিত্রীর বুকে আমরা যত দিক থেকে লালিত-পালিত হই, যত প্রকারের আহরণ দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হই, সে সমস্তের প্রতিদান স্বরূপে হিন্দুঋষি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন। এই পঞ্চযজ্ঞ শুধু ঋষিগণ বা দেবগণ প্রভৃতির হাত থেকেই নিস্তার পাওয়া নয়; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যা কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে সমস্তকে পরিতৃপ্তি দিবার জন্য ঋষির এই যজ্ঞের পরিকল্পনা।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জগতের অধিকার, এই আলো-বাতাসের অধিকার, বেঁচে থাকবার অধিকার আমরা শুধু নিজের শক্তিতেই আহরণ করিনি। আমি ইচ্ছা করে সকলের অনুগ্রহকে সরিয়ে রেখে এ জগতে আসতে পারিনি, বাঁচতে পারিনি। তবেই বলতে হয়, এর মহাজন শুধু আমরা নই। আজ উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের হস্তে ন্যস্ত ধনের আমরাই শুধু মালিক নই। এ ন্যাসের মালিক যাঁরা তাঁরা শুধু আমাদের এই সমস্ত অধিকার দিয়ে এই জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনকে আরও বিকশিত করতে ন্যাস স্বরূপে কিছু কিছু ধন আমাদের সঙ্গে দিয়ে এ জগতে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে যেন তাঁদের দেওয়া এই অমূল্য দানকে আমরা পঙ্কিল

ভোগে বিকৃত করে না ফেলি; ত্যাগ দ্বারা আবার একে আরও সুন্দর সুদৃশ্য বহুজনহিতায় ও বহুজন-সুখায় করে তুল্‌তে পারি।

ত্যাগ আমরা কিসের মাঝ দিয়ে করব? কি করব? ঋষি বল্‌ছেন, প্রাত্যহিক ভোগের ভিতর দিয়ে, দৈনিক কর্ম্মের মাঝ দিয়ে, নিজের একান্ত কষ্টোপার্জ্জিত ধন হতে বঞ্চিত করে, ইচ্ছা করে আপনাকে কৃচ্ছ তার ভিতর দিয়ে অপরকে পুষ্ট করতে শ্রীযুক্ত করতে, সুখী করতে চেষ্টিত হব। আপনাকে এইরূপে অপরের মাঝে সংক্রমিত করে ব্যাপ্ত করতে হবে। আপনার এমনিতর ত্যাগেই আপনার যথার্থ জীবন লাভ ও জগতের কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্রাহ্মণের নিয়ম, অপরকে ঋষি-শাস্ত্র অধ্যাপনা করে ঋষিঋণ পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং নিজের আগে অধ্যয়ন চাই। দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞ করতে হবে, সুতরাং হব্য সংগ্রহ প্রয়োজন। পিতৃগণের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ চাই সুতরাং সে শ্রদ্ধা বা বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস আপনার প্রতি কর্ম্মে জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে যেন তাতে তাঁদের নাম থাকে। অনন্তকোটী জীবে পরিবৃত এই সংসার। তার মাঝে সাধ্যমত ভূতবলি অর্থাৎ অপর জীবকে ভোজ্যাদি দ্বারা জীবিত থাকবার সাহায্য করতে হবে। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মচর্য্য বা আপনার মাঝে যে অগ্নি সমস্ত ক্লেদরাশি ভস্মীভূত করে ভূতে ভূতে আপনাকে বিস্তার করে আছে, সেই অগ্নির পরিতৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক আপনাকে ব্রহ্মময় ভাবে উদ্‌বুদ্ধ করা চাই। এই যদি মানুষের সাধন হয়, দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মানুষ যদি এমনি করে নিজকে ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে যেতে থাকে, তবে তার জগৎ অপরিসীম, আনন্দ অনির্ব্বচনীয়, সুখ অনবদ্য হয়ে উঠবে। ভাবের উদ্বোধনে বিশিষ্ট ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ প্রত্যেক দেবতারই সন্তুষ্টি, প্রতি জীবেরই পরিপুষ্টি হয়ে জগতে দিন দিন পরম শ্রেয়োবিধান করে এগিয়ে চল্‌বে।

দেশবন্ধু

——(:*:)——

বিশ্বজননী ভারতমাতা হয়ে আমাকে কোলে স্থান দিয়েছেন। জাতীয়তার বড়াই করি না, কিন্তু এই স্বদেশের গৌরব আমার হৃদয়ের ধন।

আমার ভিতর একটা প্রবল গর্ব্ব আছে, নানান্ দিক দিয়ে সেটা প্রকাশ পায়। প্রতিবেশীরা সকলেই জানে—ওর ঐ এক বাতিক। তাই যে বোঝে, সে ভালবাসে, যে বোঝে না, সে অবজ্ঞা করে। আমি কিন্তু ভাই একটা কিছুর নেশা না হলে বাঁচি না। কোনোপ্রকার গর্ব্ব-গৌরববিহীন হয়ে দেশটার মেরুদণ্ড যে আজো কি করে খাড়া আছে, বুঝে উঠতে পারি না। আমি তো নিজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে এমন এক বিরাট্ গর্ব্বের যোগান পাই—তাতে কাজে-কর্ম্মে প্রাণ আমার সর্ব্বদা উদ্দীপিত রাখে। চাই যে এ গর্ব্ব আমাদের সকলের ভিতরেই জাগুক—নতুবা আমার আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হয় না।

যদিও এ গর্ব্বের ভিত্তি সত্যি কি মিথ্যে, কল্পনা কি প্রেরণা, তা জানি না—তবু আমার সাহস হয়, বুক ঠুকে এ কথা বল্‌তে পারি, আমার যদি গর্ব্বের কিছু না থাকত, তবে যে আমি কী হয়ে যেতাম, সে আজ কল্পনায় আনতে পারছি না।

তবে, দেখতে হবে—এই গর্ব্ব হতে আমাদ্বারা কারো কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা; আত্মোন্নতির

বাধা ঘটেছে কিনা। সমাজের ক্ষতি যদি করে থাকি তো এ গর্ব্ব মিথ্যা!—নতুবা এ-ই আমার জীবনের পাথেয়। তারপর যদি কোন নিরাশ্রয় আমার গর্ব্ব বা আমারই অতিরিচ্যং সত্তার প্রেম-প্রসারিত বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়েই মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে জান্‌তে পারি, তবে সেই তো গৌরব, তাতেই তো আমার সার্থকতা। আমি ছাড়া জগতে যা কিছু সবি আমার ভগবান্; আমার গৌরব যদি জগতের প্রাণে প্রাণে নিশে তাঁরই গৌরবকে উদীরিত কর্‌তে পারে—তবে তাতে অলাভ কার?

যদিও একটা কিছু লাভের আশায় ভাল হওয়াটা হীনতা মনে করি, তবু আশা করি, এই নিষ্কিঞ্চন গর্ব্বই আমাকে অশেষ ক্ষুদ্রতা দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে তুলে রাখবে—কোন তুচ্ছ বস্তুতে লিপ্ত হয়ে আমি শান্তি পাব না; কাজেই তাঁর দিকে এই গর্ব্বই আমাকে এগিয়ে নেবে!

থাক্, এ গর্ব্বই থাক্—নিছক্ আত্মশ্লাঘা হয়ে নয়, দেশের গৌরব হয়ে। প্রাণের যে অনাহূত অতিথি, তাকে বিমুখ কর্‌ব কেন?

রিক্ততারও একটা গৌরব আছে—ত্যাগীর কাছে; কিন্তু গৌরববিহীন রিক্ততা আর "হায় কিছু হল না, হল না" নিজেদের মাঝে এ ভাব দেখ্‌লে প্রাণে বড় ঘা লাগে। বিনা চেষ্টায় অনেকের প্রাণের খবরই পাওয়া যায়, তবু এক একসময় ইচ্ছা করেই হাত বাড়াতে হয়। একজনকে আমি পরম উৎসাহী বলে জান্‌তাম; হঠাৎ নিশ্চেষ্ট দেখে একদিন এগিয়ে গিয়ে কথা-বার্ত্তায় প্রাণের মধ্যিখানে প্রবেশ কর্‌লাম। দেখ্‌লাম, বড় জড়, প্রাণের উষ্ণতেজ যেন নিবে গেছে। বুঝ্‌লাম, ভেবে ভেবেই সে নিজের দফা সেরেছে। যাদের ভিতর মৃত্যুঞ্জয় তেজ প্রবাহিত হবে বলে জানি, তারা কেন এমন দৈববশ, এমন পুরুষকারবিহীন, এমন বিব্রত?—কেবল আক্ষেপ, অনুযোগ আর আপত্তি? এই কি জাতীয়তা? এই নিষ্কর্ম্মা পরম জড়মতিত্ব, এরই নাম অহিংসা? হায়, ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্যের বীজ যে আমাদেরই প্রাণের মাঝে রয়েছে, সে গর্ব্ব থেকে আমরা বঞ্চিত!

যে বাড়ীতে আছি, শুধু সেই বাড়ীতেই নয়, আজ দেশ জুড়েই দেখছি, প্রাণের দীপ্তি মিলিয়ে গেছে, মানুষ অতিমাত্রায় অচঞ্চল হয়ে পড়েছে। নিজের শক্তিকে সে খাটাতে চায় না—তার নাকি শক্তি নাই! এই নাই-নাই কর্‌তে কর্‌তে যা ছিল তা-ও গেল! প্রায় মুখেই শুনি—"বয়স নাই", "সুযোগ নাই", "এ জীবন তো বয়েই গেল, যাক্ গে কচুপোড়া—যা হবার হবে"—ইত্যাদি। এই সমস্ত অসার জল্পনায় শিক্ষার পিপাসা মরে ভূত হয়েছে—আছে শুধু জীবনটা ভরে স্বেচ্ছাস্বীকৃত বিশৃঙ্খলা আর শুধু নাকিসুরে পরের কাছে আর্ত্তি! আত্মগৌরব আর উৎসাহ নিবে জল হয়ে গেলে সে মানুষ দিয়ে কি কাজের কাজ হয়? কাজ কর্‌লেও করেছি বলে তার বিশ্বাস হয় না, ভরসা জাগে না। এমনি ধরণের মেরুদণ্ডহীন জীবন সত্যি কি প্রাণে চায় কারো?

এ বড় দুঃখের কথা—ওদের হয়, আমাদের হয় না—কেন? ওরা এক একজন প্রৌঢ়-বৃদ্ধ বয়সে এ দেশে প্রবাসী হয়ে এসেও দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সম্পদ্ অর্জ্জন করে নিয়ে যাচ্ছে; নিজেরা তো প্রাণ ভরে শিখছেই, উপরন্তু আমরাও যাতে শিখতে পারি, তাদের জাতভাইদেরও যাতে শিখতে বেগ পেতে না হয়, সে ব্যবস্থাও করে তবে ছাড়ছে। আর ছাড়লই বা কই?—আমাদের জিনিষের কদর আমরা বুঝি না, কিন্তু তারা বোঝে। উদাহরণের অন্ত নাই। ভাল ভাল ব্যাকরণ, অভিধান, বেদের ব্যাখ্যা, দুরূহ ভাষাকে সুগম করবার নানা পদ্ধতি,—ইত্যাদি দুর্গমকে সুগম করবার নানা আয়াস, প্রাণপাতী তপস্যা—এ সবি আজ তাদের হাতের করাই বেশী দেখ্‌ছি। তারা পরের মুখ তাকিয়ে কাজ করে না—তাদের নিজের গৌরববোধ আছে, জাতী-

য়ত্তার গর্ব্ব আছে, তাদের প্রতি কর্ম্মে এমনি সরল প্রাণের সহজ স্ফূর্ত্তি। পরনির্ভরতায় স্বস্তি আছে?—জীবন্ত মানুষ কখনো অমনি করে কেঁচোর মত গড়িয়ে গড়িয়ে আর টেনে টেনে চল্‌তে পারে কখনো?

তারা কি পেয়েছে না পেয়েছে, সে বিচার করতে যাব না—কিন্তু তাদের প্রাণের বেগ কত, স্বাধীনতার সম্মান কত? এগুলি কি আজ আমাদেরও প্রাপ্তব্য নয়? যদিও তারা বুদ্ধি দিয়েই আমাদের পেয়েছে, তার বেশী যেতে পারেনি, এই আমরা বলি, তবুও আমাদের এ জড়তা কি সমর্থনযোগ্য? আমরা যেখানে অজ্ঞতায়-অবহেলায় একেবারে পরাঙ্মুখ হয়ে পড়েছি, সেখানে তাদের যত ক্ষুদ্র প্রগতিই হোক্ না কেন, তাই আমাদের পরম গৌরবের বস্তু। আমাদের পুরুষানুক্রমিক প্রাপ্য যে সম্পদ্‌কে আমরা কাচখণ্ড জ্ঞানে অগ্রাহ্য করে বসে আছি, তাকে ঘষে-মেজে সযত্নে শিরোধার্য্য করে আজ তাদের কত শোভা কত দীপ্তি বেড়েছে—দেখে শুধু হতাশ নয়নে আপশোষ করা ছাড়া যেন আমাদের আর কর্ত্তব্য নাই!

আমাদের আর তাদের বলে একটা ভেদভাব রাখা কেন?—তারা যা করেছে, করেছে—বেশ তো, ভাই-ভাই একঠাঁই হতেই তো প্রকারান্তরে চেয়েছে। তারা যা পরের জন্য পেরেছে, আমরা কি শুধু নিজের জন্যও তা পারি না? তাদের তো জাগাতে হবে না, জাগ্‌তে হবে আমাদের; মিলন তো তখন আপনি হবে! আমার তো খুব বিশ্বাস, আমাদের বেদ-দর্শন আমরা যেমন বুঝব, তারা তেমন বুঝবে না; আমাদের রক্তে রক্তে যে চির-পরিচয়ের আবেশ জড়িয়ে রয়েছে, জড়তায় মোহে আলস্যে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখলে কি করে আমাদের আমরা চিন্‌ব?

যে মুহূর্ত্তে বুঝেছি, চোখ আঁধা নয়—বাঁধা, সেই মুহূর্ত্তেই তো আশার বিদ্যুৎ প্রাণে চমক্ দিয়ে উঠেছে—হবে গো পাব! যে আঁধা, সে দেখ্‌তে পায় না; কিন্তু যে বাঁধা, বাঁধন খুললেই যে সর্ব্বস্ব তার। বৃথা কেন পরের ভরসায়, দৈবের আশায় মজ্জাগত সংস্কারের ভারে পরাধীন হয়ে সে কাল কাটাচ্ছে? দৈব তো কাউকে বঞ্চিত করেনি—নিজের পুরুষকার হতেই যে আজ এ দেশ বঞ্চিত!

তাই বলি—আজ সে উঠুক্, চোখের বাঁধন খুলে ফেলে দিক্; আত্মগৌরবের পুঁজি হাতে নিয়ে সমানে প্রতীচীর সঙ্গে এগিয়ে চলুক। মানুষের জীবন দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়—অনন্ত অফুরন্ত সে চিরস্বাধীন! আত্মবিশ্বাসে অটল থাকলে জগতের কোথাও তাকে ঠেকতে হবে না। কে বলেছে মজ্জাগত সংস্কারকে জয় করা যায় না? আত্মবলি দিলে সব হয়! আত্মরক্ষার নাম করে করে দিন দিন যে আমরা কোণঠেসা দৈবঘেঁসা প্রকৃতির আঁচলধরা হয়ে পড়ছি—এ অপবাদের বালাই আমাদের যাবে না? কবে আমরা নিজের সম্পদ্ নিজে লাভ করব—সগৌরবে সে সব বিশ্বে বিলিয়ে দিয়ে সঞ্চয়ের সার্থকতা দেখাব? আমাদের বেদ, আমাদের দর্শন, আমাদের সাহিত্য, আমাদের শাস্ত্র কবে আমাদের আত্মসমর্পণের শক্তিতে আমাদেরই অধিগত হবে?

আমাদের আছে শুধু প্রাচ্য বেদ-দর্শনজ্ঞানের অভিমান—আসল জিনিষ যা, তা ওরাই লুটে নিচ্ছে। হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম ইত্যাদির ঝাঁকে আমরা আত্মগৌরব হারিয়ে ফেলে ফাঁকা হয়ে পড়েছি। শক্তি আর অভিমান যে পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করে—একি আমরা এখনো বুঝবার যোগ্য হইনি? সত্যি সত্যি যার আছে, সে বড়াই করে পরকে দেখাতে যায় না—যার নাই, তারই অভিমান বেশী।

সমস্ত গলদের মূলে আত্মোন্নতির অভাব। প্রত্যেকে আমরা নিজের কাছে খাঁটী নই বলেই সমস্ত দেশটা আজ কেবল আক্ষেপোক্তিকে আর

দৈববাদে মুখর হয়ে উঠেছে। এ কলরবের মাঝে আত্মসমাহিত উপার্জ্জনের চেষ্টা নাই—আছে শুধু নালিশ। নিজের বিচার নিজে করতে না না শিখলে শুধু পরস্পরের নামে নালিশই বেড়ে চলবে—আসল প্রতিকার এক বিন্দুও হবে না। নিজকে উন্নত না করলে পরিবারের উন্নতি হবে না—পরিবার না হলে সমাজের, সমাজের না হলে দেশের—পরম্পরাক্রমে অধঃপতনের বিষাক্ত অবসাদ জগন্ময় বিসর্পিত হবে।

তাহলে আরম্ভ হল আত্মা থেকে—অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব নিজেরই বহনীয়। নিজে খারাপ হলেই দশ খারাপ হতে পারে; কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকে, ধৈর্য্য থাকে তাহলে যেখানে দশ খারাপ, সেখানেও নিজকে ভাল রাখা যায়। জগতে সাধুর সংখ্যা মুষ্টিমেয়; তবু তো ধর্ম্মেরই জয় হয়ে আসছে।

সত্যের শক্তিই ব্যাপক। ধর্ম্মও সত্য, অধর্ম্মও সত্য। যেটাকে যখন অন্তরে সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত করবে, সেটাই তোমাকে প্রচণ্ডবেগে পরিচালিত করবে। ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া—সবি নিজের মাঝে। দেশের ও দশের উন্নতির সঙ্গে আত্মোন্নতির পুত্র-পিতা সম্বন্ধ; আত্মোন্নতি করতে পারলে দেশের উন্নতি স্বতঃই হবে। কেননা মানুষের মাঝে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যে গুলিকে একজন জাগিয়ে তুললে সকলেই তার ভাগী হয়। তুমি যে সকলের সঙ্গে এক—এইখানেই তার প্রমাণ। সমাজে তোমার এইটুকু গৌরবই করবার রয়েছে যে তোমার ভাল-মন্দ দিয়ে অপরকে আবিষ্ট করতে পার তুমি। আত্ম-শুদ্ধিতে এ গৌরব আরো প্রস্ফুটিত হবে।

খাঁটীত্বের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হল সে পরকে আপন করে নেবে। আজ যদি সমাজ অধঃপাতে যায়, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল হয়, দৈব কৃপণ হয়, তবু তোমার আত্ম-সাধনার তো কোন বাধা নাই। যে নিজকে আভাসেও ধরতে পেরেছে, তার ঐ তো একমাত্র অবলম্বন। সে পরের সঙ্গে তুলনা করে নিজকে খাটো করতে যাবে কেন? যে যা করেছে করুক না—তুমি কি করতে পার তাই দেখ না! তুমি উন্নত হও, দেশ উন্নত হবেই হবে।

তুমি যদি তোমার মনের মতনটী হও, অপরকে মনের মতনটী করতে নিশ্চয় পারবে। কেননা যা তোমার মনের মতন, তা যে তখন তোমার অন্তরে পরখ করা জিনিষ। যা ভেবেছ, তাই যদি হতে পেরে থাক, তবে তাই তোমার একমাত্র সত্য-সম্বল—আত্মনির্ভর ছাড়া কোন শক্তিই আর তোমার প্রয়োজন নাই।

দেশের সম্বন্ধে তোমার যা কর্ত্তব্য—তার মূল হচ্ছে নিজের মাঝে। জীবনে এই হবে, সেই হবে, ইত্যাদির ভাবনায় সময় নষ্ট না করে যতটুকু আছে তোমার, তাই নিয়ে আনন্দে কাজ করে যাও—যা হবার তা আপনি হবে।

দেবতাকে শুধু আবাহন করা নয়, মন্ত্রের জোরে নামিয়ে আনা—এ তেজটুকুই থাকা চাই। আত্ম-শক্তিতে গুরুশক্তির প্রতিষ্ঠা,—এই হল শিশিক্ষু জীবনের মূল মন্ত্র। এইটুকু বোঝ না—আমার গর্ব্বে যদি তাঁরই গৌরব না হল তো নিজকে দেওয়া তাঁর হল কই?—দেশকে বুকে পেলাম কই?

শিক্ষক

——):*:(——

প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই বিশেষ ক্ষমতারূপে যে জিনিষটী রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলাই হল খাঁটী শিক্ষা। তাহলেই বাইর থেকে কিছু গেলানো নয়, অন্তরকে জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষের মনে বিচিত্র ভাবের দ্যোতনা ও কর্ম্মপ্রেরণা রয়েছে, কাজেই শিক্ষার নিয়ম সবার পক্ষে একরকম হতে পারে না। তবু ভারতের শিক্ষার একটা সার্ব্বভৌম লক্ষ্যই হচ্ছে—নিজকে জানা। তাই ঋষি বলছেন—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে আত্মার শক্তি অনুভব করা, বাইরের কাজেকর্ম্মে সে ভাবকে ফুটিয়ে তোলা, এই হচ্ছে শিক্ষাজীবনের চরম লক্ষ্য। কাজেই শিক্ষাগুরু হবেন আত্মতত্ত্ববিদ্—নিজকে বাইরে ভিতরে তন্ন তন্ন করে বুঝে নেবেন।

কিন্তু জটিল সমস্যাই হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষা দেবার ধারা নিয়ে। বাধ্যবাধকতায় যে কোন ফল হয় না, তা বল্‌ছি না; কিন্তু তাকে সত্যিকার শিক্ষা বল্‌তে গেলে যেন ভণ্ডামী করা হয়। আত্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করাই লক্ষ্য--বাধা দেওয়া তো নয়। এ জায়গাতেই শিক্ষকের একটা বড় দায়িত্বের কথা এসে পড়ে। নিজকে জানাই তবে তাঁর পক্ষে ইতি নয়· Objective studyরও দরকার। ছেলে কি চিন্তা করে, তার মাঝে কোন্ সময় কি ভাবের উদয় হয়, তা এসে শিক্ষকের মনে প্রতিফলিত হতে থাক্‌বে। তবেই বুঝতে হবে তিনি যোগ্য শিক্ষক।

ছেলেদের পরিচালনা কর্‌তে হলেই আগে তাদের মনের কথা জানা চাই। ফুস্‌লিয়ে কথা বের করা, এটা একটা বদভ্যাস এবং অন্যায়। এমন করে তাদের চিত্তকে জয় কর্‌তে হবে যে তারা প্রাণের কথা খুলে না বল্‌লে কিছুতেই সোয়াস্তি পাবে না, রীতিমত উদ্বেগ হবে যে কেন প্রাণ খুলে শিক্ষকের সঙ্গে দুটো কথা বল্‌লাম না। তুমি যে ছেলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এ বিশ্বাসটুকু ছেলের মনে বদ্ধমূল হওয়া চাই।

যখন তখন একটা প্রতিকার না কর্‌লেই যে শিক্ষক ছেলে সম্বন্ধে উদাসীন, তা নয়। উপদেশ দিতে গিয়ে যেন খেলো হতে না হয়—উপদেশের মর্য্যাদা থাকা চাই। লোকনাথ ব্রহ্মচারী যখন কাউকে উপদেশ দিতেন, তখন তাঁর দৃষ্টি ভ্রূর মাঝে নিবদ্ধ হত, যেন তিনি অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কোন্ অজানা রাজ্য থেকে জ্ঞান আহরণ কর্‌ছেন, আর উপদেশ দিচ্ছেন। কিছু না কর্‌লেই যে করার শক্তি নেই এমন কথা হতে পারে না; যা-তা করার চেয়ে প্রথম কিছু না করে ভেবে-চিন্তে কাজ করাই সমীচীন।

ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া মানে নিজকে শিক্ষা দেওয়া। ছেলেকে উপলক্ষ্য করে আপন জীবনের সত্য বিকাশ হতে দেওয়া। এখানেই ইমার্সন যে বলেছিলেন, Secret of education lies in respecting the pulpit—একথার তাৎপর্য্য পাই। ছেলের প্রতি যে আমার সত্য সঙ্কল্প, এ যেন ব্যর্থ না হয়—তার দরুণ ছেলের ওপর একটা বিশ্বাসও থাকা চাই। আমার শুভ ইচ্ছার ফল তার জীবনে সার্থক হয়ে উঠুক, এই থাক্‌বে শিক্ষকের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা। এর মাঝে সে যদি একটা বিগর্হিত কার্য্যই করে বসে, তা যেন ভয়ে তোমার কাছে গোপন কর্‌তে না শেখে। প্রলোভন থেকে ছেলের মন ফিরিয়ে আন্‌তে না পার, এর চেয়ে বড় একটা প্রলোভনে তার চিত্তকে মজিয়ে দাও। কুপ্রবৃত্তিকে দমন করার মঙ্গল পন্থাই হচ্ছে তাকে একটা বড় তাৎপর্য্যরসে ডুবিয়ে রাখা। ইন্দ্রিয় উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্নিবার

উন্মত্ততা আসে, তাতে একেবারে বাধা দিতে চাও, পাগ্‌লা কুকুরের মত ফিরে তোমাকে দংশন কর্‌তে আস্‌বে। এই সঙ্কট সময়ে তাদের প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়ে দিলে আর জীবনে কোন আশা নাই। শিক্ষকের শক্তির প্রয়োজন এইখানেই, ধ্বংসোন্মুখ গতি থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখা। সাধনায় শক্তি সঞ্চিত হল কিনা, ছাত্রদের অন্তর্বিপ্লবের সময়ই তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। গতির মুখে বাধা দিতে গেলেই বিশেষ শক্তির প্রয়োজন—কেননা শুধু বাধা দেওয়ার শক্তি থাকলেই চল্‌বে না, যাকে বাধা দিলাম, তার মনের সঞ্চিত ক্রোধ যখন ফুলে উঠে আমাকে এসে ধাক্কা দিবে তখন তার প্রতিক্রিয়া সহ্য কর্‌বার মত প্রশস্ত হৃদয়ও আমার তৈরী রাখতে হবে।

"না" কর্‌লে আরও বেশী করে কর্‌বে, এটা ছেলেদের রোখ্। এমনি হয়ত ততটা অকাণ্ড ঘটাতে সাহস পেত না, কিন্তু তোমার "না" করার পর থেকে তার মনে যেন জোর আসে। অনেক সময় আমরা তাদের "না" করেই আরো বেশী করে কর্‌বার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলি। ছোটবেলার একটা কথা স্মরণ হল; এমনি হয়ত নষ্টচন্দ্রের দিকে নজরই পড়ে না, কিন্তু যেদিন অভিভাবক আগে থেকেই সাবধান করে দিলেন "আজ কিন্তু নষ্টচন্দ্র, আকাশের পানে কেউ তাকিও না"—সেদিন আরো বেশী করে তাকাবার ঔৎসুক্য জাগ্‌ল; আর পরদিন নষ্টচন্দ্র দর্শনে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হবে বলে প্রায়শ্চিত্তের জলও খেতে হয়েছে। কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, 'নিগেটীভ্' দিক দিয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া বড় দুষ্কর।

আড়ম্বর এবং অভিনয় করতে নেই, বেশ সহজ ভাবে ছেলেদের কাছে নিজকে ধরা দিতে হবে। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "বিন্দুর ছেলের" মাঝে এক জায়গায় পড়েছিলাম, বিন্দুকে এসে তার জা বলছে, "তোর পড়বার এত কাপড়, একরাশ কালো কুচকুচে চুল—এ সবের পরিপাটী করিস্ না কেন বোন্?" তখন বিন্দু তাকে বুঝিয়ে দিলে, "দেখ্ বোন্, এতদিন ধরে আমাকে আমার ছেলেটী বেশ সাদাসিধে রকমে চল্‌তে দেখেছে, আজ হঠাৎ অদ্ভুত রকম পরিপাটী করে চললে বিকট দেখায় নাকি?—আর এতে ছেলের শিক্ষার পক্ষে ব্যাঘাত হয় না?"

ওদেশের অনুকরণ করতে গিয়ে বাহিরের আয়োজনটাই যদি বড় হয়ে ওঠে, তবে তা দিয়ে যে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হবে না। কেননা জাতিগত একটা বৈশিষ্ট্য তো রয়েছে—বাহিরের উপকরণের চেয়ে ভিতরের সত্যকে মর্য্যাদা করাই যে আমাদের ধাত। হঠাৎ জোর করে, যা হজম হবে না তা গিলতে গেলেই তো বমি করতে হবে!

শিক্ষা দিতে হবে ছেলের ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে এবং বর্ত্তমানের সঙ্গেও সম্পূর্ণ বিরোধ না ঘটিয়ে। সত্য চিরকালই সত্য, তা থেকে বঞ্চিত হলেই একদিন না একদিন অনুশোচনা আসবেই—কেননা মানুষের যে হৃদয় রয়েছে। ভাল-মন্দের সব কিছুই যে চিত্তে 'রেকর্ড' হয়ে থাকবে, এ দাগকে তো অস্বীকার কর্‌বার উপায় নাই, কেননা একে তো মুছে ফেলা যায় না। তোমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে—কত গর্জ্জন, কত বর্ষণ, কত অন্যায়-আশঙ্কা তোমার ওপর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু তুমি থাকবে আপন সত্যে সমাহিত হয়ে। তোমার সত্য সম্বন্ধে তোমারই যদি ইতস্ততঃ থাকে তবে অপরের মাঝে শক্তিসঞ্চার করবে কেমন করে? বিরুদ্ধ শক্তি এসে প্রতিঘাত করবেই কিন্তু তুমি থাকবে সত্য দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে।

ছেলে যা চায়, মা অনেক সময়ে তাকে তা দেন না, এর কারণই হচ্ছে, মা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেন, এ তার সত্যিকার চাওয়া নয়—তাড়না মাত্র। মায়ের ওপর ছেলে বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে দেখেছ? ছেলের যে মা ছাড়া উপায় নেই। এই

মুহূর্তে যার উপর মন বিরূপ হয়ে গেল, পরমুহূর্তেই তার কাছে গিয়ে আবার যে আবদার জুড়ে দেই। সে যে কেহই হউক না আমাকে জয় করে ফেলেছে, এ স্বীকার করতেই হবে।

মা ছেলেকে মারেন, বকেন, কত কিছু করেন, কিন্তু তবুও তো মায়ের ওপর বিদ্বেষবুদ্ধি বেশী ক্ষণের দরুণ স্থায়ী হয় না। এই যে অতিরিক্ত একটা কল্যাণকর আধিপত্যের ভাব, এটাই হচ্ছে মায়ের বিশেষ সম্পদ্। আর শিক্ষককেও আয়ত্ত করতে হবে এই Influence বা Energyটুকুই। ছেলে যদি বুঝ্‌তে পারে, তুমি তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কর্‌ছ, তন্মুহূর্তেই তোমার প্রতি যে শ্রদ্ধাটুক্ ছিল, তা লোপ পেয়ে যাবে। কাজেই সবসময় নিজকে খাঁটী রাখতে হবে। দ্বন্দ্বের মাঝে পড়লেই আত্ম-শক্তির পরিচয় পাবে। তোমার চোখের সাম্‌নে একজন রসাতলে ডুবে যাচ্ছে আর তখন যদি তুমি উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে তাকিয়ে ভাব—"হাঁ, ডুবেই তো যাচ্ছে দেখছি"—এ হলে তোমার ভিতর শক্তি বলে যে একটা জিনিষ আছে তার পরিচয় পাই কেমন করে? মানুষে মানুষে দরদ আছে বলেই তো একজন অন্যজনের দরুণ প্রাণ বিসর্জন দেয়। আর বাস্তবিক তোমার মাঝে মঙ্গল-ইচ্ছার উন্মেষ হলে তুমি কিছু না করে যে থাক্‌তে পার্‌বে না। এক-জনার জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথচ তুমি ইচ্ছা কর্‌লে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে পার, সে জায়গায় কি নিস্তব্ধ অলস হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? জীবন দিয়ে জীবনীশক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। আত্মা দিয়ে আত্মা দর্শন বলে যে একটা কথা আছে, সে হচ্ছে তোমার অন্তরের সত্যকে অন্যের মাঝে প্রতিফলিত দেখা। আমিই আমাকে দেখতে পাব—শুধু আমার মাঝে নয়, অপরের মাঝেও।

ছেলেকে নিয়েই মায়ের সমাধি হয়ে যায়। এই যে অহর্নিশ নিজের শুভ ইচ্ছাকে সন্তানের মাঝে প্রতিফলিত করে তোলার একান্ত সাধনা—এতেই মায়ের চরম তৃপ্তি।

ভাল হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা সকলের মাঝেই রয়েছে, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তাকে শুধু সাহায্য কর্‌বে। সব চেয়ে বড় কথাই হল আশ্বাস দেওয়া—যে অন্যায় করে ফেলেছে, তার তীব্র প্রতিবাদ করে তাকে আরও হতাশায় ফেলি আমরা। কিন্তু সে সময় আগের ঘটনাগুলো ভুলে যেতে হবে। তার হতাশা-পূর্ণ হৃদয়ে আশার আলোক সন্দীপিত করে তুল্‌তে হবে। গৌরাঙ্গদেব জগাই-মাধাইকে যে পদ্ধ-তিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আমাদেরও অনুসরণ কর্‌তে হবে সেই পন্থা। এখনও এই মুহূর্তে ইচ্ছা কর্‌লে মানুষ ভাল হতে পারে, এর চেয়ে বড় আশার বাণী আর জীবনকে সত্যপথে নিয়োজিত কর্‌বার সুগম পন্থা আর কি থাক্‌তে পারে?

যা অভিভূত কর্‌তে চেষ্টা করে, তাই মানুষের শত্রু। কাজেই ছেলেকে হিপ্নোটাইজ্‌ড করা মানে সম্মোহিত করে রাখা নয়, তার ভিতরের জ্বলন্ত সত্যকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা। তাই যদি হয়, তবে প্রত্যেক ছেলেকেই স্বাবলম্বী করে তুল্‌তে হবে —তারা যেন একমাত্র বাহিরের আশাতেই বসে না থাকে। তাদের ভিতর একটা 'ইণ্টারেষ্ট্' জাগিয়ে তুল্‌তে হবে—যেন তারা করে কিছু আনন্দ পায়। এরূপ সুব্যবস্থা হয়ে গেলে শিক্ষকের দিনরাত এত লেকচার্ না দিলেও চল্‌বে—কেননা ছেলেরা তখন শুধু সমস্যার সৃষ্টি কর্‌বে না—তার সমাধানও কর্‌তেও শিখ্‌বে।

শক্তি অল্প বলেই যে অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হয়, তা সত্য নয়। ঋষিযুগের আদর্শের কথা স্মরণ কর্‌লেই এর মীমাংসা আমরা অনায়াসে পেয়ে যাই। কোন্ দিকে তাদের অভাব ছিল? দেহের, মনের, এমনি করে সব বিষয়ে তাঁরা যে চরমোৎকর্ষ করেছিলেন, ইচ্ছা

করলে কি তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ করার দরুণ পর্ণকুটীর কিম্বা জমকালো প্রতিষ্ঠান ফেঁদে বস্তে পারতেন না? তাদের কি শক্তির অভাব ছিল? না সাধনসম্পদ্ কারও কিছু কম ছিল? তবু যে বৃক্ষমূলে বসেই গুরু শিষ্যকে উপদেশ বিতরণ করছেন এর তাৎপর্য্য কি? তারপর শিক্ষার কথাই ভেবে দেখ না—সমাবর্ত্তনের পর আপন গৃহে ফিরে গিয়ে ছেলের কোন দিক দিয়ে কি অযোগ্যতা প্রকাশ পেত? যেমনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে তেমনি সাংসারিক বিষয়েও ছেলেদের পাকা করে তোলা হত। ব্রহ্ম-জ্ঞানে দিশেহারা হয়ে তাদের কর্ত্তব্যবোধ কোনদিন লোপ পায়নি। আর শিক্ষা যে কেবল মনের দিক দিয়েই হবে তা নয়, দেহের দিক দিয়েও।

প্রত্যেক মানুষের মাঝেই সত্য নিহিত রয়েছে, এটা নিঃসংশয়রূপে প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। কাজেই ছেলেদের দোষ, অপরাধ, যত রকমের সম্ভব অসম্ভব ত্রুটী হয়ে থাকে সবকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা দেখিয়ে সত্যের মহিমাকেই বড় করে দেখতে শিক্ষা করতে হবে—এই হচ্ছে আসল শিক্ষা। ছেলেকে ভাল করব মন্দের অনুশোচনা জাগিয়ে নয়—ভালর প্রতি আন্তরিক প্রীতি উৎপাদন করে।

পাপ করলে অনুশোচনা জাগবেই—কিন্তু শিক্ষকের কাছ থেকে তখনও আগের মত অমায়িক ব্যবহার পেলে, ছেলের মনে একটা আন্তরিক প্রীতি জন্মে যায়। শিক্ষক যে কিছু করেনি, সেটাই তখন বড় দণ্ড বলে তাদের মনে অনুশোচনা জাগিয়ে দেয়। কাজেই সব চেয়ে ভাল প্রতিকার হয় ভালবাসা দিয়ে। আমি যা ছেলের মাঝে সত্য করে দেখতে পেয়েছি, তার তুলনায় সাময়িক উত্তেজনায় ছেলে যা করে বসে তা তুচ্ছ। এই যে সত্যের প্রতি অবি-চলিত বিশ্বাস, ছেলের চরিত্র-সংশোধনের এটাই হচ্ছে আদর্শ পন্থা। "মেরেছিস্ বেশ করেছিস্, আয় কোলে জগাই-মাধাই।"—এই বলে গৌরাঙ্গ-দেবের মত যিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটীকে ক্ষমার চোখে দেখে স্নেহে আলিঙ্গন করতে পারবেন, তিনিই হচ্ছেন ছেলের আসল শিক্ষক। শাসন না করাটাই যে একদিকে শাসন—মানে প্রতিকারের চেষ্টাটা বাহিরে ক্রোধের ভিতর দিয়ে প্রকাশ না করে অন্তরের মাঝে সমাহিত হয়ে ছেলের কল্যাণ-কামনায় নিরত থাকা। এতে অবশ্য বাহিরের শাসনের মত বাহিরকে আঘাত করে না—কিন্তু অন্তরকে যে আঘাত করে বেশী। আর যেন ছেলে অন্যায় না করে তার দরুণ ছেলের চিত্তকে সদা-জাগ্রত করাই তোমার প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে ছেলের চিত্তকে উদ্বো-ধিত করাই হচ্ছে আসল কাজ। আর স্থূলের চেয়ে যে সূক্ষ্মের ক্রিয়া বেশী—এ তো সবাই জানেন।

আনন্দম্!

মানুষ জলে পড়ে মরণের ভয়ে যত হাবুডুবু খায়, কিন্তু মরণকে বরণ করে যদি দেহটার ওপরে মিথ্যা মায়া ছেড়ে দেয় তা হলে সেখানে দেহটা ভেসেই উঠবে। শুনে কেউ হয় তো হেসে উড়িয়ে দিবে। কিন্তু এর মধ্যে অকাট্য যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানুষের দেহটা কি? কতকগুলো সুখ-দুঃখ-জড়িত মিথ্যা কামনার সমষ্টি। কেউ হয় তো প্রশ্ন করতে পারে, যেখানে কতকগুলো মিথ্যা কামনার সমষ্টি; সেখানে কি করে এই বাস্তব জগৎটা হল এবং মানুষের মধ্যে সুখের কামনাই বা এল কোথা থেকে? বাস্তবিকই প্রশ্নটী বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচার দিয়ে বুঝবার বিষয় এবং খাঁটী

মানুষ দেহটার ওপরে যতই মায়া করুক, এ দেহটা একদিন ছাড়তেই হবে। তবে মানুষ ছেড়েও ছাড়তে পারে না। দেহটার ওপর এত মায়া যে, সুখ-দুঃখ যতই থাকুক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গলিত হয়ে খসে পড়ুক, তবু মানুষ এ জগৎ ছেড়ে যেতে চায় না। মরণের ভয়ে মানুষের গা ছম্ ছম্ করে উঠে। কেন মানুষের এ রকম হয়? মরণ তো হবেই, এ কথা যুক্তি তর্ক দিয়ে কিম্বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়ে মানুষকে আর বুঝাতে হবে না। মানুষের সম্মুখে পশ্চাতে জীবন-মরণের খেলা দিন দিন হয়েই চলেছে। সৃষ্টির পত্তন থেকে শ্রীকৃষ্ণকে আদি করে ক্ষুদ্র পতঙ্গ পর্য্যন্ত স্থূল দেহটা মরণের হাত থেকে কেহই রেহাই পায়নি। তবে কেন মানুষ বুঝেও বুঝে না, দেখেও দেখতে পায় না?

মনেরই অভিব্যক্তি হল এই স্থূল দেহটা। মন যে ছাঁচে যে স্তরে থাকে এই স্থূল দেহটা সেই ছাঁচে এবং সেই স্তরেই থাকে। মানুষ অনেক সময় সুখ খুঁজতে গিয়ে অকর্ম্মণ্য হয়ে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিটাকেই আঁকড়ে ধরে। এইখানে আমি বলি, মানুষকে তার উপযোগী ভোগোপকরণ দিয়ে, তাকে ইচ্ছামত চলতে দিয়ে তার অভিমানের গোড়ায় আঘাত দাও। কটু ব্যবহার করে কি হবে? মানুষ নিজের ইচ্ছায় ত মরণকেও তুচ্ছ মনে করে!

দেহটা সর্ব্বে-সর্ব্বা বলে মানুষ যতই গলাবাজি করুক, আমি বলি, সেখানে মানুষকে অনেকখানি ঠকতে হবে। কেননা মানুষের দেহটাকে নিয়েই সুখ-দুঃখের মায়া-কান্না সুরু হয়েছে। অধ্যাত্ম বিদ্যা বেদান্ত বলে, এ দেহটা কোন দিনই ছিল না। সেখানে ছিল কি? সে এক অখণ্ড আনন্দের সত্তা। আনন্দ থেকেই এ বাস্তব জগৎটার উৎপত্তি।

নাস্তিক হয় তো প্রশ্ন করতে পারে, আনন্দ থেকেই যদি জগতের উৎপত্তি, তবে দুঃখ এবং নিরানন্দ এল কি করে? এই হল সমস্যা। প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মানুষকে যুক্তিতর্ককে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে নাগাল পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান সেখান হতে থ বনে ফিরে আসে। ফল থেকে গাছের উৎপত্তি কি, গাছ থেকে ফলের উৎপত্তি—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বুদ্ধি দিয়ে তো হয় না। ওইটুকু বীজের মধ্যে এত বড় প্রকাণ্ড মহামহীরুহ কি করে নিহিত ছিল? উত্তর হবে—বীজের মধ্যে প্রাণ ছিল। হাঁ, প্রাণই প্রাণীর মূল। কিন্তু যে প্রাণের সাড়াকে স্বীকার করা হল, সে প্রাণ কি স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে বদ্ধ, না জগৎজোড়া প্রাণেরই সাড়া পাওয়া যায়? স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাকে কি বলব? ছেলের প্রতি মায়ের ত্যাগকে কি কেবল একটা আদর্শহীন কামনা বলব? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক প্রাণ, তবেই না দুয়ের মধ্যে সুখের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিয়ে এক হতে পেরেছে? স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি, আসলে একই প্রাণ। আগেই এক প্রাণ ছিল, তাই প্রাণে প্রাণে মিলন হয়ে সুখের অনুভূতি দুয়ের মধ্যে এসে দুটীতে এক হয়ে গেছে। একের আনন্দের অনুভূতিতে অপরের আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে। ছেলের মধুর আনন্দের হাসিতে মায়ের প্রাণ রসিয়ে রসিয়ে দুলিয়ে দিয়ে যায়। ছেলের একটুখানি মুখ-কালোতে মায়ের বুক দুরু দুরু করে। মা আর ছেলের প্রাণ যে এক জায়গায় কেন্দ্রীকৃত।

তবেই দেখতে হবে, দুটীতে যদি এক হতে পেরেছে, গোটা জগৎটাই কেন এক হতে পারবে না। যেখানে একে অপরের সুখে-দুঃখে নিজের সুখ দুঃখকে সামঞ্জস্য করে চলতে পারে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে ওই প্রাণ নিয়েই তো মিলনের সূত্রপাত হচ্ছে। একের মাঝে অপরের সুখ-দুঃখের অনুভূতি জাগে

বলেই তো, একের মুখের গ্রাসটা অপরের মুখে তুলে ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ওই তো আনন্দের সূত্রপাত।

গোষ্পদের জলই ঘোলাটে হয়। যেখানে প্রাণ দেহের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ, সেখানেই প্রাণ মলিন এবং আনন্দশূন্য। এই ক্ষুদ্র প্রাণ ব্যক্তিতে, জাতিতে, দেশে, সমস্ত জগতের অণুপরমাণুর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাক্। বিরাট্ প্রাণ, বিরাট্ আনন্দের হিল্লোল দেহের অণুপরমাণুর সঙ্গে খেলিয়ে যাক্। সেই আনন্দের সঙ্গে এ ক্ষুদ্র দেহ দৌড়তে না পেরে ঢলে পড়ে যাক্। তোমার যে আনন্দের স্বরূপ, সেই আনন্দেই তোমার ক্ষুদ্র কামনা, ক্ষুদ্র মন বুদ্ধি লয় হোক্। আত্মা স্ব-মহিমায় সর্ব্বব্যাপী বিভু এবং বর্ত্তমান ভূত, ভবিষ্যত তিন কালের অতীত। সেই আত্মার আনন্দই হল স্বরূপ। অবিদ্যার দ্বারা তোমার ভোগ। আনন্দ থেকেই তো তোমার স্থূল দেহটা তৈরী হয়ে উঠেছে। আনন্দ ছাড়া এ ক্ষুদ্র স্থূল দেহেরও ভোগ হয় না। তাই মানুষ মরণের ভয়ে শিউরে উঠে। আনন্দ-শূন্য জীবন জড় এবং অকর্ম্মণ্য। আনন্দেই কর্ম্মের উৎপত্তি এবং আনন্দশূন্য জীবনে যথার্থ কর্ম্ম হতে পারে না। আনন্দশূন্য জীবনে দেহটা রোগের আবাস হয়ে ওঠে—দেহের এবং মনের খুঁৎখুঁতে ভাব যেতে চায় না।

ঘুম কি? ঘুমও তো আনন্দ। মানুষের স্থূল দেহটা ২৪ ঘণ্টা কর্ম্ম করতে অক্ষম। কলকারখানা অবিশ্রাম চল্‌তে পারে না। পরিশ্রান্ত অবস্থায় নিদ্রা সকলকে আনন্দলোকে নিয়ে যায়। মন বাহির ছেড়ে অন্তরের আনন্দে সমাহিত হয়। সুষুপ্ত অবস্থাই কারণ। কিন্তু মন কারণে লয় হলেও তার মধ্যে কর্ম্মের বীজ থাকার দরুণ তাকে আবার সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে ফিরে আস্‌তে হয়। জগতের মূলে যে কারণ-ভাণ্ডার আছে, সেখান হতেই মন শক্তি সঞ্চয় করে আবার স্থূল দেহটাকে জীবনীশক্তি দিয়ে কর্ম্মের উপযোগী করে। মানুষের বুদ্ধি আসে কোথা থেকে বা মানুষের যুক্তিতর্কের মীমাংসা হয় কিরকম করে? মন যখন স্বার্থচিন্তা ছেড়ে সমাহিত অবস্থায় থাকে, তখনই বুদ্ধি এবং যুক্তিতর্কের মীমাংসা হয়ে থাকে। মন যখন ছড়িয়ে পড়ে, অপরের অনুভূতি যখন নিজের মাঝে এসে পড়ে, তখনই আনন্দে মানুষ অপরের দরদী হয়ে কাজ করে। ওই জগতের কারণ আত্মা থেকেই মানুষের দায়িত্ববোধ আসে। আনন্দই সর্ব্বপ্রসূতি।

ভোরের মৃদুমধুর হাওয়ায়, পাখীর কাকলিতে, ভোরের রঙীন্ আলোতে শ্যামল ধরণীখানি যেমন উজল হয়ে ওঠে, তোমার মনও তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ছোঁয়াচ লেগে রঙীন্ হয়ে উঠুক। বাসনা-কামনা ও মনের খুঁৎখুঁতি, ক্ষুদ্র স্বার্থ সব দূর হয়ে যাক, দেহের ঊর্দ্ধে থেকে দেহটা চল্‌তে থাক্—আনন্দে সব উজ্জ্বল হয়ে উঠুক্।

মানুষ দেহটাকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে; একে ছাড়তে হলে ভয়ে শরীর শিউরে ওঠে—এই বুঝি তার সব গেল! একবার একটা গল্পে শুনেছিলাম, কোন এক নূতন হাকিম কোন এক জিলার হাকিম হয়ে এসেছিল। হাকিম বলে সবাইকে তাকে সেলাম দিতে হল। সেলামের চোটে বেচারী হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু ক্রমে যত পুরাণ হয়ে এল, সেও তত সেলামের পক্ষপাতী হয়ে উঠল। শেষে এমন হল যে আর যদি কেউ তাকে দেখে সেলাম না দিয়ে চলে যায় তখন তার মনটা বেঁকে বসে। এমনি করেই মানুষ অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে। মানুষ নিজের আত্ম-স্বরূপকে হারিয়ে দেহের গোলাম হয়ে পড়েছে, তাই তাকে সুখ-দুঃখে ভেসে বেড়াতে হচ্ছে। মানুষ যত সুখ খুঁজবে, ততই দুঃখের সৃষ্টি হবে—এ হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন।

এই প্রাতিভাসিক জগতের মূলে কি রয়েছে? এর মূলে রয়েছে মায়া এবং অভ্যাস। মায়াবশেই

রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে। মায়ার ওপরে রয়েছে এক অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মসত্তা। ব্রহ্মের আনন্দেই জগৎ ভাস্‌ছে। ব্রহ্ম অখণ্ডৈকরস।

উপনিষদ্ বল্‌ছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বলহীন ব্যক্তি আত্মা লাভ কর্‌তে পারে না। বিশ্ব আনন্দ দিয়ে গড়া। আনন্দই হল মহাশক্তি। আনন্দেই আনন্দ লাভ কর্‌বে। জহরৎ চিন্‌তে হলে জহুরী হতে হবে। এস ভাই এস, আজ বাসনা-কামনা ছেড়ে দিয়ে, তুচ্ছ স্বার্থচিন্তা ছুঁড়ে ফেলে কেবল আনন্দে ভেসে বেড়াও।

তোমার আত্মার মধ্যে আনন্দসমুদ্রের তুফান বইছে। চক্রবাক চক্রবাকীর সঙ্গে জলের ওপরে মনের আনন্দে ভেসে বেড়ায়—চক্রবাক-চক্রবাকীকে জল সৃষ্টি করে নিতে হয় না। জল রয়েছেই—শুধু ভাস্‌লেই হল। তোমাকে আনন্দ সৃষ্টি কর্‌তে হবে না। আনন্দ তোমার আত্মার স্বরূপ। চক্রবাক-চক্রবাকীর মত আনন্দে ভেসে চল্‌তে হবে শুধু। ছেলে যখন হেসেখেলে বেড়ায় বা আপনমনে কোন কিছু করে, তখন বাইরের জগতের হৈ-চৈয়ের সঙ্গে জড়িয়ে চলে না বা কারু তোয়াক্কা রেখে চলে না। সে থাকে আপন খুসীতে, আপন ভাবে। তাই ছেলে রাজার রাজা—শাহান্ শা! শিশু আপনমনে তার আনন্দ দুনিয়ায় বিলিয়ে যাচ্ছে। আপন স্বভাব ছাড়া ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা তার মধ্যে স্থান পায় নি। তাই না শিশুর কথায়-বার্ত্তায়, চলায়-ফিরায়, ভাবে-ভঙ্গীতে কেবল মধুর লালিমা ঝরে পড়ে! জগতের মূলে যে আনন্দ রয়েছে, সেই ভাবই জগতে কত ভাবে কত ভঙ্গিমায় প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দেই জগৎ এমন বিচিত্র!

কেবল আনন্দ, কেবল মজা, কেবল স্ফূর্ত্তি! মনের কতকগুলো বিদ্‌ঘুটে ভাব নিয়ে কেন অমৃতের বদলে হলাহল পান কর? আজ ভাইয়ে ভাইয়ে—ভাইয়ে ভাইয়ে কেন, আনন্দে আনন্দে মিশে যাক্—ব্রহ্ম ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাক—আত্মা আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে যাক্! আনন্দেই জগতের জন্ম, আনন্দেই লয়—আমার জীবন-মরণ সব আনন্দ! আনন্দ!!

ওঁ আনন্দম্! আনন্দম্!!

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

রৌদ্রের তীব্রতার জন্য বের হতে দেরী কর্‌লাম। এর ভিতর দু'চার জন পাহাড়ী এসে আত্মীয়ের মত গল্প জুড়ে বস্‌ল। তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ কর্‌তে কর্‌তে কি করে যে ৫টা বেজে গেছে, তা বুঝতেই পারি নাই। পাহাড়ীরা এমন সরল, শান্ত অমায়িক ধর্ম্মভীরু যে তাদের সঙ্গে ভাব কর্‌তে এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় না। তবে যারা বড় রাস্তার ধারে, যে রাস্তায় শিক্ষিত লোক যাতায়াত করে, তাদের সংস্রবে এসেছে তারা কিন্তু আমাদেরই মত ধর্ম্মের নামে প্রবঞ্চনা প্রভৃতি আমাদেরই বর্ত্তমান যুগের সমুদয় সদ্‌গুণগুলি আয়ত্ত করে বসেছে! সে সব শিক্ষিত পাহাড়ীদের সঙ্গে, পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে যে সকল পাহাড়ী (যাদের আমরা অসভ্য বলি) আছে, তাদের সঙ্গে তুলনাই হয় না, আকাশ-পাতাল তফাৎ! হিমাচলের পথে রওনা হয়ে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে যে ভ্রমণ না করেছেন, তাঁরা হয়

তো আমার বক্তব্য বিশ্বাস না-ও করতে পারেন। যাক্‌···দেরী কর্‌বার আর সময় নেই বলে, অধিকন্তু রাত্রি হলে পথ চলা যাবে না, এ পথে আবার বাঘের ভয়ও যথেষ্ট আছে, কাজেই ক্ষুণ্ণমনে তাদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি। বেলা ৫টা বেজে গেলেও রৌদ্রের উত্তাপ খুব। পথে মাঝে মাঝে পাহাড়ীদের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই তারা সুঁচ-সুতো চেয়ে বসে! তাদের সুঁচ-সুতা দেবার জন্য অনেক জায়গায় বসে পিঠের বোঝা খুল্‌তে হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা এসে যে চটীতে পৌছলাম, তার নাম জান্‌তে পারি নাই, অধিকন্তু বাঘের ভয় বেশ আছে, সেইজন্য চটীটির নাম ব্যাঘ্রচটী রাখ্‌লাম। পথিকমহোদয়গণ আমার এরূপ নামকরণ অসঙ্গত বলে ক্ষমা কর্‌বেন।

ব্যাঘ্রচটী
৫ মাইল

একজন পাহাড়ী ধর্ম্মশালার ভাল ঘরখানা দখল করে সাধারণ একটী দোকান করে যাত্রীদের একটু সুবিধা করে রেখেছে। ধর্ম্মশালাটীও জীর্ণশীর্ণ কঙ্কাল নিয়ে কোনরূপে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠাতার ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করছে। নিকটে আর কোন ধর্ম্মশালা বা চটী বা গ্রাম নাই। ধর্ম্মশালায় মাত্র দুখানা কুঠরী। তার একটিতে দোকানদার মহারাজ আড্ডা নিয়েছেন, অন্যটি আমরা দখল করে বস্‌লাম। দোকানদারটী বৃদ্ধ, লোক ভাল, রসিক—দুটি পয়সা কি করে উপায় হয়, সেদিকেও বেশ লক্ষ্য আছে। ভায়া আমাদের বুঝিয়ে দিল—কাল সমস্ত দিন পথ চল্‌লে রাত্রিবেলা একটি চটী মিল্‌লে মিল্‌তেও পারে। দিনের বেলা কোন চটী মিল্‌বে না। পথে বাঘের ভয় যথেষ্ট আছে, তবে দিনের বেলা কোন ভয় নাই। যাতে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্য চটীতে যেয়ে পৌছ্‌তে পারি, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করি এবং খাবার রুটি-পরোটা আজই যেন এখান থেকে তৈরী করে সঙ্গে নিই।

সন্ধ্যেবেলা টেহরীরাজের একজন সিপাহীর সঙ্গে চটীতেই আমাদের দেখা হয়। আমরা এই বাঘের পথে যাত্রা করেছি বলে সে বিশেষ দুঃখিত হল—বল্‌লো—সাম্‌নে দু'মাইল দূরে একটী ভাল চটী আছে, আজ শুধু সেখান পর্য্যন্ত যেতে পার্‌লেও ভাল ছিল। নতুবা কাল অত দীর্ঘ পথ, আবার পথে কোন চটি নাই, উপরন্তু বাঘের ভয় আছে, আমরা কি করে অতিবাহিত কর্‌বো? সমস্ত দিন অনবরত চল্‌লে সন্ধ্যেবেলা বা সামান্য রাত্র হলেও একটি চটী পেতে পারি। আমরা যেন দলবদ্ধ হয়ে যাই। তবে এতগুলি লোক এক সঙ্গে থাক্‌লে বাঘ কিছু নাও কর্‌তে পারে!

আমি তাকে বললাম—তবে তুমি একা যাচ্ছ কেন?

সে উত্তর দিল—হম্ শিপাহী হুঁ, হম্ শেরসে কভি নহী ডর্‌তা হুঁ—শের হী মেরা সে ডর্‌তা হৈঁ!

বলে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল। সিপাহীর কথা কাউকে বললাম না।

দোকানদার ভায়া বাড়ী যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়াতে তার নিকট হতে উরুদের (খোসাসহ) ডাল, ঘি, আটা, কাঠ, নিয়ে নিলাম। এ ছাড়া তার কাছে অন্য কিছু ছিলও না—এমন কি নুন, লঙ্কা পর্য্যন্ত। দোকানদার দোকানে তালা বন্ধ ক'রে রাত্রিতেই পাহাড় চড়ে বাড়ী রওনা হ'ল। আমরা সখোসা-উরুদের ডাল দিয়ে রুটি খেয়ে নিলাম। কাল দিনের বেলার জন্য পরোটা, রুটি কাঁচকলা ভেজে রাখা গেল। সঙ্গী সমস্ত লোককেই বলে দিলাম, কাল দিনের বেলায় খাবার যেন তৈরী করে নেয়, দিনের বেলা কাল কোন চটি মিল্‌বে না। সকলেই সে কথা রক্ষা করেছিলে। আমরা যে ঘরটীতে জায়গা নিয়েছিলাম, সে ঘরটী এত ছোট যে তিনচার জন লোকের বেশী থাকা অসম্ভব। মায়েদের জন্য ঘরটী ছেড়ে দিয়ে আমরা

বারান্দায় বিছানা করে নিলাম। রাত্রিবেলা বাহিরে থাকার জন্য হয় তো ব্যাঘ্রমহারাজ সুস্বাদু নরমাংসে উদরতৃপ্তি না করে বসে, মায়েরা সে চিন্তায় কাতর হলেও, অন্য কোন উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে বাহিরেই বারান্দায় শুতে হ'ল। এর ভিতর আরও দু'দল যাত্রী এসে আমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়াতে সকলেই যেন কতকটা নির্ভয় হলাম। একদলে দু'জন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ও দুজন পুরুষ। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা বিধবা বুড়ী, আর একজন স্বামী-পরিত্যক্তা, ভীষণ কলহপরায়ণা, বায়ু-পিত্ত-সংযুক্তা রুক্ষা রণমূর্ত্তিধারিণী মা। পুরুষ দু'জন সাধু, তন্মধ্যে একজন এ পথে আরও একবার গঙ্গোত্তরীতে যমুনোত্তরী ঘুরে এসেছেন, তিনি বেশ ভাল লোক। এবার গঙ্গোত্তরীতে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে। অন্য একজন সাধু নামধারী প্রতারক, কোনও দুষ্ট মতলবে সাধুর বেশে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছে। জানি না এদের সঙ্গেও আমাদের কেমন যোগাযোগ আছে, এরাও বদরীনারায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এদের ভিতর সর্ব্বদাই ঝগড়া হত। বৃদ্ধ-সাধুটী এ সব ঝগড়া-বিবাদে প্রায়ই যোগ না দিয়ে আপনমনে বসে প্রকৃতির খেলা দেখতেন, কখনও বা একটি ছোট ডাবা-হুকো নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তামাক খেতেন, আবার কখনও বা রসিকতা করে আমাদের সকলকেই হাসাতেন। অন্যদলে তিনজন হিন্দুস্থানী রামাইত সাধু, সঙ্গে একটি আট-নয় বৎসরের বালক। বালকটিকে সঙ্গে রেখে তীর্থ ভ্রমণ করিয়ে "সাধুগিরি" ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

এ চটিতে জলের সুব্যবস্থা নাই, প্রায় আধ মাইল দূর হতে নালা কেটে ঝরণার জল আনা হয়েছে। সে জলও বিশেষ ভাল না। মোটের ওপর এ চটিতে না থাকাই ভাল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনেকগুলি শুক্‌নো কাঠ জঙ্গল হতে জড় করা হয়েছিল, রাত্রি-বেলা কাঠগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বাঘের কথা চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে শুলাম। নিদ্রাদেবী অতি সত্বরেই আপন ক্রোড়ে স্থান দিয়ে সে দিনের মত চিন্তার হাত হতে রক্ষা কর্‌লেন। আজ সমস্ত দিনে মাত্র ১০ মাইল পথ এসেছি।

৩১শে বৈশাখ, শনিবার—ভোর ৫ টায় উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বেরিয়ে পড়্‌তে ৬টা বেজে গেল। অন্যান্য যাত্রীগণ আমাদের পূর্ব্বে রওনা হয়ে গেছেন। আমরা ভাগিরথী-গঙ্গা ডান হাতে রেখে ক্রমে উত্তর দিকে যাচ্ছি। বেলা ৮টার সময় একটা ভাল পরিষ্কার ঝরণার পাশে বসে দু'খানা করে পরোটা দিয়ে সকলেই প্রাতঃর্ভোজন সমাপন করে নিলাম। অন্যান্য দিন যদিও অত সকা'ল খাওয়া হয় না, আজ সঙ্গে খাবার তৈরী আছে বলেই যেন ক্ষিদেটা অত সকালেই স্বরূপ জাহির কর্‌ল, তাকে পরোটা দ্বারা শান্ত করা গেল। যে স্থানটিতে বসে প্রাতঃর্ভোজন সমাপন কর্‌লাম, সেটি দু'টি পাহাড়ের উপত্যকা—একটি মাঝারি গোছের নদী। বর্ষাকালে নদীটি প্রবল আকার ধারণ কর্‌লেও এখন সামান্য ঝরণার আকারে আপন গৌরব রক্ষা করে চলেছে। জল অতি সুন্দর—কেউ কেউ স্নান করেও নিলেন। নদী হতে আধ মাইল পরিমাণ চড়াই করে খানিক দূর যেতেই গত-কালের সিপাহী-বর্ণিত চটি পাওয়া গেল। এ চটীটির নাম খেলাচটী বা খোয়া চটী। চটীটি বেশ বড়। ৭।৮ খানা বেশ বড় বড় দোকান—নিকটেই একটি পাহাড়ী গ্রাম। গত কাল যদি আমরা পূর্ব্বের ধর্ম্মশালায় না থেকে, এখানে এসে থাক্‌তাম, তাহলে বিশেষ সুবিধা হত। স্থানটি বেশ চমৎকার। লোক জনের বসতি আছে, একটু সমৃদ্ধি-শালী বলেই মনে হল। কিন্তু এ দু'মাইল পথ খুব খারাপ। গতকাল বিকালে জান্‌তে পারলেও এমন খারাপ পথে সন্ধ্যে বেলা আসা মোটেই উচিত

খেলা বা খোয়া চটী ২ মাইল

নয়। রাস্তা মোটেই নাই, বৃষ্টিতে পাহাড় ধসে যাওয়ায় রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে; বহু কষ্টে অতি সন্তর্পণে এ দু'মাইল পথ আস্‌তে হয়েছে। হেলান পাহাড়ের বালুকাময় ঝুর্‌ঝুরে মাটির উপর পা দিয়ে দিয়ে রাস্তা তৈরী করে বিশেষ সাবধানের সহিত অতিক্রম করতে হয়েছে। একটু অন্যমনস্ক ভাবে পা দিলেই ২।৩ হাত নীচে বালুশুদ্ধ মাটি চলে যায়। কোন প্রকারে পা হড়্‌কে পড়ে গেলে খাড়া উপত্যকার ৬।৭ ফুট নীচে ভাগীরথীর সুপবিত্র জলে অনন্তসমাধি লাভ করতে হবে। এই সামান্য দু'মাইল রাস্তা আমাদের ২॥ ঘণ্টা কেটে গেল। শুধু তা নয়, পাহাড়গুলি 'করম্‌চা' ও 'বেল' কাঁটাতে ভর্ত্তি। রাস্তাগুলি কাঁকর, কুচি পাথর ও কাঁটাতে পরিপূর্ণ, খালি পায়ে চলা দুঃসাধ্য। যারা খালি পায়ে যাচ্ছিলেন, তাহাদের কষ্ট দেখে আমাদের আমাদের কান্না পেত। আমি টেহরী পৌঁছে, টেহরীর মন্ত্রী ও প্রধান জজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদজীকে এ রাস্তার ভীষণতা ও দুর্গমতার বিষয় বলে রাস্তাটী মেরামত করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমার কথাগুলি অথনই তাঁর ডাইরীতে লিখে নিয়েছিলেন এবং রাস্তাটি মেরামত করে মাঝে মাঝে আরও চটীর ব্যবস্থা করবেন, স্বীকার করেছিলেন। সে কথা রক্ষা করেছেন কিনা জানি না। তাঁরা প্রতি বৎসর রাস্তা মেরামত করে থাকেন বটে, কিন্তু পাহাড়ের রাস্তা একদিন প্রবল বৃষ্টি হলেই পাহাড় ধসে সব নষ্ট হয়ে যায়। কয়েক দিন পূর্ব্বে দেবপ্রয়াগে আসার সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল, তাতেই রাস্তা ধসে গিয়ে অত বিপদ সঙ্কুল হয়েছিল। নতুবা এ রাস্তাটি দেবপ্রয়াগ হতে টেহরী যাবার অন্য রাস্তার তুলনায় খুব ভাল,—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে।

খেলাচটীর দোকানদার ভায়ারা আমাদের থাকার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করিল এবং বলল, 'সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাম্‌নে আর কোন চটী মিল্‌বে না, এখানেও পাক করে খেয়ে যাও।' আমরা তো দ্বিপ্রহরের খাবার তৈরী করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কাজেই দ্বিপ্রহরের খাবারের জন্য দেরী না করে যাতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সাম্‌নের চটীতে পৌঁছুতে পারি, তাহার জন্যই বিশেষ চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম। যারা এ বন্ধুর পথে যাত্রা করবেন, তারা যেন আমরা যে চটীতে গত কাল রাত্রি যাপন করেছি, তথায় না থেকে এই বেলা চটীতে এসে রাত্রি যাপন করেন। তাতে থাকা, খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা হবে, অধিকন্তু পরদিন অত কষ্ট ভোগ করতে হবে না, পথ অনেকটা কম হবে—নির্ব্বিঘ্নে সামনের চটীতে পৌঁছে আরামে থাক্‌তে পারবেন।

তখন বেলা ৮ টা, খেলা চটীতে দেরী না করে তাড়াতাড়ি করে বিশ্রাম করে, ঝরণার জলে স্নান সমাপন করে নিলাম। তাদের সঙ্গে চাল, ডাল সবই ছিল—কাঠের তো অভাব নাই। খেলা চটীতে কতকগুলি আমগাছ আছে, তারা আসার সময় কতকগুলি আম কুড়িয়ে এনেছিল। আমরাও বাকী রুটী দিয়ে জলযোগ সমাধা কর্‌লাম। রাস্তায় পাক করে খাবার এমন সুযোগ সুবিধা হয় পূর্ব্বে জান্‌তে পারলে আর বাসী রুটীর বোঝা ঘাড়ে করে আন্‌তাম না। মনে করেছিলাম, পাক করার জন্য রাস্তায় আর দেরী করবো না। কিন্তু রৌদ্রের তীব্র তেজে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একখানা পাথরের পাশে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করে নিতে হল। সে জায়গাটীতে গাছপালা কিছুই নাই—যাতে একটু ছায়ায় বসে আরাম করে নেওয়া যায়। অল্পক্ষণ পরেই পাথরের আড়ালটুকুর ছায়া হতেও বঞ্চিত হওয়ায় যাবার প্রস্তুত হলাম। বাঙ্গালী সাধুর দল রওনা হয়ে গেল, এক সঙ্গে যেতে হবে, কাজেই আমরাও সকলে তাদের সাথী হলাম। মাঝে মাঝে রাস্তা মোটেই নাই, পাহাড় ধসে নষ্ট হয়ে গেছে—

রাস্তা হারিয়ে গেলেও বিপদ। বাঙ্গালী সাধুটির রাস্তা জানা ছিল, কাজেই তাঁকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। সকলেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলাম। উপরে রৌদ্র, নীচে পাথর উত্তপ্ত, সময় বুঝে বাতাসও যেন বইতে নারাজ। এমন একটী ছোট গাছও নেই, যার নীচে দাঁড়িয়ে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যায়। অধিকন্তু এ দিকটার জলের ও সচ্ছলতা নাই—বহু দূরে দূরে এক একটী ঝরণা আছে। হঠাৎ কোন বিপদ হলে, কোন দিক থেকেই আর সাহায্য পাবার আশা নাই। রৌদ্রের ভীষণ তীব্র তেজে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। সমুদয় হিমালয় ভ্রমণ করেও গরমে অত কষ্ট আর কোথাও হয় নাই। এ দিকটার কোথাও পাহাড়ীদের দেখতে পেলাম না। গ্রাম দূরে—বহুদূরে—পাহাড়ের স্তরে স্তরে অস্পষ্ট ভাবে ছবির মত দেখা যাচ্ছিল। এই দিকটায় বাঘের অত্যাচার বেশী। ২।৩ দিন পূর্ব্বেই বাঘ একটী গরুর সদ্ব্যবহার করেছে, আমরা যে স্থানটীতে বসে বাসী রুটী দ্বারা উদর তৃপ্তি কচ্ছিলাম, তার অনতিদূরেই তার রক্তমাখা হাড় পড়ে আছে। চারিদিকে রক্তের দাগ রয়েছে। কাজেই সে স্থানে দেরী না করে আমরা রওনা হয়ে পড়েছিলাম। এ সময় আমরা সেই দলছাড়া হই নাই। সকাল বেলা বেড়িয়ে খেলা চটী আস্‌তে বেশ মাঝারি রকমের দুটী চড়াই উৎরাই কর্‌তে হয়েছে। খেলা চটী হতেও এ স্থানটীতে আস্‌তে কয়েকটী ছোট ছোট চড়াই-উৎরাই কর্‌তে হয়েছে। এ স্থান হতে বেলা ১ টার সময় রওনা হয়ে একটী চড়াই উৎরাই করেই, আর একটী চড়াই করার সময় সকলেই হাঁপিয়ে গেলেন। জল নাই, অতি প্রখর রৌদ্রের তেজে সকলেই ক্লিষ্ট—বাতাসও সময় বুঝে বন্ধ! আর একটু চল্‌লেই যেন আমাদের হার্ট-ফেল্ হবে তখন সকলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণের দায়ে সেই পাহাড়ের উপরেই বসে পড়লাম, বাঘে খায় সেও বরং ভাল, তবুও এমন প্রচণ্ড রৌদ্রে আর চল্‌ব না স্থির করে নিলাম। বিহারীদাদা ও হরিদাস ভায়া ইতিপূর্ব্বেই এত ক্লান্ত হয়েছিলেন যে, এই চড়াইয়ের মুখেই ঝরণার পাড়ে একটী বড় পাথরের আড়ালে দুজনায় বিশ্রাম কচ্ছিলেন। তাদের নিকটই জলের ঝরণা ছিল। আমরা তাদের নিকট হতে প্রায় ১ মাইল দূরে চড়াই করে এসেছি। আমরা যে স্থানে বসেছি, সে চড়াইয়ের মাঝামাঝি কোথাও জল নাই, গাছ-পালা কিছুই নাই—উপরে আকাশ, নীচে উত্তপ্ত পাথর, সকলই জল-পিপাসায় অস্থির। সেই ভীষণ রৌদ্রের মধ্যে জল আনার জন্য নীচে ১ মাইল উৎরাই করে পুনরায় চড়াই করে এসে কাকেও জল দেওয়া, সে অবস্থায় সকলেরই ক্ষমতার বাহিরে। বিপদ কখনও একা আসে না বুঝি—দলবল নিয়ে হাজির হয়। আমরা চারিদিকের অবস্থা বুঝে, ভীষণ বিপদ দেখে বসে বসে ঠাকুরের নাম কর্‌তে লাগ্‌লাম। এদিকে প্রবল জলপিপাসায় সকলেরই কণ্ঠাগত প্রাণ, জিহ্বা আড়ষ্ট, ঠাকুরের নাম করতেও ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। বিপদে পড়লে আপনা হতেই সাহসেরও সঞ্চার হয়ে থাকে। মনে কর্‌ছি, নীচে গিয়ে যত কষ্টই হোক্ না কেন, জল এনে সকলকে দিব। এমন সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় মনে হল, সঙ্গে তো "পিপারমেণ্ট" আছে। পিপারমেণ্ট খেলেই তো সাময়িক জলপিপাসার কতক শান্তি হবে। বিশেষ দরকারী কতকগুলি ঔষধ সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌তাম। পিঠের ঝোলা হতে পিপারমেণ্টের শিশি বের করে সঙ্গী সকলকেই সামান্য দিলাম। পিপারমেণ্ট সকলেই মুখে দিতেই মুখ গলা ঠাণ্ডা হয়ে গেল—বেশ শান্তি অনুভব কর্‌লাম। তখন পবন-দেবও হার মেনে মৃদু-মন্দ বইতে লাগ্‌লেন। অত্যধিক ক্লান্ত শরীরে সামান্য সামান্য বাতাস লাগায় শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল—সেই তীব্র রৌদ্রের তেজের মধ্যেই ছোট

ছোট পাথর-কাঁকরের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম। চিদানন্দ দাদার সঙ্গে একটা ছাতা ছিল, তিনি ছাতা মাথায় দিয়ে আমাদের ছেড়েই আপন-মনে আগেই চলে গিয়েছিলেন। বিহারী দা ও হরিদাস ভায়া ঝরণার পাশে পাথরের আড়ালে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করে আমাদের কাছে যখন উপস্থিত হলেন—তখন আমি নিদ্রিত। রাস্তা অতীব খারাপ, এমন খারাপ রাস্তা গোমুখী ও পবালী ছাড়া আমরা সমুদয় হিমালয়ে আর কোথাও দেখি নাই। এ পথে চিদানন্দ জীর আদেশ মত এলেও বিহারী দার মতে আমারি যত দোষ। দেবপ্রয়াগে চিদানন্দ দা ও আমি অনুসন্ধানে যতদুর জান্‌তে পেরেছিলাম, তাতে এ পথে আসার জন্য সকলেই বলেছিলেন, আমরাও তাই এ পথে রওনা হয়েছিলাম। বাঘের ভয়ের জন্য শুধু বিহারী দাদাই এ পথে আস্‌তে নারাজ ছিলেন। অন্য পথে ভীষণ জল-কষ্ট চির অভ্যস্থ বাঙ্গালীর পক্ষে সহ্য হত কিনা কে জানে? এক পশলা রাগ-বৃষ্টি হওয়ার পর তিনি আমাদের শাসিয়ে বল্‌লেন, টিহরী পৌছে, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে যাবেন। আমাদের সঙ্গে থাক্‌লে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য্য। টেহরী পৌছে কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা যথাসময়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম—পাছে চলে যান। আমরাও মনে করেছিলাম, তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করবেন, কিন্তু টেহরীতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্বেও তিনি যাননি—আমাদের ছেড়ে যেতে তাঁর কষ্ট হবে তা তিনি বেশ জান্‌তেন।

খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর ৩টার সময় রৌদ্রের মধ্যেই আবার বের হয়ে পড়লাম—যেভাবেই হউক, আজ আমাদের সাম্‌নের চটী ধর্‌তেই হবে। এ পথে অনেক গ্রাম ও শস্যশ্যামলা অনেক ভূমি আছে। জলের বন্দোবস্তও খুব ভাল। তবে খানিকটা জায়গায় জল পাই নাই। অনবরত দুই ঘণ্টা চলার পর বহুদুরে একটা ধর্ম্মশালা অস্পষ্ট দেখা গেল। ধর্ম্মশালায় স্থান পাবার আশায় আমরা আনন্দে দ্রুত-গতিতে চলে ৬টার সময় গিয়ে ধর্ম্মশালায় পৌছলাম। তীব্র রৌদ্রের জন্য এত দীর্ঘ পথেও একটা জনপ্রাণীর সঙ্গেও দেখা হল না। দুর হতে ধর্ম্মশালা দেখে মনে করেছিলাম, গুরুদেব দয়া করে একটি আস্তানা জুটিয়ে দিলেন—আজকের মত শান্তিলাভ করা যাবে। মানুষ যা ভাবে, ভগবান্ পরীক্ষার্থে তার বিপরীতটা করে রেখে দেন। এক্ষেত্রেও তাই হল। ধর্ম্মশালায় পৌছে দেখলাম, তাতে লোকজন, দোকানদার কেউ নাই। ধর্ম্মশালাটী বোধ হয় সত্যযুগের হবে—অতি পুরাতন, উপরের ছাদ সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে, দেওয়াল অর্দ্ধেকের বেশী ভাঙ্গা—মানুষের ব্যবহারের একেবারে অযোগ্য। দুর থেকে অস্পষ্ট বলে তা বুঝা যায় নাই। এ ধর্ম্মশালায় থাকার চেয়ে গাছতলায় বা উন্মুক্ত প্রান্তরে থাকাও শতসহস্র গুণে ভাল। প্রায় মাইল খানেক দুরে গ্রাম আছে। গ্রামবাসীরাও আপন কুটিয়ায় স্থান দিতে নারাজ। এখানে দুজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল। আমরা এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে এইখানেই আজকের রাত্রি কাটিয়ে দিব স্থির করেছিলাম, কিন্তু সাধু দুজন বল্‌লেন, কাল সমস্ত রাত্রি ধুনী জেলে কাটাতে হয়েছে, অনবরত আগুন থাক্‌লে বাঘ আসে না। চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে এখানে দুজন লোককে বাঘে হত্যা করেছে। সেই জন্য স্থানীয় পাহাড়ীরা বেলা থাক্‌তেই গরু-বাছুর ঘরে তুলে দোর লাগায়। পূর্ব্বে এদিকে বাঘ ছিল না; মাসখানেক হল, কোথা হতে কয়েকটি বাঘ এসে উপদ্রব সুরু করেছে।

ধর্ম্মশালার দুরবস্থা দেখে, অধিকন্তু কোন দোকান দার না থাকায়, আরও বিশেষ করে খাবার কোন বন্দোবস্ত করা যাবে না বলেই, আর দেরী না করে ঝরণা হতে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে পরবর্ত্তী ধর্ম্মশালা বা চটীর উদ্দেশ্যে আবার চল্‌তে লাগ্‌লাম।

পথে একজন পাহাড়ী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হল। আমরা তাদের গ্রামে থাক্‌তে পার্‌বো কিনা জিজ্ঞাসা কর্‌তেই সে জিভ্ কেটে থাকতে পার্‌বো না জানিয়ে দিল। পথে আর কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয় নাই। অতিদূরে আবছায়ার মত একখানি গ্রাম দেখতে পেলাম। মনে কর্‌লাম, গ্রামটিতে চটী নিশ্চয়ই থাকবে। এদিকে ক্রমে সূর্য্যের তেজ কমে যাওয়ায় এবং বৈকালিক বাসন্তী-সমীরণের মৃদুমন্দ সংস্পর্শে শরীরে নূতন বলের সৃষ্টি হওয়ায় আমরা আবার নবোদ্যমে চল্‌তে লাগলাম।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গ্রামে গিয়ে পৌছ্‌লাম। গ্রামটী সমৃদ্ধিশালী বটে! তখন ৭টা বেজে গেছে, কিন্তু রাত্রি হয় নাই। সে গ্রামেও কোন চটি বা ধর্ম্মশালা নাই। গ্রামবাসীদের বাড়ীতে থাকবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও কোন জায়গা পেলাম না। তারা বললো—আরও আধ মাইল গেলে একটি চটি পাওয়া যাবে। তখন আমরা সবাই বিশেষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, অধিকন্তু আমাদের দলটিও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল—অনেক লোক পেছনে পড়েছিল। এ সময় আর কেহই দলবদ্ধ হয়ে আসি নাই, কে আগে চটিতে পৌছুতে পারি, তার জন্যই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটে চলেছিলাম। পেছনের লোকের জন্য এখানে বসে অপেক্ষা কর্‌তে লাগলাম, এর মধ্যে চটিবালার সঙ্গে দেখা হওয়াতে কয়েকজনকে তার সঙ্গে আগেই চটিতে পাঠিয়ে দিলাম। পিছনের সকলেই যখন এসে পৌছলেন, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। সেদিন শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথি। চন্দ্রের রজত-কিরণে যেন চারিদিকে আনন্দের লহর খেল্‌ছে। এদেশে এ সময়েই বসন্তকাল। আকাশে মেঘ নাই। নির্ম্মল আকাশের শুভ্র-স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাকিরণে সমস্ত পাহাড় উদ্ভাসিত হওয়াতে মনে একটা অজানা আনন্দের ঢেউ এসে মাতোয়ারা করে তুললো। রাত্রি হওয়ার জন্য এমন সুন্দর জ্যোৎস্নাতে আমরা কোনই অসুবিধা মনে কর্‌লাম না, বরং তখন রৌদ্রের ভীষণ উত্তাপের পরিবর্ত্তে সুমধুর চাঁদ্‌নী রাত্রিতে মন-প্রাণ শীতল হয়ে গেল, আবার নবোদ্যমে চলতে লাগলাম। পাহাড়ের মাইল যে কত বড়, আমাদের ধারণায় আসে না; অথবা বোধ হয় অতিরিক্ত ক্লান্ত হওয়াতেই মাইলগুলি বড় মনে হচ্ছিল। চটিবালা ও গ্রামস্থ লোকগুলি বলেছিল, আর আধ মাইল দূরে চটি আছে। আমরা কিন্তু সেই সময় হতে অনবরত চলে রাত্রি ৮৷৫০ মিনিটের সময় গিয়ে চটিতে পৌছ্‌লাম।

টেলী চটী
১৪ মাইল

নাম টেলী চটি। বাঘের ভয় আছে। চটীবালার থাকবার ঘর ভিন্ন আগন্তুকের জন্য কোনও ঘর নাই। কয়েকটি বড় বড় আম গাছ আছে, তার নীচে অনেক লোক পূর্ব্বেই আড্ডা নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে গত কাল রাত্রে যে দুদল যাত্রী ছিল, তারা আমাদের অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই এসেছে, এ ছাড়া খেলা বা খোয়া চটীতে গত রাত্রিতে যে সব লোক ছিল, তারাও এসে জুটেছে। আমরাই সকলের শেষে এসে পৌছলাম। যারা পূর্ব্বেই এসে জুটেছিলেন, তাদের নিয়ে আমরা ৪০ জন হলাম। অতগুলি লোক একসঙ্গে হওয়ায় ভয় অনেকটা কমে গেল। আমরা উন্মুক্ত সুনীল আকাশের নীচে আশ্রয় নিলাম।

আজ সমস্ত দিন অনবরত হেঁটে মাত্র ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করেছি, তাতে ৫টা চড়াই-উৎরাইও কর্‌তে হয়েছে। আজকের রাস্তা সব চেয়ে খারাপ। এমন ভীষণ সংকীর্ণ পথ দিয়ে চল্‌তে হয়েছে—সে পথ দেখলেই শরীর শিউরে উঠে। রাস্তা মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে। কোন কোন জায়গায় পাহাড়ের গায় শুয়ে শুয়ে আস্‌তে হয়েছে। কোন কোন জায়গায় বা বসে বসে অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করেছি। নীচে ভীষণ উপত্যকা, পা হড়্‌কে পড়ে

গেলে অস্তিত্বও মিল্‌বে না। গতকাল রাত্রের আলাপী যে দুজন বাঙ্গালী সাধু ছিলেন, তার মধ্যে বৃদ্ধটী এ রাস্তা জান্‌ত বলে অত শীঘ্র আস্‌তে পেরেছি. নতুবা আজ এখানে পৌছতে পার্‌তাম কিনা কে জানে? কোন কোন স্থানে পাহাড় ধসে পড়াতে রাস্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার, কোন দিক দিয়ে কোথায় যাব কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না—তবে সর্ব্বদাই একটী নিদর্শন ছিল—ভাগিরথী গঙ্গার পার ছেড়ে যেতে হয় নি। অনেক জায়গায় অনেক পার্ব্বত্য ছোট নদী এসে ভাগিরথীতে মিশেছে, সে সব জায়গায় অনেক ঘুরে ছোট নদীটি পার হয়ে আবার ভাগিরথীর পারে এসেছি। এ সময় অন্যান্য পার্ব্বত্য নদীতে সামান্য ঝরণার স্রোত ভিন্ন আর জলের বেগ নাই। কোনটীতে সামান্য বেশী জল থাক্‌লেও ভাগিরথী গঙ্গা স্বল্পায়াসে চিনে নেওয়া যায়। ভাগিরথী গঙ্গার জলের উত্তাল ভীষণ স্রোত এবং চিত্তবিভ্রমকারী প্রচণ্ড শব্দ আর এ পথে অন্য কোন নদীর নাই। যাঁরা এ পথে যাবেন, তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন, যাতে ভাগিরথীর স্রোত ছেড়ে যেতে না হয়। এ পথে জলের বিশেষ অভাব নাই। এক মাইল দুই মাইল পর পর বেশ জল পাওয়া গেছে—তবে রাস্তা খুব খারাপ ও কঠিন! কিন্তু টীহরী যাবার অন্য রাস্তার তুলনায় সোজা চড়াই-উৎরাই কম। বাঘের ভয় সব বৎসর সমান থাকে না। এবার হঠাৎ কোথা হতে বাঘ এসে উপদ্রব কচ্ছে। টিহরী সরকার বাঘ মার্‌বার জন্য সিপাহী নিযুক্ত করেছেন, পরে জান্‌তে পেরেছি; দুটী বাঘ মেরেছে। দোকানদারটী লোক বেশ ভাল, জিনিষ-পত্রের দামও নেয় না। ভাল চাল ।/০ আনা কিম্বা ।৵০ আনা সের, ঘি ২৲ টাকা, চিনি ৷৹ আনা, আলু ।০ আনা সের। দোকানদারের ঘরসংলগ্ন গমের জমি আছে, জমি হতে গম কেটে নিয়েছে, তারই এক কোণে কয়েকখানা পাথর খাড়া করে উনুন করে "অরহরকা ডাল, আলুকা-শাক" দিয়ে সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর এমন আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত ভাত খাওয়া গেল, যেরূপ আনন্দ ও তৃপ্তি সংসারে থেকে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত্রি ১ টা বেজে গেল। মণিরামের রাস্তায় কষ্ট দেখে বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলাম, আজ রাত্রিবেলা তাকে আহারের জন্য নানা প্রকার খাবার দেওয়া সত্ত্বেও সে আপন সনাতন প্রথানুযায়ী ১৫ মিনিটের মধ্যে কয়েকখানা মোটা মোটা রুটি বানিয়ে আলুপোড়া ও লংকা-পোড়া দিয়ে খেয়ে অগাধ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়েছিল।

(ক্রমশঃ)

আরণ্যক

—:*:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা।

বাসনা-কামনা হতে অতৃপ্তির সৃষ্টি হয়। তোমার মন মত না হলে তোমার ভাল লাগে না, তাই বলে পারিপার্শ্বিকও তোমার মন মত গড়ে তুলতে চাও। লোক মাত্রেরই যে ভিন্ন ভিন্ন রুচি। পারিপার্শ্বিক ত তোমার মন মত হতে যাবে না। যদি পরিবর্ত্তনই ঘটাতে চাও, তাহা তোমার মাঝেই ঘটাও। তোমার কর্ত্তৃত্ব শুধু তোমার মনের উপরই খাটাতে পার। অন্যের মনের উপর তোমার দাবী নাই। নিজে আদর্শ হলে, তোমাকে দেখে, পারিপার্শ্বিক গড়ে উঠবে।

সঙ্ঘ-সাধনাই মুক্তির সহজ সাধনা। সঙ্ঘে চলায় ব্যক্তিত্বের বালাই নাই বরং আত্ম-নিবেদনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, সাধনার সহজ উপায়। যে জাতি যত উন্নত, সে জাতি তত সঙ্ঘবদ্ধ। ভোগের পথে অতৃপ্তি, ত্যাগের পথে সর্ব্বাবস্থায় অনাবিল আনন্দ। ব্যষ্টির আত্ম-ত্যাগই সঙ্ঘের প্রাণ।

সাধক-জীবনে আমিত্বের অভিমান থাকে, পরিপাক অবস্থায় নিরসন হয়। খাটি বৈদান্তিক প্রকৃত ভক্ত। শুধু অনধিকারীর কাছেই বিরোধ। দাস্য ভাবে, অকর্ত্তাজ্ঞানে নির্ব্বিচারে যখন খেটে যাওয়াই হবে কর্ম্ম, তখন দেহটাকে যন্ত্রবৎ মনে হবে। বৈদান্তিকের দ্রষ্টৃত্ব, সেবকের সেবকজীবন ফুটবে ঐ অবস্থায়, কর্ম্ম হবে তখন স্বভাবের বশে। তার জন্য চাই দীর্ঘকালব্যাপী গুরুমুখী হয়ে নিয়মিত অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা; যে সাধনা সিদ্ধ হবে সেই সেবক নামের যোগ্য হবে।

ভুল ত্রুটি সকলেরই হয়ে থাকে কাহারও স্খলনকে অবজ্ঞার আঘাতে ক্ষুণ্ণ করি—যেখানে আমাদের শ্রদ্ধা বা প্রেম-প্রীতির অভাব। নিজকে যখন সমজদার ভাবি তখনই অভিমানের ফোয়ারায় স্বভাবের বশে হয় শাস্তা না হয় সমালোচক হয়ে বসি। প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের নিজের সম্বন্ধে সজাগ থাকা খুবই দরকার। ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে আমি কে? আমার শক্তি বা অধিকার কতটুকু?

সাংখ্যের নেতি নেতি অর্থাৎ জ্ঞান পথে গেলে মানুষ এক ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যেতে পারে এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ অজ্ঞাত থেকে যায়। ভগবৎ লীলাতত্ত্বও জানে না। এই ভগবৎ তত্ত্ব পেতে হলে ভক্তি-পথে চল্‌তে হবে। এটা হল ছোট হতে বৃহৎকে দেখা আর জ্ঞান-পথে বড় থেকে ছোটকে দেখা। সাধন-পথে ভাব অনুযায়ী দর্শন হয়। তাই ভাবেরও তারতম্য আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"সূর্য্যও একটা বিন্দু আর আমিও একটা বিন্দু।" এই বিন্দু সিন্ধুতে লয় করতে হবে। মহাসূর্য্যই সেই সিন্ধু। ইহাই শক্তিতত্ত্ব বা লীলা-তত্ত্ব। যেমন ঘটাকাশ আর পটাকাশ। একই আকাশ ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতীয়মান হচ্ছে। তেমনি এক মহাশক্তিই প্রত্যেক হৃদয় কন্দরে থেকে রস আস্বাদন করছেন। ইহাই রসিকের দর্শন।

আত্মার ভোক্তা-ভোগীর ভাব আছে। অজ্ঞানে আবৃত জীব তাই ভোগের মধ্যে ছুটাছুটী করছে। যে

বীররসের অভিনয় করে সে কেবল অভিনয়ই করে গেল, কিন্তু যে দর্শক সে দেখ্‌ল আর বীর রসের রসটাও উপভোগ করল। জীব নিজকে ভোক্তা ভোগী মনে করে ভোগের অভিনয় করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই নিজ স্বরূপে অবস্থান করা চাই। কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ে। এই ঘুমের অবস্থাটা আনন্দজনক। কিন্তু জীব তমে আবৃত, তাই সে এটা উপলব্ধি করতে না পেরে অচেতন হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মার যে শক্তির দ্বারা এই দেহ তৈরী হয়েছে সে অব্যাহত থেকে দেহের শ্বাস প্রশ্বাস চল্‌তে থাকে। তাই জীব ঘুম থেকে উঠেই পূর্ব্ব মত সকল বস্তুকে পায়। দেহ খাড়া রাখতে হলে দেহের উপযোগী আহার দিতে হয়। তেমনি মনকে খাড়া রাখ্‌তে হলে মনের উপযোগী জ্ঞান-আহার দিতে হয়। তবে আর এই ঘুমের মধ্যেও মন সমান থাকবে। ইহাই সমাধি বা মনের একাগ্রতা। মনকে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি থেকে নিরোধ করে ঊর্দ্ধে রাখতে পারলে নিজের ইচ্ছামত দেহকে হালকা বা ভারী করা যেতে পারে।

৩

বাহিরের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করে নিজের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে। প্রথমতঃ রসনাকে সামাল দিতে না পারিলে শরীরের গ্লানি মরবে না। শরীরে গ্লানি থাকলে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় না। চিত্ত-শুদ্ধির প্রধান অন্তরায় রসনা। দ্বিতীয়তঃ পরদোষান্বেষণ ছেড়ে আত্মানুসন্ধিৎসু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। তবেই কোথাও বন্ধন বলে মনে হবে না—মুক্তি সুলভ হয়ে যাবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

——:*:——

আশ্রম-সংবাদ

বিগত অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সারস্বত মঠের দ্বাবিংশ বার্ষিক উৎসব ও পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যথারীতি পূজা, হোম, আরতি, বেদ গীতা-চণ্ডীপাঠ এবং নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজান্তে সকলেই যজ্ঞীয় তিলকাদি ধারণ করেন এবং উপস্থিত সকলের মধ্যেই ফলমূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাইপ্রসাদ বিতরিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও সহরের ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্য কোন স্থান হইতে এবার ভক্তসমাগম বিশেষ হয় নাই।

——):*:(——
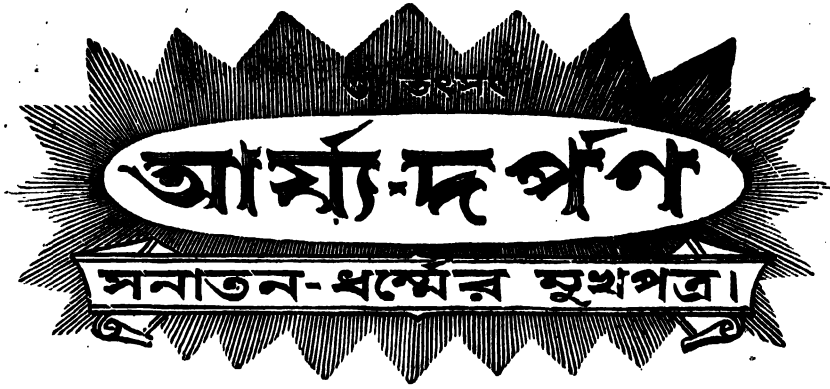
২২শ বর্ষ | ১ম খণ্ড
জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৬
সমষ্টি সং ২৩০ | ২য় সংখ্যা

বামদেবস্য পন্থাঃ

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৫।২৫-২৬

—*—

[ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—ঋষিদেবতে তত্র তত্র জ্ঞাতব্যে]

অদিতিরুবাচ

কিমু ষ্বিদস্মৈ নিবিদো ভনন্ত
ইন্দ্রস্য অবদ্যং দিধিষন্ত আপঃ।
মমৈতান্ পুত্রো মহতা বধেন
বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্বি সিন্ধূন্॥

প্রমুক্ত সলিলরাশি বাসবের স্তুতি কেন গায়?—
অপরাধী ইন্দ্র যদি, তার পাপে কেন দেয় সায়?
মহা-বিনাশের মাঝে বৃত্রেরে যে হানিয়া মরণ
মুক্ত করে সিন্ধু-নীর—জান না সে আমারি নন্দন?

বামদেব উবাচ

মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস
মমচ্চন ত্বা কুষবা জগার।
মমচ্চিদাপঃ শিশবে মমৃড্যুর্
মমচ্চিদিন্দ্রঃ সহসোদতিষ্ঠৎ॥

জননী তরুণী তব গরবিণী প্রসবে তোমারে ;
কুষবা গিলিতে এলো—কি মত্ততা পেয়েছিল তারে!
শিশুরে পাখালে আসি জলরাশি—আনন্দ-নির্ঝর ;
সহসা দাঁড়াল ইন্দ্র বীরদর্পে—ভীষণ, সুন্দর!

উত মাতা মহিষমন্ববেনদ্
অমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ।
অথাব্রবীদ্বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্
সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব॥

মহাবীর বাসবেরে মাতা তাঁর কহিলেন যবে,
"ওই দেখ, বাছা, তোরে ছেড়ে যায় দেবতারা সবে।"
শুনি তাহা কহে ইন্দ্র—বৃত্রবধে সবে আগুসার—
"দেখাও না পরাক্রম, সখে বিষ্ণু, পুঁজি যত যার!"

মমচ্চন তে মঘবন্ ব্যংসো
নি বিবিধ্বাঁ অপ হনূ জঘান।
অধা নিবিদ্ধ উত্তরো বভূবাঞ্
ছিরো দাসস্য সং পিণক্ বধেন॥

তোমারে খোঁচাতে "ব্যংস" এলো ছুটে—নিশ্চয় মাতাল!
কি করে কি হল তব, উড়ে গেল দুইটী চোয়াল!
খোঁচা খেয়ে তারপর, মঘবন্, ঝেঁকে উঠেছিলে—
মাথাটারে ও ব্যাটার একেবারে ছাতু করে দিলে!

কস্তে মাতরং বিধবামচক্রৎ
শয়ুং কস্ত্বামজিঘাংসচ্চরন্তম্।
কস্তে দেবো অধি মার্ডীক আসীৎ
যৎ প্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য॥

পায়ে ধরে ছুঁড়ে ফেলে জনকেরে মেরেছিলে যে,
মাতারে বিধবা তব তবে আর করিল বা কে!
শুয়ে থাক, চর-ফির—তোমারে কে হিংসিল তা বল।
তোমার আনন্দ মাঝে কোন্ দেব কবে বাদী হ'ল?

গৃষ্টিঃ সসূব স্থবিরং তবাগাম
অনাধৃষ্যং বৃষভং তুম্রমিন্দ্রম্।
অরীড্হং বৎসং চরথায় মাতা
স্বয়ং-গাতুং তন্ব ইচ্ছমানম্॥

প্রসবিল ইন্দ্রে মাতা—যেন এক ছট্‌ফটে এঁড়ে—
কি জোয়ান, আঁটসাঁটো—কার সাধ্য কাছে তার ভেড়ে!
মায়ে না চাটিতে করে সে বাছুর কি যে ঝাঁপাঝাঁপি—
যেথা ইচ্ছা সেথা যায়, খুসী তার দেহ ওঠে ছাপি!

অবর্ত্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে
ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্।
অপশ্যং জায়ামমহীয়মানাম্
অধা মে শ্যেনো মধ্বা জভার॥

কুকুরের অন্ত্র রাঁধি ; কি করিব—কি আছে আমার?
কে করে করুণা মোরে দেবলোকে তুমি ছাড়া আর!
প্রিয়ার সে অপমান!—হায় বিধি—তাও দেখিলাম!
সিঞ্চিলে অমিয়া ত্বরা তারো মাঝে তুমি প্রাণারাম!

———

জ্যেষ্ঠ

—*—

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বলিয়া দুইটী কথা আছে। ঠিক বড়-ছোট বলিলে যাহা বুঝায়, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বলিতে আমরা তাহা বুঝি না। ইহার মাঝে যেন একটী মধুর আন্তরিকতার স্পর্শও রহিয়াছে। বড় ছোট আকারগত বা গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মাঝে সে বৈশিষ্ট্য থাকুক বা নাই থাকুক, ইহার চেয়ে বড় আর একটী জিনিষ থাকিবেই—সেটী হৃদয়ের বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সমস্ত গুণের অপেক্ষা না রাখিয়া আপন হৃদয়ের স্নেহ দ্বারা কনিষ্ঠকে আবৃত করেন। তাঁহার বিপুল স্নেহভরা হৃদয়ের কাছে কনিষ্ঠের সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব ঢাকা পড়ে; অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত স্নেহ-প্রেম দ্বারা কনিষ্ঠের সর্ব্ববিধ ন্যূনতাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। কনিষ্ঠও আপনাকে জ্যেষ্ঠের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে সঁপিয়া দিতে পারে। কনিষ্ঠ বিদ্যায় গুণে বড় হইলেও জ্যেষ্ঠের মমতা তাহার জীবনের রসায়ন। যেখানে এই ভাবটী অক্ষত নাই, বুঝিতে হইবে সেখানেই স্বভাবটী ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই; প্রাণের সহজ স্ফুরণ সেখানে ব্যাহত, কুটিল হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষের মাঝে আমরা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের বিচার করি কোন দিক দিয়া? প্রথমতঃ জন্মগত পৌর্ব্বাপর্য্য লইয়া। যিনি এই পৃথিবীতে আগে আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছেন। তাই তাঁহার কাছে কনিষ্ঠের অনেক কিছু পাইবার আশা থাকে। এই পাওয়া কেবল বাহিরের বস্তু পাওয়াই নহে; অতি দুর্ল্লভ অন্তরের অনেক ধনও কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হইতে সঞ্চয় করে। কাজেই জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠের জন্য আপনার সঞ্চয় হইতে অনেকখানি খরচ করিতে হয়। এইরূপে আপন ধন স্বেচ্ছায় অপরকে বিলাইবার যে উদারতা, তাহাই স্নেহরূপে শ্রদ্ধাস্পদের হৃদয়ে বিধাতা পুরিয়া দেন। তাই আজীবন জ্যেষ্ঠের সেই মহাসম্পদ কনিষ্ঠদের বিলাইবার ক্ষমতা ও কনিষ্ঠের তাহা পাইবার অধিকার রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠ আপন হৃদয়ের যাহা কিছু পূর্ণতা, তাহা দিয়াই কনিষ্ঠকে পূরণ করিবেন। কনিষ্ঠ আসিয়াছে আপনার রিক্ততা লইয়া, তাই সে জ্যেষ্ঠের দ্বারে ভিখারী। সে ভিক্ষা শুধু ধনৈশ্বর্য্যই নহে। মানুষ হইতে যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সমস্তের শিক্ষাই সে ভিক্ষা করে। জ্যেষ্ঠ আপন সঞ্চয় অনুযায়ী, শক্তি অনুসারে তাহার রিক্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া দিবেন। এই দানের মাঝেও যে এক মহা তৃপ্তি, ভালবাসিয়া স্নেহ করিয়া তাহা পাইতে হয়। এই তৃপ্তিই সেই দানের ফল। নতুবা শুধু দেওয়া-নেওয়ার হিসাব কষাকষিতে অন্তরাত্মার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

স্বয়ং বিধাতা যাহাকে এ জগতে পরে পাঠাইয়াছেন, তাহার কিছু না কিছু সঞ্চয় জন্মান্তরে হয়ত ছিল। কিন্তু তাহাকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে আরো কত আয়োজনের প্রয়োজন হয়। বীজকে ফুলে-ফলে সুশোভিত মহীরুহে পরিণত করিবার শক্তি একা বীজেরই নয়। তার জন্য আর একটা শক্তির আশ্রয়ে তাহাকে আসিতে হয়। সে শক্তি আলো-বাতাসকে তাহার অনুকূল করিয়া দেয়। বিধাতার নৈসর্গিক নিয়মেই হউক, অথবা মানুষের হাত দিয়াই হউক, অনুকূল স্থানে রোপণ করিলে তবেই তাহা হইতে ক্রমশঃ অঙ্কুর, শাখা-প্রশাখা ও পরে ফুলে-ফলে পরিশোভিত বনস্পতির বিকাশ সম্ভবপর হয়। মানুষও সঞ্চয়টুকু বীজাকারে লইয়া এখানে আসিয়াছে, তাহাকে পরিণত করিতে অনেক সহায়ক শক্তির

প্রয়োজন। এ জগতে যাঁহারা প্রাক্তন, নূতনের পূর্ণ পরিণতির অনুকূল শক্তির ভাণ্ডার তাঁহাদের হৃদয়েই। তাই শিশু যেমন মাতৃবক্ষ হইতে ক্ষরিত সুধাধারা পান করিয়া দিন দিন বাড়িয়া ওঠে, জ্যেষ্ঠের হৃদয় হইতে অমৃত আহরণ করিয়া কনিষ্ঠকেও তেমনি একদিন জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়।

তাহা হইলেই দেখিতেছি, জ্যেষ্ঠের দায়িত্ব অনেক এবং তদনুসারে শক্তিরও প্রয়োজন। বুকের মাঝে টানিয়া আনিয়া আপন প্রাণের নিঃশ্বাসে কনিষ্ঠকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে ; নতুবা তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে এত প্রতিকূলতার মাঝে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু সেই উদার স্নেহময় মহাপ্রাণ তাঁহার আছে কি? পশুর তাহা না থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের তাহা আছে। মানুষকে ভগবান অসহায় করিয়া সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যও আপন জনের হৃদয়ে কত স্নেহই না ঢালিয়া দিয়াছেন। এমন কি একান্ত অনাত্মীয় ব্যক্তিরও মানবশিশুর উপর স্বাভাবিক একটা দরদ আসে। ইহাই মনুষ্যত্বের পরিচয়। হৃদয় দিয়াই মানুষের বিচার। পশুর হৃদয়ে ভাবের স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু সে স্ফুরণ ক্ষণিকার চমক মাত্র। নিত্যকালের ভাবের আবেশ একমাত্র মানবহৃদয়েই সম্ভব।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন, "যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি" —জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে যিনি জানেন, তিনিও জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠই হন।

এইখানে দেখিতে পাইতেছি, যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার গৌরব শুধু বয়সের আধিক্য নিয়া নয় ; তিনি যে শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু শ্রেয়ঃ, যাহা কিছু কল্যাণ, তাহা যে তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সর্ব্বভূতের শ্রেয়োবিধানে তিনি যে অহরহ উদ্‌যুক্ত, ইহাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠত্বের গৌরব সার্থক। এইভাবে তাঁহাকে যে বুঝিতে পারে, জানিতে পারে, সে-ও জ্যেষ্ঠত্বের এবং শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা লাভ করে।

ইহার পর উপনিষদ্ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন— "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ"—প্রাণই হইতেছে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ।

এই প্রাণ কি, তাহা নিয়া ভাবিবার, বুঝিবার অনেক কিছুই আছে। ব্রহ্মসূত্র বলিবেন, যে প্রাণকে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত করা হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাণ ব্রহ্ম, এই উক্তিটীকে মূল ধরিয়া সম্প্রদায়-ভেদে আমরা প্রাণের আরও স্পষ্টতর পরিচয় পাইতে পারি। বলিতে পারি, জ্ঞানবাদীর কাছে যে প্রাণ ব্রহ্ম, তান্ত্রিকের কাছে তাহাই মহাশক্তি, রসিকের কাছে তাহা শ্রীরাধা, প্রকৃতিবিশ্লেষকের কাছে তাহা চেতনা ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী অনির্ব্বচনীয় সত্তা, দেহতত্ত্ব-বিদের কাছে তাহা নাড়ী-চক্রের বৈদ্যুতিক শক্তি, ভূতবাদীর কাছে তাহা বায়ু-ভূত। অনুশীলন করিয়া দেখ, প্রাণের এই সমস্ত সংজ্ঞার মাঝেই আছে একটী অনির্ব্বচনীয় রহস্যের ইঙ্গিত, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য এই জগতকে বোধি দ্বারা উপলব্ধি করিবার একটা সঙ্কেত। এই সঙ্কেতের তাৎপর্য্য যিনি অব-ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ প্রাণবন্ত— উপনিষদের ভাষায় জ্যেষ্ঠত্বে এবং শ্রেষ্ঠত্বে তাঁহারই অবিসংবাদিত অধিকার।

যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি এই প্রাণতত্ত্বকে অধিগত করিয়া জগতের শ্রেয়োবিধানে আপনাকে নিযুক্ত করিবেন, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। প্রাণকে কি করিয়া অধিগত করা যায়? জীবনে সহজ আনন্দের আস্বাদন যিনি পাইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন, প্রাণকে কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু সে বলা তো মুখের বলা নয়। সবিতৃমণ্ডল হইতে প্রা[illegible] রশ্মি উর্দ্ধের আনন্দে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছুটিয়া আসিতেছে এই জগতের পানে, আর তরুলতা ব্যাকুল হইয়া

পত্রপুটে তাহাকে ধরিয়া পান করিতেছে, মানুষের চোখে ফুটিয়া উঠিতেছে দীপ্তি, পাখীর কণ্ঠে জাগিতেছে গান, গুরুভার নৈশ-সমীরণ আনন্দের আতপ্ত স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া লঘু ছন্দে বহিয়া চলিতেছে—এই তো দেখি দ্যুলোক-ভূলোকে দৈনন্দিন প্রাণের আদান-প্রদান! বাহিরে যাহা ঘটে, অন্তরেও তাহা ফোটে। সহজ-আনন্দের রসিক যিনি, তাঁহারই বক্ষ মথিত করিয়া জাগিয়া উঠে বিরহ-ব্যথায় ব্যাকুলিত কত অকথিত বাণীর অস্ফুট কাকলি—বিশ্ব জুড়িয়া আপন জনকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহারা কাঁদিয়া ফিরে। মূকের সে ক্রন্দন, আত্মীয় ছাড়া আর কে বুঝিতে পারে? যে বোঝে, সে নিঃশব্দে এই বিরহের ডালি বুকে তুলিয়া লয়—আঁধারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়ে, বাহিরের জগতে কেহ সন্ধানও পায় না, আঁখিজলের বিনিময়ে কি করিয়া প্রাণের স্পর্শে প্রাণ তৃপ্ত হয়! অন্তর্য্যামীর অন্তঃপুরে প্রাণের এই নিগূঢ় লীলা; নিত্য দেখিতেছি, এই লীলার অভিনয়—ছেদ নাই, বিরতি নাই। স্তব্ধ হইয়া ইহাকে যিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রাণবন্ত, জগতে তিনিই জ্যেষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

এ পথ রসিকের পথ, সংশ্লেষণের পথ। সাধকের পথ, বিশ্লেষণের পথও আছে; সে কথাও বলি।

চৈতন্য ও জড়ের সন্ধিতে প্রাণ। যে সাংখ্যকার চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি কোথায়ও স্পষ্টতঃ প্রাণের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রকৃতির স্বাভাবিকী পরিণামিনী শক্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই শক্তিই প্রাণ। বহির্জগতে ইহার প্রকাশ দেখি জীবন-যোনিপ্রযত্নে (Vegitative functions); অন্তর্জগতে ইহাই আস্বাদন. পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব যাহাকে বলে affective element in sensetion। ইহারই সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে জ্ঞান বা Presentative element, তন্মাত্রে যাহার চরম প্রকাশ। প্রতি তত্ত্বে সমাধি হইলে যে আনন্দের শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর প্রকাশ হয়, তাহাই প্রাণ। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সর্ব্বত্র অন্তর্গূঢ় হইয়া ইহা ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া সাংখ্যকার আর ইহাকে পৃথক সংজ্ঞায় অভিহিত করেন নাই। বিশুদ্ধ সত্ত্বতত্ত্বে বা আনন্দময় কোশে প্রাণ আর চেতনায় সামরস্য ঘটিয়াছে। অবিবেকীর কাছে ইহার জ্ঞান সম্মুগ্ধ—এইখানে আসিয়া সে আত্মহারা হইয়া যায়; এখানে সে যাহা পায়, তাহা যেন তাহার সবটুকু আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, পাওয়ার বস্তুকে ছাপাইয়া উঠিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না। উপনিষদে ইহাকেই বলিয়াছেন—হিরণ্ময় পাত্র, সত্যের মুখকে যাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই অবগুণ্ঠনকে ঘুচাইতে পারিলে, চরম আনন্দের অভিঘাতেও অটল থাকিতে পারিলে তবে প্রাণ আয়ত্ত হইবে। সেই প্রাণই অজস্র ধারায় জগতে বহাইয়া দেওয়া চলে; যিনি জ্যেষ্ঠ, এইরূপে প্রাণকে প্রবাহিত করাই তাঁহার ধর্ম্ম। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই নিদর্শন।

অন্তর্ব্যাপ্তি

(ন্যায়দর্শন)

——(:*:)——

তর্কশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় অনুমানের প্রামাণ্য নির্ণয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবে যথার্থ অনুমানের প্রতিবন্ধক হেত্বাভাসাদির নিরূপণ। ভারতবর্ষে অতি-প্রাচীনকাল হইতে লোকায়ত সম্প্রদায় এবং পরবর্ত্তী কালে বাক্যপদীয়কার ভর্ত্তৃহরি এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-রচয়িতা শ্রীহর্ষ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অনুমান একটা সম্ভাবনা মাত্র এবং ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা থাকিলেও, ইহাকে কোন প্রকারে অভ্রান্ত প্রমাণ বলা যায় না। তাঁহাদের যুক্তির সারার্থ এই যে, অনুমান একটা দৃষ্ট বা জ্ঞাত বস্তুর সহিত আর একটা অদৃষ্ট বস্তুর অচ্ছেদ্য অব্যভিচারী সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এই দৃষ্ট বস্তুর নাম হেতু, লিঙ্গ, সাধন ও গমক প্রভৃতি বলা হইয়াছে এবং অদৃষ্ট বস্তুর লিঙ্গী, সাধ্য, অনুমেয় প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে অব্যভিচারী সম্বন্ধের উপর অনুমান নির্ভর করে—তাহাকে নিয়ম, অন্বয়, প্রতিবন্ধ, অবিনাভাব, সম্বন্ধ, বা ব্যাপ্তি এই আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপ্তি-সম্বন্ধেই যত গোল উঠিয়াছে। হেতু ও সাধ্যের এই অবিনাভাব সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিতে পারি না; কারণ অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানে যাহা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত, সে সমস্ত স্থলে যে এই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহার প্রমাণ কি? যদি বল, অনুমানের সাহায্যে সে সম্বন্ধ জানা যায়; তবে আবার দ্বিতীয় অনুমানটী অপর এক হেতু-সাধ্যের সম্বদ্ধ-জ্ঞানের অপেক্ষা করিবে এবং তাহার জন্য তৃতীয় অনুমান সিদ্ধ করিতে হইলে অনন্ত অনুমান স্বীকার করিতে হইবে—অথচ আমার মূল অনুমানটী সিদ্ধ হইবে না। ইহাকে প্রাচীনগণ 'মূলক্ষতিকরী অনবস্থা' এই আখ্যা দিয়াছেন।

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব কিনা, ইহার একটা মীমাংসা না হইলে অনুমানের প্রামাণ্য দাঁড়াইতে পারে না। এই দুরূহ বিষয়ের সমাধানের জন্য বৌদ্ধ, নৈয়া-য়িক, জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ যে সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচার করিয়াছেন, সে সমস্ত দুরবগাহ যুক্তি-তর্কের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইলে একটী গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে মাত্র প্রয়াসী হইব। বিষয়টি অতি জটিল এবং নীরস। বর্ত্ত-মান লেখকের এ বিষয়ের সৌষ্ঠব ও সরসতা বজায় রাখিয়া ব্যাখ্যান করিবার যোগ্যতাও যৎসামান্য। তবে সাহিত্য-সাধনার চেষ্টামাত্র করাই লেখকের উদ্দেশ্য এবং সহৃদয় সুধীসমাজের আনুকূল্য ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য উন্মত্ত-প্রলাপে পর্য্যবসিত হইবার আশঙ্কা ষোল আনা বিদ্যমান। এখন প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ন্যায়সূত্রকার 'উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ', 'তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ' (ন্যায়সূত্র ১।১।৩৫-৩৬) উদাহর-ণের সহিত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যবশতঃ যাহা সাধ্যের সাধন হয়, তাহা হেতু) এই হেতুলক্ষণ সূত্রে উদাহরণে সাধ্য ও সাধনের সহচার দর্শন করিয়া পর্ব্বতাদি পক্ষে তৎসাদৃশ্যবিশিষ্ট সাধনের দ্বারা যে সাধ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সাধনকে হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে অব্যভি-চারী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, সূত্রে বা ভাষ্যে স্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ না থাকিলেও ভাষ্যে ইহার আভাস পাওয়া যায়। 'অনিত্যঃ শব্দঃ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, উৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টম্' (শব্দ অনিত্য কারণ ইহার উৎপত্তি আছে, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা অনিত্য

ইহা দেখা আছে) এবং 'অনিত্যঃ শব্দঃ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টং যথা আত্মাদি দ্রব্যম্', ভাষ্যকারের এইউক্তিদ্বারা হেতু ও সাধ্যের অব্যভিচারিসম্বন্ধজ্ঞানের* আবশ্যকতা সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ সম্বন্ধজ্ঞান যে অনুমানের প্রয়োজক, ইহা যে সূত্রকারেরও সম্মত, তাহা তাঁহার অনৈকান্তিক প্রভৃতি হেত্বাভাসের নিরূপণ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি। উদ্দ্যোতকর 'উদাহরণেনৈব', 'সাধর্ম্ম্যমেব' এইরূপ সাবধারণ ব্যাখ্যা করিয়া হেত্বাভাসসমূহের নিরাস করা হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। আবার হেত্বাভাস কত প্রকারে হইতে পারে, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্য সূত্রে হেত্বাভাসের লক্ষণ নির্ব্বাচন করা হইয়াছে—এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই 'উদাহরণ' ও 'সাধর্ম্ম্য' শব্দের অবধারণাত্মক অর্থ গ্রহণ করিয়া হেতুর 'পক্ষসত্ত্ব' (পক্ষ পর্ব্বতাদিতে থাকা), 'সপক্ষসত্ত্ব' (সপক্ষে অর্থাৎ দৃষ্টান্তে থাকা) এবং 'বিপক্ষব্যাবৃত্তি' (বিপক্ষে না থাকা)—এই তিনটী রূপের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; এই ত্রৈরূপ্যের দ্বারাই তাঁহার মতে হেতুসাধ্যের অব্যভিচার জানা যায় এবং এই অব্যভিচারই সাধ্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে—কেবলমাত্র অন্বয় বা ব্যতিরেকের তাদৃশ সামর্থ্য থাকিতে পারে না। (তস্মাদ্ যথাঽন্বয়িনোঽন্বয়সম্বন্ধাব্যভিচারঃ প্রতিপাদকঃ, তথা ব্যতিরেকিণোঽপি ব্যতিরেকাব্যভিচার ইতি॥ ন্যাঃ-বাঃপৃঃ১২৩।১২৪)

ন্যায়মঞ্জরীকার পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট লিঙ্গের গ্রহণ দ্বারা ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে যে পরোক্ষ লিঙ্গীর জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমান বলিয়াছেন। এখানে পঞ্চরূপবিশিষ্ট হেতুর দ্বারা ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, এ কথা পাওয়া গেল। কিন্তু উদাহরণবাক্যে ব্যাপ্তির উল্লেখ করিতেই হইবে, ইহা বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে দিঙ্‌নাগ ও তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমরা বৌদ্ধন্যায়গ্রন্থে দেখিতে পাই যে উদাহরণবাক্যে ব্যাপ্তিসূচক বাক্যের উল্লেখ না থাকিলে, তাহা 'অনন্বয়' ও 'অব্যতিরেক' রূপ দৃষ্টান্তাভাস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে ন্যায়মঞ্জরী ও নব্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হইলে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা কত সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইয়াছিল, অভিজ্ঞমাত্রেই তাহা জানেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের নিকট ব্রাহ্মণ্য ন্যায়শাস্ত্র এ বিষয়ে ঋণী—একথা বলিলে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হইবে না।

এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কি উপায়ে সাধিত হয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার ন্যায়শাস্ত্রে করা হইয়াছে। হেতু ও সাধ্যের সহচার দর্শন দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের সিদ্ধান্ত। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িক বলেন যে, কেবল সপক্ষে সহচার-দর্শন ও বিপক্ষে তাহার অদর্শন—ইহা দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহণ অসম্ভব। কারণ শত শতবার সহচারদর্শন করিলেও ব্যভিচারশঙ্কা নিবারিত হয় না [সাহচর্য্যে চ সম্বন্ধে বিশ্রম্ভ ইতি মুগ্ধতা। শতকৃত্বোঽপি তদ্দৃষ্টৌ ব্যভিচারস্য সম্ভবাৎ—ন্যাঃ মঃ পৃ১১৯]। কিন্তু হেতু ও সাধ্যের কার্য্যকারণভাব

*অব্যভিচার—ব্যভিচার শব্দের অর্থ, যেখানে সাধ্য নাই, সেখানে হেতুর থাকা; তাহার বিপরীত অব্যভিচার, অর্থাৎ হেতুর সাধ্যের সহিত নিয়ত সামানাধিকরণ্য (co-existence)। সামানাধিকরণ্য শব্দটীর অর্থ, সমান কিনা এক অধিকরণ অর্থাৎ আধারে থাকা, একজায়গায় দুটী বস্তু বা ধর্ম্মের অবস্থান। যেমন ধূম যেখানেই থাকে, অগ্নিও সেখানেই থাকে—এমন হয় না যে ধূম আছে অথচ অগ্নি নাই; তাই অগ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধকে অব্যভিচার বলা হইয়া থাকে। ইহারই নামান্তর ব্যাপ্তি প্রভৃতি। ধূমের সহিত অগ্নির সম্বন্ধকে অসমব্যাপ্তি বলা হয়; কারণ যদিও ধূম অগ্নিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেনা, অগ্নি কিন্তু ধূমকে ছাড়িয়া থাকে। কিন্তু যেখানে উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেখানে তাহাদের সম্বন্ধকে সমব্যাপ্তি বা সমনৈয়ত্য বলা হয়;—যেমন ধূম ও আর্দ্রেন্ধনযুক্ত অগ্নি। ধূম থাকিলেই আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত অগ্নি থাকিবে এবং আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকিবে; এবং ধূম ও ঈদৃশ অগ্নিকে সমনিয়ত বা সমব্যাপ্ত বলা হয় (co-extensive)।

বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ গৃহীত হইলেই অব্যভিচারী সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। কারণ হেতু ও সাধ্য এক স্বভাব হইলে অথবা হেতু সাধ্যের কার্য্য হইলে, তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার ঘটিতে পারে না ; কেননা কার্য্য কারণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না এবং যাহাদের স্বভাব অবিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে একের অন্যকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব, কারণ কেহ নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না।—এইরূপ বিপরীতসম্ভাবনার নিরাসক তর্ক-জ্ঞান তাহাদের মধ্যে অবিনাভাব-সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে। কেবল সহচার অনেক সময় ভ্রমের কারণ হইয়া থাকে ; যেমন পার্থিব পদার্থমাত্র লৌহলেখ্য—এই ব্যাপ্তি শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইলেও আমাদের ব্যাভিচার-সংশয় নিবৃত্ত হয় না ; যেহেতু বজ্র (হীরক) পার্থিব হইলেও লৌহ-লেখ্য নহে। তাই ব্যাপ্তিজ্ঞানের গ্রাহক কার্য্যকারণভাব বা তাদাত্ম্যজ্ঞান। ন্যায়মঞ্জরী-কার বৌদ্ধদের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কার্য্যকারণভাবকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের গ্রাহক বলিলে অনেকস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপপত্তি করা যাইবে না। কয়েকটী স্থল দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—যেমন, সূর্য্যের অস্তগমন দেখিয়া তারকার উদয়, পূর্ণ-চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্রের বৃদ্ধি, অগস্ত্যনক্ষত্র উদিত দেখিয়া শুষ্ক নদীপুলিনে বিশ্রামপরায়ণ খগপংক্তির অবস্থান, পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার দর্শনে আসন্নবৃষ্টির অনুমান—এগুলি কিরূপে উপপন্ন করা যাইতে পারে? ইহাদের মধ্যে তো কার্য্য-কারণসম্বন্ধ কেহ কল্পনাই করিতে পারে না। যদি বল, কেবল সহচারদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তির মূল প্রয়োজক কি জানিতে পারা যায় না, অতএব ব্যভিচারের শঙ্কা থাকিবেই, তাহা হইলে এ শঙ্কা কার্য্যকারণ সম্বন্ধেও সম্ভব। অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হয়, জল হইতে হয় না—ইহার নিয়ামক কি? যদি বল, এইরূপই দেখা যায়, তবে আমার সহচার সম্বন্ধেও ইহাই উত্তর—[তস্মিন্ সত্যেব ভবনে ন বিনা ভবনং ততঃ। অয়মেবাবিনাভাবে নিয়মঃ সহচারিতা॥ কিং কুতো নিয়মোঽস্যাস্মিন্নিতি চেদেবমুত্তরম্। তদাত্মতাদিপক্ষেঽপি নৈষ প্রশ্নো নিবর্ত্ততে॥ জ্বলনাজ্জায়তে ধূমো ন জলাদিতি কা গতিঃ। এবমেবৈদিতি চেৎ সাহচর্যেঽপি তৎ সমম্॥" ন্যাঃ, মঃ পৃঃ ১২১]।

ইহার উত্তরে বৌদ্ধেরা বলেন যে, কেবল সাহচর্য্যের দ্বারা ব্যাপ্তিনির্ণয় সাধিত হইতে পারে না, কারণ বিপক্ষে বাধকজ্ঞান উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত সংশয় দূর হয় না এবং বিপক্ষবাধকজ্ঞান হেতু-সাধ্যের কার্য্যকারণ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ গৃহীত না হইলে অবতীর্ণ হয় না ; তাহার দৃষ্টান্ত পার্থিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্বের মধ্যে সাহচর্য্য থাকিলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব। আর চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি বা কুমুদের বিকাশের যে অনুমান হয়, তাহার হেতু কেবল সাহচর্য্য নহে। কিন্তু চন্দ্রোদয় ও কুমুদের বিকাশ এককালে সংঘটিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব না থাকিলেও চন্দ্রোদয়ের যাহা কারণ, তাহা কুমুদবিকাশের সহকারী কারণ—এই জ্ঞানের সাহায্যেই তাহাদের মধ্যে এককারণজন্যত্ব অবধারণ হয়। আর কৃত্তিকার উদয়ে রোহিণীর সন্নিধিজ্ঞানও উভয়ই এক সামগ্রী(কারণ সমুদয়)-প্রসূত বলিয়া পরম্পরাই কার্য্য-কারণসম্বন্ধজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রূপ হইতে রসের অনুমানও উভয়েই ধূম ও ইন্ধন-বিকারের ন্যায় একসামগ্রীজন্য বলিয়াই সম্ভব হয়। অতএব যেখানেই একের জ্ঞান অন্যের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যকারণসম্বন্ধ বা তাদাত্ম্য না থাকিলেও পরম্পরায় ঐরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি সেরূপ সম্বন্ধ জানিতে না পারা যায়, তাহার জন্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ; কেবল সহচার দর্শনে তুষ্ট থাকিলে উহাদের অব্যভিচার নির্ণীত হইবে না। এইরূপ সহচারকে পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রে Empirical generalisation (ব্যবহারিক ব্যাপ্তিজ্ঞান) এই আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

অধ্যাপক কার্ভেথরীড তাঁহার Logic ; Deduc-

tive and Inductive নামক গ্রন্থে এইরূপ পঞ্চবিধ সহচারের (Co-existence) উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অবধৃত হয় না; যথা—

(১) জ্যামিতিক সহচার—যেমন চতুর্ভুজক্ষেত্রের বিপরীত কোণগুলি সমপরিমাণ হইলে, তাহার বিপরীত বাহুগুলি সমপরিমাণ ও সমান্তরাল হইবে—এই স্থানে সহচরিত ধর্মগুলি পরস্পরের কারণ নহে বা তাহারা কোন সাধারণ কারণের সহজাত কার্য্য—ইহাও বলা যাইতে পারে না। কেবল একের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্ব সাধন করে মাত্র—এমনই বস্তুর স্বভাব। কিন্তু দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ স্বভাব বা তাদাত্ম্য হেতুর মধ্যে ইহার অন্তর্ভাব কল্পনা করিবেন। কারণ ইহা দৈশিক সত্তার (space) স্বভাব হইতে সমদ্ভূত—যেমন শিংশপাত্ব বৃক্ষত্বের স্বভাব হইতে উদ্ভূত।

(২) মূর্ত্ত দ্রব্যের ধর্মসমূহের সার্ব্বদিক সহচার—যেমন গুরুত্ব (graviy) ও সংস্কার (inertia—বেগ ও স্থিতি স্থাপকত্ব) সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থের মধ্যে সহসন্নিবিষ্ট দেখা যায়; ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কারণ অদৃষ্ট হইলেও উহারা যে মূর্ত্তপদার্থের স্বভাব হইতে সমুদ্ভূত, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায়।

(৩) প্রাকৃতিক পদার্থের স্বরূপ বা লক্ষণঘটক ধর্ম্মসমূহের একত্র সমবধান (সহচার)।—ইহাদের কোন কারণ থাকিতে পারে—কিন্তু তাহা অজ্ঞাত। অতএব প্রক্রিয়া সৌকর্য্যের অনুরোধে পৃথক্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা উচিত।

(৪) ভূমিস্তরের (geological strata) ও অরণ্যে বৃক্ষরাজির আপেক্ষিক সন্নিবেশ।—ইহা অবশ্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু সে কারণ সব সময়ে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

(৫) অনেক বস্তুতে ধর্ম্মসমূহের পরস্পর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তাহারা সমুদয় জাতির সহিত সমনিয়ত (co-extensive) নহে; যেমন 'প্রায় ধাতুমাত্রেই শুক্লাভ (whitish)' 'লালফুলের সুগন্ধ নাই'—ইত্যাদি স্থলে।

বৌদ্ধেরা বলিবেন যে, এসব স্থলে যদিও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বা তাদাত্ম্য আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, তথাপি নিশ্চয়ই এরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, কারণ, সম্বন্ধ না থাকিলেও যদি একের জ্ঞান অন্যের জ্ঞানের হেতু হয়—তাহা হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর জ্ঞান অনিবার্য্য হইয়া পড়ে (সম্বন্ধানুপপত্তৌ চ সর্ব্বস্থাপি গতির্ভবেৎ—তত্ত্ব সংগ্রহ, ১৪২৩ কারিকা।

এই যুক্তির দ্বারাই নৈয়ায়িকদের আপত্তিও খণ্ডিত হইল। কারণ কেবল অন্বয়ী বা ব্যতিরেকী সহচার দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞান হইতে পারে না—সম্বন্ধজ্ঞানের প্রতি বিপক্ষবাধই প্রযোজক।*

এখন, ব্যাপ্তিজ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাহার সাক্ষাৎ কারণ কি—এ বিষয়ে জয়ন্তভট্ট স্বকৃত ন্যায়মঞ্জরীতে এই সমস্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) মানসপ্রত্যক্ষ দ্বারাই ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়; প্রত্যক্ষ ও অনুপলব্ধি (observation and non-observation) দ্বারা বহ্নি ও ধূমের সহচার ও অগ্নিশূন্য স্থানে ধূমের অভাব গ্রহণ করিয়া, লোকে ধূম অগ্নিব্যাপ্ত ইহা মনের দ্বারা বুঝিয়া থাকে, কারণ মন সর্ব্ববিষয়গ্রাহী। ত্রিভুবনে যত ধূম ও অগ্নিব্যক্তি আছে, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে—ইহার কোন সার্থকতা বা উপযোগিতা

*প্রযোজক শব্দের অর্থ যাহা পরম্পরায় অর্থাৎ ব্যবধানে কার্য্যের জনক (remote or mediate cause)। যাহা অব্যবধানে অর্থাৎ সাক্ষাৎ কার্য্যের জনক (immediate cause), তাহাকে জনক বা কারণ বলা হয়।

নাই, যেহেতু সামান্য-পুরস্কারে* ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়—ইহা স্বীকার করিয়া এই উপপত্তি সম্ভব হইল।

(২) কেহ কেহ বলেন যে যোগিপ্রত্যক্ষকল্প একরূপ যৌক্তিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। অগ্নিত্ব ও ধূমত্ব পুরস্কারে, যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি—এই প্রকার অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইলেও, যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধূমও নাই—এরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তি প্রত্যক্ষদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ 'অগ্নি'র অপেক্ষায় 'অনগ্নি'র সংখ্যা খুব বেশী; এক্ষেত্রে সামান্য-পুরস্কারে জ্ঞান হয়—তাহাও বলা যায় না, কারণ অভাবের সামান্য সম্ভব নয়। তাই অনগ্নিত্ব-পুরস্কারে সমস্ত 'অনগ্নি'-ব্যক্তির জ্ঞান হইতে পারে না। অথচ ব্যতিরেকের জ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তি অবধারিত হইতে পারে না। অতএব যোগিপ্রত্যক্ষতুল্য যৌক্তিক প্রত্যক্ষ কল্পনা করিতে হইবে—যাহা অশেষ ব্যক্তির গ্রাহক হইতে পারে।

(৩) মীমাংসকগণ বলেন যে, এরূপ উদ্ভট কল্পনার প্রয়োজন নাই। সামান্য-পুরস্কারে অন্বয়-ব্যাপ্তির গ্রহণ হইলেই হইবে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই। ভূয়োদর্শনের দ্বারা আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয় যে একটী অন্যটীর দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহাই পর্য্যাপ্ত। অগ্নি-রহিত স্থানে তো আজ পর্য্যন্ত ধূম দেখা যায় নাই—তখন তাহার আশঙ্কা অপ্রামাণিক (দোষ-জ্ঞানেত্বনুৎপন্নে নাশঙ্কা নিষ্প্রমাণিকা—তঃ বাঃ সূত্র ২, শ্লোঃ ৬০)।

(৪) নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, মীমাংসকের এই মত যুক্তিসহ নহে। কারণ ব্যাপ্তির স্বরূপ—অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দুইটীই। একটী থাকিলে অপরটী থাকিবে, একটী না থাকিলে অপরটি থাকিবে না, এই দ্বিবিধ ভূয়োদর্শন না হইলে সংশয়-নিবৃত্তি হইতে পারে না। কেবল অন্বয় (agreement)-জ্ঞানে অৰ্দ্ধগৃহীত ব্যাপ্তি হইবে, কারণ ব্যাপ্তির অপরার্দ্ধ যে ব্যতিরেক (differnce) তাহার জ্ঞান হইল না। আর অনগ্নিসামান্য না থাকিলেও যোগিপ্রত্যক্ষকল্প যৌক্তিক-প্রত্যক্ষকল্পনার প্রয়োজন নাই, কারণ মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারাই অন্বয় ও ব্যতিরেকের জ্ঞান সম্ভব। ধূমসামান্যের সহিত বহ্নিসামান্যের সহচার যেমন উপলব্ধ হইয়া থাকে; তদ্রূপ তাহাদের অভাবেরও সহচার উপলব্ধ হইবে। কারণ ধূমত্বসামান্যের তো অগ্নিরহিত জলাদিতে অভাবজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদিও অভাবের সামান্য(*) হয় না (সামান্য সত্তার অবান্তর-ভেদ, অভাবে সত্তার সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া তাহার সামান্যও অস-ম্ভব), তথাপি যাহার অভাব সেই প্রতিষেধ্য অর্থের তো সামান্য আছে, তাহাই অভাবকে বিশেষিত করিবে। তাই সমস্ত অগ্নিরহিত স্থলেই যে ধূমাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইবে—ইহার কোন সার্থকতা বা উপযোগিতা নাই (ন্যাঃ মঃ ১২২-২৩)।

নব্যনৈয়ায়িকগণ কিন্তু এই সামান্য-পুরস্কারে অশেষ ব্যক্তির জ্ঞানকে মানসপ্রত্যক্ষ বলেন নাই। তাঁহারা এই জ্ঞানকে সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষরূপে অলৌ-কিক প্রত্যক্ষ বলিয়া অভিহিত করেন এবং সামান্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইলে সামান্যের আধারভূত যাবৎ-ব্যক্তি বিষয়ের জ্ঞান এই অলৌকিক-প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করেন। ফলে কোন ভেদ নাই, কিন্তু বহির্ব্বিষয় প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মন অসমর্থ বলিয়াই এরূপ কল্পনা করা হইয়াছে মনে হয়। (ক্রমশঃ)

---

* পুরস্কার শব্দের অর্থ—পুরঃ অর্থাৎ অগ্রে, কার অর্থাৎ করণ, স্থাপন। সামান্য পুরস্কারে—ইহার অর্থ সামান্যকে অগ্রে অবলম্বন করিয়া। যেখানে দুইটী বস্তুর প্রাপ্তি, সেখানে একটীকে পুরোভাগে গ্রহণ করার নাম পুরস্কার। তাই শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার এইরূপ বিভাগের কারণ কি —ইহার উত্তরে প্রদীপকার বলিয়াছেন যে, এক একটীর পৃথক অবস্থান-পুরস্কারে বিভাগ করা হয় না, কিন্তু প্রাধান্য পুরস্কারে। ইহার অর্থ এই যে, যদিও অলঙ্কার শব্দ এবং অর্থ উভয়েরই শোভার বর্দ্ধন করে, তবুও শোভার আধিক্যকে গ্রহণ করিয়াই বিভাগ হইয়া থাকে। এইরূপ ভেদপুরস্কারে অভেদবোধ—ইহার অর্থ, প্রথমে ভেদের বোধ হইয়া পরে অভেদ-বোধ হয়।

(*) অভাবের সামান্য স্বীকার করিলে, অভাবের স্বরূপহানি হয় অর্থাৎ অভাব ভাবাত্মক হইয়া পড়ে। আর দুটী বিরোধী বলিয়া ভাবাত্মক সামান্য ও অভাবের সম্বন্ধও সম্ভব নহে—'ব্যক্তিরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ॥

সঙ্কেত

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—*—

খাওয়ার সময় গল্প করাটা এদেশের দস্তুর; কিন্তু ভারতবর্ষে তা নিয়ম নয়। সেখানে খাওয়ার সময় কথা না বলাটাই হচ্ছে বিধি। খাওয়াটাকে মনে করতে হবে যেন একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্যাপারটাকে পুণ্যময় করে তুলতে হবে। প্রত্যেক গ্রাস অন্ন মুখে তুলবার সময় ভাববে যে,* এই অন্নগ্রাস পৃথিবীর প্রতীক। আমি অন্নগ্রহণ করছি না তো সমগ্র বিশ্বকে আত্মসাৎ করে নিচ্ছি। ও দেশের লোক খাওয়ার সময় সর্ব্বদাই এই ভাবটা মনের মাঝে পোষণ করে আর ওঙ্কার জপ করে; জপের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে যে সমস্তটা বিশ্বকেই যেন সে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছে। "ওম্—ওম্—আমাতেই আছে এই বিশ্বপ্রকৃতি—এ নিখিল আমারই তনু।" এই ভাবে প্রতিগ্রাস অন্ন গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তারা আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় করে। ভৌতিক অন্ন আর আধ্যাত্মিক অন্ন এক হয়ে যায়। সমস্তটা জগতই আমি—এ আমারই রক্ত-মাংস। অন্ন সমস্ত বিশ্বেরই প্রতীক। সর্ব্বত্রই রয়েছে অদ্বৈতভাব! হিন্দুর কাছে এ ভাব সুপরিচিত বলে আহারের সময় এই সমস্ত চিন্তা খুব সহজেই তাদের মাঝে এসে পড়ে আর তাতে ভাবের পুষ্টি হয়, ইচ্ছাশক্তিও এমনি বাড়ে যে অপরোক্ষানুভব অতি সহজ হয়ে যায়, যে খাওয়াটা একটা পশুসুলভ দৈহিক ব্যাপারমাত্র, তাও অধ্যাত্মসাধনার রূপ ধারণ করে।

স্নানের সময়ও ওঙ্কার জপ কর। ভাব, এই জল যেন বিশ্বব্যাপী মহাসমুদ্রের প্রতীক। স্নানের সময় সমস্ত আবরণ খসিয়ে ফেলে নগ্ন দেহের সঙ্গে জলের সংযোগ হল, দেহের প্রতি রোমকূপ যেন জলকে শুষে নিল, প্রকৃতির সঙ্গে আমরা এক হয়ে গেলাম, জলচর জীবের পরমাত্মীয় হলাম, বিশ্বব্যাপী জলরাশির স্নেহস্পর্শ পেলাম তনুর প্রতি অণুতে অণুতে। জল যেমন দেহের ময়লা ধুয়ে ফেল্‌ছে, তেমনি আমাদের মনের ময়লাও ধুয়ে দিচ্ছে।

সমস্ত জগতই আমার অন্ন, আমি পবনাহারী। বেদান্তের সাধনা অনুসরণ করে চললে জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্মকে সাধনায় রূপান্তরিত করা যায়; রোগ পর্য্যন্ত দিব্যভাবের বাহন হয়ে ওঠে।

ওদেশে যখন বসন্ত হয়, তখন লোকে মোটেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে না বা কোনও প্রতিকার-চিন্তাও করে না, বরং তারা আরও আনন্দ করে। অবাক্ কাণ্ড নয় কি? গৃহস্থ তখন বাদ্যভাণ্ডের সমারোহ করে, সে যেন একটা পর্ব্বদিন। তাদের দুঃখ নাই, ভাবনা-চিন্তা কিছুই নাই। ছেলে ভাল হয়ে গেলে দান-ধ্যান করে তারা দেবতার পূজা করে, ঢোল পিটিয়ে, নানা উপায়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আজকাল অবশ্য জনসাধারণ এই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভুলে গেছে। লোকে বুঝুক আর না বুঝুক, রাম তো এসকলের অর্থ জানেন; কাজেই তিনি এসব যথাসম্ভব কাজেও লাগিয়ে থাকেন।

একটা কথা রাম তোমাদের সবাইকে মনে রাখ্‌তে বল্‌ছেন। ভোরে ঘুম থেকে উঠে বেড়াও, যা কিছু কর, মনের চিন্তাগুলোকে যেন ছড়িয়ে পড়তে দিও না। সর্ব্বদা কেন্দ্রগত হয়ে থাকবে, কখনো কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ো না। যেমন নাকি অকূল জলরাশির মাঝে মীনের বাস, অকূল বায়ুসমুদ্রে পাখীর বাস, তেমনি অকূল জ্যোতিঃসমুদ্রে তোমারও বাস। আলোতে তুমি বেঁচে আছ, চলা-

ফিরা করছ, তোমার সত্তাকে আপ্যায়িত করছ। বাইরে যখন দেখ্‌ছি অন্ধকার, বিজ্ঞানের মতে বাস্তবিক তখনো আলোই রয়েছে কিন্তু। অন্তরের আলো তো নিব্‌ছে না। গভীর সুষুপ্তিতেও সে আলো জ্বল্‌ছে। মনকে যদি একাগ্র করতে চাও, অনুভূতির তুঙ্গশিখরে যদি উঠতে চাও তো আপনাকে সর্ব্বদাই আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত প্লাবিত বলে অনুভব করবে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে এই উপদেশ।

আলোকে আমরা জড়বস্তু বলে উপাসনা করি না—যেমন নাকি রোমান ক্যাথলিকেরা পুতুলপূজা করে, আমরা কিন্তু তা করি না। হিন্দুশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করছে যে, সাধনার সুরু হতেই জগজ্জ্যোতিকে আত্মজ্যোতিঃ রূপে ভাবনা করবে—এই হচ্ছে আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। যখন ওঙ্কার জপ করছ, তখন অনুভব কর তুমি দিব্য-জ্যোতির্ম্ময়! তুমি তো জ্যোতিঃস্বরূপই। এই ভাবটা হিন্দুর শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—সমস্ত ঋষি-প্রবক্তাই এই ভাব পেয়ে গেছেন। খৃষ্ট বলেছিলেন, আমিই জগজ্জ্যোতিঃ। মহম্মদ ও অন্যান্য মহাপুরুষেরাও ওই কথাই বলে গিয়েছেন। জ্যোতিঃস্বরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি ছেয়ে আছ।

এই ভাবগুলি সদাসর্ব্বদা মনন করতে হবে। এই ভাবে হিন্দু যা কিছু করে, তাই ধর্ম্মানুষ্ঠানের তরফ থেকে আত্মার সঙ্গে যোগ রেখে করে থাকে।

তোমার ইচ্ছা থাক্ আর না থাক্, প্রকৃতি তার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে আত্মোপলব্ধির পথে তোমায় টান্‌বেই টান্‌বে। অবস্থা অনুকূলই হোক্, আর প্রতিকূলই হোক্, তাতে বড় বিশেষ কিছু আসে যায় না। হাঁটবার সময় যেমন একটা পা তুলি আর একটা পেতে দিই, তেমনি ক্রমান্বয়ে সুখ আর দুঃখ জীবনে আস্‌ছে, আর সমগ্র বিশ্ব ব্যাপে এই খেলাই চল্‌ছে। সংসারের সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে যারা রয়েছে, তারাই বাস্তবিক আনন্দে আছে। সুখ আর দুঃখ দুটীকেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে, তবেই বাস্তবিক আমরা আনন্দের সাক্ষাৎকার পাব। সুখ যেমন আমার কাছে আস্‌ছে, দুঃখও তেমনি আসুক না! সুখ-দুঃখের অতীত হতে পেরেছে যে, তার কাছে ও দুটো তো পৃথক্ পৃথক্ বলে প্রতিভাত হয় না—একটাকে যদি সে নেয় তো আর একটাকেও নিতে বাধে না। দুঃখের মাঝে আছে সুখ, আবার সুখের মাঝে রয়েছে দুঃখ; দুয়ে যে ছাড়াছাড়ি হবার নয় কখনো। সুখের বখরা যে নেবে, দুঃখের বখরাও যে তাকে নিতে হবে। সত্যিকার আনন্দ হচ্ছে এ দুয়ের ঊর্দ্ধে চলে যাওয়া। সর্ব্বদাই আত্মারাম হয়ে থাক। সুখকে যেমন, দুঃখকেও তেমনি রসের সঙ্গে ভোগ করতে পারে যে, সেই মুক্ত। সদাসর্ব্বদা আত্মপ্রতিষ্ঠ থেকো, তোমার আনন্দ কিছুতেই নষ্ট হবে না। যে মুক্ত প্রকৃতি তার দাসী, সমগ্র জগৎ তার পদানত। সোঽহং—তত্ত্বমসি! আজ এ ভাব ধরতে পার আর নাই পার, অচল কঠিন হয়ে জেগে রইল এ ভাব, আজ হোক আর দুদিন পরেই হোক, একদিন অনুভবে আসবেই আসবে। বল ওম্—ওম্, বল সোঽহং—কেননা এতে সত্যের দিকে তোমার চিত্তটী ফিরে থাকবে। কার্য্যকারণের জগতে চিত্তটাকে নামিয়ে আনাই হচ্ছে সব চেয়ে গুরুতর অধঃপতন। জগদ্‌ব্যাপারের কার্য্যকারণের হিসাব তলব করতে যখন মানুষ বসে যায়, তখন থেকেই তার পতনের সুরু। শিশু কার্য্যকারণ-ধারার ঊর্দ্ধে থাকে, যা পায়, তাতেই তার আনন্দ, কারণ খোঁজার বাতিক তার নাই; তাই শিশু নিরুদ্বেগ, শিশু আলোকময়। এই কার্য্যকারণ-স্রোতে গা না ঢেলে দিয়ে ওঠো সেই নির্ব্বিকার ভূমিতে। আমি শুধু প্রতিভাসের দ্রষ্টা, কিছুর সঙ্গেই আমি জড়িত নই—আমি সবার ঊর্দ্ধে।

এই প্রাতিভাসিক জগৎ শুধু ছন্দোবদ্ধ কম্পন মাত্র, চক্রের উর্দ্ধাধঃ গতি মাত্র, পাদক্ষেপের উন্নয়ন আর অবনমন মাত্র। উদ্দেশ্য—তোমাকে এই কারণপ্রবাহের উর্দ্ধে টেনে তোলা, নামিয়ে আনা নয়। এই প্রবাহের উর্দ্ধে উঠ্‌তে হলে চাই অবিরাম চেষ্টা, প্রাণপণ লড়াই। ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌লে, তুমি মুক্ত, তুমি ঈশ্বর—বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি। ওম্—ওম্—ওম্!

জীবনপথে চল্‌তে গেলে তোমার দেহের আর মনের শক্তির ওপর কত কিছুরই দাবী জন্মে যায়, আর তাতে অষ্টপ্রহর তোমাকে যেন সঙীন্-চড়াও হয়ে থাক্‌তে হয়। যদি চারিদিককার এই চাপকে তুমি মেনে নাও তো বুঝ্‌তে হবে—আপন হাতে তুমি অকালে আপনার চিতা সাজাচ্ছ! কি করে এ হতে বাঁচা যায়? বিশ্রাম মিলে কি করে? রাম বলছেন না যে কর্ত্তব্য হতে পিছু হটে এস, বা দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মে গাফিলি কর। রাম কক্ষণো তোমাদের তা বল্‌বেন না। তবুও রাম তোমাদের এমন একটা অভ্যাস আয়ত্ত করতে বল্‌ছেন, যাতে অতি শ্রমসাধ্য কর্ম্মের মাঝেও তোমাদের চিত্তটা নির্ম্মুক্ত রাখতে পায়। অভ্যাসটী আর কিছুই নয়—বেদান্তের ত্যাগধর্ম্মের অনুশীলন। ত্যাগের অচল শিখরে সর্ব্বদা নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ্‌তে হবে। আর সেই দৃঢ়ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে যে কাজই তোমার সাম্‌নে আসুক না কেন, পূর্ণোদ্যমে তার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার শ্রান্তি আস্‌বে না, যত দুষ্কর কর্ম্মই হোক্ না কেন, তুমি সার্থক হবে।

আরও একটু বুঝিয়ে বলি। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে একটুখানি বিশ্রাম করবে, আর এই দু'এক মিনিট বিশ্রামের সময়টাতে ভাব—যেন তোমার দেহটা কিছুই নয়, কোনও দিন যেন এই দেহটার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক হয়নি। তুমি সাক্ষী মাত্র, এই দেহের ক্রিয়া ও উত্তেজনা-অবসাদের দায়িত্ব তোমার কিছুই নাই। এই ভাবতে ভাবতে চোখ দুটী বোজ, মাংসপেশীগুলো শিথিল করে দাও, সমস্তটা শরীর একেবারে সম্পূর্ণ আয়েসের মাঝে ডুবে যাক্, মনে যেন কোন ভাবনা-চিন্তাই না থাকে। ঘাড় থেকে চিন্তার বোঝা যত নেমে যাবে, ততই নিজকে শক্তিশালী বলে মনে হবে।

নাড়ীগুলি (nerves) আমাদের প্রাণশক্তির জোগানদার আর এই নাড়ীচক্রে আমাদের ভাবনা-চিন্তাগুলো গাঁথা রয়েছে। পরিপাক-ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন, কেশোদ্গম ইত্যাদি সমস্তই নাড়ীচক্রের ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করছে। মন যদি চঞ্চল হয়, বিভিন্নমুখী চিন্তায় যদি তোমায় তোলপাড় করে, তাহলে নাড়ীচক্রের ওপর অত্যন্ত গুরুতর চাপ পড়ে। প্রাণপণে চিন্তাশক্তিকে উত্তেজিত করার কালে নাড়ীচক্রে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তা একদিক দিয়ে লাভের হলেও আর একদিক দিয়ে এতে বড্ড ক্ষতি করে। এতে দেহের জীবনীশক্তির ক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটে। এ যেন দুটো ঘোড়ার বোঝা একটা ঘোড়ার পিঠে চাপানো। একদিকে বোঝা বাড়ালে আর একদিকে কমাতে হয়। বোঝা খালাস করে নিলে ঘোড়াটা স্বচ্ছন্দে ছুটতে পারে। যদি প্রাণশক্তিকে তাজা রাখ্‌তে চাও, স্বাস্থ্যকে অটুট রাখ্‌তে চাও, জীবনের বোঝা দুর্ব্বহ করে তুল্‌তে না চাও তো চিন্তার বোঝা হাল্‌কা কর। মাথা-ঘুলিয়ে-দেওয়া যত বদ্‌খত চিন্তাভাবনায় জীবনটাকে শুকিয়ে ফেলো না। অটুট স্বাস্থ্য আর পরিপূর্ণ কর্মশক্তি বজায় রাখতে হলে মনকে সর্ব্বদা হাল্‌কা এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখ্‌বে, কক্ষনো গোম্‌রা হয়ে থাক্‌বে না, তাড়া-হুড়ো কর্‌বে না—কোনো ভয়ে, কোনো চিন্তায়, কোনো উদ্বেগে কক্ষনো দিশেহারা হয়ে যাবে না।

বৈদান্তিকের ত্যাগধর্ম্ম তাহলে কি ?—দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দাও যত ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, অশান্তি, ব্যস্ততার জঞ্জাল ; মনের সামনে সর্ব্বদা জেগে থাক্ তোমার ব্রহ্মভাবের ভাস্বর জ্যোতিঃ—সংসারের ভাবনা-চিন্তা, কর্ত্তব্যের দায় হতে নির্ম্মুক্ত তোমার আনন্দময় সত্তা ! কোনও কর্ত্তব্যের দায় তোমার কাঁধে পড়ে নি, তুমি কারু কাছে বাঁধা নও, কারু খাতক নও তো ! তোমার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোল সমগ্র সমাজ-শাসনের, রাষ্ট্রশাসনের রক্তচক্ষুকে অস্বীকার করে ! এই হচ্ছে বেদান্তের ত্যাগধর্ম্ম। সমাজ, আচার, আইন, কানুন, নিন্দা-সমালোচনা, কিছুই তোমার অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—এই অনুভবে প্রবুদ্ধ হও। ছুঁড়ে ফেলে দাও যত কিছু বিভীষিকা—ও সব কি ? ও তো তুমি নও। এই হচ্ছে ওঙ্কারের তাৎপর্য্য ; যখনই শ্রান্ত হয়ে পড়বে, তখনি বল্‌বে ওম্—ওম্—ওম্ !

*

বুভুক্ষুর মত বলছি, মৈঁ ভূখা হুঁ, চাই অপরোক্ষানুভবের একটু আস্বাদন, তাই অহরহ প্রণব জপ করছি, মনের দীর্ঘশ্বাসে জীবনের বেণু স্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে। তাই বলি, হে সাধক, চিত্তসায়রে ডুবে দেখ, অগণিত বাসনা সেখানে কিলবিল করছে, একে একে পিষে ফেল তাদের। সঙ্কল্পে দৃঢ় হও—অটুট প্রতিজ্ঞা কর। তার পরে কালীদহ হতে উঠে এলে আর সে জলে বিষের সংস্পর্শ থাক্‌বে না—মানুষে পশুতে নির্ভয়ে সে জল পান করবে, খলের বিষক্রিয়া তাদের আর মূর্চ্ছিত করবে না, সে জল হবে ভগবানের পাদপদ্ম হতে প্রবাহিত জাহ্নবীর ধারা। কোথায় তোমার দুর্ব্বলতা খুঁজে বের করে নির্ম্মূল কর তাদের। বাসনায় একাগ্রতা নষ্ট হয় ; চিত্ত পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত একাগ্র হয় না। চিত্ত একাগ্র করতে গিয়ে যাতে প্রথম বাধা পাও, তাকেই আগে ঝেড়ে ফেল। নিজের কাছে খাঁটী হও। এদেশে পরকে শোনাতে বক্তৃতা হয় মেলা। নিজকে আগে বক্তৃতা শোনাতে হবে। এ ছাড়া আত্মোন্নতি অসম্ভব।

শোবার আগে বিছানায় চুপ করে ভাব, কি কি ত্রুটী দূর করা প্রয়োজন। বাইবেল, গীতা, উপনিষদ্ কি ইমার্সনের গ্রন্থ, যা হোক একটা কিছু পড়। হয়ত লোভ বা শোক হচ্ছে তোমার আজকার অপরাধ ; ওই স্বাধ্যায় দিয়ে নিরূপণ কর, কেন এই অপরাধ তোমার মাঝে আছে, কি করে এ যাবে, এর দরুণ কোথায় বা তোমার বাধা। তারপর সে অপরাধ হতে নিজকে ঊর্দ্ধে ভাবনা করে বল—ওম্—ওম্—ওম্। যখন নিশ্চিত বুঝলে, এর কবল হতে মুক্ত হয়েছ, তখন ভাববে, চিরদিনের জন্য এ পরাভূত হয়ে রইল আর তার কথা মনেও স্থান দেবে না। এমনি ভাবে একটি একটি করে এই সব অসুরের মাথা ছেঁচে দাও—এদের স্বরূপ কীর্ত্তন করে নিজের কাছে বক্তৃতা কর। সবাইকে নিজের কাজ নিজে করে নিতে হবে। ভাবনার সময় প্রণব জপ করবে, সে স্বর্গীয় ঝঙ্কারে তোমাতে শক্তি সঞ্চার হবে। এতে ভারি আরাম পাবে, আর ধ্যানভঙ্গে মনে একটা আনন্দময় শক্তির স্ফুরণ অনুভব করবে, নিজকে শক্তিশালী বলে মনে হবে। এই হচ্ছে প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

সমস্ত আপদের মূল হচ্ছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। আত্মাকে না জেনে দেহের সঙ্গে আমরা নিজকে মিশিয়ে ফেলি, বহির্জগতের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে যাই, আর তাইতে শোক আর ক্ষতি আমাদের ঘিরে ধরে। যখন অনুভব করছ, তুমি অপরিমেয় আত্মস্বরূপ, তখন কোথায় থাকে শোক, কোথায় বা প্রবৃত্তির তাড়না ? লোকে বলে অঙ্কশাস্ত্রের আইনের

মত নীতির আইন অপরিবর্ত্তনীয় নয়। এটা ভুল। গভীর অরণ্যের মাঝে গিয়েও দেখবে, সদ্য অঙ্কুরিত শষ্পদল তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিদান-কথা যারা জানে না, তারা এটা-সেটার সঙ্গে যুঝে মরে। এই হচ্ছে এক দিব্য নিয়ম, যাকে অলঙ্ঘ্য বলে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রচার করতে পারি। ভগবানের চোখে ধূলা দিতে গেলে নিজেই কাণা হবে। অপবিত্র ভাবকে মনে স্থান দিলে তার ফল ভুগতেই হবে। এসব আইন জীবনে একে একে প্রমাণিত হবে, আর প্রমাণিত হলে পর মলিন বাসনা আর মানুষকে উদ্‌বাস্ত করতে পারবে না।

অশুচি কামনাগুলিকে যদি একবার দাবিয়ে দিতে পার তো যতদিন খুসী চিত্তকে একাগ্র রাখতে পারবে।

উপবাসে শুকিয়েও মরো না, আবার পেট ঠেসেও খেয়োনা; দুটোই এড়িয়ে চলতে হবে। অনেক সময় স্বভাবতঃই ইচ্ছা করে উপবাস করতে। স্বভাবকে অনুসরণ করবে। দাসত্ব করবে না কারুর। প্রভু বনো।

ওদেশে বিশেষ বিশেষ তিথি—যেমন পূর্ণিমা ইত্যাদি ধ্যান-ধারণার অনুকূল বলে ধরা হয়। পরীক্ষা করে দেখো, বাস্তবিকই সেদিন ধ্যান-ধারণা জমেবে ভাল, বিশেষতঃ সেদিন যদি ফল-মূল বা রুটী খেয়ে থাক। ওম্—ওম্—ওম্!

ভাগবত-ধর্ম্মের ছক

ঋষিরা সূতকে বলিলেন, ভাগে ভাগে শুনিবারও অনেক আছে, করিবারও অনেক আছে। ইহার মাঝে যাহা সার, তাহা তোমার মনীষার বলে ছাঁকিয়া লইয়া আমাদের বুঝাইয়া দাও—যাহাতে জীবের মঙ্গল হয়, সকলের আত্মা প্রসন্ন হয়।

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সূত ভাগবতধর্ম্মের একটী সংক্ষিপ্ত ছক আঁকিয়া দেখাইলেন; সে ছকের মাঝে বিভিন্ন অধিকারীর অনুকূল সব রকম আদর্শই রহিয়াছে, ভাগবতধর্ম্মের সার্ব্বভৌম স্বরূপটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। সূত যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার নিষ্কর্ষ এই—

মানবের আত্মা যাহাতে প্রসন্ন হয়, চরম তৃপ্তি লাভ করে, সে বস্তুটী কি?—সে বস্তুটী অধোক্ষজের প্রতি অহেতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি। অধোক্ষজ কাহাকে বলিব? অক্ষ অর্থে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে ব্যাপারিত করিয়া যেমন পাই প্রত্যক্ষ, তেমনি তাহাকে নির্জ্জিত করিয়া, দাবিয়া রাখিয়া পাই অধোক্ষ। ইহা চিত্তের আন্দোলনহীন অবস্থা; ইহার নামান্তর শান্তরতি। আমি প্রশান্ত হইয়া গেলে পর আমার দৃষ্টির সম্মুখেই চিৎশক্তির এক অনুপম বিলাস স্ফুরিত হইয়া উঠে। শান্তরতি হইতে সঞ্জাত এই চিদ্বিলাসই অধোক্ষজ। এই অধোক্ষজের প্রতি প্রাণের যে সহজ (অহেতুকী) এবং অটুট (অপ্রতিহত) টান, তাহাই ভক্তি; তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম, তাহাই তাহার আত্মার বিশ্রাম, সম্প্রসাদ এবং বিলাস। ভাগবতধর্ম্মের লক্ষ্য এই দিব্য ভূমি; ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার।

মানবাত্মার সম্মুখে আরও দুইটী আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে। একটী উপনিষৎপ্রোক্ত **অহৈতুক** জ্ঞান, আর একটী সাংখ্যপ্রোক্ত **অহৈতুক**

বৈরাগ্য বা গুণবিতৃষ্ণারূপ পরবৈরাগ্য। অহৈতুক ভক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয় কি করিয়া?

ভক্তিযোগ বা ভক্তির সাধনায় এই দুইটী আদর্শ বাস্তবিক বাদ পড়ে না। প্রাণের টানে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে।

এই তিনটী আদর্শই তাহা হইলে মানবজীবনের চরম এবং পরম রহস্য। ইহাদিগকেই আমরা একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতে পারি। মূলে কিন্তু ইহারা এক। যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা বলেন, এই তিনটী আদর্শের যে অদ্বয়জ্ঞান, তাহাই বস্তু-তত্ত্ব। তিনটীকে জড়াইয়া একটী করিয়া জানিতে যদি বা সকলে না ও পারে, তথাপি ইহার এক একটী বিভাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াও মানুষ পরমপুরুষার্থ লাভ কারতে পারে। এই বিভাবকেই কেহ বলে ব্রহ্ম, কেহ বলে আত্মা, কেহ বলে ভগবান। স্বরূপ বিচার করিলে বলিতে পারি, অদ্বয় তত্ত্ববিদের বা গুরুর আত্মস্বরূপ যে সচ্চিদানন্দ, গুণলীলার ভিতর দিয়া তাঁহাকেই দেখি **সচ্চিদানন্দময়** ব্রহ্মরূপে, **সচ্চিদানন্দঘন** পরমাত্মারূপে, আবার **সচ্চিদানন্দ—ঘনবিগ্রহ** ভগবান্‌-রূপে। সিদ্ধদশায় তিনটীরই স্ফূরণ অহেতুক। জ্ঞানীর জ্ঞান, যোগীর বৈরাগ্য ও ভক্তের ভক্তির সাধনা যথাক্রমে এই তিনটীকেই পাওয়াইয়া দেয়। মূলে এক বলিয়া এই তিনটীর যে কোনও একটীকে ধরিলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে আর দুইটীর আভাসও ফুটিয়া উঠে।

ভাগবত বিশেষ করিয়া ভক্তির কথাই বলিতেছেন। ভক্তিতে—প্রেমে আত্মার চরম স্ফূর্ত্তি, পরম রসায়ন, সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য। সাক্ষিভাব বা গুরুভাব তো ভূমিকারূপে সর্ব্বত্রই রহিয়া গেল; সুতরাং জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ হইবারও আশঙ্কা থাকিল না।

এই তো আদর্শ। এখন এই আদর্শ পাইব কি করিয়া? পাইতে হইলে খাটিতে হইবে, গোড়া হইতে জীবনটাকে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। তার জন্য সাধনারও একটা ছক্ চাই।

খুব নীচের অধিকারী হইতেই ধরি। তুমি কর্ম্মবাদী, কর্ম্ম ছাড়া আর কিছু বোঝ না। "পরম ধর্ম্ম" তোমার কাছে একটা ফাঁকা বুলি; তুমি জান "সু-অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম"; নীতির অনুশাসন মানিয়া বেশ গুছাইয়া-বাগাইয়া সংসারের কাজ করিয়া যাইতে ভালবাস। বেশ কথা; তোমার "স্বনুষ্ঠিত ধর্ম্মের" পথে আমি কাঁটা দিতে চাই না। কিন্তু আমার এই কথাটী স্মরণ রাখিও—তোমার এই স্বনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সার্থকতা হইতেছে হরিতোষণে; ইহার ফলে যদি তাঁহার প্রতি তোমার ভালবাসা না জন্মে তো সংসারে ভূতের বেগার খাটিতেছ মাত্র।

হয়ত কথাটার দিশা পাইলে না। আচ্ছা, আরও একটু বুঝাইয়া বলি।

বলি কি, গুছাইয়া-বাগাইয়া সংসারের কর্ম্ম করিয়া যাওয়াটাই সব কিছু নয়। কাজ কর—ক্ষতি নাই, কিন্তু চাই একটু খানি প্রেম—কাহাকেও খুসী করিবার আকাঙ্ক্ষা। খুসীর ডাকে তুমিও সাড়া দাও বটে, কিন্তু সে খুসী হরির প্রীতি নয়, তোমার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ। এইখানেই তো গলদ।

জীবনের ছকটা তুমি আঁকিয়াছ এই ভাবে।—ধর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ সদ্ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসাধনা দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিব; অর্থ দ্বারা কাম ভোগ করিব; কামভোগের ফলে আমার ইন্দ্রিয় আপ্যায়িত হইবে; ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন হইলে স্বভাবতঃই আবার কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িবার মত ধর্ম্মবল লাভ করিব। তাহার ফলে আবার অর্থসঞ্চয়, আবার কামোপভোগ, আবার ইন্দ্রিয়প্রীতি, আবার ধর্ম্মবল লাভ। এমনি করিয়া জীবনের চাকা ঘুরিতে থাকিবে।

তোমার আদর্শ তাহা হইলে ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—ইন্দ্রিয়প্রীতি (মোক্ষ নয় বা হরিতোষণ নয়), এই পরম্পরা ক্রমে চলিয়া যাওয়া। প্রবৃত্তিপথের সুষ্ঠু

আদর্শই বটে; অহেতুক বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ যে পর্য্যন্ত চিত্তে না লাগিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাকে ইহার বিপরীত আদর্শটা বোঝানো বড় শক্ত।

কিন্তু আমি আর একটা কথা বলিতেছি। জীবনের আরও একটা দিক আছে। এই প্রবৃত্তির দিকটা যেমন সত্য, সেদিকটাও তেমনি সত্য। ধর্ম্মদ্বারা যথেচ্ছ অর্থসঞ্চয় বা যথেচ্ছ কামভোগ সব সময় ভাল লাগে না। কখনো মনে হয়, অর্থ আর কাম চাই বটে; কিন্তু এতটা নয়। "লাভো জীবেত যাবতা"—বাঁচিয়া থাকিবার দরুণ ও-দুটীর যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সঞ্চয় করাই লাভ; বেশী হইলেই তাহা জঞ্জাল। অর্থ-কাম পাইতেছি না বলিয়া নয়, বা কাহারও চোখরাঙানীতে নয়, বাস্তবিকই স্তূপীকৃত অর্থ-কামের উপর বসিয়াও এই কথাটা যেন বুকের মাঝে আঁচড়াইতে থাকে। আত্মেন্দ্রিয়ের তর্পণ আর ভাল লাগে না, আত্ম-সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; সাধ হয় পরকে সুখী করিতে, আমি ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসিতে।

এই মানুষটীই বুঝিতে পারে, ধর্ম্মের লক্ষ্য হইতেছে অপবর্গ বা মোক্ষ। ছুটী চাই, আপনার হাত হইতে আপনি বাঁচিতে চাই। আপনার কবল হইতে মুক্তিই তো যথার্থ মুক্তি; আমার গণ্ডী ছাড়াইয়া আর কাহারও বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাই; নিজের সৃষ্ট বন্ধন এড়াইয়া আর কাহারও মধুর বাঁধনে বাঁধা পড়িতে চাই।

এই হইল নিবৃত্তি-পথ; কালার বাঁশী এই পথেই সকলকে ডাকিতেছে। মনের মাঝে এই কথাটা পুষিয়া রাখিয়াই বলিতেছিলাম, সংসারে খাটীয়া মর, আপত্তি নাই, কিন্তু একটুখানি মোড় ঘুরাইয়া রাখিও। দিনান্তেও একটীবার মনে করিও, আমার খুসীর জন্য এই খাটুনী নয়, এ আর কাহারও খুসীর দরুণ। নতুবা ধর্মকর্ম্ম সব পণ্ড-শ্রম হইবে মাত্র।

কেবল গাধার মত খাটিয়া যাইও না। এই জগৎটাকে একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিও। "জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা, নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ" —কেবল কাজ করিয়া যা কিছু পাও, তাই সব নয়; আসল প্রয়োজন তত্ত্ব জানিবার দরুণ আকুলতা—একটু তলাইয়া বোঝা।

নিতান্ত কর্ম্মাসক্ত মূঢ়ের প্রতি ভাগবতের এই স্নিগ্ধ মধুর উপদেশ।

তারপর জন্মান্তরের সুকৃতিবশতঃ যাহাদের মনটা নিবৃত্তির দিকে একটু ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সাধনপদ্ধতির কথা বলিতে হইবে।

বাহ্য সাধনা, আন্তর সাধনা দুইই চাই। আন্তর-সাধনার কথা আগেই বলি।

যদি অধোক্ষজে ভক্তি চাও, তাহা হইলে মুনি-ব্রত হও, সংযমী হও। শ্রদ্ধাপূরিত হৃদয়ে সাধু-শাস্ত্রের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ কর। ইহাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবে, নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিবে। তখনই আপনার মাঝে অন্তরাত্মা-রূপে তাঁহার দর্শন পাইবে।

তাহা হইলে, সংযম, শ্রদ্ধা, শ্রবণ-মনন, বৈরাগ্য ও জ্ঞান—ইহারাই ভক্তির উন্মেষক। ইহাই ভক্তির আন্তর সাধনা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জোগানও চাই। শ্রবণ-কীর্ত্তন, পূজা, ধ্যান—এইগুলি তাহার সহায়ক। আরও দুইটী বাহ্য-আলম্বন আছে। একটী তীর্থসেবা, আর একটি মহৎসেবা। তীর্থে মহতের শক্তি পুঞ্জীকৃত থাকে, তাহার প্রভাবে অলক্ষ্যে চিত্তের গতি ফিরিয়া যায়। আর মহতের সেবার তো কথাই নাই। তাঁহাদের কাছেই তো চাবী; তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারলে ভাণ্ডারের দ্বার সহজে খুলিয়া যাইতে পারে।

মোটামুটী এই হইল সাধনার কথা। এই সাধনা কি করিয়া স্তরে স্তরে সার্থক হইয়া উঠিবে,

তাহার একটা দিশা পাইলে সাধকের উৎসাহ বাড়ে। ভাগবত তাহারও একটু আভাস দিয়াছেন।

ভাগবত বলেন, শ্রীহরিকথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা হৃদয়ের কামনা-বাসনারূপী যে অকল্যাণ, তাহা দূর হইয়া যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধ চিত্ত লইয়া যদি মহতের সেবা করা যায়, তাহা হইলে সহজেই ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়।

সত্ত্ব, রজ আর তমঃ, এই তিন গুণে জগৎ-সংসার ছাইয়া রহিয়াছে। আমাদের চিত্তও এই তিন গুণের লীলাভূমি। আমাদের লক্ষ্য—চিত্ত হইতে রজোগুণ ও তমোগুণের বিকার মুছিয়া ফেলিয়া চিত্তকে সত্ত্বগুণে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিয়া তুলা। কিন্তু কখন আমাদের চিত্তে কোন্ গুণের প্রাদুর্ভাব, তাহা বুঝিব কি করিয়া ?

গীতাতে ভগবান্ এই বিষয়টী বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। চিত্তে যখন রজো-গুণের প্রাবল্য, তখন মানুষের মাঝে একটা ছট্‌-ফটি জাগে, "এটা চাই—ওটা চাই" মনে হয়, লোভ ও ভোগপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, কর্ম্মে মানুষ উদ্দাম হইয়া উঠে। তমোভাব প্রবল হইলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পাইয়া যায়, সে কিছুই করিতে চায় না, একটা করিতে যেন আর একটা করে ফেলে, নতুবা জড় হইয়া বসিয়া থাকে, আলস্য আর ঘুম অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

এই যে চিত্তের চঞ্চলতা আর জড়তা, এই দুইটাই বর্জ্জন করিতেহ হবে। সমগ্রদৃষ্টি নিয়া বলিতে গেলে বলা যায়, ইউরোপীয় চিত্তে রজোগুণের প্রাবল্য, আর বর্ত্তমানে আমাদের মাঝে তমো-গুণের আধিপত্য। দুইটাই সত্যলাভের পরিপন্থী। আমাদের প্রতিষ্ঠিত হইতে হবেই শুদ্ধসত্ত্বে।

মানুষের যখন দেহটা লঘু বলিয়া বোধ হয়, মন স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ থাকে, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়, প্রতিভাও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, সংযম-শক্তির স্ফুরণ হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার মাঝে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া সুরু হইয়াছে। এই সত্ত্বে প্রতি-ষ্ঠিত থাকিয়া মানুষ রজঃ আর তমঃকে শাসনে রাখে। রজোবৃত্তি তখন ফুটিয়া উঠে আত্মোৎসর্গ-মূলক সুচিন্তিত কর্ম্মে ; আর তমঃ জড়ত্বে বিক-শিত না হইয়া চিত্ত-সুখকর বিশ্রামে রূপান্তরিত হয়।

এই সত্ত্বমই জীবন হতেই ভাগবতজীবনের আরম্ভ। ভগবদ্ভক্তিতে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বময় হয়, প্রসন্ন হয় ; সেই প্রসন্ন চিত্তেই ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান ফুটিয়া উঠে।

শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি সমস্ত সাধনারই উদ্দেশ্য চিত্তকে একমুখী করা। চিত্ত একমুখী হইলে ছট্‌ফটানি ছুটিয়া যায়, রজোগুণ দূর হয়। আবার একমুখী চিত্তের শক্তিও হয় অসীম ; শক্তিশালী চিত্তে জড়ত্বও আসিতে পারে না ; সুতরাং তাহাতে তমোভাবও দূর হইয়া যায়। বাহ্য ও আন্তর সাধনায় এইরূপে নিজকে অচঞ্চল অথচ শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

ইহার ফলে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের স্ফুরণ। তাহার ফলে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টে এবাত্মনীশ্বরে ॥

—হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ দেহ আর আত্মাকে একত্র জড়াইয়া নিয়া যে অহ-ঙ্কারের বন্ধন, তাহা ছিঁড়িয়া যায়, মানুষ অনুভব করে, সে এই পর্য্যুষিত মৃণ্ময় তনু নয়, সে চিন্ময় বিগ্রহ ; তাহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, বাসনানির্ম্মুক্ত স্বচ্ছ হৃদয়ে যাহা কিছু প্রতিফলিত হয়, তাহাই অনির্ব্বাণ দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে ; আর তাহার সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়, এ জগতে কত কিছু করিয়াও সে থাকে নির্লিপ্ত অকর্ত্তা।

কিন্তু কথা হইতেছে কি, সবাই তো আর

আদর্শের চরম শিখরে উন্নীত হইতে পারে না, কেননা সকলের ধারণাশক্তি তো এক নয়। ওই যে তিনটী গুণের কথা বলিয়াছি, তাহারাই মানুষকে বিভিন্ন স্তরে বাঁধিয়া রাখে। গুণভেদে দৃষ্টিভেদ, অধিকারি ভেদ হইবেই। ভাগবতও তাহা স্বীকার করেন।

ভাগবত বলিতেছেন, ধর একটা কাঠ; আগুন ধরাইয়া দিলে ইহার সবখানিই আগুন হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু আগুনের ছোঁয়াচ যতক্ষণ না পাইতেছে, ততক্ষণ উহা মাটির মতই ঠাণ্ডা। তারপর আগুন ধরাইয়া দিলে প্রথমতঃ উহা হইতে বাহির হইবে ধোঁয়া। তারপর ধোঁয়া ফুটিয়া বাহির হইবে আগুন। মানুষের মনও তেমনি কাঠের মত হিম-স্তব্ধ হইয়া থাকিতে পারে। ইহাই তামসিক লোকের মন। ঘোর-রূপ ভূত-প্রেতাদি ইহাদের উপাস্য। আবার এক শ্রেণীর লোকের মনে একটু জ্ঞানের আঁচ পাওয়া যায়, যদিও ধোঁয়ার মতই তাহাদের চিত্তও চঞ্চল। ইহারা রাজসপ্রকৃতির লোক; কামনা সিদ্ধির দরুণ ইহারা পিতৃগণ, প্রজাপতি প্রভৃতির উপাসনা করে। আর জ্ঞানের আগুনে যাঁহাদের চিত্ত আগা-গোড়া দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারাই সাত্ত্বিক প্রকৃতির; তাঁহারা মুমুক্ষু, নারায়ণের প্রশান্ত বিভূতির উপাসনা করেন।

ইহাঁদেরই ক্রমে ব্রহ্মদর্শনে অধিকার জন্মে। সে দর্শনে চরাচর সর্ব্বত্র বাসুদেবের স্ফূর্ত্তি হয়। প্রেমকারুণ্যবিগলিত কণ্ঠে তাঁহারা বলেন—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মঃ বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

বেদ, যজ্ঞ, তপঃ, ক্রিয়া, জ্ঞান, যোগ, ধর্ম্ম, গতি—সকলেরই চরমে যে আমার বাসুদেব!

ইহাই চরম অনুভব—ইহাই অদ্বয় জ্ঞান।

সংসারস্রোতকে উজাইয়া এই জ্ঞানের মূলপ্রস্র-বণে গিয়া পৌঁছাইতে হইবে। তারপর সেই নিত্যধামে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লীলাবঙ্কিম দৃষ্টিতে এই জগতের-দিকে তাকাইতে হইবে। তখন দেখিবে, তাঁহা হইতেই এ নিখিল উৎসারিত। কেমন করিয়া, তাহাও ভাগবত বিবরিয়া বলিতেছেন—

ভগবান এই প্রপঞ্চ হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়াও অনির্ব্বচনীয় গুণময়ী মায়ার সহায়ে এই জগত সৃষ্টি করিলেন। যেমনি জগতের বস্তুচয়ে গুণের ক্রিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তেমনি তিনিও গুণবানের অভিমান লইয়া তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার অধিষ্ঠান হেতু সর্ব্বত্র যথাযোগ্যরূপে চিৎশক্তিরও স্ফুরণ হইতে লাগিল। ইহাই তাঁহার লীলা; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত না হইয়াও আত্মপ্রভাবে তিনি সকলের মাঝে ফুটাইয়া তুলিলেন আত্মস্বরূপেরই একটা প্রতিচ্ছবি। এইরূপে এক হইয়াও আধার-ভেদে তিনি বহু হইলেন। তারপর গুণময় ভাবদ্বারা সৃষ্ট জীবে জীবে ভোক্তারূপে তিনিই আবার সে গুণ-লীলা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই তাঁহার প্রাকৃত লীলা। এমনি করিয়া দেবতায়, মানুষে, তির্য্যক-প্রাণীতে, সর্ব্বত্র লীলায় অবতীর্ণ হইয়া তিনিই এই জগৎকে ভাবিত ও আপ্যায়িত করিয়া রহিয়াছেন।

জগদ্ব্যাপারে এই লীলাদৃষ্টিই ভাগবতধর্ম্মের সুনিশ্চিত সাধ্যাবধি।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ, ঋষিপ্রশ্নের উত্তরে সূত যে ভাগবতধর্ম্মের ছক আঁকিয়া দেখাইলেন, তাহা কত মহান্, কত উদার। এই ধর্ম্মে সকলের ঠাঁই হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক বিরোধের কর্কশ ধ্বনি এই রম্য ভূমির শান্তিভঙ্গ করিতে পারে নাই।

কিন্তু মানুষ সে কথা বুঝিতে চাহে কই?

অনন্ত গতি

——):*:(——

অনেকে বলে থাকেন, অনন্ত উন্নতির কথাটা আমরা ইউরোপ থেকে ধার করেছি। ইউরোপের অক্লান্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, তার অদম্য অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি খুবই প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তা বলে কেবলই এগিয়ে চলার বাণীটা আমরা তাদের কাছ থেকেই পেয়েছি—এ বললে যেন মনে হয়, আমরা এখনও নিজেদের জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে, আর্য্যঋষিদের চিন্তার ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোন জ্ঞানী মহাপুরুষই এ কথা বলেন না, "আমি যা জেনেছি তাই চরম, জগতে আর জান্‌বার-শুন্‌বার কিছুই নাই।" সাময়িক আত্মতৃপ্তি আস্‌তে পারে বটে আর জগতে দেখছিও তাই ; কেউ বা দার্শনিক চিন্তায়, কেউ বা বৈজ্ঞানিক সমস্যায়, কেউ বা সাহিত্যচর্চায়—এমনি করে যার যেদিকে রুচি, তিনি সেইদিককার চিন্তা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন। কেউ তো কারো উন্নতির পথে বাধাও দিচ্ছেন না, আর অমন কথাও বলছেন না, "এস, তোমাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়ে আমার মতের সঙ্গে মত মিশিয়ে একাকার হয়ে যাও, কেননা আমি যে পথের সন্ধান পেয়েছি এ ছাড়া তো দুনিয়ায় দ্বিতীয় পন্থা নেই।" আধ্যাত্মিকতা নিয়েই হোক্ কিম্বা যে কোন বিষয়েই হোক্, গোড়া থেকেই একচোখা নজর নিয়ে যিনি প্রচারে বেরিয়েছেন,—বাইরের আঘাত এসে তাঁকেই আহত করেছে বেশী। পরমত-সহিষ্ণুতা আর্য্যদের একটা বিশেষ গুণ। কত মত কত পথের সৃষ্টি হয়েছে, বাইরের বিরুদ্ধতা বারবার তুমুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তবুও অন্তরের অপরিমেয় শক্তি বলে এত বিক্ষোভও ঘটবার সুযোগ দিয়েও তাঁরা ছিলেন আপন সঙ্কল্পে অটল। তাঁরা কাউকে প্রত্যাখ্যান করেননি, বরঞ্চ সাধনায় তাঁদের বিশেষ শক্তি সঞ্চিত হয়েছিল বলেই তাঁদের অফুরন্ত সত্যের সঞ্চয় অসংখ্য ছোট ছোট সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে। সত্যকে যারা বিভিন্ন সাধনার ভিতর দিয়ে পেতে চায়, তারা অনন্ত উন্নতির পরম্পরা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, এ কথা বললে অদ্ভুত শুনায় নাকি? এ কথা বলা যেতে পারে, আজ আমরা ভাবের বন্যায় গা ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলেছি ও কর্ম্মতৎপরতার চেয়ে কর্ম্মবিমুখীনতাই আমাদের ধাত হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু আমরা যদি ভাল হতে চাই, তবে তার আদর্শটাও অপরের কাছ থেকে ধার করে আনতে হবে, এ কেমন কথা? কেন, ভারতের প্রাচীন সাধনা কি জড়ত্বের সাধনা ছিল?

ইউরোপের স্যার আইজাক নিউটন যেমন একদিন বলেছিলেন, "জ্ঞানসমুদ্রের অতল তলে কত রত্নই না পড়ে আছে, আমি মাত্র সমুদ্রতীরের উপলখণ্ড সংগ্রহ কর্‌ছি", তেমনি ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিও একদিন এই বাণী প্রচার করেছিলেন—

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।

—তুমি যদি মনে কর, আমি ব্রহ্মের স্বরূপ ভালরকমই জেনেছি, তাহলে নিশ্চয় জেনো সে রূপটা নিতান্তই অল্প। ব্রহ্মকে যে জেনে শেষ করা যায় না, আমাদের বুদ্ধিই যে সেখান থেকে বিপর্য্যস্ত হয়ে ফিরে আসে, অনেক স্থলেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যদি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ হলেন, তা হলে অনন্ত উন্নতির পথটি বন্ধ হল কেমন করে? আর মানব চিত্তেরও তো একটা ক্রম-বিকাশ রয়েছে। ওপরের শ্লোকের শেষ ছত্রে আছে, মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্।—ব্রহ্মের স্বরূপ মীমাংস্য অর্থাৎ কিনা বিচার এবং তর্ক

দিয়ে তাঁকে বুঝতে হয়। এ মীমাংসারও কোন দিন শেষ হয় না, আর ব্রহ্মকে জানারও কোন দিন ইতি হয় না। সীমার মাঝেই তিনি অসীম; আমার আত্মতৃপ্তিকে অতিক্রম করেও ব্রহ্মের সত্তা জাজ্জ্বল্যমান। কাজেই সাধকের প্রাণে একটা অফুরন্ত আবেগের ধারা ত চিরকালই বইতে থাকবে। আস্বাদন করার কত বিভিন্ন পথই না রয়েছে। যিনি ব্রহ্মকে নিজের উপলব্ধিতে পেয়েছেন, তিনিও এসে বল্‌ছেন, "কই আমি আর কতটুকু জানতে পেরেছি? তাঁর রূপের যে অন্ত নেই।" এ শুধু অভিমান খর্ব্ব করার দরুণ সাধক-প্রাণের কল্পিত দীনতার পরিচয় নয়—সত্যি সত্যি তাঁকে জেনে তো শেষ করা যায় না। তাঁকে পেয়েও শ্রীরাধার মতই বলতে হয়—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল॥

এত কাছে পেয়ে, নিশি দিন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখে, তবু যে আকুলতার হ্রাস হয় না, এর মাঝে কি কোন অনির্ব্বচনীয় রহস্য নেই? এই হৃদয়-বিথারী বিরহ-বেদনার মাঝে, পলে পলে তাঁরই অনন্ত ভাবের দ্যোতনা কি আমাদের চিত্তে প্রদ্যোতিত হয়ে উঠ্‌ছে না? প্রাণের জ্বালা দিয়েই তো বুঝি, ব্রহ্মকে জেনে শেষ করা যায় না। আসে কেবল সাময়িক তৃপ্তি; তারপর মুহূর্ত্ত না যেতেই আবার বেদনা, আবার জানার আকুলতা। বারবার দেখেছি, যেখানেই জড়ত্ব এবং সঙ্কীর্ণতা এসে পড়েছে, সেখানেই একটা বিরুদ্ধ শক্তি এসে মাথা ঝাঁড়া দিয়ে উঠেছে। জগতে বিপ্লবের সূচনাও তো সঙ্কীর্ণ মতামত নিয়েই। যখনি যে মতের প্রাবল্যে সত্যের মহিমা খর্ব্ব হতে চলেছে, তখনই বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে, নূতন সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছে। এমনি করে কত মহাপ্রাণকে যে মিথ্যা সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গদেব এঁরাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সত্য যেমন সত্য, তেমনি সত্যের বিকাশও তো সত্য। আত্মজীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি, এ যেমন একদিকার সত্য, তেমনি জীবে জীবে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা—এও তো সত্য। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, যুগপৎ আমি সাধক এবং সিদ্ধ। আত্মসাক্ষাৎকারের পরেও যে জীবহিতের জন্য মহাপুরুষদের আপ্রাণ চেষ্টা, একি আত্মার ব্যাপ্তির নিদর্শন নয়? সব মন্দের মাঝে একলা আমি যদি ভাল হয়ে যাই, ভালোতে তো আমি শান্তি পাব না। আর বাস্তবিক এইখান থেকেই আমাদের ব্যাপ্তিবোধ জেগে উঠে, আমার ব্যষ্টিজীবনের সাধনা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সমষ্টির জন্য প্রাণ কাঁদ্‌তে আরম্ভ করে। তাহলেই দেখতে পাচ্ছি, সাধকের চেয়ে সিদ্ধের কর্ম্মই বেশী। স্থির হয়ে বসেও তিনি জগতের দরুণ আকুল।

ভারতীয় শিক্ষার মূলে রয়েছে আত্মসমর্পণের কথা। অহংসত্তাকে মানুষ যখন বিসর্জ্জন দেয়, তখন বিশ্ব-সত্তাই তার ভিতর জেগে উঠে। যে সব ঋষির স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাই, তাঁরাও একদিন ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এ আত্মসমর্পণে তাঁদের Strong critical faculty দিন দিন বর্দ্ধিতই হয়েছিল। ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ যদি হয়, তাহলে যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার প্রেরণা আমার জীবনেও ফুটে উঠবে, তিনি যে-সব সমস্যার ভিতর দিয়ে সত্যে উপনীত হয়েছেন, আমাকেও সে সব ফাঁপরে পড়তে হবে। বাইরে থেকে কেউ আমাকে ব্রহ্মের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন এ নয়, আমি আমার দৈনন্দিন সাধন

দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে-বিশুদ্ধ করে আমার শক্তিতেই ব্রহ্মকে অনুভূতির মাঝে পাব—এই হল খাঁটী আত্ম-নিবেদন যিনি করেছেন তাঁর প্রাণের কথা। ব্রহ্ম যদি বলে থাকেন, তোমাদের সাধন-ভজনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, আমি যাকে বরণ করে নেব, সে-ই আমাকে পাবে, তাহলে মানুষের মাঝে এত বড় অদম্য সাধনস্পৃহার কি কোন তাৎপর্য্য নেই? সাধনায় বসলে যেমন নানা বিভীষিকা এবং প্রলোভন এসে মনকে টলাতে চায়, আমি ত মনে করি, ব্রহ্মের ও কথাও আমাদের পরীক্ষা স্বরূপ; আমাদের চিত্তের দুর্ব্বলতা-সবলতার নিরিখ হবে ওই কথাতে।

জাতির মাঝে যখন ভাবুকতার দিকটা খুব প্রবল হয়ে উঠল, তখই অল্পেতে তুষ্টি এবং শ্রান্তি এসে পড়ল। কথায় বলে, মোল্লায় দৌড় মস্‌জিদ্ পর্য্যন্ত। আমাদেরও এই দুর্ব্বল ধাতে কিছুদূর যেতে না যেতেই সমাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর এমনি করে সাধকাবস্থাতেই আমরা সিদ্ধ বনে যাই। এইখানেই আমাদের সর্ব্বনাশের সুরু।—কিন্তু ঋষিদের সাধনার মাঝে দেখি অফুরন্ত প্রাণশক্তিরই পরিচয়। তাঁরা ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন আত্মশক্তিরই উদ্বোধন দ্বারা। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—এ তাঁদেরই বাণী।

এখন যেমন পাশ্চাত্য জাতির মাঝে তত্ত্বজিজ্ঞাসার আকুলতা দেখতে পাই, আমাদের ঋষি-যুগেও এই ভাবটা প্রবল ছিল, বিশ্বতোমুখী প্রতিভা ঋষিদের মাঝে কিছু কম ছিল না। ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে রীতিমত culture চল্‌ছিল তখন—কোথায় কোনও ঋষি হয়ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে নূতন interpretation দিচ্ছেন, অমনি ঋষি-সঙ্ঘে সাড়া পড়ে গেল—সবাই গিয়ে নূতন বার্ত্তা শুন্‌বার দরুণ সেই ঋষির কাছে হাজির। এমনি করে প্রাণতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব কত কিছুর আবিষ্কারই না হল ওই যুগে। এ সব দেখে শুনেও কি বল্‌ব—তাঁদের মাঝে অনন্ত উন্নতির পিপাসা ছিল না?

অনেকের চরম আদর্শ আনন্দ লাভ। কিন্তু উপনিষদ্ বল্‌ছেন, এই আনন্দময় কোষকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। এখানেই তো অগ্র্যা বুদ্ধির পরিচয় পাই। যাঁরা আনন্দের অভিঘাতকেও অবহেলা করে উর্দ্ধলোকে উঠে গিয়েছেন, তাঁদের মাঝে কি সুতীব্র প্রেরণা ছিল, সহজেই তো বুঝতে পারি। এই যে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষা, এতেই তো অনুমান কর্‌তে পারি, তাঁরা কেমন সচেষ্ট আবেগবান্ সাধক ছিলেন।

সমস্তকে পরিত্যাগ করে, এমন কি জগন্মূল অব্যক্ত প্রকৃতির সঙ্গে non-co-operation করে কেবল হয়ে থাকা কি সহজ কথা? এই নেতিমূলক সাধনার মাঝে একটা প্রচণ্ড পৌরুষ রয়েছে। প্রকৃতির অনন্ত আকর্ষণও যেমন রয়েছে, তেমনি সাংখ্যকার দেখালেন, এ অনন্ত আকর্ষণকেও পৌরুষের সাধনা দিয়ে অতিক্রম করা যায়। বাস্তবিক সাংখ্যকারই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার অভিনব পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তা। যাদের সহজেই তুষ্টি এসে পড়ে, তারা প্রকৃতির কবলেই পড়ে থাকে। সাংখ্যবাদীর জীবনের লক্ষ্য তো বিশেষ একটা অবস্থার মাঝে আবদ্ধ হয়ে থাকা নয়। এখানেও দেখি, সাধকের প্রাণে আছে একটা উর্দ্ধ-গতিরই প্রেরণা—জড়ত্ব নয়।

কোথাও এতটুকু প্রবঞ্চনা দেখতে পাই না ঋষিদের মাঝে—কি সরল অমায়িক উদার ভাব-ব্রহ্মবিদ্যা-বিতরণ শেষ হলে ঋষি বল্‌ছেন, আমি যা জেনেছিলাম তা বলেছি, ব্রহ্ম সম্বন্ধে হয়ত আরও অনেক নূতন কিছু জান্‌বার রয়েছে, অতএব যে পর্য্যন্ত আত্মতৃপ্তি না হয়, এমনি করে সাধন-ব্যাকুলতা নিয়ে সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। এ সব কথার মাঝে কি ভাব ফুটে উঠেছে?—অসীম ব্রহ্মকে জেনে শেষ করা যায় না। জ্ঞান-গরিমায় অন্ধ হয়ে

কেউ এ কথা বলেন নি, আমি যা জেনেছি তাই চরম; বরঞ্চ যেখানেই মিথ্যা অভিমান সঞ্জাত হয়েছে, সেখানেই মহাশক্তি এসে দর্প চূর্ণ করে দিয়ে গিয়েছেন। হৈমবতী উমার উপাখ্যানে দেখতে পাই, মহাশক্তি কি করে দেবতাদের জানার গর্ব্ব হরণ করেছিলেন। কাজেই উপনিষদ্ যে বল্‌ছেন—

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

—এ যুক্তিগুলি আধ্যাত্মিক জগতের dogmaই নয় শুধু। এর মাঝে গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে, জড়ত্ব-নাশক অনন্ত উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। বাস্তবিকই যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন, কেননা জানার দরুণ আকুলতা তো তাঁর কিছুতেই প্রশমিত হয় না; আর যিনি মনে করেন, ব্রহ্মকে জানি, তিনি তো তৌষ্টিক—হয়ত উপাধিজ্ঞানেই মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, প্রেরণার উৎস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অর্দ্ধ-পথে থেমে পড়ার কথা তো উপনিষদের মাঝে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মীরাবাঈ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাভাজী বলিয়াছিলেন—

সদিরস গোপিন প্রেম প্রগট কলিযুগহিঁ দিখায়ো।

—গোপীর প্রেম যে কি বস্তু, তাহা এই কলি-যুগে ব্যক্ত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন মীরা।

এই উক্তি শুনিয়া বাঙ্গালীর আর একজনের কথা মনে পড়িবে। যে মাধুর্য্য প্রপঞ্চাতীত, যাহার এতটুকু ছোঁয়াচ লাগিলে মুগ্ধ-তনু মরমে মিলাইয়া যায়, তুলাদণ্ডে তাহাকে তৌল করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবুও বলি, মীরার প্রেম যদি বা কলস্বনা নির্ঝরিণী, গৌরাঙ্গের প্রেম বুঝি অনন্ত-উদ্বেলিত মহাসাগর। অথচ উভয়েরই প্রেম "সদরিস গোপিন প্রেম।"

এই গোপী-প্রেম বস্তুটী কি? বহির্ব্যক্তি দেখিয়া মানুষ ইহার গুমান কি বুঝিবে? সংস্কৃত ভাগবত পড়, বাঙ্গালীর পদাবলী পড়, হিন্দুস্থানী সন্তদের শব্দাবলী পড়, Songs of Solomon পড়, স্থূলদৃষ্টিতে প্রাকৃত নর-নারীর কামলীলার কবিত্বপূর্ণ পরিচয় ছাড়া আর কি পাইবে? অথচ শুনিয়া আসিয়াছি, ইহার মাঝেই নাকি কি এক অপ্রাকৃত রস-ধারা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতেছে। স্বয়ং শ্রীধর রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা করিতে গিয়া গোড়াতেই বলিতেছেন, "শৃঙ্গারকথা-ব্যপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী"—এই পাঁচটী অধ্যায়ে যদিও ভোগাত্মক শৃঙ্গার-কথা রহিয়াছে, তবুও বিশেষ করিয়া ইহারা নিবৃত্তির দিকেই মানুষকে টানিয়া নিবে। কি করিয়া এই বিরোধের সামঞ্জস্য হয়? লীলাকথাকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া? রাধা আরাধিকা, জীবাত্মা—আর কৃষ্ণ আকর্ষক, পরমাত্মা ইত্যাদি ব্যাকরণ-বিভীষিকা দিয়া কি এই রহস্যের মীমাংসা হইবে? সূক্ষ্ম অর্থ, আধ্যাত্মিক অর্থ আছে স্বীকার করি; কিন্তু তাহাতেই তো সব ফুরাইয়া যায় না।

আবার স্থূল অর্থ গ্রহণ করার মাঝেও বিপদ আছে। গোপী-প্রেমের স্থূল অর্থ নিতে গিয়া, লীলার হুবহু নকল করিতে গিয়া আমাদের দেশে

ব্যভিচারের যে বিষম স্রোত বহিয়া গিয়াছে এবং আজও বহিতেছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। অথচ জ্ঞান-বিচারে এই আপাতলভ্য স্থূল অর্থকেও তো উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মীমাংসা কোথায় ?

একটা চল্‌তি কথা আছে, বেদান্তের ভাষ্য ভাগবত। কথাটা অতি নিগূঢ় অর্থের জ্ঞাপক, কিন্তু আমরা অনেক সময় সাম্প্রদায়িক গৌরব খ্যাপন উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকি। বেদান্তের ভাষ্য ভাগবত, এ কথা বলাও যা, জ্ঞানের তাৎপর্য্য প্রেম, এ কথা বলাও তা। সমগ্র উপনিষদে যে রস প্রচারিত হইয়াছে, তাহার দুইটী বিভাব —এক শান্তরতি, অপর সাক্ষিভাব। বলিতে পারি, গোপীপ্রেমের এই দুইটী অবধি ; শান্তরতির প্রতিষ্ঠায় তাহার স্ফুরণ, আর সাক্ষিভাবে তাহার পর্য্যবসান। এই দুইয়ের মাঝে প্রেমের বৃন্দাবন বা ভাবলোক। ঔপনিষদজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া তবে এই প্রেমের সাধনা সুরু হইবে ; শ্রুতির ভাষায় হৃদয়ের আশ্রিত সমস্ত কামবৃত্তি দূর হইয়া এই মর্ত্ত্য মানুষই যখন অমর্ত্ত্য হয়, তখন এইখানেই, এই স্থূলেই সে আস্বাদন করে সচ্চিদানন্দকে, সে হয় লীলারাসিক।

সাধারণতঃ আমরা বলি, যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ কাম ; কিন্তু কথাটা উল্টাইয়া বলিলে আরো সুন্দর হয়—যতক্ষণ কাম, ততক্ষণ দেহ। যাহার কাম ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহ না থাকারই কথা। কিন্তু কাম দূর হইয়াও যদি দেহ থাকে, তবে তাহাকে আর সাধারণ দেহ বলিব না, বলিব চিন্ময় দেহ। উপনিষদ ইহাকে বলেন, ধাতুপ্রসাদ ; ধাতুপ্রসাদ হইতে আত্মার মহিমজ্ঞান হয়। আত্মার মহিমজ্ঞানই শান্তরতি ; ইহার পরের ধাপেই ব্রজলীলার সুরু ; যিনি তাহার আস্বাদক, তিনি সাক্ষি-চেতা, জীবন্মুক্ত, রসিক। ভগবান্ যেমন করিয়া এই জগতের অণুপরমাণুতে উপচিত রস পান করিতেছেন—স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে, মহাকারণে—তেমনি করিয়া তিনি আস্বাদন করেন লীলাকে। স্থূল বাদ পড়ে না ; সূর্য্যকিরণে নিষ্প্রভ-মলিন মেঘখণ্ডও যেমন ঝলমল করিয়া উঠে, তেমনি এই স্থূলও মহাদ্যুতিমন্ত হইয়া উঠে। এমনি করিয়া আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত আস্বাদন করাই জীবনের পূর্ণতা।

এই স্তরে যিনি উঠিয়াছেন, তিনিই গোপী-প্রেমের বোদ্ধা। বাসনাহীন, নিস্তরঙ্গ চিত্ত চাই ; তবে লীলার আস্বাদনে এই স্থূল দেহকেই প্লাবিত করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নাড়ীচক্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া যায়—অলঙ্কার-ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় না, লীলাবাদের প্রত্যেকটি বর্ণ আমার চেতনায় সত্য জ্যোতির্ম্ময় হইয়া জ্বলিয়া উঠে।

প্রেমের কাহিনী যিনি পড়িবেন, এমনি করিয়া চিত্ত বাঁধিয়া পড়িবেন—নতুবা বঞ্চিত, এমন কি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এই ভূমিকা।

একদিন মীরা আসিয়া মাকে বলিয়াছিলেন, মাগো, স্বপ্নে যে আমার গিরিধারীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। মা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, পাগল আর কি! মীরা জেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, না গো মা সত্যই যে সে বরবেশে আসিয়াছিল ; আমাকে যে সে তাহার করিয়া নিয়াছে, আমার তনুর অণুপরমাণু সুধাসিক্ত করিয়া দিয়াছে, অচল সোহাগের ডুরীতে আমায় বাঁধিয়া গিয়াছে।

সকল সময়েই বলা চলে না যে "স্বপ্নসমূহ মনের অমূলক চিন্তা মাত্র।" আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ যে বলেন, স্বপ্ন দমিত কামনার প্রতিরূপ মাত্র, সে কথা লইয়াও তর্ক আছে। ছাইমাটী চাপা পড়িয়াও বীজ যেমন অনুকূল ঋতুর স্পর্শে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে অদূরভাবী

ভাব-পরিণামের ব্যক্ত চিত্র অব্যক্ত হইতে স্বপ্নের আকারে স্ফুরিত হইতে পারে। উহা Re-pression বা ইচ্ছার সংঘাত হেতু নয়, উহা Evolutionএরই অগ্রদূত।

তখনো শ্যামকে চোখে দেখেন নাই, তখনো তাঁহার—

চঞ্চল চরণ চিত, চঞ্চল ভান,
জাগল মনসিজ—মুদিত নয়ান,

এমন সময় একদিন সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—

মনের মরম-কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই,
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল-বরণ দে—
তাহা বিনু আর কারো নই!

যে রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিয়াছি, সে রাতটীও কি রহস্য-মধুর—

রজনী শাওন-ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে;
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে;
ঝিঁ‌জা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে।

সখি, স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়াছি—

মরমে পৈঠল সেহ; হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী;
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত—
ধিক্ রহু কুলের কামিনী!

* * *

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়ানের কোণে—
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে!

রাধিকার এই বিহ্বলতা মীরার কণ্ঠেও ধ্বনিয়া উঠিল—

সুপন মেঁ ম্হাঁনে পরণ গয়া জী,
হো গয়া অচল সুহাগ!

কিন্তু স্বপ্ন তো চিরকাল থাকে না; উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে মুগ্ধা বিরহিণী বলিয়া উঠে—

চমকি উঠিলুঁ জাগি, কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
—আকুল পরাণ মোর, দুনয়নে বহে লোর,
কহিলে কে যায় পরতীতি!

তারপর কত দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রজনী ধরিয়া—

রৈণ অঁধেরী বিরহ ঘেরী,
তারা গিণত নিস জাত!
লে কটারী কণ্ঠ চীরূঁ—করূঙ্গী অপঘাত।

—আঁধার রাত্রি, বিরহের ছায়া তাহাতে ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতীক্ষায় আকাশের তারা গুণিতে গুণিতেই যে মীরার রাত পোহাইয়া যায়!— এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, আমি কি করিব!— এই ছুরী দিয়া কণ্ঠ চিরিয়া আত্মঘাত করিয়া মরিব!

আমি কি জানিতাম, এমনি করিয়া সে আমায় ফাঁকি দিয়া পলাইবে?

সুপন মেঁ হরি দরস দীনহোঁ,
মৈঁ ন জাণ্যো হরি জাত;—
নৈন ম্হাঁরা উঘরি আয়া,
রহি মন পছতাত!

—স্বপনের মাঝে সে আসিয়া দেখা দিয়াছিল; আমি তো জানিতাম না যে সে চলিয়া যাইবে। কি করিয়া আমার চোখ দুটা খুলিয়া গেল, স্বপ্ন মিলাইয়া গেল, মনে শুধু রহিয়া গেল আকুলতা!

সেই হইতে আজ কত দিন ধরিয়া—

আৱণ আৱণ হোয় রহ্যো রে,
নহিঁ আৱণ কী বাত।

মীরা ব্যাকুল বিরহণী রে,
বাল জ্যোঁ বিল্লাত।

—তারপর সে আসিবে-আসিবে, এই আশাই চিত্তে জাগিয়া রহিয়াছে, কিন্তু কই এখনো তো সে আসিবার নামটীও করিল না!—নিষ্ঠুর, দেখিতেছ না তোমার ব্যাকুল বিরহিণী মীরা ছেলেমানুষের মত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে তোমারি তরে!

❋

অবশেষে একদিন স্বপ্ন সফল হইল; সাঁবরিয়ার সঙ্গে চারি চোখে মিলন হইল। মীরা বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

আলী, সাঁবরো কি দৃষ্টি—
মানো প্রেম কী কটারী হৈ!

—সখি, শ্যামের এ তো চোখের চাহনি নয়, এ যেন প্রেমের কাটারী!

অরুণ-নয়ানের কোনে চাঞাছিল আমা পানে
পরাণে বরশি দিয়া টানে!

তারপর হইতে—

না জানিয়া কোন দুখে দারুণ বেদন—
ঝরঝর এ দুই নয়ানে!

কিন্তু এই দারুণ বেদনা পাইয়াও যে তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না।—

জব সে মোহিঁ নন্দনঁদন দৃষ্টি পড়্যো মাঈ,
তব সে পরলোক লোক কছূ না সোহাই।

যে মুহূর্ত্ত হইতে তাহার দুটী চোখ আমার আমার উপর পড়িয়াছে, সেই হইতে যে আমি আঁখির ভাষায় তাহার মনের ভাব বুঝিয়াছি। ইহার পর হইতে আমি যে ইহকালে পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়া আছি।

সে যে—

মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই,
বিগলিত মোহন বংশ;
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল—
কিশলয় দলে করে দংশ!
অতয়ে সে মঝু মন জলতহি অনুখন,
দোলত চপল পরাণ।

এই যে একবার আমার চোখে চোখে হাসিয়া অঙ্গ মোড়া দিয়া নবপল্লবে দংশন করিল, ইহার অর্থ কি আমি বুঝি না? বুঝি বলিয়াই তো—

লাগত বেহাল ভঙ্গ, তনকী সুধি বুদ্ধি গঈ,
তন-মন ব্যাপো প্রেম মানো মতৱারী হৈ!

—আমি যেন কেমন হইয়া গিয়াছি, এ দেহের শোধ-বোধ যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে; আমার তনু-মন ব্যাপিয়া প্রেম যেন মাতালের মত টলমল করিতেছে।

এ আমার কি হইল?—আমার যে কাহারও সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না!

সখিয়া মিলি দুই চারী,
বাৱরী সী ভঈ ন্যারী!

—দুই চারিটী মাত্র সখী লইয়া সকলকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া আসিয়াছি, কেননা এখন যে আমার পাগলিনীর দশা!

এমন করিয়া যে আমাকে বাউল করিয়াছে, তাহাকে কি আমি চিনি না?—

হোঁ তো ৱাকো নীকে জানোঁ—
কুঞ্জ কো বিহারী হৈ!

—আমি যে ওকে ভাল করিয়াই জানি; ও যে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া বেড়ায়!

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়?—

সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর,
আর তাহে কুটিল কটাখি;—
হেরইতে হামারি ভেদি উর-অন্তর
ছেদল ধৈরজ-শাখী!

সাধে কি বলিয়াছিলাম, তাহার চোখের চাহনি তো নয়, যেন প্রেমের কাটারী!

তার—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল ;
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল !
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ ;
অন্তরে বিদরে হিয়া—কি জানি করে প্রাণ !
চন্দন-চান্দের মাঝে মৃগমদ-ধান্ধা—
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা !

কি করিয়া আমি তোমাদের বুঝাইব, সে আমার কতখানি !—

চন্দ কো চকোর চাহৈ,
দীপক পতঙ্গ দাহৈ,
জল বিনা মান জৈসে,
তৈসে প্রীত প্যারী হৈ।

—কাছে পাইবে না জানিয়াও চকোর যেমন চাঁদের জন্য ঝুরিয়া মরে, পুড়িয়া মরিবে জানিয়াও প্রদীপের পানে পতঙ্গ যেমন ছুটিয়া যায়, জল-ছাড়া মাছ যেমন জলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, তেমনি করিয়া আমার প্রাণ তাহাকে চায় !

আমি তার রূপ-পাগলিনী।—

নৈণা মোরে বাণ পড়ী,
সাঈঁ মোহেঁ দরস দিখাঈ—
চিত্ত চঢ়ী মোরে মাধুরী মুরত,
উর বিচ আন অড়ী !

—বন্ধু যখন আমার পানে ফিরিয়া চাহিল, তখন তাহার নয়ন দুটী যেন তীরের মত আমার বুকে বিঁধিয়া গেল ; সেই হইতে তাহার রূপের মাধুরী আমার মনকে উচাটন করিয়া তুলিয়াছে, এ বুকের মাঝে আর যত তরঙ্গ সব যেন স্থির হইয়া গিয়াছে !

—৯০

এখন—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি,
জাগিতে স্বপনে দেখি কালা রূপখানি।
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে,
পরাণ হরিলে রাঙা নয়ন-নাচনে !
কি খেণে দেখিলাম গো নাগর-শেখর—
আঁখি ঝরে, মন কাঁদে—পরাণ ফাঁফর।

তোমরাই বল দেখি, "কৈসে প্রাণ পিয়া বিনু রাখুঁ",—বঁধু ছাড়া আমি বাঁচি কি করিয়া ?

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ?
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে !

* * *

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরিয়ে,
কে তাথে পরাণ ধরে ?
ভালে সে কামিনী দিবস-যামিনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে !

তার—

বদন-চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিলে গো
কে না কুন্দিলে দুই আঁখি—
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ কেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী।

সেদিন পথে যাইতে যাইতে—

ঘোমটা কাড়িতে রূপ নয়নে লাগিয়া গেল,
সরম রহিল সেই ঠাঞি।

তারপর হইতেই—

হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি জানি হৈল—
নিরবধি ধিকি-ধিকি জ্বলে—
কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো—
মন মোর থির নাহি বান্ধে ;
তিলে তিলে বারে বারে মুরুছা পাইয়া থাকি,
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে !

এখন আমার—

দিৱস ন ভূখ রৈণ নহি নিদ্রা,
পিয় বিন কুছ ন সুহাঈ।

—আমার দিনে নাই ক্ষুধা, রাত্রে নাই ঘুম; বঁধু ছাড়া কিছুই যে আমার আর ভাল লাগে না।

রূপ চিত্তের মাঝে জাগাইয়া দিল এক নূতন ব্যাকুলতা। আজ—

যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো,
উহারি পরশ-রস মাগে!

কিন্তু তাহাকে পাইব কোথায়?—তাই একান্তে বসিয়া কল্পনায় তাহার মূর্ত্তিখানি গড়িয়া তুলি—

মোরন কী চন্দ্রকলা
সীস মুকুট সোহৈ;
কেসর কো তিলক ভাল
তীন লোকে মোহৈ।
কুণ্ডলকী অলক ঝলক
কপোলন পর ছাঈ;
মনো-মীন সরৱর তজি
মকর মিলন আঈ।
কুটিল ভৃকুটি তিলক ভাল
চিতৱন মেঁ টৌনা;
খঞ্জন অরু মধুপ মীন
ভূলে মৃগ-ছৌনা।
সুন্দর অতি নাসিকা
সুগ্রীব তীন রেখা;
নটবর প্রভু ভেষ ধরে
রূপ অতি বিসেষা।

অধর বিম্ব অরুণ নৈন,
মধুর মন্দ হাঁসী;
দসন-দমক দাড়িম-দ্যুতি
চমকে চপলা-সী।

—ময়ূরের পুচ্ছে যে চন্দ্রক, তাহাই তাহার মাথায় মুকুটের শোভা বাড়াইয়াছে; কপালে কেশরের (জাফ্‌রান) তিলক রচনা দেখিয়া ত্রিভুবন মুগ্ধ।

কানে রত্নকুণ্ডলের ঝিকিমিকি দুটী গালের উপর মূরছিয়া পড়িয়াছে; দেখিয়া মনে হয়, মীন যেন সরোবর ছাড়িয়া মকরের সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছে।

কপালে তিলক রচনা, তার মাঝে আবার কুটিল ভ্রূকুটী, এ যেন চিত্তের উপর যাদুকরের যাদু; দুটি চোখ দেখিয়া খঞ্জন, ভ্রমর, মীন আর মৃগ-শাবক—ইহারা আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

কি সুন্দর তাহার নাসিকা, কণ্ঠে কি সুন্দর তিনটী রেখা; বিম্বের মত অধর, মধুর দুটী নয়ন, আর মুচকি হাসি—এই বা কি মিষ্টি! দশনের কান্তি যেন দাড়িমের দ্যুতি, বিদ্যুতের মত যেন তাহা ঝিকিমিকি করিতেছে। মীরার নটবর প্রভু কি মনোহর রূপই না ধরিয়াছেন!

ভাবিতে ভাবিতে অঙ্গ এলাইয়া পড়ে—"পরাণ পরবশ—জীবারে জি।" এ রূপের কি সীমা আছে, না দেখিয়া কোনও দিন আশা মিটে?

লখিল নহে রূপ লখিল নয়!—
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি, সে অঙ্গে রয়।
দেখিতে দেখিতে মন এমনি লয়—
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয়!

কিন্তু এমন করিয়া তাহাকে কেবল অন্তরে দেখিয়াই তো আশ মিটে না;—তাহাকে অন্তরে—বাহিরে সব

ঠাঁই যে আমার চাই।—তাই তো চিত্ত ফুকারিয়া উঠে—

প্যারে দরসণ দীজ্যো আয়—
তুম্ বিনা রহ্যো ন জায়,
ব্যাকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণ-দিন,
বিরহ কলেজা খায়!

তোমরা কি করিয়া বুঝিবে বল, কেমনে আমার—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মনে ভোর—
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর!
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।
সোই কি আর বলিব!
যে পুনি করিয়াছি মনে সেই সে করিব।
দেখিতে যে সুখ উঠে, কি বলিব তা—
দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা।

(ক্রমশঃ)

মানুষ-পূজা

——:*:——

বুদ্ধদেব মানুষকে কত গৌরব এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন, একটী মাত্র শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক মহাপুরুষই নিজকে আড়ালে রাখিয়া অলৌকিক ইষ্টদেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জ্জন করিতে আদেশ দিয়াই শিষ্যকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের মত এমন সহজ ভাবে আদর্শ মানুষরূপে বোধ করি আর কেহই ধরা দেন নাই। ধম্মপদের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

মাসে মাসে সহস্সেন যো যজেথ সতং সমং
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে,
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্সসতং হুতং। ৭

—শত বৎসর ধরিয়া কেহ যদি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মাসে মাসে যজ্ঞ করে, এবং সেই ব্যক্তিই যদি অন্য একজন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহূর্ত্ত মাত্রও পূজা করে, তবে শত-বর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।

লোকগুরু বুদ্ধদেব যেমন করিয়া মানুষ-পূজার পদ্ধতি শিখাইয়া গিয়াছেন, এমন আর বুঝি কেহ পারিবেন না। পাথরের মূর্ত্তি, শালগ্রাম-শিলা ইঁহাদের ফাঁকি দেওয়া বড় একটা কঠিন ব্যাপার নয়; আর অভিমান বজায় রাখিয়াও সেই নির্ব্বাক দেবতার পূজা চলে; কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে ঠাকুর ভাবিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেওয়া যে কত বড় কথা, আর ইহাতে দিনরাত্র কিরূপ সজাগ সচেষ্ট চেতনার প্রয়োজন, কতখানি আধ্যাত্মিক শক্তির পুঁজি থাকা চাই—মানুষকে যাঁহারা অবিচলিত বিশ্বাসে পূজা করিয়াছেন, শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা ভাল করিয়া জানেন। জ্যান্ত মানুষের মন জুগাইয়া চলা আর একটী চেতন পুরুষের পক্ষে যে কি দুরূহ ব্যাপার, যাঁহারা সেবক-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম জানেন। মানুষের অধীনে থাকিয়া (অবশ্য নিজের বিবেককে লোপ করিয়া ক্রীতদাস হইয়া নয়) মানুষ হওয়ার পথই বুদ্ধদেব দেখাইয়া গিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন আসে, মানুষকে যে মানুষ শ্রদ্ধা করিবে—সে কেমন মানুষ? বুদ্ধদেব বলিলেন, "ভাবিতত্তানং।" বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণলাভের চারিটী

মার্গ অর্থাৎ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—সোতাপত্তিমগ্‌গ, সকদাগামিমগ্‌গ, অনাগামিমগ্‌গ, অরহত্তমগ্‌গ। স্রোতাপত্তির তাৎপর্য্য এই, যিনি বুদ্ধ-শাসনরূপ স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পরিণামে তাহারই সাহায্যে নির্ব্বাণ-সমুদ্রে উপনীত হইবেন। আর শেষটী অরহত্তমগ্‌গ; যাঁহারা অর্হৎ তাঁহাদের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হইয়াছে, দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করেন। কাজেই পূজা করিতে হইবে তাঁহাদের, যাঁহারা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। এই অর্হত্ত্বলাভ বড় একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, তীব্রসংবেগযুক্ত হইয়া সাধনা করিলে এই জন্মেই অর্হত্ত্ব লাভ হইতে পারে।

মুণ্ডকোপনিষদেও রহিয়াছে—

> তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
> সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।

—তাঁহাকে জানিবার জন্য সমিধ হস্তে শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর নিকট যাইতে হইবে।

মানুষই আদর্শ বটে, কিন্তু কি রকম মানুষ পূজার যোগ্য, তাই এখানে বলা হইল। এমন মানুষকে জানার তাৎপর্য্যই হইল নিজকে জানা। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি শিষ্যকে সেই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়ই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। কাজেই মানুষই মানুষের মুক্তিপথের উপায় বলিয়া দিবে। পরস্পরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখাই মিলনের একমাত্র উপায়। বুদ্ধদেবের মৈত্রী-সাধনা সফল হইল কিসের দরুণ?—না, তিনি মানুষকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন বলিয়াই জীবতাবস্থাতেই এত বড় সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

কথায় বলে—সকলই নসিবের ফের। বুদ্ধদেব যাগ মানেন নাই, যজ্ঞ মানেন নাই, অপৌরুষেয় বেদ মানেন নাই—মানিয়াছিলেন আত্মপ্রত্যয়কে; শঙ্করাচার্য্যও আত্মপ্রত্যয়কেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব হইলেন ঘোর নাস্তিক্যবাদী, বেদমতবিরোধী, আর শঙ্করাচার্য্য হইলেন আস্তিক, বেদানুসরণকারী! কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বোধ হয় কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যের গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকেও প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ঈশোপানিষদের দ্বিতীয় শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে রহিয়াছে—"এবমাত্মবিদা পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্য অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ—কুর্ব্বন্নেবেতি।" আর স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে জ্ঞান-কর্ম্মে যে সমুচ্চয় হইতে পারে না, শঙ্করাচার্য্য এ কথা বারবার বলিয়াছেন। ভাষ্যেই এক জায়গায় রহিয়াছে—"জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধং পর্ব্বতবদকম্প্যং যথোক্তং ন স্মরসি কিম্?" এই দুইজন মহাপুরুষ একই বাণী প্রচার করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদের এমন ভাগ্যবিপর্যায় হইল কেন? একটু চিন্তা করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলে। বুদ্ধদেবের বাণীর তাৎপর্য্যই হইতেছে—সংস্কারমুক্ত হওয়া এবং অলৌকিক কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডের উপর আস্থা না রাখিয়া আত্মার মহিমায় নিজের পথ বাছিয়া নেওয়া। আর এখান হইতেই অপৌরুষেয় বেদের প্রতিদ্বন্দ্বী পৌরুষেয় দর্শনেরও সূচনা হইল। এমনিতর grand personality ছিল বলিয়াই বুদ্ধদেব অধিকারী অনধিকারীর বিষয় ততটা ভাবিলেন না—সকলের দরুণ একই ব্যবস্থা হইল। মানুষকে তিনি অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন বলিয়াই অনধিকার চর্চ্চার বিষময় প্রতিক্রিয়ার কথা মোটেই ভাবেন নাই। তিনি জীবিতাবস্থায় থাকিতে অবশ্য কোন ব্যভিচার ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাণলাভের পরই একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, ব্যভিচার আসিয়া সঙ্ঘের গৌরবকে ধূলায় লুটাইয়া দিল।

শঙ্করাচার্য্য 'আত্মগ্রহণাশক্তস্য' এই কথাটী বলিয়া অধিকারী অনধিকারীর বিভাগ রাখিয়া দিলেন। যাগ-যজ্ঞ করিয়া আসল জ্ঞানলাভের কিছুই হয় না, এই কথা তিনিই বলিয়াছেন, এবং অপরোক্ষ জ্ঞান যে কর্ম্মনিরপেক্ষ, এই কথাও তিনিই বলিয়াছেন, কিন্তু তবু একটু 'কিন্তু' রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এই কিন্তুটুকু রাখেন নাই—যাহা বলিয়াছেন সরল প্রাণে—অকপটে। তাঁহার নিজের সাধনার ধারা দেখিয়াও বুঝিতে পারি তিনি কেমন আত্মবলে বলীয়ান্ স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। যাহা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন—নিজের শক্তিতে, নিজের সাধনায়। কাহারও সঙ্গে কথা নাই, বার্ত্তা নাই, নীরবে বোধিদ্রুমমূলে ছয় বৎসর সাধনা করার পর সত্যলাভ করিলেন, তবে ছাড়িলেন। ক্রিয়াকাণ্ডের দোহাই, আপ্তবাক্যের দোহাই সত্যান্বেষী সাধকের তীব্র সাধনপিপাসার কাছে স্তিমিত হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, পরের কথায় কি হইবে, আমি যদি বুঝি তবেই মানিব, তাহা না হইলে মিথ্যা কতকগুলি সংস্কারের বোঝা বহন করিয়া মরিব কেন? যেমন কথা তেমন কাজ, এই সন্দেহ নিয়াই একদিন সাধনায় বসিয়াছিলেন, আবার সন্দেহ-ভঞ্জনের পর সিদ্ধ হইয়া তবে উঠিলেন। ক্রিয়াকাণ্ডকে তিনি বড় করিয়া দেখেন নাই—দেখিয়াছিলেন মানুষকে—মানুষের জ্বলন্ত আত্মাকে। মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপরই তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন; চিরপ্রচলিত আচারই যে ধর্ম্ম, এই কথা তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন নাই। চিত্তকে সংস্কারনির্ম্মুক্ত করিতে কতখানি আধ্যাত্মিক বল থাকা চাই, কতখানি প্রতিক্রিয়া সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, স্বয়ং বুদ্ধদেবই ইহার প্রমাণ। জ্ঞানের চেয়ে সংস্কারের প্রতাপ এবং আধিপত্য বেশী, কিন্তু এই মানুষই আবার আত্মার বলে বলীয়ান হইয়া সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হইয়াছে। কাজেই আচার বড়—না মানুষ বড়?

পাওয়া

এই যে আমার অকূল পানে
　ব্যাকুল হয়ে ধাওয়া—
কোন্ সুদূরে রয় অজানা—
　মিট্‌বে কি সে চাওয়া?

বুকের মাঝে কাঁদন যত
　রুদ্ধ হয়ে বাজে—
দৈন্য আমার, কুণ্ঠা আমার
　পায় না প্রকাশ লাজে।—

জান তুমি হৃদয় আমার
　ব্যথার ভারে নত—
শুষ্ক আঁখির অন্তরালে
　অশ্রু লুকায় কত!

বল বঁধু, কোন শুভখন
　রয় সে কত দূর—
ছন্নছাড়া জীবন মাঝে
　তুলবে নূতন সুর;

ভুবন হবে রঙীন স্বপন—
　কাঁদন হবে গাওয়া,
এক নিমেষে জীবনভরা
　সফল তরী বাওয়া!

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

শারীরিক শিক্ষা—যৌন বিজ্ঞান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং শিশুদের যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। আর দুটী কথা বলেই আপাততঃ এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই।

ইতিপূর্ব্বে Dr. Stopes-এর একখানা বইয়ের নাম করেছি। বইখানাতে কি ধরণে শিশুদের যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহ Stopes তার আলোচনা করেছেন। Stopes জননীকেই এ বিষয়ে যোগ্যতমা শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচন করেছেন। Stopes-এর বইখানা ইংরেজীতে লেখা। বাংলার মায়েরা অধিকাংশই ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ। তাঁদেরই মত সাগর-পারের এক জননী শিশুদের সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছেন, তা জান্‌লে তাঁদের শিক্ষা ও উপকার দুই-ই হবে, এই ভেবে Stopes-এর বই থেকে তাঁর চিন্তাধারার একটা খসড়া এখানে লিপিবদ্ধ কর্‌লাম। আশা করি, এ থেকে বাংলার মায়েদের কিছু চিন্তার উপকরণ সংগ্রহ হবে।

Stopes বল্‌ছেন—

বোধ হয় শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই প্রথম মিথ্যা-ভাষণের শিক্ষা পেয়েছে মায়ের কাছ থেকেই। শিশুর জগতে মা-ই একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। শিশুর যা কিছু সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ তার মায়ের কাছে। যা কিছু সে জানে না, তা যে তার মা জানেন, এটা শিশুর ধ্রুব বিশ্বাস।

এটা-ওটা নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে করতে একদিন শিশু হঠাৎ মাকে জিজ্ঞাসা করে বসে, মা আমায় তুমি কোথায় পেলে ?

মা তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি মত আর সব প্রশ্নেরই জবাব দেন, কিন্তু এই জায়গায় পুঞ্জীভূত সামাজিক সংস্কারের মোহ কাটিয়ে উঠে মা স্পষ্ট কথায় কিছু বল্‌তে পারেন না। মা হয়ত বলেন, রাস্তার কোণে কুড়িয়ে পেয়েছি, কি চাঁদের মা বুড়ি দিয়ে গিয়েছে।

শিশু রূপকথা ভালবাসে ; কিন্তু তা বলে কোথায় যে তাকে ভাঁড়ানো হচ্ছে, তা বুঝতে তার এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। একটা প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়ে মা তাকে যেখানে ভাঁড়ান, সেখানে সে ক্ষুণ্ণ হয় না বটে, কিন্তু আর কোথাও থেকে যে এ প্রশ্নের উত্তর আহরণ করতে হবে, এটা সে মনে মনে এক রকম ঠিক করেই নেয়।

মা আজ যে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেন, পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র সংঘাতে সে প্রশ্ন বার বার শিশুর মনে জাগে, সে সম্বন্ধে কখনো সে ভাবে, কখনো বা ভাবে না, হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে তার জবাবটাও সে পেয়ে যায়।—এমনি করে একদিন সে নিশ্চিতই জান্‌তে পারে, মা তার কাছে মিথ্যা বলেছেন।

তারপর হয় সঙ্কোচের সৃষ্টি ; সেই সঙ্কোচের ফলে আসে অজ্ঞান, আর তার ফলে দুঃখ।

মা বল্‌বেন, ওই কচি বয়সে ও সব চিন্তা শিশুর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া কি সঙ্গত ?

কি নিদারুণ ভ্রান্তি !

শিশুর স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ে যা কিছু প্রতিফলিত হয়, সবই যে শুচি-সুন্দর হয়ে ওঠে। তিন-চার বছরের শিশুর কাছে সবই যে অনির্ব্বচনীয় রহস্য—ঘটনার স্রোতে কোথায়ও যে জটিলতা নাই। অণু-প্রমাণ বীজ হতে বনস্পতির সৃষ্টি আর মানবশিশুর সৃষ্টি—দুইই তার কাছে চমৎকার ! এর মাঝে কোথায় সঙ্কোচ, কোথায় বক্র ভাবনা ?

"আমার বিশ্বাস, কোনও বিশিষ্ট উপদেশ মনে

ধরে রাখবার বয়স যখন শিশুর হয়নি, তখনই মা তার যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারার অনুবর্ত্তন করেন, বড় হয়ে প্রত্যেক নরনারীকে আজীবন তার ফল ভুগতে হয়।”

কেউ কেউ বলেন, শিশুর ১০।১২ বছর বয়স হতেই এ শিক্ষার পত্তন করা উচিত। কিন্তু তাতেও মনে হয়, আট-দশ বছর মিছামিছি নষ্ট করা হল।

“শিশুর যখন দু’বছর কি তিন বছর বয়স, তখন থেকেই জন্মরহস্য-বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ তাকে দিতে হবে, যৌন-ব্যাপারের প্রতি তার মনোভাবকে তখন থেকেই গড়ে তুলতে হবে। বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তির উন্মেষের পূর্ব্বেই এই শিক্ষার পত্তন করা উচিত।

“ক্ষুদ্র শিশু হয়ত উপদেশের একবর্ণও মনে রাখবে না, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারের প্রতি তার মনোভাবটী শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। কথাগুলো ভুলে গেলেও তার অন্তশ্চেতনায় এ সম্বন্ধে একটা গভীর ছাপ পড়বে। এইটুকুই আসল শিক্ষা।”

এই সময় উপদেষ্টার মনোভাব শিশুর মনে প্রতিফলিত হয়ে তাকে শ্রদ্ধায়, রহস্যানুভূতিতে পূর্ণ করে তুলবে। তারপর থেকে বাপ-মা এবং অভিভাবকের কর্ত্তব্য, যৌনচর্চ্চা সম্বন্ধে সকল প্রকার লঘুতা বর্জ্জন করে এই শ্রদ্ধার অঙ্কুরটীকে জীইয়ে রাখা। জগতের সমস্ত রহস্যকেই সহজ ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস এই থেকেই গড়ে ওঠে। আধ-আলো আধ-আঁধারেই প্রবৃত্তির উদ্ভব ও প্রসার; সত্যের অবাধিত আলোক সে সইতে পারে না। মানব-হৃদয়ের এই গভীর রহস্যকে আমরা অস্বীকার করে পদে পদে বিড়ম্বিত হই।

ছোট ছেলে কথার অর্থ তলিয়ে বুঝতে যায় না; কথার সুর, চোখমুখের ভঙ্গী, বক্তার ভাবোচ্ছ্বাস, এইগুলিই তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। তার ভবিষ্যৎ চিন্তার ধারাও এই অন্তঃশীলা শিক্ষা দ্বারাই নিয়মিত হয়ে থাকে।

তারপর একদিন এ বিষয়ে শিশুর চিত্ত সজাগ হয়ে ওঠে। স্পষ্ট ভাষাতেই জন্মরহস্য সম্বন্ধে সে কৌতূহল প্রকাশ করে। হয়ত মায়ের কাছেই সে এ রহস্যের মীমাংসা খোঁজে। মা তখন তাকে কি জবাব দেবেন? Stopes শিশুর সঙ্গে মায়ের কথাবার্ত্তার একটা আদ্রা দিয়েছেন। ছেলে যে ঠিক ওই প্রশ্নগুলোই করবে, আর মা কলের মত ওই কথাগুলোই আউড়িয়ে যাবেন, তা নয়। প্রত্যেক মা তাঁর সন্তানের মন বুঝে, ভাব বুঝে, নিজের শক্তি অনুযায়ী অনুরূপ আদর্শে একটা প্রশ্নোত্তরের খসড়া গড়ে নেবেন। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে, কোথাও যেন কোনও কথা চাপা দেওয়া বা বিকৃত করা না হয়। হয়ত সব কথা স্পষ্টতঃ বোঝানো যাবে না, কিন্তু ওই অস্পষ্ট উক্তিগুলি এমন ভাবে সাজাতে হবে, যাতে মূল সত্যের সঙ্গে তাদের যোগ অব্যাহত থাকে, বুদ্ধিশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হৃদয়ে ওই অস্পষ্ট উক্তিগুলিই ক্রমে নিগূঢ় তাৎপর্য্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আগের কথার সঙ্গে পরের অভিজ্ঞতা কোথায়ও খাপছাড়া হয়ে না যায়।

Stopes-এর দেওয়া কথোপকথনের কিছু ছেঁটে কিছু বাড়িয়ে আমাদের সমাজের চিন্তার উপযোগী করে নীচে একটা কথোপকথনের কাল্পনিক খসড়া দিলাম।

শিশু এসে মাকে জিজ্ঞাসা করল, “মাগো, আমায় তুমি কোথায় পেলে?”

মা বললেন, “কতদিন ধরে যে ভগবানের

কাছে তোমায় চেয়ে এসেছিলাম, তাই তিনি আমাদের তোমায় দিয়েছেন। অমনি দেননি, তাঁকে নিয়ে তোমার বাবা আর আমি একটু একটু করে তোমায় গড়ে তুলেছি।"

"কি করে আমায় গড়লে?"

"এই যেমন তুমি বাগানে মাটী খুঁড়ে তাতে একটী বীজ রাখ; তারপর মাটী চাপা দিয়ে বীজটী ঢেকে দাও; রোজ তাতে জল দাও, চারা বের হলে কত যত্ন করে রোদ বৃষ্টি বাঁচিয়ে তাকে বড় কর; একটু বড় হলে তার গোড়ায় সার দাও, জল দাও। তেমনি করে এই এতটুকু বীজ থেকে তোমায় আমরা এতখানি বড় করে গড়ে তুলেছি।"

"কেন ভগবান নিজে আমায় গড়লেন না কেন?"

"তিনি নিজ হাতে তো কিছু গড়েন না, আমাদের দিয়েই তিনি তোমায় গড়িয়েছেন। তুমি যেমন খেলাঘর সাজাও, আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখি, আর আনন্দ করি, তেমনি ভগবানও সর্ব্বদা কাছে থেকে থেকে তোমাকে যে আমরা গড়েছি, তা দেখেছেন, আর আনন্দ করেছেন। আবার নিজে খেলাঘর সাজাতে তোমার যেমন আনন্দ, আমরা নিজেরা-নিজেরা তোমায় গড়ে তুলতেও তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি।"

হয়ত সেদিন এইখানেই কথাটা সাঙ্গ হয়ে গেল। শিশুর কৌতুহল আছে বটে, কিন্তু তা বলে একটা কথা খুঁটিয়ে শুনবার মত ধৈর্য্য তার নাই। শরতের মেঘখণ্ডের মত একটা ভাব তার মনে ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়। তাই দুটী একটী স্পষ্ট কথা শুনলেই তার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়ে যায়।

তারপর হয়ত আরও কতদিন চলে গেছে, মা-ছেলেতে আর এ নিয়ে কোনও আলোচনা হয় নি। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কবে জন্মেছিলাম মা?"

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তোমার বয়স কত বল দেখি?"

পাঁচজনের মুখে শুনে শুনে ছেলে বয়সের হিসাব রেখেছে। বলল, "এই তো বৈশাখে পাঁচ বছর হল।"

মা বললেন, "তাহলে এই বৈশাখের আগে আরও চারটা বৈশাখে গিয়েছে, তার আগের বৈশাখে তুমি জন্মেছ।"

"জন্মাবার আগে আমি কোথায় ছিলাম?"

"বলি নি, তোমার বাবা আর আমি তোমায় এতটুকু থেকে একটু একটু করে এতখানি বড় করে গড়ে তুলেছি?"

"হাঁ, তা বলেছিলে বটে। কিন্তু কি করে গড়লে? যে দিন আমি জন্মেছিলাম, সেই দিনই গড়েছিলে?"

"না, সবটা কি একদিনে গড়া যায়? তোমায় গড়তে আমাদের কত দিন লেগেছে।"

"আচ্ছা, কত দিন লেগেছিল, বল না!"

"সে অনেক দিন! তুমি যে আমার সাত রাজার ধন; যা-তা করে তাড়াতাড়িতে কি তোমায় গড়তে পারি?"

"তবুও বল না গো কত দিনে গড়েছ?"

"প্রায় একটী বছর লেগেছে—পুরো নয়টী মাস।"

"খুকীকে গড়তে এতদিন লেগেছে?"

"হাঁ লেগেছে বই কি! তুমিও যেমন, খুকীও তো আমার কাছে তেমনি।"

"কিন্তু আমি তো খুকীর চেয়ে বড়।"

"হাঁ এখন বড় বটে; কিন্তু তোমার যখন খুকীর বয়স ছিল, তখন তুমিও ওর মতই অতটুকু ছিলে। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে-বেড়েই না এতখানি বড় হয়েছ।"

আবার হয়ত কতকটা চাপা পড়ল ম

ওই আলোচনারই সূত্র ধরে ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মাগো, জন্ম হয় কি করে?"

"দেখনি, ছোট্ট বীজটা মাটীর নীচে পুঁতে দাও যখন, তখন প্রথমতঃ তার কিছুই থাকে না, শিকড় থাকে না, পাতা থাকে না, থাকে শুধু একটা দানার মত। তারপর মাটীর তাপ পেয়ে, রস পেয়ে সেটা ফুলে উঠে ফেটে যায়, তা থেকে শিকড়পাতা সব বেরুতে থাকে। তখন তো আর সেটা মাটীর তলায় চাপা পড়ে থাকতে পারে না, কাজেই মাটী ফেটে চারা হয়ে সে বেরিয়ে পড়ে—সবাই তখন তাকে দেখতে পায়। চারা গাছটা দেখ্‌তে পেলে তবে না আমরা তার যত্ন করতে পারি। সে যাতে রোদে না শুকিয়ে যায় বা ঝড়ে না উপড়ে পড়ে, বা পোকায় তাকে না কেটে ফেলে, আমরা তখন তার ব্যবস্থা করি। বীজটা মাটীর নীচে থেকে খানিকটা বড় হয়ে যখন আর ওখানে থাক্‌তে পারে না, তখন ছট্‌ফট্‌ করে মাটী ঠেলে বেরিয়ে পড়ে। এমনি করে বীজই চারাগাছ হয়ে জন্মায়। তারপর দেখনি, পাখীর ডিম থেকে কি করে পাখীর ছানা হয়। টাটকা একটা ডিম ভাঙলে তুমি তার মাঝে ছানাটা খুঁজেই পাবে না, দেখবে কুসুমটার চারিদিকে খানিকটা লালা জড়িয়ে আছে। কিন্তু মায়ের বুকের তাপ পেয়ে পেয়ে ওই কুসুমটুকু থেকেই ক্রমে পাখীর ছানার শরীর, ডানা, পা, ঠোঁট সব তৈরী হতে থাকে। তারপর যখন সব তৈরী শেষ হলে ছানাটা ওর মাঝে থেকে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন ডিমের খোলা ভেঙ্গে বেড়িয়ে পড়ে আর চিঁ চিঁ করে মাকে ডাক্‌তে থাকে। তুমিও একদিন বীজের মত, ডিমের মত ছিলে, হাত-পা নাক-মুখ-চোখ কিছুই ছিল না। তখন তোমাকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। তারপর যখন একটু একটু করে তোমার সব গড়ে উঠ্‌ল, হাত হল, পা হল, নাক হল, চোখ হল—মাকে দেখতে ইচ্ছা হল, মায়ের বুকের দুধ খেতে ইচ্ছা হল, তখন তুমিও বেরিয়ে এলে আর কি! সবাই তখন দেখতে পেল—বাঃ, কেমন দিব্যি খোকাটী! এই হল তোমার জন্ম।"

"জন্মাবার আগে তুমি আমায় কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?"

"এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল যেখানে কেউ তোমায় না দেখতে পায়, জান্‌তে না পারে; কেবল আমিই জানতাম তুমি কোথায় আছ, কি করছ, কতদিনে তোমার গড়ন শেষ হবে, কবে তুমি আমায় দেখ্‌তে চাইবে।"

"কিন্তু সে জায়গাটা কোথায়?"

"আছে, গো আছে—ভারী চমৎকার জায়গা সে! সেখানে কেবল খুব ছোট ছোট খোকারাই থাকে, যতদিন না তাদের গড়ন শেষ হয়।"

"কোথায় সে জায়গা, আমায় দেখাও না! আমি সেখানে যাব।"

"তা কি হয়? আর তো তুমি ফিরে যেতে পারবে না সেখানে; এখন যে তুমি বড় হয়েছ। যতদিন না তোমার গড়ন শেষ হয়েছিল, ততদিনই তুমি সেখানে ছিলে—"

"কিন্তু তুমি তো বললে না, সে জায়গাটা কোথায়?"

"এখন দিনের বেলায় তুমি সব সময় তো আমার কাছে থাক না. এটা-সেটা দেখে বেড়াও, ছুটাছুটী কর; কিন্তু রাত্রিবেলা যখন চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে, ঘুমে দুটী চোখ বুজে আসে, তখন এমনি করে মাকে আঁকড়ে ধরে মায়ের বুকের মাঝে গুটীসুটী হয়ে চুপটী করে শুয়ে পড়। যখন তোমার হাত হয়নি, পা হয়নি, চোখ হয়নি, তুমি ছুটতে পারতে না, দেখ্‌তে পারতে না, নিজে খেতে পারতে না—তখন—তখন একেবারে মায়ের বুকটি ঘেঁসে—মায়ের মাঝে—আমার মাঝে ছাড়া কোথায় তুমি থাকতে বল তো? আমি কি আর কোথায়ও

তোমায় রেখে সোয়াস্তি পেতাম ? তাই তখন সারাক্ষণ আমার মাঝেই তোমায় রাখতে হত।”

“আচ্ছা, দেখাও না গো, তোমার মাঝে কোন জায়গায় আমি ছিলাম !”

“বল দেখি, মায়ের মাঝে কোন জায়গাটীতে থাকৃতে তোমার ভাল লাগে, কোন জায়গাটী সব চেয়ে নরম, সব চেয়ে সুন্দর ?—নিশ্চয়ই মায়ের বুকটী, না ?—মা যখন তোমায় গড়ছিলেন, তখন ওই জায়গাটীর নীচে থুয়ে গড়ছিলেন।”

“ঠিক বুকের নীচে ? ওই যে টিপ্ টিপ্ করছে ওইখানে ?”

মা ছেলের হাতটী টেনে বুকের ওপর রেখে বল্লেন, “হঁা”, ঠিক ওইখানটীতে—এই বুকের মাঝে—ঠিক এরই নীচে তোমায় আমি লুকিয়ে রেখে গড়েছি।”

Stopes বল্‌ছেন, “একটী ছেলের কথা আমি জানি, মা যখন তার কাছে এই পর্য্যন্ত বল্লেন, তখন ছেলেটী একটা কথাও না বলে মার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল, তারপর একটা আঙ্গুল মুখে পূরে দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাব্‌ল। তারপরেই সে একেবারে ছুটে এসে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠ্‌ল—‘ও মা—মাগো—তাহলে আমি একেবারে তোমার মাঝে—তোমার সঙ্গে মিশিয়ে ছিলাম !’ তারপর থেকে কয়দিন পর্য্যন্ত সে যেন কি একটা ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে ছিল ; খেলা করতে করতে হঠাৎ খেলা ছেড়ে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ত, ‘তাই তো গো মা তোমায় আমি এত ভাল-বাসি !’ ঠিক প্রাণের দরদ দিয়ে, সত্যিকার স্নেহ দিয়ে যদি ছেলেকে গড়ে তোলা যায় তো তার কাছ থেকে এমনি করেই সাড়া মেলে।”

এই কথাবার্ত্তার পর ছেলের মনোভাব যেমনই দাঁড়াক না কেন, মা এই সুযোগে দুটী কাজের কথাও বলে নেবেন। বল্‌বেন, “কাজেই বুঝ্‌তে পারছ, এই সমস্ত কথা কেবল মাকে আর বাবাকে ছাড়া কাউকে বল্‌তে নাই। কেননা মা আর বাবা ছাড়া কেউ তো জানে না, কেউ তো বল্‌তে পার্‌বে না, কি করে তোমার জন্ম হল। এ বিষয়ে যখনি তোমার কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা হবে, তুমি এসে মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে। তোমার এই শরীরটী তো মা-ই গড়েছেন কিনা, তাই মা-ই জানেন, ওর কখন কি হবে না হবে। তোমার শরীরের যা কিছু নূতন খবর, যা তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, তা এসে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বে। আর কাউকে কিছু বল্‌লে তারা তো তোমায় সব কথা বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে না, কেননা তারা তো মায়ের মত বুকে পূরে রেখে তোমায় গড়ে নি।”

এই হল একটা মোটামুটি খসড়া মাত্র। ছেলের সঙ্গে মায়ের বোঝাপড়া যে একদিনেই শেষ হয়ে যাবে, তা নয়। কত নূতন নূতন প্রশ্ন ছেলের মনে জাগ্‌বে ; মাকে তার জবাব দেবার জন্য তৈরী থাকৃতে হবে। জন্মরহস্য সম্বন্ধে একটা সরল, সত্য অথচ পবিত্র ভাব ছেলের মনে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে ; এই তথ্য রসভাবে আপ্লুত করে ছেলেকে নানা ভঙ্গীতে শোনাতে হবে।

এর পর বছর বারো বয়স হলে আর এক দফা প্রশ্নোত্তর প্রয়োজন হবে। তখন কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য ছেলের কাছে উপস্থিত কর্‌তে হবে। গোড়ায় যদি মিথ্যা সঙ্কোচ বা লজ্জার বাহানা না থাকে তো সে ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন হবে না।

যৌন-বিজ্ঞানের শিক্ষা কিছু একদিনে শেষ হয়ে যাবার নয়। মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত যৌন-আকর্ষণের অতীত হতে না পার্‌বে, কিম্বা একে আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত কর্‌তে না পার্‌বে, ততদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে জীবনের প্রতি পর্ব্বসন্ধিতেই তার শিখবার, জান্‌বার অনেক কিছুই থাকৃবে। সভ্য-মানুষ কামশাস্ত্রের নাম শুন্‌লেই লজ্জায় অধোবদন হয়, অথচ

অন্ধভাবে কামানুশীলন করে নরকের পথ প্রশস্ত করতে তার লজ্জা হয় না, বা ধিক্কার আসে না। গোড়া হতে যদি এ বিষয়ের শিক্ষার একটা বনিয়াদ গড়া থাকতো, তো পরিণত বয়সে সহজ-সুন্দর ভাবে তা জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ত; তাহলে সভ্যসমাজের অনেক কেলেঙ্কারী, অনেক হা-হুতাশের হয়ত অবসান হত।

কিশোর বয়সে যৌন-বিজ্ঞান কি করে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তার একটু আভাস ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি। অতঃপর এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করা যাক্। (ক্রমশঃ)

প্রাচী বনাম প্রতীচী

-:*:

একটা মানুষই আর একটা মানুষকে ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, আর একটা জাতি যে আর একটা জাতির সবখানি বুঝিয়া ফেলিবে, এ যেন একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এমনি অসম্ভাব্যেরই বিজৃম্ভণ দেখিতে পাই, যখন প্রাচ্যের মুখে শুনি প্রতীচ্যের ইতিবৃত্ত, অথবা প্রতীচ্যের মুখে প্রাচ্যের কাহিনী। দু'জনাই বলে, আমার যাহা কিছু, সবই ভাল, আর তোমার যাহা কিছু সবই মন্দ। কথাটার মাঝে বাস্তবতা কতটুকু, আর কতটুকুই বা কল্পনা, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু তাই বলিয়া মন্তব্য করিতে কোনও পক্ষেরই বাধে না, এবং সে মন্তব্য যে একেবারেই ভূয়া, তাহাও যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা ভারতবাসী আজ হাজার বছর ধরিয়া রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় পঙ্গু হইয়া আছি; স্থূল জগতের এমন একটা কিছু উপলক্ষ্য নাই, যাহা ধরিয়া মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে পারি। যেখানে বাস্তবিকই অনেক দিক দিয়া আমরা খাটো, সেখানে চিত্তে এই আশঙ্কাটাই প্রবল হইয়া উঠে, এই বুঝি আমার দুর্ব্বলতা লইয়া কেহ টিট্‌কারী দিয়া গেল! এইরূপ সশঙ্ক মনোবৃত্তি হইতেই অযাচিত আত্মশ্লাঘা এবং সমপরিমাণে পরনিন্দা দ্বারা রসনার কণ্ডূতি-নিবৃত্তির বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠাই স্বভাবিক। এ প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিতে পার, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, প্রাণের দায়ে এই হীনতাটুকু স্বীকার করা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্রই যে আমাদের হাতে নাই।

প্রায়শঃই এরূপ ক্ষেত্রে এই হয় যে, আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বী কতকগুলি বিরুদ্ধ ভাবকে আমি একটা প্রতিপক্ষের নামের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে গালি দিয়া মনের ঝাল মিটাই। প্রতীচ্য প্রাচ্যকে কি ভাবে, সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেননা "রাজার নন্দিনী প্যারী যা বলে তাই শোভা পায়।" আমরা প্রতীচ্যকে সময়ে-অসময়ে যে সমস্ত বিশেষণে লাঞ্ছিত করি, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা যাচাই করিবার অবসর বা প্রবৃত্তিই হয়ত আমাদের নাই; সম্ভবতঃ সে প্রতীচ্য আমাদেরই মনঃকল্পিত একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। আমার সহজাত আদর্শ আমাকে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে সঞ্জীবিত করিয়া আসিয়াছে, তাহার বিরোধী শক্তিকে কল্পনার সহায়ে সৃষ্টি করিয়া তাহারই মুণ্ডপাত করা হয়ত আমারই আত্মতৃপ্তির একটা তির্য্যক্ প্রতিরূপ। অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের নিজের বিরুদ্ধেই অভিযোগ নয়, তাই কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি?

ওদেশের সঙ্গে এদেশের প্রথম বিরোধটাই দেখি জীবনের মেয়াদ লইয়া। যদিও গড়পড়তা

আমাদের আয়ুষ্কাল তেইশ বছর মাত্র এবং তাহাদের ষাট্ বছর, তবুও আমাদের এই তেইশ বছর পরমায়ু পৌনঃপুনিক দশমিকের অঙ্কের মত অনন্ত কালপ্রবাহ বাহিয়া দীর্ঘতর হইয়াই চলিয়াছে; কেবল নির্দ্দিষ্ট একটা ব্যবধানের পর জন্ম আর মরণের দুইটা শীর্ষ-বিন্দু নিছক্ একটী সাময়িক ছেদের কল্পনা মনে জাগাইয়া দেয় মাত্র। প্রতীচী জানে, (আমরা অবশ্য Rationalistদের কথা বলিতেছি না,) এ ভবের মেয়াদ যতদিনের হউক না কেন বাবা, একবার পগার ডিঙ্গাইলে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং যাহা কিছু করিতে হয় এই গোণা কয়টা দিনের মাঝে; নিশ্চিত বর্ত্তমানের শস্যটুকু নিঃশেষে আত্মসাৎ করাই পুরুষার্থ। ওপারে একটা অনন্ত স্বর্গ অথবা অনন্ত নরকের বিভীষিকা আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের কেরামতীতে স্বর্গ-নরকের ভাবনা দিন দিন উবিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই চিন্তার ধারাকে অনুসরণ করিয়া সহজেই চার্ব্বাকের বুলিটা কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ!"

চার্ব্বাককে কিন্তু বহুদিন হইতেই আমরা মনোরাজ্য হইতে বরতরফ আসিয়াছি; অন্ততঃ মুখে আমরা এই কথাটাই বলি। জীবনটা যে সুখের, এ কথা বলিতে আমাদের বিবেকে বাধে। এ তো শুধু একজন্মের কারবার নয়; পথের বাউলও বাতাইয়া দিবে, "আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি আসিতেছ বারে বারে রে!" সুতরাং ওই অপরিমিত দীর্ঘ জীবনের মাঝে এই গোণা কয়টা দিনের সুখদুঃখের হিসাব নিয়া বাড়াবাড়ি করা নিছক্ মূঢ়তা ছাড়া আর কি? তাই হাসির কারণ ঘটিলেও আমরা হাসি চাপিয়া রাখিতে অভ্যস্ত, চোখ ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিলেও কান্না চাপিয়া যাই; অন্ততঃ ইহাই আমাদের প্রতি গুরুজনের উপদেশ। বাস্তবের ক্ষেত্রে সে উপদেশের মর্য্যাদা কতটুকু রক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু একেবারে এই আশীলক্ষ জন্মের ইজারা পাইয়াও আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়াছে কি? রুশীয়ার সাম্রাজ্য নাকি আয়তনে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ; অথচ তাহার মত দরিদ্র দেশ দুটী-একটী ছাড়া কোথায়ও মিলিবে না। তাহার কারণ এই নয় কি যে তাহার এত বড় জমিদারীটা প্রকৃতির প্রতিকূলতায় পতিত পড়িয়া রহিয়াছে, চেষ্টা করিয়াও আজ তাহাতে সোণা ফলাইবার উপায় নাই? আজ আমরা কল্পনায় লক্ষ লক্ষ বৎসর পরমায়ু পাইয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; আর ভবের গোণা কয়টী দিন মাত্র পুঁজি লইয়া প্রতীচী জগৎটাকে তোলপাড় করিতেছে। আমাদের জন্ম হইতে জন্মান্তরের জের টানিয়া নিতে হয় কেবল হতাশার সান্ত্বনার দরুণ; যে আশা-আকাঙ্ক্ষা এই জন্মে সফল করিয়া তুলিবার মত মাজার জোর পাইতেছি না, তাহাকেই পরজন্মের দরুণ মুলতবী রাখিয়া এ জন্মটা নিরুদ্বেগে ঝিমাইয়া কাটাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। এই আমিই যে "আশী লক্ষ" জন্মের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া কত বিচিত্র হর্ষ-শোকে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত হইয়া আসিয়াছি, ইহা ভাবিয়া বৈদান্তিকের মত আত্মার ব্যাপ্তি-ধর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিতে পারি না, বিশ্বের সকল জীবের মধ্য দিয়াই আমার সত্তা অনুস্যূত হইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া সকলের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করিতে পারি না, আরো কত জন্ম আমার হাতে পুঁজি আছে ভাবিয়া বীরকর্ম্মে নিজকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিবার দরুণ নিমেষের ফুৎকারে এই জীবনটাকে উড়াইয়া দিতে পারি না, অনাগত মহাভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমানের সম্বলটুকু নিঃশেষ করিয়া দিয়া রিক্ত হইতে জানি না! আমাদের এই

লক্ষ-বর্ষ-ব্যাপ্ত জীবন, অমিত্বের এই অনন্তপ্রবহমান জাহ্নবীধারা—শুধু একটা দার্শনিক বিভীষিকা মাত্র, আমাদের আশাভঙ্গের বেদনা সহিয়া যাইবার একটা অজুহাত মাত্র!

অথচ এই দেশের নীতিশাস্ত্রকারই একদিন বলিয়াছিলেন, "যখন বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, তখন মনে করিবে 'আমি অক্ষয়-যৌবনময় দেবতা সমান, আমার জরা নাই, মৃত্যু নাই' : আবার যখন ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে, তখন মনে করিবে, মৃত্যু আসিয়া যেন তোমার চুলের মুঠি চাপিয়া রহিয়াছে।" এই উপদেশের পূর্ব্বার্দ্ধ আমরা আমলেই আনি নাই; একান্ত ধর্ম্ম-প্রাণ জাতি কিনা, তাই মুক্ত-শিখার গোড়ায় মৃত্যুর দৃঢ়মুষ্টি অনুভব করিতে করিতে প্রথমেই ধর্ম্মাচরণ সুরু করিয়া দিয়াছি; তারপর যখন বিদ্যা আর অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়াছি, তখনও মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি শিথিল হয় নাই; সাধ্য কি যে বিদ্যা আর অর্থ লইয়া এতটুকু বাড়াবাড়ি করি, অমনি যে টিকির গোড়ায় যমরাজার হ্যাঁচ্‌কা টান পড়িবে!

এত বড় বীর্য্যশালী একটা নীতিবচন প্রতীচ্যের কোনও চাণক্য আওড়াইয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু তাহারা দেখিতেছি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থটা ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছে—নিজকে অজর আর অমর ভাবিয়াই বিদ্যা আর অর্থের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; ধর্ম্মের বাকী খাজানা আদায় করিবার দরুণ মৃত্যু চুলের মুঠিটা চাপিয়া ধরিয়াছেন কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার ফুরসুরৎও তাহাদের নাই। আমরা সেয়ানার দল, দূর হইতে বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছি, আর প্রবীণ কাপুচ্ছকটী দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতেছি, "ওহে, এত বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নয়!" আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের এই বচন হয়ত গ্রাহ্যও হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ দিগ্‌বলয়ের শেষ পর্য্যন্ত চাহিয়া চাহিয়াও তো উহারা আপদের কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছে না। এই অকুতোভয় দেখিয়াই মনে হয়, হয়ত বা চাণক্য-বচনের শেষার্দ্ধের যথার্থ তাৎপর্য্যটুকুও অবিলম্বে উহারাই ধরিয়া ফেলিবে, আমাদের এই জরামরণ-ভয়-কম্পিত শিথিল হস্ত হইতে ধর্ম্মের ইজারাটুকুও উহারাই কাড়িয়া লইবে।

প্রতীচী ধর্ম্মের বিজ্ঞান জানে না, কিন্তু সহজ প্রেরণাবশতঃ ধর্ম্মের প্রয়োগে দেখিতেছি তাহার সিদ্ধহস্ত। আমাদের চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান বোঝাই করা রহিয়াছে ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞান, কিন্তু প্রয়োগের বেলায় সেই খাড়া-বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি খাড়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। বিজ্ঞের বচন শুনিতেছি, আমাদের নাকি আপাদমস্তক একেবারে ধর্ম্মে ঠাসা, অহোরাত্র ব্যাপিয়া প্রতি কর্ম্মে, প্রতি পদক্ষেপে ধর্ম্মের সাধ্যসাধনা কসরৎ, কিন্তু এত করিয়াও আমাদের লাভ হইতেছে কি? ধর্ম্মের দুয়ারে এত মজুরী খাটিয়াও আমরা পাইলাম কি?—শ্রী পাইয়াছি? ভূতি পাইয়াছি?—ধর্ম্মের দালালেরা গম্ভীর হইয়া বলিবেন, বাপু হে, ধর্ম্ম তো ইহকালের সুখের দরুণ নয়, পরকালে দেখিবে, ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য কেরামতি! কিন্তু এ কথা বলিলে আমি শুনিব কেন? ধর্ম্ম আমার ইহকালের সবটুকু জুড়িয়া থাকিয়া আমাকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া পরকালে আমাকে রাজা করিয়া দিবে? আমার ওঠা-বসা, খাওয়া শোওয়া, হাসি-কাশি, সব ধর্ম্ম দ্বারা শাসিত; অথচ এইগুলিতেও আমার সুখ হইবে না, এ কি অন্যায় কথা! আর শাস্ত্রই কি এই কথা বলে? শাস্ত্র কি বলে নাই যে মরণের পর নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি যেমন ধর্ম্ম, জীবনের এই পারে অভ্যুদয়লাভও তেমনি ধর্ম্মেরই ফল? আজীবন ধর্ম্মসাধনায় যদি আমাদের ইহকালই সুখেরই না হয়, তাহা হইলে একবারও কি সংশয় হয় না যে আমাদের গোড়ায় কোথায়ও গলদ রহিয়াছে? জাতি হিসাবে

আমরা জগতের মাঝে সব চেয়ে ধাম্মিক; অথচ জাতি হিসাবেই আমরা জগতে সবার লাঞ্ছিত। তাহা হইলে ধর্ম্মের ফল কি লাঞ্ছনা—না লাঞ্ছনা সহিবার মত নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষতা? এর মাঝে কোথায়ও একটা স্বতো-বিরোধ প্রচ্ছন্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই কি? হালফ্যাসানের লোক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মানে না, তাই লোকের এত দুর্গতি—এ কথাও ইহার সম্পূর্ণ জবাব নয়। এখনও ঈশ্বরানুগ্রহে দেশের পনের আনা লোক আঁধারে পড়িয়া আছে, তাহারা নব্য ফ্যাসানের ধার ধারে না, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া মানে; কিন্তু তাহাদেরই বা দুর্গতির কি সুরাহা হইয়াছে? ধর্ম্মচর্চ্চার ফলে আমাদের দেশে দুটী-চারিটী ভাস্করানন্দ-রামকৃষ্ণ-রামতীর্থই না হয় জন্মাইতেছেন; কিন্তু তাঁহারা সরিয়া গেলে পর তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না কেন? গুরুর পদ-সেবা করিবার দরুণ লোকের অভাব নাই দেখিতেছি, এবং সেটা ধর্ম্মপ্রাণতার লক্ষণ বলিয়াও অনুমান করিতে আপত্তি নাই; কিন্তু গুরুর গুরুভার কাঁধে তুলিয়া লইবার মত পদস্থ বৃষস্কন্ধের আবির্ভাব হয় না কেন? গাছ বুড়া হইয়া গেলে তাহার ফলগুলিও ঠুঁটো হইয়া পড়ে; কদাচ কখনো বা যৌবন-স্মৃতি জাগাইবার দরুণ দুটা একটা বড় ফল ধরে।—আমাদের দশাও তাহাই নয় কি? ইহাতে মনে হয় না কি যে রসের জোগানে না হউক, রসের পরিপাকশক্তিতে কোথায়ও বাধা পড়িয়াছে?

আমাদের ধর্ম্মের পুঁজি প্রচুর, অথচ তাহা আমাদিগকে কোনও ভীতি হইতেই ত্রাণ করিতেছে না। আর আমাদের রায় অনুযায়ী পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের ধর্ম্মের পুঁজি নিতান্ত স্বল্প। অথচ দেখি, গীতার বচন তাহাদের ভাগ্যেই ফলিয়া যাইতেছে, তাহাদের স্বল্প মাত্র ধর্ম্মও নিত্যই মহাভয় হইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিতেছে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে তাহাদের ধর্ম্মটুকু স্বল্প হইলেও খাঁটী এবং আমাদের ধর্ম্ম প্রচুর হইলেও মেকী! বলিতে পার, তাহারা দৃষ্ট মহাভয় হইতেই না হয় রক্ষা পাইতেছে, কিন্তু পরকালের অদৃষ্ট মহাভয় হইতে যে রক্ষা পাইবে, তাহার প্রমাণ কি? (কথাটা চুপি চুপি বলিও; কেননা এমন তর্ক শুনিলে ওই বর্ব্বরের জাত হাসিয়া খুন হইবে এবং আমাদিগকেই উলটিয়া বর্ব্বর ঠাওরাইবে।) কিন্তু আমরা তো দৃষ্ট মহাভয় হইতে রক্ষা পাইতেছিই না, অদৃষ্ট ভয় হইতেও যে রক্ষা পাইব, তাহারও বড় ভরসা পাই না—যখন দেখি, জাতীয় দুর্ব্বলতাকে প্রকট করিয়া ভক্তের কৃপায় ভগবান্ আনাচে-কানাচে গণ্ডায় গণ্ডায় অবতার-রূপ পরিগ্রহ করিয়া পরকালের রাস্তাটা একেবারে জ্যামিতিক রেখার মত সরল করিয়া তুলিয়াছেন।

মনে করিও না, আমি প্রতীচীর পক্ষ সমর্থন করিব বলিয়া ওকালতনামা লইয়া প্রাচ্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছি। আমার দরদ প্রাচীর উপরেই; প্রাচীকে ভালবাসি বলিয়াই, তাহার অতীত গৌরবের হেতু জানি বলিয়াই তাহার বর্ত্তমান তামসিকতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও দাম্ভিকতা দেখিয়া আমার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। আমি প্রতীচীর সর্ব্বনাশ কামনা করি না; সে অভ্যুদয় লাভ করিতেছে; ইহার পর এই অভ্যুদয়েরই উত্তরার্দ্ধরূপে নিঃশ্রেয়সের সন্ধান পাইয়া সে কৃতার্থ হউক। কিন্তু প্রাচীকেও আমি খাটো দেখিতে চাই না; আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া যে কেবল আজগুবি স্বপ্ন দেখিয়াই সে কাটাইবে, ইহা একেবারে অসহ্য! ভাবিতেছ, তোমরা উহাদের গুরুগিরি করিবে? কোন্ গুণে? তোমরা চিরকাল এমনি নিস্তেজ-নির্ব্বীর্য্য হইয়া ঝিমাইবে, আর রাজার জাত আসিয়া তোমাদের কাছে নতজানু হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিবে, ইহাও সম্ভব মনে কর? আলেকজাণ্ডার আর দণ্ডীর কাহিনী নজীর স্বরূপ উল্লেখ করিও না; মনে রাখিও, এই

কেরাণী-অধ্যুষিত ভারতবর্ষ পুরুর ভারতবর্ষ নয়। তবে হাঁ, আজ যদি প্রতীচীর সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, তোমাদের মতই অন্নবস্ত্রহীন নিঃসম্বল অবস্থায় ধর্ম্ম-ছাড়া অগতির গতি তাহার আর কিছু না থাকে, তবে যদি সে গলায় গামছা জড়াইয়া আসিয়া তোমা-দের শিষ্যত্ব যাচ্ঞা করে! কিন্তু এত বড় একটা শক্তিশালী জাতির এই শোচনীয় অধঃপতন কল্পনা করিয়া তাহার গুরুগিরির সম্ভাবনায় উল্লসিত হইবার হীনতাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। প্রতীচী বড় হইয়াছে—সে আরও বড় হউক; তোমরাও বড় হইয়া তাহাদিগকে ছাপাইয়া ওঠ; তারপর তাহাদের গুরুগিরি কর! জগতে তাহা হইলে সেটা একটা দেখিবার মত জিনিষ হইবে। তফাতে বসিয়া কল্পনা করিতেছ, উহাদের এত বাড় চিরকাল থাকিবে না, একদিন ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মরিবেই!—হাঁ, মরিবে বটে কিন্তু সে মরণও সূর্য্যাস্তের মত বিশ্বকে বর্ণরাগে বিচ্ছুরিত করিয়া দিবে! এখনও তাহারা মরে; সে মরণে কি দীপ্তি, কি গরিমা!—আর তোমরাও মর! যে জাতি দেহে-মনে-প্রাণে সব দিক দিয়া বড় তাহার জীবনেও যেমন গরিমা, মরণেও তেমনি; মরিয়াও সে প্রাণের পরিচয় দেয়। রাজস্থানের মেয়েরাও একদিন দেখাইয়াছিল, মরণের মাঝে কত বড় গৌরব। এই সেদিনও নেপালী বীর বলভদ্র থাপা আর তার সঙ্গীরা দেখাইয়াছিল মরণ কি করিয়া অন্তহীন প্রাণের অঞ্জলি!

ধর্ম্ম আজ প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র; সত্যকে পরখ করিয়া লইবার বীর্য্য নাই; অনেক কিছু অদৃষ্ট রহস্য পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন জানিতে পারিয়া-ছিলেন, সেই বিশ্বাসে আজ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া যাহা কিছু সব মানিয়া যাইতেছি, শক্তি নাই যে এই স্তূপীকৃত সংস্কারের একটাকেও যাচাই করিয়া লই; স্বাধীন চিন্তাশক্তি নাই, স্বাধীন কর্ম্মশক্তি নাই, চিলে কাণ লইয়া গিয়াছে শুনিয়া চিলের পেছনে পেছনে ছুটিয়া মরি; মুখে বড় বড় বুলি ঝাড়ি, অথচ একমুষ্টি পর্য্যুষিত ভোগের দরুণ শিয়াল-কুকুরের মত কাড়াকাড়ি করিতেও লজ্জা নাই!—এই তো আমাদের স্বরূপ। এমন জাতকে ভগবান্ কৃপা করিয়া যদি হাতে ধরিয়া স্বর্গের সিঁড়িতে তুলিয়া দেন তো বলিব, তাঁহার মত পক্ষপাতী আর তোষামোদপ্রিয় দুনিয়ায় দুটী নাই।

দ্বন্দ্ব-সমাহার

——):*:(——

ভালর সব দিকে ভাল। এমন ভাল হতে হবে যে কোনও দিকে আর খুঁৎ না থাকে। তার সংস্পর্শে যা আসে, তাও যেন সুন্দর হয়ে যায়।

পরশমণির সংস্পর্শে এসে লোহাও সোনায় পরিণত হয়। তখন সোনার যে কেবল বাইরে সোনার রং, তা নয়—তাকে পোড়াও, তবুও সে সোনাই থাকবে।

সিদ্ধ বস্তুর লক্ষণই ওই। তাকে যে দিক দিয়েই দেখ না কেন, এমন একটা সুসামঞ্জস্যের ভাব তার মাঝে পাবে, যার দরুণ তাকে তোমার সমগ্র ভাবে গ্রহণ করতেই হবে। অন্যত্র যা মন্দ বলে গণ্য হত, তার সংস্পর্শে এসে তাও যেন এক নূতন রসে ও ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তিক্তরস স্বভাবতই বিস্বাদ; কিন্তু ভোজের দিন সেই তেতকেই এমন ভাবে পাক করা হয় যে রসজ্ঞ ভদ্রমণ্ডলীও তার তারিফ করেন।

সিদ্ধ চরিত্রেও আমরা সময় সময় এমন একটা ভাব দেখি, যা অন্যত্র আমরা দোষের বলে গণ্য করতাম। এখানে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাকৃত মানুষ বলবে—দেবতার বেলায় লীলা খেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা! কিন্তু, কথাটা একদিকে ঠিক। তোমার আমার বেলায় দোষই ঘটে বটে। দেবতার ভোগ সর্ব্বত্রই গুরুপাক; কিন্তু তার দিকে আড়নয়নে তাকালে হবে কি? দেবতা হয়ত অক্লেশে তা পরিপাক করতে পারেন; তুমি আমি তা পারি কি? অশ্বত্থামার দারুণ ক্রোধ ব্রহ্মাস্ত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের বুকে পড়াতেই তা ফুলের মালা হয়ে গিয়েছিল। আমরা হলে তার তেজ সহ্য হত কি?

বিশ্বামিত্র মুনি বা লোকনাথ ব্রহ্মচারী ক্রোধী ছিলেন; কিন্তু সে ক্রোধ কি আমাদের মত? সে ক্রোধের ফলে আমাদের মত মহা অনর্থ ঘট্‌ত না। অপরের দৃষ্টিতে যাই হোক্ না কেন, সেখানে পরিণামে একটা মহামঙ্গল আমরা সর্ব্বত্র দেখতে পাই। অমন কুভাষা শুনেও ব্রহ্মচারিজীকে সর্ব্বদা মানুষে ঘিরে থাকতো। তাঁর অমন বকুনীটুকুই যেন সকলের কাম্য ছিল। ওই শুন্‌তেই যে কত দূরদূরান্তর থেকে তাঁর কাছে এসে মানুষ ধন্না দিয়ে থাকত।

সত্যদ্রষ্টা বা ভগবদ্‌দ্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা এতই ভাল যে তাঁদের খুঁৎগুলিও একটা বিশেষ মধুময় ভাবের উদ্রেক করে। তাঁদের বেচালে পা পড়তেই পারে না। তারা যা বলেন, তাই সত্য হয়ে যায়, কাজেই মিথ্যা বলাই হয় না। সত্য তাঁদের এমনি মজ্জাগত!

যাঁরা সাধক, বা সত্যের মাত্র এক দিক দেখেছেন, দ্বন্দ্ব আসবে তাঁদেরই। তাঁদের দৃষ্টিতে অবশ্য যা সত্য ও সুন্দর, তাই একমাত্র সাধ্য। সেই হিসাবে তাঁরা সেই বস্তু লাভের জন্যই প্রাণপণে যত্ন করেন—কিছুতেই অপরের উদ্বেগ জন্মিয়ে বা অপরের ব্যবহারে নিজে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে চান না। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে তাঁদের অজ্ঞাতসারে হয়ত কতজনকে তাঁদের ব্যবহার উদ্বিগ্ন করে আর তার প্রতিক্রিয়ায় নিজেরাও যেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

সমস্যা এইখানেই। সিদ্ধের যা স্বভাব, সাধক তাই আয়ত্ত করতে চান কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একবার হয়ত দেখেন সিদ্ধের লক্ষণ তাঁর মাঝেও ফুটছে, অর্থাৎ তিনি যেন লক্ষ্যে পৌছেছেন;—আবার হয়ত স্বভাবের এক ধাক্কাতে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত চুরমার হয়ে যায়—অথচ শত চেষ্টাতেও যেন তার প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

জগতে যাঁরা বিশেষ কোনও একটা গুণ আয়ত্ত করে বড় হতে চান, তাঁরা হয়ত অন্যান্য সব দিকে ভ্রূক্ষেপশূন্য হয়ে থাকেন, কাজেই তাঁদের দ্বারা অপরে বিরক্ত হলেও কিছু যায় আসে না—কেননা তাঁদের ঐ বিশেষ লক্ষ্যটী অক্ষত থাকলেই হল। তাই দেখা যায়, কোনও শিল্পী হয়ত চরিত্রহীন, কোনও মনীষী হয়ত রূঢ়ভাষী, কোনও বীরপুরুষ হয়ত পরপীড়ক ইত্যাদি। তাঁদের দরুণ জগতে কম অশান্তির সৃষ্টি হয় না, কিন্তু তাতে তাঁদের সিদ্ধিতে কিছু বাধা পড়ে না।

কিন্তু সত্য বা ভগবান্‌কামী যতক্ষণ পরের উদ্বেগের কারণ হতে থাকবেন, ততক্ষণ নিজে কিছুতেই শান্তি পাবেন না। তবে দেখতে হবে, তাঁর মাঝে উদ্বেগের কারণ ঘটছে কি না। এখানে সাক্ষী হবেন অন্তর্য্যামী। যাতে কোথায়ও বিন্দু মাত্র অশান্তি ঘটে এমন কিছু না করা সত্ত্বেও যদি তাঁকে কেন্দ্র করে একটা অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে দেখা যায়, তবে তার প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চাই—এবং তার পরেও যদি তা নিবারিত না হয়, তবে নির্ব্বিকার থাকা—এই হচ্ছে সাধকের লক্ষ্য।

আমার সংশ্রবে সকলের অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘট্‌ছে জেনেও নির্ব্বিকার থাকাই সিদ্ধের লক্ষণ নয়।

তা হলে সবাই সিদ্ধ হত। কেননা সকলেই প্রকৃতির প্রেরণায় আপন স্বার্থ বজায় রেখে অপরের প্রতি উদাসীন হতে চায়।

আমার সামনে যা আসবে তাতেই অটল থাকব অর্থে তাকে গ্রহণ করে নির্ব্বিকার থাকা বটে, কিন্তু সে অর্থটা কেবল ভোগের বেলাই নয়—ত্যাগের বেলায়ও। বরং ত্যাগের বেলাতেই শরীরটা খাঁটী হয় বেশী, কাজেই এই ত্যাগের দিক থেকেই প্রথম পাঠ সুরু করতে হবে। সেজন্য অন্তরে বাহিরে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় হোক—তার পরে যা থাকবে, তাই হবে খাঁটী। ঝড়ের পরে যে মুকুলগুলি অবশিষ্ট থাকে, সেগুলিই ফলে পরিণত হয়। আপনার মাঝে আগে ঝড় বইয়ে নিয়ে তার পর শান্তি বা নির্ব্বিকারের ভূমিকা। গোড়াতেই নির্ব্বিকার ভাব, তমো বা জড়ের লক্ষণ। ইটপাটকেলও তাহলে নির্ব্বিকার।

সত্যলাভেচ্ছু সাধকের এই ঝড়ের মাঝ দিয়েই পথ। এর মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় জগতের চোখে তিনি কখনও ভাল, কখনও মন্দ, কখনও উপকারক, কখনও উৎপীড়ক, কখনও শত্রু, কখনও মিত্র, কখনও ভণ্ড, কখনও সাধু হন—কিন্তু তাঁর লক্ষ্য চরম ভাল হওয়া। যেদিন লক্ষ্যে পৌছাবেন, সেদিন তিনি এমন ভাল হবেন যে তাঁর আর কোনও খুঁৎ থাকবে না—তখন তাঁর কলঙ্কও হবে শোভা, কুব্যবহারটী পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের নিদর্শন বলে লোকে গ্রহণ করবে। পরশমণির ছোঁয়াচে তখন লোহাও সোনা হয়ে যাবে। উদ্বিগ্ন করার বা উদ্বিগ্ন হওয়ার দন্দ মিটে গিয়ে সেদিনই তিনি নির্ব্বিকার দ্রষ্টার পরম আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

কিন্তু আবার বলি, আগে চাই সংগ্রাম, তারপর সন্ধি। নতুবা প্রকৃতির সঙ্গে সন্ধি করে তার অধঃ-স্রোতেই ভেসে যাব, উজান-রসিকের অনুভূতি আর ফুটবে না।

অভয়

—*—

ওরে এমনি করেই মরণ যদি হয়—
তুই করিস্‌নে সংশয়—
দেখবি যা তোর পাওনা ছিল,
চুকেছে নিশ্চয়—
তুই করিস্‌নে সংশয়।

কেন সারা দিনের নিদাঘ-দাহে জ্বলি,
তোর সাঁঝের বেলাই ভয়?
আঁধার-ঘেরা মরণ মাঝেই
দেব্‌তা জেগে রয়—
তুই করিস্‌নে সংশয়।

এ যে বেলা-শেষের ক্লান্তি শুধু—
এ তোর নয় তো পরাজয়
এমনি করে মরণ যদিই হয়,
তোরই হবে জয়;
তুই করিস্‌নে সংশয়।

হিমাচলের পথে

——):*:(——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১লা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—রোজই ভোর বেলা আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেলেও কিন্তু সমস্ত গুছিয়ে কোন দিনই ৬টার পূর্ব্বে বের হতে পারি না। রোজই সকলে উঠে প্রাতঃকৃত্য করতে করতেই চটীর সমুদয় লোক চলে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাল এত রাত্রে এসে পৌছাতে জায়গাটী ভাল করে দেখ্‌তে পারিনি, আজ সকালে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্থানটী অতি সুন্দর—তিন দিকে পাহাড় ঘেরা, এক দিক খোলা। একটী স্রোতস্বিনী পার্ব্বত্য নদী ভাগীরথীর দিকে ছুটেছে। নদীটী সামনের পাহাড়ের একটা বড় ঝরণা। ঝরণাটী কাছে পেয়ে চটীবালা তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কখনও চটীর পাশ দিয়ে, কখনও বা আবাদী জমীর উপর দিয়ে, কখনও বা বহুদূর দিয়ে জলের ধারা বইয়ে দিচ্ছে।

আজ আমরা গাড়োয়াল-রাজ্যের রাজধানী টেহরী সহরে পৌছাব। টেহরী-রাজ উত্তরাখণ্ডের তীর্থগুলির রাজা। শুনেছিলাম, টেহরীই হিমালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর; তাই সহর দেখবার ঔৎসুক্য আমাদের প্রত্যেকেরই মাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছিল।

টেহরী ৭ মাইল

আমরা ৬ টায় বের হয়ে খুব জোরে চল্‌তে লাগ্‌লাম। আমাদের দলের সবাই বেশ চল্‌তে পারেন, তার মধ্যে আমাদের কয়েকজনের তো কথাই নাই। আমাদের পূর্ব্বে যত লোক গিয়েছিল, সকলকে পিছনে ফেলে আমি ও সারদাভায়া খুব জোরে ছুট্‌তে লাগ্‌লাম। এক ঘণ্টা চড়াইর পরই চারিদিকের অগণিত পাহাড়ের মধ্যে টেহরী সহরটী যেন স্বপ্নপুরীর মত দেখতে পেলাম। অনেক বড় বড় অট্টালিকার ও কেল্লার ধরণের রাজবাড়ীর দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলাম। দূর হ'তে টেহরীর দৃশ্য অতি সুন্দর লাগে। পাহাড়ের রাস্তাগুলি ঘুরে ঘুরে যেতে হয়, কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘুরে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলাম। তখন মনে হল, যেন একটা বায়স্কোপের ছবি আমাদের সামনা হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ভাবে তিন চার বার পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে দুটি চড়াই-উৎরাই শেষ করে বেলা সাড়ে-আটটার সময় টেহরীর পাশে ভাগীরথী গঙ্গার অপর পারে পৌছলাম;—ভাগীরথী পার হলেই টেহরী। পাহাড়ের চূড়া হতে উৎরাই করার সময় দুটী রাস্তা পাওয়া যায়। একটি পাকদণ্ডী রাস্তা খাড়া উৎরাই করলেই ভাগীরথীর পারে পৌছান যায়, অপর পারেই টেহরী। আমরা এই পাকদণ্ডি রাস্তা ধরে নেমে এসেছি। পাকদণ্ডীতে উৎরাই করাও বেশ কষ্টকর—পা খুব ধরে যায়। অন্য রাস্তাটি টেহরী হতে গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী রাস্তার সঙ্গে অল্পদূরে গিয়েই মিশেছে। সে রাস্তাটি ক্রমে ঢালু হয়ে গিয়েছে, নামতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। এ রাস্তাটিতে নেমেও টেহরিতে আসা যায়, তবে আধ মাইল খানেক ঘুরতে হয়।

আমরা নীচে এসে এক খাবারওয়ালার দোকানে বসে অন্যান্য সকলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম। আমরা এমন জায়গায় বসেছিলাম, যাতে দুটী রাস্তার যে কোন রাস্তা ধরে লোক এলে দেখা যেতে পারে। সকলে একত্রে ভাগীরথীর পুল পার হয়ে সহরে পৌছে থাকার ব্যবস্থা করব, এই উদ্দেশ্যেই বসে পড়্‌লাম। কাল রাত্রে আমাদের ভাল ঘুম হয় নি, খুব বেশী পরিশ্রম হয়েছিল, এদিকে আজও সকালে ৭ মাইল চড়াই-উৎরাই করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটু বস্‌তে না বসতেই ঘুমে যেন চোখ ভেঙ্গে আস্‌তে লাগল। অগত্যা সারদা-ভায়াকে গার্ড রেখে আমি ওইখানেই শুয়ে পড়্‌লাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। সারদা-ভায়াও সিগারেট খেতে খেতে কোন্ সময়ে ঘুমের কোলে এলিয়ে পড়েছে কে জানে? এদিকে সঙ্গীরা পাকদণ্ডী রাস্তায় নেমে ভাগীরথীর ওপরের পুল পার হয়ে টেহরী গিয়ে আমাদের খুঁজ্‌ছেন। ঘণ্টা খানেক পরে ঘুম ভাঙ্গতেই চেয়ে দেখি বৃন্দাবনের বৃদ্ধা মাতাজীটী আসছেন। তিনি প্রতিদিনই সকলের শেষে এসে থাকেন। তাঁকে হাত নেড়ে ইসারা করে আমাদের কাছে ডাক্‌লাম। তিনি বল্‌লেন, আর সবাই তো অনেক আগেই চলে এসেছেন। শুনে তো হতভম্ব হয়ে পড়্‌লাম। সারদা-ভায়ার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা জানালাম। সহরে জায়গা, খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে, তাই ভাবনা হলো। কিন্তু ওরকম সহর হতে যে আধঘণ্টার মধ্যে সব লোক গুণে শেষ করা যায়, তা আমাদের পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পুল পার হতেই আমাদের সঙ্গীদের এক জায়গায় বসে থাক্‌তে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। শুধু চিদানন্দদা ও বিহারীদা বাড়ীর খোঁজে ও আমাদের খোঁজে সহরে গিয়েছেন। তাঁরা ঘুরে ঘুরে বাড়ী, ধর্ম্মশালা বা আমাদের না পেয়ে বিরক্ত হয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অগত্যা নদীর ধারে এসে একটি বট গাছের নীচে পাকের জায়গা করা গেল। পাহাড়ে এ সময় বসন্ত কাল সুরু হওয়ায় বট গাছের সমুদয় পাতা ঝরে পড়ে সবে মাত্র নূতন কুশী বের হচ্ছে। কাজেই দুপুরের প্রচণ্ড রোদে ঝালাপালা হয়ে এসে বনস্পতির ছায়া যে কত আরামে ভোগ করা গেল তা সহজেই অনুমেয়। গাছের গুঁড়িটী পূর্ব্বে বেশ বাঁধান ছিল, কিন্তু সংস্কার অভাবে এখন যা হবার তাই হয়ে গেছে। এক ফার্লং দূরে একটি ধর্ম্মশালার নীচে একজন দোকানদার একটি ঘর দখল করে ধর্ম্মশালায় কর্ত্তাত্তি করছে। ধর্ম্মশালাটী খুবই ছোট, জায়গা নাই, উপরে মাত্র তিন খানা ঘর, খুব খারাপ, তাও খালি পাওয়া গেল না, যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেছে। আর কোন ধর্ম্মশালাও নাই। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার ওরফে দোকানদারের দোকান হতে চাল ডাল প্রভৃতি নিয়ে পাক করে বেশ আনন্দে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাধা করলাম। এখানে দু' আনা সের "কাশীফল" পাওয়ায় সবাই খুসী। কাশীফল কাকে বলে জানেন? মিষ্টি কুমড়োকে এদেশে কাশীফল বলে থাকে। দেবাদিদেব শিবের একচ্ছত্র পুরী কাশীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই অন্নে পূর্ণ। শুধু শুধু অন্ন গলাধঃকরণ তাঁর ভক্তবৃন্দের পক্ষে বড়ই অসুবিধার কারণ; তার সঙ্গে তরকারীরও দরকার। বৎসরের সব সময়ে সুলভে ভক্তবৃন্দের উদর পূর্ত্তির জন্য নাকি অন্নপূর্ণার আগ্রহে ও প্রার্থনায় শিবজী কাশীতে সর্ব্বপ্রথমে এই ফল সৃষ্টি করেছিলেন। তাই এর নাম কাশীফল।

হিমালয়ের প্রত্যেক সহরেই জলের বড় কষ্ট। এ পথের যাত্রীদের সহরে না থাকাই সব চেয়ে ভাল। সহরে অন্যান্য জিনিষ সুলভে পাওয়া গেলেও জলের কষ্ট ভোগ করতেই হবে। তবে যাঁরা "এক লোটা পানীতেই" শৌচ হতে সুরু করে, দাঁত মাজা, মুখ হাত পা ধোয়া, পাক করা ও বাসন মাজা পর্য্যন্ত সেরে নিতে পারেন, তাঁরা স্বচ্ছন্দে সহরে থাক্‌তে পারেন। এক লোটা জলে সব কাজ করতে পারেন, এমন সংযমী মহাপুরুষের সঙ্গে আমাদের অনেক বার দেখা হয়েছে। আমরা ভাগীরথী গঙ্গার পারে জায়গা নিলেও গঙ্গায় নামা ও ওঠা এবং জল তুলে পাক করা যে কি ব্যাপার তা বুঝে নিয়েছি। সমতল ভূমিতে ৩।৪ মাইল হেঁটে এলে যতটা কষ্ট না হয়, এক বার জল আনার জন্য ভাগীরথীতে নামা-ওঠা করলেই তার চেয়ে বেশী কষ্ট হয়। আজ কাল ভাগীরথীতেও

প্রচণ্ড স্রোত। যাঁরা হরিদ্বারে গঙ্গার স্রোত দেখেছেন এখানকার স্রোতের বিষয় তাঁরা ধারণা করতে পারবেন না। হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়ে বোধ হয় এদিকে ভাগীরথী ২০ গুণ খরস্রোতা। জলে নেমে স্নান করবার উপায় মোটেই নাই, সামান্য পদস্খলন হলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। আর সে জলও বরফের চেয়ে যেন ঠাণ্ডা। আজ-কাল পাহাড়ে অত্যধিক বৃষ্টির জন্য জল খুবই ঘোলা। চটির পাশে যে সব ঝরণা থাকে, তার জল কিন্তু এর বিপরীত। সে জল শীতল বটে, কিন্তু তাতে দাঁত কনকন করে না, শরীর শিউরে ওঠে না, সে জল কাক চক্ষুর মত নির্ম্মল। ভাগীরথীর জলের চেয়ে ঝরণার জল পরিষ্কার, শীতল ও কীটাণুবর্জ্জিত। ভাগিরথীর জল বর্ষার সময় খারাপ হলেও অন্য সময় কিন্তু অতি চমৎকার। টেহরীর এক মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে একটি মাত্র ঝরণা আছে, এ ছাড়া অন্য কোন দিকে নিকটে ঝরণা নাই। ঐ ঝরণার জল নালা কেটে টেহরিতে আনা হয়েছে এবং পাম্প করে রাজবাড়ীতে জোগান হচ্ছে, সে জল সাধারণের ব্যবহারের কোন উপায় নাই।

গাড়োয়াল অতি পুরাতন রাজ্য। বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মহাভারত, প্রভৃতি পৌরাণিক শাস্ত্রসমূহে গাড়োয়াল জেলাকেই ভূ-স্বর্গ বলে।

টেহরীর উৎপত্তির ইতিহাস

টেহরীর বর্ত্তমান রাজবংশ আপনাদিগকে রাজা শালিবাহনের বংশধর বলে গর্ব অনুভব করে থাকেন। আজও এই স্বর্গভূমি হিন্দু রাজার অধীনে পুরাকালের প্রথানুসারেই শাসিত হয়ে আসছে। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর সা লোদী গাড়োয়াল রাজ্য পরিদর্শন করতে এসে, গাড়োয়ালরাজের অতিথিসৎকারে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তদানীন্তন রাজা বলভদ্রজীকে “সাহা” উপাধিতে ভূষিত করে যান। সেই হতে আজ পর্য্যন্ত গাড়োয়াল রাজাগণ “সাহা” উপাধি গ্রহণ করে আসছেন। বলভদ্র সাহার পর মান সাহা, শম সাহা, দুলারাম সাহা রাজত্ব করেন। দুলারাম সাহের রাজত্বকালে নিকটবর্ত্তী কুমাউনরাজ রুদ্র চাঁদের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। রুদ্র চাঁদের মৃত্যুর পর, পুত্র লক্ষ্মীচাঁদ সাতবার গাড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করে, তদানীন্তন রাজা মহীপৎ সাহার নিকট প্রত্যেক বারই পরাজিত হন। শম সাহার রাজত্বের পর কয়েক জন রাজার নাম পাওয়া যায় না। পরে দুলারাম সাহার রাজত্ব কালে উপরোক্ত ঘটনা ঘটে। তখন এঁদের রাজধানী ছিল দেওলগড়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহীপৎ সাহা দেওলগড় হতে রাজধানী শ্রীনগরে স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে সাহ রাজাদিগের সহিত আলমোরার চাঁদ রাজবংশের বিবাদ আরম্ভ হয়। ফলে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে আলমোরার রাজা জগৎ চাঁদ শ্রীনগর হতে সাহা রাজাদিগকে দূর করে দিলেও, তাঁর পুত্র প্রদীপ সাহা পৈত্রিক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট শাহজাহান গাড়োয়ালরাজ পৃথ্বী সাহের নিকট হতে “দূন” (দেরাদুন) কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদীপ সাহা পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করে মুসলমানদের কবল হতে “দূন” পুনরুদ্ধার করেন। মোগলের প্রতাপে সমুদয় ভারত তখন হৃতসর্ব্বস্ব হলেও গাড়োয়ালরাজ মোগলরাজকে কোন ক্রমেই কর প্রদান করেন নি; মোগলরাজগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেও প্রকৃতির রম্য নিকেতন,—হিন্দুর এই স্বর্গভূমি-সাধনভূমি জয় করতে পারেন নি। জনপ্রবাদ আছে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, আকবর সাহা গাড়োয়াল রাজের নিকট তাঁর রাজ্যের একটি মানচিত্র চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তদানীন্তন গাড়োয়ালরাজ আকবরের কাছে একটি জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন উট পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন,—এই হচ্ছে গাড়োয়ালরাজ্যের মানচিত্র। এই ব্যাপারের পর

আকবর সাহা গাড়োয়াল আক্রমণের আশা ত্যাগ করেন।

গাড়োয়াল রাজাকে অনবরত কুমাউন ও নেপাল রাজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাক্‌তে হত। রাজা প্রধামন সাহার রাজত্বকালে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নেপাল-রাজ অমর সিংহ থাপা প্রমুখ সেনানীগণের সহায়তায় গুর্খা সৈন্য সহ গাড়োয়াল আক্রমণ করে জয় করে নেন। সেই সময় প্রধামন সাহা ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা অশুভ লক্ষণ দেখে ও রাজপুরোহিতদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে, নেপালরাজকে কোন প্রকার বাধা না দিয়েই "যঃ পলায়তিঃ স জীবতি" বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন ও লোকজন সহ সেন্ধোরার রাজার শরণাপন্ন হন। সেন্ধোরার রাজার সাহায্যে রাজ্য পুনরুদ্ধার কর্‌তে চেষ্টা করেও অকৃতকার্য্য হয়ে, প্রধামন সাহা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলে তাঁর পুত্র সুদর্শন সাহা ইংরেজ রাজত্বে পলায়ন করে ইংরেজের শরণাপন্ন হন। নেপালরাজ অমর সিংহ গাড়োয়াল অধিকার করে, শ্রীনগরে রাজধানী স্থাপন করতঃ কঠোর ভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি গাড়োয়াল রাজ্য অধিকার করে ক্ষান্ত না হয়ে ব্রিটিশ অধিকারেও হস্তক্ষেপ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত গুর্খাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লর্ড হেষ্টিংস গুর্খাদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে গাড়োয়াল রাজ্য হতে তাদের বিতাড়িত করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হলে সুদর্শন সাহা বর্ত্তমান টেহরী রাজ্য ইংরেজের নিকট হতে ফিরে পান। সেই সময় সন্ধির সর্ত্তানুসারে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ সমুদয় পাহাড় ইংরেজের অধিকারে আসে এবং অলকনন্দার পশ্চিম পার গাড়োয়াল-রাজের অধীনে থাকে। এই সর্ত্তানুসারে শ্রীনগর বৃটিস্ অধিকারে পড়ায়, বাধ্য হয়ে গাড়োয়াল রাজ রাজধানী শ্রীনগর হতে স্থানান্তরিত করে বর্ত্তমান টেহরীতে স্থাপন করেন।

গত সিপাহী-যুদ্ধের সময় সুদর্শন সাহা ইংরেজের বিশেষ সহায়তা করে, অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করলে ইংরেজরাজ তদীয় বংশজ ভবানী সাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করার পর তদীয় পুত্র প্রতাপ সাহা রাজা হয়ে সুশৃঙ্খলরূপে রাজত্ব পরিচালন করে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী রাজা কীর্ত্তি সাহা K. C. S. I., ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাজগদী প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুত নরেন্দ্র সাহা বাহাদুর রাজপুতনান্তর্গত আজমীরের মেও কলেজে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ক্যাপ্টেন উপাধি লাভ করেন।

বর্ত্তমান রাজা নরেন্দ্র সাহার পিতা কীর্ত্তি সাহা ১৩ বৎসর হল দেহত্যাগ করেছেন। কীর্ত্তি সাহা অতি সদাশয়, সাধন-ভজনশীল, সদাচারী, প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নী মহারাণী গুলেরিয়াও সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর অনুরূপ ছিলেন। মাত্র ছয় মাস হল তিনি দেহত্যাগ করেছেন। মহারাণী গুলেরিয়া এখানে ১২৯৯ (বিক্রম সম্বত ১৯৪৯) সনে শ্রীশ্রীবদরী নারায়ণ দেবের মন্দির স্থাপন করে, কাছেই একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা স্থাপন করেছেন। তাঁর জীবিত কালে নিয়ম ছিল, যে কোন অতিথি সেই ধর্ম্মশালায় ও মন্দিরে আহার পাবে। তিনি দেহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে অতিথিরা আহার তো পায়ই না, অধিকন্তু থাক্‌বার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত তাদের দেওয়া হয় না।

(ক্রমশঃ)

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

রুচির পরিবর্ত্তন দেখেও তো বুঝ্তে পারি, চঞ্চলতার মাঝেও মন এমন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যিনি অচঞ্চল—শান্ত। প্রকৃতি চঞ্চল কেন?—পুরুষের কোন সীমা পাচ্ছে না বলে। অসীমের পেছনে এমনি করে সসীম অফুরন্ত ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটছে; কিন্তু তাঁকে পাওয়ারও শেষ হল না, আর ব্যাকুলতাও অন্ত হল না। রাধা যে চিরকাল বিরহ-বেদনায় উন্মাদিনী, তার মর্ম্মও এই—শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েও তাঁর পাওয়া হয়নি।

* * *

জানি না—এই আমার গৌরব। এ তো শুধু মিথ্যা দৈন্যের উচ্ছ্বাস নয়—দুর্ব্বল প্রাণের স্তিমিত-আবেগ নয়—সত্যি সত্যি যখন আমরা জানি না বলে বিনীত হয়ে চলি, তখনই দেখি তাঁর দান চাওয়া না-চাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই সব দিক থেকে এসে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে তুল্‌ছে।

* * *

বেদনা দিয়ে বুঝি, একজন আমার পানে সর্ব্বদা স্নেহ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যখন তাঁকে অস্বীকার করি, পূজার আসনে না বসিয়ে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে থাকি, তখন যে আমিই মুস্‌ড়ে পড়ি। অঙ্গহানি হল বলে এই যে প্রাণের নিদারুণ জ্বালা—এতেই তো প্রমাণ হয় তিনি আছেন। আমি যাকে ভালবাসি, তিনি তো আমায় তুলে ধর্‌বেন। পড়ে যাচ্ছি দেখছে, তবু সহায়তা কর্‌ছে না—সে তো আমার আপন নয়। নিশ্চয়ই কেউ আমাকে ওপর থেকে স্নেহ-আকর্ষণে টান্‌ছে, তা না হলে প্রবৃত্তির পথ হতে নিবৃত্তির পথে ফিরছি কেমন করে?

মন হচ্ছে দ্বি কোটিক। এই মনই বলে চুরি কর, আবার মনই বলে সাধু হও। কেন যে মনে অসৎ ভাব জাগে, আবার পরক্ষণেই কেন সত্যের অনুভূতিতে চিত্ত উদ্দীপিত হয়ে ওঠে—এর জবাব দেবে কে? তবে দেখছি, যে মন আমায় একবার বিষয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ কর্‌ছে, আবার সে মনই বিদ্রোহী হয়ে সত্যের দিকে তীব্র পিপাসা জাগিয়ে তুল্‌ছে। সুতরাং "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্"—এই হচ্ছে উদ্‌গাতার বাণী।

* * *

কথা যখন অপরের প্রাণকে স্পর্শ কর্‌বে, তখনই বুঝ্‌বে তুমি যা ভাব্‌ছ তা কল্পনা নয়; সত্য রয়েছে তার মাঝে। খাঁটী বলেই একজনের কথা অপরের প্রাণে এমন করে লেগে যায়। আর মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে যে যোগ রয়েছে, এইখানেই তো তার প্রমাণ। কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থেকে, তোমার চিত্ত যতই ব্যাপক হতে থাক্‌বে, অপরের মন ততই তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে।—সত্যের আকর্ষণে তারা আপনি ছুটে আস্‌বে তখন, দুটী প্রাণের কথা শুন্‌তে পাবে বলে। তাই বলি, আয়োজনের আড়ম্বরে কোন প্রয়োজন নেই, সত্য লাভ কর্‌ব এই পিপাসা নিয়ে সাধনায় বসে গেলেই হল।

* * *

নির্জীব বৈরাগ্য দুর্ব্বলের ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র—এ নিয়ে বড়াই করা চলে না। বৈরাগ্য হচ্ছে একটা একটানা আবেগের স্রোত, তাতে পথে পথে বিশ্রামের ফিকির নেই। লক্ষ্যে না পৌছান পর্য্যন্ত এই যে মনের একমুখী আকুলতা, এই হচ্ছে সাধনার ভিত্তি।

দানপ্রাপ্তি

সারস্বত মঠে—

(অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১০॥০ শ্রীবিন্দুচরণ দাস ১০৲ শ্রীসচ্চিদানন্দ সাহা ১০৲ শ্রীগোবর্দ্ধন কুণ্ডু ৫৲ শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার ৫৲ শ্রীনীহাররঞ্জন নন্দী ৫৲ উচালন ভক্তসঙ্ঘ ৬৷০ শ্রীঅন্নদাচরণ মাইতি ৪৸৵০ শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ৪৲ শ্রীজয়ন্তকুমার ঘোষ ৩৲ শ্রীকামেশরঞ্জন পাল সংগৃহীত ২৷০ শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় ২॥০ শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ ২৲ শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ ২৲ শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী ২৲ শ্রীশম্ভুনাথ দাস দালাল ২৲ শ্রীপ্রফুল্লকুমার ২৲ শ্রীবিহারীমোহন শর্ম্মা ২৲ শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখো ২৲ শ্রীমধুসূদন বন্দ্যো ২৲ শ্রীমহেন্দ্র মাইতি ২৲ শ্রীমন্মথ বসু ২৲ শ্রীসুহাসিনী দেবী ২৲ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতি ২৲ শ্রীভীমাচরণ বসু ২ শ্রীনর্ম্মদাকুমার সেন ২৲ শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় ১॥০ শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যো ১৲ শ্রীকুমুদিনীকান্ত সাহা ১৲ শ্রীননীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৲ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পূততুণ্ড ১৲ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ১৲ শ্রীরাধানাথ দে ১৲ শ্রীহরপ্রসাদ রায় ১৲ শ্রীআশুতোষ রায় ১৲ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস ১৲ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ১৲ শ্রীবিপিনবিহারী কর ১৲ শ্রীরমেশচন্দ্র মণ্ডল ১৲ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখো ১৲ শ্রীকৈলাসচন্দ্র দাস ১৲ শ্রীনলিনীকান্ত মুখো ১৲ শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় ১৲ শ্রীনারায়ণদাস নন্দী ১৲ শ্রীনৃসিংহপদ পাল ১৲ শ্রীশ্যামাচরণ সিংহ ॥০ শ্রীগিরীশচন্দ্র নন্দী ॥০ শ্রীমানদাসুন্দরী দত্ত ॥০ শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখো ॥০ শ্রীঅমূল্যকুমার দাস ॥০ শ্রীঅমরনাথ মণ্ডল ॥০ শ্রীগুরুচরণ দাস ।০ শ্রীকেনারাম মণ্ডল ।০ শ্রীননীগোপাল মাইতি ।০ শ্রীজন্মেজয় দাস ।০ শ্রীহারাধন ।০ শ্রীবামাচরণ ।০ শ্রীত্রিলোচনী ।০ শ্রীবিদ্যাসুন্দরী ।০ ।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে—

রোসাংগিরি—শ্রীবরদাচরণ সরকার ১৲ শ্রীশ্যামাচরণ মল্লিক ২৲ শ্রীঅতুলচন্দ্র বিশ্বাস ২৲ শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ২৲ **মেখল**—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বণিক ১৲ শ্রীরাসবিহারী চৌধুরী ২৲ শ্রীপ্রাণহরি আচার্য্য ৪৲ শ্রীবংশীমোহন আচার্য্য ২৲ শ্রীমনোমোহন বণিক ১৲ শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲ শ্রীদীনবন্ধু বল ২৲ **শ্রীহট্ট**

পুকুরপার—শ্রীব্রজবাসী কুরি ৫৲ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কুরি ৩৲ শ্রীনিদানচন্দ্র কুরি ১৲ শ্রীবনবিহারী কুরি ১৲ শ্রীরমেশচন্দ্র কুরি ২৲ শ্রীযোগেন্দ্রলাল কুরি ২৲ শ্রীশ্রীনন্দন কুরি ১৲ শ্রীইন্দ্রমোহন কুরি ২৲ শ্রীযদুনাথ কুরি ২৲ শ্রীদয়ালচাঁদ কুরি ১৲ শ্রীসত্যবান কুরি ॥০ শ্রীঅভয়চরণ কুরি ॥০ শ্রীগুরুদাস কুরি ১৲ শ্রীসতীশচন্দ্র কুরি ১৲ (২)শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কুরি ১৲ **শ্রীহট্ট**—শ্রীরাইমোহন কুরি ১৲ শ্রীরাজেন্দ্রলাল কুরি ১৲ শ্রীকৃপাসিন্ধু কুরি ১৲ শ্রীজ্যোতিন্দ্রলাল কুরি ১৲ শ্রীহীরালাল কুরি ৯৲ (২) শ্রীরমেশচন্দ্র কুরি ২৲ শ্রীনারদচন্দ্র কুরি ১৲ শ্রীব্যাসলাল কুরি ১৲ শ্রীযশোদানন্দ কুরি ১৲ শ্রীরাসবিহারী কুরি ৩৲ শ্রীরজনীকান্ত কুরি ২৲ শ্রীঅদ্বৈতচরণ কুরি ৩৲ শ্রীঅতুলচন্দ্র কুরি ১৲ শ্রীকিশোরীমোহন কুরি ১৲ শ্রীনবকুমার কুরি ১৲ শ্রীদিগেন্দ্রলাল কুরি ২৲ শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র কুরি ২৲ শ্রীবংশীনাথ কুরি ১৲ শ্রীকৃষ্ণধন কুরি ৬৲ শ্রীনরেন্দ্রলাল কুরি ১৲ শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র কুরি ৬৲ শ্রীরাজমোহন কুরি ২৲ । **দমদমা**—শ্রীকালীকুমার কর্ম্মকার ৫৲ শ্রীপ্রসন্নকুমার কর্ম্মকার ৫৲ শ্রীবিধুভূষণ কর্ম্মকার ১০৲ শ্রীঅখিলচন্দ্র কর্ম্মকার ২০৲ শ্রীপ্রমদাকান্ত কর্ম্মকার ৫৲ শ্রীসরমাসুন্দরী কর্ম্মকার ২৲ শ্রীদুর্গাকুমার কর্ম্মকার ২৲ শ্রীকুঞ্জভূষণ কর্ম্মকার ১৲ শ্রীঅখিলচন্দ্র কর্ম্মকার ৩৲ শ্রীচিন্তাহরণ কর্ম্মকার ৫৲ **মখাদিয়া**—শ্রীজানকী নাথ ৮৲ শ্রীনকুলচন্দ্র নাথ ৩৲ । **সাহেরআলী**—শ্রীগগনচন্দ্র জলদান ২৲ ।

ওয়াহেদপুর—শ্রীবাণীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲ শ্রীজ্ঞানদাকুমার পাল ১৲ শ্রীশরৎচন্দ্র পাল ১০৲ শ্রীবাশীচন্দ্র মালী ১৲ শ্রীকুঞ্জবিহারী মালী ১৶ শ্রীমতী নয়ন তারা ৫৲ **গোবনীয়া**—শ্রীতরণীকান্ত পাল ৫৲ শ্রীনবীনচন্দ্র দে ৫৲ শ্রীশশীভূষণ দে ৪৲ শ্রীঅখিলচন্দ্র দে ৩৲ **আবুভরপ**—শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ ৫০৲ শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী ১০৲ **ভুলাবাড়িয়া**—শ্রীনবীনচন্দ্র পাল ২৲ শ্রীকামিনীসুন্দরী পাল ২৲ **সন্দ্বীপ**—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲ শ্রীসুরেন্দ্র ঘোষ ১৲ শ্রীপ্রসন্ন বল ৩৲ শ্রীকৃষ্ণমোহন বল ৩০৲ শ্রীসতীশচন্দ্র বল ৩৲ শ্রীরমেশচন্দ্র গুহ ৫৲ শ্রীমহেন্দ্র দে ১৲ শ্রীমহেন্দ্র বানার্জ্জি ১৫৲ শ্রীচন্দ্র-

মোহন দাস ৫৲। **কাজিরখিলা**—ঈশানচন্দ্র ঘোষ দুই টাকা।

পশ্চিম-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে—

শ্রীনারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৲ শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ ১৲ শ্রীষষ্ঠীচরণ রায় ॥৹ শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় ১৲ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গণ ॥৹ শ্রীনারায়ণচন্দ্র গণ ১৲ শ্রীসত্যকিঙ্কর গণ ॥৹ শ্রীঅমূল্যচরণ পাত্র ॥৹ শ্রীশশীভূষণ পাল ১৲ শ্রীসারদাপ্রসাদ দে ১৲ শ্রীআশুতোষ পাল ১৲ শ্রীযুগল লায়েক ১৲ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ পাল ১৲ শ্রীআশুতোষ মণ্ডল ॥৹ শ্রীসূর্য্যকুমার মণ্ডল ॥৹ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲ শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥৹ শ্রীউপেন্দ্রনাথ নন্দী ॥৹ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲ শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস ॥৹ শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী ১৲ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৲ শ্রীরামনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲ শ্রীআশুতোষ চৌধুরী ১৲ শ্রীশচীপতি ব্যানার্জ্জী ১৲ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় ॥৹।

জেঃ **সিংভূম**—গ্রাম ভাণ্ডারসোল—শ্রীপ্রসন্নকুমার ধরা ৩৲ শ্রীকাশীনাথ জানা ২৲ শ্রীজন্মেজয় জানা ১৲ গ্রাঃ **ভিলো**—শ্রীসীতানাথ রাইতদিঃ ২॥৹ গ্রাঃ **কেসার্দ্দা**—শ্রীরঘুনাথ গিরি ও শ্রীমধু গিরি ২৲ শ্রীকৈলাসচন্দ্র বাসুরী ৩৲ শ্রীহৃদয়নাথ কুইলা ২৲ শ্রীদীনবন্ধু গিরি ১৲ শ্রীনিবাস বেরা ১৲ শ্রীহৃদয়ানন্দ গিরি ১॥৹ শ্রীনিত্যানন্দ গিরি ২৲ গ্রাঃ **মাদলা**—শ্রীদ্বারীকানাথ গিরি ও শ্রীবাসু গিরি ২৲ গ্রাঃ **বাঘরাচূড়া**—শ্রীভানু মাইতি ২৲ শ্রীজট ও ঈশ্বর মাইতি ১॥৹ শ্রীভাগিরথী মিশ্র ১৲ শ্রীচিন্তামণি উপাধ্যায় ১৲ গ্রাঃ **গুহিয়াপাল**—শ্রীরামচন্দ্র পাণ্ডা ৩৲ শ্রীরঘুনাথ মিশ্র ১৲ শ্রীকালীচরণ পাণ্ডা ১৲ শ্রীভোলা নাথ পাণ্ডা ১৲ শ্রীকালীচরণ উপাধ্যায় ১৲ শ্রীভাগিরথী পাণ্ডা ১৲ শ্রীদীনবন্ধু পাণ্ডা ॥৹ শ্রীমন্দোদরী দেব্যা ২৲ গ্রাঃ **কেন্দুয়াপাল**—শ্রীনন্দবেরা ও উদ্ধবেরা ২৲ গ্রাঃ **জানুনী**—শ্রীভোলানাথ মিশ্র ১৲ শ্রীমহেশ্বর মিশ্র ১৲ গ্রাঃ **আঙ্গারপাড়া**—শ্রীনাড়ু রাউত ১৲ গ্রাঃ **মাকরী**—শ্রীভগবান সাউ ৩৲ গ্রাঃ **রতিলা**—শ্রীসদাশিব উপাধ্যায় ১৲ শ্রীমার্কণ্ড করণ ৫৲ শ্রীদয়ানিধি করণ ৫৲ শ্রীরামচন্দ্র পাল ৫৲ গ্রাঃ **ভুরসাল** শ্রীত্রৈলোক্য নায়েক এক টাকা শ্রীভজহরি নায়েক এক টাকা শ্রীনক্ষত্রমোহন সাউ পাঁচসিকা ডাঃ আকুলচন্দ্র পলাই দুই টাকা গ্রাঃ **মধুয়াবেড়া**—শ্রীপুরুষোত্তম জানা পাঁচ টাকা গ্রাঃ **বাসডোল**—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ এক টাকা শ্রীপরমেশ্বর ঘোষ দুই টাকা শ্রীক্ষেত্র মোহন সাউ এক টাকা শ্রীঅজম্বর সাউ এক টাকা শ্রীভগবান ঘোষ এক টাকা গ্রাঃ **মিঠাপুরা**—শ্রীঅখিলচন্দ্র চৌধুরী দেড় টাকা শ্রীশ্রীনিবাস মিশ্র এক টাকা গ্রাঃ **মোহনপুর**—শ্রীনিত্যানন্দ সাউ এক টাকা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ওজা চারি টাকা শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন এক টাকা শ্রীশশীভূষণ সাউ এক টাকা শ্রীবিশ্বম্ভর সাউ এক টাকা গ্রাঃ **উইন্দালা**—শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল পাঁচ টাকা শ্রীনটবর অধিকারী দুই টাকা শ্রীগোবর্দ্ধন পাল দুই টাকা শ্রীবল্লভচন্দ্র পাল এক টাকা শ্রীপ্রভাকর দে দুই টাকা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পট্টনায়েক এক টাকা শ্রীলছমন সাউ এক টাকা শ্রীপুরুষোত্তম আতিবাই এক টাকা।

সূচী

আর্য্যদর্পণের নিয়মাবলী

আর্য্যদর্পণে সাধারণতঃ ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা মাত্র, নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও বর্ষারম্ভ হইতে পত্রিকা লইতে হয়।

আর্য্যদর্পণ প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও মাসের পত্রিকা যথাসময়ে না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক-বিভাগের উত্তরসহ পরবর্ত্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে জানাইলে সেই সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

পত্র ব্যবহারকালে গ্রাহক নম্বর না দিলে কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় না। গ্রাহক নম্বর পত্রিকার মোড়কের উপর হাতের অক্ষরে লেখা থাকে।

আর্য্যদর্পণে লেখকের নাম প্রকাশ হয় না, সুতরাং সমস্ত লেখাই সম্পাদকের দায়িত্বে প্রকাশিত হয়। এ জন্য প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। টিকিট ও শিরোনামাযুক্ত খাম দিলে অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয়।

টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়পত্রাদি নিম্ন-ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

☞ "আর্য্য-দর্পণ"-কার্য্যালয়—পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)

ঋষি-বিদ্যালয়

ঋষিনির্দ্দিষ্ট পন্থায় জাতীয় শিক্ষার আদর্শ পুনঃ-প্রচারকল্পে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। আশ্রমে উৎসর্গীকৃত ছাত্রদিগের ব্যয়ভার আশ্রমই বহন করেন। অপরের জন্য মাসিক খরচ ১০৲ টাকা। ৭ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের বালককেই গ্রহণ করা হয়। অন্যূন ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট কাল। ইহার পূর্ব্বে কোনও ছাত্রই আশ্রমসংস্রব ত্যাগ করিতে পারিবে না। উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ঋষিশাস্ত্রই প্রধানতঃ অধ্যাপনার বিষয়। মাতৃভাষা ও ইংরেজী এবং প্রাথমিক হিসাবে লৌকিক শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। স্বাবলম্বন লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সংযম ও তপস্যার ভিত্তির উপর ছাত্রের মনুষ্যত্ব গঠিত করিয়া তোলাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। নিম্নের যে কোনও ঠিকানায় আবেদন করুন।

☞ অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয়, সারস্বত মঠ
পোঃ কোকিলামুখ [যোরহাট]

অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয় মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
পোঃ—জয়দেবপুর [ঢাকা]

অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয় উত্তর-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
পোঃ—বগুড়া

পর্জ্জন্যঃ কনিক্রদৎ

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৫।৬।১১

[ভৌমোঽত্রিঃ—পর্জ্জন্যঃ—ত্রিষ্টুপ্ দ্বিতীয়াদিতিস্রো জগত্যো নরম্যনুষ্টুপ্]

অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ
স্তুহি পর্জন্যং নমসা বিবাস।
কনিক্রদদ্ বৃষভো জীরদানূ
রেতো দধাত্যোষধীষু গর্ভম্॥

বি বৃক্ষান্ হন্ত্যুত হন্তি রক্ষসো
বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবতো
যৎ পর্জ্জন্যো স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ॥

পর্জ্জন্যেরে দাও ডাক—রচ অভিনন্দন,
স্তুতি গাও, পরিচর, কর বীরে বন্দন!
ঢালে ধারা ঝর্ঝর্, বৃষ হেন গর্জ্জে—
ওষধিতে দেয় বীজ—নবরূপ সর্জ্জে!

বৃক্ষেরে হানে বাজ, আরো হানে রক্ষে—
বিশ্ব এ মহাবধ হেরে ভীত-চক্ষে!
সাধুও যে সরে যায় হেরি ঘন-বর্ষণ,
ঘোররবে করে যবে অসাধুরে ধর্ষণ।

রথীব কশয়া অশ্বাঁ অভিক্ষিপন্
আবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
যৎ পর্জ্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥

রথী হেন কশা-ঘায় খেদাড়িয়া অশ্বে,
নিয়ে আসে তার দূত—যারা মেঘ বর্ষে!
দূর হতে সিংহের শুনি যেন গর্জ্জন,
ধারাসারে যবে করে আকাশেরে তর্জ্জন।

দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং
প্রপিন্বত বৃষ্ণো অশ্বস্য ধারাঃ।
অর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনে হি অপো
নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ॥

দাও—দাও—হে মরুৎ, দ্যুলোকের বৃষ্টি!
ঝর্ঝর্ ঝরি ধারা ভেসে যাক্ সৃষ্টি!
নেমে এসো গরজি, আনো মহাহর্ষ!
পিতা তুমি, হে অসুর—যত খুসী বর্ষ!

প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত
উদোষধীর্জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে
যৎ পর্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাবতি॥

এলোমেলো বয় ঝড়—বিজলীও চঞ্চল;
অঙ্কুরে ওষধী—সুরলোক টলমল্!
নিখিলের তরে ইরা জনমে যে হর্ষে—
যবে তার রেতোধার ধরাপরে বর্ষে।

অভিক্রন্দ স্তনয় গর্ভমাধা
উদন্বতা পরিদীয়া রথেন।
দৃতিং সুকর্ষ বিষিতং ন্যঞ্চং
সমা ভবন্তু উদ্বতো নিপাদাঃ॥

হানো বাজ—দাও বীজ গরজিয়া বারবার,
উদকের রথে চড়ি ঘুরে ফির চারধার।
খুলে রাখ মষকের নীচু-মুখ হর্দম—
ভেসে যাক্ গিরি-দরী—হোক্ সব কর্দম!

যস্য ব্রতে পৃথিবী নন্নমীতি
যস্য ব্রতে শফবজ্জুর্ভুরীতি।
যস্য ব্রত ওষধী বিশ্বরূপাঃ
স নঃ পর্জ্জন্য মহি শর্ম্ম যচ্ছ॥

তারি অনুশাসনে নুয়ে পড়ে বিশ্ব;
চরে ফিরে পশুরা; নব নব দৃশ্য
রচে যত ওষধী; আনত এ চিত্ত
তারি অনুশাসনে;—চাহি সুখ নিত্য!

মহান্তং কোশমুদচা নি ষিঞ্চ
স্যন্দন্তাং কুল্যা বিষিতাঃ পুরস্তাৎ।
ঘৃতেন দ্যাবা পৃথিবীং ব্যুন্ধি
সু প্রপাণং ভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ॥

খোল মুখ মষকের—বয়ে যাক্ বন্যা
তটিনীর ছাপি কূল—ধরা হবে ধন্যা!
ঘৃত-সেকে রোদসীর তনু কর ক্লিন্ন—
পাবে জল পশুদল পিপাসায় খিন্ন।

যৎ পর্জ্জন্যঃ কনিক্রদৎ
স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ।
প্রতীদং বিশ্বং মোদতে
যৎ কিঞ্চ পৃথিব্যামধি॥

পর্জ্জন্য যে গর্জ্জি ধায়,
দুষ্টে পাড়ে বজ্র-ঘায়,
আনন্দিত বিশ্ব তায়—
আর যা কিছু রয় ধরায়!

অবর্ষীর্ বর্ষমুদু ষূ গৃভায়
অকর্ ধন্বান্যত্যেতবা উ।
অজীজন ওষধীর্ভোজনায়
কমুত প্রজাভ্যো বিদো
মনীষাম্॥

থামো—থামো—আর কত বর্ষো ঝম্-ঝম্!
মরুভূমে হলো চল্ পথ যা দুর্গম।
ওষধিরে দিলে রূপ—বিশ্ব-ভোগ তায়;
মানুষের মনীষা যে লুটলো ওই পায়!

বর্ষণে

—*—

আমরা মানুষ, এই অহঙ্কারে নিখিল প্রকৃতি হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। যে বুদ্ধির রচনা একান্ত বিবিক্ত, বিশ্বের সহিত যাহার রসে রূপে সুরে কোনও যোগই নাই, অহমিকার সেই উদ্‌ভ্রান্ত আয়তনের মাঝে নিজকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমরা দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছি। নিদারুণ পিপাসায় কণ্ঠ জ্বলিয়া যাইতেছে, তবুও ভাবিতেছি, আমরা মানুষ, অতএব বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়, সহজকে আমরা মানিব না, নীরস কৌটিল্যই আমাদের জীবনের একমাত্র অর্থ—

দেখিতেছি, নিদাঘের দাহই এ জীবনে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠে। বসন্ত কবে আসে—মলয়ের নিঃশ্বাসে সুরভি ছড়াইয়া, কিসলয়ের শ্যামারুণ উত্তরী দোলাইয়া কবে যে এই কর্ম্মশালার দুয়ারে একবার উঁকি দিয়া চলিয়া যায়, তাহা জানিতেই পারি না। তরু-পল্লবে শ্যামল ছন্দে তাহার আগমনী বাজিয়া উঠে, আকাশের উৎসারিত নীলিমায় তাহার নিরঞ্জন হয়, তৃণাঙ্কুরে ধরণীর সারা অঙ্গ তাহার স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে······কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমি নাগরিক, আমি তো আরণ্যক নই; আমি গ্রামীণ, আমি তো রসিক কবি নই। কৃত্রিমতায় আমি লালিত-পালিত, বর্ব্বরতায় আমার উল্লাস। আমার কি গরজ—এই বিশ্বপ্রকৃতিকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিব, মর্ম্মের মাঝে অনুভব করিব তাহার আত্মীয়তার নিবিড় স্নেহস্পর্শ!—

কিন্তু এ দর্প তো চিরকাল থাকে না। অবরুদ্ধ বায়ু গুমোট বাঁধিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসে, রক্তপ্রবাহে বিসর্পিত হইয়া চলে একটা অসহন জ্বালা—কোথায়ও স্বস্তি নাই, কোথায়ও শান্তি নাই, নিজের হাতে গড়া বেড়াআগুনে ছটফট করিয়া মরিতে হইবে—পরিত্রাণের পথ নাই, থাকিলেও তাহা ভুলিয়া গিয়াছি—আমি বিহ্বল, আমি প্রচণ্ড, আমি বিকল!

কিন্তু মানুষ নিজকে ভুলিলেও তো বিধাতা তাহাকে ভুলেন না। তাই নিদাঘের দাহে যখন পৃথিবীর বুক ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়, তখনই নির্ম্মল

নীলিমায় দেবতার করুণা বাষ্পের আকারে অলক্ষ্যে জমিয়া উঠিতে থাকে। তারপর বিষণ্ণ, ক্লান্ত দিক্-চক্রবালের ঈশান-কোণে একদিন একখানি শ্যামল ছায়া ঘনাইয়া আসে, পর্জ্জন্যের গুরুগম্ভীর স্তনিতে মূর্চ্ছিতা ধরণীর বুকও বুঝি দুরু-দুরু কাঁপিয়া ওঠে। অবশেষে ঝঞ্ঝায়, বজ্রে, বিদ্যুতে, ধারাসারে নামিয়া আসে দেবতার করুণা; সে করুণার ভার সহিতে না পারিয়া পৃথিবী নুইয়া পড়ে, রক্ষের হৃদয় বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া যায়, মহাবধের উদ্দাম তাণ্ডবে আকাশ-বাতাস মথিত হইতে থাকে, "উতানাগা ঈর্ষ্যতে বৃষ্ণ্যাবতো যৎ পর্জ্জন্যো স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ"—গভীর গর্জ্জনে পর্জ্জন্য যখন দুষ্কৃতিকারীকে বিদীর্ণ করেন, তখন সে ধারাবর্ষণ হইতে নিষ্পাপ সাধুও যেন চকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়ান!

এই নিষ্ঠুর করুণার ধারাসারেই আবার আর একদিকে নবীন শষ্পাঙ্কুর ধরণীর গায়ে পুলক বিছাইয়া দেয়, মুহ্যমান চতুষ্পদেরা আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে, বিচিত্র বর্ণে ওষধিরা ধরাপৃষ্ঠে আলপনা আঁকিয়া যায়—"ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে"—নিখিল জগৎ পায় অন্ন, পায় দেবতার প্রসাদ, যজ্ঞাবশেষ অমৃত; "প্রতীদং বিশ্বং মোদতে যৎ কিঞ্চ পৃথিব্যামধি"—পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহাই আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে।

এই যে একাধারে নির্ম্মম অথচ মনোরম দেবতার করুণা, ইহার জন্য একটা আকুলতা আমাদের সকলের হৃদয়েই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উগ্র অভিমানে প্রতপ্ত হইয়াও মানুষ প্রাণের পরতে পরতে অনুভব করে একটা স্তব্ধ বেদনা—ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অশ্রুর আকার ঝরাইতে পারে না। এ জগতে যাহারা কেবল দাপাদাপি করিয়াই ফিরিতেছে, কর্ত্তৃত্বাভিমানে মুখর সেই বীরপুঙ্গবদের মনে করিতেছ—বড় সুখী? একবার অন্তঃপুরের খবর লইয়া দেখ, পুঞ্জীভূত অশ্রুবাষ্পকে তাহারা অশনি ঝঞ্ঝার বিক্ষোভ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে মাত্র। কাঁদিতে পারে না বলিয়াই রুদ্ধ অভিমানে তাহারা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। এই যে পৃথিবীকাঁপানো বজ্রগর্জ্জন, জান, এ একটা বুকফাটা আর্ত্তনাদেরই রূপান্তর!

আসন্নবর্ষণের কূলে বসিয়া মানুষের বুকজোড়া এই যে নিদাঘদহনের রুদ্র লীলা, এ আমার হৃদয়কে বেদনায় আনন্দিত করিয়া দেয়। নিজের জন্য এ বেদনা নয়—আমার এ বেদনা বঞ্চিতের জন্য। যাহারা চায়, অথচ পায় না, একফোঁটা ভালবাসার দরুণ, করুণার দরুণ যাহাদের সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, অথচ অভিমানের উত্তাপে যাহাদের চোখের জল নিয়তই শুকাইয়া যাইতেছে—কাঁদিতে চাহিতেছে, অথচ পারিতেছে না, সেই আত্মপ্রবঞ্চিত হতভাগ্য মানুষের দরুণ আমারও বুকের মাঝে আষাঢ়ের মেঘভার স্তব্ধ হইয়া ঘনাইয়া আসে। এই যে বারিধারার দরুণ আগুনের ঊর্দ্ধমুখী কৃচ্ছ্রতপস্যা, ইচ্ছা হয় দিগন্তপ্লাবনী বন্যায় ইহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাই; সে প্লাবনের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষ কাতর মিনতিতে বলিয়া উঠুক্—"অবরষীর্ বর্ষম্ উদু ষূ গৃভায়"—বর্ষণের মত বর্ষণই করিয়াছ দেবতা, আর এ প্লাবন সহিতে পারিতেছি না—এইবার এ ধারাসারকে নিরুদ্ধ কর তুমি!

আবার দেখি, উশতী ধরিত্রীর প্রতপ্ত কামনা আর রেতোধা পর্জ্জন্যের উদ্দাম বর্ষণ—সৃষ্টির এটা বহিরঙ্গ মাত্র। এ শুধু আয়োজনের আড়ম্বর: তৃপ্তি ইহার অন্তরালে। কামনার রাজ্যের মানুষ যাহারা, তাহারা শুধু বাহিরের এই মত্ততাকেই দেখিতে পায়। দৃষ্টি যাহার অন্তশ্চর, সে দেখে লীলা। সে লীলা প্রাণের স্ফুরণে। জননীর উদগ্র কামনা কিসলয়িত হইয়া উঠে শিশুর নবজীবনের উন্মেষে। এই সৃষ্টির জন্য প্রলয়ের আবশ্যক হয়। শীতের অবসানে জরাজীর্ণকে বিদায় দিয়া শুধু দুঃখেরই

প্রলয় নয় ; বিকাশোন্মুখ প্রাণকে আনন্দের অপর্য্যাপ্ত অভিষেকে মথিত উচ্চকিত করিয়া এই আনন্দের প্রলয়। মৃদু মলয়-হিল্লোলে বসন্তকে আবাহন করিয়া আনিয়াছিলাম ; এইবার ঝঞ্ঝা-বজ্র-বিদ্যুতের আরাত্রিকে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম। কামনা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল বলিয়া; তাই "অপো নিষিঞ্চন্ অসুরঃ পিতা নঃ"—আমাদের রেতো নিষেকী অসুর পিতাকেই আমরা চাহিয়াছিলাম। সৃষ্টি সফল হইয়াছে—"অজীজন ওষধী ভোজনায়"—প্রশান্ত ভোগের জন্য ওষধিকে তুমি জন্ম দিয়াছ, আর তোমাকে প্রয়োজন নাই।

বসন্তে প্রাণের স্ফুরণ বর্ষায় তাহার প্রতিষ্ঠা ; মধ্যে এই দ্যাবাপৃথিবীর মিলন-রভস। একদিকে কৈশোর, আর একদিকে যৌবন ; মধ্যে এই আবেগের তিরস্করণী। একদিকে স্নিগ্ধ অপ্রাকৃত প্রেমলীলা, আর এক দিকে অন্তর্গূঢ় সৃজনী শক্তির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ; মাঝে এই কামরতির উন্মাদনা।

জীবনে বসন্তের আবির্ভাবকে যে চিরস্থির করিয়া বাঁধিতে পারিয়াছে, বর্ষায় সে প্রিয়-সন্নিধান হইতে স্বেচ্ছায় প্রবাসী। কৈশোর যাহাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিয়াছে, যৌবনবিকার হইতে সে বিবিক্ত। কৈশোরের অপ্রাকৃত ভাবই যৌবনের প্রাকৃত বিকারের ভিতর দিয়া উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে ; কিন্তু বিবিক্ত থাকিয়া সে বিকারকে ঊর্দ্ধপরিণামী করিতে পারে কয়জনা ? অথচ বর্ষায় এই বাঁধ দেওয়াই একান্ত প্রয়োজন ছিল। হিন্দুর চাতুর্ম্মাস্য, অনধ্যায়, বৌদ্ধের বর্ষাবাস, রথযাত্রা—এই বিবিক্ত অধ্যাত্মসাধনার বহিৰ্বিকাশ মাত্র। রসশাস্ত্রে তাই দেখি, বর্ষার বারিসেকমন্থর আকাশ-বাতাস প্রোষিতভর্ত্তৃকার নয়নবাষ্পে যেন আরো ভারী হইয়া উঠে, মেঘমণ্ডলে প্রতিহত হইয়া তাহার করুণ বিলাপধ্বনি বারবার আমাদের বুকে ফিরিয়া আসে—

> ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়।
> তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ় ॥
> তাহে গগনে নব নব মেহ।
> সব লোক আওল গেহ ॥
> সব লোক আওল গেহ, দারুণ
> ঐরি বাদর হেরিয়া।
> হামসে তাপিনি পুরব পাপিনি—
> পঁহু না আওল ফেরিয়া !

বর্ষার এই বিরহ-বেদনা সার্থক হইবে যদি বসন্তকে হৃদয়ে বাঁধিয়া স্বেচ্ছায় প্রিয়সঙ্গম হইতে আপনাকে বিবিক্ত রাখিতে পার। অঙ্গে অঙ্গ ঠেকিয়াও যে ঠেকে না, ইহাতেই হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুতের সঞ্চার হয়। এই বিপ্রলম্ভবিজড়িত মিলনের কবি বৈষ্ণব-রসিক ; বর্ষায় বিরহের পরিচয় পাই ইঁহারই গানে, ইনিই মেঘদূতের শিল্পী। আর সিসৃক্ষা-মথিত মিলনের প্রচণ্ড উল্লাস যাঁহার মুরজ ধ্বনি-গম্ভীর ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছে—তিনি বৈদিক ঋষি ; তিনি রেতোধা পর্জ্জন্যের উপাসক, ঝঞ্ঝা-বজ্র-বিদ্যুতের পূজারী ; ওষধির কল্যাণে, চতুষ্পদের কল্যাণে, দ্বিপদের কল্যাণে পর্জ্জন্যের বারিধারা তৃষিতা ধরণীর উপর ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়ুক—ইহাই তাঁহার কামনা ; তাঁহার প্রাণের উল্লাস চিদ্বিলাসকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

বর্ষাবেদনার বারতা বহিয়া আনে। কিন্তু এ বেদনা প্রাণের ক্রন্দন না রসের ব্যাকুলতা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমি বৈষ্ণব না বৈদিক, তাহা জানি না।

নিয়তসঞ্চরমাণ মেঘমালার ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, আমি বৈদিক ও বৈষ্ণব দুই-ই ; আমি জ্যোতির্ম্ময় সবিতা ; ফাল্গুন হইতে শ্রাবণে, আবার শ্রাবণ হইতে ফাল্গুনে আমার হিন্দোলার আন্দোলন ; আমি স্থির—সত্যস্বরূপ।

মরণের পরপারে

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

——):*:(——

সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয় অমৃতস্বরূপ পরমাত্মরূপী নরনারীগণ,

এই হলে এতদিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হয়নি হয়ত, কেননা বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত জটিল। কিন্তু আজকার আলোচনা তাদের তুলনায় সুবোধ হবে আশা করা যেতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাম যখন পূর্ব্বভারতে ছিলেন, তখন আমেরিকার এক পাদ্রীসাহেবের লেখা একখানা বই রামের হাতে এসে পড়ে। বইখানার নাম ছিল, "মরণের পরপারে।" সুন্দর একটী রূপক দিয়ে পাদ্রীসাহেব বোঝাচ্ছিলেন, এ জগৎটা যেন একটা ষ্টেশন। এ ষ্টেশন হতে ও-ষ্টেশনে যে পাড়ি দেবে, তাকে টিকিট কিনতে হবে। যে ঠিক ঠিক টিকিট কর্‌তে পার্‌বে না, তাকে জাহাজের ওপর থেকে অতল সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আর যাদের টিকিটের কোনও ভুলচুক থাক্‌বে না, তাদেরই শুধু গন্তব্যস্থানে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। টিকিটেরও আবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ আছে। আবার নকল টিকিটও আছে; সেগুলোর রং কোনটা সাদা, কোনওটা কাল বা হল্‌দে বা সবুজ। কিন্তু আসল টিকিটগুলো হচ্ছে লাল রংএর, প্রভু যীশুখৃষ্টের শোণিতে সেগুলো রঞ্জিত। ওই রকম টিকিট সঙ্গে থাক্‌লে ঠিক ঠিক্ পারে পৌছান যেতে পারে। যাদের লাল টিকিট আছে, পারে যাবার অধিকার শুধু তাদেরই আছে, আর কারু নেই—এ কথা একেবারে নিশ্চিত। রং-বেরংএর টিকিটগুলো হচ্ছে অন্যান্য ধর্ম্মের টিকিট; আর লালগুলোতে আছে খৃষ্টের রক্তের ছাপ—এই-গুলোই খৃষ্টান্ টিকিট্। মোটামুটি এই হচ্ছে বইখানার প্রতিপাদ্য। পাদ্রীসাহেব বেশ গুছিয়ে-বাগিয়ে কথাগুলো লিখেছেন। বইখানিতে তাঁর সাহিত্যজ্ঞান আর লিপিচাতুর্য্যের চূড়ান্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

কতকটা এই রকম হচ্ছে সবাকার ধারণা। শুধু খৃষ্টানদেরই এই ধারণা নয়, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও ওই রকম। মুসলমানরা বল্‌বে, যমের দুয়ারে টিকিট-কালেক্‌টার বা ষ্টেশনমাষ্টার হচ্ছেন মহম্মদ; তাঁর ছাপ যার টিকিটে না থাক্‌বে, ব্যস্—তাকে নরকসই কর্‌তে হবে। অন্যান্য ধর্ম্মেরও এই মত। সবাই বল্‌বে, মানুষ আমেরিকাতে, ইউরোপে, আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, এসিয়ায়, যেখানেই মরুক না কেন, সবার মালীক হচ্ছেন একজন মাত্র—হয় তিনি খৃষ্ট, নয়ত বুদ্ধ, বা জারাথুস্ত্র বা কৃষ্ণ বা আর কেউ। আর এই জন্যই ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিবাদ। এই গোঁড়ামি, এই কুসংস্কারই বারবার জগতে রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছে—ধর্ম্মের নামে।

এ বিষয়ে বেদান্তের কি মত তা তোমাদের সাম্‌নে ধরছি। বেদান্ত এই বিরোধের সমন্বয় করে বলছেন, অপরের মতামতে হস্তক্ষেপ না করেও তো প্রত্যেকে আপন আপন মত বজায় রাখ্‌তে পারে। তুমি ঠিক আছ বলে যে অপরের মাথায় লাঠী মারতে হবে, তা তো নয়। বিষয়টা গুরুতর। ঘণ্টাখানেক সময়ের মাঝে আর কত বোঝান যাবে—তবে বেদান্তে এর যা সমাধান করা হয়েছে, তারই একটা চুম্বক মাত্র দেওয়া সম্ভবপর হবে।

জগতে যা কিছু ফুটে উঠ্‌ছে, তা কেবল সৌন্দর্য্যের বিকাশ। জগত এগিয়ে চল্‌ছে একটা

সুষম ছন্দোবদ্ধ পথে। এখানকার যা কিছু স্পন্দন, তার মাঝে একটা তাল আছে; আমরা উঠ্‌ছি-পড়ছি এলোমেলো ভাবে নয়—তালে তালে। গণিত প্রমাণ করবে, অতি চড়ার পাশেই রয়েছে অতি খাদ; দুটোতে হামেশাই অদলবদল হচ্ছে। দিন আর রাতে ছন্দ বজায় আছে। হাঁটতে গেলে এক পা নামিয়ে আর এক পা তুলতে হয়। ষড়ঋতু আস্‌ছে একটীর পর একটী—তালে তালে; সেই ছয়টীই ঘুরে ঘুরে আসছে কিন্তু। এই হল গতিতে ছন্দ। এই ছন্দ জগতের সব ব্যাপারে। প্রতিদিন জাগ্‌ছ, ঘুমিয়ে পড়ছ, আবার জাগছ, ঘুমচ্ছ, যেমন নাকি এই নিদ্রা আর জাগরণ চলছে তালে তালে, বেদান্ত বলেন, জীবন আর মরণও তেমনি একে অপরের হাত ধরে তালে তালে চল্‌ছে। সমস্ত বিশ্বে কোথায়ও তালভঙ্গের একটী দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে না। কালের তালভঙ্গ হয়েছে কোথায়ও? হঠাৎ সে কোথায়ও থেমে গেছে কি?—না। কবে কালের সুরু হয়েছিল জান? দেশের শেষ আছে কোথায়ও?—না, সে অসীম। নদীর বেগ কোথায়ও থেমে গিয়েছে?—তুমি বলছ, হাঁ। আমি বলি, না থামেনি। যে নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, সেই আবার বাষ্প হয়ে পাহাড়ে এসে জমছে, আবার বৃষ্টি হয়ে নদী বেয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। এই একটা মোমবাতি; ঘণ্টাখানেকের মাঝে পল্‌তে শুদ্ধ এ যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। তোমরা বলবে নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমরা জানি, না, এ শেষ হয়নি। বিজ্ঞান প্রমাণ করবে, এর শেষ হয়নি, শুধু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এ থেকে যে কার্ব্বন ডায়োকসাইড্‌ আর জলের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আবার উদ্ভিদের আকারে ফুটে উঠছে। কিছুরই নাশ নাই—সব চলেছে চক্রাকারে, বরং বলা যেতে পারে বর্ত্তুলাকারে। এই তো তুমি বেঁচে আছ; তারপর মরলে। এই মরণ দশাটা কি চিরকাল ধরে চল্‌বে? এ কথা তুমি জোর করে বল্‌তে পার না। এ একেবারে প্রকৃতির আইনবিরুদ্ধ। যদি বল, মরণের পর আর জীবনের পুনরাবির্ভাব নাই, আছে শুধু অনন্ত নরক, তাহলে জগতের একটা অতি বাস্তব অথচ দুর্লঙ্ঘ্য আইনকে তোমার অস্বীকার করা হবে। মরণের পর জীবকে যদি ভগবান অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করেন তো কি নিষ্ঠুর সে ভগবান্‌! একটা লোক এ জগতে এসে তিন কুড়ি দশ বছর খাটল। বেচারী হয়ত ভালমত শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পায়নি, আত্মোন্নতির পথ খুঁজে পায়নি, বাপ মা গরীব ছিল বলে তার সম্বন্ধে কোনও অনুকূল ব্যবস্থাই তারা করতে পারেনি, তাকে গির্জ্জায় পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি। এমনি ভাবে জীবনটা কাটিয়ে লোকটা মরল। খৃষ্টের রক্তের ছোপ দেওয়া টিকিট আর তার ভাগ্যে জুটল না। ফলে তাকে অনন্ত কালের দরুণ নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল। যে ভগবান্‌ এই নিয়ম করেছেন, তাঁকে নিষ্ঠুর বল্‌ব না? ন্যায়ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে তুমিই পার এমন ব্যবস্থা করতে? বেদান্ত বলেন, মানুষ মরলেই আর চিরকাল মরে থাকে না। মরণের পরেই আছে জীবন, জীবনের পরে আবার মরণ। বাস্তবিক মরণ একটা কথার কথা মাত্র। এই নিয়ে আমরা হৈচৈ করে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করি বই তো নয়। মরণের মাঝে ভয়ের কি আছে? এ তো শুধু একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন।

ধর, এই জগতে ৭০।৮০ বছর বাঁচলে, এটাকে বলা যেতে পারে দীর্ঘকালব্যাপী একটা জাগ্রত অবস্থা। তারপর মরণ হল। বেদান্ত বলেন, জাগরণের পর এটা হল তোমার সেই অনুপাতে একটা দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা মাত্র। যেমন প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টার মাঝেই ৩।৪ ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার জেগে ওঠ, তেমনি মরণের মাঝে খানিক বিশ্রাম করে আবার

তুমি জীবনে জেগে উঠবে, এই পৃথিবীতে তোমার পুনর্জ্জন্ম হবে। জন্মান্তর শুধু একটুখানি নিদ্রার পর আবার জাগরণ।

বেদান্ত বলেন, মানুষ মরার পরেই যে আবার জন্মগ্রহণ করে, তা নয়। গাছ থেকে একটা বীজ মাটীতে পড়বামাত্রই সেটা একটা গাছ হয়ে গজিয়ে ওঠে না, কিছু সময় লাগে। তেমনি মানুষ মরা মাত্রেই আবার জন্মায় না মাঝামাঝি তার একটা অবস্থা আছে, সেটাকে ঘুমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ওই হল মরণের পরপার। মৃত্যু আর পুনর্জ্জন্মের মাঝখানে এই অবস্থাটাকে কি বলা যেতে পারে? এটা ঠিক ঘুমের মত, ঘুমের সব লক্ষণই এতে পাওয়া যাবে। জানই তো, মানুষ ঘুমিয়ে যা স্বপ্ন দেখে, তা তার জাগ্রদ্ দৃশ্যেরই অনুরূপ। এই হচ্ছে সাধারণ বিধি। অবশ্য কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যাবে হয়ত, কিন্তু সচরাচর জেগে থেকে লোকে যা দেখে, ঘুমিয়েও তাই দেখে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের পড়া তৈরি করেছ, তারা রামের এ কথায় সায় দেবে নিশ্চয়ই। পরীক্ষা যখন খুব ঘনিয়ে আসে, আর বেজায় খাটুনী পড়ে যায়, তখন ঘুমে পরীক্ষার সম্পর্কিত নানা ব্যাপারই দেখা যায়, দিনের বেলায় যে খাটুনীটা গিয়েছে, রাত্রে আবার সেটার ছবিই ভেসে ওঠে। পরীক্ষা হয়ে গেলে পর ফল বেরুবার সময় যখন আসে, যখন পরীক্ষায় পাশ করা বা প্রথম হওয়ার আশাটা অতি তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, তখন আশা-আকাঙ্ক্ষায় দোদুল্যমান অবস্থায় আবার পরীক্ষার ফলের স্বপ্ন দেখা যায়। বিশেষ একটী বস্তুকে ভালবাসলে রাত্রে তার স্বপ্ন না দেখে আর উপায় নাই।

রাম যখন বি-এ পড়তেন, তখন তাঁর সঙ্গে একই ঘরে থেকে আর একটা ছেলেও বি-এ পড়ত। ছেলেটা ভারী ফূর্ত্তিবাজ ছিল। সারাটা দিন তার নাচে গানে খেলায় কেটে যেত। একদিন তার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কয় ঘণ্টা পড়? সে একটু হেসে বল্ল, আঠার ঘণ্টা। বন্ধু বল্ল, সে কি কথা? এই তো আমার সামনেই ৪.৫ ঘণ্টা নষ্ট করলে; তারপর ৮।৯ ঘণ্টা ঘুমোও; এ দুটো সময় বাদ দিয়ে ধরলেও তো ২৪ ঘণ্টার মাঝে বড় জোর ১২ ঘণ্টা সময় থাকে। তাহলে তুমি আঠার ঘণ্টা পড় কি করে? ছেলেটী বল্ল, তুমি তো গণিত জান না। জানলে দেখিয়ে দিতাম কি করে আমি আঠার ঘণ্টা পড়ি। বন্ধুটী বল্ল, আচ্ছা, বলই না কি করে তা সম্ভব? ছেলেটী বল্ল, আমি আর রাম এক ঘরে থাকি। তোমার কথা মতই ধর আমি ১২ ঘণ্টা পড়ি; আর রাম পড়ে ২৪ ঘণ্টা। তাহলে দুয়ে মিলে হল ৩৬ ঘণ্টা। এখন গড় কষ্‌লে তার ভাগে পড়বে ১৮ ঘণ্টা আর আমার ভাগে পড়বে ১৮ ঘণ্টা। বন্ধু বল্ল, আচ্ছা, না হয় মেনে নিলাম তুমি ১২ ঘণ্টা পড়; কিন্তু তা বলে রাম ২৪ ঘণ্টা পড়ে, এ কথা স্বীকার করি কি করে? এ কি সম্ভব? অবশ্য জানি, রাম খুব খাটে, অনেকগুলো বিষয় সে পড়ে; সে যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াই পড়ে তা নয়, তার চতুর্গুণ সে খাটে। কত কিছু সে পড়ছে; কিন্তু তবুও সে যে ২৪ ঘণ্টাই পড়বে, এ তো আর হতে পারে না। ছেলেটী তখন তার বন্ধুকে বোঝাতে লাগ্‌ল, দেখ, রাম যখন খেতে বসে, তখনও সে তার একটী মুহূর্ত্ত বাজে খরচ করে না। সর্ব্বদাই দেখ্‌বে তার হাতে একখানা কাগজ; হয়ত তাতে বিজ্ঞানের কোন সমস্যা বা গণিতের একটা অঙ্ক, বা দর্শনের কোনও নিবন্ধ; হয়ত কোনো একটা বইয়ের বা কবিতার খানিকটা অংশ মুখস্থ করবে বলে টুকে নিয়েছে। খেতে বসে হয় সে কবিতা লিখছে বা আর কিছু করছে। মোদ্দা কথা, এক মুহূর্ত্তও

তার বৃথা যাচ্ছে না কখনো। স্নান করতে গিয়েছে তো দেখ্‌বে কয়লা দিয়ে দেওয়ালে কি সব আঁক্‌ছে। ঘুমুচ্ছে তো তার মাঝেও আঁক কষছে। সারাদিন যা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটী করেছে, রাত্রে তা স্বপ্নে দেখা ছাড়া তার আর উপায় কি? কাজেই দেখ, তার পড়া ২৩ ঘণ্টাই চল্‌ছে।

কথাটার মাঝে কিছু পরিমাণ সত্য আছে বটে। যে মানুষটা ১৮ ঘণ্টা ধরে পড়াশুনা নিয়ে থাকে, সে ঘুমোবার সময়ও স্বপ্নেও ওই নিয়েই থাকবে বই কি? লোকে বলে, অনেক সময় স্বপ্নে এমন সব দৃশ্য দেখা যায়, যা কোনও দিন কেউ কল্পনাও করেনি। বেদান্ত বলেন, তা হতে পারে না। একজন বল্‌ল, স্বপ্নে সে একটা রাক্ষস দেখেছে। রাক্ষসটার মাথাটা সিংহের মত, পিঠটা উটের মত, লেজটা সাপের মত আর ঠ্যাংগুলো ব্যাং এর-মত। এমন অপরূপ মূর্ত্তি আর সে জন্মে দেখেনি। বেদান্ত বল্‌ছেন, ভাই, তুমি মানুষ দেখেছ, সাপ দেখেছ, উট দেখেছ, ব্যাং দেখেছ; তাই সিংহের মাথা, সাপের লেজ, উটের কুঁজ, আর ব্যাঙের ঠ্যাং জুড়ে দিয়ে ওই অপরূপটী সৃষ্টি করেছ। কাজেই যা কিছু দেখেছ, সে রাক্ষসই হোক আর খোক্কসই হোক, সবই তোমার জাগ্রদবস্থার দেখা।

যে কোনও দিন রুশীয়ায় যায়নি বা সেণ্টপিটার্স-বার্গের নাম শোনে নি, সে কখনও কি স্বপ্নে সেখানে হাজির হয়?—কখনই না। দার্শনিক কি স্বপ্নে জুতো সেলাই সুরু করেন? মুচি তাঁর প্রতিবেশী হলেও, রোজ তাকে জুতো সেলাই করতে দেখলেও তিনি নিজে জুতো সেলাই করতে সুরু করেন না।

তাই যদি হয় তো মৃত্যুরূপী দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রার মাঝে তোমার কি অবস্থা হবে বলে মনে কর? মরণ আর পুনর্জ্জন্মের মাঝামাঝি সময়টা কি করে কাটবে? বেদান্ত বলেন, এই সময়টায় তোমার হয় স্বর্গে নয় তো নরকে কাটে। কিন্তু এই স্বর্গ-নরকগুলো কি? এগুলো হচ্ছে মৃত্যু আর জন্মান্তরের মাঝে স্বপ্নলোক। একজন খাঁটী খৃষ্টান বেশ সদ্ভাবে জীবন যাপন করছে; প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যায়, প্রত্যেক সন্ধ্যায় উপাসনা করে, খাওয়ার সময় প্রত্যেকবারই ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। আজীবন সে ক্রুসচিহ্নের কণ্ঠী ধারণ করে এসেছে, সারাটা জীবন খৃষ্টের ধ্যান করে এসেছে; তার আহার বিহার, চলা-ফেরা সব খৃষ্টকে সাক্ষী রেখে। এমনি ৮০।৯০ বৎসরকাল খৃষ্টের প্রেমে সে মজে রয়েছে, দিন রাত তাঁকেই ভেবেছে, মরবার পর খৃষ্টের ডান পাশে আসন পাবে এ তার ধ্রুব বিশ্বাস, সারা জীবন সে ভেবে এসেছে, মৃত্যুর পর স্বর্গের দেবদূতেরা এসে তাকে সংবর্দ্ধনা করে নিয়ে যাবে। বেদান্ত বলেন, মৃত্যুর পর এই নিষ্ঠাবান খৃষ্টানটী ঠিক খৃষ্টের ডান পাশেই আসন পাবে। বাস্তবিক মৃত্যু আর জন্মান্তরের মধ্যবর্ত্তী সেই স্বপ্নকালে সে দেখবে, তার চারিদিকে দেবদূতেরা প্রভুর মহিমা-কীর্ত্তন করছে; সেও তাদের একজন হবে না কেন? বেদান্ত বলেন, তুমি যদি নিষ্ঠাবান খৃষ্টান হও, শাস্ত্রের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর তো শাস্ত্রবর্ণিত অবস্থা তোমার নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু তা বলে হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া কেন ভাই? (আর মুসলমানেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেজায় নৈষ্ঠিক, অনেক সময় তারা গোঁড়া কিন্তু।) মুসলমানেরাও যদি নৈষ্ঠিক মুসলমান হয়, জীবনের ৭০।৮০ বৎসর ধরে যদি মহম্মদের নির্দ্দেশ পালন করে চলে, তাঁকে ভাবে, দিনের মাঝে পাঁচ ওয়াক্ত্‌ নমাজ পড়ে, তাঁর নামে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে তো তারই বা কি হবে? ইস্‌লাম ধর্ম্মের মহিমা মহম্মদের গরিমা পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার করাই যার জীবনের স্বপ্ন ছিল, মরণের পর তার কি হবে? প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে তো কিছুই হবে না। প্রকৃতির আইন হচ্ছে, জেগে বসে

আমরা যে স্বপ্ন দেখি, ঘুমিয়েও তারই জের চলে। মুসলমান সারাজীবন স্বপন দেখেছে—মহম্মদ আর বেহশ্‌ত্‌। সেখানে নন্দন-কাননে হুরীরা রয়েছে; পয়গম্বর বলেছেন, মরণের পর সুরার নদী প্রবাহিত দেখবে; কত বিচিত্র ভোগ, কত কিছুর আয়োজন মরণের পর। বেদান্ত বলেন, এই যা সে কামনা করেছে মরবার পর, তাই যে সে ভোগ করবে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যা সে জাগ্রতে ধ্যান করেছে, মরলেও তাই পাবে। পয়গম্বর বর্ণিত সেই স্বর্গেই গিয়ে সে হাজির হবে।

কিন্তু বেদান্ত এ কথাও বলছেন, তা বলে ভাই মুসলমান, জগতের সকলকে তুমি মরণের পর তোমার পীরের দরগায় টেনে নিও না; সবাইকে তোমার পয়গম্বের দোরার ভিখারী বলে প্রচার করবার কোনও অধিকার নাই তোমার। খৃষ্টান যা ভেবে সুখ পাচ্ছে তাই পাক্; তারা ইউরোপে, আমেরিকায়, চীনে, জাপানে, যেখানেই মরুক না কেন, সবাইকে মহম্মদের দোরগড়ায় টেনে এনো না। তারা যদি মহম্মদকে মানে তো ভালই, নইলে জাহান্নামে যাবে, এ কথা বলবার কোনও অধিকার নাই তোমার। এ কি বর্ব্বরতা! তুমি যদি মহম্মদের উপাসক হও তো তাঁর কল্পনানুরূপ স্বর্গেই তুমি যাবে; অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদেরও তেমনি ব্যবস্থা। তোমার ধর্ম্ম যদি তুমি নিষ্ঠাসহকারে মেনে চল তো তার যা উদ্দিষ্ট পুরস্কার, মরণের পর তাই তুমি পাবে। বাস্তবিক স্বর্গ আর নরক তো তোমার ওপরেই নির্ভর করছে। মরণের পর তুমিই যে স্বর্গ সৃষ্টি করছ, তুমিই যে নরকের আগুন জ্বাল্‌ছ। বাস্তবিক স্বর্গ আর নরক তো স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়—যখন যা স্বপ্ন দেখ্‌ছ তখন তাই সত্য বলে মনে হয়, এই যা। স্বর্গ-নরকও মরণের পর সত্যই মনে হবে বটে। কিন্তু আসলে তারা স্বপ্ন ছাড়া তো আর কিছুই নয়। (**সমাপ্য**)

অন্তর্ব্ব্যাপ্তি

ন্যায়দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

এখন প্রশ্ন এই, বিপক্ষে অর্থাৎ অগ্নিরহিত স্থলে ধূম থাকিবে না, ইহার প্রমাণ কি? ব্যভিচার-সংশয় দূর না হইলে তো ব্যাপ্তিগ্রহণ হইবে না; অথচ ব্যভিচার-সংশয় একেবারে দূরও হয় না। এ স্থলে উপায় কি?

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন, হাঁ, ব্যভিচারসংশয়রহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানই অনুমানের প্রয়োজক বটে। এই ব্যভিচারসংশয় সাধারণতঃ বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারা নিবারিত হয়। কেবলান্বয়ী অনুমান স্থলে* বিপক্ষ না থাকায়, বিপক্ষবৃত্তিত্বের সংশয়ই উদিত হয় না, তাই সেখানে স্বতঃসিদ্ধ সংশয়াভাব আছে। এইরূপ ব্যাঘাতের (contradiction) ভয়ে যেখানে শঙ্কা নিবৃত্ত হয়, সেখানেও তর্ক-প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

* কেবলান্বয়ি অনুমান অর্থাৎ যে অনুমানে হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ কেবল ভাব বা বিধি-মুখেই (in agreement) সম্ভব, অভাব বা নিষেধমুখে (in difference) অসম্ভব। এইরূপ অনুমানের যাহা সাধ্য, তাহার অভাব থাকিতে পারে না; যেমন, 'যাহা কিছু সৎ (existent) তাহা

জৈনগণ বলেন, সর্ব্বত্রই বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারাই ব্যভিচার-শঙ্কা নিবারিত হয়। কেবলান্বয়ি অনুমান অসম্ভব, কারণ বাস্তব বিপক্ষ (প্রতিযোগী) না থাকিলেও কল্পিত বিপক্ষ থাকিবার পক্ষে তো কোন বাধা নাই। শশবিষাণাদিরূপ কল্পিত প্রতিযোগীতেও ব্যতিরেকজ্ঞানের দ্বারাই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে। কেবল অন্বয়ব্যাপ্তি পঙ্গু; সর্ব্বত্রই বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারা হেতু-সাধ্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে বলিয়া কোন হেতুই কেবলান্বয়ী হইতে পারে না।

জৈনগণ আরও বলেন, বৌদ্ধগণ পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষব্যাবৃত্তিরূপ যে হেতুর ত্রৈরূপ্যজ্ঞান এবং নৈয়ায়িকগণ অসৎপ্রতিপক্ষত্ব * ও অবাধিতত্ব † এই অধিক রূপদ্বয়ের সমাবেশে যে হেতুর পাঞ্চরূপ্য-জ্ঞানকে ব্যাপ্তির গমক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ 'অন্যথানুপপত্তি'রূপ বিপক্ষবাধ-জ্ঞান না থাকিলে ঐ ত্রিরূপ বা পঞ্চরূপ হেতু ক্লীব। যেমন—'সে নিশ্চয়ই শ্যামবর্ণ, যেহেতু সে মিত্রার তনয়, মিত্রার অন্য তনয়গণের মত'—এই সাধনবাক্যে (syllogism) প্রকৃত ধর্ম্মীতে (subject or minor term) মিত্রাতনয়ত্ব নিশ্চিত বিদ্যমান, অতএব পক্ষসত্ত্ব আছে; মিত্রার অন্য পুত্রেরা যে শ্যামবর্ণ, তাহাও নিশ্চিত, অতএব সপক্ষসত্ত্বও অক্ষুণ্ণ আছে; যাহারা শ্যামবর্ণ নহে, তাহারা যে মিত্রার পুত্র নহে, ইহাও জানা আছে, অতএব বিপক্ষাসত্ত্বও আছে;—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ত্রৈরূপ্য থাকিলেও অনুমানটী যথার্থ নহে। কারণ মিত্রার পুত্রের গৌরবর্ণ হইবার পক্ষে কোন বাধক প্রমাণ নাই।

যখন 'অন্যথানুপপত্তি'রূপ বিপক্ষবাধক প্রমাণ না থাকায় উহা সদনুমান হইল না, তাহা হইলে উহাকেই হেতুর প্রধান লক্ষণ বলিব না কেন? বিপক্ষব্যাবৃত্তি না থাকিলে, ত্রৈরূপ্যসত্ত্বেও যখন অনুমান সিদ্ধ হয় না এবং ত্রৈরূপ্য না থাকিলেও কেবল 'অন্যথানুপপত্তি' দ্বারাই যখন অনুমান সিদ্ধ হয়, তখন তাহাকেই হেতুর একমাত্র লক্ষণ বলা উচিত। আবার বৌদ্ধপ্রোক্ত হেতুর ত্রৈরূপ্য এবং নৈয়ায়িককথিত পাঞ্চরূপ্য যখন ঐ অন্যথানুপপত্তির অঙ্গ এবং তাহা হইতেই উদ্ভূত, তখন ত্রৈরূপ্য প্রভৃতিকে হেতুর লক্ষণ বলা কেবল যে ব্যর্থ, তাহা নহে, অনেক সময় উহা ভ্রান্তও বটে। কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন—পক্ষধর্ম্ম না থাকিলেও অনুমান হয়, 'পিতা-মাতার ব্রাহ্মণত্ব দেখিয়া পুত্রের ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ—সেখানে পক্ষ-ধর্ম্মের অপেক্ষা নাই।'*

বৌদ্ধগণ কিন্তু ইহার প্রতিবাদকল্পে বলেন যে,—'সে শ্যাম, যেহেতু মিত্রার পুত্র' এই অনুমান অসাধু, কারণ 'সপক্ষসত্ত্ব'রূপ হেতুর লক্ষণ এখানে বিদ্যমান নাই। সপক্ষসত্ত্ব শব্দের অর্থ—'সপক্ষে সত্ত্বমাত্র' ইহা নহে, কিন্তু 'সপক্ষমাত্রেই থাকা।' 'সপক্ষমাত্রে থাকার' অর্থ বিপক্ষে না থাকা। অতএব বর্ত্তমান হেতুটীর বিপক্ষে ব্যতিরেক অর্থাৎ অসদ্ভাব সন্দিগ্ধ বলিয়া এই হেতু সাধ্যের জ্ঞাপক হইতে পারে না। †

জ্ঞেয় (knowable)'—এই অনুমানে জ্ঞেয়রূপ সাধ্যটির অভাব নাই। কাজেই যাহা 'সৎ' তাহা 'জ্ঞেয়'—এই সত্ত্বের সহিত জ্ঞেয়ত্বের সম্বন্ধ জানিতে পারা গেলেও যাহা 'অজ্ঞেয়', তাহার সহিত 'অসত্তের' সম্বন্ধ জানিবার উপায় নাই—কারণ অজ্ঞেয় বলিয়া কিছু নাই, যাহা জানিতে পারা যায়, বা যাহাতে সত্ত্বের অভাব জানা যাইতে পারে। কেননা জানিতে পারিলেই তো তাহা অজ্ঞেয় থাকিল না, জ্ঞেয়ই হইয়া গেল।

* যেখানে প্রকৃত সাধ্যের বিপরীত অর্থের সাধক হেতু সম্ভব, সেখানে হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষিত বলে।

† যেখানে পক্ষে সাধ্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদির দ্বারা বাধ হয়, সেরূপ সাধ্যবোধক হেতু বাধিত হেতু।

* পিত্রোশ্চ ব্রাহ্মণত্বেন পুত্রব্রাহ্মণতানুমা।
সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধা ন পক্ষধর্ম্মমপেক্ষতে॥
কুমারিলভট্ট, প্রমাণ° ২-১-১৭

† তৎপুত্রত্বাদিহেতূনাং সন্দিগ্ধব্যতিরেকতঃ।
ন ত্রৈলক্ষণ্যসম্ভাবো বিজাতীয়মপেক্ষতে॥
—ত°সং° ১৪১৬

ইহার উত্তরে প্রমাণমীমাংসাকার হেমচন্দ্র সূরি বলেন, বৌদ্ধের এই ব্যাখ্যা সমীচীন বটে, কিন্তু সপক্ষমাত্রে থাকার অর্থ যে বিপক্ষ-ব্যতিরেক, তাহা কেবল আমাদেরই মত। কারণ আমরাই বলি, 'অন্যথাহনুপপত্তি'রূপ বিপক্ষব্যাবৃত্তিই হইতেছে হেতুর একমাত্র লক্ষণ।

আরও একটা কথা আছে। হেতুর ত্রৈলক্ষণ্য লক্ষণটী অব্যাপক—কারণ 'যাহা কিছু সৎ, তাহা ক্ষণিক', এই অনুমানে 'সত্ত্ব' হেতুটার কোন সপক্ষ নাই, যেহেতু সমস্ত সদ্‌বস্তুমাত্রেই ক্ষণিকত্ব অনুমান করা হইয়াছে। সমস্ত সদ্‌বস্তুমাত্র যখন আমার পক্ষ বা সাধ্যধর্মী (minor term), তখন তো বিবাদের অধিকরণেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইতেছে এবং যাহা বিবাদের অধিকরণ তাহাই তো সাধ্যধর্মী। (অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন, ১১০ পৃঃ ৬-১৩ পংক্তি)।

আরও একটা কথা এই যে, বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তে ব্যতিরেকি অনুমানে (negative inference) ধর্মী বা পক্ষের জ্ঞান অনাবশ্যক ; 'সাধ্য না থাকিলে হেতু থাকিবে না' এই জ্ঞানই সেখানে পর্য্যাপ্ত ; অতএব পক্ষধর্মত্ব না থাকা নিবন্ধন ত্রৈরূপ্যযুক্ত হেতুর লক্ষণ সেখানে অনুগত হইল না। *

তাহা হইলেই বিপক্ষব্যাবৃত্তিরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমানের প্রযোজক এবং ইহাই হেতুর একমাত্র লক্ষণ, ইহা স্বীকার করা উচিত।

কিন্তু এ কথার বিরুদ্ধেও আপত্তি হইতে পারে। যদি বিপক্ষ-ব্যতিরেকই হেতুর একমাত্র লক্ষণ হয়, সপক্ষসত্ত্বের অপেক্ষা না-ই থাকে, তাহা হইলে কেবলান্বয়ি অনুমানস্থলে যেমন 'সপক্ষসত্ত্ব' না থাকায় বৌদ্ধের হেতুলক্ষণ অব্যাপ্তি-দোষদুষ্ট হইল, তেমনই অন্তর্ব্যাপ্তি বা জৈন-সম্মত হেতুলক্ষণও সেখানে খাটে না। কারণ সেখানে তো বিপক্ষই নাই। অতএব বিপক্ষব্যতিরেক কি প্রকারে সম্ভব হইবে ?

তাই তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'ব্যাপ্তি-গ্রহণোপায়সিদ্ধান্ত'-প্রকরণে বলিয়াছেন যে ব্যভিচার-সংশয়রহিত সহচারদর্শনই ব্যাপ্তিগ্রাহক। ব্যভিচারজ্ঞান অর্থে সংশয় ও নিশ্চয় উভয়ই গৃহীত হইবে। এইরূপ সংশয়বিরহ কোনস্থলে স্বতঃসিদ্ধ, কোনস্থলে বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারা সিদ্ধ।

এখানে আপত্তি হইতে পারে, তর্কের দ্বারা সংশয়ের নিরাস হয়, এ কথা বলিলে 'অনবস্থা'দোষ (vicious i finite) হইবে ; কারণ তর্কের মূলে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োজন এবং ব্যাপ্তির সংশয় তর্ক-মাত্র-নিরাস্য বলিয়া অনন্ত ব্যাপ্তি ও অনন্ত তর্ক স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ ব্যাঘাত (contradiction) উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্তই তর্কের প্রয়োজন। ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তর্ক বিনাই ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে। তাই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন 'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা'—(ন্যাঃ কুঃ ৩৭)—তাহাই আশঙ্কা করিতে পারা যায়, যাহা আশঙ্কা করিলে স্বক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না। ইহা কখন সম্ভব নহে যে ধূমের প্রয়োজন হইলে স্বয়ং বহ্নির গ্রহণ করিব, অথচ বহ্নি ধূমের কারণ নয়, ইহাও আশঙ্কা করিব।

গঙ্গেশ বোধ হয় অন্তর্ব্যাপ্তিবাদী জৈনগণকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা মনে করেন যে বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারা হেতুর অনৌপাধিকত্ব * (unconditionality) জ্ঞান হইলে ব্যাপ্তিগ্রহ

---

* তস্মাদ্‌ বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তে নেষ্টোঽবশ্যমিহাশ্রয়ঃ।
তদভাবে তু তন্নেতিবচনাদপি সঙ্গতেঃ॥
—কমলশীল, পঞ্জিকা পৃঃ ১৪৫

* হেতু যেখানে নিজের সামর্থ্যেই সাধ্যের জ্ঞাপন করে, অন্য কোন উপাধির (condition) অপেক্ষা করে না, সেই হেতুকে অনৌপাধিক বা সাধু হেতু বলে। যেমন ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমানে ধূমটী অনৌপাধিক হেতু। কিন্তু অগ্নির দ্বারা ধূমের অনুমানে অগ্নি সোপাধিক। কারণ যদি আর্দ্রেন্ধনসংযোগ (nourished by wet fuel) থাকে, তবেই অগ্নি ধূম উৎপাদন করে ; নতুবা

হয়, তাঁহাদের মত ঠিক নহে। কারণ তর্ক প্রমাণ নহে। ব্যভিচারাদিশঙ্কার নিরাস করিয়া তর্ক প্রত্যক্ষের সহকারী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ অনবস্থাভয়ে তর্ক ব্যতিরেকে যেখানে ব্যাঘাত-প্রযুক্ত-শঙ্কা মোটেই নাই, সেই ব্যাপ্তিগ্রহস্থলে তর্ক আমলেই আসে না। কাজেই তর্ক ব্যপ্তিগ্রহের অব্যভিচারী কারণ ইহা বলা যায় না।

আরও একটা কথা, কেবলান্বয়ী অনুমান স্থলে বিপক্ষ নাই এবং বিপক্ষ না থাকায় বিপক্ষে হেতু থাকিতে পারে, এই শঙ্কাও সেখানে উদিত হয় না। অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির মধ্যে অন্যতরের নিশ্চয় হইলেই অনুমিতির অনুভব হয়।

যুগপৎ উভয়ব্যাপ্তির উপস্থিতি হইলে, কোন্‌টা প্রয়োজক, ইহার একতর নির্ণয়ের সাধনরূপ বিনিগমক প্রমাণ (crucial evidence) না থাকায় উভয়ই প্রযোজক বলিয়া স্বীকার করিয়া ব্যতিরেকের গ্রহণ করা হয়। ব্যতিরেক কিন্তু বিপক্ষবৃত্তিত্ব-শঙ্কার নিবৃত্তি করিয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানে খাটিয়া থাকে। যেখানে বিপক্ষের অত্যন্তাভাব, সেখানে শঙ্কাই নাই, অতএব সেই শঙ্কা নিরসনের জন্য ব্যতিরেকব্যাপ্তির গ্রহণও আবশ্যক হয় না।

তাই যাঁহাদের মতে সমস্ত হেতুই ব্যাতরেকী, বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারাই ব্যাপ্তিগ্রহ সিদ্ধ হয়, হেতু সাধ্যের বহির্ভূত দৃষ্টান্ত বা পক্ষরূপ ধর্ম্মীতে হেতুর সত্তাজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানে অপ্রযোজক, হেতুসাধ্যের ভিতরেই ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় বলিয়া যাঁহারা সমস্ত ব্যাপ্তিকেই 'অন্তর্ব্যাপ্তি' এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মত ব্যভিচারদুষ্ট। মুখ ফুটিয়া না বলিলেও গঙ্গেশ যে এই কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই বলিয়া মনে করি।

এইরূপ আপত্তি জৈন ও বৌদ্ধগণ পূর্ব্ব হইতে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কল্পিত অসদ্‌বস্তুও ধর্ম্মী বা প্রতিযোগী হইতে পারে, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন, সদ্‌বস্তুই বিধি-প্রতিষেধের বিষয় হইতে পারে, অলীকের বিধি-প্রতিষেধ অসম্ভব; কারণ প্রতিষেধ করিতে গেলেই তো প্রতিযোগীর (যাহার নিষেধ করা হয়) সত্তা আসিয়া পড়ে বলিয়া স্ববিরোধ (self-contradiction) দোষ হয়। বাচস্পতি-গুরু ত্রিলোচন এবং ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে উদয়নাচার্য্য এবিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। রত্নকীর্ত্তি তাঁহার 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি' নামক প্রকরণে এবং জৈনগণ তাঁহাদের রচিত ন্যায়-গ্রন্থে সে সমস্ত যুক্তির ততোধিক বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। সে সমস্ত বিচার উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকে আরও জটিল ও ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করি না। এখানে সংক্ষেপে মাত্র সে বিচারের উল্লেখ করিব।

বৌদ্ধগণ বলেন, 'অবস্তু ধর্ম্মী বা প্রতিযোগী হইতে পারে না'—এই কথার অর্থ যদি এই হয় যে, বস্তুভূত ধর্ম্মের অবস্তু ধর্ম্মী হইতে পারে না, তাহা হইলে আমরাও সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু "অবস্তুভূত ধর্ম্মেরও 'অবস্তু' ধর্ম্মী হইতে পারে না", ইহাই যদি অর্থ হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা মানিয়া লইতে রাজী নই; কারণ তাহাতে 'স্ববচনবিরোধ'

কেবল (ধূমরহিত) অগ্নি অয়োগোলকেও (red hot iron ball) দেখা যায়। তাই উপাধির লক্ষণে (definition) বলা হইয়াছে, যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের অব্যাপক, তাহাই উপাধি। আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি সাধ্য ধূমের ব্যাপক, কিন্তু সাধন যে অগ্নি, তাহার অব্যাপক; কারণ অয়োগোলকে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ থাকে না। ইহার মূল কথা হইতেছে যে, যদি হেতু ব্যাপক (more extensive) হয়, এবং সাধ্য ব্যাপ্য (less extensive) হয়, তবে সেই হেতু সাধ্যের সত্তা জ্ঞাপন করিতে পারে না। সেই জন্য এমন একটা condition (উপাধির) দরকার, যাহা থাকিলে সাধ্য থাকিবেই, অর্থাৎ যাহা সাধ্যের সমব্যাপ্ত (co extensive)। এইরূপ উপাধির অপেক্ষা আছে বলিয়া অগ্নি "ধূমের" অনুমান করাইয়া দিতে পারে না; এইজন্য অগ্নিকে সোপাধিক (conditional) হেতু বলা হয়। সোপাধিক হেতু যে দুষ্ট (fallacious), তাহা বলাই বাহুল্য।

(contradiction in terms) উপস্থিত হয়। কারণ অবস্তুর ধর্ম্মিত্ব নাই, ইহা বলিলেই 'ধর্ম্মিত্বের অভাবরূপ' ধর্ম্মের বিধান (predication) করা হইল, অথচ তাহার আশ্রয় তো অবস্তু।

যদি বল 'অবস্তু' যখন প্রত্যক্ষগোচর হয় না, তখন তাহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন যে, মানবচিত্তের একটা কল্পনা-শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে অননুভূত অবস্তুরও সৃষ্টি করিতে পারে, এবং তাহাকে বাহিরের জিনিষ ভাবিয়া অধ্যবসায় করে। কাজেই, 'যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক', 'যাহা সৎ, তাহা প্রমেয়', এইরূপ অনুমানস্থলেও 'অক্ষণিক' ও 'অপ্রমেয়' অবস্তু হইলেও কল্পনা দ্বারা তদ্বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব হয় এবং সেই অবস্তু ধর্ম্মী হইতে 'সত্ত্ব' হেতুর ব্যাবৃত্তি-(absence)-জ্ঞান সম্ভব। এই প্রকার ব্যাবৃত্তিজ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান দৃঢ় হয় না। সংশয় একেবারে উপস্থিত হয় না, এ কথার শপথ ভিন্ন প্রমাণ নাই। অতএব সমস্ত হেতুই ব্যতিরেকী, ইহা সিদ্ধ হইল।

'প্রমেয়', 'জ্ঞেয়', ইত্যাদি পদার্থের ব্যতিরেক নাই, এই উক্তি অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। কারণ শব্দের উচ্চারণ করা হয় সংশয় বা বিপর্য্যয়ের নিরসনের দরুণ। সংশয়বিপর্য্যয়রহিত জ্ঞান উৎপাদন করাতেই শব্দোচ্চারণের সার্থকতা। অতএব জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্যই 'জ্ঞেয়', 'প্রমেয়' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ হয়, নতুবা কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি এইরূপ নিষ্প্রয়োজন শব্দ ব্যবহার করিবে? 'রূপ চক্ষুর্জ্ঞানবিজ্ঞেয়' এ কথাও বলার প্রয়োজন—যদিই কেহ আপত্তি করে যে, 'চক্ষুরাশ্রিত জ্ঞানই রূপের গ্রাহক নয়, শ্রোত্রাশ্রিত জ্ঞানও তাহার গ্রাহক হইতে পারে—কারণ, চিত্ত নিত্য।' এইরূপ সংশয় বা বিপর্য্যয় না থাকিলে শব্দব্যবহারই বিফল। তাই আচার্য্য (দিঙ্‌নাগ) বলিয়াছেন,—"অজ্ঞেয়ং কল্পিতং কৃত্বা তদ্ব্যবচ্ছেদেন জ্ঞেয়েঽনুমানম্।" (তঃ সঃ পৃঃ ৩৫৯—১১৮০ কাঃ)

কাজেই সর্বত্র বিপক্ষব্যাবৃত্তি, অথবা 'অন্যথানুপপত্তি'কেই হেতুর একমাত্র রূপ বলা উচিত। ত্রৈরূপ্য বা পাঞ্চরূপ্য তো অবিনাভাব ব্যতিরেকে নিরর্থক। ইহাকেই জৈন দার্শনিকগণ '**অন্তর্ব্যাপ্তি**' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা পক্ষ হইতে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত-ধর্ম্মীতে (যেমন মহানসে) হেতুসাধ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয় একথা বলেন, তাঁহাদের ব্যাপ্তিকে জৈনেরা 'বহির্ব্যাপ্তি' এই আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপ্তি যেখানেই গৃহীত হউক, ইহা সর্ব্বোপসংহারে গৃহীত হয়; ইহাতে ব্যভিচার সংশয়ের অবকাশ নাই। কারণ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যদি কোন স্থলে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যাপ্তি হইবে না।

তাহা হইলে 'অবাধিতত্ব' ও 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব'—এই রূপদ্বয়ের স্বীকারেরও আবশ্যকতা নাই। কারণ বাধিত ও সৎপ্রতিপক্ষ হেতুর সাধ্যের সহিত অবিনাভাব থাকিতে পারে না। বাধ ও অবিনাভাবের মধ্যে বিরোধ বর্ত্তমান [যদাহ—বাধাবিনাভাবয়োর্বিরোধাদিতি]। তাই, 'অগ্নিরূপ অবয়বী অনুষ্ণ, যেহেতু তাহা কৃতক, যেমন ঘট'—এই অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহার কারণ 'অনুষ্ণত্বের' সহিত 'কৃতকত্বে'র ব্যাপ্তি নাই; অনুষ্ণত্ব অগ্নিতে প্রত্যক্ষবাধিত বলিয়াই যে অনুমান সিদ্ধ হয় না, তাহা নহে। যদি অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া ঘটাদিতে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় বল, তাহা হইলে সাধ্য ও সাধনের অন্তর্ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে না। এইরূপ সাধ্যব্যাপ্তিশূন্য 'হেতু' হইতে সাধ্যসিদ্ধির আশা ক্লীব হইতে তনয়লাভের আশার ন্যায় ব্যর্থ।* অতএব 'অবাধিতত্ব'কে হেতুর রূপ বলা ভ্রান্ত।

* "যদিত্বনলমুৎসৃজ্য ঘটাদাবন্বয়গ্রহঃ।
নান্তর্ব্যাপ্তির্গৃহীতা স্যাৎ সাধ্যসাধনধর্ম্ময়োঃ॥
ততশ্চৈবংবিধাদ্ হেতোঃ স্বসাধ্যনিয়মোজ্ঝিতাৎ।
সাধ্যাভিলাষ ইত্যেবং ষণ্ঢাত্তনয়দোহদঃ॥
—স্যা০ ম০ পৃঃ ১১০-১১

ন্যায়মঞ্জরীকার কিন্তু বলেন যে সর্বোপসংহারে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়—ইহা সত্য। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মীর উল্লেখ (জ্ঞান)-পূর্ব্বক ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, ইহা অসম্ভব। কারণ ব্যক্তি অনন্ত, তাই ব্যক্তিপুরস্কারে ব্যাপ্তিগ্রহণ মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। আর যদি তাহাই সম্ভব হয়, তাহা হইলেও অনুমান বিফল হয়, কারণ ব্যাপ্তিগ্রহণ কালেই যদি অগ্নিমান্ ও ধূমবান্ ধর্মীর সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়, তবে অনুমানের আর বিষয় থাকে না। তাই সামান্যপুরস্কারেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে। পর্ব্বত, অরণ্য বা গৃহ ইত্যাদি ব্যক্তিপুরস্কারে ব্যাপ্তিজ্ঞান কেবল অসম্ভব নহে, ব্যর্থও বটে।*

ন্যায়মঞ্জরীকার আবার বলেন, অন্তর্ব্যাপ্তির স্বরূপ কি? সামান্যতঃ ব্যাপ্তি গৃহীত হইবার পরে প্রকৃত সাধ্যধর্মিবিশেষে ব্যাপ্তি স্মরণ হইলে সাধ্যের অনুমান হয়; এই ধর্মিবিশেষে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অন্তর্ব্যাপ্তি বলে। যেমন পর্ব্বতে অগ্নির অনুমান করিতে হইলে কান্তারে গৃহীত ব্যাপ্তিকে বহির্ব্যাপ্তি বলা হয়; সেইরূপ আবার সময়ান্তরে কান্তারে বহ্নির অনুমান করিতে হইলে তাহাকে 'অন্তর্ব্যাপ্তি' বলে। তাই 'যাহা কৃতক, তাহা অনুষ্ণ'—এইরূপ সামান্যপুরস্কারে ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ব্যাপ্তিগ্রহকালে বহ্নির জ্ঞানই উপস্থিত হয় না। তাই 'অন্তর্ব্যাপ্তি' স্বীকার করিলেও 'অবাধিতত্ব'কে হেতুর লক্ষণ বলিয়া মানিতে হইবে। [ন্যায়মঞ্জরী—পৃঃ ১১০-১১ দ্রষ্টব্য।]

কিন্তু ন্যায়মঞ্জরীকারের এই খণ্ডনপ্রচেষ্টা আত্মবিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কারণ, সামান্যপুরস্কারে ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, কোন ধর্মিবিশেষের উল্লেখ হয় না, একথা তো অন্তর্ব্যাপ্তিবাদীদিগেরই মত। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সামান্যপুরস্কারে অশেষ ব্যক্তির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানে আবশ্যক মনে করিয়া কেহ যোগিপ্রত্যক্ষকল্প যৌক্তিকপ্রত্যক্ষ, কেহবা মনের সর্ববিষয়ত্ব স্বীকার করিয়া মানসপ্রত্যক্ষরূপ একটী অলৌকিক জ্ঞানের কল্পনা করিয়া সামান্যাশ্রয় যাবদ্ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যখন সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের সহিতই সাধ্যের সম্বন্ধ জানা গিয়াছে, তখন সাধ্যের বাধ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আর নব্যনৈয়ায়িকদিগেরও যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ, তাহাও তো সামান্যপুরস্কারে অশেষ ব্যক্তির জ্ঞান উপপাদন করিবার নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে, নতুবা সামান্যজ্ঞানের জন্য কোন অলৌকিক প্রত্যক্ষের তো প্রয়োজন নাই। কারণ 'ব্যক্তি যে-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার অভাব ও তাহার সামান্যও সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' ইহা তো ধরাবাঁধা কথা। তাই ব্যাপ্তিতে অশেষ ব্যক্তির জ্ঞান হয় না—ইহা বলা তো নৈয়ায়িকের সাজে না। অন্তর্ব্যাপ্তিবাদীরাই বলেন যে ব্যক্তির (পক্ষ বা দৃষ্টান্ত যাহাই হউক্ না কেন) অনুল্লেখেই কেবল সামান্যের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, সামান্যপুরস্কারে অশেষ ব্যক্তিসমূহের মধ্যে নয়। আর এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের নিমিত্ত তাঁহারা কোন অলৌকিক বা অতিলৌকিক প্রমাণও স্বীকার করেন না; কেবল বিপক্ষে বাধকজ্ঞানের দ্বারা হেতু ও সাধ্যের অন্বয় গৃহীত হয়, এই কথা বলেন মাত্র। যেস্থলে সাধ্যের বাধ আছে, সেইরূপ সাধ্যের সহিত হেতুর তো অন্যথানুপপত্তিই নাই, তাহা আর কিরূপে হেতু হইবে?—কারণ হেতুর একমাত্র লক্ষণ 'অন্যথানুপপত্তি' বা 'বিপক্ষে বাধ।' অন্তর্ব্যাপ্তিবাদির বক্তব্যের ইহাই নিষ্কর্ষ।

(সমাপ্য)

---

* ধূমো হি যত্রযত্রেতি সামান্যেনৈব গৃহ্যতে।
ন পুনঃ পর্ব্বতেঽরণ্যে গৃহে বেত্যেবমিষ্যতে॥
—ন্যা০ ম০ ১১১পৃঃ

"উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানম্!"

তপঃশক্তি নাই বলেই যে এষণার চেয়ে ইষ্ট-কৃপার প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস, এটা একটা নির্ব্ব্যূঢ় সত্যি কথা। এ দুর্ব্বলতা মনের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে বলেই অনেক সময় সাধনোপকরণের দোষ দেখিয়েই আমরা রেহাই পেতে চাই। অনেকের মুখেই শুন্‌তে পাই, "সাধন-ভজন যে কর্‌ব, তার উপযুক্ত স্থান এবং উপকরণ কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য পালন তো কর্‌ব, এদিকে যে মাথা কুটেও একফোঁটা শাস্ত্রীয় গব্যরস পাওয়ার যো নেই। সাধন-ভজন করা বুঝি মুখের কথা?"

কেবল পারিপার্শ্বিকের দোষ দিচ্ছ কেন? আত্মশক্তিতে কি পারিপার্শ্বককে অনুকূল করে নেওয়া যায় না? যে কোন মহাপুরুষের কথাই ধর না কেন, তাঁরা কি এই জগৎ ছেড়ে অন্য কোন কাল্পনিক দিব্য-জগতে গিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন? এই বাংলা দেশেই পঞ্চবটীতলে যে সাধক শুধু প্রাণের সতৃষ্ণ আবেগ ঢেলে দিয়ে জগন্মাতার দর্শন লাভ করেছিলেন, তাঁর দুধ-ঘির বরাদ্দ কতখানি ছিল? নীরব দীক্ষা নিয়ে আজীবন তিনি নীরব সাধনা করে গিয়েছেন, আর সেই সাধন-শক্তি প্রভাবেই কাম-কাঞ্চনের যুগেও আধ্যাত্মিক জগতে এক নূতন প্রভাব বিস্তার করে যেতে পেরেছেন। এই যে আড়ম্বর-বিহীন মৌন-সাধনা, এর ফলেই বিবেকানন্দের মত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের সৃষ্টি। কে জান্‌ত, পল্লী-বালক গদাধরের ভিতর এত সাধনশক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে? দিন নেই, রাত নেই, এই যে একানিষ্ঠ দিব্য-উন্মাদনা—এইতো সাধকজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। যত মহাপুরুষ সত্যলাভ করে গিয়েছেন—সবার ভিতর একদিন এই অনিবার্য্য সাধন-স্পৃহাই জেগে উঠেছিল। তাঁরা কোন দিন এ কথা বলে মনের খেদ করেন নি, "আমরা উপযুক্ত স্থান এবং উপকরণ পেলেম না বলে কিছুই করে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।" তাঁদের ভিতর এ বিশ্বাসটী প্রবল ছিল—

"তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

ভগবানের এই আশীর্ব্বচনটীই তাঁদের সাধনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আর এ বিশ্বাসের ফলেই বাইরের উপকরণ-নিরপেক্ষ হয়েও সাধন-জগতের যা লভ্য, তা তাঁরা অনায়াসে লাভ করে গিয়েছেন।

আত্মদর্শনের ব্যাকুলতায় যেখানে নূতন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে কি সামান্য উপকরণের অভাব ঘটে কখনো? ভগবানের আশ্বাসবাণী কি তাহলে ব্যর্থ? ভগবান্ ভার বইবেন কাদের?—যাঁরা সততযুক্ত, তাঁদের।

অপরে যদি পেট ভরিয়েও আমায় খাইয়ে দেয়, তবু নিজ হাতে না খেলে তৃপ্তি হয় না। মহৎকৃপা, ভগবৎকৃপার অজস্র সাধুবাদ করেও সমস্ত শাস্ত্রকারই একবাক্যে ওই কথাটীর ওপরই জোর দিচ্ছেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলছেন, আপ্তোপদেশের পর অনুমান, তারপর প্রত্যক্ষ—এ না হলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না; তাই জ্ঞানের চরম কথা—প্রত্যক্ষ। পাতঞ্জলভাষ্যকার ব্যাস বলছেন, শাস্ত্র, অনুমান বা আচার্য্যের উপদেশের যথাভূতবিষয়ক জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ্য থাকলেও যতদিন পর্য্যন্ত তা আমাদের নিজের প্রত্যক্ষগোচর না হয়, ততদিন সমস্ত পরোক্ষের ন্যায় বোধ হয়ে থাকে। বেদান্তভাষ্যকার শঙ্করও বল্‌ছেন, নিজের মুক্তি নিজের হাতে; নিজে না জাগ্‌লে কি নিজের স্বপ্নঘোর ভাঙ্গে কখনো? খেয়েও যেন ঠিক্ পেট ভর্‌ল না—এ-ও তেমনি। গুরু এসে সব বলে দিয়ে গেলেন; কিন্তু আমার সাধন-ব্যাকুলতা দিয়ে যদি প্রত্যক্ষ দর্শন না হয় তবে যে অতৃপ্তিই থেকে

যাবে। কাজেই কৃপাবাদের লভ্য প্রসাদ নিয়ে যে আমার আত্যন্তিক তৃপ্তি হবে না, এ-ও তো সত্যি কথা।

গুরু এসে পথ দেখিয়ে দেবেন—কিন্তু সে পথে চল্‌তে তো হবে তোমারই। কাজেই শিষ্যের চেষ্টাই বলবতী হওয়া প্রয়োজন। আসল কথা হল শ্রদ্ধা নিয়ে। গুরু কি দিলেন আর না দিলেন, সে নিয়ে তো তীব্র আবেগসম্পন্ন সাধকের প্রাণে মোটেই বিচার জাগ্‌বে না। কবীরের দীক্ষা নেওয়া ব্যাপারটী এর এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। রামানন্দ প্রতিদিন মণিকর্ণিকায় স্নান করতে যেতেন। কবীর একদিন রাত্রিতে গিয়ে সেই ঘাটের সিঁড়ির ওপর মড়ার মত পড়ে রইলেন। ঘাটে নাম্‌বার সময় রামানন্দের খড়ম কবীরের মাথায় ঠেক্‌ল। তিনি সাপ মনে করে বলে উঠলেন—"রাম কহো !" কবীর সেই রাম-নামকেই দীক্ষামন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে বাড়ীতে ফিরে এলেন। আর সে অবধি অহর্নিশ রামনাম জপ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

> গৃহকর্ম্ম জাঁতি পাঁতি সকল ছাড়িয়া।
> তিলক তুলসী মালা ধারণ করিয়া॥
> সদা সেই মন্ত্রজপ দিবানিশি করে।
> মাতাপিতা বন্ধুগণে করে তিরস্কারে॥
> আপন ইমান ছাড়ি লৈল হিন্দুধর্ম্ম।
> কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম্ম॥
> তেই কহে গুরু মোর রামানন্দ স্বামী।
> দীক্ষা দিলা তিঁহ মোরে তাঁর দাস আমি॥
>
> —ভক্তমাল

কবীরের মা তো এ বৃত্তান্ত শুনে অবাক্। তিনি গিয়ে রামানন্দের কাছে বললেন, "তুমি আমার ছেলেকে দীক্ষা দিয়ে ধর্ম্মভ্রষ্ট কর্‌লে কেন ?"

রামানন্দ বল্‌লেন, "কই আমি, তো তাকে দীক্ষা দিইনি !" একথা শুনে কবীরের মা কবীরের চালাকী মনে করে বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে খুব তিরস্কার কর্‌লেন। কবীর সকল কথা শুনে রামানন্দের কাছে গিয়ে হাজির। সেদিন ভোরবেলায় গঙ্গায় যেতে রামানন্দের খড়ম যে তাঁর মাথায় ঠেকেছিল, আর রামানন্দ "রাম কহো !" বলেছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। রামানন্দ কবীরের ভক্তির প্রগাঢ়তা দেখে বল্‌লেন—

> "আনুষঙ্গ রাম নাম মোর মুখে শুনি।
> দীক্ষানিষ্ঠ হৈলে মহামন্ত্র করি জানি॥
> এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
> আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া॥
> তুমি আর যবন নহ বিপ্র হতে শ্রেষ্ঠ।
> যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥
>
> —ভক্তমাল

মোট কথা নিষ্ঠা চাই, প্রাণে নিদারুণ পিপাসা থাকা চাই ; গুরুর অজানাতেও তখন শিষ্যে শক্তি সঞ্চার হয়ে থাকে। সত্য তো কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। যে সত্যের সাধনা কর্‌বে, সত্য তাতেই সংক্রমিত হবে। সন্তুষ্ট হয়ে যা ভগবান দেবেন, সে তো আমার উপরি লাভ ; ন্যায্য পাওনা ভিক্ষা করে আদায় কর্‌তে যাব কেন ? কথায় বলে—"খাট্‌লে মাইনে আছেই।"

যা পেয়েছ, তার মাঝেই সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে উজাড় করে দাও। টাকা নেই, পয়সা নেই—হৃদয় তো আছে ! একথা তো কেউ অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। নাই বা হল আড়ম্বর : অন্তরদেবতার পূজা তো শুধু হৃদয়ের আবেগেই সম্পন্ন হতে পারে। যার যা আছে, তা নিয়েই উঠে-পড়ে লেগে যাও। নাই বলে অনুশোচনা কর্‌লে কি ফল হবে ? ধন দিয়ে, মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, যে ভাবে পার, ইষ্টের প্রীতিই তোমার জীবনের লক্ষ্য।

কত পথ, কত সুযোগ রয়েছে—চাই কেবল পিপাসা। মূলে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা চাই ; নদীও এই

সঙ্কল্পের জোরেই বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সাগরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

ফাঁকি দিয়ে যা পাই, তাও যে ফাঁকি। কেননা হঠাৎ-কৃপাদৃষ্টির তীক্ষ্ণ তেজ যে অপরিশুদ্ধ আধারে এসে টিকে না। তাঁর স্পর্শে যদি দেহ-মন-আত্মা থেকে ঘুমের যবনিকা উঠে যায়, তবে যে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তিই আস্‌বে না। তার পর ইন্দ্রিয়েরও তো একটা আপ্যায়ন চাই, তারা যে কিছু না করে তৃপ্তি পায় না। সেবাতেই তাদের পরম তৃপ্তি। আর সব লাভালাভের কথা না হয় বাদই দিলাম, সাধনায় ইন্দ্রিয়শক্তির একটা ঊর্দ্ধবিকাশ তো হয়! এই নিরেট স্থূল দেহটা এক জায়গায় সংহত হয়েছে, তার কি কোন প্রয়োজনীয়তা নেই? ইন্দ্রিয়গুলো কি উদ্দেশ্যবিহীন নিরর্থক সৃষ্টি?

চুপ করে বসে থাকা তখন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার মত এসে বুকে বিধ্‌বে। যিনি আমায় কৃপা কর্‌ছেন, তাঁর ঋণ শোধ কর্‌বার জন্য যে আমার মনপ্রাণ উতলা হয়ে উঠ্‌বে। তাঁর শক্তির তুলনায় আমার শক্তি তুচ্ছ বটে, কিন্তু এই একটুখানি শক্তি নিয়েই যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ব তখন। কিছুতেই আর তাঁর মহিমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব না যখন, তখন নিজকে একেবারে উজাড় করে ঢেলে দেব।—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার শক্তিতে আমি কতটুকু বুঝতে পারি, তার চেষ্টা করে দেখ্‌ব না কেন? শক্তি ও সামর্থ্য থাকৃতে কৃপার পাত্র হতে যাওয়া যে পাপ!

সাধনভজন করে কিছু হল না, একথা বল্‌বার সাহস কারও প্রাণে দেখি না; কিছু না করেও কেন কিছু হল না, এই হচ্ছে সবার অভিযোগ। যার যতটুকু সাধ্য রয়েছে, সে ততটুকুই করে দেখুক না—তাতে কোন ফল আছে কি না। গুরু তোমায় ভরসা দিয়েছেন—বেশ তো, এখন তো আরো নিশ্চিন্ত মনে সাধনায় লেগে যেতে পার। সাধনভজন করে কিছু হয় না—গুরুর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই কি এ কথার তাৎপর্য্য বুঝে ফেলেছ? সাধনভজন করে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁদের কথা মনে হয়ে একটু সন্দেহও কি জাগে না তোমার মাঝে? গুরুর কথা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার দরুণও তো অন্বীক্ষা চাই; তা না হলে তিনি হয়ত বলেছেন এক উদ্দেশ্যে, তুমি ব্যাখ্যা করে নিলে তোমার মন অনুযায়ী।

সংশয় যাদের রয়েছে, তাদের না হয় পদে পদে বিরতি; কিন্তু তাঁর কৃপালোকে তুমি তো পথের সন্ধান পেয়েছ, এখন তোমার দিক থেকে একটা প্রবল আবেগ জন্মাবে না? তিনি আমায় আকর্ষণ কর্‌ছেন, তাঁর কাছে যাওয়ার দরুণ যে ব্যাকুলতা—এই তো সাধনা। বল, এতেও কি স্থান-কাল-পাত্র চাই?

গুরুশক্তি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তো শিষ্যশক্তি বলেও একটা জিনিষ আছে। যাঁরা গুরুশক্তি লাভ করেছেন, তাঁদেরও দায় আছে, ঋণ আছে। যে ভগবানকে গুরু হৃদয়ে পেয়েছেন, শিষ্যের মাঝে তাকে না ফুটিয়ে তুলে গুরুর তো নিষ্কৃতি নাই। শিষ্যচিত্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লে তবেই না গুরুর মহিমা। সূর্য্যের আলো মাটীর ওপরেও পড়ে, স্ফটিকেও পড়ে; মাটীর দিকে তাকিয়ে বুঝ্‌তে পারি না সূর্য্যের কতখানি আলো; কিন্তু স্ফটিকের পানে তাকিয়ে স্ফটিক আর সূর্য্য দুটীকেই চিনতে পারি। গুরুর কৃপা আগুনের মত, আর শিষ্য যেন ইন্ধন; আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, যদি ইন্ধন শুক্‌নো থাকে। ভিজে কাঠ স্তূপাকার করে দিলে জ্বলন্ত আগুনও ধোঁয়া হয়ে যায়। আগুনের ধর্ম্ম তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না, আগুন সে আগুনই থাকে; কিন্তু বাধা পড়ে তার প্রকাশ, নষ্ট হয় শুধু আধপোড়া কাঠ-গুলো।

কৃপা পাওয়াটাই শিষ্যের গরজ নয়; কৃপা করাটাও গুরুর গরজ; বুকে দুধ জমে টন্‌টন্ করতে

থাক্‌লে ছেলেকে জোর করে হলেও মাই দিতে হয়, নইলে সোয়াস্তি নাই। সত্যস্বরূপে যিনিই প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাঁরি ইচ্ছা হবে—"অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" —আমি বহু হয়ে জন্মাব। গুরুর এই বহুরূপ শিষ্যের মাঝে—যেমন ব্রহ্মের বহুরূপ এই জগতে। কাকে ব্রহ্মের প্রতীক বলে, জান? যা উজ্জ্বল, যা কল্যাণ, যা সুন্দর। গীতাতে ভগবান বলেছিলেন, "বেশী আর কি বল্‌ব, জেনো আমিই এই জগৎটাকে চেপে রয়েছি; তবে যার মাঝেই দেখ্‌তে পাবে একটা বিশেষ তেজের স্ফুরণ, তাতেই জান্‌বে আমি বিশেষ করে আছি।" এই তো রহস্য। তিনিই সব হয়েছেন বলে একমেটে রায়ও দেওয়া চলে; আবার বল্‌তেও হয়, তিনি বিশেষ করে একটা কিছুতে ফুটে উঠেছেন। নির্ব্বিশেষের এই যে বিশেষ কিছু হওয়ার আকাজ্ক্ষা, জড়ের মাঝে চেতন হয়ে ফুটে উঠ্‌বার, আঁধারের মাঝে আলো ছড়াবার, অসুন্দরের মাঝে সুন্দর হবার বাসনা—এই হচ্ছে ভগবানের ভালবাসা, গুরুর কৃপা। ভগবানকেও সার্থক করতে পার তুমি। তুমিই যে শুধু তাঁর অপেক্ষা করে রয়েছ, তা নয়; তিনিও তোমার অপেক্ষায় আছেন। তাঁকে পেয়ে শুধু তোমার আনন্দ নয়, তোমাকে সুন্দর করে পেয়ে তাঁরও আনন্দ। শুধু বস্তুতত্ত্বই নয়, প্রকাশতত্ত্বও আছে; আর জগতের হিসাবে সেইটাই বড়। খনির আঁধারে হীরা আছে; সে হীরা রাজার মুকুটে উঠলেও সে যা তাই থাকে; তবুও তার দাম চড়ে যায়। খনির গর্ভে সে কয়লার সামিল, আর রাজ-মুকুটে সে আলো। অতএব ভগবানকে প্রকাশ করবারও একটা দায়িত্ব আছে আমার। আমার কাছে আমার ঠাকুরটী বাঁধা পড়েছেন, আমায় ভাল বেসেছেন বলে। ভাল যখন বেসেছেন, তখন আর ছাড়াছাড়ি নাই; আমার সু-কু শুভ-অশুভ সব তাঁকে নিতে হবে। আমি যদি অসুন্দর হই তো আমায় গায়ে মেখে তাঁকেও অসুন্দর হতে হবে। যে আমাকে প্রাণভরে ভালবাসে, আমিও যাকে প্রাণভরে না পারি, আমার ধরণেই একটু-আধটু ভালবাসি, তাকে জেনে-শুনে আমার ময়লা-মাটী মাখ্‌তে দিতে পারি কখনো? আমার কলঙ্কে তাকে কালো করতে পারি?

এইজন্য বলি, শুধু গুরুশক্তিই মানব কেন, আত্মশক্তিকেও মানতে হবে। আমার গৌরবে ভগবানের প্রকাশ, গুরুর মহিমা। এটাও আমার একটা দায়িত্ব—বড় রকমের একটা দায়িত্ব। বাপের বাড়ী যেখানেই থাকুক না কেন, বড়ঘরের ঘরণী যে দিন হয়েছি, সেদিন থেকে স্বামীর পরিচয়েই আমার পরিচয়; স্বামীর ঘরে আমি দাসীও বটে, আবার রাজরাণীও বটে। এই হল আত্মসমর্পণের পরিচয়! তিনি কি আমার অনাত্মীয় যে নাচদুয়ারে দাঁড়িয়ে কৃপার জন্য কাৎরাতে থাক্‌ব? তাঁর কাজই যে আমার কাজ। তিনি সুন্দর গড়তে চান, আমি সুন্দর হতে চাই; তিনি শক্তি দিতে চান, আমি শক্তি নিতে চাই; তিনি আমার মাঝে সার্থক হতে চান, আমিও আমার মাঝে তাঁকে সার্থক করতে চাই। তাঁর সঙ্গে আমার সগোত্র সম্বন্ধ। যে দিন পিতৃগোত্রা ছিলাম, সেদিন অন্য কথা বলা সাজত; কিন্তু গোত্রান্তরিতার তো সে উপায় নাই—স্বামীর প্রেমে, সম্রাজ্ঞীর মহিমায় ভিখারিণীর কুশ্রী দৈন্যকে আচ্ছাদিত করতেই হবে যে তাকে।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" জোর করে নিজকে তুল্‌তে হবে। "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু; আত্মা দিয়ে আত্মাকে টেনে তুল্‌বে, আত্মাকে অবসন্ন হতে দেবে না কখনো।" এই হচ্ছে সত্যিকার কথা। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় বসে থাক্‌লে কি হবে? তাতে তোমার পেটও ভরে কি? যত কিছু অথর্ব্ব ভাব আর কৃপাবাদের কাঁদুনী এসে পড়ে সাধনার বেলায়। জানো, অতিদৈন্য-পোরা কাঁদুনী-দর্শনের

মাঝেও একটা জোর আছে। কাঁদতে হলেও বুকের জোর লাগে। কচি ছেলে নাকি কেঁদে কেঁদে ফুস্‌-ফুসের জোর বাড়ায়। কান্নাটা উপলক্ষ্য মাত্র, জোরটাই হল আসল কথা। কাঁদবো কি রকম জানো? জেদী ছেলে যেমন একটা কিছু আদায় করবার ফন্দীতে কাঁদে; সে জানে, কান্না তার ব্রহ্মাস্ত্র। যা পেয়েছি, তাতে হচ্ছে না আমার, আরও পাব বলে কাঁদব, "হায় কিছু-হলো না" কান্না কাঁদব না কিছুতেই। কিছু হলো না বল্‌লেই ফুরিয়ে গেল? কেন হল না, খুঁজে দেখ, বুঝে নাও; যতটুকু বুঝতে পেরেছ ততটুকু কাজে খাটাও, বোধস্বরূপ আপনি তোমার বুকে জ্বলে উঠবেন, সেই আলোতে সামনে রাস্তা দেখতে পাবে। "চরৈব—চরৈব"—চল্—চল্—আগে চল্—বসে থাকবার হুকুম নাই কারু। শোন বেদের হুকুম—

নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তি
ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্বরো জন
ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
—চরৈব!

—ঘুরতে ঘুরতে যে শ্রান্ত হয়ে না পড়েছে, তার কখনো লক্ষীলাভ হয় না—এই কথাই শুনে এসেছি চিরকাল। হোক্ না সে বড় লোক, মানুষের মাঝে যে ঠুঁটো হয়ে বসে আছে, তাকে বলি—ধিক্! যে চরে বেড়ায়, ইন্দ্র তারই সখা।—অতএব চল্—চল্!

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে
ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্ব্বে পাপ্‌মানঃ
শ্রমেণ প্রপথে হতঃ॥
—চরৈব!

—যে চরে বেড়ায়, তার দুটী জঙ্ঘায় ফোটে ফুল, আর আত্মা তার পুষ্ট হয়ে ধরায় ফল। চলার শ্রমে যত পাপ তার পড়ে মরে থাকে পথের ধারে।—অতএব চল্—চল্!

আস্তে ভগ আসীনস্য
ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য
চরাতি চরতো ভগঃ॥
—চরৈব!

—যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও থাকে বসে; খাড়া হয়ে দাঁড়ালে ভাগ্যও খাড়া হয়ে ওঠে। যে শুয়ে পড়ে, তার ভাগ্যও ঝিমুতে থাকে; চরে বেড়ালে ভাগ্যও তখন চল্‌তে থাকে। অতএব চল্—চল্!

কলিঃ শয়ানো ভবতি
সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি
কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
—চরৈব!

—ঘুমিয়ে থাকলে তাকেই বলি কলি; আর ঘুম ছুটলে তবে দ্বাপর। উঠে দাঁড়ালো যদি, তবে হল ত্রেতা; আর চল্‌তে চল্‌তে তবে না সত্যযুগ! অতএব চল্—চল্!

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি
চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং
যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
—চরৈব!

—চরে বেড়াও, তবে না মধু পাবে! চরে বেড়াও, তবে না পাবে মিষ্টি ডুমুর! দেখ দেখি সূর্য্যের কি মহিমা! কেন জান? চল্‌তে চল্‌লে সে কখনো ঝিমোয় না, তাই। অতএব—চল্—চল্!

নবযুগ

—*—

"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"—যে পাপীরা নিজের জন্য পাক করে, তাহারা পাপই ভোজন করে।

গীতা বলিতেছেন, যাহা কিছু পাইয়াছ, তাহা দেবতার দান; তাঁহাদের জিনিষ তাঁহাদিগকে না দিয়া যদি ভোগ কর তো তোমাকে বলিব—চোর!

দেবতা বলিতে কি বুঝিব, আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। অদৃশ্য লোকে থাকিয়া যাঁহারা মানবের ভাগ্য এবং ভোগ নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাঁহাদের সহিত আর সেই আগেকার মত আত্মীয়তা অনুভব করি না। আজ কোথায়ও মূঢ়তা. কোথায়ও ভয়, কোথায়ও বা সংশয় আসিয়া উভয়ের মাঝে প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু দেবতা নাই, দেবতা-মানুষে পরস্পর "ভাবনা" নাই, ত্যাগের প্রয়োজন নাই, একথা বলিতে পারিব না। অশরীরী দেবতারা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু গণদেবতা আজ বিরাট্ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। নর এবং নারায়ণ একদিন পৃথক পৃথক ছিলেন; আজ কোন্ তাড়িৎশক্তির স্ফুরণে দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া দেখা দিয়াছেন—নর-নারায়ণ!

দেবতা আর দূরে নয়, কল্পনাবিলাসীর মনোরম চিত্র মাত্র নয়; আজ আমাদেরই আশেপাশে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি—দৈন্যের মাঝে, অজ্ঞানের মাঝে, ব্যাধির মাঝে, মৃত্যুর মাঝে। শ্রী এবং বিজয় যে তাঁহার মাঝে নাই, তা নয়; কিন্তু অলক্ষ্মী এবং পরাভবকে অস্বীকার করিয়া তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি না। সুখে-দুঃখে, আলোকে-আঁধারে সকলকে জড়াইয়া সমগ্র মানবজাতিই একটা বৃহৎ যৌথ পরিবার—এই বিরাট্ অনুভবটাই আজ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। অদৃশ্য লোকে থাকিয়া যে দেবতা নিখিল বিশ্বকে পরিচালন করিতেছেন বলিয়া স্তুতি গাহিয়াছি, আজ লোকান্তরের ব্যবধান দূর করিয়া দিয়া সেই দেবতাই নিখিলের মাঝে দৃশ্যরূপে ফুটিয়া উঠিতেছেন। চোখ বুজিয়া আর তাঁহাকে আঁধারের মাঝে খুঁজিতে হইবে না, অবারিত আলোকের মাঝেই আজ তাঁহার মর্ত্ত্য প্রকাশ।

এই দেবতার দিকে চাহিয়া মানুষ আবার নূতন করিয়া এই সত্যটী উপলব্ধি করিতে চাহিতেছে—"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা, যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ!"

মনে হয় একদিন এই কথাটাই যেন আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। স্বার্থের গণ্ডীতে নিজকে পোক্ত করিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমার জগৎটুকু একান্তভাবেই বুঝি আমার, আর কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই; আমার ইষ্ট শুধু আমারই, আর কাহারও নন। এই একচোখা ইষ্টরতি নিয়া আসিয়াছে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা, ব্যক্তিগত সাধনার অভিমান, ভূতহিতে আত্মোৎসর্গে অপ্রবৃত্তি।

অধ্যাত্মসাধনার ভান করিয়া কোন্ আঁধারে যে তলাইয়া যাইতেছিলাম, তাহা কে জানে? শুধু ভিতর বা শুধু বাহির, দুইটার একটাও তো একান্ত ভাবে সত্য নয়। দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে। সামঞ্জস্য কঠিন হইলেও সার্থকভাবে বাঁচিয়া থাকিবার ইহাই একমাত্র পন্থা। বাঁচার এই অব্যর্থ নিয়মকে আমরা জীবনে ব্যর্থ হইতে দিয়াছিলাম বলিয়াই মরিতে বসিয়াছিলাম। আজ বুঝি আবার স্রোত ফিরিয়াছে।

একটা বহিরাসক্তি, একটা চঞ্চলতা সব জায়গায় ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহার মাঝে শঙ্কার কারণ যথেষ্ট আছে; ভুল করিবার সম্ভাবনাও পদে পদে।

কিন্তু বহুদিন ধরিয়া গুমোটের পর গাছের পাতাগুলি একটু নড়িতে-চড়িতেই কালবৈশাখীর সম্ভাবনা জানিয়াও চিত্ত যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনি ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া অভিনবকে আবাহন করিবার একটা ক্ষীণ উদ্দীপনা সকলের মাঝে জাগিয়া উঠিতেছে না কি? বাহিরে-ভিতরে যে প্রাচীর যুগযুগান্তর ধরিয়া অটলভাবে খাড়া হইয়া ছিল, আজ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ুক, জগৎটাকে একেবারে বুকের অতি নিকটে পাইয়া জড়াইয়া ধরি, নিখিল মানবচিত্তের মহাতরঙ্গ-দোলায় দুলিতে থাকি, দেশভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ—সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির বাত্যান্দোলনের উর্দ্ধে এক নির্ম্মেঘ, প্রশান্ত, প্রভাস্বর লোকে আপনার দিব্য বিভূতিকে অসীম-ব্যাপ্ত অনুভব করিয়া সার্থক হই—এই আকুলতা বুকের মাঝে জাগিয়া উঠিতেছে না কি?

হয়ত পথ ভুল করিতেছি—হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া দাও; আপনাকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া হয়ত অপরাধ করিতেছি—ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের মত উপযুক্ত দণ্ড দাও, মাথা পাতিয়া লইব; পূজ্যের পূজা-ব্যতিক্রম ঘটিতেছে—দুঃসহ তেজের সহিত কি করিয়া স্নিগ্ধ ভক্তির সংমিশ্রণ হয়, সেই সঙ্কেতটা শিখাইয়া দাও!—কিন্তু আমাদের চলার পথে বাধা দিও না, হাত-পা বাঁধিয়া অন্ধকারায় পূরিয়া শিষ্টশান্ত করিয়া তুলিও না!

যে জড়, সেই শুধু আপনার ভারে আপনি নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে। অপরকে তাহার না হইলেও চলে, কেননা সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি অপরকে ছাড়িয়া দিতে হইলেও যে তাহাকে পরমপবিত্র জড়-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়! কিন্তু যে প্রাণবন্ত, আপনাকে নিয়া তাহার আশ মিটে না; আপনাকে উপচাইয়া সে কেবলই চাহে অপরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে। হয়ত বা সে আঘাত দেয়, নিজেও কত আঘাত পায়; কিন্তু মরণের ভিতর দিয়া জীবনের বিচিত্র রসধারাকে উৎসারিত করিতে জানে শুধু সে-ই!

সংশয় আসে, প্রাণের এই চঞ্চলতার মাঝে বুঝি অনেকখানি আত্মস্বার্থ লুকাইয়া রহিয়াছে; এর সবটুকুই শুধু আপনাকে পরের মাঝে বিলাইয়া দিবার আবেগ নয়, অপরকে কুক্ষিগত করিবার বুভুক্ষাও ইহার মাঝে আছে।

তা থাকিতে পারে। কিন্তু তবুও বলিব, রোগ-বীজকে পুষ্ট করিবার উপকরণ যে চঞ্চল রক্তধারার মাঝে রহিয়াছে, তাহাতেই আবার রহিয়াছে ব্যাধিনিবারণ করিবার শক্তি। আপনার জন্য যে আহরণ করিতে পারে, পরকে বিলাইয়া দিবার যথার্থ শক্তিও তাহারই আছে। প্রাণবন্তের যে সঞ্চয়, তাহা উপচাইয়া উঠিয়া প্রাণের উদ্বোধনেই ব্যয়িত হয়, ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম। গাছ রস সঞ্চয় করিয়া ফুল ফুটায়, ফল ফলায়, বীজ ছড়াইয়া আপনাকে বিস্তার করে। কিন্তু জীবন্ত বৃক্ষই তাহা পারে, স্থাণু তাহা পারে না।

আগে সঞ্চয় করি, তারপর সৃষ্টি করিব, ইহাই জড়বুদ্ধি। প্রাণ সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি করিয়া চলে। তাহার আদিম সৃষ্টিতে অন্তিমের পরিপূর্ণতা কেহই আশা করিতে পারে না, কিন্তু তবু তাহার সমস্ত প্রচেষ্টার মাঝে থাকে একটা সুষম ছন্দ, চরম পূর্ণতারই একটা আভাস।

প্রাণের সমস্ত প্রচেষ্টাকে মিলাইয়া এই যে একটা অখণ্ডবোধ, যুগধর্ম্মের আকারে ইহা কখনো ফুটিয়া উঠে। একটা অজানা ভাবে অনেকের চিত্ত সাড়া দেয়, ভাল করিয়া কিছু না বুঝিয়াই কাহার আহ্বানে তাহারা ঘর ছাড়িয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়ে। হঠাৎ দেখা যায়, এক পুরুষের মাঝেই একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে জাতির মাঝে। পিতার আজন্মসঞ্চিত সমস্ত সংস্কারের পুঁজিকে উপেক্ষা করিয়া পুত্র হঠাৎ একেবারেই

নূতন খাত বাহিয়া চলিতে সুরু করিল। ক্ষুব্ধ পিতা ভাবিল, পুত্র বুঝি উচ্ছৃঙ্খল; কিছুতেই বাগ মানাইতে না পারিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, কালের ধর্ম্ম!

হাঁ, কালের ধর্ম্মই বটে। কিন্তু এই কালকে চেনা চাই, ভক্তিপ্রণতচিত্তে ইঁহার দানকে মাথায় তুলিয়া লওয়া চাই। মহাতাণ্ডবে ধরণীর বক্ষ কাঁপাইয়া মহাকাল চলিয়াছেন, তাঁহার উদ্দামছন্দে-স্ফুরন্ত নৃত্যের আবেগ নিজের রক্তধারায় অনুভব করিয়া তাঁহারই সাথে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে যে! শীতের অবসানে একদিন পত্রপুষ্প-হীন গাছটার আগাগোড়া পাতার কুঁশিতে ভরিয়া গেল, ফুলে ছাইয়া গেল; কালকার রিক্ততার সহিত আজকার এই প্রাচুর্য্যের মিল নাই বলিয়া ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না। গাছের এই সজ্জাপরিবর্ত্তন তাহার অপরাধ নয়; বসন্তের প্রাণের জোয়ার আসিয়া তাহার মূলে লাগিয়াছে, তাই তাহার এই উল্লাস। গাছের শিকড় কাটিয়া দিয়া তুমি তাহাকে শাস্তি দিতে পার, কিন্তু বসন্তকে ঠেকাইবে কি করিয়া?

আজও জগৎ জুড়িয়া দেখিতেছি একটা চঞ্চলতা, একটা নীড়হারা উদ্দামতা। এখনও ইহার অর্থ সকলের কাছে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই; তাই আশায় উৎফুল্ল হইয়া কেহ ইহার সম্বর্দ্ধনা করিতেছে, আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া কেহ বা করিতেছে অভিসম্পাত। কিন্তু নটরাজের লাস্যলীলা তো কাহারও নিন্দা-স্তুতির অপেক্ষা করিবে না।

মুখর ভাষণ স্তব্ধ হইয়া যাক্; শান্ত সমাহিত হইয়া আপনার মাঝে ডুবিয়া গিয়া দেখ, কলকল্লোলের কোনও অর্থ বুঝিতে পার কিনা। কেহ বলিতেছে ইহা ধনিকের জয়, কেহ বলিতেছে শ্রমিকের জয়; কেহ বলিতেছে, ইহা প্রতীচীর যন্ত্রসভ্যতার মরণ আর্ত্তনাদ; কেহ বলিতেছে, ইহা প্রাচ্যের অধ্যাত্ম মহিমার বিজয়-ভেরী। আপন রুচি ও সংস্কারের অনুকূলে সকলেই ইহাকে ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তবুও ইহার অর্থ তো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না।

তবে এইটুকু বুঝিতে পারিতেছি, সহস্র বৎসর ধরিয়া যে অজগর আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিল আজ সে নড়িয়া উঠিয়াছে। বলিতে পার, ইহা গণদেবতার জাগরণ; কিন্তু সে দেবতা যে কোন্ বলি-উপহার লইয়া আজ তুষ্ট হইবেন তাহা তো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যন্ত্রশালার লৌহ-চক্রের ঘর্ঘর-গর্জ্জনই ইঁহার শ্রুতিসুখকর, না খোল করতালের মন্দ্র ধ্বনিই ইঁহার প্রিয়, তাহা কে বলিবে!

গণদেবতা সিদ্ধিদাতা; বিশ্বেশ্বরের পুরীতে ইনি দুয়ারী; অর্দ্ধমানব অর্দ্ধপশুর আকারে সিন্দুরচর্চ্চিত বিপুল তুন্দ লইয়া ইনি সে পুরীর দুয়ার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে আগে সন্তুষ্ট কর, তবে বিশ্বনাথের দরবারে প্রবেশাধিকার মিলিবে।

তাঁহার পূজার মন্ত্র আগেই বলিয়াছি।—আত্মপাক বর্জ্জন কর, প্রাণবন্ত হও। ক্ষুদ্র বেষ্টনী হইতে মুক্তি দিয়া নিজের প্রাণকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দাও; যত বিচিত্র সংঘাত, উন্মত্ত কলরোল, অপক্ষপাতে সকলকে আপনার বুকে তুলিয়া লও; সমস্ত বিবাদের ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া দূরপ্রসারিণী প্রজ্ঞা-দৃষ্টি দিয়া অনাগতের যবনিকায় কোন সাম্যের বার্ত্তা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে চেষ্টা কর।

তাঁতির মেয়ে

——):*:(——

বয়স হলে কি হবে, ঘরকন্নার কাজে পাকা হলে কি হবে, ধর্মের কথায় আমরা প্রায় সবাই ছেলেমানুষ। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সব সময় নিজে নিজে তা বুঝে উঠ্‌তে পারি না; তবে যাঁরা আমাদের চেয়ে ভাল বোঝেন, তাঁরা যদি বলে দেন তো বুঝ্‌তে পারি। তাতেও আবার কখনো কখনো গোল হয়; ঋষিরা, মহাপুরুষেরা যা বলে গিয়েছেন, তারই বা অর্থ কি, তাই নিয়ে আমাদের মাঝে ঝগ্‌ড়া বেধে যায়। ছেলেমানুষের মত আমরা কেউ বলি, "এই কথার এই অর্থ"; অমনি আর একজন হাঁ হাঁ করে বলে ওঠে, "না, কিছুতেই না, এই কথার এই অর্থ!" এমনি করে আবার সব গোল পাকিয়ে যায়, কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ, মানুষ তা ধরতে পারেনা; যার যা খুসী, তাই সে করে যায়, ভাবে— সে-ই ঠিক ধর্মের পথে চলেছে, আর সবাই পথ ভুল করছে। নিজের পথটাই ঠিক, আর সকলের পথটাই ভুল, এই নিয়ে সবাই যদি জেদ কর্‌তে থাকে, তাহলে গোলমাল আরও বেশী হয় না কি?

একেই তো মানুষের মাঝে ভাল লোক কম, মন্দ লোকই বেশী। তার মাঝে আবার চারদিকে এই গোলমাল দেখে মন্দ লোকেরা আস্কারা পেয়ে যায়, তাদের দাপটে ভাল লোকেরা সবাই চুপ হয়ে যান—চারদিকে একটা মহা হট্টগোল, মহা অশান্তি—অন্যায় আর অসত্যের ভারে পৃথিবী যেন টলমল কর্‌তে থাকে।

মানুষের এই ঘোর বিপত্তির সময় ভগবান্‌ নেমে আসেন মানুষের মাঝে। মানুষের মত হয়েই তিনি আসেন, মানুষের সঙ্গেই চলেন-ফেরেন, মানুষের মতই কথা কন বটে; কিন্তু তবুও তাঁর কাজে-কর্ম্মে কথায়-বার্ত্তায় এমন কিছু থাকে, যাতে যারা অহঙ্কারী-অত্যাচারী, তারা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়; যাঁরা সাধু, তাঁদের মন আনন্দে ভরে ওঠে; হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর একটী কথা শোনবার জন্য, দূরদূরান্তর হতে ছুটে আসে তাঁর পায়ে। তাঁর এক একটী কথায় মানুষের মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়, এতদিনকার ঝগড়া-বিবাদ সব মিটে যায়, মানুষ যেন নূতন আলোতে পথ দেখ্‌তে পায়। মানুষের মাঝে এমনি করে ভগবান্‌ বা তাঁর শক্তি নেমে এলে আমাদের শাস্ত্রে তাঁকে বলে অবতার।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে যখন ধর্ম্ম নিয়ে ওই রকম একটা গোলমাল চল্‌ছিল, তখন ভগবান্‌ বুদ্ধরূপে আমাদের মাঝে এসেছিলেন। সে সময় মানুষের মাঝে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, নানারকম উৎকট সাধন না কর্‌লে বুঝি আর ধর্ম্মলাভ হয় না। কিন্তু সবাই তো আর উৎকট সাধনা কর্‌তে পারে না; তাই যারা কিছু কর্‌তে পার্‌ত না, তারা ভাবত, "আমাদের দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হবে না, কাজেই ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে খাই-দাই ফুর্ত্তি করি—আর কি চাই!" আবার যারা শরীরকে কষ্ট দিয়ে নানা উৎকট সাধনা কর্‌ত, তাদেরও বিশেষ কিছু লাভ হত না; কেননা মনটাকে ভাল কর্‌তে না শিখ্‌লে শুধু শরীরকে কষ্ট দিলেই আর কি হবে?

এই সময় বুদ্ধদেব এসে বললেন, "ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কেবল খাওয়া-পরার সুখ নিয়ে মেতে থাকা, এ-ও যেমন ভাল নয়, তেমনি ধর্ম্মের নামে নানা উৎকট সাধনায় শরীরকে কষ্ট দেওয়া, এতেও কোনো লাভ নেই। তোমাদের চল্‌তে হবে ঠিক এই দুয়ের মাঝামাঝি পথ দিয়ে। তোমরা তিনটী কথা মনে রাখ্‌বে। প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখ্‌বে, তোমরা যেন

কোনও পাপ কাজ না কর। মিথ্যা কথা বলা পাপ; চুরী করা পাপ; প্রাণি-হিংসা করা পাপ; নেশা করা পাপ; কামের বশীভূত হওয়া পাপ। এই সমস্ত পাপ হতে দূরে থাক্‌বে। দ্বিতীয়তঃ, যা কুশল, যা কল্যাণকর, সর্ব্বদা তাই করতে চেষ্টা কর্‌বে। কিসে মানুষের কল্যাণ হয়?—কিছুতেই অন্যায় করব না, এমনি তেজ বা উৎসাহ মনের মাঝে রাখতে হয়; আর মনটাকে সর্ব্বদা স্থির, শান্ত রাখবার চেষ্টা করতে হয়। তৃতীয় কথা, মনটাকে শাদা রাখা। তার দরুণ সর্ব্বদা মনের মাঝে এই জোর রাখ্‌তে হবে যে 'আমি নিশ্চয়ই ভাল হব'; আর সকল রকম কুসংস্কার ছেড়ে দিয়ে সোজা সরল দৃষ্টিতে সব জিনিষ দেখতে শিখতে হবে। এমনি করে ভাল হয়ে চল্‌লে মানুষকে আর দুঃখ পেতে হয় না। এই হচ্ছে সত্যিকার ধর্ম্ম।"

বুদ্ধদেবের এই কথাগুলি এত সরল, এত সহজ যে সবাই তাঁর কথা বুঝতে পারে, সবাই তাঁর মতে চল্‌তে পারে। কিন্তু কথার চেয়েও বড় হল মানুষটা। নইলে অমন কথা তো সবাই বল্‌তে পারে, কিন্তু মানুষ তা শুনেও শোনে না কেন? অথচ বুদ্ধদেবের এই কথাগুলি শোনবার জন্যই কত দূরদূরান্তর হতে যে মানুষ ছুটে আস্‌ত, রাজারা পর্য্যন্ত এসে তাঁর পায়ে লুটাত। আড়াই হাজার বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজও মানুষ তাঁর কথা ভুল্‌তে পারেনি, আজও পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক তাঁকে ভালবাসে — তাঁর মতে চলে।

বুদ্ধদেব যে একজায়গায় বসে থাকতেন, আর সবাই কথা শোনবার দরুণ তাঁর কাছে ছুটে আস্‌তো, তা মনে করো না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি লোককে উপদেশ দিতে সুরু করেন, আর আশীবছর বয়সে মারা যান। এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তাঁর এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম ছিল না; এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে—তিনি কেবল খুঁজে খুঁজে বেড়াতেন, কে তাঁর আপন জন, কে তাঁর কথা শুন্‌বে। এমনি করে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত মানুষকে উপদেশ দিতে তিনি সারা দেশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তিনি আলবি বলে একটা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধদেব এসেছেন শুনে গ্রামবাসীরা তাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। আহারাদি শেষ হয়ে গেলে সবাই এসে বুদ্ধদেবকে ঘিরে বসেছে, তিনি কি বল্‌বেন, তা শোনবার দরুণ। বুদ্ধদেব সেদিন মরণের কথা তুললেন। বল্‌লেন, "দেখ, কতদিন বাঁচি আর না বাঁচি, তার কোনও ঠিক নেই; কিন্তু একদিন যে মর্‌তে হবেই, এ কথা ঠিক। কাজেই মরণের কথা সর্ব্বদা তোমাদের মনে রেখে চলা উচিত নয় কি? 'জীবন অনিশ্চিত, কিন্তু মরণ নিশ্চিত, একদিন আমায় মরতেই হবে, এই জীবনের শেষেই রয়েছে মরণ'—এই ভাবনা কি কখনো তোমাদের হয় না? মানুষ মরণকে ডরায়; কিন্তু আগে থেকে মরণের কথা জেনে রাখ্‌লে তো মরণের ভয়ে কাতর হতে হয় না। যারা কখনো মরণের কথা ভাবে না, মরণ এসে উপস্থিত হলে তাদের কেমন অবস্থা হয় জান? রাস্তার মাঝে হঠাৎ সাপ দেখ্‌লে মানুষ যেমন ভয়ে চীৎকার করে ছুটে পালায়, তেমনি তারাও মরণের কাছ থেকে ছুটে পালাতে চায়; কিন্তু পালাতে পারে কি? আর মরণের কথা যারা আগে থেকে ভেবে রেখেছে, মরণ এলে পর তাদের কি ভাব হয় জান? রাস্তায় সাপ তারাও দেখ্‌তে পায় বটে, কিন্তু তাদের হাতে থাকে লাঠি; তাই সাপটাকে দূর হতে আস্‌তে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লাঠির আগায় তাকে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাদের একটুকুও ভয় হয় না। কাজেই মরতে যখন হবেই, তখন সে কথা আগে থেকে ভেবে রেখে

মরণের জন্য তৈরী হয়ে থাকাই উচিত নয় কি?"

স্তব্ধ হয়ে সবাই বুদ্ধদেবের কথা শুনল। শাস্তার (বুদ্ধদেব সকলকে উপদেশ দিতেন বলে তাঁর আর এক নাম ছিল শাস্তা) কথা শুনে আর কার মনে কি ভাবের উদয় হল বলতে পারি না, কিন্তু একটী তাঁতির মেয়ের প্রাণে কথাগুলি খুবই লাগল। মেয়েটীর আন্দাজ ষোল বছর বয়স হবে। এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই মেতে থাকে, মরণের কথা আর কে ভাবতে চায়, বল! কিন্তু সেদিনকার কথা শুনে এই মেয়েটীর মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। তার বার বার মনে হতে লাগল, "বাস্তবিক, ঠাকুর যা বল্লেন, তা তো সত্যি! আর কি মিষ্টি তাঁর কথাগুলি! আজ থেকে আমি মরণের কথা ভাব্ব।"

সেই হতে মেয়েটা প্রতিদিন মরণের কথা ভাবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের কথা মনে করে তার মনটা আনন্দে ভরে উঠে। তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে, শাস্তা আর আলবিগাঁয়ে আসেননি। শাস্তাকে আবার দেখবার জন্য মেয়েটীর ভারী ইচ্ছা হত। সময় সময় অবাক্ হয়ে ভাবত, আর কি তিনি তাদের গাঁয়ে আস্বেন না?

প্রতিদিন ভোরবেলায় বুদ্ধদেব গন্ধকুটীর থেকে বেরিয়ে এসে আঙ্গিনায় পায়চারি করে বেড়ান। সারাদিন তাঁকে কি কি কাজ কর্তে হবে, এই তাঁর ঠিক করে নেবার সময়। ভোরের বাতাস যেমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে, অমনি কোথায় কোন্ আপনজনের সঙ্গে আজ দেখা হবে এই ভাবনায় তাঁরও চিত্ত উতলা হয়ে ওঠে। অন্ধকার মুছে দিয়ে ধীরে ধীরে যেমন আকাশের কোলে আলো ফুটে ওঠে, তেমনি শাস্তারও করুণ দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে জ্ঞানের আলো; সেই আলোতে তিনি স্পষ্ট দেখ্তে পান, আজ কোথায় কার সময় পূর্ণ হয়েছে, কে আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে তাঁর জন্য, কার কাছে আজ তাঁকে ছুটে যেতে হবে—

সেদিন ভোরবেলায় শাস্তার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ফুটে উঠ্ল, সেই তিনবছর আগেকার আলবি-গ্রামের এক চিত্র, যেদিন তিনি গ্রামবাসীকে মরণ-স্মৃতির উপদেশ দিয়েছিলেন।...... শাস্তা উপদেশ দিচ্ছেন, সবাই তন্ময় হয়ে তা শুন্ছে। ঘুরতে ঘুরতে শাস্তার স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টি একটী কচি মুখের ওপর পড়ে স্থির হয়ে গেল। কি সুন্দর সে মুখখানি, দুটী চোখে কি জ্বলন্ত উৎসাহ, কি সুগভীর বিশ্বাস, কি তীব্র আকুলতা! দেখ্তে দেখ্তে আর সমস্ত মুখের ছায়া মিলিয়ে গেল, শাস্তার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে রইল শুধু সেই মুখখানি!......শাস্তা চিন্তে পারলেন, এ যে আলবি-গাঁয়ের সেই তাঁতির মেয়ে! সেদিন তাঁর উপদেশ শুনে আর সবাই অভিভূত হয়ে পড়েছিল, শুধু এই মেয়েটীর প্রাণে সে কথাগুলি বিদ্যুতের রেখায় গেঁথে গিয়েছিল। এই তো তাঁর একটী আপনজন! বিস্ময়ে, আনন্দে শাস্তার প্রসন্ন মুখ আরও প্রসন্ন হয়ে উঠ্ল।

এর পর কি হল, তা দেখবার জন্য শাস্তার কৌতূহল হল। মেয়েটীর জীবনের তিন বৎসরের চিত্র তাঁর সম্মুখে ফুটে উঠ্ল।......কাজে-কর্ম্মে কোথায়ও তার এতটুকু খুঁত নাই, মনটী তার একেবারে স্ফটিকের মত নির্ম্মল; শাস্তার কথামত মরণের ভাবনায় মরণকে জয় করবার জন্য তার অটুট প্রতিজ্ঞা। গাঁয়ের যে পথ ধরে শাস্তা সেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, দিনের মাঝে কতবার এসে সেই পথের পাশে দাঁড়িয়ে কার প্রতীক্ষায় সে চেয়ে থাকে! দুটী চোখ তার ছলছল করতে থাকে, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার সে ধীরে ধীরে ঘরের কাজে ফিরে যায়।......শাস্তা বুঝতে পারলেন, কার জন্য মেয়েটীর এই আকুল প্রতীক্ষা। করুণায় তাঁর মন ভরে উঠ্ল। এর পর কি হবে, দেখ্বার জন্য তাঁর কৌতূহল হল।

আবার সেই আলবিগাঁয়ের ধর্মসভার ছবি শাস্তার সামনে ভেসে উঠল।......ধর্ম্মসভায় কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে, শাস্তাকে ঘিরে গ্রামবাসীরা সবাই কোলাহল করছে, তাঁরই সম্মুখে তন্ময় হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আছে সেই তাঁতির মেয়েটী—চোখে-মুখে সেই আত্মহারা ভাব······

কিন্তু এর পরেই দৃশ্যপরিবর্ত্তন হয়ে গেল। শাস্তা দেখলেন·· উঃ, কি মর্ম্মান্তিক সে দৃশ্য!—এ তো সেই তাঁতির মেয়েই বটে!—কিন্তু এ কি?······

মুহূর্ত্তের মাঝে শাস্তা তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করে ফেল্‌লেন। আজই তাঁকে আলবিগাঁয়ে রওনা হতে হবে সেই তাঁতির মেয়ের খোঁজে। ত্রিশ যোজন পথ, অনেকটা দূর; অথচ ঠিক সময়ে গিয়ে পৌছান চাই। আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা চলবে না তো।

শাস্তা তখন শ্রাবস্তীতে জেতবনের বিহারে ছিলেন। আনন্দ সংঘের কর্মকর্ত্তা; তাঁকে ডেকে শাস্তা বললেন, "ভিক্ষুদের বল, আমাদের এখনি আলবিগাঁয়ে যেতে হবে।"

পাঁচ শত ভিক্ষু নিয়ে শাস্তা আলবিগাঁয়ে এসে উপস্থিত হলেন। গ্রামবাসীরা শুন্‌ল, শাস্তা এসেছেন, গাঁয়ের বিহারে আছেন। শুনে সবাই ছুটে গিয়ে ভিক্ষুসহ তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এল।

এদিকে সেই তাঁতির মেয়েটীও শুনতে পেয়েছে—শাস্তা তাদের গাঁয়ে এসেছেন। শাস্তা এসেছেন শুনে তার শরীর-মন যেন আনন্দে এলিয়ে পড়ল। "ওগো, এসেছ তুমি—আমার পিতা, আমার স্বামী, আমার গুরু! আবার তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাব কি?"—ভাবতে ভাবতে তার দুটী চোখ জলে ভরে উঠল। শাস্তাকে দেখতে যাবে বলে সে তাড়াতাড়ি ঘরের কাজকর্ম সারতে লাগল। কাজ করতে করতে তাঁর কথাই বারবার মেয়েটার মনে পড়ছে, আর সে ভাবছে—"উঃ, সেই তিন বচ্ছর আগেকার দেখা, তাও আর কতটুকু সময়ের দরুণ! সেই সোণার ঠাকুর আবার এসেছেন, আবার তাঁর সোণার কান্তি দেখতে পাব, তাঁর মধুমাখা ধর্ম্মকথা শুনতে পাব!" ভাবতে ভাবতে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, দু'চোখ জলে ভরে যায়, বুক ঠেলে কান্না পায় যেন! অবাক্ হয়ে সে ভাবে, "·তদিন পর তাঁকে দেখতে পাব, এতে তো আনন্দ হবার কথা; তবে আমার কান্না পাচ্ছে কেন?"

ঘরের কাজ সেরে সে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় তার বাপ এসে উপস্থিত। বাপ বল্‌ল, "মা, সেদিন তাঁতে একখানা সাড়ী চড়িয়েছিলাম, তার বিঘতখানি এখনো বুনতে বাকী। মনে করেছি কি, আজ সে-টুকু শেষ করে ফেল্‌ব। কিন্তু সুতোয় তো কুলোবে না। আমি তাঁতশালায় চলে গেলাম, তুমি কিছু সুতো কেটে আমায় দিয়ে আস্‌বে, কেমন?" বলে তাঁতি চলে গেল।

মেয়েটী মহাসমস্যায় পড়ে গেল। এদিকে শাস্তার কাছে যাবার জন্য তার প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে, তার ওপর বাপের এই আদেশ। বেচারা কি করে? বাপকে সে বেশ চেনে; বাপ খায় দায়, ফুর্ত্তি করে, ধর্ম্মকথার বড় ধার ধারে না। নইলে আজ গাঁয়ে শাস্তা এসেছেন শুনেও সে চল্‌ল এই সময়টাতেই কাপড় বুনতে! মেয়ের যে একটু ধর্ম্মের ছিট্ আছে তা সে জানে; আর এইটাই তার একেবারে অসহ্য। কে জানে, আজকে হঠাৎ সুতোকাটার হুকুমটা মেয়েকে ঘরে আট্‌কে রাখবারই দুষ্ট বুদ্ধি কি না!

মেয়েটীর ভারি মন-খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাব্‌ল, "দূর হোক্ ছাই! বাবার কথা তো রোজই শুন্‌ছি, আজকে একদিন না শুন্‌লে আর কি হবে? না হয় খানিকক্ষণ বকাবকি করবে, দু'চার ঘা বসিয়ে দেবে; তা কি আর সইবে না? কিন্তু আজ না হলে ঠাকুরের কথা আর শুনতে পাব না যে!"

আবার ভাবল, "না, বাবার কথা না রেখে যদি ঠাকুরের কাছে যাই তো মনে একটু খুঁৎখুঁতি তো থেকেই যাবে, শাদা মন নিয়ে তো তাঁর কাছে যেতে পারব না। কাজেই কাজ যা সাম্‌নে পড়েছে, তা সেরে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত। কে জানে, হয়ত এইটাই আমার পরীক্ষা!"

এই ভেবে সে ঘরের পিঁড়েয় সুতো কাটতে বস্‌ল। সুতো কাটছে আর মনে মনে বল্‌ছে, "হে ঠাকুর, আজ তিনটী বচ্ছর দিন গুণে গুণে এসেছি—দেখো, দেখা না দিয়ে যেন চলে যেও না!"—আর তার দু' চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ছে।

এদিকে গ্রামবাসীরা শাস্তাকে এনে যত্ন করে বসিয়েছে, তাঁর এবং ভিক্ষুদের হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে খাবার দিয়েছে। এইবার শাস্তা তাদের কিছু বল্‌বেন, এই আশা করে তারা উৎসুকদৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকিয়ে আছে। শাস্তা চারদিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তাঁতির মেয়েকে কোথাও দেখতে পেলেন না। মনে মনে বল্‌লেন, "মেয়ে, ত্রিশ যোজন পথ ছুটে এসেছি শুধু তোমারই জন্য। সবাই আজ এল, কেবল তুমিই এলে না! আচ্ছা, তিনটী বচ্ছর তুমি আমার পথ চেয়ে ছিলে, আজ আমিও তোমার পথ চেয়ে রইলাম। বুঝেছি, ঘরের কাছে তুমি আটকা পড়েছ। কিন্তু যতক্ষণ তোমার না ছুটি হচ্ছে, ততক্ষণ আমিও মুখ খুল্‌ছি না। আজকে আমার প্রথম বাণী তোমারই জন্য!"

এই মনে করে শাস্তা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শাস্তা যখন নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌তেন, তখন চারদিক এমন থম্‌থমে গম্ভীর হয়ে উঠতো যে কারু কথা বলবার সাহস হত না।

এদিকে তাঁতির মেয়ের সুতোকাটা শেষ হয়ে গেছে। সুতোগুলো একটা ঝাঁপিতে পুরে সে চলল তাঁতশালায় তার বাপের কাছে সেগুলো পৌছিয়ে দিতে। দৈবাৎ তাঁতশালায় যাবার পথেই সেদিন গ্রামবাসীদের ধর্ম্মসভা বসেছে, মেয়েটি আগে তা জান্‌ত না। দূর হতেই ধর্ম্মসভা দেখতে পেয়ে আশায় আনন্দে সে চঞ্চল হয়ে উঠল, তার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল।……থাক্‌, তবু যাবার পথে তো সে তাঁকে একবার দেখতে পাবে?……

সভার কাছে এসে শাস্তাকে দেখে সে যেন একেবারে পাষাণপ্রতিমার মত অচল হয়ে গেল।—এই তো সেই মুখ, সেই হাসি, চোখে সেই করুণ চাউনী—আজ তিনটী বচ্ছর ধরে যে মুখের সে ধ্যান করে এসেছে! এই যে, তিনিও যে একদৃষ্টে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন! লজ্জায়, সুখে মেয়েটির মুখখানা ঘেমে রাঙা হয়ে উঠল, সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল—বুঝি বা সে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না!

কতক্ষণ এ ভাবে ছিল, তা সে বল্‌তে পারে না। হঠাৎ খেয়াল হল, কই, ঠাকুর তো কথা কইছেন না; এখনো তাহলে বুঝি উপদেশ সুরু হয়নি!—"যাই, এই বেলা তাহলে সুতোর ঝাঁপিটা ছুটে বাবাকে দিয়ে আসি গিয়ে"—এই ভেবে মেয়েটী জোর করে নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসে যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, শাস্তা ঘাড় উঁচু করে ঝুঁকে পড়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। আবার চার চোখে মিলন হল, মেয়েটীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল, চোখ বুজে সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। দু' এক পা যেতে না যেতে আবার ভয়ে ভয়ে পেছন পানে তাকিয়ে দেখে, এ কি!—শাস্তা যে তেমনি করে তাকিয়ে আছেন তার পানে! দুটী চোখ হতে করুণা আর ব্যাকুলতা যেন ক্ষরে পড়ছে—

নাঃ, আর তার বাবার কাছে যাওয়া হল না! ওই দুটী ব্যাকুল চোখের চাউনী দেখে তার মনে হতে লাগ্‌ল, শাস্তা যেন বলছেন, "তুমি যেও না, একটী-বার আমার কাছে এস—আমি যে এতক্ষণ তোমারই

প্রতীক্ষায় ছিলাম!" মেয়েটী সুতোর ঝাঁপিটা রাস্তার ওপরে রেখেই ধীরে ধীরে সভায় ঢুকে শাস্তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শাস্তার শরীর থেকে রামধনুর মত একটা জ্যোতির ছটা বেরুতো। সবাই সে জ্যোতি দেখ্‌তে পেত না বটে, কিন্তু শাস্তার কাছে গিয়ে এই জ্যোতি-র্ম্মণ্ডলের মাঝে যে দাঁড়াত, মুহূর্ত্তের মাঝে সে যেন আত্মহারা হয়ে যেত। তাঁতির মেয়েটীরও তাই হল। শাস্তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়্‌ল। তার মনে হতে লাগ্‌ল, বা'রে ভিতরে তার আলোয় আলোময় হয়ে গিয়েছে;—আর সে আলো তার ঠাকুরেরই আলো। সেই আলোতে সে তার ঠাকুরের মনটী যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পেল—তাঁর চোখের ইঙ্গিত, মনের ভাব যেন তার কাছে একেবারে স্পষ্ট, স্বচ্ছ হয়ে গেল। ইনি যে মহাগোতম বুদ্ধ, আর সে একটী সাধারণ তাঁতির মেয়ে—এ কথা সে একেবারেই ভুলে গেল, তার দেহ-মন-প্রাণ যেন ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌ল-"ওগো, আমি তোমার—তুমি আমার!"

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মেয়েটীর পানে তাকিয়ে থেকে শাস্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়ে, কোথা হতে এলে?"

মেয়েটীর চোখে একটা বিহ্বল দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌ল,—কান্নার ফোয়ারা বুক ঠেলে উঠ্‌তে চায় যে! রুদ্ধকণ্ঠে সে বল্‌ল, "জানি না, ঠাকুর!"

তেমনি অপলক দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

মেয়েটী উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌ল, "জানি না, ঠাকুর!"

শাস্তা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "জান না?"

মেয়েটী বিহ্বলের মত বল্‌ল, "জানি, ঠাকুর!"

শাস্তার মুখে একটী বিষণ্ণ-মধুর হাসি ফুটে উঠ্‌ল। তিনি ব্যগ্র হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "জান?"

মেয়েটী উদাসভাবে বল্‌ল, "না ঠাকুর, জানি না!"

চারিদিকের লোক সব হাঁ করে এই অদ্ভুত প্রশ্নোত্তর শুন্‌ছিল। এর যে কি অর্থ, তা তারা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ল না। তবে শাস্তা যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার ওপর তো কোনও কথাই হতে পারে না; কিন্তু এই হাবা তাঁতির মেয়েটা এ কি আবোল-তাবোল বলে গেল? "কোথা হতে এলে?"—তার জবাব হল কি না, "জানি না!"—কেন রে বাপু—এই তো তাঁতিবাড়ী থেকে বেরিয়ে এলি! হাতে সুতোর ঝাঁপি রয়েছে, যাচ্ছিস্ বাপকে সুতোর জোগান দিতে, বললেই হতো যে তাঁতশালে যাচ্ছি। তা না তো ঢং করে বলা হলো, "কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না।" এতটুকু মেয়ের আস্পর্দ্ধা দেখ! সম্যক্‌সম্বুদ্ধের কথায় যা-খুসী-তাই বলে যাচ্ছে!

চারদিকে একটা ভয়ানক কোলাহল হতে লাগ্‌ল। সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। মেয়েটীর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই! সে তেমনি তন্ময় হয়ে শাস্তার মুখের পানে চেয়ে আছে;—আর তার দু চোখ বেয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল পড়ছে, আনন্দে আবেগে বুকখানা ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে।

শাস্তা উত্তেজিত জনসঙ্ঘের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডান হাতখানা তুল্‌লেন শুধু। অমনি চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে উঠল—শাস্তা কি বলেন!

শাস্তা আবার মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আচ্ছা, মেয়ে, আমি যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কোথা হতে এলে?—তুমি বল্‌লে, জানি না। এ কথা কেন বল্‌লে?"

মেয়েটী মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বল্‌ল, "ঠাকুর, তুমি তো জানই আমি তাঁতিবাড়ী থেকে এসেছি। তবুও যখন জিজ্ঞাসা করলে, কোথা হতে এলাম, তখন তোমার প্রশ্নের এই অর্থ নয় কি যে, তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করছ, 'কোথা হতে এসে তুমি এই তাঁতির ঘরে জন্ম নিলে?' কিন্তু আমি তো

জানি না, ঠাকুর, জন্মের আগে আমি কোথায় ছিলাম। তাই তোমার প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লাম—জানি না।"

মেয়েটীর কথা শুনে শাস্তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বল্‌লেন, "হাঁ, ঠিক ধরেছ। আচ্ছা, কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করাতে তুমি বল্‌লে, জান না। কেন, বল দেখি ?"

মেয়েটী বলল, "আমি যে সুতোর ঝাঁপি নিয়ে তাঁতশালায় যাচ্ছি, তা-ও তো তুমি জান ঠাকুর। কাজেই তোমার প্রশ্নের অর্থ এই যে, 'মরবার পর কোথায় গিয়ে জন্মাবে, তা কি তুমি জান ?' কিন্তু তা তো আমি জানি না, ঠাকুর।"

শাস্তা খুসী হয়ে বল্‌লেন, "হাঁ, ঠিক বলেছ মেয়ে! আচ্ছা, যখন আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, জান না?—তুমি বল্‌লে, জানি। কেন, বল তো ?"

মেয়েটী বলল, "আমায় যে একদিন মরতেই হবে, এ কথা তো আমি জানি। তুমি সেই কথাই আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে না কি ?"

শাস্তা বল্‌লেন, "ঠিক! আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, জান ?—তুমি বল্‌লে, জানি না। এর অর্থ কি ?"

মেয়েটী বলল, "আমি যে মর্‌বই, সে কথা জানি বটে; কিন্তু কখন মর্‌ব, তা তো আর জানি না। তাই তোমার কথায় বলেছিলাম, জানি না।...কিন্তু কখন মর্‌ব, তা জানা না থাক্‌লেও যে কোনও সময়েই তো মরতে পারি, এই ভেবে মরণের জন্য তৈরী থাকা উচিত, না ঠাকুর ?"

এই শেষের কথাগুলিতে সেদিনকার একটী দৃশ্য মনে পড়ে শাস্তার প্রসন্ন মুখে যেন একটুখানি বিষাদের ছায়া খেলে গেল। সস্নেহে মেয়েটীর মাথায় হাত রেখে বল্‌লেন, "হাঁ, সব সময়েই মরণের জন্য তৈরী থাক্‌তে হবে বই কি!—তুমি আমার সব প্রশ্নেরই সুন্দর জবাব দিয়েছ, মেয়ে। আর এই তো আমার দেখা পেলে। তোমাকে দেখা দেব বলেই আজ ত্রিশ যোজন পথ ছুটে এখানে এসেছি। এখন তো দেখা হল; আর তো তোমার মনে কোনও দুঃখ রইল না, কেমন ?"

মহাগৌতমবুদ্ধের এত করুণা, এত ভালবাসা—তার মত একটী দীনাহীনা মেয়ের ওপর! এত স্নেহ, এত আদর তার যেন আর সইছিল না, মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি বুকটা ফেটে যাবে। শাস্তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

চারদিকের লোকজন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে একেবারে ছবির মত নিশ্চল হয়ে আছে। ধীরে ধীরে তাদের দিকে ফিরে শাস্তা গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "এ মেয়েটী কি বলছিল, তা বুঝবার এতটুকু সামর্থ্যও তোমাদের ছিল না, অথচ তোমরা মিছামিছি কোলাহল করে উঠেছিলে। দেখ, শুধু এই বাইরের চোখ দুটো থাক্‌লেই হয় না, ভিতরে জ্ঞানের চোখও ফোটা চাই। যাদের জ্ঞানচক্ষু নাই, তারাই অন্ধ; আর জ্ঞানদৃষ্টি যাদের ফুটেছে, তারাই বাস্তবিক চক্ষুষ্মান্। শোন—

অন্ধভূতো অয়ং লোকো
তনুকেত্থ বিপস্‌সতি।
সকুন্তো জালমুত্তো ব
অপ্‌পো সগ্‌গায় গচ্ছতি ॥

"অন্ধ সবাই জগৎ মাঝে—
চোখ ফুটেছে দু'চার জনার;
জাল-পালানো পাখীর মত
তাদেরি হক্ মুক্তি পাবার।"

বুদ্ধের শাসন সবাই মাথা পেতে নিল। তারপর তাঁকে প্রণাম করে, আশীর্ব্বাদ নিয়ে সবাই যে যার ঘরে চলে গেল।

গ্রামবাসীরা সকলে চলে গেলেও শাস্তা স্তব্ধ

হয়ে সেখানে বসে আছেন। বিষণ্ণ উদাস দুটী চোখে কত ব্যথা, কত করুণাই না ফুটে উঠেছে। বেলা পড়ে যায় দেখে আনন্দ ধীরে ধীরে বললেন, "ঠাকুর, ফিরবার সময় হল যে!"

শাস্তার যেন চমক্ ভাঙ্গ্‌ল। আনন্দের পানে মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললেন, "না, শেষ দেখা যে হয়নি এখনো!"

আনন্দ বিস্মিত হয়ে শাস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ কথার কি অর্থ, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

* * *

তাঁতির মেয়েও চলেছে সুতোর ঝাঁপি নিয়ে তাঁতশালায় তার বাপের কাছে। শাস্তার স্নেহের স্পর্শ পেয়ে আজ যেন সে আর দুখিনী তাঁতির মেয়ে নয়—সে রাজরাজেশ্বরী। আকাশ, বাতাস, পৃথিবী—সব আজ তার কাছে মধুময়। তার দেহে আজ আর কোন ভার নাই, যেন আলো হয়ে সে সবার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, তার ছোঁয়া পেয়ে সবই যেন ঝিক্‌মিক্ করে হাস্‌ছে। একটা অজানা আনন্দে তার শরীরটা বারবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

তাঁতশালাতে গিয়ে মেয়েটী দেখ্‌ল, তার বাপ মাকুটা হাতে নিয়ে তাঁতের ওপর বসে বসেই ঘুমুচ্ছে। বাপের ঘুম ভাঙ্গানো উচিত হবে না মনে করে সে আস্তে আস্তে সুতোর ঝাঁপিটা একপাশে নামিয়ে রাখ্‌তে যাবে, এমন সময় তাঁতশালের এক কোণে সেটা বেধে ঝুপ করে পড়ে গেল। সেই শব্দে তাঁতিও জেগে উঠে ঝোঁকের মাথায় তাতের মাকুটা সাঁ করে চালিয়ে দিল। মেয়েটী পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মাকুটা ছিট্‌কে একেবারে তার বুকের মাঝে বিঁধে গেল। "ঠাকুর!" বলে মেয়েটী মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল।

কি করে যে কি হল, তাঁতি প্রথমটায় কিছুই বুঝ্‌তে পারল না। হতবুদ্ধির মত মুহূর্ত্তের দরুণ নিজের কীর্ত্তির পানে তাকিয়ে থেকে তারপর "মাগো!" বলে একেবারে পাগলের মত মেয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

* * *

"ঠাকুর! তোমার ধন চুরী করে রেখেছিলাম—এই তার শাস্তি! এই নাও—তোমার জিনিষ তোমায় ফিরিয়ে দিলাম—আমায় শুধু শান্তি দাও ঠাকুর—আমার বুক যে জ্বলে গেল—"

রক্তাক্তদেহ মেয়েকে শাস্তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে তাঁতি মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌ল।

শাস্তা দেখলেন, রক্তে ভিজে মেয়েটীর পরণের সাড়ীখানা একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েছে।—কিন্তু সেই ফুটন্ত কমলকলির মত ঢলঢল মুখখানি!—মৃত্যুর আঁচে তার লাবণ্য একটুও ম্লান হয়নি, হাসিটী তেমনি ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে—মরণের দুঃখ যেন তাকে ছুঁয়েও যায়নি! দেখে কে বল্‌বে, এ মেয়ে মরেছে? এ যেন রাঙা চেলীপরা বিয়ের কনে, এতদিন পরে বরের হাত ধরে আপন ঘরে চলেছে!

ভিক্ষুরা এই দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে রইল। মহাসমুদ্রের মত অতল-গম্ভীর মহাসম্বুদ্ধের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল না কি? তাঁর করুণা-কোমল নীলোৎপল নয়নের কোণে এক ফোঁটা অশ্রুও এসে জম্‌ল না কি?

শাস্তা অনিমেষ দৃষ্টিতে মেয়েটীর মরণস্নিগ্ধ মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর শোকাচ্ছন্ন পিতার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "তোমার এ চোখের জল চার সমুদ্রকেও ছাপিয়ে উঠ্‌ছে।—কেঁদোনা—আমার সঙ্গে এসো—আমি তোমায় শান্তি দেব।"

—লেসকারবীভাবখ

স্বামী রামতীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

গুরু বদরীদেব

তীর্থরামের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়াছি, তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্রের অনুলিপিও দিয়াছি। মানুষ একান্তভাবে যাহা চায়, তাহা সে পায়, একথা একেবারে খাঁটী। বাহিরের জিনিষ চাহিয়া পাইতে গেলে বরং অনেক সময় বিলম্ব হয়, কেননা বহির্জ্জগতে দাতা এবং গ্রহীতার মাঝে অনেকখানি ব্যবধান, অনেক হাত ঘুরিয়া, অনেকের দাবী মিটাইয়া তবে দানটী আসিয়া গ্রহীতার হাতে পৌঁছায়। কিন্তু অন্তর্জ্জগতে যেখানে দাতা আর গ্রহীতা একাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, চোখের ভাষায় যেখানে প্রাণের খবরের আদান প্রদান চলে, সেখানে আমরা চাহিবামাত্রই পাই—এ কথা একেবারে নির্ভেজাল সত্য। অন্তরের যে ব্যাকুলতা দিয়া অন্তরদেবতাকে চাহিতেছি, সেই ব্যাকুলতার মাঝে, বেদনার মাঝেই যে তিনি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠেন; তাঁহার জন্য যে কাঁদিতে পারি, এইটাই যে তাঁহাকে পাওয়ার একটা অবিসম্বাদী নিদর্শন। অন্তরে যেখানে তিনি আর আমি একাকার হইয়া রহিয়াছি, সেখানে আমার হাসিতেই তাঁহার অধরকোণে হাসি ফুটিয়া উঠে, আমার কান্নাতেই তাঁহার বুক ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। "তুমি আমার—আমি তোমার" অথবা তীর্থরামের ভাষায় প্রেমনিবেদনের সর্ব্বোত্তম প্রকাশ—"তুমিই আমি—আমিই তুমি"—এই ভাবটী যদি চিত্তে গাঁথিয়া যায়, তাহা হইলে বিরহের ব্যাকুলতা একটা অভাবের তাড়না বা সংশয়ের কুহেলিকা না হইয়া ফুটিয়া উঠে অনির্ব্বচনীয় বিলাসে; তাঁহাকে না পাইয়া যে দুঃখ, সে দুঃখকে নিঙারিয়া নিঙারিয়া পান করি তাঁহারই সহিত মিলনের রভসানন্দ!

তীর্থরামের এই যে মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতা, ইহার অন্তশ্চর রহস্যটাই এই। তাঁহাকে না পাইয়া যে বিলাপ, সে বিলাপ তাঁহাকে আস্বাদন করিবারই একটা বিচিত্র ভঙ্গী। এই দিক দিয়া বলিতে পারি, তীর্থরামের অনুভব সিদ্ধানুভব; ইহার মাঝে সংশয়ের আন্দোলন নাই, মূঢ়তার আবরণ নাই; সত্যের অনির্ব্বাণ শিখা নিয়তই তাঁহার চিত্তে জ্বলিতেছে; সেই সত্যকেই আনন্দ দিয়া, বেদনা দিয়া, অশ্রু দিয়া, হাসি দিয়া তিনি আস্বাদন করিতেছেন। মাকে নাগালের বাহিরে দেখিলে শিশুর মাঝে যে ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, এ ব্যাকুলতা সেই ধরণের। শিশু জানে, মা একান্ত ভাবেই তার, তাহাকে ছাড়িয়া দূরে যাইবার সাধ্যও তাঁর নাই; তবুও যে তাঁহার এই ছলনা, ইহাতেই অভিমানে তাহার অশ্রুধারাকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। এ ক্রন্দন লীলারই একটা বিলাস; এ বিরহ মিলনেরই একটা নূতন ভঙ্গী।

এইজন্যই দেখিতে পাই, তীর্থরামের কান্নার যেন আর বিরাম ঘটিতেছে না। তাঁহার উচ্ছ্বসিত আকুলতার কূলে দাঁড়াইয়া আমরা প্রত্যাশা করি—একটা সুনিশ্চিত পরিসমাপ্তি, একটা ছক্‌বাঁধা পাওয়ার খবর। হয়ত তাহার একটু আভাসও পাই; তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবি, এইবার বুঝি তীর্থরামের সাধনার ইতি হইল, সিদ্ধি আসিয়া সকল বেদনা হরণ করিয়া লইল! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সবিস্ময়ে দেখি, মহাসমুদ্রে আবার জোয়ার আসিয়াছে, আবার ঢেউগুলি আছাড়ি-পিছাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অবাক্ হইয়া ভাবি, এ কি, এখনো ইহার ক্রন্দনের

বিরতি হইল না!—তবে কি ও কিছু পায় নাই? ন্যায়ের যুক্তি দিয়া, আঁক কষিয়া আমরা এই অন্তরঙ্গ অনুভবের কচিৎ-প্রকাশগুলিকে জুড়িয়া একটা মনোমত থিয়োরী খাড়া করিতে ভালবাসি। তাই বাজারে কড়ি দিয়া সওদা করার মত ওজনকরা কয়েক ফোঁটা চোখের জল দিয়াই আমরা ভগবান্‌কে সওদা করিয়া ফেলিতে চাই; ভাবি, কাঁদিলাম—পাইলাম—সব চুকিয়া গেল; তবে আবার নূতন কান্নাকাটি কেন? কিন্তু এ কথা জানিনা, অধ্যাত্মজীবনে এমন একটা অবস্থাও আসে, যখন এই অভাবের কান্না স্বভাবের কান্নায় পরিণত হয়; পাইয়াছি বলিয়াই কাঁদিয়া আকুল হই; কাঁদিয়া কাঁদিয়াই তাঁহাকে আরও নিবিড় করিয়া পাই। মেঘভারে চিত্ত স্তব্ধ হইয়া থাকে; ক্ষণে ক্ষণে বাদলধারা ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু বর্ষণ একেবারে ক্ষান্ত হয় না; কারণে-অকারণে আবার তাহা ঝরিয়া পড়ে; আর সকল ছাইয়া থাকে ওই আকাশজোড়া আনমিত মেঘসম্ভার। ব্যাকুলতার মাঝে, অশ্রুধারার মাঝেও এই অদ্বৈতের বিলাস। তীর্থরামের অদ্বৈতানুভবের আনন্দ এমনি করিয়া ঝলকে ঝলকে বর্ষার বারিধারার মত অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িত। প্রেরণাসিদ্ধ আবিষ্ট জীবনের (inspired life) এই রহস্যটুকু না জানিলে তীর্থরামের এই ব্যাকুলতার তাৎপর্য্যও বুঝিয়া উঠিতে পারিব না।

ভিতরে পাওয়া এইরূপে যখন সুনিশ্চিত হইয়া যায়, বাহিরটাও তখন অনুকূল হইয়া আসে। হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ পড়িয়াছে, অন্তরের উত্তাপে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে, এইবার বাহিরের আলো-হাওয়া আসিয়া স্বেচ্ছায় তাহার যোগানদার হইবে। জানিও, বাহিরটা ভিতরের দাস, ভিতরের ইঙ্গিত পাইয়াই সে চলে; অন্তরে যদি একটা ভাব অঙ্কুরিত হয় তো তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার দরুণ বিশ্বপ্রকৃতিই দায়ী। বাহিরটা থরে থরে সাজানো রহিয়াছে, শুধু ভিতরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গটা দীপ্ত হইয়া উঠুক। এই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া আমরা বাহির নিয়া কত যে টানাহ্যাঁচড়া করিয়া মরি, তাহার আর অন্ত নাই।

তীর্থরামের গুরুকরণ ব্যাপার হইতে এই সত্যের সমর্থন পাওয়া যায়। বারো বৎসরের বালক তীর্থরামকে এক মহাপুরুষ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শুনাইয়া যান, একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকারের তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া তীর্থরাম যখন ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনো আর এক মহাপুরুষ তাঁহাকে একটী ইঙ্গিতে সত্যের পথে আগুসার করিয়া দেন। সেই কাহিনীটী তীর্থরাম নিজে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"হৃষীকেশের রাস্তায় সত্যনারায়ণের মন্দিরে রাম সেদিন রাত্রিবাস করিয়াছেন। সকাল বেলায় সকলকে ছাড়িয়া তিনি একলা বাহির হইয়া পড়িলেন। একজন সংস্কৃত বিদ্যার্থী কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গী হইল। খুব ভোরেই বিদ্যার্থীটীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে রাম এক ভাববিহ্বল অদ্বৈতমূর্ত্তি মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। মহাত্মার পরিধানে একটী কৌপীন ছাড়া আর দ্বিতীয় আচ্ছাদন ছিল না; কৌপীনটীও আবার ফাটিয়া গিয়াছিল। পথে বদরীযাত্রী একজন শেঠের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহাত্মাটী ভাবাবিষ্ট হইয়া চলিয়াছেন। শেঠকে দেখিতে পাইয়া সহসা কৌপীনের ছিন্ন অংশের প্রতি সংকেত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ওরে, এই বদরীনাথ! দেখে যা!" সঙ্গে সঙ্গে রামের চোখে তাঁহার চোখ পড়িবা মাত্র

দুই জনেই হাসিয়া ফেলিলেন। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। **ইহার পরেই রামের মনের অবস্থার মহা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।** এই মহাপুরুষের নাম বদরীদেব।"

মহাপুরুষের সংকেতের অর্থ তীর্থরাম ইহাই বুঝিলেন যে ঈশ্বরদর্শন করিতে পাইব বলিয়া আমাকে বদরীনাথ ছুটিয়া যাইতে হইবে কেন? বদরীনাথ যে আমার মাঝে!—আমিই যে বদরীনারায়ণ! এই কথা যে তীর্থরাম আগে জানিতেন না, কিম্বা এরূপ ভাবনায় অভ্যস্ত ছিলেন না, তাহা নয়। মুন্সী ফর্ম্মানে সমস্ত কথা লিখিয়া আনিলেও যেমন বাদ্‌শার পাঞ্জার ছাপ তাহাকে অমোঘ করিয়া তোলে, তেমনি অন্তরের সত্যানুভব ও সাধু-শাস্ত্রের সমর্থনে বজ্রলেপের মত চিত্তে আঁটিয়া যায়। তীর্থরাম যে বলিলেন, ইহার পর তাঁহার মনের অবস্থা বদ্‌লাইয়া গেল, তাহার অর্থই এই। সত্যানুভবে যে বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তার ছায়া থাকে, গুরুমুখী বাণীর দীপ্তিতে তাহা নিঃশেষে মিলাইয়া যায়। ইহাই যথার্থ গুরুশক্তি। শিষ্য তাহার আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার পরেও এই গুরুমুখভাষণের একটা অপেক্ষা থাকে, ফর্ম্মাণ মজুদ থাকিলেও পাঞ্জার ছাপের প্রয়োজন হয়। উপনিষদে সত্যকামের কাহিনীতে এই রহস্যেরই ইঙ্গিত আছে। সত্যকাম আত্মশক্তিতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলে গুরু বলিলেন, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত প্রসন্ন দেখিতেছি, ব্যাপার কি? সত্যকাম বলিলেন, "অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ···ভগবাংস্ত্বেব মে কামং ব্রূয়াৎ; শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি—মানুষ ছাড়া অপর কেহ আমাকে শিক্ষা দিয়াছে বটে······এখন আপনি আমাকে যাহা বলিতে হয় বলুন। আপনার মত ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি, আচার্য্যের নিকট হইতে বিদ্যা বিদিত হইলেই তাহা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়া থাকে।"

আধুনিক একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন, "সত্যকামের কাহিনার এই শেষের অংশটুকু দাস-মনোভাবের প্রাচীনতম নিদর্শন। বেচারী সত্যকাম নিজের চেষ্টায় সত্য লাভ করিয়াও গুরুর জবরদস্তী হইতে উদ্ধার পাইল না; তাহাকে আবার খোসামোদ করিয়া গুরূপদেশ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে ঝালাইয়া লইতে হইল।" কথাটা আধুনিক মনোভাবেরই পরিচয় বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও স্মরণ রাখিলে ভাল হইত যে সত্যকামের গুরু সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যা ভজাইবার মোটেই চেষ্টা করেন নাই—গোড়া হইতেই তাহাকে একেবারে অগাধ জলে ছুঁড়িয়া দিয়াছিলেন, একটা মুখের কথা খসাইয়া পর্যন্ত তাঁহার আনুকূল্য করেন নাই। সত্যকাম যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মুখ দেখিয়া গুরুই ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই গুরু একেবারে আনাড়ি দল চর জাতের গুরু নহেন!

একটা কথা বলিয়া রাখি, আমাদের কপালগুণে আজ যাহাই দাঁড়াক না কেন, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্কটা কিন্তু অহি-নকুলের বা কর্ত্তা গোলামের সম্পর্ক নহে। শক্তির অপ্রতুলতা যেখানে থাকে, সেইখানেই জবরদস্তী ফুটিয়া উঠে। কিন্তু গুরুত্বহীন গুরুর নজীর দেখাইয়া প্রকৃত গুরুর অবমাননা করা কি সঙ্গত? তীর্থরামের জীবনেই দেখি, ছেলেবেলায় এক জবরদস্ত গুরুর হাতে পড়িয়া তিনি অনেক নাকানি চুবানীই খাইয়াছেন। ধন্নামল তাঁহার প্রথম জীবনের গুরু (?); কিন্তু এই গুরুর জীবনের কোনও সত্য তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠে নাই। ধন্নামল তাঁহাকে নিজের ভাণ্ডার হইতে এমন কিছুই দিতে পারেন নাই, যাহাতে তীর্থরামের জীবন জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিতে পারে। তবুও স্খলদ্‌গতি শিশুর মত প্রথম জীবনে তিনি তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াই

অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধন্নামলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের ভিতর দিয়া গুরুর মহিমা কিছুই ফুটিয়া উঠে নাই, ফুটিয়া উঠিয়াছে শিষ্যশক্তিরই গৌরব। মানি, ক্ষেত্র বিশেষে এই প্রকার গুরুরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু ইহাই গুরুর একমাত্র রূপ নয়। তীর্থরামের মহাবাক্যদাতা গুরু আর এই বদরীদেব, এই দু'জনই আত্মজীবনের ছন্দে তাঁহার জীবন বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, ইঁহাদের গুরুত্ব এইখানেই সার্থক হইয়াছিল। এইরূপ গুরুরা জবরদস্ত লাঠীবাজ নহেন, ইঁহারা শিষ্য-প্রেমের ভিখারী। একটা বদ্‌গন্ধ আছে বলিয়া "গুরুকৃপা" কথাটা বাদ দিয়াও বলিতে পারি—ইঁহারা মানুষকে অহেতুক ভালবাসেন, ভালবাসেন বলিয়াই যাচিয়া আসিয়া নিজের ঝুলি পরের দুয়ারে উজাড় করিয়া দিয়া যান।

এই যাচিয়া দেওয়ার মাঝে একটা রহস্য আছে। সেই কথাটাই এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছিলাম। তথাকথিত গুরু-শিষ্যের জবরদস্তীর সম্বন্ধটা যদি ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার একটী বড় মধুর চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। দেখি, গুরু-শ্রেণীর মানুষ জগতে আছেন, চিরকাল ছিলেন, চিরকাল থাকিবেন। সঞ্চয়ের ভারে ইঁহারা নুইয়া পড়িয়াছেন, সে বোঝা খালাস না করিতে পারিলে ইঁহাদের সোয়াস্তি নাই; তাই ইঁহারা খুঁজিয়া ফেরেন—মানুষ। আবার শিষ্য শ্রেণীর মানুষও আছেন জগতে—উগ্র অহমিকাকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া প্রপন্ন বুদ্ধি যাঁহাদের জাগিয়া উঠিয়াছে, নাভি-গন্ধে আত্মহারা কস্তুরীমৃগের মত যাঁহারা সত্যের সন্ধানে আকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, মনের মানুষের নিবিড় আসঙ্গলাভের পিপাসা। যাঁহাদের তনুর অণুতে অণুতে, সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবার পণ দিয়াই যাঁহারা সত্যস্বরূপকে চিরতরে আপন করিয়া লইয়াছেন। স্ত্রী পুরুষ যেমন পরস্পরকে খোঁজে, এই দুই শ্রেণীর মানুষও তেমনি পরস্পরকে খুঁজিতেছেন। কে যে ইঁহাদের মিলনে দূতী, তাহা জানি না। কিন্তু সাতসমুদ্র তেরনদীর ওপার হইতেও মানুষকে সে আনিয়া মিলাইয়া দেয় মনের মানুষের সঙ্গে; দুইটা হৃদয় এক হইয়া যায়; এই অদ্বৈত মিলনানন্দে ভগবান্ পূর্ণ মাধুরী লইয়া ফুটিয়া উঠেন।

এইখানে বুঝি, গুরুকে আগে আমার অন্তরে পাই; তাঁহাকে বাহিরে পাওয়া পরের কথা। অন্তরে যে দিন সত্যের জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়াছে, সেই দিন হইতে গুরুও জাগিয়াছেন। আমার ব্যাকুলতা একদিন তাঁহাকে স্থূলেই আমার কাছে টানিয়া আনিবে। আমার অন্তরের সত্যই গুরু; বাহিরের গুরুমূর্ত্তি তাঁহারই চিন্ময় বিগ্রহ মাত্র। যদি বল, অন্তরেই যদি গুরু পাইলে, তবে আর তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিয়া ফির কেন? শুধাই, মানুষ যে মানুষকে কতখানি ভালবাসে, সে খবর কি এখনো তোমার বুকে পৌঁছায় নাই? স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের বাড়া প্রেমও আছে জগতে; সেই প্রেমই মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়। এই প্রেমই যে ভগবান্, মানুষে মানুষে এই আত্মহারা প্রীতিতেই যে তাঁহার উল্লাস। তাই একলা খুঁজিয়া তাঁহার দেখা পাই না। তাঁহাকে দেখিতে হইলে এই জন্য মানুষ ধরিতে হয়; এ তাঁর আনন্দের আইন।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

—*—

অবিচারে আত্মদানের একটা লোকোত্তর মাহাত্ম্য আছে, তাহা স্বীকার করি। যেখানে মহত্ত্ব আছে, সেখানে আপনা হইতেই মাথা লুটিয়া পড়ে; ইহা সুন্দর এবং স্বাভাবিক। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে যেখানে কোনও মাহাত্ম্য খুঁজিয়া পাই না, অনুশাসন বশতঃ, আপ্তবাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ সেখানে মাথা লুটাইয়া দিলেও আমি যে ঠকিব না, আমার অসঙ্কোচ আত্মদানই যে আমাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে, এ কথাও স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। এই কথাটার উপর বেশীমাত্রায় জোর দিয়াই আমাদের দেশে কতকগুলি অতিভক্তির আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহাদের জয়গান যেখানে-সেখানে শুনিতেও পাই বটে। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়", "লম্পট-মাতাল হইলেও পতিই পরম গুরু", "ব্রাহ্মণ যাহাই হউক না তথাপি সে পূজ্য"—ইত্যাদি বচন আমাদের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, এই নির্ব্বিচার ভক্তির দ্বারা আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শিষ্য, পত্নী অথবা শূদ্র তাহার স্বধর্ম্ম পালন করিয়া লোকোত্তর মহিমা লাভ করিতে পারে। যেখানে ভাল-মন্দ বিচার করিবার দরুণ নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ নাই, সেখানে অগত্যা এই পন্থাই যে কথঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ, তাহাও স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু ইহার পরেও একটা কথা থাকিয়া যায়, যেটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা নয়, যে কথাটা সমস্ত সমাজকে, সমগ্র জাতিকে লইয়া। যিনি মাতাল গুরুও নন, তাহার অনুগত শিষ্যও নন; লম্পট স্বামীও নন, তাহার পতিব্রতা স্ত্রীও নন; দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণও নন, সেবানুরাগী শূদ্রও নন; অথচ এই উভয়পক্ষের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী যিনি, যিনি সমগ্র সমাজকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার শিবানুধ্যানে অভ্যস্ত, তিনি এই ক্ষেত্রে কি বলিবেন? এই নির্ব্বিচার ভক্তিকে তিনি কি আখ্যা দিবেন? তিনি কি শাস্ত্রাভিজাতদের সুবিধার দিকে তাকাইয়া কেবল বিনাইয়া বিনাইয়া আত্মসমর্পণের বুলিই আওড়াইতে থাকিবেন? "অকপট সরল বিশ্বাসে অসত্যের সেবা করিয়া" যদি একপক্ষ বৈকুণ্ঠের রথে চাপিয়া বসে, তাহাতেই কি সমাজ উদ্ধার হইয়া যাইবে, সমাজপতির কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে? ধর্ম্ম কি শুধু আমার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির একটা শাস্ত্রসম্মত উপায় মাত্র? ধর্ম শুধু আমাকেই বহন করিবে—এই লোককে, সমাজকে বহন করিবে না?

*

ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা আমাদের আজ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে ধর্ম্মের এলাকায় দাঁড়াইয়াও আমরা দশের কথা ভাবিতে পারি না। স্ত্রী যখন ধর্ম ভাবিয়া লম্পট স্বামীর নিকট আত্মদান করে, তখন এ কথা সে বুঝিতে পারে না যে এই আত্মদানে তাহার ব্যক্তিগত ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তাহার সন্তানের মহাসর্ব্বনাশ হইবে, যে কুলের সে কুলবধূ, তাহার মহা অকল্যাণ হইবে। শূদ্র যখন ধর্ম্ম ভাবিয়াই ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের পদসেবার মৌতাত কাটাইয়া উঠিতে পারে না, তখন সে দেখিতে পায় না, তাহার এই আচার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে সে স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিলেও অসত্যের প্রশ্রয় দিয়া তাহার সমাজকে সে নরকের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে যে! শিষ্য দেখে না, অন্ধ গুরুভক্তি দ্বারা তাহার নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া লইয়াও সে দেশের আধ্যাত্মিক দৈন্যকে দিন দিন বিভীষণ করিয়া তুলি-তেছে। উভয় পক্ষ যেখানে যোগ্য, সেখানে অসঙ্কুচিত

প্রীতি-ভক্তিতে শুধু ব্যক্তিগত জীবনই যে সার্থক হয়, তাহা নহে, দেশও তাহাতে নন্দিত হয়, দেবলোকও তৃপ্ত হন। ধর্ম্মের এই একটা দিকও আছে, যেখানে ধর্ম্ম শুধু আমার ব্যক্তিগত লাভ নয়, উহা আমার সমাজের, আমার দেশের, আমার জাতির মহা-অভ্যুদয়ের নিদান। যতদিন এই ব্যাপ্তিবোধ আমাদের ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" কথাটার সার্থকতাও ছিল; ততদিন সন্ন্যাসীও বলিতেন, তাঁহার ধর্ম্ম "আত্মনো মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায় চ"; "বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ"—বসন্তের মত লোকহিত আচরণ করা তাঁহার জীবনের ব্রত। শুধু ব্যষ্টির কথা একান্তভাবে না ভাবিয়া সমষ্টিকেও অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই বুদ্ধদেব তাঁহার ভিক্ষুসঙ্ঘকে আদেশ করিয়াছিলেন, "চরথ ভিক্‌খবে চারিকং বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়, লোকানুকম্পায়, অত্থায় হিতায় সুখায় চ দেবমনুস্সানং—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য বিচরণ করিতে থাক!" আজ অসত্য এবং অধর্ম্ম আমাদের সেই সমগ্রদৃষ্টির বাহানাটুকু মাত্র লইয়া সমাজের পুণ্য বেদীতে বসিয়া যজ্ঞের পুণ্যহবিঃ লেহন করিতেছে। আমাদের অধঃপতন হইবে না তো কাহার হইবে?

*

আজ নারীজাগরণ, শূদ্রজাগরণ একটা বিভীষিকার মত আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে দেশে খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট নাই, সে দেশ এই নবজাগরণের ধাক্কাটা কোনওরকমে সাম্‌লাইয়া লইতে পারে; কিন্তু যে দেশে খাদ্যের ভাণ্ডার শূন্যপ্রায়, সে দেশে কোনও একটা কিছু জাগিতেছে শুনিলেই আতঙ্ক হয়। মনে হয়, আরে বাপু, যতক্ষণ ঘুমাইয়া আছে, ততক্ষণ তো খাবারের ভাবনা থাকিতেছে না; জাগিয়া উঠিলেই যে ক্ষুধা অনুভব করিবে, খাইতে চাহিবে; তখন পেট ভরাইব কি দিয়া? নূতন একটা কিছুর জাগার খবর পাইলেই যে আমরা ক্ষেপিয়া উঠি, তাহার মূলে সম্ভবতঃ নিজের এই শক্তিদৈন্যের অনুভব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমাজে নূতন কিছু ঘটিলে তাহাকে সামলাইবার সামর্থ্য আমাদের নাই; তাই পচা ধসা পুরোণো ব্যবস্থাগুলিকেই কোনও রকমে টিকাইয়া রাখিবার দরুণ আমাদের এত ব্যাকুলতা। গোলমাল করা দূরে থাকুক, গোলমাল সহার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত আমাদের লোপ পাইয়া গিয়াছে; তাই আধ্যাত্মিকতার নীড় রচনা করিয়া পরম আয়েসের সহিত তাহার মাঝে কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া আছি। কথায় কথায় আমরা কর্ম্মবাদের দোহাই দিই; যে নীচে পড়িয়া আছে, সে যদি উপরে উঠিতে চাহে তো তাহাকে ধমক দিয়া বলি, আরে মূর্খ, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে তুই আজ নীচে পড়িয়া আছিস্, উপরে উঠিবার চেষ্টা করিয়া কর্মফল লঙ্ঘন করিতে চাস্—শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে চাস্? আমাদের অদৃষ্টেই কেবল অনিশ্চিত পূর্ব্বজন্ম আর পরজন্মটা যত কর্ম্মফলের ঝুড়ি সমেত কায়েম হইয়া রহিয়াছে। ইহজন্মটা তো জন্মই নয়—ওটা মায়া; আর এ জীবনে কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু ফল পাওয়া যাইবে, কোনটাই থাকিবে না—কেননা দুধারেই যে পূর্ব্বজন্ম আর পরজন্মের আওতা, জীবনের মাঝে তাপ কোথায়? কিন্তু কর্ম্মফলের এমন গাজুরি ব্যাখ্যাতেও সমাজ আর টিকিতে চাহিতেছে না, অস্বস্তি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সমাজপতি হইয়া ব্যক্তিগত কর্ম্মফলটা কোনওরকমে ফাঁকি দিয়া যদি বা আত্মসাৎ করিতে পারি, সমষ্টির কর্ম্মফলকে কোনমতেই হজম করিতে পারিতেছি না। তোমার কর্ম্মবাদই বলিয়া দিতেছে, স্ত্রী-শূদ্রের জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী-শূদ্রকে চিরকাল শুনাইয়া আসিয়াছ, "সেবা ও আনুগত্যই তোমাদের

ধর্ম্ম; স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই তোমরা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করিবে।” স্ত্রী-শূদ্রেরা কোনও দিন ইহাতে আপত্তি করে নাই, অম্লানবদনে তাহারা স্বামিসেবা করিয়া আসিয়াছে। এই স্বধর্ম্মাচরণের ফলটা কোথায় যাইবে? আজ পুরুষ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, ব্রাহ্মণ পতিত; অথচ স্ত্রী-শূদ্র স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা এখনো রক্ষা করিয়া চলিতেছে। ভগবানের বিচারে, কর্ম্মফলে বণ্টনে এই অসামঞ্জস্যের পরিণাম কি দাঁড়াইবে? অনুপযুক্ত হইয়াও যাহারা আত্ম-পরকে প্রবঞ্চিত করিয়া সেবা গ্রহণ করে, সেবকের নিষ্ঠার কাছে তাহাদের পরাজয় হইবে না কি? সেব্যের অধর্ম্ম সেবকের ধর্ম্মদ্বারা পরাভূত হইবে না কি? স্ত্রী-শূদ্রের আনুগত্য শ্রীরূপে, শক্তিরূপে সমাজকে ততদিনই পালন করিবে, যতদিন পুরুষ তাহার পৌরুষে ও ব্রাহ্মণ তাহার ব্রাহ্মণ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যেদিনই ইহার বিপর্য্যয় ঘটিবে, সেইদিনই মহাশক্তির অবমাননায় রুদ্রের তৃতীয় নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, মহাকালের প্রমথবাহিনীর তাণ্ডবে অহমিকার দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হইয়া যাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে মহত্তর ভারতের উদ্‌গাতা ব্যাসদেব স্বেচ্ছাচারী আর্য্যজাতির এই ঘোর বিপদ্ আসন্ন দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; যে স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুকে বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য ইতিহাস-পুরাণরূপী পঞ্চম বেদ রচনা করিয়া, বিরাট্ mass-educationএর প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজকে সুনিশ্চিত ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—একূল-ওকূল দুকূল বাঁচাইয়াছিলেন। সেই “বিশালবুদ্ধি” বাদরায়ণের বচন আওড়াইয়া আমরা এখনও বলি—“স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা”—এবং ইহার অর্থ করি, প্রতিষেধমুখে। কিন্তু যে ভাগবত হইতে এই শ্লোকাংশ উদ্ধার করি, তাহার প্রকরণ (context) আলোচনা করিয়া দেখি না, এই শ্লোকটী নিষেধবাক্য নয়, “কৃপণবৎসল” বাদরায়ণের করুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস! আবারও দেখিতেছি, মহাঝড় আসন্নপ্রায়। লাঞ্ছিত মহাশক্তির আপ্যায়ন দ্বারা নূতন মহা-ভারতের রচনায় উদ্বুদ্ধপ্রাণ বাদরায়ণের আবির্ভাব কি আমাদের মাঝে হইবে না? নহিলে এই জরাজীর্ণ জাতি যে মহাকালের প্রলয়তাণ্ডবে চূর্ণ হইয়া যাইবে!

*

বর্ত্তমান সভ্যতার যে সমস্ত বেয়াড়া বুলি ঝাড়িয়া অভিনবত্বের দাবীতে আমরা লম্ফ-ঝম্ফ করি, তাহার সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সুচিন্তিত মত উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি যাঁহারা বর্ত্তমান সভ্যতার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে একটুকুও চিন্তা করেন, তাঁহারা এই বিজ্ঞের উক্তিকে সমর্থন করিবেন।—“মানুষের সভ্য মন যে সেদিনকার সৃষ্টি, এখনও যে তাহার পরিণতির অনেকখানিই বাকী, এ সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতেরা সকলেই একমত। এই সভ্য মন সর্পিল গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; আদিম যুগের বর্ব্বরোচিত আকাঙ্ক্ষা ও মনোবৃত্তি লইয়া সেই প্রাচীন কালে ফিরিয়া যাইবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা ইহার মাঝে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। মানবশিশুর মাঝেই এই ঝোঁকটা অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠে। ইহাতে এই প্রমাণ হয়, এখনও মানুষ বর্ব্বর হইয়াই জন্মগ্রহণ করে; সমাজের সভ্য আচরণ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, শিক্ষাসাপেক্ষ মাত্র। কদাচ কখনো যে দুটী একটী সাধু-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহাদের পুণ্যশক্তিই সভ্যতার প্রগতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। একটা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিকে যদি আজ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে এই সভ্যতা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে, মানুষ সহসা ফিরিয়া বর্ব্বর হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্যই দেখি সমাজবাদ বা কম্যিউনিজম্, অরাজকতাবাদ বা এনার্কি এমন

করিয়া মাঝে মাঝে সমাজের ভিত্তিকে সাংঘাতিকরূপে টলাইয়া দেয়, কারণ মূলতঃ এই সমস্ত বিপ্লববাদ আবার সেই বর্ব্বরযুগে ফিরিয়া পাইবার উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে দুই-চারিটী চিন্তাবীরের স্কন্ধে বর্ত্তমান সভ্যতার গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, এই বিপ্লবপন্থীরা তাঁহাদেরই উচ্ছেদকামনা করিয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ বৎসর সাধনার পর মানবমন আজ এই যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে; প্রত্যেক যুগেই দুটী চারটী মনীষার মনই যথাসম্ভব পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া সর্ব্বভূতের হিতে আত্মোৎসর্গ দ্বারা সভ্যতার প্রগতিকে সহায় করিয়া থাকে। হোমার, প্লাটো, শেক্সপীয়ার, ডারউইন্, হাক্সলীর মত মনীষী বা উদ্গাতা জগতে অতি বিরল। পনের আনা মানুষই কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকে—আর সে বাঁচাও যেমন-তেমন করিয়া টিকিয়া থাকা মাত্র; তাহারা জাতিকে এমন কিছু দিয়া যাইতে পারে না, যাহা জাতির প্রগতির অনুকূল। কখনো কখনো অনুভব করি, অন্তর্জ্জগতে আমরা কত অন্ধ; আমরা কি-ই বা বুঝি, কি-ই বা দেখি, কি-ই বা ভাবি! এই দুই চারিটী মাহেন্দ্রক্ষণে, আমাদের সাধ হয়, যে সমস্ত নেতাকে আমরা ভুল বুঝিয়াছি, যে সমস্ত ভাবুককে বিদ্রূপ করিয়াছি, তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতিকে আমাদের চিত্তে অমর করিয়া রাখি, সরলান্তঃকরণে স্বীকার করি যে আমাদের মূঢ় পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি আমাদিগকে এমন বিভ্রান্ত করিয়াছে যে, যে-উচ্ছেদবাদীরা আমাদের চিত্তকে পঙ্কিল করিয়া ফেলে, আর যে দার্শনিক ভাবুক তাহাকে পুণ্যশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন, উভয়ের মাঝে আমরা কোনও তফাতই দেখিতে পাই না যেন! আমাদের এই সামাজিক জীবনের বয়স বড় জোর ত্রিশহাজার বৎসর। যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সাধনায় মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই কাল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; আর ব্যক্তিত্বের জাগরণ ভিন্ন সমাজের উদ্বর্ত্তনও কখনও সম্ভবপর নয়। সৃষ্টির পর যে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ বর্ব্বরতার পাঁকে গড়াগড়ি দিয়া আসিয়াছে তাহার তুলনায় এ সময় নিতান্তই সঙ্কীর্ণ নহে কি?"—ভারতবর্ষ এই atavismএর কি প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়াছিল, বর্ত্তমান সমাজ ধুরন্ধরেরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? এই পণ্ডিতের চিন্তার কষ্টিপাথরে ভারতের সমাজ-বিবর্ত্তনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে যাচাই করিয়া দেখিবেন কি, আমাদের কোন পথ ধরিয়া চলা উচিত?

*

খুলনা জেলার কপিলমুনিতে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার লইয়া হিন্দু-মিশনের তরফ হইতে যে সত্যাগ্রহ চালান হইয়াছিল, সুখের বিষয় উভয় পক্ষের আপোষে মিটমাট হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। যে সমস্ত সর্ত্তে আপোষ হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী সর্ত্ত এইরূপ—"নিত্য ভোগের সময় ব্যতীত দিবসের সকল সময়ে সর্ব্বজাতির মন্দিরে প্রবেশাধিকার থাকিবে।" সর্ত্তগুলির মধ্যে এই সর্ত্তটারই যাহা কিছু গুরুত্ব, অন্য সর্ত্তগুলি প্রায়ই মামুলী ধরণের, তাহাদের মাঝে অভিনবত্ব কিছুই নাই। এই সর্ত্তটীর ভাষাও কিছু অস্পষ্ট। সর্ব্বজাতির প্রবেশাধিকার বলিতে কি বুঝিব? পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সর্ব্বজাতির প্রবেশাধিকার থাকিলেও বিশেষ বিশেষ কয়েকটী জাতি সেখানেও বাদ পড়িয়াছে। এখানেও কি তাহাই হইবে? মন্দিরে প্রবেশ বলিলেই বা কি বুঝিব? মন্দিরের অঙ্গনে কিম্বা নাটমন্দিরে প্রবেশও মন্দির প্রবেশ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে; গর্ভগৃহে প্রবেশ না করিলেও মন্দির-প্রবেশ করা হইল বলা চলে। সত্যাগ্রহীরা এই সমস্ত খুঁটিনাটীর কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা না জানিলে তাঁহাদের আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে

জোর করিয়া কিছু বলা যায় না,—মনে হয় ব্যাপারটা যেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হইল।

*

দেবমন্দিরে সর্ব্বজাতির প্রবেশাধিকার লইয়া কিছুদিন যাবতই আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনটা মূলতঃ আধ্যাত্মিক আন্দোলন নয়, বচন-রচনে বোঝা যায়, ইহা পুরামাত্রায় রাজনৈতিক আন্দোলন। আন্দোলনের দুইটী উদ্দেশ্য—"অচ্ছুতোদ্ধার" বা অনুন্নত হিন্দুর উন্নয়ন এবং "হিন্দুসংগঠন" বা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা। দুইটীই আবার একটী মূল উদ্দেশ্যের অনুগত—সেটী হইতেছে সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করা। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধু, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তাহা সর্ব্ব ক্ষেত্রে হিতকর কিনা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হিন্দুদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার দরুণ প্রধানতঃ এই উপায়গুলি অবলম্বন করা হইতেছে দেখিতে পাই।—(১) সর্ব্বজাতির হিন্দুর মধ্যে স্পর্শবিচার না করিয়া পানাহারের প্রচলন; (২) সর্ব্বজাতির হিন্দুর মধ্যে বর্ণবিচার না করিয়া যৌনসম্পর্ক স্থাপন; (৩) সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুকে কোন একটা বিশিষ্ট মন্ত্রে প্রকাশ্যভাবে দীক্ষা দান; (৪) সার্ব্বজনীন পূজা-পার্ব্বণাদির অনুষ্ঠান; (৫) দেবমন্দিরে সর্ব্বজাতির প্রবেশাধিকার স্থাপন; (৬) সর্ব্বজাতিকে উপবীত প্রদান। যাঁহারা হিন্দু-সংগঠনের উদ্যোক্তা তাঁহারা বিশ্বাস করেন এই ব্যবস্থাগুলি সমাজে প্রচলিত হইয়া গেলেই হিন্দুসমাজ দ্রাঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে! এ বিষয়ে মুসলমান-সমাজকে হিন্দুর আদর্শরূপে উপস্থাপিত করা হয়। ইংরেজ-সমাজকেও আদর্শ করিতে অবশ্য আপত্তি নাই, কিন্তু মুসলমানের যেমন ধর্ম্মান্ধতা আছে, ইংরেজের সেরূপ নাই বলিয়াই তাহার সামাজিক জীবনের আদর্শটা যেন আমাদের কাছে কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দুসমাজ শুদ্ধি ও সংগঠনের প্রসাদাৎ যদি অচিরে মুসলমান-সমাজে পরিণত হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই! কিন্তু সেইটাই হইবে কি না সন্দেহ। সংগঠনের নীতিটাই যে সংগঠনের বিরোধী হইবে না, শুদ্ধির প্রণালীই যে শুদ্ধির মুণ্ডপাত করিবে না, তাহা কে বলিল? মনে হয় সংস্কারকেরা সমস্যার এই দিকটাতে সেরূপ নজর না দিয়া রাতারাতি একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার জন্য আদা-জল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন এবং সংবাদপত্রের মারফতে যতটুকু ঢাক পিটান যাইতে পারে, ততটুকু পিটাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেছেন। ফলে হিন্দু সমাজ সত্য সত্যই শুদ্ধ ও সংগঠিত হইয়া উঠিতেছে কিনা, সে বিষয় সন্দেহ থাকিয়াই যাইতেছে।

*

সংস্কারকেরা যে ব্যবস্থাগুলির প্রচলন করিলে হিন্দু সমাজ সংহত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেগুলির প্রচলনের প্রধান বাধা হইতেছে জাতিভেদ। জাতিভেদ না থাকিলে উপরিউক্ত কোনও সামাজিক বালাই থাকে না। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কারান্দোলনের ফলে জাতিভেদ বাস্তবিকই ঘুচিয়া যাইতেছে কি? আমাদের মনে হয়, জাতিভেদ যাইতেছেও, যাইতেছেও না। প্রথমতঃই দেখিতে পাই, সংস্কারকেরা জাতিভেদটাকে তুলিয়া দিতে গিয়া সেই ভেদবুদ্ধিটাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন। জাতিভেদ বর্জ্জনের একটা বহুলপ্রচারিত ব্যাখ্যা হইতেছে—ব্রাহ্মণের একাধিপত্য নিবারণ বা ব্রাহ্মণপাতন। অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিবার জন্য ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে তাহাকে বিধিমত উত্তেজিত করিয়া তোলা হয়। ফলে কি হয়? অব্রাহ্মণের পক্ষও যেমন "সংগঠিত" হইয়া উঠে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণের পক্ষও তেমনি সংগঠিত হইয়া উঠে অব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে; তাহাতে জাতি-বিদ্বেষটা আরও প্রবল আকার ধারণ করে। সংগঠন হয় বটে, কিন্তু সেটা "উল্টা-বুঝিলি-রাম" গোছের সংগঠন। আজ-

কাল ব্রাহ্মণসম্মিলন হইতে আরম্ভ করিয়া নমঃ-শূদ্র সম্মিলন, ঝাড়ুদার সম্মিলন ইত্যাদি কত সম্মিলনে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সমস্ত সম্মিলনের আত্মগঠন একটা উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু আরও একটা গভীর উদ্দেশ্য—নিজের হক বজায় রাখা এবং অপরকে হিংসা করা। যিনি ঝাড়ুদার সম্মিলনের সভাপতি হইয়া গড়ের মাঠে বক্তৃতা করিলেন, তিনি মনে করিলেন, পতিতের দুঃখে গলিয়া গিয়া তিনি ভারতমাতার না জানি কত বড় উপকারটাই করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এ দিকে বিচার করিয়া দেখিলেন না, যে ঈর্ষার সয়তান এতদিন ঘুমাইয়া ছিল খোঁচাইয়া যে তিনি তাহাকে জাগাইয়া দিয়া গেলেন; অথচ সয়তানের সয়তানী নিবারণ করিবার এতটুকু ক্ষমতা তাঁহার নাই। এই হাজারো সম্মিলনের মাঝে কোথাও একটা সর্ব্বসমঞ্জস স্নিগ্ধোদার বাণী শুনিতে পাই না, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির কথা শুনিতে পাই না—শুনি শুধু ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রভুত্বপ্রিয়তার কোলাহল। জাতিভেদের নাগপাশ খুলিতেছে, না আরো আঁটিয়া বসিতেছে? আগে এই আঁটা-সাটির মাঝে কুশ্রীতা ছিল না, জাতিতে জাতিতে বড়-ছোট ভেদ থাকিলেও ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি ছিল, সমাজে সোয়াস্তি ছিল। কিন্তু আজকাল একি অসন্তোষ, অবিশ্বাস, কলহের ইতরতা!

*

তারপর এই সমস্ত আন্দোলন খবরের কাগজের স্তম্ভ ছাড়া আর কোথায়ও যে সফল হইতেছে, দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহাও তো মনে হয় না। এইখানে একটা সত্যাগ্রহ, ওইখানে একটা শুদ্ধিসভা—ইহা নিয়াই আমাদের কত আস্ফালন; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ইহার মাঝেও কত অতিরঞ্জিত বর্ণনা, কত ভেজালের কারবার। অথচ মূঢ়, মূক বিশাল হিন্দুসমাজ যেমন অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিল, তেমনই আছে। সমাজ জাগিতেছে কি? ঈর্ষা, কুটিলতা, আত্ম-স্বার্থের প্ররোচনা—এইগুলি কি সুস্থ-সবল সমাজের জাগরণের লক্ষণ? তা ছাড়া এই সমস্ত সংস্কার উপলক্ষ্যে আত্মকলহেরও তো বিরাম নাই। সাহা-সমাজ বলিলেন, আমরা বৈশ্য, অতএব উপবীত লইব; অমনি নিজেদের ভিতরেই মারামারি লাগিয়া গেল। এই রকম বিশৃঙ্খলা সর্ব্বত্র। ছোট ভাইকে দিয়া বড় ভাইয়ের কানমলার ব্যবস্থা করিয়া ভ্রাতৃবাৎসল্যের বনিয়াদ গড়িবার মূঢ় চেষ্টা সবখানে!

*

আহারে জাতিভেদ মানিতে চাহি না সুবিধাবশতঃ বা জেদবশতঃ, ঠিক প্রেমে গদগদ হইয়া নয়; আবার যাহারা আহারে স্পর্শবিচারের কড়াক্কড় করে, তাহারাও শুধু সংস্কারবশতঃ তাহা করিয়া যাইতেছে। আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহার সম্বন্ধ, আহার-সংযমের যুক্তি ও উপায়—সকলই তো আমরা ভুলিয়া গিয়াছি! এ ক্ষেত্রে সংস্কারটাও যেমন বাহানা, আচারপরায়ণতাটাও তাই। যৌন-ব্যভিচার দেশে যথেষ্ট হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি না, তর্ক করিতেছি বাল্যবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ আর বিধবা-বিবাহের উপকারিতা লইয়া; পারিলে দেশের মাঝে বিরুদ্ধ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া রাজদরবার হইতে একটা ক্লীব আইন পাশ করাইয়াই মনে করিতেছি—কর্ত্তব্য চুকিয়া গেল! ব্রাহ্মণের দিকে রুখিয়া বলি, তুমি কেবল পৈতার জোরে বামুন, তোমাকে কেয়ার করি না! আবার সেই "তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলসটা"ই জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের গলায় আঁটিয়া দিবার দরুণ শুদ্ধিমণ্ডপ ফাঁদিয়া বসি! মুখে বলি, আমরা আচারের দাস নই; আবার ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বের অবলম্বনস্বরূপ পৈতাটাও গলায় রাখি, যদিও পৈতা গলায় রাখিয়াও পৈতার কাজ করাটা মনে করি বর্ব্বরতা! দীক্ষা আর দেবোপসনা হইতে ভক্তির

স্নিগ্ধতাটুকু চলিয়া গেল, তাহার স্থলে দেখা দিল পলিটিক্যাল দাঁতখিঁচুনী। এমনি করিয়া চারিদিকে কেবল একটা হট্টগোল চলিতেছে, আর ইহাকেই আমরা নানা গালভরা নামদিয়া জাঁকাইয়া তুলিতেছি।

*

কপিলমুনিতে যে মনোভাব বশতঃ সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হইল, ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও হয়ত তাহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। দেশাচারবশতঃই সম্ভবতঃ অনুন্নতজাতীয় কোনও ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির উৎসর্গ করিয়া তাহাতে ভাগ বসাইবার দাবী করিত না; সে হয়ত বুঝিত, এই প্রকার দেবসেবায় তাহার এইটুকু মাত্র অধিকার; ইহার দরুণ তাহার চিত্তেও কোনও ক্ষোভ থাকিত না, ভক্তিও কোথায়ও প্রতিহত হইত না, পৌরোহিত্য ব্যবসায়ীর প্রভুত্ব তাহার কাছে বিসদৃশ ঠেকিত না। আজ সেই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারিতেছি না। তবে এইটুকু দেখিতেছি, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার মাঝে যে একটা বিজ্ঞান রহিয়াছে, সূক্ষ্ম বিচার রহিয়াছে, রাজনীতিকতার উত্তেজনায় আমরা তাহা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। আমরা সহজেই বলিয়া বসি, উপাস্যের কাছেও হিন্দুর এত ভেদবিচার? কথাটা খুব উঁচুদরের বটে। কিন্তু তবুও উহাকে আসলে বোকার রায় ছাড়া কিছু বলিব না। হিন্দুর উপাসনার একটা বিজ্ঞান আছে বলিয়াই এত ভেদবিচার। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দুর উপাসনায় বিধিমার্গ আর রাগমার্গ বলিয়া দুইটা কথা আছে। বিধিমার্গে আঁটাআঁটি থাকিবেই, থাকাও প্রয়োজন; কেন প্রয়োজন, সে বিচার এখানে করিবার স্থান নাই। কিন্তু তা বলিয়া রাগমার্গে ভজনের স্বাতন্ত্র্যে তো কেহ বাধা দিতেছে না। কাজেই আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির দিক দিয়া বিচার করিলে কোনও দেবমন্দিরে ঢুকিতে না পাইলেও আমার ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতার কোনও বাধাই থাকিতে পারে না। কারণ আমার ভক্তি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সেই ভক্তিকে আজ রাজনীতির হাটে উপস্থিত করিয়া তাহার দর যাচাইর ব্যবস্থা হইয়াছে! ইহাতে পলিটিক্যাল লাভ হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

*

দেবমন্দিরে দেবোপাসনাটাই খুব বড় অধিকার নয়, সাধক হিন্দুমাত্রেই তাহা জানেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনো হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোক এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয়কেই খুব বড় মনে করিয়া ভুলিয়া রহিয়াছে। ইহাদের সেই ভুল ভাঙ্গিতে হইলে এই সমস্ত নিম্নাধিকারের চেয়ে বড় জিনিষও যে তাহাদের ধর্ম্মে আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তাহা হইলে এই সমস্ত স্থূল উপাসনার অনাবশ্যক ভার সমাজদেহ হইতে অনেকখানি খসিয়া যায়, বিধিমার্গের সঙ্কীর্ণতা আপনি দূর হইয়া গিয়া রাগমার্গের প্রশস্ত আদর্শ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাহা না করিয়া বিধিমার্গের সহিত রাগমার্গকে ঘুলাইয়া ফেলিয়া সুবিবেচনার কাজ করা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। "দেবমন্দিরে সমবেত উপাসনাটাই" আধ্যাত্মিকতার চরম নয়, বিশেষতঃ যে দেব-প্রতিষ্ঠান বিধিদ্বারা অনুশাসিত। "উপাস্যের কাছে সবাই এক"—এই কথাটা এই বিধিপদ্ধতিতে খাটে না। বিধি বিধির মতই চলুক; নিষ্প্রয়োজন মনে কর তো তাহার অনুসরণ করিও না, কেহই তাহাতে তোমার বাদী হইবে না, কেননা কোনও কালেই হিন্দু কাহারও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা নষ্ট করিতে চাহে নাই। কিন্তু তা বলিয়া বিধিকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার লাঞ্ছনা করাতে রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, আধ্যাত্মিক কোন প্রয়োজনই কিন্তু ইহাতে সিদ্ধ হয় না, বরং কুসংস্কারের কালিমা আর এক পোঁচ গাঢ় হয় মাত্র।

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আজ দুপুরের প্রচণ্ড রোদটা মাথার উপর দিয়েই গেল। বিকালবেলা আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে টিহরীর সমুদয় মন্দিরাদি দর্শন করে, বদরীনারায়ণজীর ও কেদারনাথজীর মন্দিরে গিয়ে পৌঁছি। টিহরী-রাজই মন্দির দুটীর মালিক। টিহরীস্থ মন্দিরকেই বদরীনাথের ও কেদারনাথের গদী বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। মন্দিরে পৌঁছে একরাত্র থাকবার জন্য পূজারীর নিকট বহু অনুনয়-বিনয় করেও অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে আস্‌তে হল—অথচ মন্দিরে যথেষ্ট জায়গা পড়ে ছিল। ধর্ম্মশালাটীও ছোট—তাতে জায়গাও নাই। সাধু-মহাত্মা এবং যাত্রীদের থাকবার জন্য শিখদের একটা 'গুরুদুয়ারা' আছে, তার চারপাশের বারান্দায় ৩০।৪০ জন লোক থাকতে পারে। এদিকে কাল-বৈশাখীর আয়োজন চল্‌ছে। বৃষ্টির আশঙ্কায় আমরা তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র সহ শিখদের গুরু-দুয়ারার বারান্দায় গিয়ে আসন পাতলাম। সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। আবার আধঘণ্টার মাঝেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে পশ্চিমের সূর্য্যকিরণে গাছপালা যেন হাস্‌তে লাগ্‌লো। আমরা আজ এখানেই কোনরকমে রাত কাটিয়ে দেব মনে করেছি, এমন সময় একজন দরজী ব্যবসায়ী শিখ আরতি কর্‌তে এসে সকল যাত্রীর উপরেই বরষার বারিধারার মত অফুরন্ত গালিবর্ষণ কর্‌তে লাগল। অপরাধ, তিনিই এই গুরুদুয়ারার বর্ত্তমান হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা, তাঁকে না বলে আমরা কার আদেশে সেখানে আড্ডা নিয়েছি? বিহারীদার সঙ্গে তার রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ চল্‌তে লাগল। আমরা কিন্তু "জব জৈসা তব বৈসা" মনে করে ঠাকুরের নাম নিয়ে পোঁটলাপুঁটলী সহ আবার পূর্ব্বের সেই গাছ-তলায় এসে আসন পাতলাম। শিখ-ভায়াটীর সঙ্গে বিহারীদার বোধ হয় ঘণ্টাখানেক বাগ্‌যুদ্ধ চলছিল। আমরা ততক্ষণ গাছের নীচে দিব্যি আসর জমিয়ে নিয়েছি। বাগ্‌যুদ্ধের তালে তালে শিখ-ভায়া প্রদীপ জ্বেলে আরতির কাজও সারতে লাগলেন। হাতে আরতি করলেও মুখে অফুরন্ত বাক্যবর্ষণের বিরাম নাই—ভায়া অসীম উৎসাহে দুটী কাজই এক সঙ্গে চালিয়েছেন! পরে শুনতে পেলাম, বিহারীদা তামাক খান বলেই নাকি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। তামাক সম্প-র্কিত কোন জিনিষ সঙ্গে থাকলে তাঁদের মন্দিরের চতুষ্পার্শ পর্য্যন্ত নাকি অপবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু যখন "নাগা"-সম্প্রদায়ের পালোয়ান সাধুরা বড় বড় ছিলিম বের করে "বম্‌ বম্‌" শব্দে "বড় তামাকে" দম লাগায়, তখন নাকি মন্দিরের কিছুমাত্র পবিত্রতা-হানি হয় না।

এদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে—দিগদিগন্ত তার কিরণে ভেসে গিয়েছে। এরই মধ্যে দু'জন গুপ্তচর এসে কৌশলে আমাদের নাম-ধাম গন্তব্যস্থান প্রভৃতি জেনে নিয়ে চলে গেল। সকালে যখন আমরা এই গাছতলায় এসে বসি, তখন যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর দুজন পাণ্ডা এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেছিল। তারা যাত্রীর খোঁজেই এতদূর এসেছে; আমাদের সঙ্গে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী যাবার জন্য প্রস্তুত আছে বলে জানাল। গুরুদুয়ারার ঝগড়ার বিষয় শুনে, আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তারা জানতে এসেছিল। কথাপ্রসঙ্গে আমরা তাদের জানালাম, কাল সকালে আমরা এখানকার প্রধান জজসাহেবকে এ বিষয় জানাব স্থির করেছি। এ সব কথা শুনে শিখ-ভায়াটি জনকয়েক ইয়ার বন্ধু

সহ এসে মন্দিরের বারান্দায় থাক্‌বার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে লাগ্‌ল। আমরা কিন্তু নড়্‌লাম না। অনেকেই শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতটা অনাহারেই কাটাতে হল। অত রাতে কোথায় পাক করা যাবে? বিশেষতঃ জলের খুবই অসুবিধা। ক্রমে আমরা সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়্‌লাম।

২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—পূর্ণিমা! কাল সমস্ত রাত বসন্ত পূর্ণিমার রজতোচ্ছাসে আনন্দে কেটে গেছে। নির্ম্মল আকাশে নির্ম্মল জ্যোৎস্নার কিরণে, চারদিকের পাহাড়ের দৃশ্যে এবং ভোরের পাখীর কাকলিতে আপনা হইতেই ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কার না হৃদয় ভরে ওঠে! বাংলা দেশ ছেড়েছি পর কোকিলের কুহুধ্বনি কি "বউকথা কও" পাখীর করুণ ডাক শুন্‌তে পাই নি। আজ কিন্তু ভোরে জাগতেই শুনি, সেই চিরপরিচিত বসন্ত-দূতের মধুর তান আর "বউ কথা কও" পাখীর করুণ মূর্চ্ছনা। একটা অনির্ব্বাচনীয় আবেশে হৃদয় যেন নুয়ে পড়্‌ল। বৃন্দাবনের বৃদ্ধা মাতাজীরা প্রত্যহই পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মধুর সুরে প্রভাতী গান করে থাকেন, আজ রাস্তা না চললেও কিন্তু তাঁরা প্রভাতী গান আরম্ভ করতে ভুলেননি। চারদিকে পাখীর কণ্ঠে মানুষের কণ্ঠে ভগবানের জয়গান মুখরিত হয়ে প্রভাত সমীরণকে আনন্দে মাতাল করে তুল্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাহাড়ের উপর ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়্‌ল। আমিও পূর্ণিমায় ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়্‌লাম। স্থানীয় পুরোহিত ও পাণ্ডাগণ বল্‌লেন, এখানে ভাগিরথীগঙ্গা, ভিলঙ্গগঙ্গা ও সরস্বতীগঙ্গা এই তিনটী নদীর সঙ্গম হওয়ায় ত্রিবেণী হয়েছে। আমি কিন্তু বহু ঘুরেও তিনটী নদীর সঙ্গমস্থল বের করতে পারিনি। ভাগিরথীগঙ্গা ও ভিলঙ্গগঙ্গা এই দুটী নদী এক সঙ্গে মিশেছে বটে। স্নান করবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাজবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটি ছোট পাহাড়ের চূড়া সমতল করে তার উপর রাজবাড়ীটী প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের প্রথম কয়েকটি স্তরে অসংখ্য ফল-ফুলের গাছে ভরা বাগান—দেখে ভারী আনন্দ হল। উপরের স্তরে রাজবাড়ী। সেখানেও ফুলবাগানে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটেছে।

রাজবাড়ী ও বাগিচার বিবরণ

বাগানে ফলের মাঝে আমের ভাগই বেশী। এ ছাড়া নাস্‌পাতি, আখরোট, আলুবোখরা, আপেল, আঙ্গুর, বেদানা পীচ, কালোজাম, জামরুল, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। নাম জানি না, এমন অনেক গাছও দেখ্‌লাম। সামান্য শাকসব্‌জীর আবাদও আছে। বাগানের চারদিকে পাহাড়িয়া লতানো গোলাপের বেড়া। গোলাপগাছে এক একটী স্তবকে ১৫।২০টী গন্ধহীন বিচিত্রবর্ণের গোলাপের তোড়ায় বাগানগুলি যেন হাস্‌ছে। গাছের ডালে ডালে পাতার আড়াল হতে কোকিল কুহুধ্বনিতে মাতিয়ে তুলছে, বৌ-কথা-কও পাখীও তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছে।

বাগান দেখতে দেখতে সবার অগোচরে কি করে রাজবাড়ীর হলঘরের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, তা বুঝতে পারিনি। রাজবাড়ীতে বিনা অনুমতিতে কারও প্রবেশের অধিকার নাই, আমি তা জান্‌তাম না। হলঘরটি বেশ সাজানো—বড়লোকের বাড়ীতে যেমন হওয়া উচিত। পাহাড়িয়া রাজবাড়ী হলেও কিন্তু জাঁকজমকের ত্রুটী নাই। বড় বড় কাচের ঝাড়, বনাতের গদী আঁটা চেয়ার টেবিল ইত্যাদি গৃহোপকরণের কিছুই অভাব নাই। দেওয়ালে দেখলাম বড় বড় বাঘের ছাল টাঙান রয়েছে। রাজবাড়ীর অন্দরমহল ছাড়া আমি আর সব জায়গা দেখে নেওয়ার পর একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে নীচে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন, বললেন—অনুমতি ছাড়া কারু এ জায়গায় আসা নিষেধ। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তে আস্তে আবার

বাগান দেখতে দেখতে নীচে নেমে এলাম। রাস্তায় যেতে যেতে দুটি স্কুলের ছেলের সঙ্গে দেখা হতেই তারা দুজনে দুটি গোলাপফুলের গুচ্ছ এনে আমায় উপহার দিল। ওদেশে সবারই ফুলের বেশ সখ! পথে-ঘাটে সব জায়গায় দেখেছি, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, এমন কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই মাথায় ফুল পর্‌তে ভালবাসে। পুরুষেরা টুপির কোণে ফুল গুঁজে দেয়। যখন ব্রহ্মদেশে ছিলাম, তখন সেখানেও দেখেছি, ব্রহ্মদেশীয়েরাও ফুলের বিশেষ কদর করে থাকে। কেউ এক টাকার বাজার কর্‌তে গেলে দু' আনার ফুল কিন্‌বেই কিন্‌বে!

ফুলের তোড়া দুটি হাতে করে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে দপ্তর-খানায় এসে খানিকক্ষণ সেখানকার কাজ দেখে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ কর্‌লাম। এখানে দপ্তরখানায় সকাল হতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাজ হয়। বাদী-বিবাদী স্বয়ং হাজির হয়ে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে, কোনরূপ উকীল-মোক্তারের প্রয়োজন হয় না। তবুও ষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখার জন্য দুজন উকীল আছে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, তিনিই এখানকার সমুদয় খবর আমায় দিলেন। কাল বদরীনারায়ণজীর মন্দিরে ও ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইনি শুনে তিনি এখানকার চীফ জজ শ্রীযুত গঙ্গাপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয় জানাতে অনুরোধ কর্‌লেন। ডাক্তারবাবুর নিকট হতে বিদায় নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদজীর বাংলায় গেলাম; কিন্তু তাঁর দেখা পেলাম না। সেখান হতে বেরিয়ে সমুদয় সহরটি ঘুরে বেলা ১১টার সময় সেই গাছ-তলায় ফিরে এলাম। এখানে দুপুরে ভীষণ গরম—রৌদ্রের তেজ যেন দেবপ্রয়াগ হতেও বেশী বলে মনে হল।

সমুদ্রতল হতে টিহরী ২২৭৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। সহরের পশ্চিম দিকে গঙ্গোত্তরী-যমুনোত্তরীর রাস্তা; সেদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত উঁচু পাহাড় নাই—সব সমতল ভূমি। এমন বিস্তীর্ণ সমভূমি আলমোড়া জেলায় ছাড়া হিমালয়ে আর কোথাও দেখতে পাইনি। রাজবাড়ী হতে এ দৃশ্য ভারী সুন্দর দেখায়। চারদিক উঁচু পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা, পাশ দিয়ে ভাগীরথী আপন মনে বয়ে চলেছে। ভারী চমৎকার দৃশ্য কিন্তু!

এখানে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণজীর, শ্রীশ্রীকেদারনাথজীর, শ্রীশ্রীগঙ্গামাতার ও শ্রীশ্রীযমুনামায়ীর গদী। টিহরীরাজের আদেশে মন্দিরগুলির দরজা খোলা হয়ে থাকে। আজকাল বদরীনারায়ণজী ও কেদার-নাথজীর মন্দির গবর্ণমেণ্ট খুলে থাকেন। উপরোক্ত ৪টি মন্দির ছাড়াও রঘুনাথজীর মন্দির, রঙ্গনাথজীর মন্দির, লছমীনারায়ণজীর মন্দির, সত্যেশ্বর শিবালয়, নর্ম্মদেশ্বর মহাদেবের মন্দির, দক্ষিণাকালিকা মাতার মন্দির, ভট্টেশ্বর শিবের মন্দির আছে। উপরোক্ত সমুদয় মন্দিরই টিহরীরাজের তৈরী এবং তাঁর খরচেই চলছে। বদরীনারায়ণজীর মন্দিরে কাজকর্ম্ম যাতে সুব্যবস্থায় চলে, এজন্য কিছু জমিদারীও দেবোত্তর আছে। পূর্ব্বে সমস্তই সুব্যব-স্থায় চল্‌ত, কিন্তু এখন কর্ম্মচারীদের শৈথিল্য ও স্বার্থের দরুণ নানারকম গোল হচ্ছে। পূর্ব্বে এ সব মন্দিরে অতিথিদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এখন খাওয়া ত দূরের কথা, থাক্‌বার স্থান পর্য্যন্ত পাওয়া ভার। পূর্ব্বে এ পথে যে সকল সাধু-মহাত্মা গঙ্গো-ত্তরী-যমুনোত্তরী দর্শনে যেতেন, তাঁদের পথে পথে সদাব্রতের ও পাথেয়ের ব্যবস্থাও ছিল। এখন সে সব কিছুই নাই,—এখানে কেবল নামমাত্র একদিন সদাব্রতের বিধি আছে। বিহারীদা ও হরিদাস ভায়া আজ সকালে সদাব্রত আনেন। আধসের আটা দেবার নিয়ম, সে স্থলে অনেক কষ্টে এক পোয়া, কেউ বা অদৃষ্টের জোরে দেড় পোয়া আটা পায়। সে আটাও এমনি অখাদ্য যে, খেলে রক্ত আমাশয়

নয় তো কলেরায় আক্রান্ত হয়ে চিরদিনের জন্য সদাব্রত ভিক্ষার কষ্ট হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। আটাটা খরচ না করে চীফ্ জজকে দেখাবার জন্য রেখে দিই। দুপুরবেলায় আহারান্তেই ডাক্তারসাহেবকে আটা দেখিয়ে তা যে খাবার অযোগ্য তা লিখিয়ে নিয়ে বেলা ৫ টার সময় পুনরায় চীফ্ জজ গঙ্গাপ্রসাদজীকে দেখাবার জন্য তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে সমস্ত বিস্তারিত খুলে বলি। অমন সদাব্রত দিয়ে লোকের অনিষ্ট করার চেয়ে না দেওয়াও বরং ভাল। লোকে একবেলা খেতে না পেলে তো মরে যায় না। চীফ্ জজ প্রথমতঃ আমার কথা গ্রাহ্য করেননি; পরে বিদায় নেবার সময় আমাদের পরিচয় জান্‌তে পেরে বিশেষ সমাদর করে ঘরের ভিতর নিয়ে বসালেন এবং এর প্রতীকার করবেন বলে স্বীকার করলেন। বল্‌লেন, সব কর্ম্মচারীদের দোষেই ঘটে, তারা ভাল জিনিষ দেয় বলে রাজসরকার হতে টাকা আদায় করে থাকে। তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলে তাঁকে কেউ ভয়ে এসব খবর না দেওয়াতেই তিনি কিছু জান্‌তে পারেন না। গত রাত্রের গুরুদ্বারার ব্যাপারও তাঁকে জানিয়ে বললাম, "আপনার এই গাড়োয়াল রাজ্যই হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্বর্গভূমি, সাধনভূমিরূপে এখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত। আপনার এই স্বর্গভূমিতে যদি এমনভাবে অত্যাচার চলে, তাহলে যাত্রীরা কি করে এ দেশে তীর্থ করতে আসবে? আপনি যদি এর প্রতীকার না করেন, তাহলে আমরা এ সম্বন্ধে খবরের কাগজে লিখে সর্ব্বসাধারণকে জানাতে বাধ্য হব। দরকার মনে করলে ব্রিটিশ সরকারকেও জানাতে ভুলব না।"

এ পথে যাত্রী চলাচলের জন্য গাড়োয়ালরাজের অনেক আয় হয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক মালবাহী কুলীই টাকা প্রতি ৴৯ পাই ট্যাক্স দেয়; এ ছাড়া যাত্রীদের জিনিষপত্র ও খোরাকীর মালের উপরেও ট্যাক্স আছে; পথে যত চটীবালা আছে, তাদেরও রীতিমত সেলামী দিয়ে প্রতিবৎসর চটীর নূতন বন্দোবস্ত নিতে হয়। মোটকথা, যাত্রী হতে নানা উপায়ে গাড়োয়ালরাজের যথেষ্ট আমদানী হয়ে থাকে। যত স্থানে ঘুরেছি, দেখেছি বাঙ্গালীর কদর সর্ব্বত্রই। বাঙ্গালীই ব্রিটিশ সরকারের স্তম্ভস্বরূপ, বাংলার বাইরে অধিকাংশ লোকেরই এখন একটা ধারণা আছে। সুতরাং বাঙ্গালীর সঙ্গে বিবাদ করলে ব্রিটিশ সরকার চটে যাবে ভয়ে এখনও অনেক জায়গায় বাঙ্গালীদের বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জজ্ সাহেব আমাকে বিশেষ আদর-যত্ন করে সঙ্গীয় লোকজন সহ তাঁর বাংলাতেই থাক্‌বার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন ৬টা বেজে গেছে। আজও বেলা ৩টার সময় একবার ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। বাইরে থেকে ঝড়বৃষ্টিতে ভিজার চেয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে চটীতে আশ্রয় নেওয়া সুবিধা মনে করে সঙ্গীদের পূর্ব্বেই রওনা করে দিয়ে আমি গঙ্গাপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তাঁকে জানালাম "আমি আপনার কথা রক্ষা করতে না পেরে বিশেষ দুঃখিত, এখানে নানারকম অসুবিধার জন্য আমি আমার সঙ্গীয় লোকদের পূর্ব্বেই রওনা করে আপনাকে inform করতে মাত্র এসেছি, আমিও থাকতে পারবো না—আমার এখনই যেয়ে তাঁদের ধরতে হবে।"

তিনি তখনই তাঁর Diaryতে আমার সমুদয় মন্তব্য, নাম-ধাম প্রভৃতি লিখে নিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর এসে আমায় এগিয়ে দিলেন; পথে যাতে কোনও কষ্ট না হয়, তার জন্য নানাপ্রকার সদুপদেশ দিলেন। তাঁর এলাকায় কোথাও কোনরূপ অসুবিধা হলে তৎক্ষণাৎ সে জায়গার নম্বরদারকে (গ্রামের বা চটীর মোড়ল) জানিয়ে তাঁকেও inform কর্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন। আরও বল্‌লেন, "প্রত্যেক চটীতেই আমাদের শিলযুক্ত জিনিসের

দামের লিষ্ট আছে, কোন জায়গায় যদি কোন দোকানদার দাম বেশী চায়, আপনি লিষ্ট দেখে দাম দেবেন।" জজ সাহেব অতি বিনয়ী ও সৎ লোক। এদেশবাসী রাজার চেয়েও তাঁকে বেশী সম্মান ও ভয় করে। রাজা বাহাদুর গত অক্টোবর মাসে রাণী ও ছেলেমেয়ে সহ বিলাত ভ্রমণে গিয়েছেন। এখন টিহরীর হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা এই চীফ্ জজ্ গঙ্গা-প্রসাদজী।

গাড়োয়ালরাজের এখানে অনেক সদনুষ্ঠান আছে। সাধারণ হাঁসপাতাল, স্ত্রীলোকদের ও সৈন্যদের হাঁসপাতাল, Cassel হাঁসপাতাল, মোট ৪টী হাঁস পাতাল আছে। Cassel হাঁসপাতালটা রাজবাড়ীর উপ-রই অবস্থিত, তাতে একজন পাঞ্জাবী Civil Surgeon আছেন। তিনি মহারাজার সঙ্গে বিলাত ভ্রমণে গেছেন। **F**emale Hospitalএ আমেরিকার একজন এম্-ডি লেডি-ডাক্তার আছেন। সর্ব্ব-সাধারণের হাঁসপাতালে পাঞ্জাবী ডাক্তার দীননাথজী আছেন। ৩০০ শত সৈন্য দ্বারা সহরটী সুরক্ষিত। এ ছাড়া হৃষীকেশের নিকট পাহাড়ের উপর রাজার নূতন ভবন "নরেন্দ্রনগর" তৈরী হচ্ছে, সেখানেও ১০০ শত গুর্খা-সৈন্য ঘাটি আগলিয়ে রাজ্য রক্ষা করছে। ভবিষ্যতে নরেন্দ্রনগরেই গাড়োয়ালরাজ রাজধানী স্থানান্তরিত করবেন বলে শুনতে পেলাম। নরেন্দ্রনগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৮০০০ ফুট উঁচুতে—মুসুরী, সিমলার চেয়েও উঁচু, খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। টিহরী সহরে ৬০০০ লোকের বাস। রাজবাড়ীতে জলের কল ও ইলেক্ট্রিক্ লাইটের ব্যবস্থা আছে। মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্তে প্রায় প্রত্যেক জিনি-ষেরই এমন কি শাকসবজির পর্য্যন্ত দাম বাঁধা আছে। কোন দোকানদার তার ব্যতিক্রম করলে রীতিমত নজরসেলামী ও জেলের বন্দোবস্ত আছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু দোকানদারগুলি চোরের মাসতুত ভাই! প্রত্যেক জিনিষেরই দাম যাত্রীদের কাছে দেড়া, দ্বিগুণ, তিনগুণ আদায় করে থাকে। তারা জানে, যাত্রীরা তো একদিন দুদিন মাত্র থাকে, সুতরাং তাদের নিকট হতে যত আদায় করা যায়। বিশেষতঃ যাত্রীরা তো আর নালিশ-ফরিয়াদ করবে না।

চীফ্ জজ্ গঙ্গাপ্রসাদজীর অধীনে ছয়জন ডিপুটী কালেক্টর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কাজ করছেন। এ ছাড়া Forest Department, P. W. D. আফিস প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্তই পাকা ভাবে আছে। টিহরীর Forest Department হতেই আয় সব চেয়ে বেশী। একটা State Bank আছে, তা হতে রাজ্যের গরীব প্রজাদের কর্জ্জ দেওয়ার বিধি আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিস্তম্ভের উপর একটা বড় ঘড়ি হতে সহরে টাইম্ দেওয়া হয়ে থাকে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১৫০ জন পাহাড়ী ছেলে শিক্ষা লাভ করছে। একটা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ৬০ জন বিদ্যার্থী সংস্কৃত পড়ছে। দুটী বিদ্যালয়ে ১৭ জন শিক্ষক। কিছুদিন পূর্ব্বে দুজন বাঙ্গালী মাষ্টার ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক পূর্ব্বে হেড্ মাষ্টার ছিলেন। এখন তিনি পেন্সন্ ভোগ করছেন। বর্ত্তমানে টিহরী সহরে কোন বাঙ্গালী না থাকলেও টিহরী হতে ৪৪ মাইল দূরে উত্তরকাশীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে একজন বাঙ্গালী শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত আছেন। একটা বালিকা বিদ্যালয় আছে, ছাত্রীসংখ্যা ৩৭, শিক্ষয়িত্রী ৪ জন। সমস্ত স্কুলই ফ্রি। স্কুলের সব খরচ মহারাজা বাহাদুর বহন করে থাকেন। উচ্চবিদ্যালয়টী নব্যপ্রথানুযায়ী বেশ সুন্দর বিল্ডিংএ স্থাপিত। সকালে রাজবাড়ী হতে আসার সময় স্কুলটী ঘুরে দেখে এসেছিলাম। কোনও ছেলে এই বিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশে অর্থাৎ ভারতের কোন কলেজে পড়তে চাইলে, রাজকোষ হতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

টিহরী রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা (গাড়োয়াল জিলা) ৩,১৮,৩৮২ জন, বর্গফল ৪২০০ বর্গমাইল, আয় ৮ লক্ষ টাকা। রাজবাড়ী হতে সহরের দৃশ্য মন্দ নয়। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালা ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মশালা নাই—সুতরাং যাত্রীদের থাকার বিশেষ অসুবিধা।

(ক্রমশঃ)

মিছে দূষি !

—:*:—

তোমায় যে চাই জীবনমাঝে সহজ ভাবে পেতে—
তত্ত্বকথার গোলোকধাঁধাঁয় চাই না মোটেই যেতে।
তবু কেন তোমার আলোয় পেছন ফিরে রই—
দাও না বলে অভিমানে মনের গুমোর বই !
রইল আঁধার এ ঘর বলে মিছে তোমায় দূষি—
তোমার দিকে মুখ ফেরাতে হয় না তো মন খুসি !
এই বাতাসে এই আলোতে পাখীরা গান গায়,
নিত্য নূতন রূপে জগৎ রং ফলিয়ে যায়,
জ্যোতিঃ তোমার সবার 'পরে করছে ঝিকিমিকি—
আমার বুকেই হায় সে আগুন্ জ্বল্‌ছে ধিকিধিকি !

——):*:(——

আরণ্যক

—:*:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

আমার খাঁটি ইচ্ছা আমারও অগোচর। আমি তাকে জানি না অথচ সে আমার সবটা জানে—সবটা দেখে। সবই গোপনে গোপনে চলছে—জানি আমরা কয়টা ? কাজেই দুঃখে অতি বিহ্বল হওয়ার প্রয়োজন নাই ; আবার অত্যুৎফুল্ল হওয়াতেও লাভ নাই। আমার খাঁটি ইচ্ছা যেটি সেটি মহদিচ্ছার সঙ্গে একযোগ। তাই তাতে অনিষ্ট বীজ নাই।

একটা কথা আছে, তুমি যা পেতে চাও, তোমাকে তা হতে হবে। আসক্তির বেলায় এ নিয়মটীর প্রমাণ পাই। মানুষ বিকট কামচিন্তায় নাকি কামিনী হয়েও জন্ম নেয়। কিন্তু উজান মুখেও এই কথাটী খাঁটি হতে পারে। মন কেবল ভোগাভিমুখীই নয়, অপবর্গাভিমুখী হওয়াও তার আর একটা স্বভাব। তাই মানুষে বৈরাগ্যও স্বাভাবিক। বরং ভোগের পঙ্কিল পথে বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে না; কিন্তু সত্য ও আনন্দের পথ অনন্ত বিস্তৃত। তবে সেই ব্রহ্মবর্ত্মে গিয়ে উঠতে হলে আগে অনেক কর্দ্দমময় পথ অতিক্রম করতে হয়। মনে প্রাণে অবিরত সেই মহাভাবের অনুরণন চাই, যেন আচারে ব্যবহারে কথা-বার্ত্তায়, চালচলনে সর্ব্বত্র প্রাণের সেই উন্মুখীনতা সংযম ও সুষমায় প্রকাশ পায়। জগতের যা চরম সত্য, তাই পরম সুন্দর। তার সংস্পর্শে যেতে হলে সুন্দর হয়েই যেতে হয়। সংযম সৌন্দর্য্যেরই সাধনা, সংযত হলেই সেখানে সৌন্দর্য্য ফুটবে। কায়মনোবাক্যে সেই সুন্দরের উপাসনা করা চাই, তবেই চিরসুন্দর জীবনে আবির্ভূত হবেন।

* * *

জীবনে অতৃপ্তি থাকেই। সেইটাই জীবনের পাহারাওয়ালা। ভোগলোলুপ মন এলিয়ে যেতেই ভালবাসে। তাই অশান্তির অঙ্কুশতাড়নে তাকে বিদ্ধ না করলে সে ঘুমিয়ে পড়বে, ক্রমশ আঁধারেই তলিয়ে যাবে। তাই মানুষের জীবনে দুঃখ একটা মহাদান। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুঃখই প্রার্থনা করেছিলেন। দুঃখের মাঝেও যে রস আছে, তার সন্ধান আমরা রাখিনা বলেই দুঃখ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তলিয়ে বুঝতে পারলে দুঃখই রসের প্রস্রবণ হয়ে আমাদের সেই রসময়ের দিকেই এগিয়ে নেয়।

ভিতরে আলো না জাললে বাইরের শত রোশনাইয়েও অন্তর আলোকিত হয় না, মানুষ তৃপ্তি পায় না। এটা-সেটা দিয়ে কত রকমেই না আমরা মনটাকে ভরে রাখতে চাই, কিন্তু তাতে অক্ষয় আনন্দ হয় কি? হবে কি করে? বিষয়ের আলো যে মনের দেয়ালের বাইরে—অন্তরের মণিকোঠার সন্ধান তো সে দিতে পারেনি। তাই অন্তরের রত্নবেদিকায় আগে সেই দেবতার অধিষ্ঠান কর—যাঁর জ্যোতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত।

* * *

কর্ম্মের ঝঞ্চাটে ভাব হারিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সেই অ-ভাবের ছিদ্র দিয়েই শত্রু প্রবেশ করবার সুযোগ বেশী হয়। ঠিক ঠিক আত্মস্থ ভাবে যতক্ষণ মানুষ থাকতে পারে, তার মাঝে ততক্ষণ এমন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ সৃষ্টি হয় যে বাইরের জগতের ঝটিকা সেখানে পৌঁছাতে পারেনা। কিন্তু সে ভাব থেকে বিচ্যুত হলেই সেই মহা ঝটিকায় মানুষকে বিব্রত করে তোলে। বাক্-সংযম এই আত্ম-সমাধানের সর্ব্ব প্রথম উপায়।

* * *

তাঁকে পাওয়া অর্থে তন্ময় হওয়া। তাতেই তাঁর গুণ এসে আমাতে বর্ত্তাবে; তবেই তাঁর আসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি জগন্ময়, আমাকেও জগৎ নিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু থাকছি জগৎ থেকে সরে আপন স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে। তাই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি। জগন্ময় আপনাকে বিস্তৃত করে ভাবলে, প্রতি জীবকে নিজের মাঝে অনুভব করলে সে যে মহাব্যাপক মহাশক্তিময় হয়ে পড়ে। যার প্রাণের জোর বেশী, সেই পাবার অধিকারী। হীনপ্রাণ তাঁকে পায়না।

* * *

আত্ম-সমর্পণ হয়েছে বুঝ্‌ব কোন দিন? যে

দিন থেকে আমার চিন্তা-ভাবনা, এমনি কি স্থূল দেহটা পর্য্যন্ত তাঁর ভাবের বাহন হয়ে যাবে। ইষ্টের প্রতি এই তন্ময়তা নিয়েই একদিন গোপীরাও বলে উঠেছিল "আমরাই শ্রীকৃষ্ণ, আমরাই গোবর্দ্ধন ধারণ করেছি।" মিথ্যা ভাবোন্মাদ নয় এসব, সত্যি সত্যি ইষ্টের প্রতি যাদের এমন তন্ময়তা এসেছে, তাদের চিত্ত ভাবের জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে উঠবে। সমর্পণ করে একদিকে শূন্য হয়ে যাবে, আবার দশ দিক থেকে তাঁরই প্রেরণা তাঁরই শক্তি এসে সমস্ত দৈন্য অপসারিত করে দেবে। আমি যাকে ভালবাসি, তার গুণ আমাতে সংক্রামিত হবেই—এ তো জানা কথা।

সংবাদ ও মন্তব্য

জন্মমহোৎসব

আগামী ৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার ঝুলনপূর্ণিমাতে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে **কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে** (পোঃ কাথুলী, জেলা নদীয়া) মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সাধু, ভক্ত এবং আর্য্য-দর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। গুরুধামেই সার্ব্বভৌমভাবে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল বিভাগের ভক্তগণেরই উৎসবে যোগদান বাঞ্ছনীয়। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজও উৎসব উপলক্ষ্যে গুরধামে পদার্পণ করিবেন।

ভ্রমসংশোধন

বিগত সংখ্যায় অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষ্যে সারস্বতমঠে দানপ্রাপ্তির তালিকায় শ্রীযুত অন্নদাচরণ মাইতির নিকট হইতে প্রাপ্ত দানের পরিমাণ ৪৸৶০ স্থলে ১০৲ হইবে।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন

আমরা মিশনের ১৯২৭-২৮ সনের কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। মিশন প্রচার-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ ও সেবা-বিভাগ এই তিনটী বিভাগ খুলিয়া নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মিশনের উদ্যম ও কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। মিশনটী সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে এখনো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আশা করি দেশবাসী ইহার প্রতি অবহিত হইবেন।

গ্রাহকগণের প্রতি

প্রেসবিভ্রাটে এই সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘটিল। আগামী সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রলয়প্লাবনের কথা কাহারও অবিদিত নাই। সহস্র সহস্র লোক নিরাশ্রয়। সম্ভবতঃ আগামী কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সেবাকার্য্য চালাইতে হইবে। এজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। যাঁহার যাহা সাধ্য, তাহাই লইয়া আর্ত্তসেবায় অগ্রসর হউন। কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করিলে নিম্ন ঠিকানায় তাহা পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও বিপন্নসেবায় ব্যয়িত হইবে। দাতার নাম ও দানের পরিমাণ এই পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশিত হইবে।

অধ্যক্ষ—সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)

শ্রাবণ---১৩৩৬

দ্বাবিংশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

পরিদর্শক

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ

পরিচালক

ব্রহ্মচারি-সঙ্ঘ—ঋষিবিদ্যালয়

সম্পাদক

স্বামী নির্ব্বাণানন্দ সরস্বতী

সূচী

আর্য্যদর্পণের নিয়মাবলী

আর্য্যদর্পণে সাধারণতঃ ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ টাকা মাত্র, নমুনার জন্য ।১০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও বর্ষারম্ভ হইতে পত্রিকা লইতে হয়।

আর্য্যদর্পণ প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও মাসের পত্রিকা যথাসময়ে না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক-বিভাগের উত্তরসহ পরবর্ত্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে জানাইলে সেই সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

পত্র ব্যবহারকালে গ্রাহক নম্বর না দিলে কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় না। গ্রাহক নম্বর পত্রিকার মোড়কের উপর হাতের অক্ষরে লেখা থাকে।

আর্য্যদর্পণে লেখকের নাম প্রকাশ হয় না, সুতরাং সমস্ত লেখাই সম্পাদকের দায়িত্বে প্রকাশিত হয়। [illegible] জন্য প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। টিকিট ও শিরোনামাযুক্ত খাম দিলে অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয়।

টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়পত্রাদি নিম্ন-ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

☞ "আর্য্য-দর্পণ"-কার্য্যালয়—পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)

ঋষি-বিদ্যালয়

ঋষিনির্দ্দিষ্ট পন্থায় জাতীয় শিক্ষার আদর্শ পুনঃ-প্রচারকল্পে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। আশ্রমে উৎসর্গীকৃত ছাত্রদিগের ব্যয়ভার আশ্রমই বহন করেন। অপরের জন্য মাসিক খরচ ১০৲ টাকা। ৭ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের বালককেই গ্রহণ করা হয়। অন্যূন ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট কাল। ইহার পূর্ব্বে কোনও ছাত্রই আশ্রমসংস্রব ত্যাগ করিতে পারিবে না। উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ঋষিশাস্ত্রই প্রধানতঃ অধ্যাপনার বিষয়। মাতৃভাষা ও ইংরেজী এবং প্রাথমিক হিসাবে লৌকিক শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। স্বাবলম্বন লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সংযম ও তপস্যার ভিত্তির উপর ছাত্রের মনুষ্যত্ব গঠিত করিয়া তোলাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। নিম্নের যে কোনও ঠিকানায় আবেদন করুন।

☞ অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয়, সারস্বত মঠ
পোঃ কোকিলামুখ [যোরহাট]

অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয় মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
পোঃ—জয়দেবপুর [ঢাকা]

অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয় উত্তর-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
পোঃ বগুড়া

পর্জ্জন্যো রেতোধাঃ

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৭।৬।১২

[বশিষ্ঠ ঋষিঃ—পর্জ্জন্যো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

——:*:——

তিস্রো বাচঃ প্রবদ জ্যোতিরগ্রা
যা এতদ্দুহ্রে মধুদোঘমূধঃ।
স বৎসং কৃণ্বন্ গর্ভমোষধীনাং
সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি॥

জ্যোতির্ম্ময়ী শিখা যার, সেই ত্রয়ী ঘোষ বারবার ;—
দুয়েছে পালান তারা, যাহা হতে ক্ষরে মধুধার।
বৎসের জনম হেতু ওষধীর গর্ভ সঞ্চারিয়া,
সদ্যোজাত এ বৃষভ মহাহর্ষে ফিরে গরজিয়া!

যো বর্দ্ধন ওষধীনাং যো অপাং
যো বিশ্বস্য জগতো দেব ঈশে।
স ত্রিধাতু শরণং শর্ম্ম যংসৎ
ত্রিবর্ত্তু জ্যোতিঃ স্বভিষ্ট্যস্মে॥

ওষধীরে সে বাড়ায়, জলস্রোতে করে খরতর,
এ বিশ্বজগৎ তারি—নিখিলের সেই অধীশ্বর।
পেয়েছি ত্রিবিধ সুখ, পেয়েছি যে তিনটী শরণ,
জ্যোতির্ম্ময় পুণ্যপথ তিন ভাগে করেছি বরণ।

যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থু-
স্তিস্রো দ্যাবস্ত্রেধা সস্রুরাপঃ।
ত্রয়ঃ কোশাস উপসেচনাসো
মধ্ব ওষধীর্বিরপ্‌শং॥

এ বিশ্বভুবনখানি যাঁর বুকে শিশু সম রয়,
ত্রিবিধ দ্যুলোক শোভে, ত্রিধারায় জলরাশি বয়,
তিনটী মষক তাঁর ক্ষরে জল ধরণীর পরে—
তাঁহারে ঘিরিয়া তারা দিকে দিকে মধুবৃষ্টি করে।

স্তরীরু ত্বদ্ভবতি সূত উ ত্বদ্
যথা বশং তন্বং চক্র এষঃ।
পিতুঃ পয়ঃ প্রতিগৃভ্ণাতি মাতা
তেন পিতা বর্দ্ধতে তেন পুত্রঃ॥

কোনো ধেনু দেয় বৎস, কোনো ধেনু প্রসবে না আর;
যখন যেমন খুসী মূর্ত্তি যে সে ধরে চমৎকার।
পিতা হতে ক্ষরে রস, তৃষাতুরা নেয় মাতা তারে,
পিতা তাতে বাড়ে আর তারি সাথে তনয়ও সে বাড়ে।

ইদং বচঃ পর্জ্জন্যায় স্বরাজে
হৃদো অস্ত্বন্তরং তজ্জুজোষৎ।
ময়োভুবো বৃষ্টয়ঃ সন্ত্বস্মে
সুপিপ্পলা ওষধী র্দ্দেবগোপাঃ॥

স্বরাট্ পর্জ্জন্য, তাঁরে, সঁপিলাম এই স্তুতিখানি—
অন্তরে রাখুন তারে, হৃষ্ট হোক্ এই দীনা বাণী।
বৃষ্টি তাঁর শতধার আমাদের সুখী যেন করে,
দেবতার দৃষ্টি পেয়ে ওষধীতে ফল যেন ধরে।

স রেতোধা বৃষভঃ শাশ্বতীনাং
তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
তন্ম ঋতং পাতু শতশারদায়
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥

রেতোধা বৃষভ তিনি, নিখিলের তিনিই যে স্বামী—
স্থাবর জঙ্গম যত, সবাকার আত্মা অন্তর্য্যামী।
বরিষ আশিষ নিত্য জীবনের শতবর্ষ পরে—
অনুদিন তোমাদের দৃষ্টি যেন কল্যাণ বিহরে।

—:•:—

রিক্তের বেদন

—:*:—

স্নিগ্ধনীল, উদার, অনন্ত আকাশের পানে তাকাইয়া আপনাকে ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাই—ধরিত্রীর একান্ত অসহায় সন্তান আমি, সার্দ্ধত্রিহস্ত-পারমিত দেহের পিঞ্জরে বন্দী, কামনা-বাসনার বিক্ষোভে বিচেষ্টমান, জরা-মৃত্যু-ব্যাধির অবলেপে সশঙ্ক! কমল-কলিকার মত মুষ্টিপ্রমাণ আমার হৃদয় ওই অনন্তের স্বতঃউৎসারিত অজস্র আলোকের পানে চাহিয়া দলে দলে বিকশিত হইয়া উঠে, অন্তরের মধুকোষ হইতে নিঃসৃত দিব্য-সৌরভ দিগ-দিগন্তের কোলে লুটাইয়া পড়ে, একটা স্নেহ-কোমল স্পর্শের মত নিখিলের উপর ছড়াইয়া পড়ে এই ভাবাবেগ-শিহরিত বাধাবন্ধ-হারা মন! কোথায় থাকে এই জড়দেহের ভার, চিত্তের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আঁটিয়া ধরা কামনার ক্লিন্ন-পাশ! অনুভব করি, আমি নির্ম্মল, আমি উদার, আমি সর্ব্বাবগাহী—অনুচ্ছ্বসিত, অপরিমেয় আনন্দের ভারে আমি স্তব্ধ। মহাপ্রলয়ের প্রভঞ্জন আমার বক্ষ দলিয়া চলিয়া যায় সুখ-সুপ্তের একটী মৃদু-নিশ্বাসেরই মত; সৃষ্টির নবীন উষায় আমারই নাভিকন্দ হইতে ফুটিয়া উঠে বিশ্বের লীলাকমল, নবজাত শিশুর মুগ্ধ-বিস্ময়ে বিস্ফারিত চাহনির মত। আমি পরম ব্যোম, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—"যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাস আসন্"—আমি সৃষ্টির প্রাণ, প্রলয়ের সাক্ষী, নির্ব্বাণের প্রতীক।

অবিশ্বাসী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিবে—এ তো কল্পনা মাত্র; সত্যই তো আমি আর অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত মহাপ্রাণ নই!—হাঁ, কল্পনা বটে, কিন্তু সত্যসঙ্কল্পের দৈন্য-প্রমাথিনী কল্পনা, কামসঙ্কল্পের ব্যভিচারিণী কল্পনা নয় এ! আর তোমার কি-ই বা কল্পনা নয়? এই যে ছিন্নকন্থা অঙ্গে জড়াইয়া ভিখারীর বেশে বাহির হইয়াছ বিশ্বের রাজপথে—এ-ও কি কল্পনা নয়? ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না, রিপুর উত্তেজনা—এ-ও কি কল্পনা নয়? অতি অভ্যস্ত কল্পনাকেই না তোমরা বাস্তব আখ্যা দিয়াছ? অকুণ্ঠ-চিত্তে ইহার প্রতিবাদ কর, আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধা কর, হৃদয়ের সুপ্ত শক্তির সন্ধান নাও, বিশ্বাসের বজ্রাঘাতে শিবত্বের বিপরীত এই জীবত্ব-কল্পনার মূলও শিথিল করিয়া দাও!

অভাবের তাড়নায় স্বভাব ভুলিয়া একদিন আমিও তোমার মত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, ধরিত্রীর অজস্র শ্যামলতার অঙ্কে বসিয়াও জড়া-পাণ্ডুর দৈন্যকেই মনে করিয়াছিলাম আমার অনতি-ক্রমণীয় নিয়তি! আজও সেই স্মৃতি লোপ পায় নাই; কিন্তু তাহার তীব্র দাহ আজ স্নিগ্ধ হইয়া গিয়াছে। শরতের নীলাকাশে লঘু-শুভ্র মেঘখণ্ডের মত স্মৃতি চিত্তে ভাসিয়া যায়, জাগায় শুধু অপরিসীম ঔদাস্য! সেই বুভুক্ষাই জীবনে বাস্তবিকের বিভীষিকারূপে তোমাদের তাড়াইয়া ফিরিতেছে, তাহাও দেখিতেছি, আর চিত্ত করুণায় আনমিত হইয়া পড়িতেছে। গুহাহিত থাকিয়া তোমাদের দেখিতে পাইতেছি অতিস্পষ্টতর রূপে; তোমরা কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইতেছ না। কাহার দৃষ্টিকে বিভ্রম বলিব?

বিতর্ক ভুলিয়া যাও, তিক্ত ঔষধপানের মত হইলেও একবার তোমার এই পরিব্যাপ্ত মহিমার উচ্ছল আনন্দধারা পান কর। যে সময়টুকুতে তোমার সংসারের দায় হইতে ছুটী, সেই অবসরটুকুই না হয় এই কল্পনার বিলাসে কাটাইয়া দিলে! আকাঙ্ক্ষার প্ররোচনায় অবাস্তব কত কিছুরই তো কল্পনা করিয়া চিত্তকে ভারাক্রান্ত কর; একবার এই বন্ধনমুক্তির কথা, ভারমোচনের কথাই তোমার

নির্জ্জন কল্পনার সহচরী হউক না কেন! একবার দেখই না কেন, এতটুকু অমৃতের আস্বাদনও সে তোমায় দিয়া যায় কিনা, সংসারকর্ত্তব্যে এতটুকু শক্তি-সঞ্চার করে কিনা, এতটুকু শ্রান্তিহরণ করে কিনা!

অবিশ্বাসই কর আর উপহাসই কর, আত্মার এই অনন্ত মহিমার কল্পনা যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, সে আর ইহার মৌতাত কাটাইয়া উঠিতে পারে না কিছুতেই। তোমার কাছে যাহা একরকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, তাহার কাছে তাহা আলোর মত বাতাসের মতই সহজ। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের মত উর্দ্ধচঞ্চু হইয়া অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় চীঁচীঁ করিয়া মরিতেছ, জাতপক্ষের বাধাবন্ধহীন নভোবিহারের আনন্দ তুমি কি করিয়া অনুমান করিবে? চঞ্চু-পুটে আহার লইয়া তোমার কুলায়ে নামিয়া আসে বলিয়া সে-ও কি তোমারই মত অসহায়? দুঃখ করিও না, তোমার পক্ষবল সুপ্ত রহিয়াছে—এই মুক্তপক্ষদেরই সগোত্র তুমি। তুমি সে কথা জান না, কিন্তু ইহারা সে কথা জানে বলিয়াই খেচর হইয়াও স্বেচ্ছায়, মমতায় ভূচর সাজিয়াছে!

কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছ? সাহস করিয়া একবার শূন্যব্যোমরূপী পরম রিক্ততার কল্পনায় ঝাঁপাইয়া পড়! ভয় নাই, তোমার সংসার ভাসিয়া যাইবে না। মহাশূন্য একান্ত রিক্ত বলিয়াই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডকে সে বুকে ধরিয়া রহিয়াছে; আর তুমি তোমার এই অতি সত্য বস্তুপিণ্ডের একটী কণিকার মাঝেও তো আর একটী কণিকার স্থান করিয়া দিতে পার না! জড়ের মিলনে এই বাধা, কেহ কাহাকেও ঠাঁই ছাড়িয়া দিতে পারে না, মিলিতে গিয়াও চিরকাল এ উহার বাহিরে পড়িয়া থাকে—তৃষ্ণার আর নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু রিক্তের মাঝে সকলেরই সহজে ঠাঁই হয়; বস্তুতে বস্তুতে যে সংঘর্ষ, তাহাকেও সে প্রশান্ত মহিমায় বহন করে; আপনার মাঝে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহলের ঠাঁই করিয়া দিয়াও সে নির্দ্বন্দ্ব; তাহার একাংশে এই জগৎ পড়িয়া রহিলেও ত্রিপাদ যে দ্যুলোকে অমৃত হইয়া থাকে।

পরম শূন্যে প্রতিষ্ঠা কর তোমার সংসার। শূন্য না হইলে তাহাকে আশ্রয় দিবে কে? সংসার-কল্পনার উর্দ্ধেও তোমার এই শূন্যের কল্পনা, তোমার অবসরকালের রসায়ন। এই শূন্যের অমৃত পান করিয়া আত্মাকে বলিষ্ঠ কর, সংসারের ভার অনায়াসে বহন করিতে পারিবে। মাটীর কীট, চিরকাল মাটী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া কোন্ রসাতলের পানে তলাইয়া যাইতেছ? একবার মাথা তুলিয়া উপরের পানে চাহিয়া দেখ, নীলিমার অনন্ত অবকাশ স্নিগ্ধ চাহনিতে তোমারই পানে চাহিয়া আছে। তুলনা করিয়া দেখ, এ জগতে বস্তুপিণ্ড কতটুকু, আর ঐ বস্তুহীন শূন্যই বা কতখানি! ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে তুমিই কি সোয়াস্তি পাও? খাপের মাঝে যেমন করিয়া তরোয়াল পুরিয়া দেয়, তেমনি করিয়া নিরবকাশ আধারের মাঝে তোমায় পুরিয়া দিলে এক দণ্ডও বাঁচিতে কি? নিজের চারিদিকে প্রচুর অবকাশ সৃষ্টি না করিয়া প্রাণের প্রকাশ হয় কি কোথায়ও?

সাড়ে তিন হাত মানুষটী, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ভগবান্ যদি তাহার দৃষ্টিকেও সাড়ে তিন হাতের ওপারে যাইতে না দিতেন! এইখানে, এই মাটির বুকে এতটুকু জায়গা জুড়িয়া থাকিয়াও সে তার দৃষ্টিকে লক্ষ লক্ষ যোজন অতিক্রম করিয়া দূরতম জ্যোতিষ্কের কাছে প্রেরণ করিতে পারে। সে যত অতিকায়ই হউক না কেন, আকাশ যে কখনো তাহার মাথায় ঠেকিবে না, এ কি ভগবানের কম করুণা! দেহটী তার আঁটে-ঘাঁটে বাঁধা—কিন্তু তাহার মনের কাছে দেশ-কালের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া গেছে, সে সেখানে স্বরাট্। এমনি করিয়া রিক্ততার অজস্র আয়োজন চারি-

দিকে দেখিয়াও কি করিয়া গুটিপোকার মত নিজের জালে নিজকে জড়াইয়া মরিতে চাও?

তুমি সসীম—এই তোমার কল্পনার এক দিক। আবার তুমি অসীম, এ-ও তোমার কল্পনার আর এক দিক। পক্ষপাত করিও না, শুধু তোমার সীমাটাকেই একান্ত মনে করিও না, তোমার মাঝে সীমাহীনের যে আভাস জাগিয়া উঠে বিবিক্ত অবসরের মাঝে, তাহাকেও আপন বলিয়া জান। অসীমের বুকে তোমার সসীমকে রাখিয়া দাও—কিছুই হারাইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বাস্তবিক, কেবল সঞ্চয়ই তুমি চাও না, তুমি রিক্ততারও কাঙ্গাল; কিন্তু সে কথা বুঝিয়া উঠিতে পার না। কুসংস্কারে কদভ্যাসে চিত্তের সঞ্চয়-বৃত্তিটাই অনুশীলিত হইয়াছে, তাই তাহাকেই অহরহ চোখের সম্মুখে দেখিতে পাও। কিন্তু অফুরন্ত কর্মচঞ্চলতার মাঝেও তোমার মন কি বিশ্রাম চায় না? একান্ত ভাবিয়া যাহাদের জড়াইয়া ধরিয়াছ, এমন একটা মুহূর্ত্ত কি জীবনে আসে না যখন তাহাদিগকেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিবিক্ত একক হইতে সাধ যায়? মমতালোলুপ চিত্ত বলিবে, তাও কি হয় কখনো?—যাহাদের এত ভালবাসি, তাহাদের ছাড়িয়া কোথায় গিয়া শান্তি পাইব!—মিথ্যা এ ভালবাসার কল্পনা! প্রিয়জনের মাঝে শুধু বস্তুকেই ভালবাস নাই, বস্তুর আশ্রয় শূন্যকেও ভালবাসিয়াছ যে। তাই কখনো কখনো প্রিয়জনকে বুকের কাছে পাইয়াও নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ, নিঃস্পন্দ হইয়া থাকিতে ভালবাস। এ কি সেই রিক্ততারই আরতি নয়? সুগভীর মৌন দিয়াই কলভাষণের উপচার নয়? আঁখি মুদিয়াই দিদৃক্ষার আপ্যায়ন নয়?

এমনি করিয়া অপর্য্যাপ্ত রিক্ততা তোমার চারিদিকে ছড়ানো; নতুবা তুমি বাঁচিতে কি করিয়া, প্রাণকে ফুটাইতে কি করিয়া! অন্তহীন পরম শূন্যের মাঝে এই জগৎ এক কণা বস্তুসত্তা মাত্র; চারদিক্‌কার বিরাট্ নাস্তিত্বই তাহার অস্তিত্বকে সার্থক করিয়াছে; আর কিছু চারিদিকে নাই বলিয়াই সে যে আছে, এইটুকু পরমবিস্ময়ে পরম আনন্দে আমরা অনুভব করিতে পারি। অতএব শুধু বস্তু-পিণ্ডেরই নয়, অবস্তু রিক্ততারও পূজা করিতে হইবে। আমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ওই বিরাট্ নাস্তিত্বের পায়; ওই নীলতনু জগদ্বিষ্ণু আকাশের পানে চাহিয়া আমি আত্মহারা। শূন্যের বুকে দেখি ক্ষণিকার চপল বিলাস; বিশ্বলীলার এই মায়ায় আমি মুগ্ধ! আমার প্রজ্ঞাজ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বাণ-রসিক বুদ্ধ-আত্মা শূন্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এই ক্ষণিকার পানে; আর আমার সর্ব্বভূতের কল্যাণবাহী শঙ্কর-আত্মা এই ক্ষণিকার আলোকেই আরতি করিতেছে সেই নিখিল রূপায়নের আধারভূত অরূপ মহাশূন্যের। এই শূন্যও আমি, ক্ষণিকও আমি, আমি পূর্ণ। রিক্ততায় আমার অন্তর বাহির পূর্ণ বলিয়াই বৈদিক ঋষির মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমি বলিতে পারি—"অথ কো বা অন্যাৎ, কো বা প্রাণ্যাৎ, যদি আকাশ এষ আনন্দো ন স্যাৎ—আচ্ছা, কেই বা নিশ্বাস ফেলিত, কেই বা বাঁচিয়া থাকিত, যদি এই আকাশ—এই আনন্দ না থাকিত!"

এই রিক্তেরও একটা বেদনা আছে; বুঝি বা সে রহস্য জগতে অনধিগতচর। নিদাঘের তাপে উতপ্ত-নিথর যে আকাশ, তাহারও বুকে যে সকলের অলক্ষ্যে কান্না জমিয়া উঠিতে থাকে, তাহা কে জানে? বিরহের তাপে ধরণী দিন দিন দগ্ধ হইয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তার কান্না বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে জানেনা আর একজন তাহার বেদনাকে তিল তিল করিয়া আপনার বুকে জমাইয়া তুলিয়াছে। এমনি করিয়া সবার অলক্ষ্যে বৈরাগীর রিক্তহৃদয় রসের সঞ্চয়ে স্নিগ্ধশ্যাম হইয়া উঠিল—অবশেষে একদিন সে হৃদয় আছড়াইয়া পড়িল এই বিরহ

সন্তপ্তা প্রোষিতভর্তৃকা একবেণীধরা ধরিত্রীরই বুকে !

এ-ও মায়া বটে ; কিন্তু মিথ্যা বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিতে পারি না। মায়াও সত্য ; এমন সত্য যে তাহার রহস্যকে বেড়িয়া পাই না। বৈরাগীর রিক্ততাকে বুঝিতে পারি, কেননা তাহা প্রত্যক্ চেতনারই ঊর্দ্ধজ্বালাময়ী শিখা ; কিন্তু এই প্রত্যক্-চেতনাই কি করিয়া পরাঙ্‌মুখী হয়, তেজস্তত্ত্ব কি করিয়া অপ্‌তত্ত্বে বিবর্ত্তিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; শাণিত দীপ্তিতে যে আঁখির ভাষা তাহা বুঝি, কিন্তু অশ্রুজলের ভাষা তো বুঝিতে পারি না।

মুক্তির মাঝেই আবার বন্ধন ফিরিয়া আসে ; নির্ব্বিকার রিক্ততার বুকেই ফোটে লীলাঞ্চিত রসব্যাকুলতা। এ রহস্য যে জানে না, সে পরম-শূন্যের প্রশান্তি মাত্র দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার মাধুর্য্যের সন্ধান সে পায় নাই। বিকার একেবারেই বিকার নয়, তাচ্ছীল্যভরে ঠেলিয়া ফেলিবার বস্তু তাহা নয়। বিকার বলিয়া যাহাকে এ জগতে লাঞ্ছিত করিতেছ, তাহারও একটা রূপাদর্শ আছে ; সে আদর্শকে নির্ব্বিকারও বলিতে পারি না, আবার বিকার বলিয়াও খাটো করিতে পারি না। নির্ব্বিকার আর বিকার, দুইয়ের মাঝামাঝি তাহাকে রাখিয়া দিয়া নাম দিলাম—ভাব। উদ্বেলিত মহাসিন্ধু বটে সে—অনন্ত, অপার ; আপূর্য্যমাণ হইয়াও যেমন তাহা অচলপ্রতিষ্ঠ, আবার তেমনি অচল প্রতিষ্ঠ হইয়াও আপূর্য্যমাণ।

নিস্তরঙ্গ সমাহিত চিত্তকেই আদর্শ বলিয়া জানিয়াছি, নির্ব্বাণভূমিকার আভাস তাহারই মাঝে খুঁজি। কিন্তু জানি না, অসহ্য আনন্দের আবেগে স্পন্দমান চিত্তকেও সমাহিত বলা যাইতে পারে। নির্লেপ আকাশই শুধু নির্বাণের স্বরূপ নয় ; সেই আকাশের নীরূপ বুকে ধরিয়া উদ্বেলিত মহাসিন্ধুও নির্ব্বাণেরই এক বিভাব। সিন্ধু আর সমুদ্র যেখানে একাকার হইয়াছে, সেইখানেই অনাদি প্রকৃতি-পুরুষের মিথুনলীলা। দিক্‌চক্রবালের পানে তাকাইয়া দেখি, দুই-ই বুঝি শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে—তরঙ্গের আন্দোলন আর লক্ষ্য হয় না মনে হয়, সমস্তই বুঝি প্রশান্ত, নির্ব্বিকল্প। কিন্তু এ-ও তো মায়া ; কেননা অকূলের যাত্রী যে, সে জানে, ওই অনন্তের পানে যতই সে অগ্রসর হইয়াছে, তরঙ্গভঙ্গিমার বিরতি সে কোথায়ও দেখে নাই, অথচ নির্ব্বিকল্পের নিস্তরঙ্গ মহিমা এমনি করিয়া দিক্‌চক্রবালের কোলে সে চিত্রিত দেখিয়াছে। কাহাকে সে সত্য বলিবে ? এই তরঙ্গই মায়া, না ওই প্রশান্তিই মায়া ? প্রশান্ত আকাশের ছায়া বুকে লইয়া যে সিন্ধু আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, সে আলোড়ন আকাশের বুকেও ব্যাকুলতা জাগাইয়াছে কিনা কে জানে ? নতুবা শ্রাবণের প্লাবন নামিয়া আসে কোথা হইতে ?

স্তব্ধ আকাশ আর ক্ষুব্ধ সাগর, অনন্তের এই দুই প্রতীক ; রিক্ততা আর পূর্ণতার মহাসঙ্গমতীর্থ এই জগন্নাথের পুরী। ইহারই কূলে দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস লইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতের রূপ কেমন হইতে পারে, বিশ্বকর্ম্মার পরিকল্পনানুসারে এইখানে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছি। অনাদি প্রকৃতি-পুরুষের সাক্ষী এই জগন্নাথ—অরূপ নন, বিরূপ ; অচল নন, পঙ্গু ; অচক্ষু নন, বিশ্বতশ্চক্ষুর ব্যঙ্গরূপ, আমাদের প্রয়োজনে কাণা ; চৈতন্যের চেতনা হইয়াও স্তব্ধ, দারুভূত। নির্ব্বিকল্পভূমিকার এই এক দিক। ইহারই পাশে, এই আকাশ-সাগরের সঙ্গমতীর্থেই একদিন আসিয়া দাঁড়াইলেন চারুব্রহ্মরূপী জঙ্গম জগন্নাথ, রূপে নারীর সৌন্দর্য্যকেও পরাভূত করিয়া, সুমধুর নৃত্যে বিদ্যুল্লতার লাস্যলীলাকে পরাজিত করিয়া, নীলোৎপল আঁখিতে অশ্রুর সুরধুনী বহাইয়া, গম্ভীরার অন্তরকে ভাবাবেগে মথিত করিয়া ! দারুভূত চেতনা নয়, চারু চৈতন্য-বিগ্রহ ! ইহার রসোদ্গারকে বিকার বলিবার স্পর্দ্ধা কাহারও হইবে কি ? এ-ও সমাধি ; নির্ব্বিকল্পের আর এক দিক, রিক্তের বেদনার পূর্ণ-প্রতীক। দুই-ই জগন্নাথ, দুই-ই "সাক্ষী, চেতা, কেবলো নির্গুণশ্চ।" দুয়ে মিলিয়া এক।

মরণের পরপারে

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর একটা কথা বলা যেতে পারে। লোকে বলে, মরণের পর যা মিলবে বলে শাস্ত্রাদিতে লেখে, তাতে তো আমাদের অনন্ত সুখ পাওয়ার কথা। শাস্ত্রে বলে, মরার পর হয় অনন্ত স্বর্গ, নয় তো অনন্ত নরক কপালে আছে। এখন তার কি হবে?

বেদান্ত বলেন, অনন্ত বল্‌তে তুমি কি বোঝ? জানই তো, অনন্ত বল্‌তে কালসম্পার্কিত একটা কিছু বুঝাবে—যে কালের অবধি নাই। স্বপ্ন দর্শন যে জাগ্রৎকাল হতে ভিন্ন, তা-ও জান। জাগ্রতের সময় তোমার একরকম কাল, আবার ঘুমের সময় আর এক রকম কাল। স্বপ্নে এমন জিনিষও তোমার সামনে হাজির হতে পারে, যা পাঁচ হাজার বছরের পুরাণো। স্বপ্নে যেমন একটা পাহাড় দেখ্‌লে। জাগ্রতের দিক থেকে বিচার কর্‌লে পাহাড়টার উৎপত্তি এই মুহূর্ত্তে মাত্র হয়েছে; কিন্তু স্বপ্নের বিচারে ওটা হয়ত পাঁচ হাজার বছরের পুরাণো পাহাড়। কাজেই বেদান্ত বল্‌ছেন, স্বপ্নে অনন্ত কাল ধরে স্বর্গে থাক্‌বে বা অনন্তকাল ধরে নরকে থাক্‌বে—এতে তো কোনও আপত্তি হতে পারে না। ওই অনন্তকাল স্বপ্নের বিচারেই অনন্ত, জাগ্রতের বিচারে নয়!

বাইবেলে যা বলেছে, মরে গিয়ে দেখবে বাস্তবিকই তাই; কেননা স্বপ্নের ঘোরে তখন মনে হবে, বাস্তবিকই তুমি বুঝি অনন্ত কাল ধরে স্বর্গে বা নরকে আছ। কিন্তু স্বপ্নের তরফ থেকে যা অনন্ত, তা তো জাগ্রতের তরফ থেকে কিছুই নয়।

বেদান্তের মতে মরণের পর কি করে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হতে পারে, এই হতে তার কতকটা আভাস পেতে পার।

কিন্তু জন্মান্তরের কি মীমাংসা হবে? যাঁদের মুক্ত-পুরুষ বলা হয়, তাঁদের বেলায় কি হবে? বেদান্ত বলেন, মৃত্যুর পর সকলকেই যে স্বর্গ-নরকের ধাঁধাঁয় কাটাতে হয়, তাতো নয়। কিম্বা সবাইকে যে জন্ম নিতে হয়, তা-ও নয়। মুক্তপুরুষ বলেও একটা থাক্ আছে। তাঁরা কে?—তাঁদের জন্মান্তর হয় না; তাঁরা মুক্ত; তাঁরা স্বর্গ বা নরকে আবদ্ধ থাকেন না; স্বর্গ বা নরক সবই তাঁদের মাঝে, বিশ্বজগৎ তাঁদের মাঝে। এদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌ছি।

স্বপ্নে দু'রকম প্রতিভাস ফুটে ওঠে—বিষয় আর বিষয়ী। এই যে পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা যা তোমায় ঘিরে আছে, এ সমস্তই হচ্ছে বিষয়; আর এই যে স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ, পান্থরূপে নিজকে এই সমস্ত দৃশ্য দ্বারা বেষ্টিত মনে কর্‌ছেন, তিনিই হলেন বিষয়ী। স্বপ্নে তো অনেক কিছুই দেখা যায়। তার মাঝে একটা হচ্ছে যাকে বলা যায় "আমি"; আর সব হচ্ছে আমার জ্ঞেয়, আমা হতে তারা পৃথক্। বেদান্ত বলেন, স্বপ্নের বিষয় আর বিষয়ী, দুইই উৎপন্ন বস্তু, দুইই জাগ্রৎ আত্মার সৃষ্টি।

অভিধানকর্ত্তা ডাঃ জন্সনের কথা জান তো? তাঁকে লোকে বল্‌ত "বাক্য-নবাব।" তর্কে হেরে যাওয়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। সব কথাতেই শেষ রায়টা তাঁর হওয়া চাই ই। একজন রহস্য করে বলেছিল, ওঁর বন্দুকের যদি গুলি ফস্‌কে যায় তো কুঁদো দিয়েই তোমায় ঠেসে ধর্‌বেন। সব তর্কেই তাঁর জিৎ হওয়া চাই; কেউ যদি তর্কে জিতে গেল তো পাল্টা জবাব দেবার দরুণ উনি সৃষ্টি ওলট্ পালট্ কর্‌বেন! একদিন জন্সন স্বপ্নে দেখলেন, প্রসিদ্ধ বক্তা এড্‌মণ্ড বার্ক তাঁকে কি একটা তর্কে হারিয়ে দিয়েছেন। জন্সনের মত লোকের কাছে এ তো স্বপ্ন

নয়, দস্তুরমত বিভীষিকা। স্বপ্ন দেখেই উনি একবারে অস্থির হয়ে পড়েছেন, সেই যে তাঁর আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আর কি ঘুম কাছে ঘেঁসতে চায়? জানই তো, মনের ধর্ম্মই হচ্ছে, আরাম খোঁজা, শান্তিতে থাকার চেষ্টা করা। যখনই একটা কিছুতে গোল বাধে, তখনই মন তা ছুঁড়ে ফেলে সুস্থির হতে চায়, কেননা মনের স্বধাম হচ্ছে প্রশান্তি, তাই সে আপন ঘরে ফিরে যেতে চায়। কোনও না কোনও উপায়ে শান্তি তার চাইই চাই। অবশেষে জন্সন এই বলে নিজকে সান্ত্বনা দিলেন, "আমি যদি বার্ককে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, বার্ক, তুমি কি যুক্তিতে আমায় স্বপ্নে হারিয়ে দিয়েছিলে? তাহলে বার্ক আর সে যুক্তি-গুলির পুনরুল্লেখ করতে পারবে না। ঘুমের ঘোরে যে সব জবর যুক্তি সে পেশ করেছিল, তা আমার যেমন জানা আছে, তেমনি আমার যুক্তির কোন্ খুঁতে আমি হেরে গেলাম, তাও বেশ জানা আছে। তাহলে আমি দু'তরফের যুক্তিই জানি; যে জিতেছে তার কথাও জানি, যে হেরেছে, তার কথাও জানি। কিন্তু বার্ক কোনও তরফের কথাই জানে না। কাজেই আমার মাথা থেকেই তো দু'তরফের যুক্তি বেরিয়েছে। আমিই এক তরফে হয়েছি এড্মাণ্ড্ বার্ক, আর এক তরফে হয়েছি—জন্সন্।"

বেদান্তও বলছেন, স্বপ্নেও তুমি এক তরফে হও বিষয়ী, আর এক তরফে আবার হও বিষয়। আত্ম-স্বরূপ তুমিই একবার পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, বনজঙ্গল, পশু পাখী হচ্ছ, আবার আর একদিকে পথবিভ্রান্ত পথিক সাজ্ছ। তুমিই বিষয়, তুমিই বিষয়ী।

কাজেই বেদান্তের মতে মৃত্যুর পর যে সুদীর্ঘ স্বপ্নাবস্থা আসে, তার মাঝে তুমিই একাধারে স্বর্গ-নরক, আবার স্বর্গ-নরকের ভোক্তাও বটে। এইটী অনুভব কর, তবেই মুক্ত হবে।

একটী মেয়ের এই বেদান্তজ্ঞান হয়েছিল। এক হাতে আগুন আর একহাতে জল নিয়ে তিনি রাস্তায় চলছেন। লোকে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "একি! আপনার একহাতে আগুন, আর এক হাতে জল যে!" প্রশ্নকর্ত্তা ছিল একজন পাদ্রী। মেয়েটী বললেন, "এই হাতের আগুন দিয়ে তোমার স্বর্গ পুড়িয়ে ছারখার করব, আর এই হাতের জল দিয়ে নরকের আগুন নেবাব।"

যাঁর এই জ্ঞান হয়েছে যে স্বর্গ নরক তাঁরই মাঝে, স্বর্গ-নরকের ভীতি বা আকর্ষণ তাঁর কিছুই থাকে না। তিনি দুয়ের অতীত।

আচ্ছা, এই স্থূল জগৎটাই বা কি? এই যে জাগ্রতের দেশে এত মজা লুটছ—এটাই বা কি? বেদান্ত প্রমাণ করছেন, এই নিরেট, কঠিন, অনভি-ভাবনীয় বস্তুজগৎ এও প্রতিভাস মাত্র, স্বপ্নজগতের সঙ্গে এর কোনও তফাতই নাই। তীব্রতার পরিমাণের তফাৎ থাকৃতে পারে, কিন্তু জাতির তফাৎ নাই। তোমার জাগ্রতের জগতও একটা স্বপ্ন, নিরেট স্বপ্ন বল্তে পার; আর এই তথাকথিত নিরেট বস্তু-জগতে বিষয় আর বিষয়ী দুই ই আত্মার সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, এই হচ্ছে বেদান্তের মত। তোমার আত্মাই এই পাহাড়-পর্ব্বত, গ্রাম নগর, সব হয়েছে, আবার তারই মাঝে পথহারা মুসাফির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে বিষয়ী, সেই বিষয়, যে বিষয়, সেই বিষয়ী; তোমার জাগ্রতেও এই লীলা!

মৃত্যু মানে বিষয়ীর বিরতি, বিষয়ের বিরতি নয়। তুমি স্বপ্ন দেখ্ছ, তুমি বার্কলেতে আছ; বাস্তবিক তুমি আছ কিন্তু স্যানফ্রান্সিস্কোতে। স্বপ্নে দেখা এই বার্কলে আর তার সম্পর্কিত ঘটনার তাৎপর্য্য কি? তারা হলো গিয়ে বিষয়; আর যে তুমি এখন বার্কলেতে আছ বলে মনে করছ, সেই হল বিষয়ী। জান, কখনো কখনো আমাদের ডবল ঘুম হয় অর্থাৎ আমরা ঘুমের মাঝেও ঘুমাই। যেমন সুদেরও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ চলে, তেমনি স্বপ্নের মাঝেও

স্বপ্ন বা ডবল স্বপ্ন চলে। তুমি যদি স্বপ্নে বার্কলে থেকেই ঘুমিয়ে পড়, তাহলে তোমার ডবল ঘুম হল না কি? ফলে কি হল? তুমি আবার জাগ্‌লে। স্বপ্নে আমরা একজায়গায় ঘুমিয়ে আর একজায়গায় জেগে উঠি। এখানেও তুমি ঘুমিয়েছিলে সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে, কিন্তু জেগে উঠ্‌লে বার্কলেতে। বার্কলে হল তোমার বিষয় আর তুমি হলে বিষয়ী; বিষয়ী ঘুমিয়ে পড়ল, বিষয় কিন্তু ঠিকই থাক্‌ল। বিষয়ী একবার ডুব দিয়ে আবার ভেসে উঠল। আবার তুমি বার্ক্‌লেতে এলে, অথচ তোমার ঘুম সমানেই চল্‌ছে। বার্ক্‌লে হতে তুমি গেলে লজেঞ্জেলেসে। লজেঞ্জেলেসে এক বন্ধুর বাড়ীতে আবার তুমি ঘুম দিলে। লজেঞ্জেলেস্‌, বন্ধুর বাড়ী ইত্যাদি হল বিষয়; আর তুমি হলে বিষয়ী। বিষয় ঠিকই রইল, বিষয়ী আবার ডুব দিল। লজেঞ্জেলেসে একটু ঘুমিয়ে তুমি হাজির হলে লিক্ অব্‌জারভেটারীতে; সেখানে গিয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে নিলে। লিক্ অব্‌জারভেটারী হল বিষয়, আর তুমি হলে বিষয়ী। বিষয়ী কিছুক্ষণ ডুবে থেকে আবার ভেসে উঠ্‌ল। লিক্ অব্‌জারভেটরী হতে গেলে তোমার এক গ্রীষ্মাবাসে; সেখানে তোমার এক আত্মীয় এসে তোমায় জাগিয়ে দিল। তুমিই কিন্তু ছিলে গ্রীষ্মাবাসে; আর গ্রীষ্মাবাসটী দেখছিল যে, সে-ও তুমিই। যখন জাগ্‌লে, তখন বিষয় বিষয়ী দুই-ই চলে গেল, কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে, ততক্ষণ বিষয়টা থাকৃত, কেবল বিষয়ী একেকবার ডুব দিত। তখন অর্থাৎ স্বপ্নের মাঝে যে জাগরণ, সেটা কিন্তু বাস্তবিক জাগরণ নয়।

এখন এই দৃষ্টান্তটা কি করে খাটে, তাই দেখ। বেদান্তের মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই এক স্বপ্ন। এই বিশ্বস্বপ্নে দেশ-কাল নিমিত্ত ইত্যাদি যা কিছু দেখ্‌ছ, সব হচ্ছে বিষয়; এমন কি যাকে তুমি বল্‌ছ তোমার দেহ, তোমার "আমি"—তাও বিষয়। মানুষ যখন মরে, তখন কি হয়? মায়ার সুদীর্ঘ স্বপ্ন তো তখনও ছুটে যায় না; স্বপ্ন যেমন ছিল, তেমনি থাকে। কাজেই একটা মানুষ যদি আজ এখানে মরে তো জন্মান্তরে সে আবার হয়ত ওইখানে জেগে উঠবে। মরবার সময় স্নেহপ্রীতিভরা যে সংসার সে দেখে গিয়েছিল, সেই সংসার জেগেও সে দেখতে পেল। এই দ্বিতীয় জন্মটা যেন বার্কলে বা লিক্ অবজারভেটরীতে থাকার মত। বিষয় সেই একই থাক্‌ছে, কেবল বিষয়ী কিছুক্ষণের জন্য সরে যাচ্ছে। আবার কিছুদিন পরে সে জন্মাল। এই তৃতীয় জন্মে ৭০।৮০ বছর বেঁচে থেকে আবার সে মরল। লিক্ অব্‌জারভেটরী তেমনি থাক্‌ছে, বিষয়ী কিন্তু আবার ডুব মেরেছে। আবার সে হয়ত একখানে গিয়ে ভেসে উঠল। এমনি করে জন্ম আর মরণ ঘুরে ঘুরে আস্‌তেই থাক্‌বে, যে পর্য্যন্ত নাকি বিষয় আর বিষয়ী দুই-ই ছুটে যায়। যতদিন পর্য্যন্ত জগৎটা তোমার বাইরের একটা কিছু এই বোধ থাক্‌বে, ততদিন তুমি এখানে বন্দী। ততদিন এই জন্মান্তরের চাকায় তুমি বাঁধা। চাকা ঘুর্‌ছেই—একবার তোমায় ওপরে তুল্‌ছে, আবার নীচে ফেলে দিয়ে পিষে মার্‌ছে, আবার তুল্‌ছে, আবার ফেল্‌ছে। কোথাও আর তোমার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই।

বেদান্ত বলেন, বিষয় আর বিষয়ী, দুই-ই নিজের মাঝে যে দেখে, সেই মুক্ত। জন্সনের মত যখন জেগে উঠে দেখি আমিই বিষয় বিষয়ী দুই পক্ষ, তখন আমরা মুক্ত। এই বিশ্বজগৎ আমারই দেহ; যে এ কথা বল্‌তে পারে সে জন্মান্তরের আবর্ত্ত হতে মুক্ত। সে আস্‌বে কোথায়, যাবে কোথায়? এমন দেশ নাই, যা সে পূর্ণ করে না রয়েছে; অনন্ত দেশে প্রসারিত সে। সে আস্‌বে কোথায়? যাবে কোথায়?—বিশ্বজগৎ তারই মাঝে—সে ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, জন্মমৃত্যুর প্রবাহ হতে মুক্ত। পূর্ব্বভারতে শিশু মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে চিন্তা অভ্যাস কর্‌তে শেখে, সে হচ্ছে এই যে তাকে যেন এই জন্মান্তর-

প্রবাহে না ভেসে বেড়াতে হয়, সে যেন মুক্তি লাভ করে, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে যেন পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ শান্তি পায়।

মিল্‌টনের জীবনীতে তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে একটী ভারী সুন্দর গল্প আছে। মিল্‌টনের স্ত্রী একদিন স্বামীকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বামীকে দেখেই তাঁকে কাছে পাবার জন্য তাঁর ভারী একটা আকুলতা হল। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তিনি বল্‌লেন, "আমি চিরজীবন তোমারই!" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জেগে উঠে দেখেন কি, তাঁর কুকুরটা বিছানায় তাঁর পাশে শুয়েছিল, সেটা ঝাঁপিয়ে তাঁর বুকের ওপর উঠেছে। তিনি জাগতেই কুকুরটা মেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বপ্নে যে তাঁর স্বামীকে তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন মনে করেছিলেন, সেটা বাস্তবিক কিন্তু এই কুকুরটা। কুকুরটা যদি তাঁকে আরও চেপে ধর্‌ত তো তাঁর মনে হ'ত, বুকের ওপর যেন হিমালয় চেপে বস্‌ছে।

বেদান্ত বলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবিদ্যারূপী কুকুর তোমার বুকে চেপে থাক্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার স্বপ্নের দৃশ্যপটগুলো বদ্‌লে যাবে শুধু—একবার ভাল হবে আবার মন্দ হবে—একবার হবে স্বামী, একবার হবে পাহাড়! ঘড়ির দোলকের মত হাসি আর কান্নার মাঝে দোল খেতে হবে শুধু তোমায়। এই জগৎটা তোমার বুকে পাথরের মত চেপে বস্‌বে—কোথায়ও আর শান্তি থাকবে না। তাই বেদান্ত বল্‌ছেন---দূর করে দাও এই অবিদ্যার কুকুর—ব্রহ্মরূপে জেগে ওঠ—বল সোঽহং—জান তুমি মুক্ত!*

* At Golden Gate Hall, *Jan. 15, 1903*

সংযমী

আমার কিসে ভাল হইবে, কিসে মন্দ হইবে জানি না।—সংসারে সহস্র পথের মোহানায় দাঁড়াইয়া সকলেই একদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই কথাটাই বলি। তখন যদি এমন কোন মরমী বন্ধু কাছে আসিয়া আশ্বাসের বাণীতে বলে, "এই তোমার পথ, এই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতেই একদিন গন্তব্যস্থলে পৌছিবে," তখন মনে হয় না কি আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সব তাহাকে উৎসর্গ করিয়া দিই? আমিও একদিন এই জটিল সমস্যায় পড়িয়াই একজনের কাছে এর সমাধান চাহিয়াছিলাম। দোটানায় পড়িয়া আমার মন কেবলই দুলিতেছিল, বারবার প্রশ্ন জাগিতেছিল—ভোগের পথে, না ত্যাগের পথে? তবুও হঠাৎ একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারি নাই। একটা অপেক্ষাবুদ্ধি সর্ব্বদাই বলিত, "রোস, যা কিছু সুন্দর দেখছ সবই সুন্দর না-ও হতে পারে তো।" এই অপেক্ষাবুদ্ধিই ছিল আমার সুহৃদ, সেই আমাকে আবেগের বশে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে দেয় নাই, সেই আজ হাতে ধরিয়া আমায় কল্যাণের পথে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে।

একটী মাত্র উপদেশ বন্ধু আমায় দিয়াছিলেন, "দেখ, ভালই হোক আর মন্দই হোক, ধাঁ করে একটা কিছু করে বসো না; আবেগটা থিতিয়ে গেলে তারপর কাজে হাত দিও।" কথাটা যখন প্রথম শুনি, তখন শুধু অবিশ্বাসের হাসিই হাসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এ ও কি কখনো সম্ভব যে আবেগ চলিয়া গেলে মানুষ কাজ করিতে পারে?—

কাজ তো মানুষ করে আবেগের ভরা জোয়ারে। তবু একবার ভাবিলাম, "আচ্ছা, এক আধ-বার পরখ করিয়াই দেখা যাক্ না কেন, শেষ ফল কি দাঁড়ায়। একটু রহিয়া-সহিয়াই কাজ করা তো? ক্ষতি কি?" এখন দেখিতেছি বন্ধুর কথা শুনিয়া ঠকি নাই। আবেগের স্রোতে ভাসিয়া গেলে আজ কূল পাইতাম কি?

ভাল জিনিষ তৈরী করিতে গিয়া অযথাও অনেক অপচয় হয়। চিত্তকে বাঁধিতে গিয়াও তেমনি প্রথমতঃ চিন্তার বাজে খরচ হয়। কিন্তু তাহাতে অস্থির হইলে চলে না। শক্ত মুঠিতে হাল ধরিয়া ঢেউএর দু'চার ধাক্কা সামলাইতে সামলাইতেই তরী কূলে ভিড়িয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে মানুষের মাঝে এই অপেক্ষাবুদ্ধিটুকু আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। যাঁহার ভিতর এই সহ্য করিবার ক্ষমতা যত বেশী, জগতে তিনিই তত বড়।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

—দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধের বেগ উদ্ভব মাত্রেই প্রতিরোধ করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই সমাহিত যোগী এবং তিনিই সুখী।

কাজেই উত্তেজনাটাই কিছু আতঙ্কের বস্তু নয়। উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন-ও যদি সহযোগী হইয়া ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতে থাকে, তবে সেইটাই বাস্তবিক ভয়ের কথা। বেগের উদ্ভব হইবে না, এমন অসম্ভব কথা সাধুরা বলেন না; কিন্তু বেগকে যে উদ্ভবমাত্রেই প্রতিহত করা যায়, এই কথাটাও তাঁহারা জোরগলায় বলিতেছেন। মানুষ তো জড়বস্তু নয়; তাহার চিত্ত আছে, বিচিত্র অনুভবও আছে, রিপু আছে, রিপুর উত্তেজনাও আছে। কিন্তু এই উত্তেজনাকেই পরম তৃপ্তি বলিয়া তলাইয়া যাইতে তো কেহই বলেন নাই। সমস্যা এবং সমাধান দুই-ই আছে। কাম-ক্রোধের বেগ উদ্ভব হয়, ইহা সত্য এবং ইহাই সমস্যা; আবার এই বেগকে মানুষ আপন শক্তিতে জীর্ণ করিয়া অন্যদিক দিয়া সুন্দর রূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, ইহাও সত্য এবং ইহাই সমাধান। বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনকে মুক্ত করিয়া দিব্য অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত করিলে এক অনির্ব্বচনীয় রসের আস্বাদন পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণও এই কথাটাকেই নানা দিক দিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বলিয়াছেন। সুখ কে না চায়? কিন্তু যে ভোগ-সুখে দিবারাত্র মজিয়া রহিয়াছ, এ আর কি সুখ? এর চেয়েও কোটিগুণ সুখ পাওয়া যায় শুধু সংযমে।

আবেগকে হজম করিয়া ফেলা চাই। মোটকথা বাহিরের কোন কিছুর দ্বারাই যেন আবিষ্ট হইয়া না পড়ি। ব্যর্থ-জীবন তাহারই বলি, যে ধারণে অসমর্থ—একটুখানি সঞ্চয় হইতে না হইতেই সঞ্চয়ের আবেগে যে উপচিয়া পড়ে। ভাল-মন্দ, সু-কু সমস্তই জীবনে মেঘের খেলা। কিন্তু আমার আপন ঠাঁই যে মেঘের পরপারে উদার নির্ম্মুক্ত স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ। ওই নির্লিপ্ত আকাশকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে মেঘলোকের মায়া।

যাহা জানিতে চাও, তাহাতেই সংযম করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহার তত্ত্ব আপনি তোমার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। কাম, প্রেম, রস, রতি, উত্তেজনা, উদ্দীপনা যাহাই বল না কেন—সংযমেই সকলের তত্ত্ব করায়ত্ত হয়। কাম-ক্রোধ মানব-মনের সহজ বৃত্তি, কিন্তু ব্যবহারদোষে তাহাদিগকে আমরা বিকৃত করিয়া ফেলি। আর বিকৃত করিবার মূল কারণই হইতেছে, আসল জিনিষটা কি তাহা আমরা মোটেই জানি না। ভালবাসা কথাটা নামে জানি, কিন্তু আসলে ভালবাসা জিনিষটা কি, তাহার কতটুকু ধারণা আমাদের আছে? অনেক সময় অলক্ষ্যে

আমাদের হৃদয়ে কত আশ্চর্য্য অনুভূতি আসে ; কিন্তু সেই অনুভূতিকে ধরিয়া রাখিয়া তাহার তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা জাগে কি ? অপরে আমায় ভালবাসে এই কথাটাই যখন জানিতে পারি, তখনই আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া পড়ি ; তারপর কেন আমায় অপরে ভালবাসে, তাহা সন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হয় কি ? স্বল্প চেষ্টায় ভোগ মিলিলে তত্ত্বের জন্য কে আর মাথা ঘামাইতে চায়, বল ? কিন্তু সাধারণের সহিত সাধকের এইখানেই তফাৎ। সাধকের অনায়াস প্রাপ্তিতেও বিচার থাকে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা থাকে।

ভালই হোক আর মন্দই হোক বৃত্তিগুলিকে তো কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কাজেই বৃত্তির স্ফুরণ তত আশঙ্কার নয়, যত আশঙ্কার বিষয় বৃত্তির তত্ত্বসম্বন্ধে অজ্ঞান। বাস্তবিক যে কোনও বিষয়ের তত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত মানুষের সম্পূর্ণ তৃপ্তিই আসিতে পারে না। ভোগীর ভোগস্পৃহার মূলেও রহিয়াছে তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রেরণা, তাহা কি আমরা তলাইয়া বুঝি ? এই জন্যই মনু বলিয়াছিলেন, শুধু টুঁটি চাপিয়া ধরিলেই প্রবৃত্তিকে সায়েস্তা করা যায় না, ভোগেও সে বাগ মানে না ; প্রবৃত্তির শাসন হয় জ্ঞানে।

ঢেউকে বুঝিতে হইলে সমুদ্রের মত স্থির হইয়া যাইতে হইবে। আমার ভিতর হইতে উদ্ভূত তরঙ্গে যদি আমিই চঞ্চল হইয়া উঠি, তবে আমার নিস্তরঙ্গ সত্তার অনুভব হইবে কখন ? কাজেই যে কোন বেগই আসুক না, সমস্তই সহিয়া যাইতে হইবে—ইহাই হইল সাধনা এবং সিদ্ধির সঙ্কেত।

অন্তর্ব্যাপ্তি

ন্যায়দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

যদিও বৌদ্ধ-পণ্ডিত রত্নাকর শান্তি "অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন" নামক প্রকরণে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত অন্তর্ব্যাপ্তিবাদ স্থাপন করিয়াছেন এবং দিঙ্-নাগের মতের সহিত ইহার সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি ইহা ধ্রুব সত্য যে বৌদ্ধগণের অনেকেই ইহা গ্রহণ করেন নাই, বরং ইহার খণ্ডনেই সচেষ্ট ছিলেন। ইহা স্বাভাবিক। কারণ এই মত গ্রহণ করিলে দিঙ্নাগের 'ত্রৈরূপ্যবাদ' ও 'অসাধারণ অনৈকান্তিক' নামক হেত্বাভাস উড়িয়া যায়। তাই শান্তরক্ষিত স্বকৃত তত্ত্বসংগ্রহে জৈন দার্শনিক পাত্রস্বামীর মত খণ্ডনপূর্ব্বক দিঙ্নাগ-প্রোক্ত হেতুর ত্রৈরূপ্যবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শান্তরক্ষিতের খণ্ডনশৈলী আলোচনা করিলে এ কথা বেশ বুঝা যায়।

পাত্রস্বামী বলিতেছেন, যদি হেতু 'অন্যথানুপপন্ন' হয়, তবে রূপত্রয়ের কি প্রয়োজন ? আর যদি 'অন্যথানুপপন্ন' না হয়, তবে রূপত্রয়ের উপযোগিতা কোথায় ? কারণ যাহার অন্যথানুপপত্তি আছে, তাহাই মাত্র হেতু।*

---

* অন্যথাঽনুপপন্নত্বং যস্য তস্যৈব হেতুতা।
দৃষ্টান্তৌ দ্বাবপি স্তাং বা মা বা তৌ হি ন কারণম্॥
অন্যথানুপপন্নত্বং যস্য তস্য ত্রয়েণ কিম্।
নান্যথানুপপন্নত্বং যস্য তস্য ত্রয়েণ কিম্॥
—ত॰ স॰ ১৩৬৮—৬৯

শান্তরক্ষিত বলিতেছেন, হেতুর এই 'অন্যথানুপপন্নত্ব' লক্ষণটী কোথায় জানিতে পারা যায়? হেতু ও সাধ্যের সামান্যের মধ্যে জানা যায়? কি সাধ্যধর্ম্মীতে? কিংবা দৃষ্টান্তে? যদি সামান্যতঃ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, তবে সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুর সত্ত্ব প্রদর্শিত না হওয়ায় বিবক্ষিত সাধ্যের সিদ্ধি হইতে পারে না। যেমন চাক্ষুষত্ব ও বিনাশিত্বের মধ্যে অবিনাভাব সামান্যতঃ অবগত হইলেও, তাহা শব্দের অনিত্যতা সাধনে অসমর্থ। যদি ধর্ম্মীতে হেতুর সদ্ভাব খ্যাপন করা প্রয়োজন মনে কর, তবে সেই ত্রৈরূপ্যই স্বীকার করা হইল। কারণ ধর্ম্মীতে হেতুর সদ্ভাবের দ্বারা পক্ষধর্ম্মত্ব এবং অন্যথানুপপত্তি দ্বারা ব্যতিরেক ও অন্বয় পাওয়া গেল। আর যদি বল, সাধ্যধর্ম্মীতেই এই অন্যথানুপপত্তির গ্রহণ হয়, তাহা হইলে হেতু অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ দৃষ্টান্তে যাহা সাধ্যব্যতিরেকে দৃষ্ট হয় না, এমন হেতুই সাধ্যের জ্ঞাপক, ইহা বৌদ্ধেরা বলেন। জৈনেরা কিন্তু সাধ্যধর্ম্মীতেই যাহা সাধ্যব্যতিরেকে সম্ভূত হয় না, এমন হেতুরই গমকত্ব স্বীকার করেন। তাই জৈনগণ বলেন, "আমাদের অনুমান নরসিংহতুল্য; মীমাংসকের বিপক্ষব্যাবৃত্তি ও বৌদ্ধর পক্ষসত্ত্ব এই দুইই আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সপক্ষসত্ত্বের কোন স্থান আমাদের অনুমানে নাই। তাই আমাদের অনুমান শবর প্রোক্ত অর্থাপত্তি ও ভিক্ষুপ্রোক্ত অনুমান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"*

শান্তরক্ষিত বলেন, জৈনদের এই মত গ্রহণ করিলে হেতু অনর্থক হইয়া পড়ে। যদি হেতুর সাধ্যব্যতিরেকে উৎপত্তিই অসম্ভব হয়, তবে যে প্রমাণের দ্বারা পক্ষে হেতুর অবস্থিতি অবগত হইবে, তাহার দ্বারাই সাধ্যও সিদ্ধ হইয়া যাইবে, অতএব হেতু ব্যর্থ। আর যদি সাধ্যের সিদ্ধি না হয়, তবে হেতুও সিদ্ধ হইবে না, কারণ সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যাবিনাভাবিত্বই জৈনমতসিদ্ধ হেতুর লক্ষণ। সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্য সিদ্ধ না হইলে সাধ্যাবিনাভাবিত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? আর যদি অন্য প্রমাণের দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে হেতু নিরর্থক। কারণ সাধ্যসিদ্ধির জন্যই হেতুর অপেক্ষা করা হয়; সেই সাধ্য অন্য প্রমাণ সিদ্ধ হইলে হেতুর প্রয়োজন থাকিবে না—ইহা তো স্পষ্ট।

আর যদি দৃষ্টান্তেই অবিনাভাব গ্রহণ হয় বল, তবে সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যজ্ঞান হইবে না, কারণ তাহা হইলে সর্ব্বোপসংহারে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল না। অতএব হেতুর ত্রৈরূপ্য ব্যতিরেকে ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে তদধীন সাধ্যসিদ্ধিও আকাশকুসুমে পরিণত হইবে (ত০ স০ ১৩৮১-৮৯)। আর অন্তর্ব্ব্যাপ্তিতে যেমন স্বার্থানুমানে হেতুর ব্যর্থতা প্রমাণিত হইল, পরার্থানুমানেও পক্ষধর্ম্মতার (Minor Premise, হেতুর পক্ষে অবস্থান) উল্লেখ নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ সাধনবাক্যে (Syllogism) পূর্ব্বে ব্যাপ্তির এবং তারপর পক্ষধর্ম্মত্বের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অন্তর্ব্ব্যাপ্তিতে সাধ্যধর্ম্মীতেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানের পূর্ব্বেই কিম্বা তৎসমকালেই পক্ষধর্ম্মতার জ্ঞান হইয়া যায়। অতএব ব্যাপ্তির উল্লেখের দ্বারাই পক্ষধর্ম্মের অবগতি হওয়ায়, পুনরায় পক্ষধর্ম্মতার উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। বহির্ব্ব্যাপ্তিবাদীদিগের মতে কিন্তু পক্ষের বহির্ভূত দৃষ্টান্তধর্ম্মীতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় বলিয়া পক্ষধর্ম্মতার উল্লেখ না করিলে পক্ষে সাধ্যজ্ঞান হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে অন্তর্ব্ব্যাপ্তিবাদী বলেন যে, ব্যাপ্তিজ্ঞানে সাধ্যধর্ম্মী বা দৃষ্টান্তধর্ম্মীর প্রবেশ নাই, একথা অন্তর্ব্ব্যাপ্তিবাদী ও বহির্ব্ব্যাপ্তিবাদী উভয়কেই

---

* বিনা সাধ্যাদদৃষ্টস্য দৃষ্টান্তে হেতুতেষ্যতে।
পরৈর্ম্ম্যা পুনর্ধর্ম্মিণ্যসম্ভূষ্ণোবিনামুনা॥
অর্থাপত্তেশ্চ শাবর্য্যা ভৈক্ষবাচ্চানুমানতঃ।
অস্মদেবানুমানং নো নরসিংহবদিষ্যতে॥
—ত০স০ ১৩৮৮ কারিকার পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

স্বীকার করিতে হইবে। কারণ প্রত্যক্ষদ্বারা পক্ষধর্ম্মতার জ্ঞান এবং ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে অনুমান হয়, একথা বহির্ব্যাপ্তিবাদী বলেন এবং তাহা অন্তর্ব্যাপ্তিবাদীরও অভিমত। ব্যাপ্তির বিস্মরণ হইলে কেবল পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের দ্বারা অনুমান হয় না, ইহা তো অনুভবসিদ্ধ। তাহা হইলে এখন বলা যাইতে পারে যে, যে হেতুবিশেষের পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হয়, তাহারই যখন সাধ্যের সহিত ব্যাপ্তিস্মরণ হইয়া থাকে, তখন অনুমান তো ব্যর্থ, কারণ সাধ্যের জ্ঞান তো স্মৃতির দ্বারাই পাওয়া গেল। যদি বল, সাধ্যধর্মীর পরামর্শ না হইয়াই ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সাধ্যধর্মীতেই দৃষ্টহেতুর যখন ব্যাপ্তি স্মরণ হয়, তখন সাধ্যধর্মীর পরামর্শ হইবে না কেন? অতএব এ কথা বলিতেই হইবে যে ব্যাপ্তি সামান্যকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সাধ্যধর্মীর জ্ঞান হয় না, আর সাধ্যধর্মীর জ্ঞান হইলে প্রত্যুত হেতু অসাধারণ হইয়া যাইবে, ব্যাপ্তিগ্রহণই সম্ভব হইবে না। আর ধর্ম্মিবিশেষের জ্ঞানের ব্যাপ্তিজ্ঞানে কোন উপযোগিতাও নাই, যেহেতু ধর্ম্মিজ্ঞান না হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে—যেমন বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তে। আর পক্ষধর্ম্মত্বের জ্ঞান যদি ব্যাপ্তিজ্ঞানের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়—এ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ তখন তো পক্ষধর্মতার জ্ঞান থাকে না। আর যদি পক্ষধর্ম্মত্বের জ্ঞানকে ব্যপ্তিজ্ঞানের অঙ্গ বল, তবে তো সমস্ত অনুমানই ব্যর্থ। কারণ ব্যাপ্তিস্মৃতিদ্বারাই পক্ষে সাধ্যজ্ঞান হইল এবং সাধ্যজ্ঞান স্মৃতিই হইল, অনুমানের তো কোন আবশ্যকতাই রহিল না। অতএব বহির্ব্যাপ্তিতে যেমন পক্ষধর্মত্বের জ্ঞান অনাবশ্যক ও অনিষ্ট, সেরূপ অন্তর্ব্যাপ্তিতেও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। তবে আর অনুমানের ব্যর্থতা কোথায়?

বলা হয় যে, অন্তর্ব্যাপ্তিতে পরার্থানুমানে পক্ষধর্ম্মত্বের উল্লেখ অনর্থক, কারণ সাধনবাক্যে পূর্ব্বে ব্যাপ্তিসূচক বাক্যের এবং পরে পক্ষধর্ম্মতার উল্লেখ করা হয়। অন্তর্ব্যাপ্তিবাদীদিগের মতে কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের পূর্ব্বেই পক্ষধর্ম্মতার জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবার পক্ষধর্ম্মতার উল্লেখ তুষারশিশিরীকরণের ন্যায় ব্যর্থ। আর কেবল হেতুর উল্লেখ করিলেই সাধ্যের জ্ঞান হইয়া যাইবে, কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞানে দৃষ্টান্ত বা পক্ষধর্মত্বজ্ঞানের প্রবেশ নাই।* ইহার উত্তরে অন্তর্ব্যাপ্তিবাদী বলেন যে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মত্বের যে কোন ক্রমেই উল্লেখ হউক না কেন, তাহাতে উঁহাদের আপত্তি নাই। কারণ তাঁহারা বলেন যে শব্দ তো স্বয়ং প্রমাণ নহে। উহা বস্তুর সূচনা করিয়া দেয় মাত্র; বস্তুর প্রামাণ্য থাকিলেই শব্দের প্রামাণ্য।(*) তাই যেমন বহির্ব্যাপ্তিতে তেমনই অন্তর্ব্যাপ্তিতেও পূর্ব্বে পক্ষধর্ম্মত্বের জ্ঞান, পরে বিপক্ষবাধকতর্করূপ প্রমাণান্তরের দ্বারা ব্যাপ্তি গ্রহণ হইলে কাহার ব্যর্থতা হইবে?

তোমার দৃষ্টান্তধর্মীতেও প্রথমে হেতুর প্রত্যক্ষ হয় এবং পরে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। যদি বল, দৃষ্টান্তে হেতু ও সাধ্য উভয়ই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, সাধ্যধর্মীতে কিন্তু সাধ্য প্রত্যক্ষগোচর হয় না, কি করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, দৃষ্টান্তে উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু হেতু ও সাধ্য বলিয়া তো তাহাদের জ্ঞান হয় না, ব্যাপ্তিগ্রহণের পরেই তাহাদের এই স্বরূপটী ধরা পড়ে।

আচ্ছা, বহ্নি ও ধূমের বেলায় না হয় উহাদের প্রত্যক্ষ হয়, সত্ত্ব ও ক্ষণিকত্বের ব্যাপ্তিজ্ঞানে তো

---

* "তদ্ভাবহেতুভাবৌ হি দৃষ্টান্তে তদবেদিনঃ।
ব্যাপোতে বিদুষাং বাচ্যো হেতুরেব হি কেবলঃ॥"
—পঃ লঃ সুঃ বৃঃ ৩।৯৩

(*) শব্দস্ত সূচকং হেতোর্বচোঽশক্তমপি স্বয়ং"—অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন, পৃঃ১০৮।

ক্ষণিকত্বের কোন দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ হয় না—সেখানে বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারাই* ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় বলিতে হইবে; তখন সাধ্যধর্মীতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে বাধা কিসের? আর দৃষ্টান্তে বহ্নিধূমের সহচার মাত্র দর্শনেই তো ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না; কারণ সহচার-দর্শনে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে প্রত্যেক সহচারদর্শনই যখন একরূপ ও অবিশিষ্ট, তখন প্রথম সহচারদর্শনেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়া সম্ভব। আর লৌহলেখ্যত্ব ও পার্থিবত্বের মধ্যে তো শতসহস্র সহচার দর্শন হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না। তাই যতক্ষণ বিপক্ষবাধক তর্ক উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব।

ধর্মীতে ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে হেতু ব্যর্থ হইবে, নতুবা চাক্ষুষত্বহেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যতাজ্ঞান হওয়ার সম্ভব, এ আপত্তির কোন সারবত্তা নাই। কারণ চাক্ষুষত্বের সহিত শব্দগত অনিত্যত্বের অবিনাভাব নাই; অবিনাভাব না থাকাতেই অনিত্যত্বের অনুমান সিদ্ধ হয় না, উহা পক্ষধর্ম্মত্বের অভাবনিবন্ধন নহে। আর সাধ্যব্যাপ্ত সাধনের উল্লেখ হইলে সামান্যতঃ সাধ্যধর্মীর অবগতি হইলেও, বিশেষতঃ সন্দেহ অপনোদনের জন্য তাহার উল্লেখ আবশ্যক। সাধ্যধর্মীর উল্লেখে অন্তর্ব্যাপ্তিতে হেতু ব্যর্থ হইবে—এ আশঙ্কার পরিহার পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। আর ব্যধিকরণধর্ম্মের [যাহা প্রকৃত ধর্মীতে (Subject) অবিদ্যমান এমন ধর্ম্ম] দ্বারা সাধ্যের অনুমান হইবে, এ আপত্তিও করিতে পারা যায় না; কারণ ধর্মিবিশেষে হেতুর জ্ঞান না হইলে বিবাদের (debate) কারণই উপস্থিত হয় না। তাই ধর্মীতে যে হেতু দৃষ্ট হয়, তাহার বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারা সাধ্যের সহিত ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত অনুধাবন ব্যর্থ। কারণ যদি বাধকজ্ঞানের দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহণ না হয়, সহস্র দৃষ্টান্তের দ্বারাও তাহা সম্ভব হইবে না।

আর এক কথা, দৃষ্টান্তের উল্লেখের প্রয়োজন কি? তুমি বলিবে, সাধ্যধর্মীতে ব্যাপ্তিসিদ্ধি হইলে ব্যাপ্তিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি হইয়া যায় এবং হেতু ব্যর্থ হইয়া পড়ে—এজন্য দৃষ্টান্তে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়; তাহা হইলে হেতুও ব্যর্থ হয় না এবং অনুমানের প্রামাণ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। আমিও তাহা হইলে বলিব, ভালই তো, ব্যাপ্তিসাধক প্রমাণের দ্বারাই যে সাধ্যজ্ঞান হইল, হেতুজ্ঞানের প্রয়োজনই হইল না, এ তো আমাদের লাভ। হেতুনির্দ্দেশ করিতেই হইবে বলিয়া তো আমাদের মাথার দিব্য নাই। আর যদি বল, ব্যাপ্তিসাধক প্রমাণের দ্বারা ধর্মীতে সাধ্যসিদ্ধি হয় না, তবে তো হেতু ব্যর্থ হইল না এবং অনুমানও টিকিয়া গেল। এরূপ অনাবশ্যক আশঙ্কার তো কোন হেতু নাই। ব্যাপ্তিগ্রহণ বা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্যও তো দৃষ্টান্তের উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ বিপক্ষবাধক তর্কদ্বারাই ব্যাপ্তিগ্রহণ হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্যও দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক, কারণ ব্যাপ্তি সামান্যকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, আর দৃষ্টান্তমাত্রেই ব্যক্তি; দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্তিনিশ্চয় কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ব্যাপ্তিস্মরণের জন্যও দৃষ্টান্তের উল্লেখ ব্যর্থ, কারণ তাহার জন্য অবিনাভাবি হেতুর উল্লেখই পর্য্যাপ্ত। দৃষ্টান্তের উক্তি প্রত্যুত সন্দেহের সৃষ্টি করিবে। কারণ ব্যক্তিরূপ দৃষ্টান্তে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য (Co-existence) প্রদর্শিত হইলেও সর্ব্বত্র সেইরূপ সামানাধিকরণ্য থাকিবে ইহা তো প্রমাণিত হয় নাই। আর যদি সন্দেহনিরাসের জন্য দৃষ্টান্তের উল্লেখের সহিত ব্যাপ্তিসূচক সমর্থনবাক্য উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে কর, তবে সমর্থনরূপ হেতুবাক্যেরই উল্লেখ কর, নিরর্থক দৃষ্টান্ত স্বীকার করায় লাভ কি? আর যদি বল, মন্দবুদ্ধিকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ আবশ্যক, তবে শাস্ত্রেই তাহার উল্লেখ থাকুক, বাদে (discussion) তাহার প্রয়ো

---

* বাধকাৎ তদসিদ্ধিশ্চেদ্ব্যর্থো ধর্ম্মান্তরগ্রহঃ।
—অন্তর্ব্যাপ্তিস॰, পৃঃ ১০৯

জন নাই। কারণ বাদে ব্যুৎপন্নেরই অধিকার, অব্যুৎপন্ন বাদে অনধিকারী। তাহা ছাড়া বাদকালে শিষ্যের ব্যুৎপাদন তো উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু পরপক্ষের পরাজয় পূর্ব্বক স্বপক্ষের সিদ্ধিই সেখানে উদ্দেশ্য। অবশ্য বলিতেছ, পক্ষসত্ত্ব ও অন্যথানুপপত্তি দ্বারা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ত্রৈরূপ্যের কথাই বলা হইতেছে; আমরাও সে কথা অস্বীকার করি না। কারণ অন্যথানুপপত্তি থাকিলে ত্রৈরূপ্যের জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু অন্যথানুপপত্তি না থাকিলে ত্রৈরূপ্য একেবারে ক্লীব। অন্যথানুপপত্তি থাকিলেই যখন তাহাদের সাফল্য, অন্যথায় নহে. তখন যুক্তির অনুরোধে ইহাকেই আমরা হেতুর একমাত্র সমর্থ-রূপ বলিয়া প্রতিপাদন করি।

আর এক কথা। যদি সাধ্যধর্মীতেই ব্যাপ্তি গ্রহণ হয়, তবে দিঙ্‌নাগ যে 'অসাধারণ অনৈকান্তিক' নামে হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। হাঁ, আচার্য্য মূঢ়মতকে অপেক্ষা করিয়াই অসাধারণ হেতুকে দুষ্ট হেতু বলিয়াছেন। যাহারা দৃষ্টান্তরূপ বহির্ভূতধর্ম্মীতে ব্যাপ্তিগ্রহ হয় মনে করে, সেই সমস্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণকে উদ্দেশ করিয়াই ইহাকে আচার্য্য হেত্বাভাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু 'শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা শ্রবণগ্রাহ্য' এ অনুমানে শ্রবণগ্রাহ্যত্ব সাধু হেতু। কারণ, বিপক্ষে বাধক প্রবৃত্তির দ্বারা এখানে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইতেছে এবং বিপক্ষে বাধ বা অন্যথানুপপত্তিই হইতেছে সাধু হেতুর একমাত্র লক্ষণ, পক্ষধর্মত্ব তাহার গৌণ লক্ষণ। অতএব অনেকস্থলে পক্ষধর্ম্মত্ব না থাকিলেও কেবল বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারাই ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে দেখা গেল, জৈন দার্শনিকগণ ও বৌদ্ধ রত্নাকর শান্তির মতে বিপক্ষবাধক তর্কের দ্বারাই ব্যাপ্তি গ্রহণ হইয়া থাকে, দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন এই তর্ক স্বয়ং প্রমাণ বা অপ্রমাণ ইহা বিচার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তর্ককে অপ্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে তর্ক অনবধারণাত্মক, তর্ক 'ইহা এইরূপই বটে' (এবমেবেদমিতি)—এই প্রকার জ্ঞান নহে। দুটী বিষয়ের উপস্থিতি হইলে, তর্ক একতরের বাধা প্রদর্শন করিয়া অন্যতরের অভ্যনুজ্ঞা মাত্র (approval) করে। তাই প্রমাণান্তরের দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয়ে ইহা সহকারী মাত্র, নিজে স্বতন্ত্র ভাবে বস্তুর নিশ্চয় সাধন করে না বলিয়া স্বয়ং প্রমাণ নহে। তর্ক 'এই অর্থ সঙ্গত, অপরটী নহে' এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণের বিষয়কে বিবিক্ত করিয়া দেয়, পরে প্রমাণগুলি প্রবৃত্ত হইয়া সেইরূপ তর্কের দ্বারা বিবেচিত অর্থের অবগতি সাধন করে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তর্ককে অপ্রমাণ বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর তর্ককে সংশয় ও নির্ণয় হইতে পৃথগ্‌জাতীয় জ্ঞান বলিয়াছেন। তর্ককে যাঁহারা অনুমান বলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন, কারণ তর্কে ধর্মিমাত্রের অবগতি থাকে। লিঙ্গের অবগতি থাকে না বলিয়া তর্ক লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। অনুমান ধর্মিগত ধর্মের উপলব্ধি হইলে প্রবৃত্ত হয়, তর্ক কিন্তু অন্যগত ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলেও প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়। যেমন, 'এখানে নিশ্চয়ই মানুষ আছে. যে হেতু অশ্ব বাহিত হইয়া থাকে'—এখন অশ্ববাহন পুরুষধর্ম না হইলেও পুরুষের সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দিতেছে। তাই তর্কে সাধন কেবল সাধ্যধর্মীতে অসিদ্ধ তাহা নয়, অন্যগতও বটে। অনুমান অন্যগত ধর্মের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাই অনুমান হইতে তর্কের ভেদ পরিস্ফুট (ন্যাঃ বাঃ ১৪২ পৃঃ ও তাঃ টীঃ ৩০১ পৃঃ)।

এখন দেখা গেল, নৈয়ায়িকদিগের মতে তর্ক ব্যভিচারাদির শঙ্কা নিরাস করিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহকারী হইলেও স্বয়ং প্রমাণ নহে। কারণ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকেই প্রমাণ বলা যাইতে পারে; তর্ক কিন্তু নিশ্চয়াত্মক নহে, সে অভ্যনুজ্ঞা মাত্র। কিন্তু জৈনগণ এ মত স্বীকার করেন না। হেমচন্দ্র স্থরী তাঁহার 'প্রমাণমীমাংসা' গ্রন্থে যে প্রকারে এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইতেছে।

'যৌগগণ (নৈয়ায়িক) তর্কসহকৃত প্রত্যক্ষ হইলে ব্যাপ্তিগ্রহ হয় বলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও মতে যখন কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না, কিন্তু তর্কসহকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারা হয়, তখন তর্ককেই ব্যাপ্তিগ্রাহক বলেন না কেন? বেচারী তর্কের যশো-মার্জ্জন করিয়া লাভ কি? আর কেনই বা তর্কপ্রসাদ-লব্ধ ব্যাপ্তিগ্রহের অপলাপ করিয়া প্রত্যক্ষের উপর কৃতস্বত্বের আরোপ করা? যদি বল, তর্ক অপ্রমাণ বলিয়াই এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তর্ক অপ্রমাণ কেন হইল? অব্যভিচাররূপ প্রামাণ্যের লক্ষণ তো তর্কেও বিদ্যমান, ব্যাপ্তিরূপ বিষয়ও রহিয়াছে। তাই তর্ককে অপ্রমাণ বলা নৈয়ায়িকদিগের অপ্রামাণিক পরিভাষামাত্র (technical fiction), তাহার অনুকূলে কোন যুক্তি নাই। অতএব অন্য প্রমাণের দ্বারা অগৃহীত যে ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক বা উহকে প্রসিদ্ধ প্রমাণসমূহ হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। আর তর্কব্যতিরেকে কেবলান্বয়ি অনুমান স্থলে ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে,—এই উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কারণ সেখানেও সংশয় আছে ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।'

আমরা দেখিলাম যে অন্তর্ব্যাপ্তিবাদ জৈনদের সৃষ্টি। ষষ্ঠ শতাব্দীর সিদ্ধসেন দিবাকর হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশশতকে সমুদ্ভূত হেমচন্দ্র স্থরি পর্য্যন্ত এই অন্তর্ব্যাপ্তি সমর্থন করিয়াছেন। শান্তরক্ষিত এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন, কারণ ইহা দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তিসম্মত ত্রৈরূপ্যবাদ ও অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট এই অন্তর্ব্যাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জৈন বা বৌদ্ধদের মত, এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করিয়াছেন। পরে বৌদ্ধ রত্নাকরশান্তি এই মতকে বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে গ্রহণ করেন। রত্নাকর যে বৌদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ তিনি এই অন্তর্ব্যাপ্তিবাদকে দিঙনাগের মতের সহিত সমন্বয় করিতে অশেষবিধ প্রয়াস করিয়াছেন। জৈন-নৈয়ায়িকগণের নিকট আমরা অশেষপ্রকার ঋণী। জৈন ও বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যা যে অপূর্ণ থাকিবে, তাহাতে মতদ্বৈধের লেশমাত্র অবকাশ নাই। কেবল এই অন্তর্ব্যাপ্তিবাদ নহে, নিগ্রহ-স্থানের উপর জৈন-নৈয়ায়িকগণ যে উদার ও নির্ভীক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রশংসাবলী স্বতঃই সমুৎসারিত করে। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(সমাপ্ত)

উপজীব্য গ্রন্থপঞ্জী

(১) গোতম—ন্যায়সূত্রম্ (ন্যা০ সূ০); (২) বাৎস্যায়ন—ন্যায়ভাষ্যম্ (ন্যা০ ভা০); (৩) জয়ন্তভট্ট—ন্যায়মঞ্জরী (ন্যা০ ম০); (৪) উদ্দ্যোতকর—ন্যায়বার্ত্তিকম্ (ন্যা০ বা০); (৫) বাচস্পতি মিশ্র—তাৎপর্য্যটীকা (তা০ টী০), (৬) শান্তরক্ষিত—তত্ত্বসংগ্রহঃ (ত০ স০); (৭) কমলশীল—তত্ত্বপঞ্জিকা (ত০ প০); (৮) হেমচন্দ্র সূরি—প্রমাণমীমাংসা (প্র০ মী০)। (৯) মাণিক্য নন্দী ও অনন্তবীর্য্য—পরীক্ষামুখসূত্রম্ ও লঘুবৃত্তিঃ (প০ সূ০ ও ল০ বৃ০); (১০) Carveth Reid—Logic: Deductive & Inductive; (১১) রত্নাকরশান্তি—অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থনম্ (অ০ ব্যা০ স০); (১২) গঙ্গেশ উপাধ্যায়—তত্ত্ব-চিন্তামণিঃ; (১৩) কুমারিল ভট্ট—তন্ত্রবার্ত্তিকম্ এবং (১৪) শ্লোকবার্ত্তিকম্; (১৫) উদয়নাচার্য্য—ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ; (১৬) রত্নকীর্ত্তি—ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিঃ।

আস্বাদন

——(::)——

আস্বাদনই জীবনের চরম লক্ষ্য। দ্রষ্টার আসন-লাভের চেয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ কাম্যই বা কি থাক্‌তে পারে? আমাকে যখন যুগপৎ আমার মাঝে এবং অন্যের মাঝে দেখতে পাই, তখনই আস্বাদন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রশ্ন হয়, আস্বাদন করব কাকে? ভোগীর কাছ থেকে এর উত্তর সহজেই পাওয়া যাবে; কিন্তু আস্বাদনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য একমাত্র যোগী ছাড়া আর কেউ জানেন না। শ্রুতি বল্‌ছেন, "আত্মানং বিদ্ধি"—নিজকে জান। এই হল চরম কথা—চরম আস্বাদন। আমাকেই যখন আমি বিভিন্ন আধারে নানা ব্যঞ্জনায় জান্‌তে পারি, তখনই চরম তৃপ্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অবতরণের মূল প্রয়োজন বিচার কর্‌তে গিয়ে চৈতন্যচরিতামৃতকার বল্‌ছেন—"শ্রীরাধার প্রণয়মহিমাই বা কি, সে প্রণয়-বলে আমারই বা কি মাধুর্য্য তিনি আস্বাদন করেন, আর আমাকে ভালবাসিয়া তাঁহারই বা কি সুখ, এই তিনটী বিষয় জান্‌বার দরুণ শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।" এখানেও দেখি, নিজকেই নিবিড় করে অনুভব করারই ইঙ্গিত রয়েছে। শ্রীরাধিকা কেন আমার দরুণ এত উতলা, এ তত্ত্বানুসন্ধানের মূলেও রয়েছে আমি কি—তাই জানা। মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজকেও জান্‌লেন, আবার তাঁকে অনুভব করে দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধার যে অনুভব হত, তাও যুগপৎ নিজের মাঝেই অনুভব কর্‌লেন। এই জন্যই মহাপ্রভুর জীবনকে অনতিবর্ত্তনীয় আস্বাদনের জীবন বলা যেতে পারে। ভালবাসায় তিনি নিজকে হারিয়ে ফেলেননি, বরং সেই ভালবাসার ভিতর দিয়েই নিজকে আরও নিবিড় ভাবে আস্বাদন করেছেন।

এই তো মহাপুরুষদেরও গুরুত্ব। তাঁরা জগতে প্রচার কর্‌তেই আসেন না বা রাজা মহারাজাকে শিষ্য কর্‌তে পার্‌লেই কৃতার্থ হয়ে যান না। তাঁদের দ্বারা যদি জগতের হিত হয় তো সে তাঁদের আবির্ভাবের গৌণ প্রয়োজন; তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—আস্বাদন, নিজকে জানার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা। আমরা কিন্তু সে রহস্য না বুঝ্‌তে পেরে সাধারণতঃ মুখ্য কারণটাকে চেপে রেখে গৌণ কারণটাকেই মুখ্য বলে প্রচার করি।

চৈতন্য-চরিতামৃতকার বল্‌ছেন—

> "এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
> যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম॥
> কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
> যুগধর্ম্ম কালের হৈল সেকালে মিলন॥
> দুই হেতু অবতরি লৈয়া ভক্তগণ।
> আপনে আস্বাদে প্রেম নামসংকীর্ত্তন॥

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু আসেন নি, তবে কিসের দরুণ এসেছিলেন?—

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
> রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
> সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
> আনুষঙ্গে কৈলা সব রসের প্রচার॥
> রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
> অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥
> সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
> রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥

রস আস্বাদন করাই মহাপ্রভুর অবতরণের গূঢ় উদ্দেশ্য, আর যত কিছু সব আনুষঙ্গিক।

যিনি স্বয়ং রসস্বরূপ, তিনি আবার রস আস্বাদন কর্‌বেন কি? তাই চরিতামৃতকার বল্‌ছেন—

> কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান।
> পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
> রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
> না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন বল।
> যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥

এ বিহ্বলতার মাঝে কিন্তু অপূর্ণের আকুলতা

নাই, কেননা তিনি পূর্ণানন্দময়, চিন্ময়, পূর্ণতত্ত্ব। আত্মারাম হয়েও তিনি রাধিকার প্রেমে উন্মত্ত, তাই প্রেমকে মহাবল বল্‌ছেন। তিনি জানেন, এই যে তাঁর দরুণ শ্রীরাধার "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি"—এ তাঁরই অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তির অনুভব ; কিন্তু তবুও তিনি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছেন না, শ্রীরাধা কি করে তাঁকে এত ভালবাসেন, তাই ভেবে তিনি কেঁদে আকুল। আপন মায়ায় আপনি মুগ্ধ তিনি—এই তো আস্বাদনের অনির্ব্বচনীয় রহস্য। অজ্ঞানী বিহ্বল হয়ে পড়ে না বুঝে, জ্ঞানী জেনে-শুনে বিহ্বল হন। তাই তো জ্ঞানীর প্রেম অনির্ব্বচনীয়।

অবতারের মুখ্য প্রয়োজনটী অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া আর কেউ বুঝ্‌তে পারে না। মহাপ্রভুর নাকি সাড়ে তিন জন মাত্র অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; অথচ দেশবিদেশে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর কৃপা পেয়েছে। অবতারের বিশিষ্ট-শক্তিতে, দিব্য-প্রেরণায় ছোট-বড় ভাল-মন্দ সবার ভিতরেই একটা তুমুল তরঙ্গ ওঠে, তারাও নাচে গায়, প্রেমোন্মাদে মত্ত হয়; কিন্তু আসল তত্ত্বটী সবাই ধর্‌তে পারে না। ঐশ্বর্য্য আর বিভূতি দেখেই তারা মুগ্ধ, কিন্তু সহজ-মানুষটীর সহজ আচরণ তাদের চিত্তে তরঙ্গ তোলে না। মহা-পুরুষদের চরিত্র-চর্চ্চাও আমরা ওইভাবে করি। কে যোগবলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন, কে একাসনে বসে কত সের গাঁজা পুড়িয়েছিলেন—এ সব তথ্য দিয়েই আমরা সাধুত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করি। কিন্তু সিদ্ধাই দিয়ে কি কখনো মহৎ জীবনকে বোঝা যায়? মানুষের মাঝে মানুষেরই মত যিনি এসেছেন, তাঁর হৃদয় অনির্ব্বচনীয় সুখে-দুঃখে, আকাঙ্ক্ষায়-আকুলতায় কম্পিত, এ কথা ধারণা করতে পারাও বহু ভাগ্যের ফল। যিনি জ্ঞানী, জগতের সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তাঁকেই আঘাত করে বেশী, জগতের দরুণ তাঁরই চোখের জল অজস্র ধারে ঝরে পড়ে। জ্ঞানী হলেই যে তাঁর হৃদয় থাক্‌বে না, তা তো নয়; বরং তাঁর হৃদয় তখন সকলের দরুণ আরও বেশী করে কেঁদে আকুল হবে। মহাপ্রভু যদি তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে লোক ভোলাতেন, তাহলে এত লোক তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ত না। তিনি যে মানুষের দরুণ কেঁদেছিলেন, তাই মানুষও তাঁর দরুণ কেঁদে আকুল হল। শক্তি দেখিয়ে, ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে মানুষকে আবিষ্ট করা যায়, কিন্তু ভালবাসা আকর্ষণ করা যায় না। এমন অনেকের কথাই জানি, তথাকথিত গুরুর সম্মোহন-শক্তিতে কতক সময়ের দরুণ তারা আবিষ্ট হয়ে ছিল, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে এলে তারাই আবার গুরুদ্রোহী হয়ে উঠল। এমনধারা শক্তি-প্রয়োগে সত্যিকার ভালবাসার বীজ নেই বলেই তার প্রতিক্রিয়াও হয় বিপরীত।

উপাধির প্রলোভন থাক্‌তে পারে, কিন্তু তৃপ্তি তাতে নেই। তাই দেখি উপাধির জ্বালায় অস্থির হয়ে মানুষ সহজ জীবন-যাপনের দরুণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাস্তবিক হাটের বাইরে যদি মানুষের এমন একটু আপন ঠাঁই না থাকে, যেখানে গিয়ে সে প্রাণ-খুলে দুটো কথা বল্‌তে পারে, আপন খুসীতে চল্‌বার কোন বাধা পেতে হয় না তাকে, তাহলে যে মানুষ কবে শুকিয়ে মরে যেত। তার কর্ম্ম-জীবনের উৎসই যে সেই প্রাণখোলা জায়গাটী, যেখানে আর দশজন হতে সে আলাদা। কর্ম্মজীবনের প্রাণশক্তি আহরণ করি আমরা সেই অব্যক্ত কেন্দ্রভূমি থেকেই। মানুষ বেঁচে আছে সেই কেন্দ্রটীকে ধরেই, তা না হলে পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে সে যে অস্থির হয়ে পড়্‌ত। সারাদিন বাইরের খাটুনীতে শ্রান্ত হয়ে যখন ঘরে এসে আপনজনের সঙ্গে দুটো প্রাণখোলা কথা বলি, তখনই সারাদিনের সমস্ত তাপ জুড়িয়ে যায় না কি? কাজেই কোন্‌টাকে সত্য বল্‌ব? বাইরের এই কোলাহলময় জগৎ, না এই নিভৃত শান্তি-নিকেতন? দুটীই সত্য, তবে একটী মুখ্য আর একটী গৌণ। একটী না হলেও বুঝি চল্‌ত, কিন্তু আর একটী না

হলে যে আমরা প্রাণেই বাঁচি না। অতিমানুষও যে মুখ্যত: সহজ-সরল মানুষ, এইটাই হল রসের কথা, অনুভবের কথা। তাঁদের জীবনেও একটা মুখ্য উদ্দেশ্য রয়েছে—সে হচ্ছে আস্বাদন। এ আস্বাদন অপরের নয়, অপরের মাঝে আমারই আস্বাদন। শ্রুতিও বলছে, "আত্মা বিত্তের চেয়েও প্রিয়, পুত্রের চেয়েও প্রিয়।" নেতি নেতি বলে জগৎ হতে সরে দাঁড়িয়ে এই আত্মাকে আস্বাদন করা নয়; অনাত্ম বস্তু বলে যাদের দূরে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন, তাদেরকেই আত্মা বলে, আমার অতি আপন বলে জানা—এই হচ্ছে সহজ জীবনের কথা। তখন আমার রসদৃষ্টিতে আবার এই জগৎটাই অনির্ব্বচনীয় হয়ে ফুটে উঠবে।

অপরে আমায় কেন ভালবাসে, তা খুঁজতে গিয়েও আমাকেই অপরের মাঝে পাই। এমনি করে আমিই যে জগৎময় ছড়িয়ে আছি ক্রমে ক্রমে সে অনুভব জাগতে থাকে। আর মুগ্ধ হয়ে যাই তখনই. যখন দেখি বাইরের কিছুতে আমায় আবিষ্ট করেনি, আমিই আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছি। প্রকৃতির শোভা দেখে প্রাণ নেচে ওঠে কেন? আমি যে সত্যি সত্যি প্রকৃতির মাঝে রয়েছি। এমনি করে যার মাঝে আমাকে আমি বেশী করে পাই—সেই আমার প্রিয়তম। রাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সব চেয়ে বেশী করে পেতেন বলে রাধাই হলেন ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি, কৃষ্ণপ্রিয়তমা।

গুরুগিরি বল, ধর্ম্মপ্রচার বল, সবই গৌণ প্রয়োজন—আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজকে জানা—ব্যষ্টিতে নয়, সমষ্টিতেও। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মাঝে অনুস্যূত থেকেও পুরুষ "অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্"—দশ আঙ্গুল ছাড়িয়ে উঠেছেন। পুরুষ যে চঞ্চল, অতৃপ্ত, তার কারণই এই, পুরুষ প্রকৃতিকে কেবলই ছাড়িয়ে উঠতে চাইছেন। আবার প্রকৃতিরও মাধুর্য্য হচ্ছে পুরুষের মন জুগিয়ে চলার আশ্চর্য্য লীলাকুশলতায়। উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণের এই বীজ। এই অন্তহীন অন্যোন্য-রসব্যাকুলতা যিনি নিজের মাঝে আস্বাদন করছেন, তিনিই পূর্ণ। এই আস্বাদনই সৃষ্টির সফলতা। এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই কবিরাজগোস্বামী রাসলীলার তাৎপর্য্য বুঝাতে গিয়া বলছেন—

> কৈশোর বয়স, কাম, জগৎ সকল।
> রাসাদিলীলায় কৈল এ তিন সফল॥

এ সাফল্য পূর্ণ আত্মতৃপ্তির সাফল্য, এবং তাতেই জগৎ ধন্য। আমি আমাকে পেলেই তবে জগৎ আমাকে পেয়ে সার্থক হবে।

রহস্য এই, মানুষ নিজকেই জানতে চায় নিজকেই পেতে চায়, অথচ জগতের ইতিহাসে তার পরিচয় হয় অন্যরূপ। ইতিহাস বলে, শঙ্কর শুষ্কজ্ঞানী, আর চৈতন্য প্রেমাবতার। কিন্তু শঙ্কর-গৌরাঙ্গের অন্তরের সাক্ষী কে? এমনি করে মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে, একদিক ধরে তার চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কত যে ভুল হয়ে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। অতিমানুষের মর্ম্মকথা কেউ বুঝে না, তাই অন্তরঙ্গ ভক্তও দুর্লভ; অথচ তারাই অতিমানুষের সহজ আস্বাদনের পাত্র-পাত্রী।

মীরাবাঈ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

——(::)——

যে গলিতে আমার ঘর, ভুলেও কি একবার সে গলিতে তোমার পা পড়ে না?—

রারী রারী হো শ্যাম হুঁ রারী—
তুম্ আজ্যো গলী হামারী!
তুম দেখ্যাঁ বিন্ কল ন পড়ত হৈ,
জোউঁ বাট তুমারী।

—আমি তোমার, আমি তোমার, ওগো শ্যাম, আমি তোমার; একবার তুমি আমার গলিতে আস না কেন? জান না, তোমাকে না দেখিয়া আমার এক তিল সোয়াস্তি নাই; আমি তোমার পথ চাহিয়া রহিয়াছি যে!

কভী ম্হাঁরী গলী আররে—
জিয়া কি তপত বুঝাররে!
ম্হাঁরে মোহনা প্যারে!

—একবার আমার এ পথে তুমি এসো—ওগো আমার চিত্তচোর প্রিয়তম! একবার আসিয়া এ প্রাণের জ্বালা জুড়াও গো!

তেরে সাঁবলে বদন পর
কঈ কোট কাম বারে।
তেরা খুবী কে দরস পৈ
নৈন তরস্তে ম্হাঁরে!

—তোমার ঐ শ্যামল তনুতে কত কোটী কাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তোমার ওই অনুপম মাধুরী দেখিবার দরুণ আমার দুটী চোখ যে চিরপিয়াসী।

ঘায়ল ফিরুঁ তড়পতী,
পীড় জানে নহিঁ কোঈ।
জিস্ লাগী পীড় প্রেমকী
জিন লাঈ জানে সোঈ।

—ঘায়েল হইয়া আমি ছট্‌ফট্ করিতেছি, আমার ব্যথার কথা কেউ তো জানে না। ভালবাসিয়া যার জন্য যে ব্যথা পাইয়াছে, সে-ই ইহার পরিমাণ জানে!

এইখানে আমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, আর ওইখান দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে—আমার পিপাসিত দুটী আঁখি তাঁহার দিকে তাকাইয়া আর ফিরিয়া আসিতে পারে নাই—

নৈনা লোভীরে বহুরি সকে নহিঁ আয়!
রোম-রোম নখ-শিখ সব নিরখত
ললচ রহে ললচায়।

—লোভী আমার দুটী নয়ন, আর বাহুড়িয়া আসিতে তো পারিল না। আমার পায়ের নখ হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী রোমকূপ যেন আঁখি হইয়া ফুটিয়া উঠিল, তবুও দর্শনলালসা তো মিটিল না।

মৈঁ ঠাঢ়ী গৃহ আপনে রে
মোহন নিকসে আয়,—
সারঙ্গ ওট তজে, কুল অঙ্কুস,
বদন দিয়ে মুসকায়!

—আমি আপনঘরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময় বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া আমার মনের হরিণী আড়াল ছাড়িয়া সম্মুখে আসিল, কুলের কাঁটা দূর হইয়া গেল, আমার সমস্ত শরীরে হাসির তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল।

লোক-কুটুম্বী বরজ বরজ হী
বতিয়াঁ কহত বনায়—
"চঞ্চল চপল, অটক নহিঁ মানত,
পর হথ গয়ে বিকায় !"

—আত্মীয়স্বজন সকলেই আমার সঙ্গ এড়াইয়া যায়, কত রচা কথাই না তাহারা বলে ! বলে, "কি চঞ্চল, কি চপল ও—কিছুতেই ওকে আটকাইয়া রাখা গেল না। অনায়াসে পরের হাতে বিকাইয়া গেল !"

ভলী কহো কোঈ, বুরীক হো—
মৈঁ সব লঈ সীস চঢ়ায়।
মীরা কহে, প্রভু গির্ধর কে বিন্
পল ভর রহ্যো ন জায়।

—তোমরা ভালই বল আর মন্দই বল, তোমাদের সকল কথাই আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। কিন্তু তবুও মীরা বলে, গিরধারীকে ছাড়িয়া এক পলও যে সে থাকিতে পারে না।

গোকুলে গোয়ালাকুলে কেবা কিবা বোলে।
তনু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে।

*   *   *

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া,
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া।
বারেক দেখিতে নাহি পাই সব দিনে,
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে ?
এ দুঃখ কাহারে কব, কে আছে এমন ?
তুমি সে পরাণবন্ধু জান মোর মন !
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ, রহিতে না পারি—
খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি !

❦   ❦   ❦

এই পথ চাহিয়া থাকা অবশেষে সফল হইল। গিরিধারী একদিন বাস্তবিক ঐ পথ দিয়া আসিলেন।

*   *   *

ও কাহাকে খুঁজিতেছে ? আমাকে কি ? না, আমাকে সে খুঁজিবে কেন ? আমার এমন কি গুণ আছে, যাহা দিয়া তাহাকে বশ করিব ?

তবুও সে যে আমাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও চাহিবে, এ কথা মনে করিতে গেলেও যে চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়ে। কত দিন এই পথের মোড় হইতে সে ফিরিয়া গিয়াছে, অপাঙ্গেও একবার চাহিয়া দেখে নাই, আমি যে তাহার জন্যই—

ঊঁচী চঢ়্ চঢ়্ পন্থ নিহারূঁ,
রোয় রোয় আঁখিয়া রাতি।

— উঁচুতে উঠিয়া উঠিয়া পথ চাহিয়া কাটাইয়াছি, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার চোখে নামিয়া আসিয়াছে নিশার আঁধার।

সে আমাকে দেখিয়াও দেখে নাই। আমার পানে একবার ফিরিয়া না চাহিলেও আমি তাহাকে দোষ দিতে পারি না বটে, কিন্তু তবুও এই উপেক্ষার বেদনা আমার বুকে তীরের মত বিঁধিয়াছে. আমার অজানিতে কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে—

কূণ সখী সূঁ তুম রঙ্গ রাতে—
হম সূঁ অধিক পিয়ারী !

—কোন সখীকে লইয়া তুমি রঙ্গ করিতেছ, আমার চেয়েও যাকে বেশী ভালবাস !

আমি জানি জগতের যত দুঃখ সব আমার ভাগে পড়িয়াছে, এ জনমে সুখের মুখ দেখিব, সে আশাও করি না। যাহারা তাহার সোহাগ পাইয়াছে, তাহাদের বিরহে তবুও একটা কিছু সান্ত্বনা থাকে,

কিন্তু আমার তো তাহাও নাই। তাই সেদিন সখীকে বলিয়াছিলাম—

রী আলী, মৈঁ বিরহিন্ বৈঠী জাগূঁ,
জগৎ সব সোবৈ।
বিরহিন্ বৈঠী রঙ্গমহাল মেঁ
মোতিয়ন্ কী লড় পোরে।
ইক বিরহিন হম ঐসী দেখী
অঁসুঅন্ কী মালা পোরৈ।
তারা গিণ্ গিণ্ রৈন বিহানী,
সুখ কী ঘড়ী কব আবৈ ?

—সখীরে, ঘুমের কোলে জগৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে, এক বিরহিনী আমিই জাগিয়া বসিয়া আছি। সোহাগ পাইয়াছে যে বিরহিনী, সে রঙ্গ-মহালে বসিয়া মতির মালা গাঁথে; কেবল দেখিতেছি একমাত্র বিরহিনী আমিই, যাহাকে অশ্রুজলের মালা গাঁথিতে হইতেছে! সখি, তারা গুণিতে গুণিতে যে রাত প্রভাত হইয়া গেল, আমার সুখের দিন কবে আসিবে?

বুঝি বা সে দিন আজ আসিল!—এই যে সে আমার গলিতে অসিয়াছে! একি, সে যে আমার ঘরের দিকেই আসিতেছে!—এতকাল ধরিয়া যাহার পথ চাহিয়া রাত জাগিয়া কাটাইয়াছি, আজ সে আসিতেছে; সখী, বলিয়া দাও, আমি কি করিব! আমার যে সব এলাইয়া গেল, এই সঙ্কট সময়ে লজ্জা যে হইল আমার বৈরী!

হরি হরি! মনে মনে আমি যত কিছু আঁচিয়া রাখিয়াছিলাম, সব যে আমার এলাইয়া যাইতেছে! —ভাবিয়াছিলাম,

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে,
মঙ্গল যতহু করব নিজ দেহে।
অঙ্গনে আওব যব রসিয়া,
পালটি চলব হাম ঈষত হসিয়া।
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে,
যাওব হাম, যতন পহু করবে।
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ মুড়ি বিহসি বোলব নহি তবহি।

কিন্তু জান, সেদিন আমি কি করিলাম?

আবত মোরী গলিয়ন মেঁ গিরিধারী—
মৈঁ তো ছুপ গঈ লাজ কী মারী!

—আমার গলিতে গিরিধারী আসিতেছে দেখিয়া লজ্জায় আমি ঘরের মাঝে গিয়া লুকাইলাম।

কিন্তু মুগ্ধার লজ্জা যেমন করিয়া ভাঙ্গিতে হয়, তাহা সে জানে।—

সো কি কহব ইহ সখিনি-সমাজ!
কি কহব রে সখি, কহইতে লাজ—
যোই করল সোই নাগররাজ!
জানসি তব কাহে করসি পুছারি!
না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে,
কি করব হাম তাক পরবোধে।
অলপ বয়স হাম, কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ লাজ-ডর, অতি সে করুণা!

আমার কথা আমি আর কি বলিব!—"সো ধনি, যো থির তাহে নেহারি"—তাহাকে দেখিয়া যে মেয়ে স্থির থাকিতে পারে, তাহাকে আমি বলিহারি যাই। তাহারা রসিকা, তাহারা হয়ত পারে, আমি কিন্তু সখি পারিলাম না!

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান,

কত শত কোটী কুসুমশরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ।
সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই—
তছু পায় মঝু পরণাম!
সুনয়নি কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি;
রসবতি তাক পরশে রসে ভাসত—
হামারি হৃদয়ে জলু আগি!

❀ ❀ ❀

একটী দিনের জন্য তাহাকে কাছে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আজ আমার কাছে লক্ষযুগের সমান। সে যে আমার কতখানি, তাহা সেই একদণ্ডের মিলনেই বুঝিয়াছি। আর কি তাহাকে আমি ছাড়িতে পারি, না সেই আমায় ছাড়িতে পারে?—

হমরে রৌরে লাগলি কৈসে ছূটে।
জৈসে সোনা মিলত সোহাগা,
তৈসে হম রৌরে দিল-লাগা।
জৈসে কমল-নাল বিচ পানী,
তৈসে হম রৌরে মন-মানী।
জৈসে চন্দহি মিলত চকোরা,
তৈসে হম রৌরে দিল-জোরা।

—ওতে আমাতে যে মিলন হইয়াছে, তাহা আর কি ছুটিবে? যেমন সোনার সঙ্গে মিলে সোহাগা, তেমনি ওতে আমাতে মিলিয়াছে। যেমন জলের মাঝে থাকে কমলের নাল, তেমনি ওতে আমাতে ভালবাসা। যেমনি চকোর মিলে চাঁদের সাথে, তেমনি ওর আর আমার হৃদয় জুড়িয়া গিয়াছে।

তাহাকে পাইয়া আমি যে কি আবেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছি, তাহা আর কাহাকে বলিব?

কাহারে কহিব কানুর পিরিতি,
তুমি সে বেদনী সই।
রসের ধাধসে ধস ধস হিয়া—
তেঞি সে তোমারে কই।
ও নব নাগর রসের সাগর,
আগর সকল গুণে;
সে সব পিরিতি আদর আরতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে।
পিরিতি বোলে কত না ছলে সে
কি না সে আকুতি সাধে—
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে।

এই যে দুইটী পরাণ এক হইয়া মিলিয়া গেল, তোমরা কি ভাবিয়াছ, আর কখনো ইহাদের ছাড়াইয়া লইতে পারিবে?

যো তো রঙ্গ ধত্তাঁ লগ্যো এ মায়।
পিয়া পিয়ালা অমর রস কা,
চঢ় গঈ ঘূম ঘূমায়।
যো তো অমল ম্হাঁরো কবহু ন উতরে
কোট করো ন উপায়।

—তার অনুরাগে চিত্ত যে আমার আগাগোড়া রঙিয়া গেল। আমি অমৃত-রসের পেয়ালায় চুমুক দিয়াছি, নেশা যে বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমার এ বিভ্রম কি কখনো টুটিবে—যত উপায়ই তোমরা কর না কেন!

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম?
শয়নে-স্বপনে দেখোঁ কালিয়াবরণ।
কেশ আউলাইয়া বেশ বানাইতে
হাত নাহি সরে বান্ধি।
সে কালার ভরমে কেশ কোলে করি
কালা কালা করি কান্দি!

আর জান, সে আমার জগৎ ছাইয়া গিয়াছে, তোমরা আমায় যতই বারণ কর না কেন, তাহাকে না দেখিয়া যে আমার তিলেক সোয়াস্তি নাই—

মৈঁ তো ম্হাঁরা রমৈয়াকে
দেখ্‌বো কর্‌রী !
তেরো হী উমরণ, তেরো হী সুমরণ
তেরো হী ধ্যান ধর্‌রী।
জহাঁ জহাঁ পাব্ঁ ধর্ঁ ধরণী পর
তহাঁ তহাঁ নিরত কর্‌রী।

—আমি তো আমার বন্ধুকে দেখিবই—তোমরা এখন যাহাই বল না কেন ! আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত স্মৃতি যে তাহাকেই বেড়িয়া আছে, আমি যে তাহারই ধ্যানে বিভোর। এই পৃথিবীর পরে যেখানেই চরণ থুই না কেন, সেখানেই যে তাহারই আভাস পাইয়া আনন্দে গলিয়া পড়ি।

আজ আর আমার আনন্দ ধরে না সখি, আজ তাহাকে লইয়া আমার বিশ্ববিহার।—

সখী রী, মৈঁ তো গিরধর কে রঙ্গ রাতী।
পঁচরঙ্গ মেরা চোলা রঙ্গা দে—
মৈঁ ঝুরমট খেলন জাতী।

—সখি, আমি যে গিরিধরের প্রেমে মজিয়াছি ; তোরা বিচিত্র বর্ণে আমার বসন রাঙ্গাইয়া দে, আমি বঁধুর সঙ্গে ঝুরমট* খেলিতে যাইব।

সে খেলায় কি আমি একা যাইব ? তা নয়—

চন্দা জায়গা, সুরজ জায়গা,
জায়গা ধরণ অকাসী।
পবন পানী দোনোঁ হী জায়ঁগে—
অটল রহে অবিনাসী।

—সে নৃত্যে চাঁদ যাইবে, সূর্য্য যাইবে, ধরণী, আকাশ যাইবে ; পবন-সলিল দুই-ই যাইবে। সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিবে, কেবল মধ্যে অটল হইয়া থাকিবে আমার অবিনাশী বন্ধু।

পথ তো অন্ধকার কি করিয়া যাইব, জান ?

সুরত নিয়ত কা দিব্‌লা সঁজো লে,
মনসা কী কর বাতী ;
প্রেম-হাটী তেল বনা লে—
জগা করে দিন-রাতী।

—সখি, অনুরাগ আর আনন্দের দীপদানে তোমরা আমার মনের বাতিটী জ্বালাইয়া দাও, আর প্রেমকে কর সে দীপাধারে তৈল। এ দীপ একবার জ্বালাইলে আর দিনরাতের মাঝে কখনো নিভিবে না।

মনে করিওনা, এ আমি পাগলের মত কি বলিতেছি। বন্ধুকে যাহারা বাস্তবিক পায় নাই, তাহারাই তাহাকে বাহিরে খুঁজিয়া মরে, একবার পাইলে তাহাকে আবার হারায়। কিন্তু অন্তর দিয়া তাহাকে যে পাইয়াছে, তাহার নিকট হইতে সে কখনো পলাইতে পারে কি ?

জিনকে পিয় পরদেস বসত হৈঁ,
লিখি লিখি ভেজেঁ পাতী।
মেরে পিয় মো মাহিঁ বসত হৈঁ
কহূঁ ন আতী জাতী।

—যাহাদের প্রিয় প্রবাসে থাকে, তাহারাই তাহার কাছে পাঁতি লিখিয়া পাঠায়। আমার প্রিয় সে আমার মাঝেই রহিয়াছে, সে তো কোথায়ও যায়ও না, আসেও না।

---

* হাতে হাতে ধরিয়া মণ্ডলাকারে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য।

এমন পীরিতি কভু নাহি দেখি শুনি—
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া;
আধতিল না দেখিলে যায় কি মরিয়া?
জল বিনু মীনে যেন কবহুঁ না জিয়ে;
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।
ভানু কমল বলি, সেহো হেন নয়;—
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রয়।
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা;
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা!
কুসুমে মধুপে কহি, সেহো নহে তুল;
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।

কিন্তু এই যে অনন্ত মিলন, ইহার মাঝেই আবার কি করিয়া বিরহের আগুন ধোঁয়াইয়া উঠে। যাহাকে এমনি করিয়া বুকের মাঝে পাই, তাহাকে আবার চোখে চোখে রাখিতে সাধ যায় কেন? তাই তো বলি—

পিরিতি কি রীত কোন অবগাহই,
সহজই বঙ্কিম সোই—
যো রস-ধাধসে ধস-ধস-অন্তর,
পাঁজর জর-জর হোই!

* * *

মিলনের মাঝে বসিয়াও বিরহিণী তাই ফুকারিয়া উঠিল—

প্রেমনী প্রেমনী প্রেমনী রে
মন লাগী কটারী প্রেমনী রে।
জল জমুনা মঁ। ভরবা গয়া তাঁ
হতী গাগর মাথে হেমনী রে।
কাঁচে তে তাঁতনে হরিজী যে বাঁধী
জেমে খেচে তেমনী রে।

—কি আর বলিব, তার প্রেমের কাটারী আমার বুকে বিঁধিয়াছে। যমুনায় গিয়াছিলাম জল আনিতে মাথায় ছিল সোণার গাগরী; আমাকে দেখিয়া সে যে প্রেমের ডুরী দিয়া বাঁধিল, তারপর হইতে যেদিকে আমায় টানিতেছে, সেই দিকেই যাইতেছি।

এখন—

মুঞি যদি বলোঁ, পাসরোঁ কান;—
মনে সে না লয় আন!
তিল আধ তার মুখ না হেরিলে
নিঝরে ঝরে নয়ান।
মানের নামে সে পরাণ উছলে—
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহোঁ কানুর বচন,
কাণে সে মুরলী বাজে।
যদি চলিতে না চাহোঁ কানাইর পাশে—
চরণে থির না বান্ধে—
এমতি করিয়া কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে!

(ক্রমশঃ)

সত্যভাবনা

—(:॰)—

একটা প্রচণ্ড জেদের বশে কি এই জীবনটাকে চালানো যায় না? খুব যায়; আর সেই চলাটাই সত্য। সাত্ত্বিকতার ভাণ করো না—বলো না যে ধীরে-সুস্থে চারদিক ভেবে-চিন্তে চল্‌ছি। কে জানে তোমার ওই পরমসাত্ত্বিক ভাবনাগুলো তামসিক ভাবেরই মুখোস কি না? বুকজোড়া একটা আবেগ, দেহের অণুতে-পরমাণুতে একটা দুর্নিবার স্পন্দন—এই চাই। ওই তোমার নিজস্ব অনুভূতি। বাইরে শান্ত থাক, স্থির থাক—আপত্তি নাই। কিন্তু ভিতরটা যেন কাঁপ্‌তে থাকে—প্রভাতের সৌররশ্মির স্পর্শে চমকে উঠে নিথর আকাশটা যেমন করে কাঁপে।

বোবা হয়ে থাক লোকের কাছে, কিন্তু মহতী কল্পনাকে কখনো বর্জ্জন করো না। লোকে নাই বা জান্‌ল, নাই বা মান্‌ল—তুমি জান্‌ছ, তুমি শাহান্‌শাহ। রাজতক্তে গরীয়ান্ হয়ে আছ—কেউ যে জান্‌ছে না, সেই তো আরো মজা। তুমি যে রাজার রাজা, তার কি যাচাই হবে ওই মুষ্টিভিক্ষার ভিখারীদের কাছে? বাইরের আড়ম্বর চুলোয় যাক্—প্রতিদিনের খুঁটিনাটিতে ফুটে উঠুক তোমার রাজ্যেশ্বরের মহিমা! "কোথায়ও বাধা নাই, বন্ধন নাই, কোনও কামনার সঙ্কোচ নাই। যে যা কামনা করে এসে হাত পাতছে, ভাণ্ড উজাড় করে তাকে তাই দিচ্ছি, কিন্তু আমি তো যাচ্ছি না কারু কাছে হাত পাততে। এ আমার অভিমান নয়—আমার অনুকম্পা! সব ছেড়েছি বলেই সব পেয়েছি, তাই ভিখারী-রাজার মণিমুক্তার ভেটও মনে হয়—এক মুঠো ছাই!" এই তোমার স্বরূপ-কথা।

স্তব্ধ তুমি—অটল তুমি; পাহাড়ের ওপর সমুদ্র আছড়ে পড়্‌ছে, পাহাড় টল্‌ছে না; বজ্রের হুঙ্কারে পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে, কিন্তু আকাশ নির্ব্বিকার। এই হচ্ছে পরম সত্য। অটল থাকতে পার্‌ছি না বল্‌লে চল্‌বে না। একচোখা হবে কেন? সত্যের পূজারী যে, তার সবার প্রতি সমান দৃষ্টি। আকাশটাও তুমি, বজ্রগর্জ্জনটাও তুমি। একটার সঙ্গে যদি নিজকে জড়িয়ে ফেল্‌তে পার তো আর একটার সঙ্গেও পার্‌বে। চেষ্টার শৈথিল্য আছে বলেই মনে হচ্ছে পার্‌ছি না। নইলে অভ্যাসে সব হয়। টলমল করাটা স্বভাব মনে কর্‌ছ কেন? ওটাও যে অভ্যাসের ফল। চঞ্চলতা যদি স্বভাব হয়, তো স্থৈর্য্যও স্বভাব; স্থৈর্য্য যদি আগন্তুক হয় তো চঞ্চলতাও আগন্তুক। তুমি দুয়ের অতীত। অপক্ষপাতে দুয়ের সেবা কর—যখন যেটার প্রয়োজন। তোমার প্রয়োজন নয়, পারিপার্শ্বিকের গরজ। তুমি আপ্তকাম; তোমার শিবস্বরূপের প্রতিবিম্ব যারা, তাদের কামনার প্রতিভাসকেই নিজের ইচ্ছার জঞ্জাল ভেবে ভুল বুঝো না!

"কল্পনায় কত কিছু এঁকে রেখেছি, কিছুই কি ফুট্‌বে না?"—আলবৎ ফুট্‌বে। হাল ছেড়ে যে বসে থাকে, তারই কিছু ফোটে না। বিভীষিকাগুলোকে যে তোয়াজ করে পুষ্‌ছে, যখন-তখন আঁৎকে ওঠে সেই। কেবলই বিপরীত কল্পনা—এই দেহকে জড়িয়ে, এই মনকে জড়িয়ে, এই প্রবৃত্তিকে জড়িয়ে। আছে ওরা, তা থাক্ না! ওদের বাইরেও তো কেউ আছে? তাঁকে এনে সামনে ধর। আলোটা পেছনে রেখেছ, তাই ছায়াটা সামনে পড়্‌ছে; ওটাকে সাম্‌নে ধর, সামনার সব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ছায়াটা পড়ে থাক্‌বে পেছনে। এই দেহ-মন-প্রাণেই যে সত্যের শিখা জ্বলে উঠবে, সুন্দরের আরতি হবে। হোক্ না তোমার পাত্র ফুটো,

মহাসমুদ্রের মাঝে তাকে তলিয়ে দিয়েছ, সব ছিদ্র তার রসে পূর্ণ হয়ে থাক্‌বে। এখান হতে ওখানে সরাতে গেলেই ভয়, যদি বা সব ঝরে পড়ে! সব ঠাই যা পূর্ণ করে আছে, তার মাঝে স্বচ্ছন্দবিহারেই বা ভয় কিসের? জলের নীচে কলসী উপুড় কর্‌লেই কি তা শূন্য হয়?

বারবার পড়েছ, ঠকেছ, আশার ছলনায় ভুলেছ—মানি, সব সত্য কথা। কিন্তু তার জন্য দুঃখ কি? দেহের দিকে তাকিও না, তাকাও অফুরন্ত যৌবনপ্রমত্ত প্রাণের দিকে! অদীন প্রাণের ভাণ্ডারী তুমি—এইটুকু জীবনের মর্ম্মান্তিক সত্য। দেহের যৌবনে আজ প্রাণ ফুটেছে—এ কথা মিথ্যা; প্রাণের আরতিতে আজ দেহে যৌবন দেখা দিয়েছে। দেহ আস্‌বে, যাবে—কিন্তু যৌবন স্থির থাক্‌বে—এই বিশ্বাসে নিজকে মহীয়ান্ করে রাখ। প্রাণকে বিজয়ী কর সঙ্কল্পকে অটুট কর। তোমার অবিচলিত নিষ্ঠার বজ্রস্ফুরণকে স্তম্ভিত কর্‌বে কে? কে সে মায়াবিনী—তোমার তপোহন্ত্রী, ছলনাময়ী অপ্সরা? ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে তার অসত্য উলঙ্গ হয়ে পড়বে—প্রকাশের লজ্জায় ধূলায় লুটিয়ে পড়বে সে!

ভাব তুমি সত্যস্বরূপ—পার্থসারথিরই দোসর তুমি? ভয় হয় এই কথাতে? ব্যবসাদারী যাচাইয়ের প্রবৃত্তি আসে? ভুলে যাও ও সব ছোট ছোট জঞ্জাল! নিজকে বড় ভাবতে, মহৎকল্পনায় চিত্তকে প্রাণের বিদ্যুতে পরিপূর্ণ রাখতে ভয় পেও না। "অভীরভীঃ"—ভয়ই সমস্ত পাপের মূল। তুমি শিব—তুমি সত্য—তুমি সুন্দর! বাক্য দিয়ে নয়, মন দিয়ে নয়, স্তব্ধ হয়ে, দীপ্ত হয়ে আত্মার দিব্যমহিমা দিয়ে এই সত্য অনুভব কর!

ভেবো না তুমি হীন, তুমি অসমর্থ। কাজে শ্রান্তি আসছে, দুর্ব্বল হয়ে পড়ছ? বিশ্রাম পাবে কোথায়? বল পাবে কোথায়? সে তো তোমারই মাঝে। এই বেদান্ত দিয়ে নিজকে সঞ্জীবিত করে তোল—সব অবসাদ, অপমান, কলঙ্ক মুছে যাবে।

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

টেহরীতে আস্‌বার আরও কয়েকটা রাস্তা আছে। টেহরী-দেবপ্রয়াগের পর্ব্বতের শীর্ষদেশ দিয়ে একটি রাস্তা খাড়া চড়াই উত্তরদিকে গিয়েছে। এই রাস্তায় আস্‌তে অলকানন্দা গঙ্গা ডানহাতে থাকে। এ রাস্তাটিও ৩২।৩৩ মাইল। পথে চটী খুব কম। অত্যধিক চড়াইয়ের জন্য অতি দুর্গম। অধিকন্তু জলের অভাব খুবই বেশী। আমরা যে রাস্তায় এসেছি, সে রাস্তায় বাঘের ভয় বলে অনেকে ওই রাস্তা ধরেই টেহরী যায়।

তৃতীয় রাস্তাটী এই। **হরিদ্বার** হতে **হৃষী-কেশ** হয়ে **"মৌনী-কী-রেতী"**—১৫॥ মাইল। মৌনী-কী-রেতীতে নানা রকম কাঠের বাসন তৈরী হয়। সেখান হতে একটি রাস্তা বাঁ দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তায় যেতে যেতে পাহাড়ের শীর্ষদেশে হংসডিম্ব-বৎ সুন্দর একটি শ্বেতবর্ণের নগর দেখা যায়, তার নাম **নরেন্দ্রনগর।** মৌনী-কী-রেতী হতে নরেন্দ্রনগর ৫ মাইল চড়াই। টেহরীরাজ গ্রীষ্মাবাসের জন্য এটী প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে নরেন্দ্র-

নগর ৮০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে টেহরী-গবর্ণমেণ্টের ৭০০ গুর্খা সৈন্য ঘাটি আগলিয়ে আছে। নরেন্দ্রনগর হতে ১০ মাইল দূরে **ফকোট** চটী। ফকোট হতে ১০ মাইল **নাগনী** চটী। নাগনী হতে ৪ মাইল **চম্বা** চটী। চম্বা হতে ১১ মাইল **টেহরী**। হরিদ্বার হতে হৃষীকেশ—নরেন্দ্রনগর দিয়ে টেহরী ৫৫॥ মাইল। হরিদ্বার হতে হৃষীকেশ—দেবপ্রয়াগ দিয়ে টেহরী ৯১ মাইল। নরেন্দ্রনগরের রাস্তায় যাত্রী চলে না। পাহাড়ীদের জন্য পাকদণ্ডী রাস্তা আছে। যাঁরা নরেন্দ্রনগর হয়ে টেহরী যেতে চান, তাঁরা ব্যাসতীর্থ, দেবপ্রয়াগ দেখ্‌তে পাবেন না।

চতুর্থ রাস্তা—দেবপ্রয়াগ হতে কেদারবদরীর পথে অলকানন্দা বাঁ হাতে রেখে যে রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তায় দেবপ্রয়াগ হতে ২০ মাইল দূরে শ্রীনগর সহর। এ কিন্তু কাশ্মীররাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর নয়। শ্রীনগর হতে টেহরী ৩০ মাইল। এ পথে জলকষ্ট কম। শ্রীনগর হতে টেহরী প্রায় কোন যাত্রীই যায় না। এ পথে যাত্রীদের যাওয়ার কোনই দরকার করে না। রাস্তা মন্দ নয়; চড়াই-উৎরাই বেশ আছে, চটীও কম।

পঞ্চম রাস্তা—হরিদ্বার হতে ৪৮ মাইল দূরে রেলের শেষ ষ্টেশন **দেরাদূন**। ভাড়া হরিদ্বার হতে ৸৶০ আনা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে হরিদ্বার ১৯০০ ফুট উচ্চে ও দেরাদুন ২২০৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে দেরাদুনে গরম অত্যন্ত বেশী। দেরাদুন ইংরেজ সেনাবিভাগের একটি পার্ব্বত্য ছাউনী এবং প্রসিদ্ধ সহর। এখানে স্কুল, কলেজ, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, হাঁসপাতাল প্রভৃতি সবই আছে। দেরাদুনের বিস্তৃত বিবরণ মাসিকপত্রের কৃপায় বাঙ্গালী ভ্রাতাদের অজ্ঞাত নাই, সুতরাং আমি আর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ

দেরাদুন
৪৮ মাইল

পুনরাবৃত্তি কর্‌তে চাই না; তবে বিশেষ যা দ্রষ্টব্য, তা জানাচ্ছি। এখানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সকলরকম দপ্তর আছে। অনেক সাহেব ও বড়লোক গ্রীষ্মাবাসের জন্য এখানে বাড়ী করেছেন। আজকাল আবার মুসুরী সহর হওয়াতে দেরাদুন কিছু শ্রীহীন হলেও পূর্ব্বগৌরব একেবারে হারায়নি। এখানে মোহন্তমহারাজ লছমন দাসজীর প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড দেবালয় ও তৎসংলগ্ন বৃহৎ ধর্মশালা আছে। মোহন্তমহারাজের অতিথি-সৎকার প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ সাধুসেবার তো কথাই নাই। নানকপন্থী উদাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শিখগুরু রামরায় দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দেরাদুন সহর প্রথম স্থাপিত হয়। সেইজন্য এটী নানকপন্থী সাধুদের একটি প্রধান তীর্থস্থানরূপে পরিচিত। পঞ্চম দোলের সময় বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। রাস্তাঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সহরে জলাভাব। হিমাচলের পথে যাত্রীদের যানবাহন কিম্বা আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সমস্তই এখান হতে কিনে নিতে হয়। দেরাদুন উত্তরাখণ্ড বা কেদারখণ্ডের অন্তর্গত বলে সাধুসমাজে গণ্য হয়ে থাকে। স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে উক্ত আছে, এখানে পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীরামচন্দ্রদেব কিছুকাল বাস করেছিলেন।

দেরাদুন হতে রাস্তায় সামান্য সামান্য চড়াই করে ৭ মাইল দূরে **রাজপুর** চটী। রাজপুরও একটি ছোটখাট সহর, সকলরকম খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই প্রভৃতির দোকান আছে। হিমালয়যাত্রীদের যানবাহনাদি এখান হতেও নেওয়া চলে।

রাজপুর
৭ মাইল

রাজপুর হতে খাড়া চড়াই করে ২॥ মাইল অতিক্রম করলে **ঝড়ীপানা** চটী। নিকটে জলের ঝরণা আছে।

ঝড়ীপানা চটী
২॥ মাইল

ঝড়ীপানা হতে খাড়া চড়াই করে ৫॥ মাইল চলার

পর সুপ্রসিদ্ধ গ্রীষ্মাবাস **মুসুরী**। মুসুরীর রাস্তা পূর্ব্বে খুবই খারাপ ছিল। আজকাল মুসুরী গ্রীষ্মাবাস হওয়ায় রাস্তা বেশ ভাল হয়েছে। অধিকন্তু মটর, টম্‌টম্‌, রিক্স, গরুর গাড়ী প্রভৃতির প্রচলন হওয়ায় অধিকাংশ লোকই মুসুরী পর্য্যন্ত ওইসব যানেই এসে থাকেন। যাঁরা উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ কর্‌তে যান, তাঁরা জিনিষপত্র এখান হতে সংগ্রহ করে থাকেন। এ পথে মুসুরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর; বড় বড় দোকানে সবরকম জিনিষই পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সহরটী ৬৭০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; কলের জল, ইলেক্‌ট্রীক্‌ লাইট্‌, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন্‌, হাঁসপাতাল, পোষ্টাফিস্‌ প্রভৃতি আধুনিকতার সমস্ত উপকরণই বর্ত্তমান। এ ছাড়া সাহেবী হোটেল, হিন্দু হোটেল ও ধর্ম্মশালারও অভাব নাই। কিন্তু এখানেও জলকষ্ট বেশ!

মুসুরী
৫॥ মাইল

মুসুরীর একাংশের নাম ল্যাণ্ডোর বাজার—সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৭৪৬০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই বাজারেই সকলরকম জিনিষ খরিদ-বিক্রী হয়ে থাকে। একে মুসুরীর বড়বাজারও বলা চলে। এখানেও পরিচ্ছন্ন হিন্দু হোটেল ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি আছে। পাহাড়ের গায়ের রাস্তায় মোটরকার, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি চল্‌বার বেশ বন্দোবস্ত আছে। অভ্যাগত সাধু-সন্ন্যাসীদের থাক্‌বার জন্য শিবালয় এবং তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালাও আছে। কখন কখন সদাব্রতও পাওয়া যায়। হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গের দৃশ্য এখান হতে ভারী চমৎকার দেখায়।

মুসুরী পূর্ব্বে টেহরীরাজের ছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট টেহরীরাজের নিকট হতে জায়গাটী বন্দোবস্ত নিয়ে সুন্দর সহরে পরিণত করেছেন। অনেক সাহেব-সুবা, বড়লোক এখানে গ্রীষ্মবাস কর্‌তে আসেন। মুসুরী পাহাড়ে সহর স্থাপিত হবার পর দেরাদুন হতে অনেক অফিসাদি এখানে তুলে আনা হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত বাড়ীগুলির দৃশ্য অতি মনোরম।

মুসুরী হতে ল্যাণ্ডোর বাজারের ভিতর দিয়ে একটি কঠিন চড়াই পার হয়ে সমতলভূমিতে অনেকখানি চলার পর **জব্বরক্ষেত** নামে একটি ছোট চটী পাওয়া যায়। মুসুরী হতে এ চটী দু মাইল। চটী হতে তিন মাইল দূরে দেরাদুনের মোহন্ত লছমন দাস মহারাজের জব্বরক্ষেত নামে একটি প্রকাণ্ড বাগান আছে। এই বাগানের ভিতর বা আশেপাশে কোন জীবজন্তু শিকার করা নিষিদ্ধ। এখানে থাকার বিশেষ কোন সুবিধা নাই, তবে স্থানটী বেশ মনোরম।

জব্বরক্ষেত
২॥ মাইল

জব্বরক্ষেত হতে তিন মাইল দূরে **ঝালকী** চটী। রাস্তা সিধা। এখানেও দেরাদুনের মোহন্ত লছমন দাসজী মহারাজের একটী ধর্ম্মশালা ও ৩।৪টী খাবারের দোকান আছে। দুধও পাওয়া যায়। এখানে জলকষ্ট খুব বেশী—প্রায় এক মাইল দূর হতে জল আন্‌তে হয়। এক টিন জলের দাম এক আনা। ঝালকী হতে এক মাইল দূরে একটী পাকদণ্ডী রাস্তা ধরাসুতে গিয়ে মিশেছে। এ পথে খুব বেশী চড়াই-উৎরাই, চল্‌তে কষ্ট হয়। এখানে ধর্ম্মশালায় সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থাও আছে।

ঝালকী
৩ মাইল

১১ মাইল দূরে **ধনোলটী** চটী। রাস্তা অনেকটা সিধা; চড়াই-উৎরাই সামান্য। এখানে রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। এখান হতে বহুদূরে চিরতুষারাবৃত ধবলগিরির অপূর্ব্ব শোভা দর্শকের নয়নমন প্রফুল্ল করে। বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা, টেহরীরাজের ডাকবাংলা, পুলিশ ষ্টেশন ও ৩।৪খানা খাবারের দোকান আছে। দুধ অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়, কিন্তু জলকষ্ট খুব। রাজপুর হতেও এ পর্য্যন্ত একটী পাকদণ্ডী রাস্তা আছে, দূরত্ব ১৮

ধনোলটী
১১ মাইল

মাইল মাত্র ; এ পথে ২৪ মাইল। উক্ত পাকদণ্ডী পথে চড়াই-উৎরাই বেশী, চটির সংখ্যাও কম : চটীর বন্দোবস্তও ভাল নয়। ঝালকী হতে তিন মাইল আসার পর একটি পাকদণ্ডী পাওয়া যায়, সে রাস্তাটীও টেহরী পর্য্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু সে পথে পাহাড়ীরাই চল্‌তে পারে।

ধনোলটী হতে ১০ মাইল দূরে **কানাতাল** চটী। হৃষীকেশ হতে দেবপ্রয়াগের পথে যে বিজলীর বড় চড়াই পড়ে, এই ধনোলটী-কানাতাল সেই চড়াইয়ের অন্তর্গত। এর পর ক্রমে উৎরাই করে আবার প্রায় সমতল ভূমিতে নামতে হবে। এইটী হিমালয়ের প্রথম স্তর, গড়ে প্রায় ৬।৭ হাজার ফুট উঁচু।

কানাতাল—১০ মাইল

কানাতাল হতে একটা রাস্তা টেহরী পর্য্যন্ত গিয়েছে। এখানে প্রচুর গোল আলুর চাষ হয়; অনেক জায়গায় "আলুকা শাক"ই রুটীর সঙ্গে একমাত্র উপকরণ। এখানে বাবা কালী-কম্বলীবালার একটী দোতালা ও একতালা ধর্ম্মশালা আছে। খাবারের এবং কাপড়ের দোকান আছে। জলের ঝরণাও একটী আছে। রাত্রে শীত খুব বেশী। এখানে চোরের উপদ্রবও খুব। পাহাড়ীরা চোর না হলেও তাদের বেশে চোরে অভাব নাই। আজকাল আবার সভ্য-জগতের সংশ্রবে এসে অনেক পাহাড়ীই এ বিদ্যাটিতেও বেশ পরিপক্ক হচ্ছে। যাঁদের সামর্থ্যে কুলায়, তাঁরা একটি ছোট তাঁবু মুসুরী হতে ভাড়া করে সঙ্গে রাখলে অনেক সুবিধা হয়, অধিকন্তু চোরের হাত হতেও অনেকটা নিস্তার পাওয়া যায়।

কানাতাল হতে ২ মাইল গেলে পর দু'টী রাস্তা পাওয়া যায়। এই অংশটীর নাম **গরুগার** বা **নৈরধার** চটী। এখান হতে ডানদিকের রাস্তা ধরে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করলে গাড়োয়ালরাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী **টেহরী** সহর। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে ৭ মাইল উৎরাই করলে **ভলডিয়ানা** জংশন। যাঁরা টেহরীর পথে গঙ্গোত্তরী-যমুনোত্তরী যান, তাঁরা টিহরী হতে ১১।০ মাইল এসে এই ভলডিয়ানা জংশনে পৌঁছেন। ভলডিয়ানার এক মাইল উপরে মুসুরীর রাস্তার সঙ্গে টিহরীর রাস্তার সংযোগ হয়েছে। বাস্তবিক জংশন এইখানেই। তবে ভলডিয়ানা চটী বলে, সেইটিই জংশন বলা হয়। যথাসময়ে পথিকদের এ জংশনের খবর জানাব। এখানে শুধু দেরাদুন হতে মুসুরী হয়ে টেহরী আস্‌বার ও গঙ্গোত্তরী-যমুনোত্তরী যাবার রাস্তার বিবরণ দিলাম।

গরুগার বা নৈরধার ২ মাইল

হরিদ্বার হতে **টেহরী** ১০৩ মাইল, **যমুনোত্তরী** ১৬১, **গঙ্গোত্রী** ১৮৭, **গোমুখী** ২০৫।

হরিদ্বার হতে **দেহরাদুন্ ৪৮** মাইল, রাজপুর ৫৫, ঝড়ীপানা ৫৭॥, **মুসুরী ৬৩**, জব্বর ক্ষেত ৬৫, ঝালকী ৬৮, ধনোলটী ৭৯, কানাতাল ৮৯, গড়ুগাড়-জংশন ৯১, **টেহরী** ১০৩, ভলডিয়ানা (গড়ুগাড় হতে দ্বিতীয় রাস্তা) ৯৮, ছাম ১০৩, দোলী ১০৬, নগুন **২০৮**, **ধরাসু**-জংশন (এখান থেকে একটী পথ গঙ্গোত্তরী, আর একটী যমুনোত্তরী গিয়েছে) ১১৩, কল্যাণী ১১৭, গেইলা বা ব্রহ্মচটী ১২২, ছিলকালা ১২৭, ভাণ্ডাল ১৩৪॥, **সিমলী জংশন ১৩৫**॥ (এখান হতে গঙ্গোত্তরী যেতে হলে একটী বড় পাহাড় অতিক্রম করে নাকুরী-চটীতে গিয়ে গঙ্গোত্তরীর পথ ধরতে হয়) গঙ্গানী ১৩৮, কোৎনোর বা জগন্নাথ চটী ১৪৩, যমুনা-চটী ১৪৪॥, বর্জী বা ওজরী ১৪৬॥, রাণাগাওঁ ১৫১, হনুমান-চটী ১৫৩, খড়শালী ১৫৭, **যমুনোত্রী** ১৬১।

হরিদ্বার হতে **ধরাসু-জংশন** ১১৩ মাইল, ডুণ্ডা ১২২, **নাকুরীজংশন** (যমুনোত্রী হতে ফির্‌বার সময় সিমলী-চটী হতে এই

চটীতে আসতে হয়) ১২৫, **উত্তরকাশী** ১৩১, গঙ্গোরী ১৩৪, নেটালী ১৩৭, মনেরী ১৪১, কুলরী ১৪৫, মালা ১৪৭, **ভটবারী-জংশন** (এই চটী হতে ত্রিযুগীনাথ যাবার পাকদণ্ডী রাস্তা) ১৪৯, **ভুকিকা-পুল** ১৫৫, গঙ্গানাশী ১৫৮, লুহারীনাগ ১৬০॥, **সুখী** ১৬৬, ঝালা ১৬৮॥, হরশিল ১৭০, ধরালী ১৭৪, **জঙ্গলী-জংশন** (এখান হতে একটী রাস্তা নিলং মঠ হয়ে কৈলাসে গিয়েছে, রাস্তায় চটি নাই) ১৭৮, ভৈরবঘাটী ১৮১, **গঙ্গোত্তরী** ১৮৭, **গোমুখী** ২০৫।

* * *

[**টিহরী** হতে সোনারগাঁও ২, কুমারী-চটী ৩, গোদীসরাই ৬, **ভলডিয়ানা** জংশন ১১ মাইল।]

পূর্ব্বেই সঙ্গীদের রওনা করে দিয়েছিলাম। তাঁরা ৩ মাইল পথ চল্‌বার পর বৃষ্টির দরুণ কুমার-চটীতে আশ্রয় নেন। আমি ৬ টার সময় বের হয়ে ২ মাইল দূরে যেয়ে একটী চটী পেলাম। মাত্র একজন দোকানদার সামান্য একখানা দোকান করে আছে। নিকটেই গ্রাম। এখানে কোন চটী না থাকলেও ক্ষতি নাই, এদিকে টিহরী সহর, অন্যদিকে এক মাইল দূরে কুমারচটী। সোনারগাঁও না থেমে আরও এক মাইল যেয়ে একেবারে **কুমার**চটীতে পৌছলাম। এখানে মাত্র এক জন দোকানদার। ৩।৪ শত গজ দূরে ঝরণার জল নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এ চটীতে লোক বেশী না হওয়ায় জন্য থাক্‌তে কোনই অসুবিধা হয়নি। আজ টিহরী হতে মাত্র ৩ মাইল আসা হল।

সোনারগাঁও ২ মাইল

কুমার-চটী ১ মাইল

এ পথে বিছার কামড়ের ভয় অত্যন্ত বেশী। এখানকার দোকানদারটী বিছার কামড়ের মন্ত্র জানে, তাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও কিন্তু মন্ত্রটী আদায় করতে পার্‌লাম না। রাজপুতানা ভ্রমণের সময় একটা প্রতিষেধক জান্‌তে পেরেছি। পাঠকদের কেউ ইচ্ছা কর্‌লে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। উপায়টী এই—যখন আমগাছে নূতন বোল হয়, তখন যবে প্রথম ফুটেছে এমন কতকগুলি বোল নিয়ে চট্‌কিয়ে তার রসে দু'হাতের তালু ও ওপরের কতদূর ভাল করে মেখে শুকিয়ে নিতে হয়। জল দিয়ে চট্‌কাতে নাই। ঘণ্টা তিনেক কি আরও দেরীতে হাত ধুয়ে ফেল্‌তে পারেন। তিন ঘণ্টার পূর্ব্বে হাতে জল লাগান নিষেধ। পরে কাউকে বিছায় কামড়ালে যে স্থান পর্য্যন্ত বিষ উঠেছে, সেই জায়গা হতে দুহাত দিয়ে ধীরে ধীরে নীচের দিকে হাত চালিয়ে 'পাস্' দেবেন। এই ভাবে ২১ বার ঝেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ নেমে যাবে। ঝাড়ার সময় খুব ধীরে ধীরে শরীর প্রায় ছুঁয়ে হাত চালাতে হয় কিন্তু শরীরে হাত ঠেকাতে নাই। প্রতিষেধকের শক্তি হাতে মাত্র এক বৎসর থাকে। পুনরায় নূতন বৎসরে আমের বোল দিয়ে হাত ঠিক করে রাখ্‌তে হয়।

বৃশ্চিক দংশনের ঔষধ

(ক্রমশঃ)

মনের অন্দর

মানুষ ঘুমায়, আবার জেগে উঠে। মনটাও তেমনি কখনো ঘুমিয়ে পড়ে, আবার ধড়মড় করে জেগে উঠে। ওর প্রতি সদাসর্ব্বদা নজর রাখতে হয়। ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে, মা জেগে থাকেন; ঘুম ভেঙ্গে ছেলে একবার কেঁদে উঠলেই ছুটে যান, কি জাগবার আগে থেকেই কাণ খাড়া করে প্রতীক্ষায় থাকেন, কি জানি কখন কেঁদে ওঠে। তেমনি এই চঞ্চল মনের ওপর একটা স্থিরমনের প্রহরী রাখতে হয়। সে প্রহরী আছেই—সদা জাগ্রৎ হয়েই আছে। একটুখানি অন্তর্ম্মুখী হলে তার দেখা পাওয়া যায়। তার কাজ সে করছেই, তবে একবার তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ঝোপ বুঝে কোপ দিতে হয়। চিত্ত যখন জেগে উঠেছে, তখনই চাই সাধনার ব্যাকুলতা। যখন মনটা উড়ুউড়ু করে কেবল, তখন থেকেই হুঁসিয়ার হতে হয়, বুঝতে হয়, পাখী এইবার নেমে বসবে; আগে থেকে তাই ফাঁদ ঠিক করে রাখতে হয়। দুটো কথাই ঠিক—স্থির মন চঞ্চল হয়ে উঠবেই এবং চঞ্চল মন স্থির হয়ে যাবেই। কাজেই চঞ্চলতার সময় স্থৈর্য্যের প্রত্যাশায় উৎফুল্ল থাকতে হবে, মুসড়ে পড়লে চলবে না; আবার স্থৈর্য্যের সময় চঞ্চলতার আশঙ্কায় হুঁসিয়ার থাকতে হবে, নিশ্চিন্ত হলেও চলবে না। চিল যেমন সোজা ওপরে উঠে যেতে পারে না, চক্র দিতে দিতে ওঠে, মনও তেমনি; সাঁ করে ওপরে উঠে যাওয়া সহজে হয় না। তাই তার চলা-ফেরার আইন বুঝে তাকে চালাতে হবে, কোনও অবস্থাতেই ব্যস্ত-বাগীশ হলে চলবে না। এই যে দোলায়মান চিত্তকে একজন চালাচ্ছে, তাকেই বলছি সাক্ষী মন, এর সঙ্গে আত্মীয়তা যত ঘনিষ্ট হয়।

দেহের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠতা খুবই বেশী। কতকগুলি দৈহিক সদভ্যাস থাকা চাই। এই-গুলোকেই বলে আচার। অনেক সময় তাদের যুক্তিটা স্পষ্ট ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু তাদের পরোক্ষ ফল একটা আছে। মন কিছুতেই বসছে না, কোনও কাজেই গা হচ্ছে না, এমন অবস্থায় যন্ত্রবৎ কতকগুলি আচার পালন করে যাওয়ার অন্ততঃ একটা negative ফল আছে—চিত্তে তাতে নূতন কোনও ভাব না জাগুক, আরও অধঃপতন হতে চিত্তকে তা বাঁচিয়ে রাখে। যখন মন কোনও কর্ম্মই পাচ্ছিল না, তার সৃষ্টিশক্তি যখন একেবারে স্তিমিত, তখনও তাকে কাজ জুটিয়ে দিয়ে তাকে সায়েস্তা রাখে এই আচারগুলোতে।

আচার ছাড়াও দেহকে খাটিয়ে লাভ আছে। দেহ আর মন দুটোই খাটছে সর্ব্বদা। কিন্তু তাদের আধিপত্যের একটা পালা আছে। মনটা যখন উত্তেজিত, মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্রিয়াশীল, তখন অনেক সময় দেহটা কর্ম্মবিমুখ থাকতে পারে। দেহের অত্যধিক খাটুনীতে মস্তিষ্কে চিন্তার উন্নত কেন্দ্রগুলো খোলে না। হাড়ভাঙ্গা দৈহিক খাটুনীতেও চিত্তকে মোটের ওপর সরস রাখা যায় বটে, কিন্তু নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্ফুরণ সে অবস্থায় আশা করা বৃথা। মস্তিষ্ককে পূর্ণ সক্রিয় করতে হলে দেহকে লঘু অথচ আয়াসশূন্য করতে হবে। কিন্তু শুধু মনের ক্রিয়াশীলতার ওপর নির্ভর করে থাকলেই চলে না। মনও বিশ্রাম চায়, খেটে খেটে সে-ও বলে আর পারি না, তখন তাকে হাজার চাবুক মারলেও নড়বে না। এই অবস্থায় দরকার হয় দেহের ইঞ্জিনটাকে চালিয়ে দেওয়া। মন যখন সূক্ষ্ম চিন্তায় অপারগ, তখন দেহটাকে স্থূল কাজে লাগিয়ে দাও, দেখবে, দেহের কসরতের

সঙ্গে সঙ্গে মনও আবার তার লুপ্ত শক্তি ফিরে পাচ্ছে, মস্তিষ্কের চিন্তা-কেন্দ্রগুলো সচল হচ্ছে। বিদ্যুতের কারখানায় দুটো করে ডাইনামো থাকে; একটা শ্রান্ত হয়ে পড়লে আর একটাকে চালাতে হয়। পর্য্যায় ক্রমে দুটো খাটুলে পর আর current-এর অভাব হয় না। আমাদেরও দেহ আর মন—দুটো ডাইনামো। দুটোকেই তৈরী রাখতে হবে। খাটুতে খাটুতে দেহ যখন শ্রান্ত হয়ে পড়বে, তখন বিশ্রামের ফাঁকে একটু স্থির হয়ে মনের ডাইনামাটা চালিয়ে দাও, দেখ্‌বে ব্রহ্মচিন্তা অনায়াস হয়ে আস্‌ছে। আবার মন যখন নিস্তেজ হয়ে পড়বে, তখন যে কোনও একটা দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজে নিজকে নিযুক্ত কর, দেখবে, আবার মন চাঙ্গা হয়ে উঠছে। মোট কথা দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়লে মনকে খাটাবে, মন শ্রান্ত হয়ে পড়লে দেহকে খাটাবে, তাহলেই ঠিক balance থাকাব, সোয়াস্তি পাবে। এইটা হল সঙ্কেত। তবে এর দরুণও অভ্যাস চাই, কুঁড়েমিটী বর্জ্জন করা চাই—এখন সে দেহের কুঁড়েমিই হোক, আর মনের কুঁড়েমিই হোক।

আর খুব কড়াকড় হিসাব চাই। প্রত্যেক দিনের কথার, কাজের, চিন্তার তন্ন তন্ন হিসাব দিতে হবে। এই হল আত্মচিন্তার একটা দিক। একটা অতি মনোরম লক্ষ্যের ভাবনা, উদার প্রশান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় আত্মস্বরূপের ভাবনা—এতো চাইই। কিন্তু দিনশেষে যদি খোঁজ করে দেখি ভাবনায় মন বসেনি, তাহলে কি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছুটী নেব? না তখন অ-ভাবের কারণটা খুঁজতে হবে? যেদিন ব্রহ্মচিন্তায় বাজে চিন্তা আসবে, সেদিন ওই নিয়েই ঘাঁটতে হবে, ওর "কেন, কি বৃত্তান্ত" সব খুঁজে বার করতে হবে। কারু অসুখ হলে আত্মীয়-স্বজনেরা উতলা হয়ে পড়ে, কিন্তু চিকিৎসককে স্থির থাকতে হয়, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" এই ভেবে তাকে শেষ পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। মনের চিকিৎসাতেও তাই। হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না, হাল ছেড়ে দিলে হবে না; ওতো তোমারই মন, তুমিই ওর নাড়ীনক্ষত্রের খবর জান তো। রোগীও তুমি, চিকিৎসকও তুমি, রোগের ঔষধও তুমিই। বাইরে থেকে কেউ কিছু করে দিতে পারে না, যদি না তুমি অনুকূল হও। আলোতে ডুবে রয়েছ, কিন্তু ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে আছ বলে তা বুঝতে পারছ না। বন্ধ জানালার ওপর এসে আলো পড়ছে, কিন্তু পথ পাচ্ছে না, জানালা খোলবার সাধ্য তার নাই, সে তুমিই পার—এই কথাটী মনে রাখতে হবে।

প্রথম অবস্থায় চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ কর্‌বার একটা বড় উপায় হচ্ছে অভিমানশূন্য সেবা। নিজকে বিলিয়ে দিতে শিখতে হবে। সহিষ্ণুতা চাই, সাহস চাই, প্রেম চাই। আমার ইচ্ছাটাই বড় নয়, বরং ও বালাই না থাক্‌লেই জগতের স্বাদ ঠিক ঠিক বোঝা যায়; তাই পরমতসহিষ্ণু হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অন্যায় এবং অসত্যকে প্রত্যাখ্যান কর্‌বার সাহস থাকা চাই, সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের কামড়ানি থাক্‌লে চল্‌বে না। তারপর চাই প্রেম।—কেউ আমার শত্রু নয়, সব আমার আত্মস্বরূপ, তাঁরই মূর্ত্তি। যা কিছু দেখব জগতে, তা শুদ্ধ চিত্ত নিয়ে দেখব। বাইরের ক্ষতি যত বড়ই হোক না কেন, তার জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ কর্‌ব না, আত্মাকে অটল বীর্য্যের আসনে অধিষ্ঠিত রাখব।

অতীতটা অনেক সময় একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়। তখন তার সঙ্গে একটা রফা কর্‌বার চেষ্টায় মনটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। অতীতের পাপকে বর্ত্তমানের ডবল-পুণ্যের ঘুষ দিয়ে বিদায় কর্‌বার একটা ফিকিরে মনটা ফিরে শুধু। আসলে ফল কিন্তু কিছুই হয় না, লোভীর শুধু লোভ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অতীতের সঙ্গে রফা কর্‌বার

প্রয়োজন নাই—তাকে বেমালুম ভুলে যেতে হবে। অতীতের অশুভ কর্ম্মের ফল যদি এখন ভোগ করতে হয় তো বীরের মত তা ভোগ করব। ভয় কি? একদিন মন্দ ছিলাম; আজ যে ভাল হয়েছি, এই তার শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, আর আমার জবাবদিহী কার কাছে? কর্ম্মফলের জের যদি না মিটে থাকে তো নিয়ে এসো তোমার হিসাবের খাতা-পত্র —কড়াক্রান্তি শুদ্ধ চুকিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু হুম্‌কি দিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারবে না।

আত্মস্বরূপের মননের অভাব থেকে এই দুর্ব্বলতা জাগে। যাঁর কটাক্ষে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি লয় হচ্ছে, তাঁকে যদি আমার বুকের মাঝে পেয়ে থাকি তো ভয় করব কোন ক্ষতিকে—কোন লজ্জাকে? ওরে মূঢ়, সম্মোহিত হয়ে আছিস্ যে! তুই যে শিব—ভূতে ভূতে গূঢ়—রাজার রাজা তুই। অপসম্মোহিত কর দেখি নিজকে!

"ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" থাকবে যেন পদ্ম-পাতার মত। মনে করো না ওইটুকু তোমার বাহাদুরী; ও হচ্ছে আত্মস্বরূপের মননের ফল—তোমার কর্ম্মফল নয়, ও তোমার স্বভাব। কাজ করছ, কর্ম্ম করছ, মাঝে মাঝে একবার অন্দর-মহলটা ঘুরে আস না কেন? বিয়ে-বাড়ীর কর্ত্তা গামছা কাঁধে সারা বাড়ীময় ছুটোছুটি করছে, ডাক-হাঁক করছে, আবার তারি মাঝে একবার ভাঁড়ার-ঘরের দরজায় গিয়ে গিন্নির সঙ্গে দুটো রসিকতাও করে আসছে, কি তারই দেওয়া এক খিলি পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে আসছে!

আলোচনা

স্রোতের উজানে যাহারা সাঁতরাইতে চায়, সাধারণের রায়ে তাহারা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়। কালস্রোত, জনমত, সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের জেদ, এইগুলিকে মানিয়া চলাই নাকি বুদ্ধিমানের কাজ! যাহাদের মনের মেরুদণ্ড একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দলচর হইয়া সস্তায় ঘাসজলের যোগাড় করার চেষ্টা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং স্থানবিশেষে হিতকরও বটে। কিন্তু সত্য যে জনমতের তোয়াক্কা রাখিয়াই চলে. তাহা তো নয়। প্রকৃতির মাঝে একটা মূঢ় আবেগ আছে; কোথা হইতে তাহার উদ্ভব হয়, তাহা কেহ জানে না, কিন্তু জলপ্লাবনের মত, ঝঞ্ঝার মত, অগ্ন্যুৎপাতের মত বহু আয়াস ও চিন্তায় সৃষ্ট সৌন্দর্য্যরচনাকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহার লজ্জা নাই, ক্ষোভ নাই। মানুষের সমষ্টি মন মূঢ়; এই মূঢ় মনও প্রকৃতিরই একটা বিভাব। এখানেও তেমনি প্রলয়প্লাবনের আবেগ সৃষ্ট হয়। কিন্তু এই প্লাবন সব সময় সত্যের নির্দ্দেশ মানিয়া পথ চলে না। কখনো দেখি, মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াই উহা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই সত্য বলিয়া আস্ফালন করিতেছে, চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"জনমত কখনো ভ্রান্ত হইতে পারে না।" যে আত্মদর্শী পুরুষ সমুদ্রের মত এই জনমতের উত্তাল তরঙ্গকে আপনার বুকে করিয়াও অতলস্পর্শ গভীরতায় স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কাছে এই আস্ফালনের মূল্য কতটুকু? জনমত তো অবিবেকীর অভিনিবেশ মাত্র; ওতো শুধু স্তূপীকৃত ইন্ধন, উহার চেয়ে একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যে কোটী গুণ সত্য। ইন্ধনের অন্তরে অগ্নিকে যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং

সেই অগ্নিকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন, মতবাদের যদি কোনও মূল্য থাকে তো তাঁহাদের মতেরই আছে। আজ তাঁহাদের মত উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু একদিন জগৎকে ঘাড় হেঁট করিয়া তাহা শুনিতেই হইবে। অথবা এই ভরসাও মিথ্যা। সত্য স্বমহিমায় প্রদীপ্ত, আর কাহারো সমর্থনের অপেক্ষা না রাখিয়াই স্বতঃপ্রমাণ। এ জগতে আগাছার দৌরাত্ম্যই বেশী; কিন্তু তবুও রসিকের কাছে তাহারা ফুলফলের মর্য্যাদাকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। দুটী-চারিটী হৃদয়ে যে সত্যের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই আলোতেই যে জগৎ পথ দেখিয়া চলিয়াছে, অবিবেকীর মূঢ় চিত্তে এ সত্য প্রতিভাত না হইতে পারে, কিন্তু সত্যের জ্যোতিঃ তাহাতে ম্লান হইবে না। আত্মদর্শী, বিবেকী পুরুষের আবির্ভাব ঘটানোই প্রকৃতির একান্ত নিগূঢ় প্রয়াস; দুটী-একটী অপরূপ সৃষ্টিতে সে প্রয়াস সার্থক হয়, কিন্তু তাহাতেই জগৎজোড়া এই সৃষ্টির আয়োজনও সার্থক।

*

সেদিন সার্ জন্ উড্রফ্ আমাদের সান্ত্বনার ছলে শুনাইয়াছেন, "পরাধীন জাতির পক্ষে ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন।" সার্ জনের এই উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করি না। ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ কাহারও অবিদিত নয়। বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতির অভাব নাই। ইদানীং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ধুরন্ধরদের মুখে মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হইলে এ জাতি আর জগৎসভার মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। কথায় যদি কথার প্রতিবাদ হয় তো সার্ জনের এই উক্তিটী এই সমস্ত বিজ্ঞগণের সুন্দর প্রত্যুত্তর। যে কোনও রকম একটা বৈশিষ্ট্য নিয়া টিকিয়া থাকাটাও যদি একটা জাতির প্রাণ-শক্তির পরিচয় হয়, তাহা হইলে এত বিপ্লব পার হইয়াও ভারতবর্ষের এতদিন পর্য্যন্ত একটা জায়গায় অন্ততঃ আপন কোট বজায় রাখার ক্ষমতাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা চলে না; আর এই ক্ষমতার মূলে যে রহিয়াছে ধর্ম্মবল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তারপর এই টিকিয়া থাকাটা যে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অন্ধ আচারের দাসত্ব করিয়া কোল-ভীল-সাঁওতালের মত টিকিয়া থাকা, তাহাও বলিতে পারি না; কেননা সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ জগৎকে অনেক কিছু দিয়া আসিয়াছে এবং দিতেছে, অথচ জগতের সঙ্গে এই মাখামাখিতেও সে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই। যাঁহারা অপক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়া ভারত-বর্ষের সামাজিক ইতিহাস অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কোনও কালেই ভারতবর্ষ একটা আচারপদ্ধতিকেই একান্তভাবে আঁকড়িয়া থাকে নাই। যুগভেদে, অধিকারিভেদে আচারের ভেদ স্বীকার করা তাহার ধর্ম্মের একটা মূল নীতি। সুতরাং ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ রূপ দেখিয়া যদি বিচার করি, তাহা হইলে ধর্ম্মই জাতীয়তার পরিপন্থী, এই কথাকে কিছুতেই শ্রদ্ধা করিতে পারি না। বরং সার্ জনের কথায় সায় দিয়া আমরাও বলি, পরাধীন জাতির পক্ষে ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন; কেননা পরাধীনতা বাহিরের নিমিত্তসাপেক্ষ, কিন্তু ধর্ম্মে আমি অন্তরে স্বাধীন। যে তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াও বাংলার হরিদাস বলিয়াছিলেন, "দেহ খণ্ড খণ্ড কর, তবু হরিনাম ছাড়িবনা", ধর্ম্ম সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজ। এ তেজকে পরাভূত করে, এমন সামর্থ্য জগতে কোনও রাজ্যেশ্বরেরই নাই। কিন্তু মনে হয়, আজ আমাদের মাঝে ধর্ম্মের সে তেজটুকুও বুঝি নাই! সত্যানুরাগ, তেজস্বিতা, তৎপরতা, আত্মত্যাগ এইগুলিই যে

ধর্ম্ম, সে কথা আচার দিয়া প্রমাণ করিবার সামর্থ্য আমরা দিন দিন হারাইতে বসিয়াছি। তাই ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ আমাদের কাছে আচ্ছন্ন, তাহারই একটা বিকারকে ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া একপক্ষ তাহার বাপান্ত, আর একপক্ষ তাহার ওকালতী করিতেছি। যাঁহারা বলেন, ধর্মই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল অতএব শাস্ত্রের মাথায় লাঠি মার, তাঁহারা ধর্ম্মের খোলসটাকেই ধর্ম বলিয়া ভুল বুঝিতেছেন এবং এ কথাও হয়ত জানেন না যে শাস্ত্র কোনও কালেই ক্লীবত্বকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে না; আবার সাধ্জনের কথায় উল্লাস প্রকাশ করিয়া যাঁহারা বলেন, "শুনেছ সায়েবেব কথা! অতএব যেখানে আছ, সেখানেই শুয়ে শুয়ে জাবর কাট, আর আনন্দে ন্যাজ নাড়, তাহলেই ধর্ম্মের জয় হবে", তাঁহারাও আত্মপ্রতারক। একদিন কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসু বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুন ভাবে গদগদ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অতি বড় প্রেমের ধর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষা করিয়া খাইব, না খাইয়া মরিব, উহারা আসিয়া আমার গলায় ছুরী দিবে, তবু লড়াই করিতে পারিব না। হরি, হরি, এই মহাপাপে যে জাতি-কুল সব ভাসিয়া গেল! গোবিন্দ, এই দেখ, আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, হাত-পা কাঁপিতেছে, গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। আমি লড়াই করিব না।" শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ তো স্পষ্টই দেখিতেছি বাংলার ম্যালেরিয়া, তার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাও আছে। কাজের সময় এ কাঁদুনী ভাল লাগে না। তুমি ক্লীব?—ঝেড়ে ফেল সব!—ওঠ!"—এ দুয়ের মাঝে কোনটাকে ধর্ম্ম বলিব? মহাযোগেশ্বরের আঠার পর্ব্ব যোগের মাঝে অর্জ্জুন-বিষাদও একটা যোগ বটে; কিন্তু সেটা আদি মাত্র, গীতার সুরু ওখানে। আমরা গীতাপাঠ করি উল্টা করিয়া—মোক্ষযোগ হইতে সুরু করি, আর বিষাদযোগে আসিয়া শেষ করি! ফলে পাই, মুখে বিশ্বপ্রেমের বুলি, আর কাজের বেলায়—"ন যোৎস্যে!" ম্যালেরিয়া তো সঙ্গে আছেই!

*

একটী প্রাচীন কাহিনী পড়িলাম। মান্দ্রাজে সিংহাচলমে নারায়ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিম্বদন্তী এই, পুরূরবা এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও অদ্ভুত। উর্ব্বশী-পুরূরবার প্রণয়ের ইতিহাস সকলেই জানেন, বেদ হইতে কালিদাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ণনা আছে। ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে দেখি, এই প্রণয়ে রক্তমাংসের দাবী মিটাইবার পক্ষে কাহারও কৃপণতা নাই। পুরূরবা উর্ব্বশীকে লইয়া সিংহাচলমে আসিয়াছেন 'হনিমুন্' করিতে। আসিয়া শুনিলেন, এখানে নারায়ণ আছেন। অমনি কোথায় আছেন, তাহা খুঁজিতে লাগিয়া গেলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া যখন হয়রাণ হইয়া পড়িলেন, তখন পূর্ণ শারীরসংযম অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রতচারী হইয়া কুশশয্যায় শুইয়া উপবাস করিতে সুরু করিলেন—পণ, হয় নারায়ণ তাঁহাকে দেখা দিবেন, নয়ত তিনি না খাইয়া মরিবেন। নারায়ণ প্রসন্ন হইলেন, তিন দিন উপবাসের পর পুরূরবার কাছে আসিয়া প্রকট হইলেন।—এখন এই পুরূরবার মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে বলি। পুরূরবা সমুদ্রের পারে হাওয়া খাইয়া ফুর্ত্তি করিতে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিল স্বর্বেশ্যা। সুতরাং পুরূরবা যে ভোগী, পূর্ণমাত্রায় ভোগী, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যেই শুনিলেন, এখানে নারায়ণ আছেন, অমনি ভোগস্পৃহা সূর্য্যকিরণস্পর্শে শিশির-বিন্দুর মত মিলাইয়া গেল—তাঁহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল ব্রতচারী তপস্বীর নির্ম্মলাবদান! পুরূরবা যখন ভোগী, তখন তাঁহার ভোগে ছলনা নাই, দুর্ব্বলতা নাই। উর্ব্বশীকে তিনি কতখানি ভালবাসিতেন, তাহা কালিদাস বেশ বিনাইয়া বিনাইয়

বলিয়াছেন। পড়িলে মনে হয়, ভোগ ছাড়া এ মানুষটা বুঝি আর কিছু জানে না। কিন্তু সেই মানুষটাই যখন উর্ব্বশীকে দূরে ছুঁড়িয়া সটান কুশ-শয্যায় চীৎ হইয়া পড়িল "নারায়ণ দেখা দাও" বলিয়া, তখনই বাহিরের ভোগীর আবরণ ভেদ করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, একটা বজ্রদৃঢ়, বলিষ্ঠ পুরুষের চরিত্র। এই বলই ধর্ম্মবল। পুরূরবা যে যুগের মানুষ, সে যুগে ধর্ম্ম এমনি জাগ্রৎ ছিল, তাহার প্রেরণা এমনি সহজ অথচ অপ্রতিহত ছিল বলিয়াই ভোগও তখন শোভা পাইত। পুরূরবার জাতভাই বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি। কিন্তু আকণ্ঠ ভোগে ডুবিয়া থাকিয়াও সত্যের আহ্বানে সব কিছু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একেবারে প্রভাত-সূর্য্যের মত নির্ম্মল হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারি কি? আমাদের পাটোয়ারী বুদ্ধিতে আসে উর্ব্বশী আর নারায়ণের মাঝে একটা রফা—ইনিও থাকুন, উনিও থাকুন—এই ভাব! ইহাই ক্লীবত্ব, ইহাই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। এই রফা করিবার প্রবৃত্তি যতদিন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের আচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হইলেও ধর্ম্ম আমাদিগকে বল দিবে না, শ্রীসম্পন্ন করিবে না। জার্ম্মান-তরুণদের মধ্যে Karl Fischর Wandervogel movement যে কতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিদের অজ্ঞাত নয়। তাহারা নব-যৌবনের দল। কিন্তু তাহারা যে শক্তিশালী, তাহারা যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহা এই বর্ণনাটুকু হইতে বুঝিতেই পারি, "এরা আনন্দের আতিশয্যে যেখানে-সেখানে খামাখা গান গেয়েও উঠতে পারে, আবার প্রকৃতির বিরাট্ সৌন্দর্য্যের সামনে নিস্তব্ধ, তন্ময় হয়েও যেতে পারে।" আমাদের তরুণেরা হয়ত খামাখা গান গাওয়াটাই মনে করিবে অতি আধুনিক—যৌবনের হক্; আর ওই স্তব্ধতাটা নিতান্ত সেকেলে—বুড়ামীর চূড়ান্ত, সম্মার্জ্জনীর যোগ্য। কিন্তু তাহাদের কেহ বুঝায় না, যে দুর্জ্জয় শক্তি মানুষকে ভোগে এবং ত্যাগে তুল্যরূপে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতে পারে, সেই শক্তিই ধর্ম্ম। প্রাণে স্পন্দমান যে জাতি, জীবন আর মরণকে ক্রীড়নক করিয়া রাখিতে পারিয়াছে যে মানুষ, সে-ই ধার্ম্মিক। আর এই ধর্ম্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যোগ হইলে জগতে আর তাহার তুলনা মিলে না।

*

দল বাঁধাটাই সব সময়ে শ্রেয়ের পথে লইয়া যায় না, যদি না ধর্ম্মবোধ জাগ্রত থাকে। গোটা ইউরোপ আজ দল বাঁধিয়া দুইটী কাজে লাগিয়াছে—এসিয়া-বাসীর বহিষ্করণ এবং এসিয়ার সম্পত্তি লুট। এ-ও সংঘশক্তির ফল; কিন্তু ইহাকে তো ভাল বলিতে পারিতেছি না। মুসলমানের একতার উদাহরণ দিয়া হিন্দুকে লজ্জা দেওয়া হয়। কিন্তু যখন দেখি, সমগ্র মুসলমানসমাজ একত্র হইয়া হিন্দু-নারীধর্ষককে প্রশ্রয় দেয়, আর সে ব্যাপারে বাপ-ব্যাটা, মা-বোনের সম্পর্কের সমীহটুকু পর্য্যন্ত থাকে না, তখন আমি মুসলমান-সমাজভুক্ত নই বলিয়া দুঃখ হয় না। এ-ও তো সংঘবদ্ধ হওয়ারই ফল, কিন্তু ধর্ম্মবোধহীন এই সংঘশক্তি কি পৈশাচিক! ইউরোপের মত এমন কুৎসিৎ একোলসেঁড়ের ভাব হিন্দু-মনোবৃত্তির অনুকূল বলিয়া তো ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না; আর মুসলমানের মত ব্যভিচারকে এমনি করিয়া সামাজিক ভাবে লালন করার কল্পনাতেও হিন্দু শিহরিয়া উঠে। হিন্দু যে ইহাদের মত সংঘবদ্ধ নয়, ইহা একদিকে যেমন সুখের কথা, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নততর আদর্শের অনুগামী হইয়াও যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ইহাও তেমনি পরিতাপের কথা। কিন্তু খুঁজিলে যে সংঘসাধনার বীজ হিন্দুর মাঝে আবিষ্কার করিতে পারা যায় না, এ কথা মনে করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস হিন্দুর ধর্ম্মবোধ যতই মার্জ্জিত

হইবে, হিন্দু ততই সংঘবদ্ধ হইতে শিখিবে। যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতিকে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ একতার পরিপন্থী বলিয়া বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, উদ্দীপ্ত ধর্ম্মবোধের কাছে হিন্দু সেগুলিকে কত সহজে খর্ব্ব করিয়া দিতে পারে, তাহাও কি তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না? বিদেশী সমালোচকের কতকগুলি বুলি আমরা গড় গড় করিয়া আওড়াইয়া যাই মাত্র; দেশের জনসাধারণকে, ধর্ম্মবিশ্বাসকে, সমাজকে, আচার-বিচারকে বুঝিবার চেষ্টা করি না, তাহাদের প্রকৃতি বা ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার শ্রমটুকু স্বীকার করিতে চাহি না। যে কোনও সামাজিক রীতিকেই আজ আমরা বিদেশীর চশমার ভিতর দিয়া দেখিয়া উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া গালাগালি করি এবং রাতারাতি তাহার উচ্ছেদের দরুণ নানা জল্পনায় মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করি; কিন্তু তাহারই যে দেশভেদে, কালভেদে, পাত্র-ভেদে কত বৈচিত্র্য, কত ব্যতিক্রম রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সেই গবেষণার উপর নিজের মতবাদকে স্থাপিত করিবার প্রয়াস করি কি? বিদেশী ঐতিহাসিকের অসম্পূর্ণ ও সংস্কারদুষ্ট দৃষ্টি লইয়া যে নিজের দেশের সমালোচনা করি, ইহাতে দিন দিন আমরা স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছি। কেবলই বলিতেছি, গেল—গেল—আমাদের সব তলাইয়া গেল—ওদেশ হইতে কর্ণধার আমদানী না করিলে আমাদের আর উপায় নাই! কিন্তু আমাদের মাঝেই শুভশক্তির বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কিনা, তাহা তো খুঁজিয়া দেখিতেছি না। ধর্ম্মবোধের বিকারের দৃষ্টান্তগুলিই খুঁটিয়া খুঁটিয়া জড় করিতেছি এবং প্রতীকারের চেষ্টায় বিদেশী রাজার দুয়ারে পর্য্যন্ত ধন্না দিতে কসুর করিতেছি না; কিন্তু এখনো যে এই ধর্ম্মবোধকে আশ্রয় করিয়াই সমাজে সাম্য ও মৈত্রীর প্রভাব অন্তঃশীল হইয়া সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া এই প্রভাবকে পুষ্ট করিবার তেমন চেষ্টা তো করিতেছি না। হিন্দুকে সংঘবদ্ধ করিতে, জাতি-পাঁতির বৈষম্যের মাঝে সমন্বয় করিতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর ধর্ম্মপ্রবক্তারা যে কতখানি সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্নিগ্ধ ও উদার বাণী যে কিরূপে ধীরে ধীরে অথচ অপ্রতিহতগতিতে এই বিরাট্ সমাজকে সাম্য ও মৈত্রীর দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর কি আমাদের হয় না? "মানুষ বাহিরে নানা অবস্থার ফেরে পড়িয়া বিচ্ছিন্ন, কিন্তু অন্তরে সকলেই এক; অতএব বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ঐক্যের ভিত্তি খুঁজিতে হইবে"—ইহাই সাম্য-মৈত্রীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী নয় কি? সংঘসাধনার ইহাই প্রাণ নয় কি? আর অতীত ও বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মপ্রবক্তারা সকলেই ঠিক এই বাণীই প্রচার করিয়া আসেন নাই কি? আমাদের গণ চিত্তও এই ভাব দ্বারাই অনুষিক্ত নয় কি? এই চিন্তাধারাকে কার্য্যে অধিকতর ফলপ্রসূ করিতে হইলে প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ শক্তিপ্রয়োগ, অধ্যাত্ম-শক্তি দ্বারা ভিতর হইতে জাতিটাকে গড়িয়া তোলা। কিন্তু আমরা সে চেষ্টা না করিয়া বাহিরটা লইয়া মাতামাতি করিতেছি বেশী। মানুষের সমাজ জড় নয় যে বাহিরে বাহিরে মালমসলা লাগাইয়া, চূণকাম করিয়া তাহাকে সুশ্রী করিয়া তুলিব। সমাজের অভ্যন্তরে ক্রিয়া হওয়া চাই, তাহার মর্ম্মে প্রাণশক্তির স্পন্দন জাগানো চাই। চোখের সামনেই দেখিলাম, ইংরেজ দেড়শ' বছরের মধ্যে আমাদের কি রূপান্তরটাই না ঘটাইল! ইহার মাঝে বাহিরের প্রভাব কতটুকু? ধুতি চাদর পরিয়া হবিষ্যান্ন করিয়াও যে আমরা ইংরেজীভাবাপন্ন হইতে পারি, এরূপ দৃষ্টান্তেরও তো অসদ্ভাব নাই। অথচ এই রূপান্তরটা কোন দিক দিয়া হইল তাহা কেহই ধরিতে পারি নাই। আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ আজ হঠাৎ ফিরিয়া আসিলে চিনিতেই পারিবেন না যে তাঁহার বংশধর এমনতর হইয়া

গিয়াছে; অথচ আমি যে বদ্‌লাইয়া গিয়াছি. সে খবর আমিও জানি না। ইহার কারণ এই নয় কি যে, ইংরেজের সবল প্রাণ আমাদের দুর্ব্বল প্রাণকে অজ্ঞাতসারে জিনিয়া লইয়াছে? সংসারের তাগিদটা আসিয়াছে ভিতর হইতে, বাহির হইতে নয়। বাস্তবিক যদি দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে হয়, সংঘ-বদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে চাই এইরূপই অনভি-ভাবনীয় একটা মহান্ প্রাণের স্পর্শ, একটা million-volt soul-power! চাই বাংলার অদ্বৈত মহাপ্রভুর মত patriot—যিনি গঙ্গাজলে তুলসীদল ভাসাইয়া দিয়া হুঙ্কার দিতে থাকিবেন—"এস—এস!"

*

শ্রীযুক্ত সর্দ্দা ও শ্রীযুক্ত গৌড়ের দুইটী বিল সম্বন্ধে আগামী সেপ্টেম্বরে ব্যবস্থাপরিষদে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। এ বিষয়ে সম্প্রতি জনমত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে। গৌড়ের বিলের অনুরূপ আইন ইতিপূর্ব্বেই ছিল। বর্ত্তমান বিলে শুধু বয়োবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিবাহ-সম্বন্ধের বাহিরে সহবাস-সম্মতির বয়োবৃদ্ধির প্রস্তাব করার ফলে নারীধর্ষকদিগের বিরুদ্ধে একটা আইনের জোর পাওয়া যাইবে; অসদভিপ্রায়ে অল্পবয়স্কা বালিকা বিক্রয়ের ব্যাবসা চল্‌তি আছে, তাহারও কণ্ঠরোধ করিবার পক্ষে ইহা আনুকূল্য করিবে—যদি নাকি উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধীরা আইনের কবলে ধরা পড়ে। বিবাহিত দম্পতীর পক্ষে সহবাস-সম্মতির যে বয়স প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহের ফলে যে যৌন-ব্যভিচার ঘটে, তাহার নিবারণ করা। উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু আইন করিলেই কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? এরূপ আইন তো এখনও আছে, কিন্তু সে আইনের ধারার একটীও বোধ হয় প্রয়োগ-ক্ষেত্র পাওয়া যায় নাই। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি না জাগিলে আইন করিয়া কিছুই হইবে না—বিশেষতঃ এদেশে। এ দেশটা বিলাত নয়; ঘরের ঝি-বউকে লইয়া আদালতে কেলেঙ্কারী করার আগে এ দেশের লোক গলায় দড়ি দিতে প্রস্তুত। এজন্য কত নারীধর্ষণের কাহিনীও গোপনই থাকিয়া যায়; আর আইনের আশ্রয় লইয়া এ দেশের মানুষ দাম্পত্য-অপরাধের প্রতিকার করিতে যাইবে? নারীর ইজ্জত সম্বন্ধে এ দেশের স্ত্রী-পুরুষের ধারণা যে স্বতন্ত্র, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? তারপর সর্দ্দার বিল পাশ হইলে গৌড়ের বিলের দাম্পত্য অপরাধের ধারা তো কিছুদিনেই বাতিল হইয়া যাইবে, কারণ ১৪ বছরের পূর্ব্বে যদি বালিকার বিবাহ না হয় তো সহ-বাসসম্মতির বয়স ১৪ করিয়া কি ফল হইবে? তবে ১৪ বছরের নিম্নে যে সমস্ত বালিকা ইতিপূর্ব্বে বিবা-হিত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে রক্ষা করা এই আইনের উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু সে কয় বছর? যদি সর্দ্দার বিল পাশ হয় তো কয়েক বছর পরেই তো সব সমান হইয়া যাইবে। তবে আর এই তাড়াহুড়োটা করিয়া কি লাভ? সিলেক্ট কমিটি ১৪ বছরকে ১৫ বছর করিতে বলেন, তাহা হইলে সর্দ্দার বিল পাশ হইলেও আইন খাটাইবার জন্য গৌড় এক বছর হাতে পাইবেন। কিন্তু আইন খাটিলে তো? গৌড় কি এখনও এ দেশের লোকের ধাতু-প্রকৃতি চেনেন নাই? এত শীঘ্র কি তাহারা লজ্জা-সরমে জলাঞ্জলি দিয়াছে মনে করেন?

❦

সর্দ্দার বিল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করিয়া দেশের শক্তি বাড়াইবে বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এই এক বাতিক! সংস্কারকদের ধারণা, বাল্যবিবাহই বুঝি যত নষ্টের গোড়া। শিক্ষার প্রসারে, আর্থিক কারণে বাল্যবিবাহ তো আপনা হইতেই দিন দিন কমিয়া আসিতেছে; কিন্তু তবুও দেশের লোক বাপ-পিতা-মহের চেয়ে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে কেন? তা ছাড়া বাল্যবিবাহটা কি সার্ব্বভৌমিক বিধি? দেশের সব জায়গায়, সব সম্প্রদায়ে কি বাল্যবিবাহ

প্রচলিত ? অথচ সংস্কারকেরা বক্তৃতার সময় এমনি ভাবখানা প্রকাশ করেন, যেন দেশ জুড়িয়া কেবলই বাল্যবিবাহ চলিতেছে ! সেন্সাস্ ঘাঁটিয়া দেখা যায়, ১৫ বছর পর্য্যন্ত বয়সের যত বালিকা তাহাদের মধ্যে শতকরা ১৯টী বিবাহিতা ; ১৪ বছর পর্য্যন্ত অনুপাত নিশ্চয়ই কম হইবে। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত শতকরা ৩২টি পুরুষ বিবাহিত ; ১৮ বছর ধরিলে অনুপাত আরও কম হইবে। ইহাতে দেখি, সমাজেতের আনী মেয়ের বয়সই বিবাহের সময় সর্দ্দার বিলের নির্দ্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়। তবুও মেয়েরা বীরপ্রসবিনী না হইয়া দিন দিন ছুঁচোপ্রসবিনী হইতেছে কেন ? যেখানে নাকি মায়ের দোষে দেশের তিন-আনী মানুষ অধম হওয়ার কথা, সেখানে প্রায় ষোলআনীই অধম কেন ? হিন্দুর কাছে বিলাতী সমাজনীতি অনুযায়ী marriage আর consummation of marriage সমান কথা নয়, বাল্যবিবাহ অর্থেই সব স্থানে বাল্য-যৌনাচার নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে বিহারে বাল্য-বিবাহ সব চেয়ে বেশী হয়; কিন্তু অধিকাংশস্থলে সে বিবাহ বাগ্‌দানের চেয়ে বেশী কিছু নয়, মেয়ে সমর্থা না হওয়া পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ী যায় না, এখন কি জামাই শ্বশুরবাড়ী আসিলে অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে অপর আত্মীয়ের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যৌনাচার নাই, তবুও বালিকা-বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়, ইহার মাঝে হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক সুখ-সোয়াস্তির অনেকখানি ভাবনাই নিহিত রহিয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে নিজে না বুঝিয়া এবং প্রতিপক্ষকে না বুঝাইয়া সামাজিক স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা আইন নয়—নিছক অত্যাচার ! আর সমস্ত ব্যাপারটার মূলে রহিয়াছে—একটা কল্পিত বিভীষিকা, বিদেশী সমালোচকের মুখে ঝাল খাওয়া, slave mentality র উৎকট নিদর্শন। সমাজের ভাল কে না চায় ? নর-নারী শান্ত, সংযত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হউক, এই নিয়া হিন্দু আজ হাজার হাজার বছর ধরিয়া মাথা ঘামাইয়া আসিতেছে—জগতের কোনও জাতিই এ সমস্ত ব্যাপার নিয়া হিন্দুর মত চুলচেরা বিচার করে নাই। সেই হিন্দু কি যৌন-ব্যভিচারের অবাধ সুযোগ দিবার জন্য বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিল বলিব ? এমন কথা বলিতে চাই না যে সামাজিক রীতি-নীতির কোনও পরিবর্ত্তন না হউক ; কিম্বা ঋষি-সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যা যে কোথায়ও না হইতেছে, তাহাও বলি না। কিন্তু সেই সংশোধনের ভার সমাজের উপর ছাড়িয়া দাও ; ঘরের ঝি-বউএর শাসন বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজার হাতে তুলিয়া দিতেছ কেন ? ছিঃ, ছিঃ, এত বড় ক্লীব—এমনি অপদার্থ তোমরা ? গলায় দড়ি জোটে না ? সব তো খোয়াইয়াছ, শেষকালে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যটুকুও খোয়াইয়া স্বরাট্ হইবে ? সব দিক দেখিয়া-শুনিয়া যদি বাল্যবিবাহ অনিষ্টকর মনে কর তো যাহারা বাল্যবিবাহের পাঁতি দিয়াছিল এবং দিতেছে, তাহাদিগের উপর চাপ দাও ; পার তো এই নিয়া সমাজপতি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সত্যাগ্রহ চালাও—নির্ভীকচিত্তে বল, "ব্রাহ্মণ, তুমিই একদিন এ পাশ রচনা করিয়াছিলে, আজ তুমিই ইহা কাটিয়া দাও—এ বন্ধন আমাদের কাছে অসহ্য ঠেকিতেছে ; যুগান্তরের সন্ধিতে দাঁড়াইয়া নবসংহিতা রচনা করিয়া তুমিই আজ সমাজসংস্কার কর, আমাদের সঞ্জীবিত কর উদ্ধার কর।" নিজেরা নিজেদের ? ঘর সামলাও—এর মাঝে পরকে কেন টানিয়া আনিতেছ

ধর্ম্মদত্তা

(ধম্মদিন্নথেরিয়া কথা)

——(::)——

(১)

মানুষ কি যে চায়, সে নিজেই জানে না। বাইরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাই, তবুও প্রাণের মাঝে একটা হাহাকার, কিছুতেই যেন তৃপ্তি হচ্ছে না— এমনটি কি কারু কখনো হয় না? মনে হয় না কি, যে জায়গাটীতে আমি আছি এ ঠিক আমার আপন ঠাঁই নয়, যাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাস্‌ছি, তারাই ঠিক আমার আপন জন নয়; অথচ অন্য কোথায়ও যে যাব সে সাহসও নাই, ভালবেসে যাদের জড়িয়ে ধরেছি তাদের ছেড়ে যাবার কল্পনাতেও বুক কেঁপে ওঠে। এই ঘর দোর, এই আত্মীয়-স্বজন—এ ছেড়ে সোয়াস্তি কোথায় আছে, তাও জানি না; তবুও যেন শুধু এতেই আমার বুক ভরে উঠ্‌ছে না—মনে হচ্ছে যেন আমার আরও কিছু পেতে বাকী, কর্‌তে বাকী। কিন্তু সে যে কি, তাও জানি না, ভাব্‌তে পারি না। এই দোটানার মাঝে পড়ে সুখের দিনেও যেন দুনিয়ার যত কান্না এসে বুকের মাঝে জমা হতে থাকে।

এমনি একটা চাপা কান্না দিন দিন জমে উঠ্‌ছিল রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী বিশাখের স্ত্রী ধর্ম্মদত্তার বুকে। ধর্ম্মদত্তা বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরে তাঁর বিয়ে হয়েছে। বাপের বাড়ীতে ছিলেন বাপের দুলালী, তেমনি স্বামীর ঘরে এসে স্বামী-সোহাগিনী হয়েছেন। যা কিছু থাক্‌লে পর মানুষ নিজকে সুখী মনে করে, তার কিছুরই তাঁর অভাব নাই। আর তাঁর সব সুখের বাড়া স্বামীর ভালবাসা। মানুষ যে মানুষকে এতখানি ভালবাস্‌তে পারে, এ না দেখলে কেউ বিশ্বাস ক'তে পার্‌ত না। স্বামীর ভালবাসার আবেগ দেখে কখনো কখনো ধর্ম্মদত্তার বুক কেঁপে উঠ্‌ত, মনে হত —এত সুখ বুঝি তাঁর কপালে সইবে না; এ যেন জোয়ারের জল, আজ ফুলে ফেঁপে কূল ছাপিয়ে চলেছে, আবার কোন্ দিন ভাটার টানে সব সরে যাবে, কে জানে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর মন ভারী হয়ে উঠ্‌ত, আরও নিবিড় করে তিনি স্বামীকে আঁক্‌ড়ে ধরতেন, মনে মনে বল্‌তেন "হে ভগবান্! আমার সব কেড়ে নিয়ে গাছতলার ভিখারিণী কর, তাও সইব; কিন্তু একে যেন ছিনিয়ে নিও না, তাহলে আমি আর বাঁচ্‌ব না!"

অথচ এই স্বামীর ভালবাসার মাঝে ডুবে থেকেও তাঁর আর একটা মন যেন আব্‌দারে ছেলের মত কেবলই খুঁৎখুঁৎ করত—কি যেন তার পাওয়ার ছিল, কোথায় কি জানি কি হারিয়ে গেছে—

মনের মাঝে এই মেঘ জমে উঠ্‌তেই ধর্ম্মদত্তা আরও ব্যাকুল হয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধর্‌তেন। কেন যে তাঁর এমন ভাব হত, তা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌তেন না; কিন্তু ভয় হত, পাছে তাঁর এই খুঁৎখুঁতির ছল ধরে ভগবান্ স্বামীকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেন!

স্ত্রীর এই ভালবাসা পেয়ে বিশাখেরও সুখের অবধি ছিল না। কিন্তু তাঁরও মনের কোণে এক জায়গায় একটু মেঘ জমা হয়ে ছিল। ধর্ম্মদত্তার মত এমন স্ত্রী পাওয়া—এ যে বহু তপস্যার ফল! ধর্ম্মদত্তা তাঁর সকল সময়ের সঙ্গিনী, সকল কর্ম্মের সহায়, তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎস। সকল বিষয়ে তিনি ধর্ম্মদত্তার কাছে থেকে উৎসাহ পান, সাড়া পান—কেবল একটী বিষয় ছাড়া।

বুদ্ধজ্যোতিঃর তখন জগতে আবির্ভাব হয়েছে। ভোরের আলো পেয়ে কমলবনে যেমন কমলকলি ফুটে ওঠে, তেমনি তাঁর আলো পেয়ে মানুষের মনও

ফুটে উঠ্ছে। রাজগৃহে শাস্তা কতবার এসেছেন, বিশাখ প্রত্যেকবার তাঁকে দেখ্তে গিয়েছেন, আত্মহারা হয়ে তাঁর মুখে ধর্ম্মদেশনা শুনেছেন। নিমেষের তরে তাঁর মনে হয়েছে, ধন-জন, মান-সম্ভ্রম সমস্ত অসার—ঘরে থেকে যত সুখ, তার কোটিগুণ সুখ বুঝি এই মহাভিক্ষুকের সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো! কতবার তাঁর মনে হয়েছে, মহাগোতমের চরণতলে যদি তিনি আশ্রয় পান, তাহলে সংসারে তাঁর যা কিছু প্রিয়তম, সব বুঝি ছাড়্তে পারেন!······হাঁ, সব তিনি ছাড়তে পারেন—এমন কি ধর্ম্মদত্তাকেও যদি তাঁর ছাড়তে হয়—

এইখানটাতেই তাঁর একটা ব্যথা। ধর্ম্মদত্তাকে সব জায়গায় তিনি পেয়েছেন, শুধু এই জায়গায় তাঁকে পান নি—এইখানেই যেন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটা মস্ত ব্যবধান! সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ধর্ম্মদত্তা কি বিলাসিনী, সংসারের আসক্তি কি তাঁর খুবই প্রবল? তা তো মনে হয় না। বরং বিশাখ চিরকাল লক্ষ্য করে এসেছেন, তাঁর স্ত্রীটী সংসারে থেকেও যেন উদাসিনী; সুখ-ভোগের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোলুপতা নাই, দেহে মনে তিনি ফুলের মতই পবিত্র; স্বভাবটীকে নির্ম্মল করবার জন্য শাস্তা সকলকে যে শীলাচারের উপদেশ দিয়ে থাকেন, ধর্ম্মদত্তা যেন সে শীলাচারের জীবন্ত প্রতিমা। তবু বিশাখের মনে একটা অসোয়াস্তি লেগেই আছে। কেন, তা বল্ছি।

ধর্ম্মদত্তা বিশাখার সকল সময়ের সঙ্গিনী। কিন্তু এই যে কতবার শাস্তা রাজগৃহে এলেন, একটীবারের তরেও ধর্ম্মদত্তা স্বামীর সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করতে যান নি। যখনি তিনি শুনেছেন, স্বামী শাস্তার চরণ দর্শন করতে যাচ্ছেন, একটী কথা না বলে তিনি দুয়ার পর্য্যন্ত স্বামীকে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তারপরেই আর তাঁর পা সরে নি। বিশাখও অভিমান করে কোনও দিন তাঁকে সঙ্গে যেতে বলেননি। শাস্তাকে যে তিনি কি চোখে দেখেন, তা তিনিই জানেন; ধর্ম্মদত্তাকেও যে কতখানি ভালবাসেন, তা-ও জানেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রীকে শাস্তার কাছে নিয়ে গেলে কি জানি যদি তিনি বিন্দুমাত্র শাস্তার অমর্য্যাদা করে ফেলেন, তাহলে সে আঘাতে তাঁর বুক যে চূর্ণ হয়ে যাবে! তাই মুখ ফুটে কোনোদিন ধর্ম্মদত্তাকে তিনি সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেননি। দুয়ারের কাছেই স্ত্রীকে ছেড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চেপে তিনি শাস্তার কাছে গিয়েছেন। তারপর সেখানে ধর্ম্মদেশনা শুনতে শুনতে তাঁর চিত্তে কত আশা, কত আনন্দের লহর খেলে গিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে আস্বার সময় ধর্ম্মদত্তার ম্লান মুখ। এ আনন্দের ভাগ তিনি তাঁকে দিতে পার্লেন না—একি তাঁর কম দুঃখ? সংসার ছাড়বার সঙ্কল্প কতবার তাঁর মাঝে জেগেছে, কিন্তু ধর্ম্মদত্তার কথা মনে করে তিনি তা পারেন-নি। নির্ব্বাণের সুখ-সমুদ্রে তিনি ভাস্বেন, আর চিরকাল দুয়ার ধরে ধর্ম্মদত্তা ম্লান চোখে অমনি চেয়ে থাক্বেন পথের পানে? না,—যদি বেরুতে হয় তো ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হয়ে দুজনাই বেরিয়ে পড়বেন, ধর্ম্মদত্তাকে সংসারের কূলে ফেলে রেখে তিনি আনন্দ-সায়রে অবগাহন কর্তে চান না কিছুতেই!

এমনিতর কত কথা ভাবতে ভাবতে বিশাখ বাড়ী ফিরে আসেন, আর প্রতিদিনই দূর হতে দেখতে পান, ধর্ম্মদত্তাকে যেমন ভাবে তিনি দুয়ারের কাছে রেখে গিয়েছিলেন, তেমনি তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন,—চোখে-মুখে একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠা! দেখে বিশাখের যেমন আনন্দও হত, তেমনি বুকের মাঝে একটা ব্যথাও যেন কোথায় আলোড়িত হয়ে উঠত। স্ত্রীর এই আকুল ভালবাসা—এর একটী কণাও যদি তিনি সম্যক্সম্বুদ্ধকে দিতে পার্তেন তো তাঁর মত আজ জগতে সুখী কে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বিশাখ দুয়ারমুখে এসে দাঁড়ান, ধর্ম্মদত্তা ব্যগ্র হয়ে দুহাত বাড়িয়ে স্বামীর দুটী হাত চেপে ধরেন, শরতের আকাশের মত নির্ম্মল দুটী চোখে আনন্দ যেন উছলে পড়ে। সে চোখের পানে চেয়ে বিশাখের মনের সকল গ্লানি মুছে যায়, আনন্দে হৃদয়ের কপাট খুলে যায়, স্ত্রীর হাত ধরে গর্ভগৃহে গিয়ে দুজনে বসেন, তারপর সেদিনকার কত কথা, কত কাহিনী বিশাখ অনর্গল বলে যেতে থাকেন! ধর্ম্মদত্তা তন্ময় হয়ে সমস্ত কথা শোনেন, একটা অজানা-রাজ্যের আলোক তাঁর দুটী চোখে জ্বল্‌তে থাকে, বুকের ভিতর যেন ঝড় বইতে থাকে —কিন্তু বাইরে তার একটুও প্রকাশ পায় না। বিশাখ দেখেন স্ত্রী নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ; এ যেন পাষাণ-প্রতিমার কাছে তিনি এতক্ষণ প্রলাপ বকেছেন, —প্রত্যুত্তরে একটী কথাও শুন্‌তে পাননি।···বুকের মাঝে আবার কোথা হতে মেঘের ভার জম্‌তে থাকে।

অবশেষে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি ঘর ছেড়ে চলে যান। ফিরে এসে দেখেন, ধর্ম্মদত্তা তেমনি নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন, বাতায়নপথে শূন্য দৃষ্টিতে দূর আকাশের পানে চেয়ে—মুক্তার মত দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। একদিন দেখলেন, চুলের রাশ এলিয়ে দিয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে ধর্ম্মদত্তা ফুলে ফুলে কাঁদ্‌ছেন। সে কি কান্না! বিশাখ অস্থির হয়ে পড়্‌লেন। কত সান্ত্বনা, কত আদর, কত ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—কিন্তু তবুও স্ত্রীর মুখ থেকে একটী কথাও শুন্‌তে পেলেন না। ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবলেন, "এ কি রহস্য!"

(২)

এমনি করে দিন যায়। বিশাখ ধর্ম্মদত্তাকে সব জায়গায় বুঝ্‌তে পারেন, কেবল শাস্তার প্রসঙ্গে তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের তিনি কোনও অর্থই খুঁজে পান না। কিন্তু এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ব্যাবধানটা যেন ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। অথচ দুজনেই এমন ভাবে চলেন যেন কোথায়ও কিছু ঘটেনি। বিশাখের প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে ঘর ছাড়্‌বার জন্য, কিন্তু স্ত্রীর কথা মনে পড়্‌তেই তাঁর সঙ্কল্প শিথিল হয়ে যায়। স্বামীর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে ধর্ম্মদত্তাও তাঁকে জোর করে আঁকড়ে ধর্‌তে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না যেন। কি যে তাঁর হয়েছে তা অপরকে বোঝাবেন কি, নিজেই তা বুঝ্‌তে পারছেন না। কোথাও তাঁর একটু সোয়াস্তি নাই, বুকজোরা কেবল একটা প্রচণ্ড হাহাকার!

অবশেষে একদিন শাস্তার ধর্ম্মকথা শুন্‌তে শুন্‌তে বিশাখের সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল। এত বৎসর ধরেই তো তিনি স্ত্রীর প্রতীক্ষা করলেন, কিন্তু আর কত দিন! এমনি করে একদিন দুদিন করে জীবনের গোণা কয়টা দিন তো ফুরিয়ে এলো প্রায়, আর তো কারু প্রতীক্ষায় বসে থাক্‌লে চলে না। স্ত্রীকে এই পথে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু এত দিনেও কিছুই কর্‌তে পারলেন না; এমন কি স্ত্রী যে কি চান, তাও তিনি বুঝতে পারলেন না। আমরণ দুজনায় পরস্পরের সাথী থাকবেন, এই ছিল তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। ভাগ্য বিরূপ, তা আর হলো না। যাক্, স্ত্রীকে ছেড়েই তাহলে তাঁকে এই পথে আস্‌তে হবে।······মনে মনে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বিশাখ সে দিন ঘরে ফিরলেন।

দূর হতে দেখ্‌তে পেলেন, প্রতিদিন ধর্ম্মদত্তা যেমন তাঁর পথের পানে চেয়ে দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন, আজও তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। একবার তাঁর মনটা আগের মতই আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। কিন্তু নাঃ,—এই মোহই এতদিন তাঁকে সংসারের জালে বন্দী করে রেখেছে; আজ যেমন করেই হোক, এই জাল ছিঁড়ে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হবে। নির্ব্বাণের পথে যে স্ত্রী তাঁর সঙ্গিনী হল না, থাক্ সে—সংসারের ভোগসুখ নিয়েই সে মেতে থাক্!

দুয়ারের কাছে আসতেই ধর্ম্মদত্তা প্রতিদিনকার মতই হাত দুটী স্বামীর পানে বাড়িয়ে দিলেন;

কিন্তু বিশাখ তাঁর দিকে একবার তাকালেনও না, পাশ কাটিয়ে সোজা উপরে চলে গেলেন।

স্বামীর এই উপেক্ষা ধর্ম্মদত্তার বুকে যেন শেলের মত বিঁধ্‌ল। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেলেন। অন্যদিন স্বামী এসে শাস্তার কথা বলেন, গল্প করেন; কিন্তু আজ গিয়ে দেখেন, স্বামী তাঁর জন্য একটু অপেক্ষা না করেই খেতে বসে গিয়েছেন। ধর্ম্মদত্তা কাছে গিয়ে বস্‌লেন, এটা-ওটা এগিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, কিন্তু বিশাখ তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলা দূরে থাকুক, একবার মুখ তুলে তাঁর পানে তাকালেনও না। পাতের অন্নব্যঞ্জন একরকম পাতেই রইল, দু-এক গ্রাস মাত্র মুখে দিয়েই বিশাখ আচমন করে উঠে পড়লেন। তারপর স্ত্রীর সঙ্গে কথাটী মাত্র না বলেই নিজের শোবার ঘরে চলে গেলেন।

আজ এতদিন ধরে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একদিনের জন্যও তো স্বামী তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি। দুঃখে, অভিমানে ধর্ম্মদত্তার যেন বুক ফেটে কান্না পেতে লাগ্‌ল। স্বামীর কাছে তিনি কি অপরাধ করেছেন, যার জন্য তাঁর এই শাস্তি, এই অপমান?

কিন্তু কোনও কিছুতেই উতলা হয়ে ওঠা তাঁর স্বভাব নয় কিনা, তাই চোখের জল চোখে চেপেই তিনি চল্‌লেন স্বামীর ঘরের পানে। দুয়ারের কাছে এসেই অভিমানিনীর মনে হল, কি জানি হয়ত এ ঘরে তাঁর আসাও নিষেধ! বাইরে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "একটু সময়ের জন্য ভিতরে আস্‌তে পারি কি? আমার দুটো কথা ছিল।"

বিশাখ বল্‌লেন, "এস!"

বিশাখ পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন। ধর্মদত্তা ঘরে ঢুক্‌তেই তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লেন।

একটু ম্লান হাসি হেসে ধর্ম্মদত্তা বল্‌লেন, "ভয় নাই, আমি তোমার কাছে যাব না বা তোমায় ছোঁব না। তুমি শোও, আমি এই এখানে নীচেই বস্‌ছি।"

উত্তরে বিশাখ কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার কি মনে করে নিজকে সাম্‌লে নিলেন। খানিকক্ষণ স্বামী স্ত্রীর মাঝে কোনও কথাই হল না। কিন্তু এমন করে চুপ করে থাকাও যে অসহ্য! ধর্ম্মদত্তার চোখের জল যেন আর মানা মান্‌তে চায় না।

বিশাখ দেখ্‌লেন, ধর্ম্মদত্তা কাঁদছেন। এ কান্নার অর্থ যে কি, তা বুঝ্‌তে তাঁর বিলম্ব হল না। কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহার স্মরণ করে অনুশোচনায় তাঁর চিত্ত ভরে গেল। বাস্তবিক, তিনি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন, এতটা না কর্‌লেও চল্‌তো। স্বামীর কোন ইচ্ছাতেই তো ধর্ম্মদত্তা কোনও দিন বাধা দেন নি। সমস্ত কথা খোলাখুলি বুঝিয়ে বল্‌লে কি তিনি বাদী হতেন? শাস্তার সম্বন্ধে ধর্ম্মদত্তার মনোভাব কি, তা না বুঝতে পেরেই না তিনি তাঁর উপর অভিমান করেছেন। ধর্ম্মদত্তা কোনও দিন কিছু বলেননি বটে, কিন্তু কই, তিনিও তো কোনও দিন স্পষ্ট কথায় তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিশাখের মনটা একটু নরম হয়ে এল। কোমলকণ্ঠে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি কি আমায় কিছু বল্‌তে চাও?"

চোখের জল মুছে ধর্ম্মদত্তা বল্‌লেন, "আমি কি বল্‌তে চাই, বুঝ্‌তে পার না? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিশাখ বল্‌লেন, "আমার আজকার ব্যবহারে খুব ব্যথা পেয়েছ—না?"

ধর্ম্মদত্তা কোনও কথা না বলে চুপ করে রইলেন। চোখের জল যেন দ্বিগুণ হয়ে ঝর্‌তে লাগল।

বিশাখ ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "আজকার ব্যবহার দেখে মনে করো না যে তোমার উপর রাগ করেছি। আজ কদিন ধরে আমার মনটা ভাল ছিল না।

আমার আর ঘর-সংসার ভাল লাগ্‌ছে না। অনেক দিন ধরেই যাব যাব মনে করছি, কিন্তু তবুও যেতে পারছি না। কেন পারছি না, সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নাই। কিন্তু এই দোটানার মাঝে পড়ে আমার মনের সমস্ত সুখ-শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আজ ঘুম থেকে উঠেই সঙ্কল্প করেছিলাম—শাস্তার কাছে যাব; আজ যদি তাঁর মুখে এখন কোন কথা শুনতে পাই, যাতে আমার এই সমস্যার সমাধান হয়, তা হলে আজই আমি এদিককার সমস্ত জঞ্জাল মিটিয়ে ফেল্‌ব। আমার সাধ পূর্ণ হয়েছে, শাস্তার করুণা পেয়ে আমি আজ ধন্য হয়েছি। তাঁর মুখে ধর্ম্মদেশনা শুনতে শুনতে আমার আজ জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছে। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—এই জন্মই আমার শেষ জন্ম, আর আমাকে এই সংসারে দুঃখ ভোগ করতে ফিরে আস্‌তে হবে না। আজ আমি আর ঘরে ফিরতাম না, কিন্তু তোমার কথা মনে হয়ে আবার আমায় ফিরে আস্‌তে হল। যে পথ আমি মনে মনে বরণ করেছি, স্ত্রীলোক স্পর্শ করলে বা আহারে লোভ থাকলে আমি সে পথ হতে ভ্রষ্ট হব। তাই তখন আমি তোমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেছিলাম। এখন তোমার একটা ব্যবস্থা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার টাকা-পয়সার অভাব নাই; সব আমি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। এই সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে তুমি ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পার; আর এখানে যদি তোমার ভাল না লাগে তো যত খুসী ধন-রত্ন সঙ্গে নিয়ে তোমার বাপের বাড়ী গিয়েও থাক্‌তে পার। তোমার যা অভিরুচি হয় বল, আমি সেই রকমই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

বিশাখ উত্তরের প্রতীক্ষায় স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন। স্বামীর মুখে আজ এই নিষ্ঠুর কথা শুন্‌তে পাবেন, ধর্ম্মদত্তা স্বপ্নেও তা ভাব্‌তে পারেন নি। তাঁর মনে হত লাগল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যেন তাঁর চোখের সাম্‌নে টল্‌ছে। বুকের আগুনে তাঁর চোখের সমস্ত জল শুকিয়ে গেল, শুষ্ক চোখে অভিভূতের মত তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিশাখের মনটা যেন মুচ্‌ড়ে কেঁদে উঠ্‌ল। বাস্তবিক কি নিষ্ঠুর তিনি!—কিন্তু উপায় নাই! এই তো এতদিন বৃথা কেটে গেল, আর কত দিন এমনি করে যাবে? স্নেহ ও করুণায় বিগলিত কণ্ঠে বিশাখ বল্‌লেন, "আমি চলে গেলে কি তোমার খুবই কষ্ট হবে? আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না?"

অতদিন পরে স্বামীর মুখে এই প্রশ্ন! স্বামী কি জানেন না, ধর্ম্মদত্তার তিনি কতখানি? এ যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা!......কিন্তু স্বামীর এই প্রশ্নে বিশাখা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। চোখ ফেটে তাঁর ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগ্‌ল। রুদ্ধস্বরে বল্‌লেন, "তুমি কি আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবে?"

স্ত্রীর এই প্রশ্ন যেন বিশাখের অত্যন্ত ব্যথার ঠাঁইটাই মাড়িয়ে দিল। বেদনাতুর কণ্ঠে বিশাখ বল্‌লেন, "জানি না পারব কি না—কিন্তু তবুও আমায় তা পারতেই হবে। তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে হবে, এ কল্পনাও আমার সইত না। তাই কতবার আমার ডাক এসেছে, তোমার মুখের পানে চেয়ে সে ডাক আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। এমনি করে কত দিন কেটে গেল, এ পথে তোমার কাছে আমি এতটুকু আশার বাণী, এতটুকু উৎসাহ পেলাম না। সে ব্যথা আমার বুকে নীল হয়ে জমে আছে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনায় তোমায় আমি সঙ্গিনী পেলাম না, এ যে আমার কি দুঃখ তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার? শাস্তার কাছ থেকে আলো নিয়ে, আনন্দ নিয়ে তোমার কাছে আমি ছুটে এসেছি, হৃদয় উজাড় করে তোমায় সব ঢেলে দিয়েছি; কিন্তু একটী দিনের জন্যও মুখ ফুটে বললে না, তুমি তা গ্রহণ করলে কি না। শাস্তাকে তুমি শ্রদ্ধা কর—শুধু এই কথাটী

শোনার জন্য আকুল হয়ে আমি দিনের পর দিন তোমার মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছি—"

বিশাখের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। সবিস্ময়ে দেখলেন, একি! পাহাড়ের আড়াল থেকে ভোরের সূর্য্য উঠে যেমন চারিদিক উদ্ভাসিত করে তোলে, তেমনি একটা দিব্য জ্যোতিতে ধর্ম্মদত্তার চোখ-মুখ ছেয়ে গেছে। এ যেন হাজার বছর ঘুমের পর আত্মার নবজাগ্রৎ মহিমা!—স্ত্রীর এমন অপরূপ মুখশ্রী তো তিনি কখনো দেখেন নি! বিহ্বল, স্খলিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠ্‌লেন, "এ কি! কি হল?"

ধর্ম্মদত্তা যেন স্বপ্নাবিষ্টার মত বল্‌তে লাগলেন, "শাস্তাকে শ্রদ্ধা করি কি না? জানি না, শ্রদ্ধা কাকে বলে! তোমাকে ভালবেসেছি, এইটুকু বুঝি; শাস্তাকে ভালবাসি কিনা, এতদিন তা বুঝিনি, বুঝতে চাই নি। তাঁর কথা মনে হলে আমার বুক কেঁপে ওঠে, চোখের সামনে এই জগৎটা যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়। কতদিন তুমি শাস্তার কাছে আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছ, তোমার চোখের মিনতিভরা ভাষা থেকে কি তা আমি বুঝতে পারি নি? কিন্তু তবুও আমি যাই নি; ভয় হত, গেলে বুঝি আর ফিরে আস্‌তে পারব না। আমার সর্ব্বনাশকে আমি ভয় করেছি—আমার জন্য নয়, তোমার জন্য! জানি, তুমি আমায় কতখানি ভালবাস; আমি চলে গেলে তোমার যে কি দশা হবে, তা কল্পনা কর্‌তে গেলে আমি যেন পাগল হয়ে যেতাম। তাই শাস্তাকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। কিন্তু আমার চিত্তের হাহাকার তো থামেনি! কি জ্বালায় যে জ্বলেছি এতদিন, তা কেউ জানে না। কাকে আমি চাই—তোমাকে, না শাস্তাকেই—তা বুঝিনি, বুঝ্‌তে চাইনি। হাত ধরাধরি করে দুজনায় নির্ব্বাণের পথে চলেছি—এ মনোরম কল্পনা তুমি কতবার আমায় শুনিয়েছ। কি তোমার ইঙ্গিত, তা কি আমি বুঝতে পারি নি? কিন্তু আমি তো জানি, বুদ্ধশাসনের কি নিষ্ঠুর আকর্ষণ! হাত-ধরাধরির কথা বল্‌ছ? জানি না স্রোতে পড়লে তোমার হাতে আমার হাত থাক্‌বে কিনা!··· তোমার জন্যই আমার যত ভয়; আজ সে ভয় হতে তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ। আমাকে ছেড়েও যখন তুমি থাক্‌তে পার্‌বে, তখন তোমার জন্য আমার কোন ভাবনা রইল না! জীবনের সুখ-দুঃখ যত কিছু সব তোমার হাত থেকে যেমন নিয়েছি, আজ এই মুক্তির আনন্দও আমি তেমনি তোমার কাছ থেকেই নিলাম। স্বেচ্ছায় তুমি আমায় এ আনন্দের অধিকার না দিলে আমি তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়ে তা নিতে পার্‌তাম না। আজ আমার চিত্তের সমস্ত মেঘ কেটে গেল, আমার চারদিক আলোয় আলোময় হয়ে উঠল যে!—কি আনন্দ, কি অমৃতের আস্বাদন তুমি আমায় দিলে বন্ধু!"

বাস্তবিক, মানুষ কি যে চায়, তা সে নিজেই জানে না। ধর্ম্মদত্তার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে বিশাখের মনের মাঝে সব যেন ঘুলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। চীৎকার করে তিনি বলে উঠলেন, "একি.—এ কি বল্‌ছ তুমি ধর্ম্মদত্তা!—তুমি—তুমি আমায় ছেড়ে যাবে?"

অতি মধুর হেসে ধর্ম্মদত্তা বল্‌লেন, "এতদিন পরে আজ যে আমার ডাক এসেছে, আর তো থাক্‌তে পারি না।"

বিশাখ ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন, "আমার ঘরের লক্ষ্মী তুমি—তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে? এই সব ধন-সম্পদ্—"

প্রশান্তস্বরে ধর্ম্মদত্তা বল্‌লেন, "ছিঃ, বমির মত না এই ধনসম্পদ্ তুমি ফেলে যাচ্ছিলে? আমাকে বল্‌ছ তুমি সেই বমি কুড়িয়ে খেতে?"

বিশাখ ভগ্নকণ্ঠে বল্‌লেন, "তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না! আমি ঘর ছেড়ে কোথায়ও যাব না, তোমাকেও যেতে দেব না।"

ধর্ম্মদত্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "দেখ, অমন অবুঝ হয়ো না। তুমি মান আর না মান, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। আর কিছু না করে থাকি, ধর্ম্মের পথে তোমায় কোনও দিন আমি বাধা দিইনি। তোমার এই দুর্ব্বলতার সময় আমায় উদাসীন থাক্‌লে চল্‌বে না; আমি তোমায় ব্রতভঙ্গ কর্‌তে দেব না। এই ধনসম্পদ্ তোমায় ছেড়ে যেতেই হবে, আমাকেও তোমার ছাড়তে হবে। আজ স্বেচ্ছায় বল্‌ছি, তোমার ধর্ম্মদত্তাকে তুমি শাস্তার কাছে নিয়ে চল। কতদিন কত উপহার তাঁর চরণতলে নিয়ে গিয়েছ; আজ এই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ উপহার। আমাকে অনুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্‌ব। তুমি প্রব্রজ্যা

গ্রহণ না কর, কিন্তু এই ঘর তোমায় ছাড়তেই হবে! বল, তুমি আমার এই শেষ অনুরোধ রাখ্‌বে?"

"এ ঘর আমার শ্মশান হয়ে গেল যে!" বলে ধর্ম্মদত্তার বুকে মুখ লুকিয়ে বিশাখ বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। (ক্রমশঃ)

দায়ী

প্রভু আমার, বন্ধু আমার, সকল আমার তুমি—
কি জানায় আজ ভোরের আলো আমার ললাট চুমি!

এই যে হেরি বিশ্ব-ভুবন দুঃখ-সুখে ভরা—
ভেবেছিলাম কোথাও তো এর দাও নি তুমি ধরা!
গাছের পাতায় মর্ম্মরিয়া দুঃখের কথাই কয়,
বাতাস চলে নিশ্বসিয়া—শুধুই ব্যথা বয়।
তোমার কথা কয় না তো কেউ আপনা নিয়েই রয়—
কোথায় তুমি পাইনে সাড়া—খুঁজি ভুবনময়।

আজ নেহারি আলো হাওয়ায় এই যে জগৎ চলে—
প্রতিক্ষণেই তোমায় এরা মোর কথাটী বলে!
সবার পিছে আড়াল হয়ে আপনি তুমি রও—
আমায় দেবার যা কিছু ভার নিজেই তুমি লও।

যে বাণী আজ মধুর হয়ে আস্‌ছে আমার কানে,
কিম্বা যাহা পরুষ্ মহা বাজছে এসে প্রাণে—
সবার মুখে বারে বারে জানাও ইসারায়—
"আমার দেয়াই পাওনা যে তোর ওরাই বয়ে যায়।"

কর্‌ব দায়ী এমন বুঝি রইল না আর কেউ
যা পাব আজ জান্‌ব তারে সব ওপারের ঢেউ।

আরণ্যক

—:*:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

আশ্রয়বিহীন হয়ে মানুষ থাক্‌তে পারে না। বিশেষতঃ যারা দুর্ব্বল অপরের কাছ থেকে সহানুভূতির প্রত্যাশা তারাই করে বেশী। যারা প্রাণ খুলে আসে তোমার কাছে দুটো কথা বল্‌তে, তারা যদি কোন দিক দিয়ে আহত হয়, তাহলে তাদের চারদিক আঁধার হয়ে যায়। তোমার সহানুভূতি না পেয়ে, অপরের মনে তোমার প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব এসে পড়ে। তখন তারা তোমার কাছে এসেও মনের কথা মনেই গোপন করে রেখে দেয়। শুধু একটু মৌখিক কথার সহানুভূতির অভাবে এতখানি অপ্রিয়

হয়ে ওঠ তুমি মানুষের কাছে। একজন আর একজনকে ভালবাসে কেন?—সহানুভূতি পায় বলে।

নীতির শাসনে প্রবৃত্তির স্রোতকে দমন করা যায় না। এমন একটা সময় আসে, নিজের সর্ব্বনাশ করেও তখন আনন্দ হয়। শুধু মুখের কথায় তখন সংশোধন হয় না, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়—"তুমি যে সর্ব্বনাশের পথে চলেছ, এর চেয়েও যে জীবনের গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে।" সে অবস্থাটা এমনি, বাস্তবিকই প্রাণে প্রাণে কিছু চায় তারা, তাই শুধু খালি মুখের কথা দিয়ে তাদের ভুলানো যায় না। তাদের বাঁচাতে হলে, অবুঝ ছেলের ভার যেমন মা নিজ হাতে নেন, তেমনি সংযমী আচার্য্যকে নিতে হবে অবুঝ ছেলের ভার।

মানুষের অন্তরের ভাবই বাইরের পারিপার্শ্বি'ককে গড়ে তোলে। আবহাওয়ার মাঝে ভালমন্দ দুইই থাকতে পারে, কিন্তু অন্তরের সাম্য হতে গিয়ে কারও কাছে মন্দটাই তার অন্তরের টানে আকৃষ্ট হয়, কারও কাছে বা উজ্জ্বলটাই আগে ভেসে ওঠে। মোট কথা যেমনটী হবে; তেমনটী পাবে। অন্তর বিকল কর, বাইরটাও বিশৃঙ্খল লাগবে—অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হও, বাইরটাও নন্দনকানন হয়ে উঠবে।

কারও মন্দ দিকটা অপরের মনে আঁকতে গেলে আগে সেই কালরং দিয়ে নিজের মনটা চুবিয়ে নিতে হবেই; তাই সত্যের সাধককে অসদাচারীর প্রতি উপেক্ষার ভাব নিয়ে থাকতে হয়। আর যদি খুব বেশী শক্তি থাকে তো মৈত্রী ও করুণা নিয়ে তাকে তুলতে হয়। তা না করে সে ময়লাকে জগন্ময় ছড়িয়ে লাভ?

হৃৎপিণ্ড প্রতিক্ষণে স্পন্দিত হয় বলেই জীবন চলছে। স্থির হলেই তা মৃত্যু। যে মুহূর্ত্তে দুঃখের স্পন্দন সম্পূর্ণ নীরব হবে, জীবনের উন্নতি চেষ্টাও সেই মুহূর্ত্তেই থেমে যাবে। তাই কি তোমার কাম্য?

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রলয়প্লাবনের কথা কাহারও অবিদিত নাই। সহস্র সহস্র লোক নিরাশ্রয়। সম্ভবতঃ আগামী কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সেবাকার্য্য চালাইতে হইবে। এজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। যাঁহার যাহা সাধ্য, তাহাই লইয়া আর্ত্তসেবায় অগ্রসর হউন। কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করিলে নিম্ন ঠিকানায় তাহা পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও বিপন্নসেবায় ব্যয়িত হইবে। দাতার নাম ও দানের পরিমাণ এই পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশিত হইবে।

অধ্যক্ষ—সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)

বন্যার্ত্ত-সাহায্য

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ	৫০৲
উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম	২৮॥৶০
ঐ সংগৃহীত	১০৲
মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম	২৫৲
পশ্চিমবাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম সংগৃহীত	১৫॥৶০

[বিতং—শালবনী :—শ্রীনাথুমল মাড়বারী ২৲ শ্রীনিত্যানন্দ মাহাত ১৲ শ্রীমহেন্দ্রনাথ রাণা ১৲ শ্রীমাধবচন্দ্র ভকত ৵০। গ্রাঃ চন্দ্রকোনা রোড —শ্রীগগনচন্দ্র হাজরা ২৲ ; ১৲ টাকা করিয়া—জনৈক মাড়বারী, শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, শ্রীজানকীনাথ দালাল, শ্রীধরণীধর মাইতি ; ॥০ আনা করিয়া—শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীবীরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু ।০ ; খুচরা আদায় ৩।০ ।]

"ক"	৫৲
শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়	২৲
শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ	৩৲

(ক্রমশঃ)

দানপ্রাপ্তি

উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে—

(জেলা—কুচবিহার)

গ্রাঃ শালবাড়ী—শ্রীললিতমোহন বসুনিয়া ২০৲, শ্রীঝগড়ু দাস ১॥০ ; এক টাকা করিয়া—শ্রীঝড়ু দাস, শ্রীদীননাথ দাস শ্রীযোগলাল বসুনিয়া শ্রীদেবেন্দ্র নাথ অধিকারী শ্রীরামনারায়ণ পাইকার শ্রীহরিকান্ত পাইকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস শ্রীচেলু দাস শ্রীহোদ দাস শ্রীহাগুড়া দাস শ্রীমহেন্দ্রনাথ বর্ম্মন্ শ্রীকৈলাসচন্দ্র পাটোয়ারী শ্রীউপাসু রায় সরকার শ্রীরাজচন্দ্র সরকার শ্রীচেম্টা দাস শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র দেব শ্রীলক্ষ্মীময়ী বসুনিয়া খুচরা সংগৃহীত ১০৸১৫ । গ্রাঃ ছেদারঝাড়—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ বসুনিয়া ১০৲ শ্রীশলরাম পাইকার ৩৲ শ্রীআরকান আলী পণ্ডিত ২৲ ; এক টাকা করিয়া—শ্রীথছর দাস শ্রীপিসু দাস শ্রীশ্রীমন্ত দাস শ্রীরাজমোহন দাস শ্রীচাঁদিয়া দাস শ্রীসদাকৃষ্ণ দাস শ্রীনৃপেন্দ্র দাস শ্রীভবেশ্বর বর্ম্মণ শ্রীবিনন্দু দাস পাইকার শ্রীতারাচরণ দাস পণ্ডিত ; সংগৃহীত ২৶০ । গ্রাঃ শীতলাবাস—শ্রীপেসুল দান ৩৲ শ্রীথয়ের উদ্দিন বসুনিয়া ২৲ ; এক টাকা করিয়া—শ্রীগৌরহরি পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দ দাস রায় পণ্ডিত শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী শ্রীমহিমচন্দ্র সরকার ; সংগৃহীত ২৸৶০ গ্রাঃ ভাউরথানা—শ্রীকেদারনাথ পাইকার ২৲ ; এক টাকা করিয়া—শ্রীকাল্টা দাস পাইকার শ্রীসুদাই দাস শ্রীসুন্দর দাস শ্রীবাটাল বর্ম্মণ শ্রীবসন্তকুমার সরকার শ্রীইন্দ্রনাথ রায় শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সরকার শ্রীধনবর সরকার শ্রীদীননাথ প্রামাণিক শ্রীদুর্গামোহন প্রামাণিক শ্রীহুকুমচন্দ্র অধিকারী ; সংগৃহীত ২৶০ । গ্রাঃ ফুলেশ্বরী—শ্রীপ্রাণনাথ রায় সরকার ৪৲ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র পাইকার ২৲ শ্রীসূর্য্যপ্রসাদ রায় সরকার ২৲ ; এক টাকা করিয়া—শ্রীশ্রীমন্ত দাস শ্রীইন্দ্রনাথ দাস শ্রীটেপরা দাস পাইকার শ্রীবংশীধর দেবশর্ম্মা শ্রীঝাপড়ু দাস শ্রীভারতচন্দ্র সরকার শ্রীপতিরাম বর্ম্মণ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মণ শ্রীমহানন্দ বর্ম্মণ শ্রীপেট্রু নারায়ণ পাইকার শ্রীপিসু দাস শ্রীকমলাকান্ত পাইকার শ্রীকুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ ; সংগৃহীত ৩৵৫ । গ্রাঃ শিবপুর—এক টাকা করিয়া—শ্রীসীতেশ্বর দাস শ্রীহায়েচন্দ্র দাস শ্রীটৈল্যাদাস পাইকার শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস শ্রীরাধামোহন দাস শ্রীগোবর্দ্ধন রাউত মল শ্রীপর্ব্বনাথ দাস শ্রীযুক্তা মগী দাস্যা ; সংগৃহীত ৬।৴০ । গ্রাঃ গড়খোলা—এক টাকা করিয়া—শ্রীরসাল দাস পাইকার শ্রীখেলপ দাস শ্রীচন্দ্রকান্ত পাইকার ; সংগৃহীত ১৲ । (ক্রমশঃ)

পশ্চিম-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে—

শ্রীযুক্ত চৌধুরী গোলোকনারায়ণ প্রহরাজ জমিদার ৩৲ শ্রীবিদ্যাধর পাণ্ডা ১৲ । (বালেশ্বর হইতে)

(জেলা—মেদিনীপুর, মোহনপুর)

শ্রীযুক্ত চৌঃ বনবিহারী বার মহাপাত্র জমিদার ৫৲। এক টাকা করিয়া :—শ্রীকিশোরীরঞ্জন রায় মহাপাত্র বি এ, শ্রীবসন্তকুমার কর মহাপাত্র, শ্রীরঘুনাথ পাণ্ডা, শ্রীগদাধর পাল, শ্রীরামহরি দাস, শ্রীকালীচরণ মাইতি, শ্রীগোকুলচন্দ্র জানা, শ্রীহরপ্রসাদ পাণিগ্রাহী, শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতি । খুচরা সংগৃহীত—১।৶০ ।

(ক্রমশঃ)
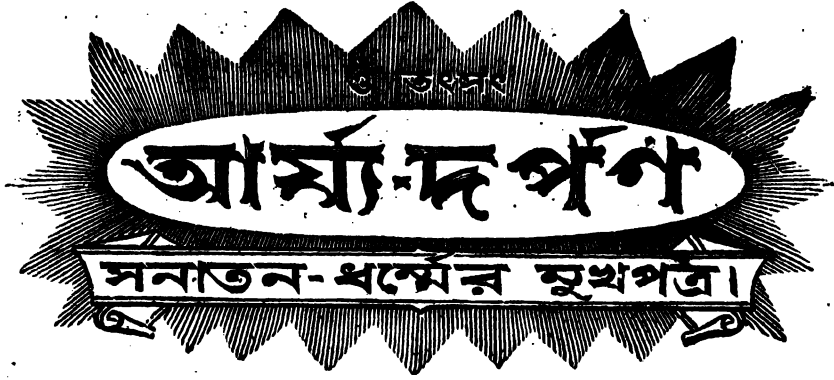
২২শ বর্ষ ১ম খণ্ড

ভাদ্র—১৩৩৬

সমষ্টি সং ২৩৩ ৫ম সংখ্যা

অগ্নয়ে

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৪।২

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

যো মর্ত্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা
দেবো দেবেষ্বরতির্নিধায়ি।
হোতা যজিষ্ঠো মহ্না শুচধ্যৈ
হব্যৈরগ্নির্ম্মনুষ ঈরয়ধ্যৈ ॥

মর্ত্ত্য মাঝে যে দেবতা অমৃতের আনেন বারতা,
অব্যাহত-গতি যাঁর সুরলোকে, যজনীয় হোতা,
হব্য-তৃপ্ত শিখা যাঁর আলোড়িছে মানবের চিত,
মহাতেজে দীপ্ত যিনি—তাঁরে হেথা করিনু নিহিত।

ইহ ত্বং সুনো সহসো নো অদ্য
জাতো জাতাঁ উভয়াঁ অন্তরগ্নে।
দূত ঈয়সে যুযুজান ঋষ্ব
ঋজুমুষ্কান্ বৃষণ শুক্রাঁশ্চ॥

জন্মিলে এ বেদি' পরে তুমি অগ্নি বলের কুমার;
সদ্যোজাত সুর-নর; তুমি দূত আজি সে দোঁহার।
রথে জুড়ি অশ্ব তব চলিয়াছ, প্রিয়দরশন!
জ্যোতির্ম্ময় সবে তারা, ঋজু-মুষ্ক, তরুণ-যৌবন।

গোমাঁ অগ্নেঽবিমাঁ অশ্বী যজ্ঞো
নৃবৎসখা সদমিদপ্রমৃষ্যঃ।
ইলাবাঁ এষো অসুর প্রজাবান্
দীর্ঘো রয়িঃ পৃথুবুধ্নঃ সভাবান্॥

ধেনু, মেষ, অশ্ব, আর অন্ন, ধন, যাহা কিছু চাই,
আমার এ যজ্ঞ হতে, হে অসুর, সবি যেন পাই;
দীর্ঘ ও অটুট হোক্, দিক মোরে পুত্র মনোমত,
চিরসাথী হোক্, তারে ঘিরে থাক সুধীরা সতত।

অত্যা বৃধস্নু রোহিতা ঘৃতস্নূ
ঋতস্য মন্যে মনসা জবিষ্ঠা।
অন্তরীয়সে অরুষ যুজানো
যুষ্মাঁশ্চ দেবান্ বিশ আ চ মর্ত্তান্॥

টুক্‌টুকে ঘোড়া দুটী—বলিহারি!—মনোবেগে ছোটে,
যার ঘরে রহে তার অন্নজল চিরকাল জোটে;
চলিয়াছ সে দুটীরে, জুড়ি রথে অরুণ-বরণ—
কভু যাও দেবলোকে, কভু যাও মর্ত্ত্যের ভবন।

যস্ত ইধ্‌মং জভরৎ সিষ্বিদানো
মূর্ধানং বা ততপতে ত্বায়া।
ভুবস্তস্য স্বতবাঁ পায়ুরগ্নে
বিশ্বস্মাৎ সীমঘায়ত উরুষ্য॥

কাষ্ঠভার বহি শিরে তোমা তরে ঘাম যার ঝরে,
তোমারি সেবার লাগি কত দুঃখ সহে অকাতরে—
তুমি তারে দাও ধন, রক্ষা কর অমঙ্গল হতে,
ক্ষতি তার কেউ যেন করিতে না পারে কোনো মতে!

অর্য্যমণং বরুণং মিত্রমেষাম্
ইন্দ্রাবিষ্ণু মরুতো অশ্বিনোত।
স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধা
এদু বহ সুহবিষে জনায়॥

অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, দেবমাঝে শতক্রতু আর,
তাঁরি সখা বিষ্ণু, তথা মরুতেরা, অশ্বিনীকুমার—
নিয়ে সবে এস, যথা হবিষ্যের পূর্ণ আয়োজন—
আছে তব ভাল ঘোড়া, ভাল রথ, আরো কত ধন!

যস্তে ভরাদন্নিয়তে চিদন্নং
নিশিষন্ মন্দ্রমতিথিমুদীরৎ।
আ দেবয়ুরিনধতে দুরোণে
তস্মিন্ রয়ি ধ্রুবো অস্তু দাস্বান্॥

তুমি যবে অন্ন চাও—সে কামনা পুরায় যে জন,
পিষে সোম, যজ্ঞভূমে অতিথিরে করে আবাহন,
দেবত্ব যাচিয়া অগ্নি সমিদ্ধিত করে নিজ ঘরে,—
অক্ষয়, উদার ধন লভি ধন্য হোক্ তব বরে।

———:*:———

সুরধুনী

——:*:——

"আমি দুরন্ত প্লাবন। মহারুদ্রের পিঙ্গল-জটাজালকম্পিনী আকাশগঙ্গার ঝর্ঝর ধারা আমি। আমি বিষমকে সুষম করি, কঠিন শিলাপট্টকে রেণু রেণু করিয়া গলাইয়া প্রাণের কোমল পঙ্করূপে বসুন্ধরার বুকে বিছাইয়া দিই। আমি মৃত্যু, আমি করুণা—আমি প্রলয়, আমি আনন্দ!"

এই কথাটাই জোর করিয়া বলা চাই। তপস্বীর জটাজালে এই দিব্যোন্মাদ-প্রমাথিনী সুরধুনীর ধারাকেই বন্দিনী করা চাই। ভয় হয়? কি জানি, কে কোথা হইতে অতর্কিতে তোমার মুখ হইতে এই কথাগুলি শুনিয়া পাছে মুখ টিপিয়া হাসে? কেবলি শঙ্কা করিয়া, প্রতি পদক্ষেপে শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনা শুনিয়া কেহ কোনও দিন মুক্তি-পথের যাত্রী হইতে পারে নাই। ভয় তোমাকে দূর করিতেই হইবে; যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ, অন্তরে যে অনুভবের নিবিড় আসঙ্গ পাইয়া দেহে-ইন্দ্রিয়ে-মনে অসহ্য পুলকের অভিঘাত সহিয়াছ, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যদি মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়, তাই পড়িতে হইবে। ভয় করিয়া, সদ্বিবেচনার দোহাই দিয়া, অর্ব্বাচীনের মূঢ় সমালোচনার মান বাঁচাইতে পিছু হটিয়া আসিবে কেন?

পাথরের উপরেও যদি সত্যের বীজ পড়ে তো পাথর ফুঁড়িয়া সে রস সঞ্চয় করিয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সত্য অমর, মর্ম্মান্তিক প্রত্যয়; শুধু কল্পনা নয় তো, দৈন্য-পীড়িতের নিষ্ফল সান্ত্বনা নয় তো!

এই সত্য কি? সত্য এই—তুমি তুচ্ছ নও, কাঙ্গাল নও, পঙ্গু নও! তুমি সব করিতে পার, কেননা তুমি সবার মাঝে। এই খর্ব্বদেহের পানে তাকাইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতেছ? মনের সঙ্গে যুঝিয়া যুঝিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া আজ নিজের অসামর্থ্যই কি তোমার কাছে বড় হইয়া উঠিল? কিন্তু আমি তো তোমার দেহ-মনের বিজয়-গাথা গাহিতে আসি নাই। আমি জয়ধ্বনি তুলিতেছি, দেহ যাঁহাকে বন্দী করিতে পারে না, মন যাঁহার জ্যোতিঃতে স্তিমিত হইয়া যায়—সেই আত্মার। অণুতে যিনি অণুপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছেন, মহতে যিনি মহীয়ান হইয়া আছেন, নীরন্ধ্র আলোক-সম্পাতের দ্বারা নিখিলকে উদ্ভাসিত করিয়া যিনি স্ব-মহিমায় জাগিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকেই তোমাতে আমাতে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি, হে মুহ্যমান, হে ব্যথাতুর, উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!—ওঠ, জাগ! জগতের সমস্ত সংবাদ তুমি এখনও পাও নাই। সব ঘর খুঁজিয়াছ, কেবল আপন ঘরই খুঁজিয়া দেখ নাই। ওই আদিত্যবর্ণ পুরুষেরা তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহাদের নিকট যাও, তাঁহাদের আলোকে স্নাত-পূত হইয়া জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? আগুনের ছোঁয়াচে আগুন হইয়া ফিরিয়া আসিবে, দিব্য জ্যোতিতে ঝলমল হইয়া ফিরিয়া আসিবে! এই দীনহীন কাঙ্গাল তুমিই তখন মহাসত্যের অভ্রভেদী শিখরে দাঁড়াইয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিবে, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!—মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদেরি মত!"

এই প্লাবন, এই বন্যা। মরুভূমিরও অন্তস্তলে রসের ফল্গুধারা বহিয়া চলিয়াছে। পিপাসিত পান্থ! পার্থসারথির ইঙ্গিত অনুসরণ কর। আকর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া তোমারই হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দাও তোমার তীক্ষ্ণ সায়ক ভোগবতী ধারার সন্ধানে! সমস্ত জ্বালা মিটিয়া যাইবে, সুরধুনীর প্লাবনে মরুভূমিতে নন্দনকাননের সৃষ্টি হইবে।

চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস, শুধু নাস্তিকতা! করামলকবৎ যাঁহাকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, শ্বাসের সঙ্গে প্রাণরূপে যাঁহাকে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া লইতেছি, আলোকরূপে রোমকূপে যাঁহাকে অজস্র ধারায় পান করিতেছি, মনের উচ্চাবচ বিচিত্র কল্পনায় যে অনতিবর্ত্তনীয় সত্তাকেই বারবার রূপায়িত করিয়া তুলিতেছি—তিনি নাই, কি করিয়া এ কথা বলি? কি করিয়া বলি, তিনি আমার মাঝে নাই, তোমার মাঝে নাই, এই তৃণাঙ্কুরে নাই, এই ক্ষুদ্রকীটে নহে, এই ধূলিকণায় নাই?

বীর্য্যহীন এই অবিশ্বাস! যদি দেখিতাম, এই অবিশ্বাসের ভিত্তির উপর তুমি মৃত্যুঞ্জয় মহাসৌধ গড়িয়া তুলিয়াছ; যদি বুঝিতাম, এই অবিশ্বাস তোমাকে শান্তি দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, মানুষকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে; তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে তোমার এই নাস্তিকতার পতাকা বহন করিয়া চলিতাম। কিন্তু কই? নিজকে ভূমা হইতে বিচ্ছিন্ন দীন হীন কাঙ্গাল ভাবিয়া, অথর্ব্ব জড় কল্পনা করিয়া কী সোয়াস্তি পাইয়াছ? যে পারিপার্শ্বিক উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া তোমাকে ডুবাইতে আসিতেছে, তাহার বিভীষিকা হইতে আপনাকে কতটুকু বাঁচাইতে পারিয়াছ?

হে শিবস্বরূপ! ফুৎকারে উড়াইয়া দাও এই অশিব কল্পনার কুহেলিকা। আনন্দের নির্ঝর তুমি, দিব্যদ্যুতিতে প্রভাস্বর তুমি। আপনাকে আমি যদি ছোট বলিয়া জানিতাম, তাহা হইলে তোমারও ক্ষুদ্রত্বের কল্পনায় সায় দিতে পারিতাম। আমাকে আমি মহান্ রূপে অনুভব করিতেছি বলিয়াই, তুমি যে হও, যা হও—তোমাকেও আমি মহৎ না ভাবিয়া পারিতেছি না। তুমি যে আমার দোসর! রূপের সীমারেখা তোমার চারিদিকে, সে সত্যকে অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু অরূপের অসীম ব্যঞ্জনাও যে সবিতার ছটামণ্ডলের মত তোমায় ঘিরিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি! হে বন্ধু, তোমার ওই সীমার আবর্ত্তনে সুবঙ্কিম রূপরেখা আমার চোখে বড় সুন্দর ঠেকে। কেন জান?—আমি যে ওই সীমার পরপারেই দেখি সীমাহারার অনন্ত প্রসার আর সেখানে যে অনুভব করি, তুমি আর আমি এক। তাই তুমি যে হও না কেন, যা হও না কেন, তোমায় আমি সত্যস্বরূপ বলিয়া জানি, আমার মত করিয়াই তোমায় ভালবাসি! সেই মহান্ত পুরুষের জ্যোতির্লেখা তোমায় ছুঁইয়া আছে বলিয়াই তোমার সব আমার কাছে সুন্দর;—তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার অশ্রু সুন্দর—তোমার দৈন্য সুন্দর, তোমার ঐশ্বর্য্য সুন্দর—তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর!

আবারও বলি, অবিশ্বাস করিও না, আশঙ্কায় নিজকে দুর্ব্বল করিও না। একজন মানুষ যে অনুভব পাইয়াছে, আর এক জনও তাহা পাইতে পারে এবং নিশ্চয়ই পাইবে, কেননা সমস্ত মানুষের মূলেই যে এক ছাঁচ। মানুষের অন্ধকার পথে বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাইয়া দাও, সংসারাবর্ত্তে সে তলাইয়া যাইতেছে, তোমার সবল হস্তের অবলম্বন তাহাকে দাও। চারিদিকে আজ শোনাও কেবল আশার বাণী, বীরত্বের কাহিনী, দীপ্তির জয়-গাথা। মানুষ তাঁহাকে পাইয়াছে, এখনও পাইতেছে, চিরকাল পাইবে—এই অমৃতের বার্ত্তাই ঘরে ঘরে বহন করিয়া লইয়া যাও।

কোথায় তাঁহার প্রাপ্তির নিদর্শন? কোথায় আত্মার বিজয়-মহিমা?—যেখানে ত্যাগ, যেখানে তপস্যা, সেখানে আনন্দ। মানুষ আপন স্বার্থ লইয়া নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে পারে নাই, পরের জন্য আপনাকে সে বিসর্জ্জন দিয়াছে, ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ভাবের জন্য বস্তুকে অস্বীকার করিয়াছে এবং এই ত্যাগ ও তপস্যার দুঃখের মাঝেও সে অনাবিল আনন্দ অনুভব

করিয়াছে। এই তো আত্মার মহিমা—তাঁহাকে পাওয়ার এই তো পরিচয়। পাওয়া তো ধাঁ করিয়া পাওয়া নয়; তিল তিল করিয়া তাঁহাকে পাওয়া—উষার আলোকের মত, ফুটন্ত কলিকার মত। ধীরে ধীরে এই জগৎ তোমার সম্মুখে বিবর্ত্তিত হইতেছে—সুন্দর হইতে সুন্দরতর, দুর্নিবার প্রাণের আবেগে কম্পমান, অগণিত মঙ্গল-প্রচেষ্টায় ব্যাকুলিত; একবার সমগ্র দৃষ্টি নিয়া ইহার পানে চাহিয়া দেখ, মনে হয় না কি, বিশ্বব্যাপী এই ক্রমবিবর্ত্তন ভূমারই আনন্দ-বিলাস? এই জগৎ অহরহ ব্রহ্মের দিকেই প্রচোদিত হইতেছে না কি?

নিজের দিকে না চাহিয়া যদি জগতের দিকেই তাকাও, তাহা হইলেও তো দেখিতে পাও—ইহার সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরই বিজয়, প্রাণেরই উল্লাস, উৎসর্গেরই মহিমা! কিন্তু শুধু এই পরাক্-দৃষ্টি দিয়া আত্মার মহিমা আমি তোমার কাছে প্রমাণ করিতে চাহি না। যে সন্ধানী-আলো জগতের উপর ফেলিতেছ, পরাবর্ত্তিত করিয়া একবার তাহাকে নিজের উপরেও ফেল। মর্ম্মভেদী দৃষ্টি নিয়া একবার নিজের দিকেও তাকাইয়া দেখ দেখি, নিজকে চিনিতে পারিতেছ কিনা? তুমি কি শুধু দুঃখেই জর্জ্জরিত? তোমার অবসর-মুহূর্ত্তকে সুধাধারায় প্লাবিত করিয়া অকারণ আনন্দের বন্যা কি কখনো চিত্তের দুই কূল ছাপাইয়া যায় না? মুহূর্ত্তের জন্যও কি কখনো মনে হয় না, বিচিত্র সংঘাতে সংক্ষুব্ধ এই জগৎ যেন এক সুনিপুণ চিত্রকরের সুকুমার বর্ণ-বিন্যাস মাত্র? কোনও দিন কি অনুভব কর নাই—সুখ অতি অনায়াস, জীবন অতি সহজ, মরণ বড় মধুর? বন্ধু, এই বিক্ষিপ্ত মুহূর্ত্তগুলিতেই তুমি তোমার সন্ধান পাইয়াছিলে; ক্ষণিকের বিলাস মনে করিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছ, জান নাই এই ক্ষণিকার দীপ্তিই ছিল চিরন্তনের অঙ্গদ্যুতি।

অমৃতানুভবের এই ক্ষণিক মুহূর্ত্তগুলিকে একত্র কর। মুহূর্ত্তের জন্যও যাহাকে আস্বাদন করিয়াছিলে, তাহাকে মুহূর্ত্তের চমক মনে করিয়া উপেক্ষা করিও না. চিত্তে হতাশা আনিও না। অতীতের স্মৃতিকে মথন করিয়া এই পুণ্য মুহূর্ত্তগুলিকেই উদ্বুদ্ধ কর। এক মুহূর্ত্তের জন্য যাহা আসিয়াছিল, তাহা চিরন্তনও হইতে পারে, এই বজ্রদৃঢ় প্রত্যয়ে নিজকে প্রতিষ্ঠিত কর। ইহাই সাধন-বীর্য্য। অরণিতে আগুন লুকান রহিয়াছে, সদাচারে নির্ম্মলীকৃত ওজঃশক্তিদ্বারা তাহাকে মথন করিতে হইবে। তীব্র ভাবনা চাই, আর কিছুই নয়; জড় ইন্ধনকে সন্ধুক্ষিত করিয়া বহ্নিজ্বালা আপনা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িবে।

ভয় পাইও না, পিছু হটিও না; 'আজ নয়, কাল' বলিয়া এই অমৃতানুভবকে ঠেলিয়া রাখিও না। "ইহ চেদবেদীঃ, অথ সত্যমস্তি; ইহ চেন্নাবেদীঃ, মহতী বিনষ্টিঃ!"—এই এখানে, এই জীবনে যদি তাঁহাকে জানিতে পার, তবেই না বুঝিব, সত্যের যথার্থ পরখ—তবেই না বলিব, হাঁ তিনি আছেন, আমি আছি। আর যদি এখানে তাঁহাকে না জানিতে পারিলে, তবে একেবারে মহাবিনাশের মাঝে যে তলাইয়া গেলে!

মানুষ তাঁহাকে পাইয়াছে; আমি মানুষ, আমিও পাইব।—কত বড় ভরসার কথা, কত বড় সাহসের কথা! জান না, যাহারা পায়, কি নিদারুণ তাহাদের বিলাইয়া দিবার ব্যাকুলতা। এই অবিদ্যা-মূঢ়, কাম্যকর্ম্মে বিচেষ্টমান জগতের অন্তরালেই গূঢ় হইয়া রহিয়াছে সেই আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় লোক, করুণার অজস্র ধারা ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে এই জগতের পানে—শুধু বিশ্বাস কর, শুধু প্রাণ ভরিয়া তাহাকে চাও, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় উপচিয়া পড়িবে!

অন্ধকারের বুকে দাঁড়াইয়া চাহিয়া আছি প্রাচীর তোরণ পানে—নবযুগের উষার আগমনী আলোকের স্বর্ণতন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে না কি? দেখিতেছি, ধীরে ধীরে অন্ধকার নির্ম্মল হইয়া উঠিতেছে,

উদয়াচলের শুভ্র-নীল মহিমা আকাশের গায়ে অবরুদ্ধ আবেগের মত তরঙ্গায়িত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারপর সেই অচলশীর্ষ হইতে—"জীব অসুর্ন আগাৎ—অপ প্রাগাৎ তম—আ জ্যোতিরেতি"—আনন্দে কম্পমান আমাদের প্রাণের কিরণ ওই ছুটিয়া আসিল - অন্ধকার দূরে হটিয়া গেল—ওই আসিল দিগন্ত-বিথারী জ্যোতির প্লাবন! নব-প্রভাতে সবিতার আশীর্ব্বাদ আমার ললাট চুম্বন করিয়া ভ্রূমধ্যে প্রজ্ঞানেত্রকে বিকশিত করিয়া দিল, তনুর প্রতি অণুপরমাণু আনন্দে চঞ্চল হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিল! চারিদিকে শুনি শুধু প্রাণের জয়ধ্বনি—"উদীর্ধ্বং—উদীর্ধ্বং"—ওঠ—ওঠ – দুরন্ত প্রেরণায় আপনাকে কাঁপাইয়া তোল;—"আ জ্যোতিরেতি"—ওই দেখ জ্যোতির্ম্ময়ীর আবির্ভাব!

নিত্য, সত্য, অবিনাশী এই আনন্দ—অদীন অক্ষুব্ধ, অমৃত এই প্রাণ। মহাসিন্ধুর মত আমার মাঝে এ গর্জ্জিয়া উঠিতেছে – ইহাকে আবার প্রমাণ করিব কি দিয়া? দীপালোক দিয়া সূর্য্যরশ্মিকে দেখাইতে যাইব কি?—শুধু আমার তো নয়, হে বন্ধু, তোমারও হৃৎপিণ্ডের তালে তালে শুনিতেছি ওই মহাসিন্ধুর ভৈরব গর্জ্জন। তুমি আমি যে এক! মূঢ় বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিও না, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ-চেষ্টায় তোমার অধর যেন স্ফুরিত না হয়। স্তব্ধ হইয়া যাও—নিথর হইয়া যাও! এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজকে ভুলিয়া যাও, এই জগৎ ভুলিয়া যাও, কর্ত্তব্যের দায় দূরে ছুঁড়িয়া ফেল, অনন্ত নীলাকাশে উৎসারিত প্রভাতের নির্ম্মল আলোকে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া বল, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্—আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ সেই মহান্ত পুরুষকে আমি জানিয়াছি! বল, "তেজো যত্তে, রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি—যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ, সোঽহমস্মি"—যাহা তোমার তেজ, যাহা কল্যাণতম রূপ, তাহাই যে তোমার দেখিতে পাইতেছি বন্ধু! ওই—ওই—ওই যে পুরুষ, সে-ই আমি, সে-ই আমি!

প্রতি প্রভাতে অন্ধকারের বুক চিরিয়া এমনি করিয়া আলোক-ধারা উৎসারিত কর, আপনার মাঝে আদিত্যবর্ণ পুরুষকে আবিষ্কার কর। তারপর তাঁহার সখ্য, তাঁহার সৌমনস্যকে কর তোমার দিনব্যাপী কর্ম্মাভিযানের সঙ্গী। জীবনের আদি-অন্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠুক।

—

তীর্থ-সঙ্গমে

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

প্রথম পর্ব্ব

নরবিগ্রহে এবং নারীবিগ্রহে বিবর্ত্তমান হে অনন্তস্বরূপ!

প্রশ্ন করলে, অল্প বয়সে ছেলেপিলেরা মারা যায় কেন? এ প্রশ্নের তন্ন-তন্ন করে জবাব দেবার সময় এখন হবে না; তাই আমরা আভাসে শুধু কিছু বলে যাব।

এই ধর, কারু লেখা একখানা বই। বইখানিতে ইংরেজী কথা অনেক আছে, মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকও কিছু কিছু তোলা আছে। বোধ হয় জান, ইংরেজী লেখা যায় যে কলম দিয়ে, সে কলমে সংস্কৃত লেখা চলে না। গ্রন্থকার যখন ইংরেজী হরফ লেখেন, তখন যে কলম ব্যবহার করেন,

সংস্কৃত লেখবার সময় তাঁকে তা পাল্টে নিতে হয়। এমনি করে কলমের অদল-বদল করে লেখা চালাতে হয়। তেমনি যতদিন এই জগতে এই দেহ নিয়ে আছ, ততদিন এটাকে ওই কলমের মতই ব্যবহার কর্‌ছ। যতদিন এই দেহ দিয়ে তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, ততদিনই এটা নিয়ে কারবার। যখন দেহটা জীর্ণ হয়ে রোগা হয়ে পড়ে, একে দিয়ে আর তোমার কাজ চলে না, তখন এটাকে ছেড়ে দাও, আবার আর একটা দেহ গ্রহণ কর। এই যেমন কাপড়-চোপড়গুলো পুরোণো হয়ে গেলে সেগুলো ছেড়ে আবার নূতন কাপড় পর। এর মাঝে তো আর বিভীষিকা নাই কিছুই—এ তো স্বাভাবিক!

শিশুরা মরে কেন? মানুষের নানা রকম কামনা থাকে। এমন একটা সময় আসে, যখন এক রকম কামনা রূপান্তরিত হয়ে আর এক রকম কামনা হয়ে দাঁড়ায়। ধর, একটা লোক আমেরিকার কোনও একটা সহরে অনেক দিন বাস করছে। আমেরিকায় থেকেও সে এমন সমস্ত পুথি-পুস্তক প'ড়্‌ল, এমন সব সাহিত্যের আলোচনা কর্‌ল যে, তার ভিতরের ভাব-ভঙ্গী সব যেন বদ্‌লে গেল। ধর, মনে-প্রাণে সে একজন প্রাচ্য-বিদ্যার পণ্ডিত হয়ে দাঁড়াল, সে যেন হিন্দু হয়ে গেল। আমেরিকায় থেকে এখানকার চাল-চলন অনুযায়ীই সে চল্‌ছে বটে, কিন্তু ক্রমে তার বাহ্যিক ব্যবহারের সঙ্গে তার অন্তরের ভাবনা-চিন্তা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনও সামঞ্জস্যই রইল না। সে আর তাহলে আমেরিকার মানুষ নয়; সে এখন ভারতের লোক, তাকে আবার ভারতবর্ষে জন্মাতে হবে। আবার ধর, আমেরিকার একজন বড় লোককে তার ভারী ভাল লেগেছে, তার ইচ্ছা, সে যেন সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই যে আমেরিকার একজন বড় লোকের আসঙ্গলিপ্সা—ধর সানফ্রন্‌সিস্কোর মেয়রের সঙ্গে থাকবার ইচ্ছা—এ যেন ভারতবর্ষে জন্মাবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবলতর হল না। এখন তার প্রথম কামনাটাও পূরণ হবে, আবার দ্বিতীয় কামনাটাও পূরণ হবে। দুয়ের সামঞ্জস্য হবে কি করে? গতিক এমন হল যে যাকে সে এত ভালবাসে, তার সঙ্গে মিলবার যেন তার কোনও উপায়ই রইল না। কাজেই তাকে মরার পর আবার হয়ত এই মেয়রের ছেলে হয়ে জন্মাতে হল বা যে বড় লোক তাকে মুগ্ধ করেছিল, তারই কোনও আত্মীয় হয়ে জন্মাতে হল। যে লোকটী তাকে এমনি করে আকর্ষণ করেছিল, তার সঙ্গে থাক্‌বার মেয়াদ যতদিন না ফুরাল, ততদিন সে তার আত্মীয় হয়েই রইল। তারপর ভারতবর্ষে জন্মাবার যে বাসনা সঞ্চিত ছিল, তা পূরণ কর্‌বার জন্য আবার তাকে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ কর্‌তে হল। এই জন্যই মানুষ ছেলে-বেলায় মরে।

এই যে একজন বড় লোককে পিতা বা মাতারূপে পাওয়ার ইচ্ছা, এ যেন ইংরেজী হরফে লেখা একটা প্রকাণ্ড বইয়ের মাঝে এক ছত্র সংস্কৃত লেখা। অকালে যে সমস্ত শিশু মরে, তারা যেন বইয়ের মাঝে দু'ছত্র ভিন্ন ভাষার উদ্ধরণ (quotation); অথচ সমস্তটা বই ওই ভাষায় লেখা নয়।

*

"পাপ আর পুণ্যের মাঝে তফাৎ কি, তা বুঝিয়ে বলুন না!"

ধর একটা মই। মইটা বেয়ে যদি ওপরে উঠে যাও, তাহলে সেটা হল পুণ্য; আর যদি নীচে নেমে যাও তো সেটা হল পাপ।

গণিতশাস্ত্রে পরস্পরের আপেক্ষিক কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধান্ত আছে। আলাদা আলাদা ধরে তারা বিধি না প্রতিষেধ, তা বুঝবার উপায় নাই। তাদের বেলায় বিধি আর প্রতিষেধ পরস্পরের অপেক্ষা রেখে প্রবর্ত্তিত হয়।

বেদান্তমতেও পাপ-পুণ্য পরস্পরসাপেক্ষ সংজ্ঞা মাত্র। বল্‌তে পার না যে এইখানে এসে পাপের শেষ হল, এর পর থেকে পুণ্যের সুরু।

একটা রেখাতে এই একটা বিন্দু আছে, তার নাম দিলাম 'ক'। এখন এই রেখাটা ধরে 'ক'-বিন্দুর এই দিক দিয়ে চল্‌তে থাক্‌লে যে গতিকে বল্‌ব অনুকূল, আবার বিপরীত দিকে চল্‌লে তাকেই বল্‌ব প্রতিকূল। কিন্তু 'ক'-বিন্দুর এপাশ কি ও-পাশ ধরে একটা বিন্দুর অবস্থানকেই আমরা পর্য্যায়-ক্রমে অনুকূল বা প্রতিকূল বলে ধরে নিতে পারি তো। তেমনি একই কর্ম্মকে অবস্থাভেদে পাপ বা পুণ্য বলা যেতে পারে। যদি একটা বিশিষ্ট কর্ম্মকে আশ্রয় করে তুমি সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হও, তাহলে তা পুণ্য; সেই কর্ম্মকেই আশ্রয় করে যদি তুমি সত্য হতে পরাঙ্মুখ হও তো তা পাপ। বিবাহ করে দাম্পত্য প্রেমকে যদি বিশ্ব-প্রেমে পরিণত করতে পার, যে বিশ্বজ্যোতিঃ নিখিলকে আলোকিত করে আছে, তার সাক্ষাৎ পাও, তো বিবাহ তোমার পক্ষে পুণ্যকর্ম্ম। আর এই বিবাহের ফলেই যদি তুমি বিশ্বপ্রেম বা বিশ্ব-জ্যোতিঃ হতে দূরে সরে যাও, তাহলে বিবাহ তোমার পক্ষে বিষ, বিবাহ একটা অভিশাপ।

বেদান্ত বলেন, পাশব-কামনার রাজ্য দিয়ে সকলকেই একবার যেতে হয়। এই হচ্ছে কর্ম্মের বিধান। সবাই বিকাশের পথেই চল্‌ছে, ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে।

কতকগুলি লোক সবেমাত্র পাশব দেহ ছেড়ে মানুষের দেহ পেয়েছে; কাজেই তাদের মাঝে পাশব-প্রবৃত্তিই প্রবল থাক্‌বে। তারা বাঘ, শিয়াল, কুকুর বা শূয়রের দেহ এইমাত্র ছেড়ে এসেছে, কাজেই ওদের সংস্কার তাদের মাঝে থাক্‌বেই তো। জড়ধর্ম্মের আইন হচ্ছে (law of inertia) এই, জড়ে গতিসঞ্চার হলে সমভাবে, সমরেখায় তা চল্‌তেই থাক্‌বে।

যদি জড়ধর্ম্মের এই অভিনিবেশ না থাক্‌তো জগতে, তাহলে সব ছন্নছাড়া হয়ে যেত। জড়-ধর্ম্মের ক্রিয়া না থাক্‌লে, যারা পশুজগত থেকে এসেছে, তারা পশুই থেকে যেতো। নদী বয়ে যাচ্ছে একটানা প্রবাহে, এজন্য যেমন তাকে দোষী কর্‌তে পারি না, এই সমস্ত মানুষকেও তেমনি দোষ দিতে পারি না। তাদের পাপী বলে ঘৃণা কর্‌বার কোনও অধিকার নাই আমাদের! যাদের পাষণ্ড বল্‌ছি, হিংসুটে বল্‌ছি, তাদের ঘৃণা করব কি বলে? বরং তথাকথিত পাপীকেই ভালবাসার অধিকার আছে আমাদের। যীশু বলেছিলেন, পাপীকে ভালবাস। বেদান্তও তাই বল্‌ছে; বেদান্ত দেখিয়ে দিচ্ছে, পাপীকে ঘৃণা করবার কোনও সঙ্গত কারণ আমাদের নাই।

এই সমস্ত পাষণ্ডের কি নিজেদের কোনও লক্ষ্য নাই? তারাও যে এগিয়ে যাচ্ছে। কেবল জড়-ধর্ম্মের আইনই তো জগৎকে শাসন কর্‌ছে না। মানুষকে যদি বাঁচতে হয় তো জড়ত্বকে অতিক্রম কর্‌তেই হবে।

বেগ কি? আদিম জড়ত্বের মাঝে পরিবর্ত্তন নিয়ে আসাই হল বেগ বা বলের পরিচয়। যে রেখায় বেগ চল্‌ছিল, তার যদি কোনও পরিবর্ত্তন না হয় তো বুঝতে হবে এখানে বলের অভাব, প্রাণের অভাব। কাজেই যারা পাপী, তারা যে বেঁচে আছে, এই কথা প্রমাণ কর্‌তে হলেও তাদের প্রাণ-শক্তির পরিচয় দিতে হবে। আর সে পরিচয় হচ্ছে জড়ত্বের অভিনিবেশ হতে, পাশব-প্রবৃত্তির অন্ধ-আবেগ হতে আপনাকে মুক্ত করা। প্রবৃত্তির যে বেগ তাদের মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে, তার পরাবর্ত্তন ঘটাতেই হবে তাদের। এইটা ঘটানোই হচ্ছে অধ্যাত্মশক্তির পরিচয়; এই শক্তি

দিয়ে স্বভাবের ঝোঁকের বিপর্য্যয় ঘটাতেই হবে।

এইখানে 'স্বভাব' কথাটা প্রয়োগ করতে হল। 'স্বভাব' কাকে বলে, তা বুঝিয়ে বলা দরকার; কেননা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক এই কথাটাকে ভুল বোঝে। আর এই 'স্বভাবের' অপব্যাখ্যার আওতায় যত কিছু পাপ আর দুঃখ প্রশ্রয় পায়, পুষ্ট হয়।

কেউ কেউ মনে করে, মনের মাঝে যা কিছু পাশবিক প্রবৃত্তি এবং কামনা জাগে, তাই বুঝি 'স্বাভাবিক।' তারা বলে, "দাও ইন্দ্রিয়-লালসার তুরঙ্গমকে ছেড়ে! সংযমের বল্গা ছেড়ে দাও—ও তো আমাদের 'স্বভাব'কেই চেপে রাখে শুধু। আমরা মুক্ত হব।" কিন্তু এ মুক্তি অর্থে সংসার-জীবন, পশুর জীবন।

ছেলেদের একটা খেলনা-গাড়ী পূরোদমে ছুটে যাচ্ছে। যে কুণ্ডলীর (spring) জোরে ওটা চল্‌ছে, তার দম ফুরিয়ে গেলেও গাড়ীটা কিছুক্ষণ চল্‌বেই। কেন?—কারণ, ওই দিকে ঝোঁক নিয়ে চলাটাই হচ্ছে গাড়ীটার পক্ষে স্বাভাবিক, কেননা তার মাঝে যে বেগ রয়েছে, সে কেবল ওই দিকেই তাকে ঠেল্‌ছে কিনা। এটা স্বাভাবিক; অর্থাৎ কিনা, স্বভাব মানে জড়ধর্ম্মের অভিনিবেশ (Inertia), আর এই জড়াভিনিবেশই গাড়ীটাকে ওই রাস্তায় ঠেল্‌ছে। শূন্যে একটা ঢেলা ছুঁড়ে মারলে সেটা এই অভিনিবেশের তাড়নে যেতেই থাক্‌বে, যেতেই থাক্‌বে—এইটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। ছেলেরা লাটুম ঘোরায়; লাটুমটা ঘুরতেই থাকে, ঘুরতেই থাকে, কেননা তার পক্ষে ঘোরাটাই স্বাভাবিক।

যখন পশুর দেহে ছিলে, তখন তোমার প্রবৃত্তির একদিকে ঝোঁক ছিল। পশুর দেহে পাশব-প্রবৃত্তি পূরণের দিকেই ঝোঁক থাক্‌বে—এ তো স্বাভাবিক। তোমার পশুদেহে পাশব-প্রবৃত্তি স্বভাবেরই দান। তখনকার প্রবৃত্তির খেলা সর্ব্বতোভাবে তোমার উপযোগী, কেননা ওর চর্চ্চা করেই তুমি উন্নত হয়েছ; তখন ওই প্রবৃত্তিই তোমার ধর্ম্ম। ওদের আশ্রয় করেই তুমি বিবর্ত্তনের এক ধাপ উঠেছ, লভ্য জ্ঞান লাভ করেছ।

কুকুর কুকুরামী করে বলে তাকে কেউ পাষণ্ড বলে না; শূয়র শূয়োরামী করে বলে সে তো পাষণ্ড নয়।

তারপর যখন নরদেহ পেলে, তখন পশুযোনিতে যে সমস্ত বাসনা-কামনায় অভ্যস্ত ছিলে, সেগুলোর অনুবৃত্তি তোমার মাঝে থাকা তো স্বাভাবিক। মানুষের দেহে থেকেও তুমি পশুর কাজ কর, স্বভাবের প্রেরণাতেই, তোমার মাঝে জড় ধর্ম্মের অভিনিবেশ আছে বলে। পশু দেহে যে সমস্ত কাজ তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, এখন তারই জের চল্‌ছে। কাজেই স্বভাব মানে জড়ত্বের অভিনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু জড়ত্ব তো তোমার বাস্তব স্বরূপটা ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে না। তোমার মাঝে যে মরে গেছে, পচে গেছে, জড়ত্ব তারই নিদর্শন; এ তোমার ব্রহ্মভাবকে প্রকাশ করে না।

মানুষ যখন এই জড়ত্বকে পরাভূত করে, তখনই সে যথার্থ মানুষ। পাশব-প্রবৃত্তি পশুর পক্ষেই স্বাভাবিক; অথবা যে সমস্ত মানুষ পশু-যোনি হতে সদ্য মানুষ হয়েছে, তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক। তারাও কিছুদূর পর্য্যন্ত এই পাশব-প্রেরণার অনুসরণ কর্‌তে পারে বটে; কিন্তু তার পর তাকে ছেড়ে তাদের ওপরে উঠ্‌তেই হয়।

শোন একটা গল্প বল্‌ছি। এই প্রসঙ্গে গল্পটা খাট্‌বে ভাল। পূর্ব্ব-ভারতে তুলসীদাস নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি রামেরই পূর্ব্বপুরুষ। তুলসীদাস তাঁর স্ত্রীকে ভারী ভালবাস্‌তেন; বোধ হয় আর কেউ স্ত্রীকে এত ভালবাসেনি। একবার তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ী গেলেন। তুল্‌সীর বাড়ী হতে তাঁর শ্বশুর-বাড়ী সাত-আট মাইল দূরে ভিন-গাঁয়ে।

স্ত্রীর বিরহ তাঁর সহ্য হল না, তাই তিনি বাড়ী ছেড়ে তার সন্ধানে ছুটলেন। স্ত্রীর বাপের বাড়ী যাওয়ার কথা যখন শুনেছেন, তখন রাত প্রায় দুপুর; কিন্তু সেই দুপুর রাতেই তিনি একেবারে উন্মাদের মত বিহ্বল হয়ে বাড়ী হতে ছুটে বেরুলেন। দুই গাঁয়ের মাঝে একটা নদী, তাতে প্রবল স্রোত, রাতের বেলায় নদী পেরুনো ভয়ানক শক্ত, বিশেষতঃ এত রাতে পার করে দেবার লোক পাওয়া যাবে কোথা? নদীর পারে তুলসী একটা পচা-গলা মড়া পেলেন। স্ত্রীর বিরহ তাঁকে এমনি আকুল করেছে, এমনি উন্মত্ত তাঁর ভালবাসা যে, তুলসী সেই মড়াটাকেই জড়িয়ে ধরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে অপর পারে উঠলেন। নদী পেরিয়েই ছুট্—ছুট্—একেবারে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে হাজির। বাড়ীর দরজা তখন বন্ধ, ভিতরে ঢোকবার উপায় নেই, চাকর-বাকরদের ডাকাডাকি করে তোলাও কঠিন, তারা থাকে একেবারে অন্দরমহলে। এখন কি করা যায়? লোকে বলে, পীরিতের পথে নদী হয় নালা, পাহাড় হয় ঢিবি! এখন প্রেমের পাখায় ভর করে স্ত্রীর কাছে যেতে হবে আর কি! সাত-পাঁচ ভেবে তুলসী যখন অস্থির, তখন হঠাৎ দেখতে পেলেন, দেওয়ালের ওপর থেকে কি যেন একটা ঝুলছে। তুলসী মনে করলেন, ওটা বুঝি দড়ি। ভাবলেন, স্ত্রী তাঁকে এত ভালবাসে যে দেওয়াল টপকাবার দরুণ দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে। তাঁর আর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু আসলে ওটা তো দড়ি নয়, ওটা হচ্ছে সাপ। তুলসী সাপটাকেই চেপে ধরলেন। ভাগ্যে সেটা কামড়ালো না। তারপর ওই ধরে দেওয়াল টপকিয়ে বাড়ীর ভিতর পড়ে, স্ত্রী যে ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, সেই ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। স্ত্রী তো তাঁকে দেখে অবাক্, বললেন, "আশ্চর্য্য তো! তুমি এলে কি করে?" তুলসীর দুই চোখ বেয়ে দরদর আনন্দের ধারা বইছে—বললেন, "আদরিণী, তুমিই যে পথ দেখিয়ে এনেছ গো! নদী পার হবার দরুণ ঘাটে ডিঙ্গি রেখেছিলে যে, আর দেওয়াল টপকাবার দরুণ দড়ী ঝুলিয়ে!" তুলসী বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ভালবাসা তাঁকে পাগল করেছে। স্ত্রীরও দুই চোখ বেয়ে আনন্দের ধারা বইছে। তিনি ছিলেন বিদুষী মেয়ে, দিব্য-জ্ঞানের প্রতিমা; স্বামীকে তিনি বললেন, "দেবতা আমার, বন্ধু আমার! আমার এই আপাত-রমণীয় তুচ্ছ দেহটাকে সঞ্জীবিত, উদ্ভাসিত করে রেখেছে যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ, তাঁর দরুণ যদি তোমার এই আত্মহারা প্রেম হত, তাহলে তুমি যে ব্রহ্মস্বরূপ হতে গো! জগতে তোমার চেয়ে বড় প্রবক্তা কেউ হত না তাহলে! তুমি মহর্ষির পদ পেতে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য দেবতা হতে।"

এমনি করে স্ত্রী-ই তুলসীকে ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন, স্ত্রী-ই তাঁকে বোঝালেন, তিনি মানবীমাত্র নন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপিণী। স্বামীকে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমার এই দেহটাকে তুমি ভালবাস? এ দেহ যে অনিত্য। কাল এ দেহটা তোমার ঘরে ছিল, আজ এই ঘরে এসেছে। তেমনি এ তো এই মুহূর্ত্তে এই সংসার ছেড়েও চিরবিদায় নিতে পারে। এই দেহের রোগ হতে পারে, নিমেষের মাঝে এর সমস্ত সৌন্দর্য্য লোপ পেতে পারে। এই যে আমার গালে গোলাপের আভা, এ কোথা হতে এল? আমার চোখে ঝিক্‌মিক্ করছে, এ কিসের আলো? আমার দেহকে এমন রমণীয় করেছে কে? কে আমার চোখে বিদ্যুৎ দিয়েছে, চুলে মেঘের বর্ণ দিয়েছে, আমার দেহ-ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল, প্রাণময় করেছে? দেখ, ভাল করে দেখ, তোমায় যে ভুলিয়েছে, সে আমার দেহ নয়, গায়ের এই রাঙা চামড়াটুকু নয়! আবার দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি আমার পানে!—ও কি? কি দেখছ? দেখছ না আমার মাঝে আত্ম-স্বরূপ, ব্রহ্মের

জ্যোতিঃ—ওই তো তোমাকে মুগ্ধ করেছে, পাগল করেছে, যাদু করেছে! আমার মাঝে ব্রহ্মের দিব্য-মহিমা, আর কিছুই নয়; আমার মাঝে ভগবানের প্রকাশ, আর কিছুই নয়। আমার মাঝে এই ব্রহ্মকে অনুভব কর। শুধু আমার মাঝে কেন, সর্ব্বত্র দেখ—এই ব্রহ্ম! আকাশের তারা হয়ে, চাঁদ হয়ে তোমার মুখের পানে যে চেয়ে আছে, সে কি এই ব্রহ্ম নয়?"

স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে তুলসী ইন্দ্রিয়-তর্পণের ঊর্দ্ধে, লালসার ঊর্দ্ধে, সংসারাসক্তির ঊর্দ্ধে উঠে গেলেন। এই মহাপুরুষ একদিন যেমন প্রাণের ঐকান্তিক কামনা ঢেলে দিয়ে স্ত্রীকে ভালবেসেছিলেন, তেমনি ভগবান্‌কেও তিনি ভালবাস্‌লেন। সর্ব্বত্র তিনি ব্রহ্মদর্শন কর্‌তে লাগলেন। ভগবানের প্রেমে তিনি এমন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, ব্রহ্মানন্দ-রসপানে এমন বিভোর হলেন যে একদিন বনপথ দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একটা লোককে কুড়ুল হাতে গাছ কাটতে যেতে দেখতে পেলেন। গাছের গোড়ায় কোপ পড়তেই তুলসীদাসও যেন অবশের মত হয়ে পড়লেন। ছুটে গিয়ে লোকটার হাত ধরে বল্‌লেন, "তোমার এ কোপ যে আমার ওপর পড়ছে, আমার বুকে বিঁধ্‌ছে—ছেড়ে দাও ভাই!" লোকটা বল্‌ল, "সে কি মহারাজ!" তুল্‌সী বল্‌লেন, "এই গাছটী যে আমার অতি প্রিয়; আমার প্রিয়তমকে, আমার দেবতাকে যে আমি এর মাঝে দেখতে পাচ্ছি।"

এমনি করে ভগবান্ হলেন তাঁর বর, বধূ, মাতা, ভগ্নী, সন্তান—সব! প্রাণের সকল আকুলতা, হৃদয়ের সমস্ত প্রেম তিনি তাঁর পায়ে অর্পণ কর্‌লেন, সত্য-স্বরূপকে তিনি সর্ব্বস্ব দান কর্‌লেন। তাই তিনি কাঠুরিয়াকে বলেছিলেন, "আমার প্রিয়তমকে আমি দেখতে পাচ্ছি এই গাছে; আমার দেবতার গায়ে তুমি আঘাত কর্‌বে, এ আমার সইবে না।"

একদিন এক শিকারী হরিণ শিকার কর্‌তে যাচ্ছে, তুল্‌সী গিয়ে তার পায়ে পড়লেন। শিকারী বল্‌লে, "এ কি মহারাজ!" তুলসী আকুল হয়ে বলে উঠলেন, "মেরো না, মেরো না বন্ধু! ওই দেখ, আমার সুন্দরের করুণ চাউনি ওই দুটী চোখে! তার চেয়ে বরং আমাকে মার, তাঁর নামে এই দেহটাকে বলি দাও—আমি মর্‌ব না তাতে; কিন্তু ওকে বাঁচাও, আমার বন্ধুকে বাঁচাও!"

জগতে যা কিছু আকর্ষণের বস্তু দেখতে পাচ্ছ, সমস্তই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার আপনজনের দেহ-মনে যাঁর প্রকাশ, তাঁরই প্রকাশ পর্ব্বতে-কান্তারে, বৃক্ষ-লতায়; এইটী অনুভব কর। এই অনুভবেই সংসারের বাসনা-কামনা ছাড়িয়ে উঠতে পার্‌বে। এমনি করে বাসনা-কামনাকেও অধ্যাত্মসম্পদে পরিণত করা যায়, তাদের খাঁটী করে তোলা যায়। কিন্তু তোমরা অধ্যাত্ম-জীবনের সর্ব্বনাশ কর্‌ছ, আকণ্ঠ কলুষে নিমজ্জিত হচ্ছ। বাসনা-কামনাগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে যদি তাদের উৎকর্ষ কর্‌তে পার, তাহলে ওইগুলোই যে হবে তোমার পুণ্যের পুঁজি!*

—ক্রমশঃ

* At Golden Gate Hall, Jan 25, 1903.

মানমেয়োদয়

——):*:(——

সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

——:*:——

[ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন-রাষ্ট্রের রাজধানী হইতে "অনন্ত-শয়ন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী" (Trivandrum Sanskrit Series) নামে যে গ্রন্থমালা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে, "মানমেয়োদয়" তাহার ঊনবিংশতিতম। মানমেয়োদয় কুমারিলভট্ট-প্রবর্ত্তিত ভাট্টমতের অন্যতম প্রকরণ। এই প্রকরণ-গ্রন্থের রচয়িতা কেরল-দেশীয় নারায়ণভট্ট ও শৈলাব্ধি (Calicut)রাজ মানবেদের আশ্রিত নারায়ণ পণ্ডিত। নারায়ণ-ভট্ট প্রমাণ-পরিচ্ছেদ রচনা করিয়া কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রমেয়-পরিচ্ছেদ রচনা করিতে পারেন নাই। তাই শৈলাব্ধিরাজ মানবেদের অনুরোধে ও উৎসাহে মেয়-পরিচ্ছেদ রচনা করিয়া নারায়ণ পণ্ডিত উহা পূরণ করেন। ভাট্টমতের এমন সরল ও সরসভাবে প্রতিপাদন আর কোন গ্রন্থে করা হইয়াছে কি না জানি না। ভাট্টমতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তার্কিক-(নৈয়ায়িক) মত ও স্বল্পজ্ঞাত প্রভাকর-মতের যেরূপ সমীচীনভাবে উল্লেখ ও খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসুগণের বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ভাট্টমতের সহিত পরিচয় না থাকিলে শাঙ্কর-বেদান্তে প্রবেশ করাও দুর্ঘট। কারণ প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণ এই ভাট্টমতকে অবলম্বন করিয়া লৌকিক প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহারের উপপাদন করিয়াছেন। "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকায় মাসে মাসে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া আবশ্যক পাদটীকাও সংযোজিত হইবে। এ সমস্ত উপাদেয় ও গভীরার্থক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ হইলে বঙ্গভাষায় দার্শনিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। প্রতিপাদ্য বিষয় অতি কঠিন; তাহার অনুবাদেও যে কাঠিন্য থাকিবে না, এমন আশা করা যায় না। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি-গণেরও দর্শনের পরিভাষা আয়ত্ত করিতে বিশেষ শ্রম ও ধৈর্য্য স্বীকার করিতে হয়। বাংলা ভাষাতেও দর্শন-গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহার এইরূপ গুরুত্ব থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। অনেকেই ভুলিয়া যান্ যে ইংরাজী ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াও কেবল ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে তর্কশাস্ত্র (Logic), পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) প্রভৃতিতে প্রবেশ করা যায় না। সেখানেও শাস্ত্রের পরিভাষা ও বিচার-প্রণালী বুঝিতে হইলে গুরুর উপদেশ ও শিষ্যের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় উভয়েরই প্রয়োজন হয়। এই অনুবাদ-পাঠে "আর্য্যদর্পণের" পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে কাহারও মনে যদি শাস্ত্র-জিজ্ঞাসার লেশমাত্রও উদ্দীপিত হয়, তবে অনুবাদক নিজের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

গ্রন্থকারদ্বয়ের স্থিতিকাল সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় ইহার বিচার করিব মনে করিয়াছি। তবে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে এই গ্রন্থ যে চতুর্দ্দশশতকের পরে রচিত হয় নাই, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পরিশেষে বক্তব্য এই, অনুবাদকে যথাসম্ভব মূলানুগত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু মূলের আশয় বিশদ করিবার জন্য স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব হয় নাই, সেখানে ভাষার অপেক্ষা ভাবেরই অনুবাদ হইয়াছে। আশা করি সুধীগণ অনুবাদকের এই আপাত স্বাতন্ত্র্য ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।—অনুবাদক]

———

মানমেয়োদয়

——):*:(——

প্রমাণ-পরিচ্ছেদ

——*——

প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা

——):*:(——

আচার্য্যমত জলধিবিশেষ; অব্যুৎপন্ন বালকগণও যাহাতে সেই জলধি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, বুদ্ধিসাহায্যে তাহাই সাধন করা আমার অভিপ্রায়। এখন এই সমুদ্রে কোন গোপাল-**পোত** (গোপ-**তনয়** শ্রীকৃষ্ণ) আমার পোতস্বরূপ হউন্ ॥ ১ ॥

মান ও মেয় (প্রমাণ ও প্রমেয়) ভেদে বস্তুসমূহের স্থিতি দুই ভাগে বিভক্ত। তাই শ্রীমান্ কুমারিল প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া এই উভয়েরই নিরূপণ করিব ॥ ২ ॥

প্রমাণের লক্ষণ

প্রমার করণই প্রমাণ, ইহা তর্কশাস্ত্রেরও অভিমত। (কিন্তু আমাদের মতে) **অজ্ঞাত তত্ত্বার্থের জ্ঞানই প্রমা**—ইহাতেই কিছু মতের ভেদ আছে। ॥ ৩ ॥

লক্ষণ-বিচার

অজ্ঞাত এই পদটী লক্ষণ-বাক্যে (definition) থাকায় স্মৃতি ও অনুবাদের[১] নিরাস হইল, কারণ জ্ঞাত-বিষয়েই ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অনুবাদের প্রামাণ্য নাই, ইহা তার্কিকগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা বলি, অনুবাদ যখন কি বস্তু-জ্ঞানে কি ব্যবহারে (পূর্ব্বজ্ঞান হইতে) কোন অধিক অর্থ জ্ঞাপন করে না, তখন ফলে বিশেষ না থাকায় এবং ফলের নিমিত্তই প্রমাণ স্বীকার করা হয় বলিয়া অনুবাদকে স্মৃতি প্রভৃতির মতই প্রমাণ-পক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত।

জিজ্ঞাসু ॥—আচ্ছা, যদি অজ্ঞাতের জ্ঞানকেই প্রমা বলেন, তবে ধারাবাহিক জ্ঞানে, যেখানে 'ইহা ঘট' 'ইহা ঘট' এইরূপ ক্রমিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়—সেখানে দ্বিতীয় জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পরবর্ত্তী জ্ঞানের তো প্রমাত্ব থাকিবে না।

বোধয়িতা ॥—না, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। ধারাবাহিক স্থলেও 'ইহা' 'ইহা' এইরূপ পর পর জ্ঞানে উত্তরোত্তর কালাংশের (ক্ষণের) জ্ঞান হয় এবং এই কালাংশগুলি পূর্ব্বে অজ্ঞাত বলিয়া উত্তর-ক্ষণস্থিত ঘটাদিও পূর্ব্বজ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয় না (তাই ধারাবাহিক জ্ঞানেও অজ্ঞাত বিষয়েরই জ্ঞান হয় বলিয়া উহার প্রামাণ্যের বাধা হয় না)।

---

(১) অনুবাদ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের দ্বারা যে অর্থ জানা যায়, শব্দের দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করিলে তাহাকে অনুবাদ বলা হয়। "প্রমাণান্তরেণাবগতস্যার্থস্য শব্দেন সংকীর্ত্তনমাত্রমনুবাদঃ"—ইতি কাশিকা ("অনুবাদে চরণানাম্"—২।৪।৩ এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ভাট্ট-মীমাংসগণ ও তদনুবর্ত্তী বেদান্তাচার্য্যগণ এই অনুবাদকে প্রমাণ বলেন না। কারণ তাঁহাদের মতে অনধিগত অর্থের জ্ঞানই প্রমাণ। তুল্যযুক্তিতে স্মৃতিকেও প্রমাণ বলা হয় না, কারণ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানই স্মৃতি। তাই পিষ্ট-পেষণের ন্যায় ইহারা ব্যর্থ। ইহাদের যে অর্থক্রিয়াকারিত্ব (প্রয়োজন-সম্পাদকত্ব) দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বাবগত-জ্ঞানকৃত, স্বতন্ত্রভাবে নহে। মীমাংসকগণ অনুবাদকে অর্থবাদের মধ্যে অন্তর্ভাবিত করেন; আর অর্থবাদ যে বিধির পুচ্ছানুবর্ত্তী, তাহা মীমংসা-দর্শনের সহিত যাঁহার স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তিনিই জানেন। এই জন্যই মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, 'অনন্যলভ্যো হি শব্দার্থঃ'—শব্দের অর্থ শব্দরূপ প্রমাণের দ্বারাই জানা যায়, প্রমাণান্তরের দ্বারা নহে।

জিজ্ঞাসু ॥—কিন্তু কালের (স্বাভাবিক ভেদ নাই, উহার) ভেদ তো উপাধিকৃত[২] ; তাই কোন্ উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া কালাংশসমূহের জ্ঞান হয়, তাহা বলুন।

বোধয়িতা ॥—বলিতেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকটতা[৩] উৎপাদিত হয়, সেই প্রকটতাগুলি তাহাদের (অব্যবহিত) পর পর জ্ঞানের সময় পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে এবং এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকটতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া কালাংশসমূহের (ভেদে) জ্ঞান হয়। এ কিন্তু বলিবার জো নাই যে যেহেতু প্রকটতাগুলি সূক্ষ্ম ও তদবচ্ছিন্ন কালাংশগুলিও সূক্ষ্ম, অতএব তাহাদের জ্ঞান অসম্ভব। কারণ, যদি তাহারা সূক্ষ্ম হইত, তবে সূচির দ্বারা শতপদ্মপত্র যেমন এককালেই বিদ্ধ হয়, সেইরূপ যৌগপদ্য-(এক-

---

(২) উপাধি—ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মবিশেষ (distinguishing mark)। যাহা কোন বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, তাহা ব্যাবর্ত্তক। ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা বিশেষণ, উপাধি ও উপলক্ষণ।

যাহা বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বিত ও বর্ত্তমান থাকিয়া বিশেষ্যকে ব্যাবর্ত্তিত (পৃথক্‌কৃত) করে, তাহা বিশেষণ, যথা 'রূপবান্ ঘট' ; এখানে রূপ ঘটের সহিত অন্বিত এবং বর্ত্তমান থাকিয়া ঘটকে বিশেষিত করিতেছে, তাই রূপ ঘটের বিশেষণ।

'উপাধি' বর্ত্তমান থাকিয়াই বিশেষ্যকে ব্যাবর্ত্তিত করে, কিন্তু তাহা বিশেষ্যের সহিত অন্বিত নহে ; যেমন, 'কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রোত্রেন্দ্রিয়।' এখানে কর্ণশষ্কুলী বর্ত্তমান এবং বিশেষ্যভূত আকাশকে অন্য আকাশ (যেমন ঘটাকাশ বা মহাকাশ প্রভৃতি) হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। কিন্তু যেহেতু কর্ণশষ্কুলী আকাশে অনুগত নহে, তাই আকাশের বিশেষণ হইল না। ইহা তটস্থ (অর্থাৎ অনন্বিত) থাকিয়াই ব্যাবর্ত্তক। প্রকৃতস্থলে (in the present context) কালের ভেদ সম্ভব নহে। কারণ মীমাংসকগণের মতে কাল বিভু, নিরবয়ব ও নিত্য ("কালস্যাপি বিভুত্বেঽপি উপাধিবশাদৌপাধিকভেদব্যবহারোঽস্তি"—মানমেয়োদয়, পৃঃ ৮০)। তাই কালের ভেদজ্ঞান উপাধিকৃত। উপাধির ধর্ম্ম এই যে, সে বস্তুর স্বরূপে অনুগত না হইয়াও তাহাকে ভিন্ন করিয়া দেয়। যেমন কর্ণশষ্কুলী আকাশের ভেদ না থাকিলেও নিজের স্বরূপভেদের দ্বারা তাহার (আকাশের) ভেদ জানাইয়া দেয়। উপাধির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে স্ফটিকনিহিত জবাকুসুম। স্ফটিক স্বচ্ছ ও শুভ্র ; কিন্তু জবাকুসুমের সান্নিধ্যে তাহার লৌহিত্য প্রতীতি হয়। তাই জবাকুসুম বিশেষ্য স্ফটিকের স্বরূপে অনন্বিত হইয়াও তাহাতে নিজের ধর্ম্ম লৌহিত্য সংক্রামিত করিয়া তাহাকে ব্যাবর্ত্তিত করিতেছে। তাই কুসুমাঞ্জলি-(৩।৭) টীকায় হরিদাস 'উপ সমীপবর্ত্তিনি…স্বধর্ম্মম্…আদধাতি বোধয়তীতি উপাধিশব্দো জবাকুসুমাদিসাধারণঃ' এইরূপ উপাধির অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তপরিভাষাকার—"উপাধিশ্চ কার্য্যানন্বয়ী ব্যাবর্ত্তকো বর্ত্তমানশ্চ" এইরূপ উপাধির এবং "বিশেষণঞ্চ কার্য্যান্বয়ি বর্ত্তমানং ব্যাবর্ত্তকম্"—এইরূপ বিশেষণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন (বেঃ-পঃ পৃঃ ৮৭-Cal. Uni. Edn.)। তাই কালের ভেদ না থাকিলেও উপাধি 'প্রকটতা'র ভেদ কালে সংক্রামিত হইয়া কালকে পৃথক্ করিয়া দিবে।

উপলক্ষণ রূপ তৃতীয় ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মটীর উপাধি হইতে পার্থক্য তাহার অবর্ত্তমানত্ব ও বর্ত্তমানত্ব নিবন্ধন। উপাধি বিশেষণের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়াই বস্তুকে পৃথক্ করিয়া দেয়। উপলক্ষণ কিন্তু সর্ব্বদাই অবর্ত্তমান। অনন্বিতত্ব অংশে উহাদের ভেদ নাই। উপলক্ষনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, অতীতকালে দৃষ্ট কাকের দ্বারা যখন দেবদত্তের গৃহকে বিশেষিত করা হয়। 'দেবদত্তের গৃহ কোন্‌টী ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—'সেই যে গৃহের ছাদে কাক বসিয়াছিল।' এখন এই কাক বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তথাপি দেবদত্তের গৃহকে অন্য গৃহ হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে বলিয়া কাক ব্যাবর্ত্তক হইল এবং 'উপলক্ষণ' হইল। উপাধি ব র্ত্ত মা ন ব্যাবর্ত্তকধর্ম্ম, অতএব কাককে এস্থলে উপাধি বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

নৈয়ায়িকের উপাধিও এইরূপ ; কারণ তাহাও ব র্ত্ত মা ন থাকিয়া স্ব-সমানাধিকরণ বস্তুতে নিজের ধর্ম্ম (ব্যাপ্তি) সংক্রামিত করে। নৈয়ায়িকসম্মত উপাধির বিশেষ বিচার জিজ্ঞাসু 'আর্য্যদর্পণ' আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃঃ ১১২-১৩ পাদটীকায় দেখিবেন।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে উপাধি প্রভৃতির ভেদবিচার করা হয় নাই ; নির্ব্বিচারে বিশেষণ, উপলক্ষণ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখা যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহার বিচার করা হইল না।

(৩) প্রকটতা—জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে বিষয়টী জ্ঞাত হয়, ইহাই সাধারণতঃ বলা হয়। কিন্তু জ্ঞান আর বিষয় ছাড়া অতিরিক্ত কোনো সম্বন্ধ (যেমন দণ্ড আর পুরুষের মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধ) দেখা যায় না ; তাই কোন্‌টী জ্ঞাত আর কোনটী অজ্ঞাত ইহা নিরূপণ করিবার উপায় থাকে না। আর জ্ঞান যখন নিরাকার (কুমারিল ও ন্যায়মতে), তখন ঘটের জ্ঞান হইল না পটের জ্ঞান হইল, ইহাই বা কিরূপে স্থির হইবে, কারণ জ্ঞান ঘট ও পট উভয়ের

কালীনত্ব) বোধের ন্যায়, ঘটের জ্ঞানও একবার মাত্রই হইয়াছে, এইরূপ যৌগপদ্যের অভিমান হইত। কিন্তু ধারাবাহিক জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে 'ইহা' 'ইহা' এইরূপ ক্রমে ক্রমে পুনঃ পুনঃ প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। অথচ ক্রম-প্রতীতি যৌগপদ্য জ্ঞানের বিরোধী। তাই প্রকটতা ও কালের ভেদগুলি সূক্ষ্ম, ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু॥—আমি বলি, প্রকটতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না এবং কালের প্রত্যক্ষও সিদ্ধ নয়; সুতরাং কাল-খণ্ডগুলির জ্ঞান কি করিয়া হইতে পারে?

বোধয়িতা॥—তোমার এ অনুযোগ সমীচীন নহে। দাঁড়াও, আমরা পরে এ দুটী বিষয়ের প্রমাণ দিতেছি। (আপাততঃ লক্ষণ-বাক্যের বিচার চলুক)।

লক্ষণবাক্যে **তত্ত্ব** শব্দ থাকায় ভ্রম, সংশয় প্রভৃতি অযথার্থ জ্ঞানের নিরাস হইল। প্রভাকরমতানুবর্ত্তিগণ কিন্তু বলেন যে, অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া যখন কিছুই নাই, তখন (লক্ষণ-বাক্যে) তত্ত্বপদের প্রক্ষেপ করা অনর্থক। তাঁহাদের মত এই যে, (শুক্তিকাতে) 'ইহা রজত' বলিয়া যে জ্ঞান হয়, সেস্থলে 'ইহা' এই অংশের দ্বারা শুক্তিখণ্ডেরই গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে; কেবল তাহার যে বিশেষ স্বরূপ, তাহার গ্রহণ বা উপলব্ধি হয় না। আর 'রজত' এই অংশের দ্বারা কেবল রজতের স্মরণ হইয়া থাকে। এখন এই প্রত্যক্ষ-গ্রহণ ও অপ্রত্যক্ষ-স্মরণ, এই উভয়েরই ভেদ উপলব্ধি হয় না বলিয়া পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; শুক্তিখণ্ডকে রজত মনে করিয়া যে তাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহা নয়।

আমরা কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া এ মত প্রত্যাখ্যান করি। কারণ প্রত্যেক জ্ঞানই নিজের যাহা বিষয়, তাহাতেই পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে—ইহা নিয়ম। তাই রজত-জ্ঞানের যদি 'ইহা' এই ইদমংশ বিষয় না হয়, তাহা হইলে এই ইদমংশে প্রবৃত্তি সিদ্ধ

প্রতিই উদাসীন ও একপ্রকার। তাই বিষয়-নিয়মের নিমিত্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ে এমন কোনো ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, যাহা জ্ঞাত বিষয়কে অজ্ঞাত বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। এই ধর্ম্মের নাম মীমাংসকগণের মতে 'প্রকটতা' বা 'জ্ঞাততা।'

এখন এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে ঘটজ্ঞান হইলে ঘটে জ্ঞাততারূপ ধর্ম উৎপন্ন হয় বলিয়া ঘটের বিষয়ত্ব সিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহা যে ঘটেরই জ্ঞান, অন্য জ্ঞান নয়, ইহারও নিয়ামক জ্ঞাততাই বলিতে হইবে। তাই ঘটজ্ঞান যখন ঘটে জ্ঞাততার জনক, তখন জ্ঞাততার উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই ঘটজ্ঞান যে ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান নয়, ইহার নিয়ামক কি?—অবশ্যই ঘটনিষ্ঠ জ্ঞাততা, কারণ জ্ঞাততা জ্ঞানের বিষয় নিয়মিত করে। কিন্তু এই দ্বিতীয় জ্ঞাততার কারণ অন্য ঘটজ্ঞান হইবে এবং সে ঘটজ্ঞানও অপর একটী জ্ঞাততা দ্বারা নিয়মিত হইবে। এইরূপ অনন্ত জ্ঞাততা ও ঘটজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, অথচ প্রকৃত ঘটজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না।

এই আপত্তির উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, আমরা ঘটজ্ঞান ঘটনিষ্ঠ জ্ঞাততার জনক ইহা বলি না; কিন্তু কোনো জ্ঞান ঘটে জ্ঞাততার জনক, অপর কোনো একটী জ্ঞান পটে জ্ঞাততার জনক। তাই যে জ্ঞান যে বস্তুতে জ্ঞাততার জনক, সে জ্ঞানের বিষয় সেই বস্তু হইবে—এইরূপ নিয়ম সম্ভব হওয়ায় অনবস্থার আপত্তি উঠিতে পারে না।

নৈয়ায়িকগণ বলেন, জ্ঞানের সহিত বস্তুর সম্পর্ক বিষয়তারূপ সম্বন্ধের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়তা কিন্তু বিষয় ঘটাদি হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহা তাহার স্বরূপ। আর জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ে জ্ঞাততা উৎপাদিত হইলে বিষয় নিয়মন হয়, একথা বর্ত্তমান বিষয়ের সম্বন্ধে খাটিলেও অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিরূপে জ্ঞাততা উৎপন্ন হইবে? কেননা জ্ঞাততার আধার বিষয় তো তখন অনুপস্থিত।

মীমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, আধার না থাকিলে জ্ঞাততা উৎপন্ন হইবে না—নৈয়ায়িকের এই আপত্তি যুক্তিহীন। কারণ জ্ঞাততা একটা স্বতন্ত্র পদার্থ; আধার থাকিলে তাহাতে উৎপন্ন হইবে, না থাকিলেও স্বরূপেই উৎপন্ন হইবে; নিরাধার গুণ থাকিতে পারে না, একথা তো আর নৈয়ায়িক বলিতে পারেন না। কারণ দ্রব্যনাশ আশ্রিত-গুণনাশের কারণ—ইহা স্বীকৃত, এবং কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী—ইহাও সকলেরই মত। তাই দ্রব্যনাশ হইলেও একক্ষণ গুণ থাকে। কারণ গুণ না থাকিলে তাহার বিনাশের প্রতি দ্রব্যনাশ কি করিয়া কারণ হইবে? আবার দ্রব্যনাশের সঙ্গে গুণনাশ হইলে, দ্রব্যনাশ গুণনাশের কারণ হইবে না, কেননা কার্য্যকারণের যৌগপদ্য অসম্ভব। তাই নিরাধার হইয়াও গুণ যখন থাকিতে পারে, তখন প্রকটতাই বা বিষয়

হইতে পারে না। আর 'ইহা রজত' এই যে সামানাধিকরণ্যের[৪] প্রয়োগ তাহাও 'ইদং' ও 'রজতের' অভেদ জ্ঞান না হইলে সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে এক বস্তুর অন্যবস্তুরূপে যে জ্ঞান হয়, সেই অন্যথাজ্ঞানরূপ ভ্রম ও তাহার সজাতীয় অযথার্থ জ্ঞানের নিরাস করিতে 'তত্ত্ব'-পদের উল্লেখ প্রয়োজন।

এখন এই অজ্ঞাততত্ত্বের জ্ঞানরূপ প্রমার করণ বলিয়া ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ প্রভৃতির প্রমাণত্ব সিদ্ধ হইল (কারণ প্রমার যাহা করণ, তাহাকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে)। আর 'প্রমার করণ' এই বাক্যে প্রমাশব্দে লক্ষণা[৫] স্বীকার করিয়া জ্ঞানের কার্য্যভূত প্রাকট্যকেও বুঝানো হয় এবং এই প্রাকট্যরূপ প্রমার করণ বলিয়া জ্ঞানকেও পক্ষান্তরে মীমাংসকগণ প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করেন। ইহার দরুণ অপর বাদিগণ আমাদিগকে ফলপ্রমাণবাদী বলিয়া থাকেন।

তার্কিকগণ কিন্তু "প্রমার করণ প্রমাণ; যথার্থ অনুভব প্রমা; স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানই অনুভব"—এইরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই লক্ষণ অতিব্যাপ্তি[৬] দোষে দুষ্ট। কারণ লক্ষণে অনুবাদের ব্যাবর্ত্তক (ব্যবচ্ছেদক) কোন পদ না থাকায় অনুবাদেও লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। অনুবাদের যে প্রামাণ্য নাই, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাভাকরগণের লক্ষণ অন্যরূপ, যথা "অনুভূতিই প্রমাণ; আর স্মৃতিভিন্ন জ্ঞান হইতেছে অনুভূতি।" কিন্তু (ইতিপূর্ব্বে) ভ্রম প্রভৃতির অস্তিত্ব আমরা প্রমাণিত করিয়াছি এবং তাহারা যে স্মৃতি হইতে ভিন্ন,

---

না থাকিলেও উৎপন্ন হইবে না কেন? (ন্যাঃ কুঃ ৪।২-৪ কারিকা ও চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।)

(৪) সামানাধিকরণ্য—বিশেষণ-বিশেষ্যভাবকে বলা হয়। এইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্তুদ্বয়ের একবিভক্ত্যন্ত শব্দদ্বয়ের দ্বারা উল্লেখ হয়। যেমন, 'নীলো ঘটঃ।' 'ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্'—প্রবৃত্তি-নিমিত্ত ভিন্ন হইলেও যখন দুটী শব্দ এক অর্থকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তখন তাহাদের সম্বন্ধকে সামানাধিকরণ্য বলে—ইহা শাব্দিকদের মত। নীলশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত (Connotation, যে অর্থে শব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োজন বা ব্যবহার হয়, তাহাই সে শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত) নীল-গুণ এবং ঘটশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ঘটত্ব-জাতি। ইহারা ভিন্ন হইলেও ইহাদের আশ্রয়ভূত ঘটরূপ দ্রব্য এক। যেখানে শব্দার্থের অত্যন্ত ভেদ, সেখানে এই সামানাধিকরণ্য অসম্ভব, যেমন গো আর অশ্বের সামানাধিকরণ্য অসম্ভব; অত্যন্ত অভেদেও হয় না, যেমন দুটী পর্য্যায় (synoyn) শব্দের মধ্যে। তাই 'ইদমংশ' যদি শুক্তিকাকেই বুঝায়, তাহা হইলে রজতের সহিত তাহার অত্যন্ত ভেদ থাকায় সামানাধিকরণ্য হইবে না। কারণ শুক্তিকাত্ব ও রজতত্ব এ দুয়ের কোন অভিন্ন আশ্রয় নাই।

(৫) লক্ষণা—মুখ্যার্থের বাধা হইলে, মুখ্যার্থের সহিত প্রসিদ্ধ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থে শব্দের যে ব্যবহার হয়, তাহার হেতুকে লক্ষণা বলে। যেমন, তিনি এখন গঙ্গাবাসী। গঙ্গা-শব্দের মুখ্য অর্থ জল-প্রবাহ, সেখানে মানুষ কি করিয়া বাস করিবে? তাই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তীররূপ অর্থ গ্রহণ করা হইল। 'নৌকাদি' অর্থ স্বীকার করিলেও অন্বয়ের বাধ পরিহার হইতে পারে। কিন্তু নৌকার সহিত গঙ্গার সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ, তীরের সহিতই প্রসিদ্ধ, তাই তীররূপ অর্থই গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতস্থলে প্রমার মুখ্য অর্থ জ্ঞান; কিন্তু প্রকটতাকে বুঝাইতে হইলে লক্ষণা করিতে হইবে। লক্ষণার অন্যতম কারণ প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ; তাহা এখানে আছে, কেননা প্রমা প্রকটতার কারণ।

(৬) অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি—লক্ষণের অর্থ, যাহা কোন বস্তু বা বস্তুসমূহকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। লক্ষ্য-বস্তুর অসাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ দ্বারা কিংবা অন্য বস্তুসমূহের নিষেধক ধর্ম্মের দ্বারা ইহা সম্ভব হয়। প্রথমটীকে স্বরূপ লক্ষণ এবং দ্বিতীয়টিকে তটস্থ বা ব্যতিরেকি লক্ষণ বলে। যেমন, 'সৎ চিৎ আনন্দ' ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ; আর যাহা 'অণু নয়, স্থূল নয়' ইত্যাদি নেতি-নেতি করিয়া নিষেধ-পুরস্কারে লক্ষ্য-বস্তুকে ব্যাবর্ত্তিত করে, তাহা তটস্থ লক্ষণ।

এই লক্ষণ যদি তিনটী দোষ হইতে বিনির্মুক্ত হয়, তাহা হইলে সাধু লক্ষণ হইবে; অন্যথায় অসাধু লক্ষণ বা লক্ষণাভাস হইবে। এই তিন দোষ হইতেছে—অসম্ভব, অতিব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তি।

যদি লক্ষণে এমন ধর্ম্মের নির্দ্দেশ থাকে, যাহা লক্ষ্য-বস্তুতে থাকে না, তাহা হইলে লক্ষণ 'অসম্ভব' দোষে দুষ্ট হইবে। যেমন, 'যাহার একটী খুর আছে, তাহা গরু' এই লক্ষণ।

অলক্ষ্যে লক্ষ্যের গমনকে 'অতিব্যাপ্তি' বলে। যেমন, 'শৃঙ্গহীন প্রাণী অশ্ব' এই লক্ষণ অশ্বকে কেবল লক্ষিত করে, তাহা নয়; মানুষ, গর্দ্দভ, শশক প্রভৃতিকেও বুঝায়।

আর, সমস্ত লক্ষ্যপদার্থে যদি লক্ষণ অনুগত না হয়, তবে 'অব্যাপ্তি' দোষ হইবে। যেমন 'শ্বেতবর্ণ ধীশক্তিশালী জীবই

তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে প্রাভাকরগণের লক্ষণ ভ্রম প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্ত হইতেছে। আরও তাঁহাদের মত এই যে, সমস্ত জ্ঞানেই আত্মা (জ্ঞাতা), জ্ঞানের স্বরূপ এবং বিষয় এই তিনটীরই প্রকাশ হয়। আর সমস্ত জ্ঞানেই 'জ্ঞাতা ও জ্ঞান' এই অংশদ্বয়ের প্রমাণত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব আছে, ইহাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু, তাঁহারা যখন স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানকেই প্রমাণ বলেন, তখন স্মৃতির ঘটক জ্ঞাতা ও জ্ঞান, এই দুই অংশের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে বলিয়া তাঁহাদের প্রমাণ লক্ষণে অব্যাপ্তি[৬] দোষও বিদ্যমান।

বৌদ্ধদের মতে "অবিসংবাদী[৭] বিজ্ঞানই প্রমাণ এবং অবিসংবাদিত্ব মানে অর্থক্রিয়াকারিত্ব[৮]।" কিন্তু ভূত ও ভবিষ্যদ্‌বিষয়ক অনুমানের অর্থক্রিয়াকারিত্ব না থাকায় তাদৃশ অনুমানের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়িতেছে বলিয়া অব্যাপ্তি[৬] এবং স্মৃতির কোন কোন স্থলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকায় প্রামাণ্য আসিয়া পড়ে বলিয়া অতিব্যাপ্তি[৬]—এই উভয়বিধ দোষে বৌদ্ধের প্রমাণ-লক্ষণ দুষ্ট।

অতএব অজ্ঞাততত্ত্বার্থ-জ্ঞানের যাহা সাধন, তাহাই কেবল প্রমাণ, ইহা নির্ণীত হইল। এখন এই প্রমাণের ভেদের কথা বলিব ॥৭॥ (ক্রমশঃ)

মনুষ্য' এই লক্ষণটী কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ প্রভৃতি মনুষ্যকে লক্ষ্য করিতেছেন; তাই ইহা অব্যাপ্তি দুষ্ট হইল।

(৭) অবিসংবাদী—জ্ঞানের সহিত বস্তুর অমিল হইলে, তাহাকে বিসংবাদ বলে। এই বিসংবাদ না থাকিলে, অর্থাৎ জ্ঞান ও বস্তুর স্বরূপে মিল থাকিলে, জ্ঞানকে অবিসংবাদী বলে। যেমন সরোবরে জলজ্ঞান—ইহা অবিসংবাদী জ্ঞান; কিন্তু মরীচিকায় জলজ্ঞান—ইহা বিসংবাদী, তাই মিথ্যা।

(৮) অর্থক্রিয়াকারিত্ব—অর্থ মানে কার্য্য বা প্রয়োজন, তাহার ক্রিয়া অর্থাৎ সম্পাদন। এই প্রয়োজন-সম্পাদনকারী হইলেই বস্তু সত্য হইবে—ইহা বৌদ্ধদের মত। কোন কার্য্য করে না অথচ বস্তু হইবে, ইহা অসম্ভব। বস্তু আর অবস্তুর প্রভেদ হইতেছে এই কার্য্যকারিত্ব লইয়া। এই কার্য্যকারিত্ব বলিতে জ্ঞানজনকত্বও বুঝায়। তাই শশশৃঙ্গ যে অবস্তু, অলীক, তাহার প্রমাণ—ইহা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের জনকও নয়, বা কোন কাজও করে না। তাই যাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই, তাহা অলীক, ইহা বৌদ্ধদের সিদ্ধান্ত।

চাওয়া আর পাওয়া

জীবনে অনেক কিছুই আমরা চাই, কিন্তু পাই না কেন? সোজা কথায় এর উত্তর হবে, তেমন করে চাওয়া হয় না তাই। কিন্তু এ-ও যেন যুক্তির কথা—প্রাণ তাতে তৃপ্ত হয় না। সে বলে—এমন করে দিন-রাত কামনার আগুণে পুড়ে মরছি, এর চেয়ে আর চাইব কি করে? বুক যে খাক্ হয়ে গেল, তবু তো এ দহনের বিরাম নাই! কে বলে দেবে—কেমন করে, কোন পথে গেলে আমার ঈপ্সিত ধন মিলবে—আমি তৃপ্ত হব?

একটা কামনা মিটতে না মিটতে প্রাণে আর একটা অভাব জাগছে, তার ফলে নূতন আর একটা কামনার উদ্ভব হচ্ছে, এমনি করে মানুষ নিজের রচিত অনন্ত কামনার গোলোকধাঁধায় ঘুরে মরছে। কোনটাই যে মিটে না, তা নয়, বরং সমস্তই ক্রমশঃ পূরণ হয়। কিন্তু ভোগ-লোলুপ মন যে প্রতিনিয়ত ইন্ধন জুগিয়ে অনন্ত অগ্নির কুণ্ড সৃজন করে চলছে, তার তো শেষ নাই! স্বল্পায়ু জীবনে তার কতটুকুই

বা পূরণ হবে? দেহের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ, সেই বা কতটুকু বহন করবে? তাই এ দেহের পতনের পর কামনার পরিপূরণের জন্য নূতন দেহের প্রয়োজন হয়। জন্মান্তর মানুষের অতৃপ্ত কামনা পূরণ করবার সুদীর্ঘ অবসর। এ বিধির শাস্তি নয়, বরং অজ্ঞান মানুষের নিতান্ত আগ্রহে করুণাময় বিধির অনুগ্রহ।

যা চাইছি, তা হচ্ছে না; যেদিক দিয়ে যেতে চাই, সে দিক হতে কে আর এক দিকে ঠেলে নিচ্ছে; তার ফলে কোথাও পাই অবাঞ্ছনীয় সিদ্ধি, অভাবনীয় সুখ—আবার কোথাও মিলে ব্যর্থতার কান্না। এমন হয় কেন? মানুষ ইচ্ছামাত্র সব পায় না কেন? এ কি তার শক্তির ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণের জন্য বিধাতার পরিহাস? তা কখনও হতে পারে না। তিনি যদি দয়াময় হয়ে দেবার জন্যই উন্মুখ থাকেন, তাহলে কখনও এমন পরিহাস তাঁতে সম্ভব নয়। মানুষ ব্যর্থতাও সৃষ্টি করে নিজে। কামনার পর কামনার সজ্ঘাতে পথকে পঙ্কিল করে সে নিজেই। সমস্ত কামনাই পূরণের জন্য উন্মুখ, কিন্তু যেগুলির বেগ বেশী, সেগুলিই আসে আগে। স্থূলের প্রত্যেকটী কর্ম্ম, বাসনার প্রত্যেকটী রূপ সূক্ষ্ম জগতে record হয়ে থাক্‌ছে, আর চরিতার্থতার জন্য অনন্ত কালের পথে প্রত্যেকেই এগিয়ে আস্‌ছে, কিন্তু যেটীর বেগ যত বেশী, সেটী তত আগে পূরণ হবে। অনন্ত জীবনে কতবার কত কিছু চাইছি, কিন্তু পরবর্ত্তী অভাবের পীড়নে আগের সে কামনা হয়ত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে—কি চেয়েছিলাম তা ভুলে গিয়ে বর্ত্তমানের প্রয়োজনটাই বেশী হয়ে পড়েছে। কিন্তু চঞ্চল মনের এমন অসহিষ্ণু তাগিদে তো জগৎ সংসার চলে না। তাই সেখানে যেমন শৃঙ্খলার সঙ্গে একটীর পর একটী করে বাসনা গাঁথা রয়েছে, আমার দেওয়া সংবেগ অনুযায়ী তার সেই ক্রম ধরেই সিদ্ধির পথে ফিরে আস্‌ছে। কাজেই এ শৃঙ্খলার মূলেও আমারই শক্তি নিহিত—পথের বাঁকে বাঁকে আমিই যাদের রেখে এসেছিলাম তারা এখন একে একে দেখা দিচ্ছে। আমার বর্ত্তমানের রুচি অনুযায়ী সু-কু ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের প্রেরয়িতা বলে আজ আর কাকে দাঁড় করাব?

কামনা আসে অভাব থেকে, আর অভাব জাগে দুর্ব্বলতা থেকে। যেখানে শক্তির পরিচয় পাই না, রিক্ততার পীড়নে অহরহ উদ্ভ্রান্ত হতে থাকি, কামনা আসে সেই অপূর্ণের কুক্ষি থেকে। সমস্ত জগৎ নিয়ে যে-পূর্ণের অভিযান চলেছে পূর্ণের দিকে, যে-পূর্ণ থেকে উপ্‌চিয়ে এই পূর্ণ জগতের সৃষ্টি হয়েও অবশেষ পূর্ণ হয়ে আছে, সেই পূর্ণের দিকে যখন দৃষ্টি পড়ে, অভাবের সমষ্টি নিয়ে আপনার স্বরূপ না গড়ে সেই পূর্ণ একরস দিয়ে যখন নিজের স্বরূপ চিন্তা করি, অভাবের ছায়াও তখন থাকে না। কিন্তু আনন্দের প্রস্রবণ থেকে নিজকে অন্তরিত করে যখন দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে, অভাবের তাড়নায় পেয়ে বসে তখনি।

কিন্তু এ-ও তো জগতের একটা দিক। ঊর্দ্ধে যে রস প্রস্রবণ থেকে এই জগৎ উৎসারিত, বিলোম-ক্রমেও তো সেখানে পৌছান যায়। সেই রস-স্রোতে অবরোহক্রমে এ জগতে নেমে আসবার যেমন পথ রয়েছে, তেমনি এখান থেকে আরোহক্রমে সেখানে গিয়েও তো ওঠা যায়। যেমন করে এ জগৎ চল্‌ছে, তাতে জগতের ক্ষয়ও তো হচ্ছে, তার পূরণ হয় কি করে? আমার কাছে যে বিশিষ্ট জগৎ রয়েছে, ঘর-সংসার কর্‌তে গিয়ে পদে পদে যে অভাবের অস্তিত্ব অনুভব হয়, তা মেনে নিয়ে সেই পীড়নই মধুময় হয় এমন কোন পথ নাই কি? আমার এই দেহ, এই মন, এই জগৎ তো রয়েছে; এর মাঝে যখন যা প্রয়োজন হচ্ছে, আজ হোক্ কাল হোক্ একদিন পূরণ তো হচ্ছেই; তবু যে পিপাসা মেটে না, তার কারণ কি?

এর মূল খুঁজতে গিয়ে দৃষ্টি পড়ে হৃদয়ের দিকে। মানুষের সমস্ত অভাব সত্ত্বেও জীবন মধুময় মনে হয় যদি সে কাউকে ভালবাসে। আপনার মাঝে যত দৈন্য, যত অভাবই সৃষ্টি হয়, দিন দিন তাতে সেই ভালবাসার পাত্রের ওপর আকর্ষণ বাড়তেই থাকে। শত বিচিত্র ভঙ্গীতে অপূর্ণ মানুষ তাই সেই পূর্ণ প্রেমময়কে ভালবাসে। এই সংসারের নিত্য কান্নাও মধুময় হয় যদি তা তাঁর কাছে যায়। সমস্ত অভাবের স্মৃতি সে প্রেমাস্পদের সংস্পর্শে এসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কান্না তখন থাকে বটে, কিন্তু অশ্রুতে উত্তাপ থাকে না। নিজের মাঝে দৈন্য আরও বিশেষ করে অনুভব হয়, কিন্তু তাঁকে বুকে করে আবার সমস্ত রিক্ততা দূর হয়ে গর্ব্বে বুক ফুলে ওঠে। কাজেই সে অভাবের বেদনা বরং মধুর হতে মধুর হয়। এই ভাবের ভাবুক বলেই ভিক্ষোপজীবী হয়েও প্রেমিক বিদুর পরম ধনী। অভাবের হাত থেকে বাঁচতে হলে এমনি জ্ঞান আর প্রেম দু'দিকেই পথ রয়েছে।

কিন্তু জ্ঞানই বল, আর প্রেমই বল, উভয়তঃ চাই চিত্তের দীপ্তি। ভক্তি বলতে হৃদয়কে অপরের কাছে নত করে দেওয়া বটে, কিন্তু সেখানেও যদি চিত্তের জোর না থাকে, তবে সেই প্রেমাস্পদের ওপর বিশ্বাস গভীর ও নির্ভরতা স্থায়ী হয় না। চঞ্চল চিত্তে কোনও ভাব দাঁড়ায় না বলেই জ্ঞান কিম্বা প্রেম কিছুরই স্থান সেখানে হয় না। আত্ম-প্রত্যয়ে যেমন চিত্ত দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন, ভালবাসাতেও তেমনি একনিষ্ঠ গভীর আবেগ থাকা চাই। সাধন-জগতের ইমারতের ভিত্তিই হল দৃঢ় চিত্ত।

চিত্তের জোর যেখানে বেশী, সেখানে কামনা না থেকে থাকে সংকল্প। সংকল্প কামনারই গাঢ় অবস্থা। দুর্ব্বলের সাধ আছে, সাধ্য নাই, তাই সে পড়ে পড়ে কেবল কামনা করে, আর তা পূরণের উপায় না পেয়ে কল্পনার লোক সৃষ্টি করে। মানুষের ভিতরে যে শাশ্বত সত্তা বিদ্যমান, তার খানিকটা এই কামনার রসে মিশে গিয়ে সেই কল্পনাকে অতি সূক্ষ্ম ভাবে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু তাকে মূর্ত্ত করে তোলবার মত বজ্রদৃঢ় শক্তির জোগান পায় না বলেই তাকে সার্থক করে তুলতে বহুদিনের আবশ্যক হয়। সূক্ষ্ম-লোকে যে কামনাগুলি ভেসে বেড়ায়, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক এসে জুটলে তবে সেগুলি সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সংকল্পকে ক্রমশঃ দৃঢ়তর করে পারিপার্শ্বিককে আপন প্রয়োজন মত আকর্ষণ করা অমন দুর্ব্বল কামনার দ্বারা সম্ভব হয় না। যা-ই চাই না কেন, তাই পূরণ হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়, কিন্তু সে যে কোন্‌কালে গিয়ে সফল হবে তার ঠিক নাই। সংকল্প দ্বারা তার মাঝে প্রচণ্ড শক্তি inject করে আমরা এই কালের দীর্ঘত্ব কমাতে পারি। কিন্তু তা করতে হলে অনন্য-চেতা হয়ে একটা সংকল্পে শরবৎ তন্ময় হওয়া চাই। সেটা আমার শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হয়ে আয়ত্ত হলে তবে আর একটা ধরা যেতে পারে।

কিন্তু কামনাই হোক্, বা সংকল্পই হোক্, একটার পর একটা এলেও মানুষ কূল পায় না। তারা এক একটা করে জমে মানুষকে এমনি জড়িয়ে ফেলে যে মানুষ জন্ম জন্ম ধরে সেই কামনার ঋণ শোধ করতে থাকে। কিন্তু কামনাও অফুরন্ত—মানুষের জন্ম-বিরতিও অনিশ্চিত। ভোগলোলুপ মন হয়ত বলে বসবে, "বেশ তো, জন্মাব আর ভোগ করব। মরণ? সে তো দুদণ্ডের তরে। অনন্ত জন্ম—অনন্ত জীবন—অনন্ত ভোগ—অনন্ত সুখ! সুতরাং এই অনন্ত ভোগের পরিবর্ত্তে ওই অমঙ্গলকর ও অকিঞ্চিৎকর মরণটার কথা ভাবতে যাই কেন? সেটা তো আসবেই, আর এক নিঃশ্বাসে মিলিয়েও যাবে। কাজেই চাও, পাও, আর ভোগ কর।"

কিন্তু পেটুক ছেলের আনন্দ যেমন খাওয়ার সময়েই থাকে, পরে আবার সেই পেট সামাল দিতে

গিয়ে নাস্তানাবুদ্ হতে হয়, কামনার ভোগেও ঠিক তাই ঘটে।

পূর্ব্বেই দেখেছি, কামনা জন্মে অভাবের দুঃখ থেকে। মানুষ কোনও না কোনও অভাবের নিপীড়নে দুঃখ পেয়েই তার হাত থেকে নিস্তার পেতে কামনা করে। আনন্দ থেকে কামনার উদ্ভব হয় না। আনন্দের ন্যূনতাতেই তা পরিপূরণের জন্য মানুষ আরো চায়। কিন্তু সে চাওয়ার ফলে যখন সে পায়, ততক্ষণে তার সে অভাবের পরিবর্ত্তে অন্য অভাব জেগে উঠেছে, কাজেই সে পাওয়ার আনন্দ আর তখন তেমন করে উপভোগের সুবিধা হয় না। উত্তরোত্তর বাসনার যে আগুণ জ্বলতে থাকে, প্রাপ্তির সামান্য জলবিন্দু তা নিবাতে পারে না।

তাহলে মানুষের অভাব কোনোদিন মিটেও না—চাওয়াও ফুরায় না। তবে কি সে চিরদিনই কাঙ্গাল থাকবে—তার ভিক্ষার ঝুলি কি কোনও দিন পূরবে না, অপূর্ণতা নিয়ে সে এ জগতে এসে কোনও দিন পূর্ণ হবে না? এখানেই আসে চাওয়ার রকম ফের। ভিখারী মুঠা মুঠা চাল ভিক্ষা করে সারাদিনেও হয়ত ঝুলি পোরাতে পারে না। কিন্তু সে যদি তেমন দাতার সন্ধান পেয়ে মণি-কাঞ্চন চেয়ে বসে, আর নাছোড়বান্দা হয়ে তাই আদায় করে নিতে পারে, তবে আর তার দুয়ারে দুয়ারে ভিখ্ মাগতে হয় না। তেমনি চাইবার মত জিনিষ, আর তা প্রাপ্তির উপায় খোঁজ করে যদি তার দিকে উধাও হই, তবেই এই নিদারুণ অভাবের পূরণ হয়; নতুবা অপূর্ণ মানবের অভাবের খাঁকৃতি কোনও দিন মিটবার নয়। তার পূর্ণত্বের দিকে ঝোঁক রয়েছে অজ্ঞাতে; কিন্তু সচেতন হয়ে সাহস করে সে দিকে সে হাত বাড়াতে ভয় পায়। অথবা বহুজন্মার্জ্জিত হীন অবস্থার হীন সংস্কারে এমনি মূঢ় হয়ে আছে যে ছোট-খাটো নিয়েই সে তৃপ্তি পায়। বড়র কল্পনা তার মনে জাগেই না। এ যেন দিন-মজুরের লাখ টাকা পেয়ে খাটিয়া কেনার কল্পনার মত। তৃপ্তির দৌড় তার বর্ত্তমানে ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু এ চমক্‌ও তার ভাঙ্গবে। অতৃপ্তির দহনে আবার তাকে একদিন ছুটতে হবে। আজ সে কি চায়, তা জানে না।

সে চায় আনন্দ, কিন্তু পায় না। তাই তার বিশ্বময় ছুটাছুটী। আজ যেটা আনন্দের উপকরণ বলে সতৃষ্ণ হয়ে জড়িয়ে ধরছে, কাল তাকে বিতৃষ্ণ হয়ে দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এমনি আনন্দের কাঙ্গাল হয়ে সে অনাদি যুগ ধরে ঘুরে মরছে, কিন্তু শাশ্বত আনন্দ তার ভাগ্যে জুটছে না। লৌকিক সুখের আনন্দ খুঁজতে গিয়ে ঘাটে ঘাটে ঘা খেয়ে যখন মানুষের জীবনতরী উজানমুখে ছোটে, পরম ও চরম বস্তুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখন থেকেই তার খাঁটী আনন্দের পথ ধরা হয়। কিন্তু এ পথে আসে লক্ষের মধ্যে একটী। আবার এমনি কচিৎ যাঁরা আসেন, তাঁদের সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ গীতায় বলছেন—

> মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
> যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

—মানুষের মাঝে হাজারকরা কচিৎ একজন সিদ্ধির জন্য, চরম বস্তু লাভের জন্য চেষ্টা করে। আর সেই চেষ্টাকারীদের মাঝে যারা সকলদিক ঘেটে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছে, তাদের মাঝেও কচিৎ কেউ কখনও তাঁকে জানতে পারে।

এর কারণ কি? তবে কি শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে? না সাধারণ অধিকারীর মত 'কে জানে কে গিয়ে পায় বা না পায়' ভেবে হতাশ হতে হবে? তেজীয়ান্ বলেন, আমিই সেই কশ্চিৎ। যতই দুরবগাহ হোক্, সকল যাত্রী ফিরে যাক্—আমি সেখানে গিয়ে পৌছবই। তবে তাঁরা যে ওকথা বলেছেন, তার কারণ রয়েছে। সে হচ্ছে এই কামনা। সকল ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকলেও তাঁর দিকের

পথের অর্দ্ধেক গিয়েও, মানুষ হঠাৎ কামনার এক কটাক্ষে ধাঁ করে নেমে পড়তে পারে।

এই মহাবস্তু লাভের পথে ছোট খাটো অনেক কিছু এমন লাভ হয়ে যায় যে, তাদের অতিক্রম করে আর এগুতে ইচ্ছা হয় না। সাংখ্যবাদী তাই অষ্টসিদ্ধির উল্লেখ করেছেন। যাঁর ভিতরে বাসনার অণুমাত্র বিদ্যমান থাকে, তিনিই সেখানে গিয়ে তৌষ্টিক পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েন। রাজাধিরাজের এক একটা বিশিষ্ট অধিকার বা তাঁর একটী সামান্য বিভূতিতেই এঁরা মজে যান। স্বয়ং তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা আর হয় না। কামনা-পিশাচী সর্ব্বত্র গিয়ে এমনি সত্যসাধকের পথে হানা দেয়। তাকে জয় করবার একমাত্র পন্থা, ভূতনাথ হয়ে সমস্ত জগতের প্রতি উদাসীন থাকা। ভূতনাথ অমন হয়ে আছেন বলেই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব—আর জগন্ময়ী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী গৌরী তাঁর অঙ্কভাগিনী, যে কিছু চায় না, উপনিষদ বলেন সেই সব পায়। অকামঃ সর্ব্বকামঃ। উদাহরণ দেন মহাশূন্যের। মহাশূন্য নির্লিপ্ত বলেই তার কোলে অনন্ত কোটী গ্রহোপগ্রহসমন্বিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আর ইন্দ্রাদি দেবতারা কামনার চাতুরীতে ঐটুকু মাত্র অধিকার নিয়েই গণ্ডীবদ্ধ। মহাশূন্যের মত আপনাকে উদার করলে সমস্ত কামনার পূরণ হয়ে তার নিবৃত্তি হয়।

আবার প্রেমের দিক দিয়েও, কাম বা মদনের গোলাম না হয়ে ভজতে হবে মদনমোহনকে। তবেই সমস্ত রিক্ততা তাঁরই সুষমায় পরিপূর্ণ হয়ে জীবনে নিত্য নবরসের যোগান দেয়—মানুষ ধন্য হয়।

তাহলে সাধন-পথে সর্ব্বত্রই চাই মহাৎ লক্ষ্য, আর তা সাধনের জন্য অটুট সঙ্কল্প। সেই মহাবীর্য্যময় সংকল্পের প্রভাবেই সমস্ত বাসনা-কামনার দাগ মুছে গিয়ে দিব্যজ্যোতিঃর পথ উদ্ঘাটিত হবে, মানুষ তৃপ্ত হবে।

স্বামী রামতীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভাগীরথী-বক্ষে

——:*:——

বদরীদেবের কথা তীর্থরামের হৃদয়ে যেন এক আগুণ জ্বালাইয়া দিল। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রবল পিপাসা লইয়াই তীর্থরাম হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন হিমালয়ের বনে বনে ঘুরিয়া দেখিবেন, তাঁহার ইষ্টবস্তু কোথাও মিলে কিনা। কিন্তু বদরীদেবের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "তাই তো, যে বস্তু আমারই মাঝে গুহাহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে আমি বাহিরে খুঁজিয়া মরিতেছি কেন? ব্রহ্ম তো আমারই মাঝে; আমিই তো ব্রহ্ম! আনন্দের সন্ধান করিতেছি, সে আনন্দ তো উপকরণের দান নয়, সে যে আমারই আত্মানন্দ। অপরে আমাকে যে আনন্দ দিবে, তাহা তাহার খুশীর উপর নির্ভর করে; কিন্তু আমি তো ভিখারী নই। আমার নিজের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকিতে কাঙ্গালের মত অপরের কাছে হাত পাতিব কেন, অপরের খোশখেয়ালের প্রতীক্ষায় হা-হুতাশ করিয়া মরিব কেন? ব্যস্, সত্যলাভের অমোঘ সংকেত যখন পাইয়াছি, তখন আর ঘোরাফিরা নয়; এখন এক জায়গায় আসন জমাইয়া বসিয়া পড়িব, আর ইষ্টং বাধিগচ্ছামি, দেহং বা পাতয়ামি—হয় আমার

ইষ্টবস্তু লাভ করিব, নতুবা এই দেহ বিসর্জ্জন দিব। অমৃত কোথায়? অমৃত তো আমারই মাঝে! তবে আর কেন! এইবার এই হৃদয়-গোমুখী বিদীর্ণ করিয়া সুরধুনীর পূতধারা প্রবাহিত করিব!"

হৃদয়ভরা আবেগ লইয়া তীর্থরাম হৃষীকেশ আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্রহ্মারণ্যে আসিয়া একটা পাতার কুটীর রচনা করিয়া তীর্থরাম তাহাতেই আপনার আসন স্থাপনা করিলেন। তারপর তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকারের তপস্যা সুরু হইল।

এই তপস্যায় তীর্থরামের বাহ্য উপকরণ কিছুই ছিল না। বিচার দ্বারা সদা জাগ্রৎ হৃদয়কে সংসার-প্রবাহের উর্দ্ধে তুলিয়া ভাবাবেগে ভাসিয়া যাওয়া—এই ছিল তীর্থরামের তপস্যার রীতি। তপস্যার ফল কায় এবং ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি, যাহাতে এই তনু মনই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হইতে পারে। তীর্থরাম আবাল্য সংযমী, আশৈশব ভাবুক; তপস্যা তো তাঁহার কাছে কৃচ্ছ্রসাধনা নয়; তপস্যার রসেই তিনি ডুবিয়া আছেন, তাঁহাকে আর নূতন করিয়া তো দেহ-মনকে ঝালাইয়া নিতে হইবে না। তাই একান্ত-বাস আর তীব্র মনন, এ ছাড়া এখন তাঁহার আর কোন সাধনারই প্রয়োজন ছিল না।

তীর্থরাম সদানন্দ পুরুষ। যে আনন্দের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়াছিলেন, তাহার কিছু অপ্রতুলতা তাঁহার ছিল কি? আমরা বলিব—না। অসাধনে তীর্থরাম যতটুকু পাইয়াছিলেন, জন্মজন্মান্তরের সাধনায়ও মানুষ তাহা পায় না। কিন্তু মহৎ হৃদয়ের স্বভাব এই, অল্পে তাহা তুষ্ট হইতে জানে না। মহৎ প্রাণ শামুকের খোল নয় যে এক গণ্ডূষ পাইলেই তাহা ভরিয়া যাইবে। মহাপ্রাণ চায় মহাসিন্ধুকে আত্মসাৎ করিতে। তাই কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হয় না। চাই, আরও চাই—একদিককার আশা-ভরসা একেবারে উজাড় করিয়া দিয়া আর একদিকের সবটুকু দখল করিতে চাই—এমনি একটা দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা জাগে মহতের প্রাণে।

একদিকে দেহ-মন-প্রাণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী; আর একদিকে অভয়, অমৃত, আনন্দের অনন্ত-বিস্তার মহা-পারাবার। তীর্থরাম চান, "এদিককার সব নিঃশেষ হইয়া যাক্, আর ওদিককার অখণ্ড আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠুক—কাহার মাঝে?—তাহা জানি না। দ্বৈতকে কোথায়ও স্বীকার করিব না, আমার মাঝে আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠুক, একথাও বলিব না। আমিই আনন্দ!—না, তাও বুঝি ঠিক বলা হইল না—হয় আমি—নয় আনন্দ—অথবা আত্মানন্দ—আর কিছুই নয়। আমি যাহা চাই, ভাষায় তাহা ব্যক্ত হইবার নয়। আনন্দস্বরূপকে বিধিমুখে ভাষায় কেহ ফুটাইয়া তুলিতে পারে না; শুধু নেতিমুখে বলা চলে—এ নয়, এ নয়! এ যদি নয়, তবে আর কি?—তা জানি না; শুধু বলিব, দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন নয়, ইহাদের আভাসমাত্র নয়—কিছুই নয়! এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আনন্দময়, জ্যোতির্ম্ময় হইয়া জ্বলিয়া উঠুক, আনন্দ আনন্দে লীন হইয়া যাক, জ্যোতি জ্যোতির মাঝে মিশিয়া যাক্—জাগুক্ শুধু—শান্তম্—শিবম্—অদ্বৈতম্!"

এমনি করিয়া যাহারা চায়, তাহারা সাধ করিয়া প্রাপ্তিকে বুঝি আরও কঠিন করিয়া তোলে। ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মত প্যাঁচের পর প্যাঁচ সৃষ্টি করিয়া আবার অবহেলে তাহা কাটিয়া বাহির হইয়া যাওয়াতেই বুঝি তাহাদের আনন্দ। তাহাদের দীর্ঘদর্শী বিচারপ্রবণ চিত্ত একেবারে বিষয়ের মর্ম্ম চিরিয়া সত্যকে নিষ্কাশন করিতে চায়; মনের জোর অত্যন্ত বেশী বলিয়াই সে মন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে—সূক্ষ্মতমে ঢুকিয়া পড়ে, তবুও যেন এলাইয়া পড়িতে জানে না। তাই এই মনকে মারিবার জন্য আত্মার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ করিতে হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে—সে দ্বন্দ্বে বীর্য্য থাকে, আনন্দ থাকে, আত্মশক্তির নব নব উপলব্ধির বিস্ময় থাকে; আবার ইষ্টলাভ সহজ হইল না বলিয়া অতৃপ্তি আর

বেদনারও অন্ত থাকে না। তীর্থরাম এমনি করিয়া মাধুর্য্যলোকের পুরোভাগে জাজ্জল্যমান ঐশ্বর্য্যের সম্মুখীন হইলেন। ইহাতে তাঁহার জ্বালাও যেমন বাড়িল, তেমনি দুরন্ত জেদও চাপিয়া গেল।

কুটীরের সম্মুখে গঙ্গার তীরে তীর্থরাম দাঁড়াইয়া আছেন। কলকল শব্দে গঙ্গার ধারা উন্মত্তবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তীর্থরাম অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। বনভূমি নির্জ্জন; শুধু ঝিল্লীর রব আর স্রোতের গর্জ্জন দু'য়ে মিলিয়া ভাব-বিহ্বল মহাকালের একতারাতে অবিশ্রাম ঝঙ্কারের মত ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছে। তীর্থরামের মন যেন লঘু বাষ্পের মত নিখিলের উপর ছড়াইয়া পড়িল।—"হাঁ, সব এক—সব এক! আমি ছাড়া আর কিছুই নাই—কোনও দ্বৈতের বিরোধ কল্পনা নাই! সমস্তই আমার আত্মস্বরূপ! এই যে গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে, এ-তো রামেরই চরণকমল হইতে রামেরই মাঝ দিয়া চলিয়াছে। আজ যদি এ অনুভব সত্য না হয়, তাহা হইলে সমস্ত আপদের গোড়া এই দেহটাকে এই গঙ্গার স্রোতে বহাইয়া দিব!"

ভাবিতে ভাবিতে তীর্থরামের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই চক্ষু বাহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সিদ্ধ কবির কণ্ঠে এই সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—

গঙ্গা, তেথোঁ সদ বলহারে জাউঁ।
হাড়-চাম সব বার কে ফেঁকুঁ
যহী ফূল-বাতাসে লাউঁ।
মন তেরে বন্দরন্ কো দে দূঁ
বুদ্ধি ধারা মেঁ বহাউঁ।
চিত্ত তেরী মছলী চব জাবেঁ
অহং গিরি-গুহা মেঁ দবাউঁ।
পাপ-পুণ্য সভী সুলগা কর্
যহ্ তেরী জ্যোতি জগাউঁ।
তুঝ মেঁ পড়ূঁ তো তূ বন জাউঁ,
ঐসী ডুবকী লগাউঁ।
পঞ্চে জল-থল-পবন দশোঁ দিক
অপনে রূপ বনাউঁ।
রমণ করূঁ সৎ ধারা মাহিঁ
নহী তো নাম ন রাম ধরাউঁ।*

—হে গঙ্গা, শতবার তোমার মাঝে আপনাকে সঁপিয়া দিই! আমার অস্থিচর্ম্ম সব তোমার জলে ছুঁড়িয়া ফেলি, তোমার পূজার নৈবেদ্যস্বরূপ এই ফুলবাতাসা আমি লইয়া আসিয়াছি। তোমার তীরবাসী বানরদের দিয়া দিই আমার মন, আর তোমার ধারায় আমার বুদ্ধিকে বহাইয়া দিই। আমার চিত্তকে তোমার মাছেরা ঠুকরাইয়া খাইয়া ফেলুক। আমার অহংকে তোমার গিরিগুহায় সমাহিত করি। পাপপুণ্য সকল কিছুতে আগুন লাগাইয়া দিয়া তোমার জ্যোতিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি। তোমার মাঝে যদি পড়ি তো যেন তুমিই হইয়া যাই —এমন ডুবই দিতে চাই আমি। এই জল-স্থল-পবন, এই দশ দিক, সব আমার আত্মস্বরূপে ফুটিয়া উঠুক, আমি তোমার সত্য-ধারায় রমণ করি, নতুবা রাম নাম ধারণ করার সার্থকতা কোথায়?

গাহিতে গাহিতে তীর্থরাম গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

গঙ্গায় তীব্র স্রোত। একবার সে স্রোতে পড়িলে আর উঠিবার সাধ্য থাকে না। উঠিবার ইচ্ছাও তো তীর্থরামের নাই; "তুঝ মেঁ পড়ূঁ তো তূ বন্ জাউঁ"—তোমার মাঝে পড়ি তো তুমিই হইয়া যাই যেন—এই তাঁহার বুলি! আর কেহ সে খরস্রোতে পড়িলে বাঁচিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু তীর্থরাম এখন মরিতে চাহিলেও তো মরিতে পারেন না। আর তিনি যে মরিতেই গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন,

* রাগিণী জংলা—তেতালা।

তাও তো নয়। বাঁচা-মরা বুঝি না—চাই নিজানন্দের অনুভব! এই অনুভবের রসিক যে, তাহার তো মরণ নাই! রামতীর্থ নিজেই বলিতেন, "যে আত্মানুসন্ধিৎসু, নিখিল প্রকৃতি তার সহায়। ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতার সন্ধানে রাম যখন বাহির হইলেন, তখন বনের কাঠবিড়ালী পর্য্যন্ত তাঁহার সেবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।" এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল। গঙ্গায় পড়িবা মাত্রই তীর্থরাম অচেতন হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার শরীরে কোথায়ও একটু আঘাত লাগিল না—অথচ হিমালয়ের গঙ্গা পাথুরে গঙ্গা! সুরধুনী যেন জননীর মত পরম স্নেহে, পরম সন্তর্পণে তীর্থরামের পুণ্যতনু বুকে ধরিয়া লইলেন, তারপর ঢেউয়ের দোলায় নাচাইতে নাচাইতে নদীর মাঝেই একটা পাথরের চট্টানের উপর তুলিয়া দিলেন।

ধীরে ধীরে রামের চেতনা ফিরিয়া আসিল। চোখ মেলিয়াই রাম দেখেন, মাঝ নদীতে একটা পাথরের উপর তিনি পড়িয়া আছেন; পাথরের দুই ধারে তীব্র স্রোত, সে স্রোত পাড়ি দিয়া সাঁতরাইয়া তীরে উঠিবার কোনও উপায়ই নাই। তীর্থরাম যেন সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন। এইখানে—এই গঙ্গাগর্ভে তাঁহাকে কে আসিয়া বাঁচাইবে? চারিদিকে একবার চাহিয়াই তীর্থরাম শিহরিয়া উঠিলেন।—সে কি ভয়ে? না, আনন্দে!—"মরণের বিভীষিকার কথা বলিতেছ? জীবনে আর মরণে ভেদ কোথায়? আমি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছিলাম? গঙ্গার প্রবাহে না আনন্দের প্রবাহে? এ কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছি? সংসারারণ্যের কূলে কি?—না, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভাগীরথীরই বুকে, অটল নির্ব্বিকার মহিমার শিলাসনে! আমার দুই পাশ দিয়া উচ্ছল আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছে—আমি তার দ্রষ্টা, আপ্তকাম! মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব আমি, এই বিবিক্ত মহাশ্মশানে আত্মপ্রতিষ্ঠার শিলাপট্টে আজ আসন পাতিয়াছি। আমি অসঙ্গ, কিন্তু নিঃসঙ্গ নই—এই তো মহাপ্রকৃতি আমার সঙ্গিনী। সংসারের কূল হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এমনি করিয়াই আমি আবার বিশ্বের মর্ম্মকোষে অনির্ব্বাণ মহাজ্যোতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছি! কোথায় শঙ্কা, কোথায় মৃত্যু, কোথায় বন্ধন! আমি মুক্ত—আমি মুক্ত! আমি স্বরাট্—রাজরাজেশ্বর আমি!"

তীর্থরামের দুই চক্ষু বাহিয়া আনন্দধারা ঝরিতে লাগিল। সেই শিলাপট্টে বসিয়াই আবেগকম্পিত কণ্ঠে মহাকবি গাহিয়া উঠিলেন—

আজাদা অম্, আজাদা অম্!
অজ্ রেঞ্জ্ দূর উফ্তদা অম্!
অজ ঈশ্ব এ জালে-জহাঁ—
আজাদা অম্—বালাস্তম্!

তন্হাস্তম্, তন্হাস্তম!
চেহ্ বুল অজব তন্হাস্তম্,
জুজ্ মন ন বাশদ্ হৈয়্ শৈ.
য়ক্তাস্তম্—তন্হাস্তম্!

চুঁকার মরদম্ ভী কুনন্দ,
অজ দস্তো-পা হরতক্ কুনন্দ,
বেকার মাঁদম জায় হয়কত,
হম্ মনম হর্ জাস্তম্।

অজ্ খুদ চহা বেরু জহম্,
গো-মন কুজা হরকত কুনম,
অজ বহর্ চেকারে কুনম্
মন রুহে-মতল বহাস্তম্।

চেহ্ মুফ্লিসম্, চেহ্ মুফ্লিসম্,
বা খুদ্ নমীদাবম্ জরে,
অঞ্জম্ জরাহির্ মিহর্-জর্
জুমলা মনম য়ক্তাস্তম্!

দীৱানা অম্—দীৱানা অম্ !
বা অকলো-হুশ বেগানা অম্ !
বেহুদা আলম ভী কুনম্
ঈং করদমো মন খ্বাস্তম্ !

নমরুদ শুদ্ মরহুদ্ চুঁ ?
বুদশ্ নিগহ্ মহদুদ্ চুঁ ?
মারা তকব্বুর কৈ সজদ্,
চুঁ কিব্রিয়া হর্ জাস্তম্।

তালিব্ ! মকুন্ তৌহিনে মন,
দরখানা অৎ "রাম" অস্ত বীঁ,
রু তাফ্তী অজ্ মন চরা !
দর কল্বে-তো পৈদাস্তম্ !

—মুক্ত আমি—মুক্ত আমি ! দুঃখ আর শোক হতে দূরে—বহুদূরে ! সংসারের মায়াজাল হতে মুক্ত আমি—উর্দ্ধে আমি !

—একা আমি—নিঃসঙ্গ আমি ! এ কি পরম আমি নিঃসঙ্গ ! আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনও বস্তুর আশ্চর্য্য—অস্তিত্বই যে নাই। আমি একমেবা-দ্বিতীয়ম্—আমি সঙ্গীহীন !

—মানুষ কাজ করছে, হাত-পা নাড়ছে, আর আমি ততক্ষণ একেবারে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি, কেননা সমস্ত গতির আমিই তো উৎস। এ বিশ্ব যে আমার প্রভাবেই গতিশীল।

—আমার বাইরে আমি কোথায় যাব ? বল, কোথায় আমি যাব ? আমি কাজই করব বা কিসের গরজে ? কেননা বিশ্বের যা কিছু, সকলের প্রাণ আর আত্মা যে আমিই !

—আমি কি কাঙাল ? বাস্তবিকই কি আমি সম্বলহীন ? যবের একটী দানাও কি আমার কাছে নাই ? রত্ন, সুবর্ণ, আকাশের সূর্য্য, নক্ষত্র—সবই যে আমি ; একমাত্র আমিই যে আছি !

—উন্মত্ত আমি—বিক্ষুব্ধ আমি ! বুদ্ধি আর বিবেকের সঙ্গে এতটুকু সম্বন্ধও নাই আমার ! আমি খেয়ালের বশে এই বিশ্ব সৃষ্টি করছি ; আর সৃষ্টির পরক্ষণেই তা হতে ফারাক্ হয়ে যাচ্ছি !

—নমরুদকে মার খেতে হল কেন ? এই জন্য যে তার দৃষ্টি ছিল পরিচ্ছিন্ন। আমি যে সবার ওপর—সবার শ্রেষ্ঠ—সকলকে জড়িয়ে আছি আমি ! তুচ্ছ অহঙ্কার আমার মাঝে ঠাঁই পায় কি ?*

—হে জিজ্ঞাসু, সাবধান, আমার অবমাননা করো না। ওই দেখ, তোমার ঘরে রাম ! তুমি আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন ? আমি যে তোমার হৃদয়ে প্রকাশরূপে ফুটে উঠেছি !

সকাল বেলায় তীর্থরাম গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, আর এখন বেলা দ্বিপ্রহর। কিন্তু তীর্থ-রামের সেদিকে হুঁশ নাই। মৃত্যুর কবল হইতে অমৃত ছিনাইয়া আনিয়াছেন, আজ আর তাঁহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা নাই। মুক্তির দিশা যে

*নমরুদ ছিলেন শামদেশের বাদশাহ। নিজের অতুলন ধন-সম্পদের অহঙ্কারে নিজকেই ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতেন। ঈশ্বরেচ্ছায় একদিন কাণে মাছি ঢুকিয়া যাওয়ায় তাঁহার মাথার মাঝে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। হাকিমেরা আসিয়া ব্যবস্থা দিল, "কেহ যদি আপনার মাথায় জুতা মারে, তাহা হইলে একটু আরাম পাইবেন।" অগত্যা নমরুদ সিংহাসনের পেছনে এক গোলামকে জুতাহাতে মোতায়েন করিয়া রাখিলেন—গোলামের কাজ হইল, থাকিয়া থাকিয়া বাদশাহের মাথায় জুতা মারা ! এইখানেই কিন্তু বাদশাহের বিপত্তির শেষ হইল না। ইহার পর এক ফিরিশ্তা (দেবদূত) আসিয়া নমরুদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া দেশের বাহির করিয়া দিল। নমরুদ পথের ভিখারী হইয়া দুয়ার দুয়ার ঘুরিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন। এমনি করিয়া তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া নাস্তিকতা ছাড়িয়া পরমেশ্বরের শরণাগত হইলেন। তীর্থরাম বলিতেছেন, এই নমরুদ জীবাত্মা, মাছিটা অহঙ্কার, আর দেবদূত হইতেছেন যম। নমরুদের এই বিপত্তির কারণ, তিনি শুধু তাঁহার দেহকেই ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, তাই তাঁহার দৃষ্টি পরিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তিনি যদি এই বিশ্বচরাচরকে ঈশ্বর মানিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মাঝে ক্ষুদ্র অভিমান ঠাঁই পাইত না, এবং তাঁহাকে এত লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইত না।

পাইয়াছে, এই দেহের খবরদারীতে তাহার প্রয়োজন? আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা তাহার কাছে প্রলাপমাত্র নয় কি? তীর্থরাম আত্মানন্দে বিভোর, দেহের অণুতে অণুতে উদ্বিলসিত বিদ্যুৎশিহরণে বিবশ, দেশ-কালের পরিমিত জ্ঞান কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, কে তাহাকে খুঁজিয়া আনিয়া স্থূলের সম্বন্ধে তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিবে?

হয়ত তীর্থরাম এই জলসমাধি হইতে ফিরিতেন না। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াও যেমন পাথরে টক্কর খাইয়া তাঁহার দেহ চূর্ণ হয় নাই, তেমনি এক অভাবনীয় উপায়ে তিনি এই জীয়ন্তে মরার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। ব্যাপারীরা হিমালয়ের জঙ্গলে কাঠের স্লিপার সংগ্রহ করিয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। নদীর বাঁকে কিম্বা কোনও পাথরের চট্টানে বা নদীর গুহায় সে স্লিপারগুলি কখনো কখনো আটকাইয়া যায়। এইজন্য ব্যাপারীদের নিযুক্ত লোক স্লিপারের হেপাজৎ করিবার জন্য সঙ্গে চলে। গঙ্গার তীব্র স্রোতে নৌকা চলা অসম্ভব; তীরে তীরে চলিয়াও কাজ হইবে না। তাই চামড়ার মশক তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চড়িয়া স্লিপারের সঙ্গে সঙ্গে লোক চলে। দৈবাৎ তীর্থরাম যেখানে বসিয়াছিলেন, সেদিন সেখানে এইরূপ মশকারোহী কয়েকটী লোক আসিয়া উপস্থিত। গঙ্গার বক্ষে তেজঃপুঞ্জকায় সাক্ষাৎ শঙ্কর-বিগ্রহ তীর্থরামকে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। কি করিয়া যে ইনি এখানে আসিলেন তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ সাহায্য না করিলে তীরে ফিরিবার যে কোনও উপায় নাই, তাহাও জানা কথা। মশকওয়ালারা তীর্থরামের আসনের কাছে মশক ভিড়াইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ তীরে উঠিবেন না কি? আমারা তাহা হইলে সাহায্য করিতাম।" তীর্থরাম মধুর হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, চল।"

এইরূপে দৈবক্রমে সেবার তীর্থরামের জীবন রক্ষা হয়। এমনি করিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সেবার তিনি যে সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিজেই এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

আমার মনের মানস-সরোবর অমৃতে পরিপূর্ণ হয়ে টল্‌মল করছে যে! হৃদয় হতে অনন্দের স্রোত বয়ে চল্‌ছে জগতের পানে—আমার প্রতি রোমকূপ ধন্য, সার্থক। মহা-বিষ্ণুর সাত্ত্বিক প্রকাশ এমনি উপচে উঠ্‌লো যে তা আর যেন তাঁর মাঝে কুলালো না। সেই সত্ত্বধারাই গঙ্গাজল হয়ে চরণ বেয়ে জগৎ প্লাবিত করে ছুটেছে।......কত দিন যে এই আবেশে কেটে গেল। কিন্তু দিন-রাতের খবর রাখে কে?...এ কি আমার বঁধুর সাথে মিলনের আনন্দ, না এই দেহের মরণের আক্রন্দ? সংস্কারের অন্তিম সংস্কার হয়ে গেল যে! বাসনার মরণ হল, দুঃখ-দৈন্য একবার উঁকি দিতে না দিতেই আলোর সাম্‌নে আঁধারের মত কোথায় মিলিয়ে গেল, পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য খতম হয়ে গেল।......যে তুরীয়াবস্থা এতদিন পর্য্যন্ত আকাশকুসুমের মত ছিল, সে যে দেখছি আমি স্বয়ং। মধ্যম পুরুষ গণ্য করে এতদিন যাঁর স্মরণ-মনন করে এসেছি, আজ যে তিনি উত্তম পুরুষ—সোঽহম্‌! মধ্যম পুরুষ কোথায়? নাই তো!—ওম্‌ আমি—আমি ওম্‌! মৈঁ হুঁ তুম্‌—দফ্‌তর্‌ গুম্‌! ওঁ—ওঁ—ওঁ!

(ক্রমশঃ)

———

আত্মানং বিদ্ধি !

"আত্মানং বিদ্ধি !"—আত্মাকে জান, আপনাকে জান।

কোনও উপকরণের অপেক্ষা না রেখেই যদি স্তব্ধ হৃদয়ের গোমুখী বিদীর্ণ করে আনন্দের গঙ্গা বয়ে গিয়ে থাকে কোনোদিন তোমার মাঝে, তবে সেইখানে তোমার আত্মার পরিচয় ! বিদ্যুৎ-চমকের মত একবার তিনি দেখা দিয়ে আড়াল হয়ে গেছেন—অনন্তের পিপাসা জাগিয়ে গেছেন তোমার বুকে, তা অনুভব কর্‌ছ না কি ? উপকরণের স্তূপে চিত্তকে ভারাক্রান্ত করেছ—তাই মলয়-নিঃশ্বাসের মত মৃদু সুরভি তাঁর সঞ্চরণ তোমার চেতনাকে স্পর্শ কর্‌ছে না। ছুঁড়ে ফেলে দাও যত জঞ্জাল—প্রভাতের আলোর মত, নগ্ন শিশুর মত, নিদ্রাভঙ্গে সদ্যোজাগ্রৎ হে বিমুগ্ধচিত্ত, পুলককম্পিত আত্মস্বরূপ ! একবার অসঙ্কোচ উদার আনন্দের দৃষ্টি মেলে তাকাও দেখি এই জগতের পানে ! দেখ, আনন্দে, সৌন্দর্য্যে, বেদনায় এ জগৎটা যেন কাঁপছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভিতরটাও কাঁপছে। ভার ফেলে দাও—তুমি মুক্ত, স্বচ্ছন্দ-গতি, বাতাসের মতই লঘু, আলোকের মতই স্বচ্ছ। বায়ুসমুদ্রে নিমজ্জিত এ জগৎ; এত বড় বোঝা সে বহন করছে কি করে ? আলোকের উচ্ছ্বাসে প্লাবিত এ জগৎ; কর্ম্মের ভারে নুয়ে পড়ছে না সে ? কি করে এই ভূতগ্রাম অনায়াস লঘু স্বাচ্ছন্দ্যে এই বিশ্বকে বহন কর্‌ছে ? সেই সঙ্কেত আয়ত্ত কর। সে সঙ্কেত ব্যাপ্তির সঙ্কেত, ঔদার্য্যের সঙ্কেত, শিবত্বের সঙ্কেত। শিব রিক্ত, তাই তিনি বিশ্বেশ্বর। একের বোঝা না বয়েই আমি সকলের বোঝা বইছি। আমি বিশেষ করে কারও সেবক নই বলেই সকলের আত্মস্বরূপের সেবক !

কাউকে তুমি ভালবাস ? তবে সেই ভালবাসার মাঝেই আত্মস্বরূপের সন্ধান পাবে। ভালবাসার অর্থই যে রিক্ততা, ত্যাগ। নিজের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে না আস্‌তে পার্‌লে তো কাউকে ভালবাসা যায় না। আবার ব্যক্তিত্বের মোহ না কাটাতে পার্‌লে আত্মস্বরূপের অনুভবও তো জাগে না। কাজেই যে ভালবেসেছে, ভালবেসে আত্মসুখকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, সে-ই আত্মাকে জানার পথে চলেছে। ভালবাসায় দুঃখ আছে কি ?—না, দুঃখ তো নাই ; যদিই বা থাকে তো সে আনন্দেরই তির্য্যক্‌রূপ। সে দুঃখের তাড়নায় ভিতরে পিশাচ জাগে না, প্রতিহিংসা-বৃত্তি জাগে না, প্রতীকারের বাসনা জাগে না ;—জাগে শুধু আঘাতে আঘাতে হৃদয় হতে অমৃত ঝরাবার মত স্নিগ্ধতা, শুধু অসীম সহিষ্ণুতা, শুধু শিরীষ-সুকুমার প্রশান্তি ! "আমি ভালবাসি—কাকে ভালবাসি, কেন ভালবাসি তা জানি না—শুধু ভালবাসি"—ভালবাসার আদি মুহূর্ত্তে এই একান্ত নিবিড় অনুভবটী যদি না জেগে থাকে, শুধু ভালবাসার অনুভূতিতে যদি আপনাকে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনকেও না ভুলে গিয়ে থাক, যদি কাছে পাবার, ভোগ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষাটাই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উন্মত্ত হয়ে উঠে থাকে, তবে ও ভালবাসা নয়, ভালবাসার নামে অন্য আর কিছু ; ওতে তুমি কামনার, জ্বালার, দুর্ব্বলতার পরিচয় দিচ্ছ ! স্নিগ্ধ, উদার, আনন্দময় আত্মস্বরূপের অনুভব ওতে জাগবে না তো। হয়ত আদি-মুহূর্ত্তে ভালবাসা একবার তার স্নিগ্ধ-পরশ বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তুমি তাকে চিন্‌তে পার নি, ধরে রাখতে পার নি। শুধু মিলনাকাঙ্ক্ষায় ভালবাসার সূচনা নয়, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই যদি না অহেতুক তৃপ্তি থাকে, তবে সে

কাম, প্রেম কখনো নয়। বিরহে কাম জর্জ্জরিত, প্রেম উদ্ভাসিত; উপকরণের অভাবে কাম লাঞ্ছিত, প্রেম পরিতৃপ্ত, স্বরাট্; রিক্ততায় প্রেমের উল্লাস, কামনার বিনাশ। তাই সে-ই ভালবাসায় আত্ম স্বরূপের পরিচয় পাবে তুমি, যে ভালবাসা শুধু 'আমি ভালবাসি' এইটুকু জানিয়েই অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে হৃদয় আপ্লুত করে দেয়, যে ভালবাসা প্রিয়জনকে কাছে টেনে আন্‌তে চায় না, যে ভালবাসা দেহ-মনকে গলিয়ে আলোকের মত স্বচ্ছ-তরল করে তাই দিয়ে প্রিয়জনকে ঘিরে থাকে। যে ভালবাসায় আপনাকে ভুলতে পার্‌বে, সেই ভালবাসায় আপনাকে পাবেও। তাই বল্‌ছিলাম, আপনাকে যদি জান্‌তে চাও, কৃপণের বদ্ধ-মুষ্টির মত হৃদয়টাকে সঙ্কুচিত করে রেখো না—কারু কাছে আপনাকে সঁপে দাও, অমনি-অমনি আপনাকে বিলিয়ে দাও!

অথবা আত্মার মহিমাকে জাগ্রত কর—নিজকে প্রেমস্বরূপ বলে উপলব্ধি করে। এই এখানে বসেই তুমি নিখিলের হৃদয়কে আকর্ষণ কর্‌ছ; কারু টানে টল্‌ছ না, কারু পেছনে পেছনে ছুটছ না. অথচ অনুভব কর্‌ছ, জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা, তা ছুটে আস্‌ছে তোমারই পানে। সিন্ধু-তরঙ্গ যেমন আকুল উন্মাদনায় আছড়িয়ে পড়ে তট-শৈলের ওপর, আর শিকরবাষ্পে তাকে আর্দ্র করে দিয়ে ফিরে যায়—কিন্তু শৈলাধিরাজ অটল, প্রশান্ত, নির্ব্বিকার; তেমনি নিখিলের প্রাণের উচ্ছ্বাস তোমাকেই প্লাবিত করতে ছুটে আস্‌ছে, প্রশান্ত স্মিতহাস্যে তুমি তাকে গ্রহণ কর্‌ছ—তোমার মাঝে সবার ঠাঁই করে দিয়েও তুমি সীমার অতীত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছ। বিশেষকে তুমি ভালবাস না, বিশেষের মাঝে গুহাহিত যে নির্ব্বিশেষ, তিনিই তোমার প্রাণের দোসর। তোমার প্রেমের ভিখারী সেই চিরন্তন এক। ভাবব্যূঢ় সেই এককেই তুমি রূপে-রূপে দেখছ, তাই তোমার প্রেমে কামনা নাই, বিশেষ করে কাউকে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা নাই, অথচ সবার জন্যই তোমার হৃদয়ের অঙ্গনতলে আসন পাতা রয়েছে। তোমার প্রেম আলোর মত; তার পরিবেষের মাঝে যে আসে সেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেই জানে, সে-ও তোমারই মত জ্যোতির্ম্ময়, তোমারই সগোত্র সে। বিশেষ করে কাউকে চাও না বলেই তোমার প্রেম ঈর্ষ্যা জাগায় না, জাগায় আত্ম-বিসর্জ্জনের ব্যাকুলতা। উদাসীন ভোক্তা তুমি, ভিখারী মহারাজ তুমি, তাই কেউ তো জানে না কিসে তোমার তৃপ্তি; সর্ব্বস্ব ঢেলে দিয়েও তাই মনে হয়, তোমায় বুঝি কিছুই দেওয়া হল না! এ জগতে এমন কি সম্পদ আছে, যা দিয়ে তোমায় ভোলাবে তারা? এমন কি সৌন্দর্য্য আছে, যা দিয়ে তোমায় মুগ্ধ কর্‌বে? সমস্ত সম্পদের উৎস তুমি, নিখিল সৌন্দর্য্যের নির্ঝর তুমি, বিশ্বের প্রাণা-রাম তুমি। তাই তোমাকে আয়ত্ত কর্‌বার মূঢ় কল্পনা কারু মাঝে জাগে না; তোমায় কেউ বশ কর্‌তে চায় না, চায় তোমারই বশ হতে। তুমি কারু কামনার বস্তু নও, কেননা তুমি কামনার ফল-স্বরূপ নও তো; সমস্ত কামনার নির্ব্বাণ তুমি। তোমার কোনও কামনা নাই বলেই তোমার সংস্পর্শে অপরের মাঝেও তুমি কামনাকে উগ্র করে তোল না। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্—একো বহুনাং ত্বং বিদধাসি কামান্"—নিত্যেরও নিত্য তুমি, চেতনেরও চেতন তুমি, একা তুমি বহুর কামনা বিধান কর্‌ছ; যে তোমাকে যে ভাবে চায়, সেই ভাবে পেয়েই তৃপ্ত, তোমার ভাণ্ডার-দুয়ার হতে বিমুখ হয়ে কাউকে ফিরে যেতে হয় না। আপ্তকাম তুমি, কামনার অনায়াস বিধাতা তুমি, তাই তোমার সংস্পর্শে এসে কাম প্রেমে রূপান্তরিত হয়, বাসনা আনন্দে ফুটে ওঠে।

কাম-গন্ধহীন ভালবাসার এইএক রূপ; এইরূপে তুমি আত্মারাম, আত্মার সদাজাগ্রৎ মহিমা!

"আত্মানং বিদ্ধি"—শুধু ভাবেই নয়, কর্ম্মেও। নির্ব্বিকার প্রশান্তিই কেবল আত্মার রূপ নয়; এই কর্ম্মচঞ্চলতাও তাঁর ঐশ্বর্য্য। প্রশান্তি সেই ঐশ্বর্য্যেরই ভূমিকা। স্থিরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্ম্ম করা চাই। কর্ম্মচক্র পূর্ণবেগে আবর্ত্তিত হোক্, আমি কীলকের মত স্থির; আমি জানি এই চক্রের আবর্ত্তন ওই ধ্রুব-দণ্ডেরই আশ্রিত; ওই ধ্রুব সত্তার অবলম্বন না থাকলে এই ভীষণ আবর্ত্তনে বস্তু-পিণ্ড রেণু রেণু হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত। তোমার অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, নিত্যবর্ত্তমানে প্রবহমান অনাদি কালস্বরূপ তুমি। তাই তোমার অবসরেরও অপ্রতুলতা নাই। অবিচ্ছেদ কর্ম্মে পরিপূর্ণ তোমার জীবন, কিন্তু তা বলে সেটা শুধু কর্ম্মেরই ঠাস-বুনোনী নয় তো! আসক্তিই কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মকে সিমেণ্টের মত জুড়ে দিয়ে জীবনটাকে পাষাণের মত গুরুভার করে তোলে। তোমার আসক্তি নাই বলেই কর্ম্ম তোমার কাছে বাষ্পের মত লঘু। অফুরন্ত তোমার প্রাণের সঞ্চয়, তাই পরিণাম-চিন্তা তোমায় বিব্রত করে না। দুঃখ আসুক, ক্ষতি আসুক, বীরের মত তুমি বুক পেতে দিতে পার; সম্পদ্ আসুক, পুরস্কার আসুক, নিমেষের মাঝে তুমি তার মোহ হতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে শিব-স্বরূপে সমাহিত হয়ে যেতে পার। রোমে (Rome) আগুন লাগিয়ে দিয়ে নীরো (Nero) নিশ্চিন্ত হয়ে বীণা বাজাচ্ছিল। নীরো নির্ম্মম হতে পারে, কিন্তু তার নির্ম্মমতার মাঝেও একটা সত্য আছে। আমিও আমার রোমে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অমনি একান্তে বসে বীণা বাজাতে চাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অনুভব করতে চাই যে এই রোম আমারই দেহের একটা অংশ। নীরো তা জানত কিনা জানি না। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে যদি প্রলয়ের তাণ্ডব-লীলা সুরু হয় তো হোক্; জানি, সে প্রলয় আমারই ইঙ্গিতে। প্রলয়ের মাঝেও সৃষ্টির প্রাণকে সমাহিত করে রাখতে পারে যে মহাশক্তি, তারই অন্তরঙ্গ অনুভব আমার মাঝে। তাই প্রলয় আমার কাছে সৃষ্টির দ্যোতনা।

অনায়াস কর্ম্মই আত্মার বিলাস। নিঃশব্দে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে প্রভাতে আলোর বিকাশ হয়েছে, নিঃশব্দে সে আলো মধ্যাহ্নে দুঃসহ তেজে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, নিঃশব্দে আবার সে অস্তরাগে বুকের শেষ রক্ত-ঝলক শ্রান্ত জগতের ওপর ঢেলে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। রাত্রির অন্ধকার এসেছে নিঃশব্দে চরণপাতে, আকাশের গায় লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ নিঃশব্দে ফুটিয়ে তুলেছে। এই উদার ব্যাপ্তি, এই অটল মহাশান্তির মমতাভরা সন্তর্পণ আবেষ্টনের মাঝে শুনি পাখীর কাকলি, যন্ত্রশালার ঘর্ঘর-ধ্বনি, ঝিল্লীর একটানা ঝঙ্কার। সব সত্য, কিন্তু মহাসত্য ওই অটল প্রতিষ্ঠা, মহাসুপ্তিবৎ নিস্তব্ধ ওই শান্তির পারাবার। ওই তো আমার আত্মস্বরূপ, ওই তো আমার অনায়াস মহিমা! কর্ম্মে আমি অনায়াস, প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বিশ্বের এই অক্ষুব্ধ প্রাণকে আমার মাঝে শোষণ করেছি বলে। কর্ম্মকোলাহলে জগৎ সচকিত হয়ে উঠেছে; তার মাঝে যে আমি নাই, তা তো নয়! আমার চিত্ত বিস্ফারিত, হৃদয় আবেগে কম্পিত, দেহের প্রতি অণুপরমাণু কর্ম্মতাণ্ডবে দুর্দ্দমনীয়! দেহ-সুখের আরামকুণ্ডলীতে আত্মহত্যা করতে আমি জানি না। যেখানে দুঃখ, গ্লানি, অপমান, মরণের বিভীষিকা, সেইখানেই উল্কার মত, ঝঞ্ঝার মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, প্রাণের ফুৎকারে সকল বাধা উড়িয়ে দিতে চাই। তবুও আমি স্তব্ধ, আমি গম্ভীরবেদী, মহাসমুদ্রকে সংক্ষুব্ধ করেও আমি আকাশের মত নির্ব্বিকার। যারা ভূচর, ঝঞ্ঝার হাত ধরে মহাসিন্ধুর উল্লসিত মরণ তাণ্ডব দেখে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে; আকাশের পানে তাকিয়ে দেখে, সেখানেও মেঘের তিমিরপুঞ্জ, বজ্রের গর্জ্জন, বিদ্যুতের কশা-

স্খলন। কিন্তু এই তাণ্ডবই তো আমার একমাত্র সত্য নয়। এই তাণ্ডবেও যে ছন্দ আছে, ছন্দের অন্তরালে সুষমা আছে, সুষমার মাঝে রসের নিবিড় অনুভূতি আছে! ঝড় আসে, ঝড় যায়; মহা-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে এলিয়ে পড়ে; আকাশের অঙ্গনে ধীরে ধীরে তারার দীপালি ফুটে ওঠে; প্রলয়-তাণ্ডবের পর শিবস্বরূপ আবার প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। ওই তো তোমার, আমার আত্মস্বরূপ।

বলো না, এ মরণের শান্তি, প্রলয়ের স্তব্ধতা। জীবনেও আমি প্রতিনিয়ত এই মরণকেই বয়ে চলেছি যে! কর্ম্মে উন্মথিত এই জগৎকে যদি করামলকবৎ আমার মুঠার মাঝে পুরে রাখতে না পারি তো শক্তিকে বুকের মাঝে পেলাম কোথায়? অফুরন্ত কর্ম্ম-চঞ্চলতার মাঝেই যদি অচঞ্চল হয়ে না থাকতে পারলাম তো আমার সাত্ত্বিকতার বীর্য্য কোথায়? জীবন আর মরণ, কর্ম্ম আর বিশ্রাম, দিন আর রাত আমার কাছে পর্য্যায়ক্রমে আসে না। জীবনের ও-পিঠেই আমি অনুভব করি মরণের প্রশান্তি, মরণের মাঝে দেখি প্রাণে স্পন্দমান জীবনের ভ্রূণ; দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ স্ফূরণে আমি অনুভব করি আত্মার নিস্তব্ধ নিগূঢ় উল্লাস, আবার বিশ্রামের নির্জ্জনতায় দেখি বিশ্বহিতের অগ্রদূতরূপী অগণিত প্রেরণায় আমার ভাবজগৎ আকীর্ণ, প্রকাশের আকুলতায় স্ফুরন্ত! দিবারাত্রির আবর্ত্তনের ঊর্দ্ধে নিত্যজ্যোতিঃতে দেদীপ্যমান সবিতা আমি!

তুমিও তাই! এই জগৎটাও তাই!—ওম্।

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

—:*:—

৩ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—শেষ রাত্রে ৩টার সময় উঠেও সনাতন প্রথানুযায়ী বের হতে ৫টা বেজে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে তিন মাইল পথ চলে **গোদী সরাই** নামে একটি ছোট চটী পেলাম। পথ সীধা, কালকার মত, কোন কষ্ট নাই। গোদী সরাইয়ে ৪।৫টি চটী আছে। বৃন্দাবনের মাতাজীর জ্বর হয়েছিল বলে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি আজ যেতে পারবেন কিনা জানবার জন্য এখানে বসে অপেক্ষা করতে করতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে বললে, বেলা ৮ টার সময় গোদীসরাই হতে বের হয়ে, একটি বড় চড়াই করে পাহাড়ের চূড়ায় উপস্থিত হলাম। গোদীসরাই হতে এ স্থানটা ৪ মাইল। এই পথটুকু আসতে কিন্তু ছোট মাঝারী তিনটী চড়াই-উৎরাই শেষ করে, একটি পাকাপুল পার হয়ে, এক মাইল খাড়া চড়াই করতে হয়েছে। আজ সকাল থেকে এইটি চতুর্থ চড়াই-উৎরাই। পুলটি পার হয়ে একটি পাকদণ্ডী রাস্তাও আছে, সেটী ধরে খাড়া উঠলে এক মাইলের জায়গায় আধ মাইল হয় বটে, কিন্তু সে খুবই কষ্টকর। যে স্থানটিতে বসেছিলাম, সেটী চারটী রাস্তার সংযোগস্থল। একটি ধরে আমরা পূর্ব্বদিক হতে এলাম; পশ্চিম দিক যে উৎরাই রাস্তা গিয়েছে সেটী যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরী যাবার জন্য; দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে খাড়া চড়াই রাস্তাটী

গোদী সরাই
৩ মাইল

গিয়েছে সেটী মুসুরী-দেরাদুনের রাস্তা ; আর একটী রাস্তা সিধা দক্ষিণ দিকে গিয়েছে সেটী দিয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাওয়া যায়। রাস্তা কয়টীই সমান চওড়া, কাজেই আমাদের কোন পথে যেতে হবে জেনে নিতে ও সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই দুজন সাধু এসে আমার কাছে বসে ছিলিম-পূজা সাঙ্গ করে উৎরাই পথে পশ্চিম দিকে চলে গেলেন। আমাদেরও সেই পথে যেতে হবে।

ঘণ্টাখানেক পর দূরে অস্ফুট ঘণ্টার শব্দ শুন্‌তে পেলাম। ব্যাপার কি বুঝ্‌তে পারলাম না। শব্দটা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হল। অল্পক্ষণ পরেই এক দলে প্রায় ৫০০ ছাগলের পিঠে খাবার জিনিষ সহ কয়েকজন ভুটিয়া ব্যাপারী আমার সমুখ দিয়ে উৎরাই-পথে চলে গেল। প্রত্যেকটি ছাগলের গলায় ঘণ্টা বাঁধা : এই ভুটিয়া ও তিব্বতী ব্যাপারীরাই হিমালয়ের সর্ব্বত্র খাবার ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহ করে থাকে। এই দলের সঙ্গে দুটি প্রকাণ্ড কুকুর আছে। কুকুর দুটীর চেহারা দেখলেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তির্ব্বতী ভুটিয়াদের চেহারা যেমন ভীষণ কুকুরগুলিও তেমনি। কুকুর দুটীর গলায় মোটা লোহার চাদরের ৬।৭ ইঞ্চি চওড়া বেল্ট লাগান, যাতে কোন হিংস্র জন্তুতে আক্রমণ করলে পর তাদের ঘাড় ধরতে বা ঘাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে। একটি কুকুর সিপাহীর মত আগে আগে চলেছে, অপরটী সকলের পেছনে থেকে ছাগলগুলিকে তাড়িয়ে নিচ্ছে। কুকুর দুটী বেশ শিক্ষিত। কোনো ছাগল বিপথগামী হলে তাকে ফিরিয়ে আনাও তাদের কাজ।

প্রত্যেক ছাগলের পিঠেই দুদিকে ঝোলান চামড়ার থলিয়ায় খাবার জিনিষ। ছাগলগুলি দশ সের হতে আধমণ পর্য্যন্ত জিনিষ বয়ে নিয়ে যায়। এমন সঙ্কট রাস্তাতেও তারা স্বচ্ছন্দে বোঝা নিয়ে চলেছে। কোন কোন ছাগল বোঝা পিঠেই গাছে চড়ে পাতা খাচ্ছে—এ-ও দেখেছি। বোঝাগুলি এমন ভাবে আটকান, যাতে লাফালাফি কর্‌লেও পিঠ হতে পড়ে যায় না; যদিও বা পড়ে যায়, ছাগলটা সেটা টেনে নিয়ে চলে বা দাঁড়িয়ে লোকের অপেক্ষা করে। ছাগলগুলি খুব বড়, এত বড় ছাগল বাংলা দেশে আমরা দেখিনি। শিংগুলিও যেমন বড়, তেমনি সুন্দর। বাংলার বড় বড় গরুর শিং এ সব ছাগলের শিংয়ের চেয়ে ঢের ছোট বলে মনে হয়। গায়ের লোমগুলি দশ-বার ইঞ্চি লম্বা, রেশমের মত চক্‌চকে। ব্যাপারীরা প্রায়ই ভুটানী-তিব্বতী, রীতিমত মাংসাশী। পথে যদি কোন ছাগল অসুস্থ হয়ে মর-মর হয় তো ব্যাপারীরা স্বচ্ছন্দে তাকে উদরসাৎ করে ফেলে। অতিরিক্ত মাংস থাক্‌লে পরে শুকিয়ে সঙ্গে রাখে। এক একটী ছাগলের লোম শুদ্ধ চামড়া ৬৲ টাকা কি ৮৲ বিক্রি হয়। এই সমস্ত ছাগলের সহায়তাতেই হিমালয়েব সর্ব্বত্র জিনিষ পত্র সরবরাহ হয়।

ক্রমে আমাদের সঙ্গীরা একে একে এসে উপস্থিত হলেন। এর পর এক মাইল উৎরাই করে

ভলডিয়ানা-জংশনে যেয়ে পৌছি। যাঁরা মুসুরীর রাস্তায় আসেন, এই চটীই হল তাঁদের জংশন

ভলডিয়ানা জংশন
৫ মাইল

ভলডিডানায় বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা আছে, তা ছাড়া কয়েকটী বড় বড় চটীও আছে। ধর্ম্মশালাটী দোতালা। এখানে মাছির বড় অত্যাচার। খাবার জিনিষ আলগা রাখলে মনে হবে, কেউ যেন পাকের হাঁড়ি উল্টো করে রেখেছে। পাহাড়ে একবার কলেরা আরম্ভ হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রোগটী ছড়িয়ে পড়ে—বোধ হয় মাছিই এর একমাত্র কারণ। মাছি মারারও উপায় নাই—জীবহত্যা হবে; জৈনী ভায়ারা লাঠি ধর্‌বেন। সব চেয়ে সুবিধা একটী মশারী সঙ্গে রাখা।

ভলডিয়ানাতে বাবা কালী-কম্বলীবালার সদাব্রত

আধসের আটা ও একতোলা লবণ পাওয়া গেল। দেবপ্রয়াগ হতে বেরিয়ে পথে ৪৪ মাইলের ভিতর আর কোথায়ও সদাব্রত নাই। যাঁরা শুধু সদাব্রতের-ওপর নির্ভর করে পথে বেরিয়ে পড়েন, তাঁদের এই রাস্তায় বিষম বিপদগ্রস্ত হতে হবে। সুতরাং সদাব্রতের চিঠি থাকলেও হাতে কিছু টাকা অবশ্যই থাকা দরকার।

বৃন্দাবনের মাতাজীটির আবার ভোরে জ্বর হয়। তিনি জ্বর নিয়েই সকালে ৮ মাইল পথ চলে এসেছেন। জ্বর না ছাড়া পর্য্যন্ত কুইনাইন দিতে পার্‌ছি না। কাজেই তাড়াতাড়ি জ্বর ছাড়াবার জন্য Hydropathy (জলচিকিৎসা) মতে তাঁকে ঝরণার ঠাণ্ডা জল দিয়ে প্রথমে 'হিপ্ বাথ' দিয়ে পরে 'হোল বাথ' দেওয়ার পর জ্বর খুব কমে যাওয়ায় ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিলাম। আজ সকালে যখন সকলের জন্য বসে অপেক্ষা করছিলাম, তখন সর্দ্দি-গর্ম্মির মত হয়ে আমার জ্বর হয়। জ্বর হলেই আমি খুব ভাল করে স্নান করে Hydropathic মতে ভাত খাই—আজও তার অন্যথা করিনি।

বৈকালে বৃন্দাবনের মাতাজীর জ্বর কমে যাওয়ায় ভলডিয়ানা হ'তে বের হয়ে, ছোট ছোট দুটী চড়াই-উতরাই শেষ করে, একটী বড় ঝরণার পুল পার হয়ে, সন্ধ্যেবেলা **ছাম চটীতে** পৌছি। ভলডিয়ানা হতে ছাম চটী ৫ মাইল। আজ মোট ১৩ মাইল পথ হাঁটা হয়েছে। ছাম চটীতে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্বর বেড়ে যায়—বৃন্দাবনের রোগিণীটির জ্বর ছেড়ে যায়। তাঁকে এ বেলাও ৫ গ্রেণ কুইনাইন দিই। এ পথে এ কয়টি চটীতে জিনিষ সস্তা। খুব ভাল ঘি ১৷৷০ সের, আটা ।০ আনা, ধোয়া মুগ ডাল ৷৷০ আনা, ভাল চা'ল ।৵০ সের। আমরা টিহরী হতে বের হয়ে ভাগীরথী গঙ্গা ডান হাতে রেখে ক্রমে উত্তর-পশ্চিম কোণে চলেছি। নেপালের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা শমশের জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালার (দোতালা) ওপরের কামরায় জায়গা নিলাম। বাড়ীটী সুন্দর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে সমতলভূমি,—অদূরেই গ্রামের বস্তি। এ চটীতে সামান্য জলকষ্ট আছে।

ছাম চটী
৫ মাইল

৪ জ্যৈষ্ঠ বুধবার—সকালে আমার সামান্য জ্বর ছিল। বৃন্দাবনের রোগিণীটির জ্বর নাই। সকাল সকাল ছাম চটী হতে বের হয়ে ৩ মাইল চলে **ধৌলী** নামে একটী গ্রাম পেলাম। একজন খৃষ্টান পাহাড়ী রাস্তার ওপরেই একটি দোকান করে আছে। লোকটি বৃদ্ধ, অতি ভদ্র। পূর্ব্বে সে মুসলমান ছিল। এ দিক-টায় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম, প্রায় সবই হিন্দু। মাছ-মাংস বেশ চলে! পূর্ব্বে শুনেছিলাম উত্তরখণ্ডে মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, সেখানকার লোকেও খায় না। কিন্তু টেহরী সহরে মাছ ধরবার জাল পর্য্যন্ত বিক্রি হতে দেখেছি। দোকানী বলল, প্রায় সকলেই মাছ খায়, তবে ব্রাহ্মণেরা প্রকাশ্যে খেতে পারেন না—খেলেই জাত যায়।

ধৌলী গ্রাম
৩ মাইল

হিমাচলের শৌচাচারও বড় অদ্ভুত! যমুনোত্তরীর ও গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাগণ প্রায় সকলেই একটি করে লেঙ্গটি ও কম্বলের চাপকান পরে থাকে। শুধু পাণ্ডারাই নয়—মেয়েরাও তাই। মেয়েরা অধিকাংশই কাপড় পরে না—বিশেষতঃ যমুনোত্তরীর মেয়েরা খুব মোটা কম্বলের একটি চাপকান গলা হতে পা পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়। চাপকানটি প্রথম তৈয়ারী করে একবার পরে নেওয়ার পর জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত (কয়েক বৎসর!) তাকে গা হতে আর খোলে না। এক একটি চাপকান চাম-উকুনের বাগান! স্নান তো তারা করেই না—গায়ের দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত, ভূতেরও টেকা অসাধ্য। আজকাল যারা বাঙ্গালীদের সংশ্রবে আস্‌ছে বা শিক্ষিতসমাজে

বের হতে আরম্ভ করেছে তাদের মধ্যে, একটু পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার আভাস পাওয়া যায়। হিমালয়ের সর্ব্বত্রই এই অবস্থা।

দোকানদারের নিকট কিছু কিছু এলোপ্যাথিক অষুধ আছে। হিমালয়ের ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন জ্বরের প্রকোপ আরম্ভ হল, তাতে আরও কিছু অষুধ সঙ্গে রাখা বিশেষ দরকার মনে হল। এখান থেকে Quinine Sulphate সিকি আউন্স, Aspirin কিছু, জোলাপের জন্য কিছু সোনাপাতা কিনে নিলাম। লোকটির নিকট মাত্র আধ আউন্স কুইনাইন আছে, সে সিকি আউন্সও দিতে নারাজ। বললে, পাহাড়ে খুব ম্যালেরিয়া হয়, সে সময় কুইনাইন বিশেষ দরকারী; অথচ মুসুরী হতে না আনা পর্য্যন্ত পাবার উপায় নাই।

দোকান হতে বের হয়ে বেলা ৮টার সময় **নগুণ চটী**তে পৌছলাম। ধৌলী গ্রাম হতে নগুণ চটী ২ মাইল। শরীর অসুস্থ বলে সকালে ৪ মাইল এসেই, এ বেলার মত যাত্রা বন্ধ করে গঙ্গাতে স্নান করতে গেলাম। গঙ্গার জলে নেমে স্নানের বেশ সুবিধা আছে বটে, কিন্তু খুব স্রোত, জলও অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বন্দর চটীর মত এ চটীটীও একেবারে গঙ্গার ওপরেই। ৪।৫টী দোকান আছে। এখানকার দোকনদাররা বড় ঠকায়। খাওয়ার জন্য খোরা কেনা হয়েছিল, তাতে আটার ভাগ বার আনা, দুধের ভাগ চার আনা হবে—এমনি ভেজাল। গাড়োয়াল রাজ্যে ভেজাল দেওয়া নিষিদ্ধ—টেহরীতে জানালে এর প্রতিকার হতে পারে বটে, কিন্তু এই সামান্য বিষয় নিয়ে গোল করে কে? এখানে বাবা কালীকম্বলীবালার একটি ধর্ম্মশালা ও তাঁরই একটি দোকান আছে। রামসীতার একটি মন্দিরও আছে। স্থানটি বেশ সুন্দর। দুপুরে চিদানন্দজীর আদেশে একজন বাঙ্গালী সাধুকে ভোজন করান গেল—তাঁর সঙ্গে

নগুণ চটী
২ মাইল

একজন ভৈরবীও আছেন। দুজনে তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষ্যে বের হয়ে রাস্তায়ই মিলে একসঙ্গে চলেছেন।

বিকালে ৪টার সময় রওনা হয়ে সন্ধ্যায় **ধরাসূ** এসে দোতালা ধর্ম্মশালায় আড্ডা নেওয়া গেল। শরীর অসুস্থ বলে সকলের শেষে এসে পৌছেছি। তখন রাত হয়ে গেছিল। নগুণ চটী হতে রওনা হবার পর জ্বর বেশী হওয়ায় তিন মাইল পথ এসে, উন্মুক্ত প্রান্তরে শ্রান্ত-ক্লান্ত-শরীরে মাটীতেই শুয়ে পড়ি। শরীর এত ক্লান্ত যে, কম্বল পেতে শোবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না—সঙ্গে কিন্তু দুটা কম্বল, পিঠে একটা ঝোলা, হাতে লোটা ও লাঠি। বোম্বাই অঞ্চলের একজন বিধবা শেঠানী অনেক লোকজন সহ যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরী যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে দুটা ডাণ্ডী, একটা তাঁর নিজের জন্য, অন্যটি তাঁর সঙ্গীয় একজন মোহান্ত সাধুর জন্য। সঙ্গে আরও ৫।৬ জন সাধু, বন্দুক ও উন্মুক্ত কৃপাণধারী দরোয়ান, ৪।৫ টী চাকরাণী, মুনীম (ম্যানেজার) কেসিয়ার প্রভৃতি সহ খুব আড়ম্বরের সঙ্গে চলেছেন। আমাকে এই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে, শেঠানীর দুজন পরিচারিকা খানিক দূর হতে ফিরে এসে আমার অবস্থা দেখে দুঃখ করতে লাগল এবং আমার কম্বল ও ঝোলা প্রভৃতি তারা বয়ে নেবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করল। বললে, "ডাণ্ডী আগে চলে গেছে, নতুবা ডাণ্ডীতে নিয়ে যেতাম।" আমি তাদের অনেক বুঝিয়ে বিদায় দিলাম। মানুষের হৃদয়ে যে তিনিই রয়েছেন করুণারূপে, সমবেদনারূপে—এ ভেবে তাঁর প্রতি চিত্ত কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ল।

ধরাসূ স্টেশন
৫ মাইল

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হয়ে গেল। গরমের তেজ নষ্ট হয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শরীর অনেকটা স্নিগ্ধ হয়ে এল। তখন "জয়গুরু" বলে আস্তে আস্তে ধরাসূর দিকে রওনা হলাম। যখন ধরাসূতে পৌছলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। ধরাসূ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী

পথের জংশন। এখান হতে ভাগীরথীর ধার দিয়ে যে পথ গিয়েছে সেটী গঙ্গোত্তরীর রাস্তা ; আর বাঁ হাতে খাড়া পাহাড়ের উপর দিকে চড়াই যে রাস্তা গিয়েছে সেটী যমুনোত্তরীর রাস্তা। এখানে একটী ছোট পার্ব্বত্য নদী গঙ্গায় মিশেছে। আজকাল তাতে জল না থাকলেও বর্ষাকালে খুব জল হয়—তার ওপর পুল দেওয়া আছে। আজ এ ধর্ম্মশালাতে ৭০।৮০ জন লোক আছি—সকলেই তীর্থযাত্রী—চারদিকে মহা হট্টগোল। বাবা কালী-কম্বলীবালার একটী একতালা ও অন্য একটি দোতালা ধর্ম্মশালা আছে। আমরা দোতালায় আছি। নিয়মমত সদাব্রত পাওয়া গেল। কানফোঁড়া নাথ-সম্প্রদায়ের কয়েকজন গৃহস্থের বাড়ীও আছে। এ ছাড়া যমুনোত্তরীর পথের পাশে পাহাড়ের ওপর টেহরী-মহারাজের দুটী ডাক-বাংলা আছে। খাবার পাওয়া যায়, কিন্তু শাক-সবজী কোথাও নাই। টিহরী হতে বের হয়ে আমরা শাক-সব্জী দেখতেই পাইনি।

৫ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার (১৩১ মাইল)—আজ এখানেই থাকার ইচ্ছা ছিল, শরীর অসুস্থ, জ্বর ছাড়েনি। তা ছাড়া জায়গাটিও বেশ ভাল, একেবারে গঙ্গার ওপরেই। আমি সকালে হাতমুখ ধুতে গঙ্গার ধারে যাবার পর এঁরা সকলেই রওনা হয়ে গেছেন। ধর্ম্মশালায় ফিরে দেখি, শুধু আমার জিনিষগুলি পড়ে আছে, আর কেউ নাই—সবাই চলে গেছে—ঘর শূন্য। অগত্যা আমিও বের হয়ে পড়লাম। আজ রাস্তা প্রায় সবই চড়াই। দু মাইল চড়াই করার পর রাস্তা অনেকটা সীধা—মাঝে মাঝে সামান্য চড়াই আছে। ৪ মাইল যাবার পর **কল্যাণী** চটী পেলাম। ইচ্ছা ছিল এ বেলা এখানেই থাকি। কিন্তু দেখ্‌লাম, একটী মাত্র চটী, জলেরও বিশেষ অসু-বিধা, চটীটীও ভাল নয়। তা ছাড়া আজই সকালে চটীবালার ছেলের মৃত্যু হওয়ায় মৃতপুত্রের কাছে

কল্যাণী চটী
৪ মাইল

বসে সকলে কাঁদছে—অগত্যা আমরা সরে পড়লাম। এখান হতে আবার চড়াই করতে লাগলাম—অসুস্থ শরীর, তখনও জ্বর। জ্বর নিয়ে চড়াই করতে খুবই কষ্ট হতে লাগলো। কল্যাণী চটী হতে ১ মাইল এসে আমার অত্যন্ত কাসি ও বমি হতে লাগলো—তখন আমি একা। কয়েকজন আগেই চলে গিয়েছেন, পেছনেও কয়েক জন আছেন। খানিক পরে চিদানন্দজী এসে উপস্থিত হলেন। প্রবল কাসির সঙ্গে সঙ্গে বমি হওয়ায় জলপিপাসা খুব পেলো। কাল যে বাঙ্গালী সাধুটীকে খাইয়েছিলাম, তিনিও এসে হাজির হলেন। তাঁর ঘটিতে জল ছিল—তিনি জল দিলেন। জল খেয়ে খানিকটা সুস্থ হয়ে আস্তে আস্তে চলে বেলা ৯।৪০ মিনিটের সময়, **ব্রহ্মচটী** বা **গেঁইলা** চটীতে যেয়ে পৌছি।

এখানে একটী মাত্র চটী, বড় বড় অনেক গাছ আছে, পাশেই ঝরণা—থাকার বিশেষ অসুবিধা। আমরা পূর্ব্বেই এসে চটী দখল করে বসেছিলাম। খানিক পরে শেঠানীর লোক-জন এসে হাজির হল। তারা চটীতে জায়গা না পেয়ে গাছতলাতেই আড্ডা নিল। তারা বড় লোক—আমরা গরীব লোক হয়ে চটী দখল করে বসে আছি, এটা বোধ হয় তাদের কাছে ভাল ঠেকল না। তাই দুপুরের কাঠফাটা রোদের মাঝেই দুজন লোক রওনা হয়ে সামনের চটীতে যেয়ে সমস্ত জায়গা দখল করে বসে রইল। কল্যাণী চটী হতে ব্রহ্মচটী বা গেঁইলা পাঁচ মাইল।

ব্রহ্মচটী বা গেঁইলা
৫ মাইল

আমরা বেলা ৫টার সময় বের হয়ে ৫ মাইল যেয়ে **ছিলকারা** চটীতে পৌছি। এ ৫ মাইল পথ আস্‌তে ছোট ছোট চড়াই-উৎরাই পাঁচটী করতে হয়েছে। এরকম ছোট-ছোট চড়াই-উৎরাই বিশেষ কষ্টকর নয়। আজ বিকালেও সামান্য জ্বর ছিল। আমরা চটীতে পৌছে দেখি, শেঠানীর লোক সমস্ত চটীটি দখল করে বসে আছে,—আর কোনও ঘর

ছিলকারা চটি
৫ মাইল

নাই। একটী মাত্র চটী, তাতে একখানা মাত্র ঘর, তাও লতাপাতার ছাউনি। এ চটীটির যেমন দশা, যমুনোত্তরীর রাস্তায় প্রায় প্রত্যেকটি চটীরই অবস্থা এর চেয়ে বিশেষ ভাল না। এ পথে যাত্রী খুব কম যাতায়াত করে, তাতেই চটীবালারা বিশেষ যত্ন নেয় না। কোনোরকমে ৩।৪ মাস চটী খুলে কিছু ট্যাঁকে এলেই হলো। তবুও তাদের শত-সহস্র ধন্যবাদ, যারা এমন দুর্গম পথে দুটী পয়সার লোভে মোটামুটি খাবার জিনিষটা সরবরাহ করছে। নতুবা খাবার সঙ্গে নিয়ে এ পথে যাতায়াত করা সকলের পক্ষে সম্ভব হত না।

সামনের ৬ মাইল খাড়া-চড়াই, ভীষণ জঙ্গল—হিংস্র জন্তুর ভয়ও আছে। আজ রাত্রে সামনের চটীতে যাবার উপায় নাই, এখানেও থাকার কোন সুবিধা নাই। অগত্যা চটীর পাশেই উন্মুক্ত প্রান্তরে আড্ডা নিলাম। জঙ্গল থাকায় অনায়াসে অনেক শুক্‌নো কাঠ সংগ্রহ হল। সমস্ত রাত্রি ধুনী জ্বালিয়ে কাটান গেল। রাত্রে বেশ শীত অনুভব করলাম। সন্ধ্যাবেলা একটী কুইনাইনবড়ি গরম চা সহ সেবন করে ৪।৫ টী কম্বল মুড়ী দিয়ে নেপালী বাবার আদেশ মত জ্বর ছাড়িয়ে নিলাম। আজ জ্বর নিয়েই ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করেছি। (ক্রমশঃ)

ঈশা বাস্যম্

——):*:(——

উপনিষদের গোড়াতেই পাই ভাগবত দৃষ্টির কথা। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রয়েছে—"ঈশা-বাস্যমিদং সর্ব্বং।" যা কিছু দেখছ, সবই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত, এই ভাবে অনুপ্রাণিত হতে হবে। সাধনার এর চেয়ে সহজপন্থা আর কি আছে ?

প্রয়োজনের দৃষ্টি মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেলে মানুষ যতখানি দেখ্‌তে পায়, সাধারণ দৃষ্টিতে ততখানি দেখতে পায় না। যা যা, তাকে ঠিক তাই বলে গ্রহণ করা—এ-ও একদিককার সত্য বটে; কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে একটী ভাগবত-সত্তাও যে সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে, এ কথা জান্‌তে না পারলে, অনুভবে নিবিড় করে না পেলে, আর একদিকে তুমি অন্ধই রয়ে গেলে, কেননা বাইর-ভিতর যুগপৎ তো তুমি দেখতে পেলে না। অপূর্ণ দৃষ্টি নিয়েই আমরা প্রত্যেক জিনিষকে বিকৃত করে দেখি, আর পরস্পরের প্রতি নির্ম্মম হয়ে উঠি। এমনি করে যা দেখি তাই হয়ে যায় চরম—তাতে দিন দিন জড়বাদীই হয়ে পড়ি, আর যা স্থূল-চোখে দেখতে পাই না, তাতেই হয় নিষ্ঠুর অবিশ্বাস। দিব্যদৃষ্টি নাই বলে আমরা কেবল বাইরের জগৎটা নিয়েই নাড়া-চাড়া করছি; কিন্তু একবার জীবনে সে শুভক্ষণ এলে দেখতে পাব—আমরা যার মোটেই আভাস পাই নি, এমন কত দিব্যলোক স্তরে স্তরে সাজানো আছে, যেখানকার চিন্তা, ভাবনা, প্রেরণা এসেই আমাদের এ জগৎকে অনুপ্রাণিত করছে।

উপনিষদের মাঝেও এই দিব্যদৃষ্টির কথাই রয়েছে। ঋষিরা বল্‌ছেন, এই সহজ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেও আমরা নির্ম্মুক্ত থাকতে পারি।

অনাত্ম-বস্তু বলে বাইরের প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব সঞ্জাত হয়েছিল, উপনিষদ এসে সে বিরোধের সমাধান করে দিয়ে গেলেন। সাংখ্য অনাত্ম-বস্তু বলে যাদের সঙ্গে অসহযোগিতা অবলম্বন করেছেন—উপনিষদ দিব্য-দৃষ্টি নিয়ে সেখানে সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তাই সাংখ্যকে বলা হয় বিশ্লেষণ-পন্থা, আর বেদান্তকে বলা হয় সংশ্লেষণ-পন্থা। বড় বলব কাকে ? ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক, যিনি নিছক "কেবল", তাঁকে ? না সকলের সঙ্গে আত্ম-সংমিশ্রণ করেও যিনি "কেবল" তাঁকে ? জগতের প্রতি অবজ্ঞাকে দূর করেছে উপনিষদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, তাই উপনিষদ্‌কে বলা হয় বেদান্ত-দর্শন বা চূড়ান্ত দর্শন। জগৎকে বিকৃত রূপ-রস-গন্ধের সমষ্টি রূপে না দেখে, কি করে এই জগৎই চিন্ময় জগৎ বলে প্রতিভাসিত হয়, উপনিষদে সেই রহস্যেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাই।

আসল কথা হল, তোমাকে নিয়ে—তোমার অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। চঞ্চলতার মাঝেও অবিচলিত সত্যে নিষ্ঠা, একেই তো বলি সিদ্ধভাব। জগৎ ভালই হোক্, মন্দই হোক, চঞ্চল হোক আর অচঞ্চলই হোক—আমি জানছি—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।" এই অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়াই আমার লক্ষ্য। জানি, স্থূল জগতের দুর্ভেদ্য মায়াকে অতিক্রম করে সত্যের আলোকে দৃপ্ত হয়ে ওঠা বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—এ বাণীকে বিশ্বাস করে ঠক্‌তে যদি হয় তাতেও রাজি, তবু আমি বুদ্ধির কারসাজিতে ঋষির উপলব্ধিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে চাই না, এই পণটুকু থাকা চাই। এক একবার মনে হয়, এত বিরুদ্ধ জল্পনা কল্পনার মাঝেও মন কেবল একের দিকেই ছুটে যায় কেন ? তাহলে নিশ্চয়ই এমন একটী অবিচলিত সত্য রয়েছে, যাকে জান্‌তে না পেরেই আমরা চঞ্চল হয়ে উঠেছি। সে সত্য কি ? উপনিষদ্ বল্‌ছেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।" মিথ্যে নয়, বাস্তবিক যখন ভাগবত দৃষ্টি খুলে যায়, তখন এই রক্ত-মাংসের মানুষই যেন কি হয়ে যায়। একটা কিছু যে হয়েছে, তা বুঝি আমরা তার আচরণ দেখে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় বল্‌তে গেলে—"তখন তার বেতালে পা পড়ে না।"

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—পরমেশ্বর যদি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আপন মতলবসিদ্ধির দরুণ তাঁকে বিশিষ্ট জায়গা থেকে অপসারিত করে যা খুসী তা করতে পারবে না ! তিনি যদি চরাচর ব্যাপ্ত, তা হলে তিনি এ জায়গায় নেই বলে, জায়গাটীকে আলদা করে নিলেও সে যে সেই চরাচরের মাঝেই পড়ে। এ নিয়ে সুন্দর একটী গল্প আছে। এক সাধু চেলাকে পরীক্ষা করবার দরুণ বল্‌লেন,—"যাও তো, এ কবুতরটীকে কোনও নির্জ্জন স্থানে নিয়ে বধ করে এসো।" চেলা অনেক জায়গা ঘুরে এসে গুরুজীকে বল্‌লে,—"প্রভু ! আমি কত জায়গা অনুসন্ধান করে ফিরেছি, কিন্তু এমন একটী নির্জ্জন জায়গা পেলাম না, যেখানে ভগবান নেই ; তাই কবুতর নিয়ে ফিরে এসেছি।" সাধুটী খুশী হয়ে বল্‌লেন্, "হাঁ, বাচ্চা, তুমিই ঠিক দেখেছ।"

নিষ্ঠা চাই—তন্ময় হয়ে যাওয়া চাই। ব্যভিচার-ভাব থাক্‌লে তো তন্ময় হওয়া যায় না। আজ যদি গুরুজী বলে থাকেন, ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—তাহলে এই তোমার শিরোধার্য্য—থাক্ তোমার বিচার আর সন্দেহ ! দেখলে না একবার তন্ময় হয়ে গিয়ে, এর মাঝে কি রয়েছে। যেই বলা অমনি বিশ্বাস, একে কাপুরুষতা বলছ কেন ? ভিতরে অদম্য সত্যস্পৃহা থাক্‌লে, দুদিনেই তো সব তোমার কাছে ধরা পড়্‌বে। বিশ্বাস করে আঁকড়ে ধর, আবার সত্য না থাক্‌লে নির্ম্মম হৃদয়ে তাকে পরিত্যাগ কর ; মিথ্যার অভিনিবেশ থাকবে কেন ? সামান্য কথাতেও যদি তোমার প্রাণের খোরাক মিলে, কাজ কি তোমার

জটিলতায়! কাজ হয় জীবনে এক মুহূর্ত্তের একটী কথাতেই।

রাম বলা, কাপড়ও তোলা এ হলে কিন্তু চল্‌বে না। তন্ময় হয়ে গেলে ভাবের ঘরে চুরী হতে পারে না। আজ যদি সত্যি তোমার ভিতর ভগবানের প্রতি মাতৃভাব জেগে থাকে, তা হলে এমন একটী জায়গা থাকবে না জগতে, যেখানে ভাবের ব্যভিচার হওয়ার আশঙ্কা আছে। এমনি করে যখন যে ভাব আস্‌বে, তার মাঝে অন্য কোন ব্যভিচারী ভাব উদয় না হলেই বুঝ্‌বে, ভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, ভোগেই বা তাহলে তোমার অত্যুগ্র স্পৃহা থাক্‌বে কেন? মিথ্যাই যদি হয়, বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কেন তুমি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে? তুমি যে নিরাসক্ত, উদাসীন হয়ে যাবে।

গভীরতর উপলব্ধি পেলে মানুষ আর বাইরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় না। প্রকৃত বন্ধু বল্‌ব তাঁকেই, যিনি সত্যি সত্যি প্রাণে শক্তিসঞ্চার করে চঞ্চল মনকে অচঞ্চলের দিকের নিয়ে যেতে পারেন। যত-খানি সুখ আমরা বিষয়ে মজে পাই, তার চেয়ে বেশী সুখ দেবার অনায়াস পন্থা জানা আছে বলেই নিবৃত্তিবাদী প্রবৃত্তিবাদীকে বল্‌ছেন—"তুমি যে পথে চলছ, এ কল্যাণের পথ নয়, আমার পথ ধরে এস, তাতে তোমার কল্যাণ হবে।" মানুষ মানুষকে অসত্য হতে, অকল্যাণ হতে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে বলেই তো মানুষ মানুষের কথা বিশ্বাস করে।

তর্ক দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে নয়, সত্যের জোরে অকুণ্ঠ চিত্তে যিনি আশ্বাসের বাণী বলেন, তাঁর বাণী কি নির্ভরযোগ্য নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়? এমন সার্ব্বভৌম বাণী প্রচারের অটল শক্তি যাঁর মাঝে রয়েছে, নিশ্চয়ই তিনি সত্যের পূজারী। বাণীর সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেই তিনি বাণী প্রচার করেন। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"—এ বাণী যিনি প্রচার করেছেন—নিশ্চয়ই তিনি জগৎকে পরমেশ্বরময় বলে অনুভব করেছেন। আমার যদি শ্রদ্ধা থাকে, বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে অনুভূতি আমার মাঝেও কেন ফুটে উঠ্‌বে না?

সত্যিকার অনুভূতি নিছক একলার নয়, তার মাঝে দশজনেরও ভাগ রয়েছে। মানুষ যে সত্য লাভ করে, তার পরিচয় এই, সত্যকে সে না বিলিয়ে থাকতে পারে না। আলো যখন আসে, সমস্ত অন্ধকার অপসারিত করে আপন আনন্দে চারিদিক উছলে পড়ে; তেমনি মানুষ যখন সত্যের আলোক পায় তখন তার ব্যষ্টি আধার তো পূর্ণ হয়ই, উপরন্তু সত্যের আলোক পূর্ণতার আতিশয্যে চারিদিকেও বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। তাই উপনিষদ বল্‌ছেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এই পূর্ণতার আতিশয্য মানুষের ভিতরে জাগে। সে দেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, না দিয়ে থাকতে পারে না। পরমহংসদেব ছাদের ওপর উঠে তাই সকলকে আকুল কণ্ঠে ডাকতেন—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্‌রে, ছুটে আয়, আমি যে আর থাকতে পারছি না!"

একদিন এই সত্যলাভ করেই ঋষি বলেছিলেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—তোমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, সবই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত কর। তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাক, তোমরাও এই স্থূল চোখ দিয়েই দেখ্‌তে পাবে, এই বিশ্ব কত সুন্দর—কত পবিত্র!"

ঋষির কণ্ঠে সেদিন পরিশুদ্ধ দেহ-ইন্দ্রিয়ের জয়-গানই মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল—

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণমস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

—আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র,

বল, সমস্ত ইন্দ্রিয় আপ্যায়িত হোক্! ব্রহ্মের সমস্ত রহস্য আপ্যায়িত হোক্! ব্রহ্মকে যেন আমি নিরাকৃত না করি না, ব্রহ্মও যেন আমায় নিরাকৃত না করেন। অনিরাকরণ হোক্—অনিরাকরণ হোক্! তারপর, আত্মাকে আমি আঁকড়ে ধরব, তখন উপনিষদে যে সমস্ত ধর্ম্ম, তা যেন আমাতে স্ফুরিত হয়—স্ফুরিত হয়!

এই দিব্য দৃষ্টি লাভ করেই মানুষই অতিমানুষ (Superman) হয়। সজীব নির্জীব সকল পদার্থেই ভাগবত সত্তার উপলব্ধিই ভাগবত জীবন। ঋষিরা এই সহজ জীবনই পেয়েছিলেন, তাঁদের পাওয়ার সহজ মন্ত্রই ছিল—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"
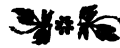
আলোচনা

——(::)——

গোঁড়ামী ভাল নয়, ইহা বিজ্ঞের অভিমত। মতটা খাঁটী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অত্যাবশ্যক আবর্জ্জনা হিসাবেও জগতে অনেক জিনিষ টিকিয়া যায়। গোঁড়ামীও তাহার মাঝে একটা। নিজে হিন্দু হইয়াও কেন জানি একটা সঙ্কোচ সর্ব্বদা মনের মাঝে পুষিয়া রাখি যে আমরা বড় গোঁড়া আর জগতের সবাই অতি উদার; গোঁড়া বলিয়াই আমরা জগতের অপাঙ্‌ক্তেয়। কোথা হইতে এই ধারণার আমদানী হইল, আদতেই এ ধারণা সত্য কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার আমাদের বড় অবসর হয় না। ঔদার্য্যের একটা philosophy আছে, তাহা জানি; কিন্তু গোঁড়ামীরও কি একটা philosophy নাই? ভব্য-ব্যক্তিরা এই কথা শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিবেন না! পরের চসমা দিয়া নিজের দিকে তাকাইতে অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়াই যেখানে-সেখানে আত্মার অবমাননাও আমাদের কাছে শ্লাঘার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। জগতে গোঁড়া নয় কে? সমস্ত সংস্কার উন্মূলিত করিয়া দিব্য-সত্যের যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না মিলে, সে পর্য্যন্ত কাহারও গোঁড়ামী যায় কি? বিশিষ্ট আচারই যদি অসহ্য গোঁড়ামীর নিদর্শন হয় তো সে বিশিষ্ট আচার জগতের কোন জাতির মাঝে নাই? সুসভ্য ইউরোপের কোনও গোঁড়ামী নাই? দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের ধুতি আর উড়ানী গোঁড়ামী; সেই গ্রীষ্মেই ইংরেজের কোট্-প্যাণ্টালুনটা আরও অসহ্য গোঁড়ামী নয় কি? জাতীয় আচার কাহার নাই? আর সে আচারে কে গৌরব অনুভব করে না? অবশ্য পরের যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি করা উচিত নয়; কিন্তু মোহে অন্ধ হইয়া প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে পরের নকল করিয়া বেড়াইতে লজ্জা হয় না? যে শক্তিধর পুরুষ, তাহার নিশ্চয়ই লজ্জা হয়, দুর্ব্বল-চিত্তের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে এরূপ শক্তিধরের সংখ্যা বেশী না কম, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নূতনের ঢেউ আসিতেছে; তাল সামলানো কঠিন, তাহা জানি। কিন্তু তবুও বাঁচিতে হইলে ইহাকে ঠেকাইতে হইবে। আবার যাহারা জলে না নামিয়া ঢেউএর সঙ্গে লড়িতে চায়, তাহাদের বুদ্ধিরও প্রশংসা করিতে পারি না; ইহাও অশক্তিরই নিদর্শন। বিপক্ষের ব্যূহে প্রবেশ করিয়া ব্যূহ ভেদ করিয়া

বাহির হইতে হইবে, তবে না বুঝিব আমাদের প্রাণ আছে। আমার যাহা ভাল বলিয়া মনে করি, শিব-রাত্রির সলিতার মত তাহাকে কোনরকমে বাঁচাইয়া রাখাটাই পৌরুষ নয়। আমার ভালটা জগতের সম্মুখে একটা challenge; আপন শক্তিতে সে জগতের মাঝে ঠাঁই করিয়া লইবে। যদি তাহার মাঝে দুর্ব্বলতা থাকে, খুঁত থাকে, তবে সত্যের সহিত সংঘর্ষে তাহা পরাভূত হউক। সর্ব্বত্র সত্যেরই জয় হউক। সত্য পূবের এলাকায়, না পশ্চিমের এলাকায়, তাহা জানি না। তবে আমি যখন পূবে আছি, তখন পূব হইতেই যাত্রা সুরু করিব; কিন্তু চিত্তটা রাখিব নির্ম্মুক্ত, যাহাতে সে আত্মকল্যাণ না ভোলে, পরকে না আহত করে, সত্যের না অবমাননা করে, শিবকে না প্রত্যাখ্যান করে। আপন কোটে থাকিয়া সত্যের সাধনা করিব, ইহাকে যদি গোঁড়ামী বল, তো ঝড়ের মুখে এঁটোপাতার মত নিত্য নূতনের হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ানোটা গোঁড়ামী নয় কিসে?

* * *

একটা বহু পুরাতন কথা তুলিব। কুসংস্কার মনে করিয়া তাহাকে একেবারে উড়াইয়া না দিয়া ভব্য-ব্যক্তিরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের নাকি আবির্ভাব হইয়াছিল "গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।" গো-ব্রাহ্মণে দ্বন্দ্ব-সমাস না কর্ম্মধারয়-সমাস সে বিচার করিতে চাই না, তবে কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে চাই। সব ধর্ম্মের মত হিন্দুয়ানীরও একটা বাতিক আছে—সেটা এই গো-ব্রাহ্মণের হিত। কে যেন বলিয়াছিলেন, সমগ্র হিন্দু-সমাজ ব্যবহারিক জগতে এই এক জায়গায় এককাট্টা হইয়াছে—তাহারা গরু খায় না। কথাটার পোণে ষোল আনাই সত্য বটে। গরু না খাওয়ার মাঝে হিন্দু-সংগঠনের একটা সনাতন (non-political) বীজ লুকানো থাকিতে পারে, ইহা মনে হয় না কি? যাহারা গোঁড়া এবং যাহারা সংস্কারক, তাঁহারা উভয়েই এই দিক দিয়া সমাজের হিতসাধনের একটা অছিলা আবিষ্কার করিতে পারেন না কি? হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ হইয়াও যখন বলিল, ভগবানের অবতার হইয়াছিল গোবংশের হিতের জন্য, তখন কথাটার মাঝে কত বড় দুঃসাহসিকতা যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা বোধ হয়, কেহ তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। আমাদের দেশে সব কথারই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়। তাই গোহিতের দরুণ ভগবানের অবতরণেরও এইরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, গব্যরস যজ্ঞের একটী প্রধান উপকরণ, অতএব গোরক্ষা করিয়া ভগবান যজ্ঞরক্ষা ওরফে হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষাই করিলেন। আজকাল যজ্ঞ হয় না, তবু হিন্দু গো-রক্ষার গোঁড়া। হিন্দুর এই মনোবৃত্তি হইতে কি কিছু Economic benefit দোহন করা যায় না? যজ্ঞ স্থূলে না থাকুক, সূক্ষ্মে তো আছে। তার দরুণ গো-হিতে অবহিত হওয়া এখনও অপরিহার্য্য। যুক্তিটা এইরূপ—কর্ম্মযোগই কলির বিশিষ্ট যজ্ঞ; কর্ম্ম করিতে হইলে শক্ত শরীর চাই, ভাল ব্রেন চাই; তার দরুণ গব্যরস প্রয়োজন। এই গেল নম্বর এক। দ্বিতীয় নম্বর, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; অন্নাভাবে আমরা শীর্ণ; কিন্তু কর্ষণযোগ্য পতিত জমিরও অভাব নাই; তার দরুণও গোহিত প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ অন্তর্ব্বাণিজ্যে এবং যানাদিতে গোযানের উপযোগ অপরিহার্য্য। অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে, যদি ভারতবর্ষের সনাতন গ্রাম্য-সভ্যতা বজায় রাখিতে চাও, নবোদ্ভূত নাগরিক সভ্যতার যদি জৌলুষ করিতে চাও, ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শূদ্র-শক্তির যদি পুষ্টি করিয়া আমার দেশমাতাকে জগদী-শ্বরী করিতে চাও—তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পথ ধর—গোহিত কর। শুধু গরু না খাইলেই গোহিত হয় না। গরুর জন্য প্রাণ দিব, এমন একটা গোঁ হিন্দুর মাঝে নিবু-নিবু হইয়াও জাগিয়া আছে। এই

গোঁড়ামীগুলি উপেক্ষার জিনিষ নয়। এগুলিই প্রকৃতির military force। ভাল লোকের দ্বারা পরিচালিত হইলে এই গোঁড়ামীগুলি দিয়া মস্ত বড় কাজ হইতে পারে। জাতি-সংগঠনের বনিয়াদ এই গোহিতরূপ একাধারে spiritual ও economic culture-এর উপর গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। কথাটা শুনিতে নিজের কাণেই অদ্ভুত ঠেকে বটে; ভাবি, হিন্দু কি শেষকালে গোরুর লেজ ধরিয়া জরা মৃত্যু-ব্যাধির বৈতরণী পার হইবে? স্বরাজ মিলিবে গোরু-পূজা করিয়া? আবার ভাবি, চরকা ঘুরাইয়া যদি স্বরাজ আসে তো গোরু পূজিয়া আসিবে না কেন? অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের যুগে দেশ যখন সুখে-সমৃদ্ধিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল, তখনও গম্ভীরপ্রকৃতি ঋষিরা সমস্ত আধ্যাত্মিক জৌলুষের নিদান আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই গোরু-পূজায়; ভগবানের হাতে পাচনবাড়ি তুলিয়া দিতেও তাঁহারা ইতস্ততঃ করেন নাই। কাজেই কথাটা একেবারে উড়াইয়াও দিতে পারিতেছি না। চরকায় ধর্ম্মের গন্ধ নাই; গোরু-পূজায় আছে। সুতরাং ধর্ম্মধ্বজী হিন্দুর ইহাতে মাতিয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। আর গোরুর হিত হইলেই ব্রাহ্মণের হিত হইবে, ইহা শাস্ত্রেরও কথা। অনুভবেও দেখি, কথাটা সত্যি। ইচ্ছা হয়, সরকারী শিক্ষাবিভাগকে ডাকিয়া বলি, বিদ্যার্থীদের দাঁত ঠুকিয়া, কাণ মলিয়া, চোখ খুঁচাইয়া স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই হয় না। যেমন ইস্কুলে ইস্কুলে চরকা প্রচলনের কথা হইতেছে, তেমনি গোপালনের ব্যবস্থাও হউক। একই বিদ্যাভবনে গোরু আর মানুষ পরস্পরকে সম্ভাবিত করিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠুক। ইহাই হউক এ যুগের নবগীতা, হিন্দুর নবসংগঠন।

* * *

কলিকাতায় আবার ছাত্র-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। শেষ মীমাংসা কি হইল, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। আচার্য্য ও ছাত্রের মাঝে অতি মধুর ও পবিত্র সম্বন্ধ। পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধের চেয়ে হিন্দু এই সম্বন্ধকে উচ্চতর স্থান দিয়াছে। মনু মহারাজ বলিয়াছেন, পিতা শুধু স্থূল শরীরই দেন, কিন্তু আচার্য্য গঠন করেন দিব্য-তনু; অতএব পিতা অপেক্ষাও আচার্য্য মহীয়ান্। "গুরুর্দোষাবরণং ছত্রং"—এই ছত্র আছে বলিয়াই ছাত্র, ছাত্র—ইহাও হিন্দুরই কথা। শুধু হিন্দু কেন, এ কথা সকল ছাত্র ও আচার্য্যের পক্ষেই খাটে। কিন্তু এই ছাত্র ও আচার্য্যের সম্পর্ক যখন এই ভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইতে দেখি, তখন শিক্ষার পরিণাম ভাবিয়া বড় দুঃখ হয়। ছাত্র আর আচার্য্যে মনোমালিন্যের ভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। আচার্য্যদের হাতে ক্ষমতা আছে; তাঁহারা যদি সে ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করেন, এবং ছাত্রেরা নিরীহভাবে তাহা সহিয়া যায়, তাহা হইলে ছাত্রদের বিনয়ের আদর্শ বজায় থাকে বটে; কিন্তু বিনেতার আদর্শ ইহাতে খর্ব্ব হয়, এবং সেই পাপে বিনীতেরও নৈতিক অধঃপতন ঘটে। ক্ষমতা সদ্ব্যবহারের জন্য, অপ-ব্যবহারের জন্য নয়। অনেকে বলেন, ছাত্রেরা দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। আমরা বারবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এ শিক্ষানীতির খাত-সলিল। যে নীতি অনুযায়ী আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহাতে এই ঠোকাঠুকি অবশ্যম্ভাবী, ইহার জন্য দুঃখ করা বা কোনও পক্ষকে দোষী করা বৃথা। বীজটা বিলাতী; ফলটা দেশী হইবে কোথা হইতে? শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের প্রভাব মোটেই নাই, ধর্ম্মবোধ জাগাইবার প্রয়াস নাই, চরিত্রগঠনের সুযোগ নাই, ইহার পরেও ছাত্র আর আচার্য্যের সম্পর্ক চিরকাল অবিক্ষুব্ধ থাকিবে? ফাঁকিটা যতদিন নিরুপদ্রবে চলিবার তাহা চলিয়াছে; আর চলিবে বলিয়া ভরসা হয় না, তাহার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং এখন

এরূপ সংঘর্ষ কথায় কথায় হইবে। ছাত্রেরা শিক্ষকমণ্ডলীর বা অভিভাবকমণ্ডলীর নির্দ্দেশ বা উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া সংঘ গড়িয়াছে। ভাল কথা। কিন্তু যাঁহারা তাহাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ, পৃষ্ঠপোষকতা ও নিরুপদ্রব নায়কত্ব দ্বারা এই সংঘ কেন অনুপ্রাণিত হইল না, এ কথার জবাব কে দিবে? মনে হয় না কি, শ্রমিক-সংঘের মত, নারী-সমিতির মত এ-ও যেন অত্যাচারিতদের আত্মরক্ষার একটা দুর্গ? ছাত্র-সমাজে কেন এ মনোবৃত্তির উদ্ভব হইল, ইহার পরিণাম শুভ কি না, তাহা কে বলিবে?

*   *   *   *

বিজাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই এই অনিষ্টের মূল। শিক্ষা অর্থে মানুষ গড়া। এই গড়ার ভার জাতিকে নিতে হয়। বিজাতিকে এই ভার দিই কোন বিশ্বাসে? বিদেশী শিক্ষকেরা তাহাদের মনোমত করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য পড়াইবে, তাহাদের রীতি নীতিতে ধীরে ধীরে আমাদের অভ্যস্ত করিয়া তুলিবে, অতি ধীরে ধীরে আমাদের মাঝে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অবজ্ঞার বীজ বপন করিয়া দিবে; ইচ্ছা করিয়াই না আমরা এ আফিমের নেশা ধরিয়াছি! ইহার ফল যে কস্মিন্ কালে ভাল হইবে এ কথা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ব্যাপার হইতে একটা বিষয় বেশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। শিক্ষার মাঝেও যে negatives politics অন্তঃশীল হইয়া রহিয়াছে, তাহা এই ব্যাপারেই বেশ বোঝা যায়। "আমি বিদেশী শিক্ষক, তোমাকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য আমার এত আঁকুপাঁকু; কিন্তু দেখ, আঁতে ঘা পড়িবা মাত্রই আমার নিজের মূর্ত্তি কেমন করিয়া প্রকট হইয়া পড়িল! ছাত্র আর আচার্য্যের মাঝে সম্বন্ধ যত পালিস্ ও ধোপদুরস্তই হউক না কেন, আসলে এ কথা যেন কখনো ভুলিও না—আমি তোমার শিক্ষক, বন্ধু ও হিতৈষী হইলেও তোমার বিজেতা; এবং তুমি শিশিক্ষু, জীবন-পথের তরুণ যাত্রী হইলেও বিজিত। যদি কখনো এ কথা ভুলিয়া গিয়া আত্ম-গৌরব প্রকাশের অবকাশ খোঁজ তো মনে রাখিও, আমার হাতে তোমাকে পিষিয়া মারিবার ক্ষমতা আছে।" শিক্ষকের অন্তরে এই মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন থাকিলে সে শিক্ষায় কখনো মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে? স্বজাতীয় কোনও প্রতিষ্ঠানে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের এইরূপ অপমান ও অমর্য্যাদা— তাহাও আবার শিক্ষকের দ্বারা—কখনো কি সম্ভবপর হইত? অবশ্য এ জন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না, কেননা যে যাহার স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ভদ্রতার মুখোস ফেলিয়া দিয়া যে নখদন্ত বাহির করিয়া বসিবে, ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাব হইলেও এ নীচের স্বভাব, এ কথা শতবার বলিব। ইহার চেয়েও উন্নততর স্বভাবের পরিচয় মানুষের মাঝেই পাওয়া যায়। বিদেশী, বিজাতীয় হইয়াও অন্তেবাসীকে মানুষ হইতে শিখাইয়াছেন, এরূপ মহামনারও অভাব হয় নাই। জাতিপাঁতির কথা ছাড়িয়া দাও। সর্ব্বভৌম মনুষ্যত্বের উপর শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল কিনা, ইহাই দেখ। শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মাঝে অবাস্তব কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিলে শিক্ষার্থীর জীবনটাই মাটী এবং দেশের ভবিষ্যতও ঘোরান্ধকার। শিক্ষকদিগের হাতে ক্ষমতা আছে; ইহার উষ্মা যতদিন পর্য্যন্ত না দূর হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ ও মনুষ্যত্বের পূজারী হওয়া একটু কঠিন বই কি—বিশেষতঃ আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষানীতি যতদিন বজায় থাকিবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদিগের প্রতি স্বভাবতঃই সহানুভূতি আসিয়া পড়ে। কেননা, মনে হয় তাহারাই যেন অত্যাচারিত পক্ষ, মুখ বুজিয়া তাহারা অনেক অপমানই সহিয়াছে, আর সহিলে ধর্ম্মে সহিবে

না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারাও সার্ব্বভৌম মনুষ্যত্বের আদর্শ ভুলিয়া গিয়া আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য ও ছলনার আশ্রয় লইবে, ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। সত্যের কাছে, ধর্ম্মের কাছে মানুষের মনগড়া আইন ও আচারের কোনও মূল্য নাই, ইহা শতবার স্বীকার করি। কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া আমরা যেন ছলনার আশ্রয় না লই, ধর্ম্মের জয় ঘটাইতে গিয়া অধর্ম্মকে যেন সারথ্য না দিই, মনুষ্যত্ব বজায় রাখিবার অজুহাতে অমানুষের কাজ যেন না করিয়া বসি। ছাত্রেরা তরুণ, মনুষ্যত্বের সাধক, দেশের আশা-ভরসা; এই কথাগুলি ভুলিয়া গেলে শুধু তাহাদের ক্ষতি নয়, দেশেরও সর্ব্বনাশ।

* * * *

একজন নেতা বক্তৃতা করিতে গিয়া ছাত্রদের বলিলেন—"তোমরা বেশ করিয়াছ, ইউরোপের ছাত্রেরাও এই রকম করে।" বিজ্ঞম্মন্য নেতার মুখে এই তরল মনোভাবের পরিচয় পাইয়া লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। নিরুপদ্রব ব্যবধানে থাকিয়া ছেলে নাচাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মেটানো গোছ active politics এ-র অভিনয় অনেক নেতাই এ যাবৎ করিয়া আসিয়াছেন। তাহার ফলে সমাজের দেশের কতখানি যে ক্ষতি হইয়াছে, যৌবন-শক্তির কতখানি যে অপচয় হইয়াছে, পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে কতখানি যে বিষ ঢুকিয়াছে, তাহার খবর রাখিবার অবসর বোধ হয় তাঁহাদের হয় নাই। সত্যের পথে, মনুষ্যত্বের পথে তরুণ প্রাণকে উদ্দীপিত কর, প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক বলিয়া তোমাকে শ্রদ্ধা করিব। কিন্তু একটা কথায় অগ্রপশ্চাৎ না বিবেচনা করিয়া শুধু হুজুগ সৃষ্টি করিবার জন্য বিদেশের নজীর টানিয়া আনা যে কিরকম স্বদেশীয়ানা, তাহা তো বুঝিতে পারি না। ইউরোপের ছাত্রদের সাময়িক ঔদ্ধত্য সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদেরই পরিচয়; ইউরোপের educationistরা ইহাকে কখনই শিক্ষার শোভন আদর্শ বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু হুজুগে মাতিয়া গেলে বুঝি আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না; তাই আজ এ দেশের ছাত্রদের চেতাইবার দরুণ বিদেশের ছাত্রদের গুণ্ডামীর আদর্শ প্রচার করিতেও বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না। নির্য্যাতিত দুর্ব্বল জাতির স্বভাবের ইহা প্রকৃষ্ট পরিচয় বটে। যে চির কাল কিল খাইয়া কিল চুরী করিয়া আসিয়াছে, সে যদি একটা চিমটী কাটিবার সুযোগ পায় তো সে লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে ইহাও স্বাভাবিক বটে; কিন্তু ইহা যে আমাদের হীন স্বভাবের পরিচয়, তাহা মনে করিয়া দুঃখের আর অবধি থাকে না।

দুর্দ্দম

দুর্দ্দম, ওরে দুর্দ্দম—
যতই ছড়ানো থাক্ তোর পথে
কণ্টক ও কর্দ্দম—
দুর্দ্দম, তুই দুর্দ্দম!

শৃঙ্খল শত চূর্ণ করিতে,
ঝঞ্ঝার মাঝে ঝাঁপায়ে পড়িতে,
সিন্ধু-বক্ষ মথিতে দমিতে
তুই কিরে অক্ষম?
দুর্দ্দম ওরে দুর্দ্দম!

মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত যারা,
বিশ্বের মাঝে লাঞ্ছিত তারা;
তোর তরে নয় অন্ধ সে কারা—
স্পর্শিবে তোরে যম্?—
দুর্দ্দম তুই দুর্দ্দম!

বজ্রধ্বনিতে আঁধারের পথে,
শঙ্কা-শূন্য মরণের রথে,
পর্ব্বতসম বিঘ্নেরি সাথে
যেতে হবে দুর্দ্দম!
দুর্দ্দম, তুই দুর্দ্দম!

আরণ্যক

——):*:(——

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

মানুষ ফতুর হয়ে যায় কখন ? যখন মূল উৎসের মুখ বন্ধ হয়ে যায়—আগের পাওয়া পুঁজি নিয়েই বড়াই করতে থাকে; ভিতরের পাওয়ার বেগও আর বাড়ে না—তখনই। অসীম আনন্দের রাজ্য এই—মানুষের বুক কতটুকু যে তা ধারণ করবে ? তাই যুগ যুগ ধরে কতজন সে মহাধন থেকে কত রকমে এখানে আনন্দ-সত্র খুলে দিয়েছেন, তবু তো সে ধন ফুরায়নি। এখনও আমাদের নূতন করে কত কিছু পাওয়ার আছে, পেয়ে ছড়িয়ে দেবার এখনও কত অঢেল ধন পড়ে রয়েছে—চাই শুধু আপনাকে ব্যাপ্ত করে দুহাত মেলে বিশ্বকে বুকে করা—কেবল বেড়ে যাওয়া আর পাওয়া—অনন্ত বিস্তার সুধার সমুদ্রে মিলিয়ে যাওয়া !

❦

চাওয়ার আগে আমি কি চাই তাই বুঝতে হবে। তাহলেই আকুলতা থাকবে--কিন্তু উদ্বেগ থাকবে না; কেননা পাব যে, এ তো নিশ্চিত—শুধু পাওয়ার দরুণ যা আকুলতা। সত্যিকার সাধক যিনি, তাঁকে তো বাইর থেকে চেনা যাবে না, বাইরে তিনি প্রশান্ত আর অন্তরে তার অফুরন্ত ব্যাকুলতা।

❦

মানুষ শুধু দেহের মাঝে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে কতটুকু ভালবাসবে ? দেহীকে যদি সে না চেনে, তবে এ দেহ যে তাঁর দেওয়াল হয়েই থাকবে। আগে চাই সে দেহীকে চেনা। তারপর তাঁর সেই অফুরন্ত প্রেম নিয়ে দেহে ধরা দিয়ে দেহ-দেহী এক হয়ে যাবে। এ দেহ এত সুন্দর, এত মধুভরা কি হত—যদি এর সাথে সেই চিরমোহন অনন্ত প্রেমময় দেহী না বিজড়িত থাকত ? ঐ যে দেহের টান—ওই তো সেই দেহীর আকর্ষণ ! সে যে ধরা দিতে চায়—ধরে না তো কেউ !

❦

সাধনা বলতে বুঝি আত্মশুদ্ধি—নিজের দেহ-মনকে মেজে-ঘসে যত সাফা করতে পারি। আমি স্বচ্ছ হলেই কল্যাণময়ী শক্তি এসে আমাকে প্লাবিত করে দেবেই দেবে। খাঁটী সাধক যে কিছু চায় না—পাবে না বলে নয়—না চাইলেও পাওয়া যায়, এ বিশ্বাসে সে দৃঢ়।

❦

শুধু বুঝে যাওয়া—আর কিছু নয়। পাওয়া মানেই বুঝা। বুঝলেই মন-প্রাণ সে রসে মিলিয়ে যাবে, পাওয়ার দীপ্তিতে জগৎ-রহস্য স্বচ্ছ হয়ে যাবে। বুকভরা মধু জমতে থাকবে—আর বিশ্বময় তা প্রসারিত হবার জন্যে বুক ফুলে উঠবে। তখন বুক ঠেলে আসবে দেবার আকুলতা। কিন্তু প্রথমে চাই আপনাকে নিপীড়িত করে শুধু বুঝবার তপস্যা।

❦

মানুষের ভিতর অভিমান আছে বলেই মানুষ জড়-বস্তু থেকে পৃথক্। নিরভিমানী অকর্ম্মণ্যের চেয়ে অভিমানী অকর্ম্মণ্য শতাংশে শ্রেয়; কেননা তার অভিমান বজায় রাখবার দরুণও তাকে কিছু করতে হয়। অক্ষম হলেও "আমি অক্ষম"—অভিমানী এ কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না। তাহলেই

আত্মপক্ষসমর্থনের কিছু না কিছু ক্ষমতা ও প্রচেষ্টা তখনও তার মাঝে থাকে। আবার এই ধরে তার উত্থানও অসম্ভব নয়।

*

তোমার তুলিতে যে রং রয়েছে, তাই দিয়েই তুমি জগতের সব আঁকতে পার। কিন্তু সেইটাই যে তার আসল রূপ এমন কথা প্রচার করো না। যেদিন সমস্ত রংএর অতীত শুভ্র জ্যোতির দর্শন হবে, সেদিন সেই শ্বেতবর্ণের মাঝে সকলেরই সমাবেশ দেখবে। তারি মাঝে ভেসে উঠবে সমস্ত রংএর আরও ঘনীভূত অবস্থা—সমস্ত জ্যোতির চরম, ধারণার অতীত কালোরূপ। সে রূপের সন্ধানী যে, তার তুলিতে যে রং ধরবে তাই অপরের বিস্ময় জাগাবে—বিশ্বের কল্যাণকারী হবে। সুতরাং আগে মনকে সংস্কারমুক্ত কর—তবেই বিচার সুষ্ঠু হবে।

মেঘলা দিনের গুমোটের আড়ালে হঠাৎ যে বিদ্যুৎ চমকায়, দেবতার দেখানো সেই জ্যোতিতে অনেকখানি পথ সুস্পষ্ট হয়। দুঃখের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর হাসির ছোঁয়াচটুকুই জীবনে ধরে রাখবার জিনিষ—কেবল গুরু গুরু মেঘের গরজনির মত বিষাদের হাহাকারটাই বড় করে তুলো না।

ঊ

ধূমের ভার বায়ুগুলের তুলনায় কম বলেই আকাশময় তা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আপনার অভিমানের ভার কম হলেই, সঙ্কুচিত ভাবটা কমে এলেই তাকে সকলের ভাল লাগে। সকলের মাঝে পরিব্যাপ্তির কৌশলই মৎলবের ভার কমানো। তার আগে কেউ ছুঁড়ে দিলেও কিছুদূর উপরে উঠে আবার নীচে পড়ে যাবে।

সমালোচনা

—(::)—

জাতিভেদ ও ব্রাত্যসংস্কার ব্যবস্থা।—শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার সম্পাদিত, ঢাকা—কটন লাইব্রেরী হইতে শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য যথাক্রমে ।৹ ও ৵৹। পুস্তক দুইখানির প্রতিপাদ্য বিষয় নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। জাতিভেদ বর্ত্তমানে যেরূপ অনতিবর্ত্তনীয় আকার ধারণ করিয়া আছে, প্রাচীন কালে যে ইহা সেরূপ ছিল না, নিম্ন জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নয়ন সম্ভবপর ছিল, গ্রন্থকার প্রথম পুস্তিকাখানিতে বেদ ও পুরাণ ঘাঁটিয়া প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। হিন্দুর সামাজিক বিবর্ত্তনের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই; তাহার সমস্ত উপাদানও সংগৃহীত হয় নাই। একটা জাতিকে বুঝিতে হইলে তাহার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে সুপ্রচুর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ইহা যেরূপ সামাজিক প্রগতিরও সহায়তা করে, তেমনি চিত্তের সংস্কারদুষ্ট আড়ষ্ট ভাব দূর করিয়া সমাজে নূতন চিন্তার স্রোতও প্রবাহিত করে। হিন্দুর সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। কবে যে এই ইতিহাস প্রণীত হইবে, তাহা বলা দুরূহ; কিন্তু যাঁহারা এইরূপ খণ্ডিত আলোচনা দ্বারা এই দুর্গম পথে অগ্রদূতের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয় এবং তাঁহারা সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।

দ্বিতীয় পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকার একই রীতিতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "বহু পুরুষ সাবিত্রীপতিত থাকার পর পুনরায় সংস্কৃত হইয়া উপনয়ন-সংস্কার করা অশাস্ত্রীয় নহে।" অবশ্য ইহা শাস্ত্রীয়-প্রমাণসিদ্ধ কিনা, বনিয়াদী শাস্ত্রব্যবসায়ীরাই তাহা বিচার করিয়া বলিতে পারেন। তাঁহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের উপরও যে নূতন ভাবের গোলাগুলি বর্ষণ হইতে সুরু হইয়াছে, এই ধরণের গ্রন্থাদির প্রকাশ তাহার প্রমাণ। আমরা আশা করি, তাঁহারা তাঁহাদের সনাতন বিবর হইতে বাহির হইয়া প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবেন এবং নানা বিরোধী আলোচনার যুগোপযোগী সমাধান করিয়া সমাজকে যথার্থ কল্যাণের পথে লইয়া যাইবেন।

পালীবাল প্রভা—প্রবেশাঙ্ক, অগস্ত, ১৯২৯, সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত উমাশঙ্কর দ্বিবেদী 'কামপাল', উদয়পুর, মেবার। বর্ষিক মূল্য ১৷৷০। এই পত্রিকাখানি রাজপুতানার পালীবাল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র। ভারতবর্ষের সমাজ যে সমস্ত খণ্ড জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহাদের মাঝে নিজকে বুঝিবার ও জানিবার একটা চেষ্টা প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে। এই বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা যদি এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের উদ্যোগপর্ব্বরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে, তাহা হইলে ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যক্তিগতভাবে আত্মগঠনের চেষ্টার ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, আত্মকলহ ও দম্ভ পরিপুষ্ট হইয়া সমাজকে অধঃপাতের পথে লইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কাও অমূলক নহে। সুখের বিষয়, 'প্রভা'তে ইহার ছায়াপাত হয় নাই। এই প্রবেশাঙ্কটী নানাবর্ণে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধাদিও চিত্তাকর্ষক।

বীণা—অহিল্যাঙ্ক, শ্রাবণ, ১৯৮৬—সম্পাদক, অহিল্যোৎসব কমিটী, ইন্দোর। বার্ষিক মূল্য ৫৲। 'বীণা' মধ্যভারত হিন্দী-সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র। ৺অম্বিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠীর সুযোগ্য সম্পাদকতায় ইহা এ যাবৎ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার আকস্মিক অকালমৃত্যুর পর ইহার 'অহিল্যাঙ্ক' যে এত শীঘ্র এবং এত সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি নাই। চিত্র-সম্পদে ও প্রবন্ধ-গৌরবে এই বিশেষাঙ্কটী অতি মনোরম হইয়াছে। বীণার সাধারণ সংখ্যাগুলিও সুপাঠ্য।

ত্যাগভূমি—শ্রাবণ, ১৯৮৬, সম্পাদক শ্রীযুত হরিভাউ উপাধ্যায়, সস্তামণ্ডল, অজমের। বার্ষিকমূল্য ৪৲। অতি অল্পদিনের মাঝে এই পত্রিকাখানি হিন্দী সাহিত্য জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত ত্যাগভূমি আপনার গৌরব সমান ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। পত্রিকাখানি এত রোচক অথচ প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ থাকে যে ডাক্‌হাঁকবালা অনেক বৃহদায়তন হিন্দী মাসিকপত্র অপেক্ষা ইহাকে অসঙ্কোচে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। ত্যাগভূমির চিত্র-নির্ব্বাচনে বিশেষ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাও কম শ্লাঘার কথা নহে।

যোগেন্দ্র—আষাঢ়, ১৯৮৬, সম্পাদক শ্রীমোহননাথ যোগী,—অখিল-ভারতবর্ষীয় যোগী মহামণ্ডল, প্রয়াগ। বার্ষিকমূল্য ১।০। এই স্বল্পকায় মাসিকখানি সম্প্রতি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের মাঝে যোগবিদ্যার প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করি মহাযোগেশ্বরের কৃপায় তাহা সার্থকও হইবে। পত্রিকাখানি হিন্দী ভাষার।

সংবাদ ও মন্তব্য

জন্মমহোৎসব

বিগত ৪ঠা ভাদ্র ঝুলনপূর্ণিমা তিথিতে কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরু-ধামে সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের সার্ব্বভৌম জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরতি, বেদপাঠ, ব্রহ্মনামযজ্ঞ ও নগর-সংকীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। পূজান্তে কীর্ত্তনাদির পর সমাগত ভক্তমণ্ডলী যজ্ঞীয় তিলক ধারণ ও লুচি মিষ্টান্নাদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণা, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি ও আসাম হইতে ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যের রাজা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুর উৎসবে যোগদান করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ভক্তবৃন্দও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় কুতবপুর ও অন্যান্য গ্রামের গণ্য-মান্য অনেক ব্যক্তির সমাগম হয়। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু পাল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ শ্রীধামের গুরুত্ব ও সাধারণের তৎপ্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উক্ত তিথিতে বস্তারের রাণীসাহেবাও দার্জ্জিলিংএ মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূজা-রতি, ভোগনিবেদন ইত্যাদি সমস্তই রাণীসাহেবা নিজহাতে নিষ্পন্ন করেন। প্রতিবেশীদিগকে মিষ্টান্নবিতরণ, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, সিপাহীদিগের কুচকাওয়াজ, বাজী-পোড়ান ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানই বাদ পড়ে নাই।

ইহা ছাড়া সন্দীপ, বীরপেতি, রোশাংগিরি প্রভৃতি স্থান হইতেও আমরা উৎসবানুষ্ঠানের সংবাদ পাইয়াছি। ইহার মধ্যে সন্দীপের ভক্তগণের, বিশেষতঃ মহিলাগণের উৎসাহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষ্যে রোশাংগিরিতে একটী শাখাসঙ্ঘও স্থাপিত হইয়াছে।

পরলোকে

ব্রহ্মচারী হরিদাস সংঘের সকলের নিকটই সুপরিচিত। গত বৈশাখমাসে কাশীধামে অতি শোচনীয়ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে নাকি তাহার বুদ্ধিবিভ্রমও ঘটিয়াছিল। আমরা শ্রীগুরুর চরণে তাহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি।

কুতুবপুর জন্মোৎসবে

সাহায্যপ্রাপ্তি

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ	২৫৲
পশ্চিম-বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম	৫৲
পূর্ব্ব-বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম	৫৲
মধ্য-বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম	৫৲
উত্তর-বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম	৫৲
রাজা প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুর, বস্তার ষ্টেট্ মধ্যপ্রদেশ	৫০৲

নদীয়া—শ্রীযুক্তাঃ কালীপদ দাস ৩৲ দানবারি চক্রবর্ত্তী ৩৲; দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ রামকৃষ্ণ পাল কৃষ্ণবন্ধু পাল রাজকৃষ্ণ পাল প্রিয়নাথ ভৌমিক রাজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় গোপী বন্দোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ মুন্সী জলধর পাল সরোজিনী দেবী; এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ রামব্রহ্ম পাল রামচাঁদ পাল গৌরচন্দ্র বিশ্বাস বৈদ্যনাথ ঘোষ পঞ্চানন পাল গোপীনাথ পাল বহুবল্লভ পাল অবিনাশ পাল কৃষ্ণচন্দ্র পাল কৃষ্ণগোপাল পাল যতীন্দ্রনাথ পাল হরিবোল পাল জটাধারী মিশ্র।

চট্টগ্রাম—শ্রীযুক্তাঃ করুণাকান্ত মুখার্জি ৫৲ মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ৪॥০ টাকা; দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ হেমন্তকুমার ঘোষ ঈশ্বরচন্দ্র বণিক চন্দ্রনাথ

ভৌমিক আমিলাইস মহিলা সঙ্ঘ ১৲ ; শ্রীযুক্তাঃ রামহরি বণিক ৸৵০ রাসবিহারী চৌধুরী ১।৵০ ....বণিক ১৲ ।

হাওড়া—দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী ফণিভূষণ মিত্র হেমচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখার্জি ১৲

ঢাকা ও ফরিদপুর দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় কুমুদিনীকান্ত সাহা অনিল কুমার রায় ; এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ যতীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র চৌধুরী যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ।

ময়মনসিং—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন চৌধুরী ২৲ শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সরকার ১৲॥

জলপাইগুড়ি—শ্রীযুক্ত কুমার গুরুচরণ দেব ৫৲ শ্রীমতী ভবানীশ্বরী দেবী ২৲ শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবী ১৲।

কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট—শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দে জগৎসী সঙ্ঘ ৩৸০ শ্রীযুক্ত রাধানাথ দে ১৲ ।

কুচবিহার ও ধুবড়ী—শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস ৫৲ ; এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ নবীনচন্দ্র রায় নিশারাণী বর্ম্মাণী টুলটুলী বর্ম্মাণী ।

বগুড়া—এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ হরিনাথ কর হরপ্রসাদ রায় গোবিন্দচন্দ্র পূততুণ্ড সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ।

২৪ পরগণা—শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী ৩৲ ; দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ মতিলাল চক্রবর্ত্তী শরৎচন্দ্র বানার্জি ।

বর্দ্ধমান ও বীরভূম—শ্রীযুক্ত নৃপালচন্দ্র চাটার্জি উচালন সঙ্ঘ ১১॥৵০ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সাহা ৫ ; দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ রাধাশ্যাম মিত্র নলিনীমোহন বানার্জি করুণাসিন্ধু প্রামাণিক ।

মানভূম ও সিংভূম শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভোল ৪৲ ; শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস ২৲ ; এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামসুন্দর দে ।

মেদিনীপুর—বড়গোদা সারস্বতসঙ্ঘ ৪৲ ; দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ শরৎচন্দ্র বানার্জি মধুসূদন বানার্জি সুহাসিনী দেবী মহেন্দ্রনাথ মাইতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতি মন্মথনাথ বিশ্বাস বিধুভূষণ মিত্র সারদাপ্রসাদ পট্টনায়ক ভীমাচরণ বসু কৃষ্ণচন্দ্র বেরা ; শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ১৲ ।

আসাম—পাঁচ টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র দাস তারানাথ দাস অবিনাশচন্দ্র ঘোষ হরিশচন্দ্র রাও ; শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দাস ১৲ ।

বর্ম্মা—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দে ২৲ ।

জমসেদপুর—শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার ঘোষ ৫৲

পাটনা—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু ২৲ ।

বন্যার্ত্ত-সাহায্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী, কলিকাতা	৫৲
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু, পাটনা	২৲
শ্রীযুক্ত মঞ্জুঘোষ ত্রিপাঠী, নবরঙ্গপুর	১৲
শ্রীযুক্তা প্রফুল্লবালা দেবী, কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি, শেখরনগর, ঢাকা	২৲
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মণ্ডল ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দে, Kyankpyu, L. B.	১৲
"K"	৫৲
শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার ঘোষ, জমশেদপুর	৫৲
শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবী, তমলুক, মেদিনীপুর	১০৲

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল সর্ডিহা B.N.R. ৫৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গাঁতাইত সুন্দরচক ॥০
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দে—ঐ ॥০
শ্রীযুক্ত আসকড়ি মণ্ডল, সাঁওতাল পরগণা ৵০
শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মিত্র সংগৃহীত ৫॥০
শ্রীযুক্ত হরিশরাও, নাগা হিল্‌স, সংগৃহীত ১০৲
বীরখেতি সারস্বত সংঘ সাঁওতাল পরগণা
সংগৃহীত—১৮৵১০

ধুলেডাঙ্গা সারস্বত সংঘ সংগৃহীত ৬৲
[বিতং—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দোপাধ্যায় ৵০ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল ১৲ শ্রীযুক্ত অমূল্য সামুই ।০ শ্রীযুক্ত যুগল নায়েক ॥০ শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাল ১৲ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী ॥০ শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ চৌধুরী ১৲ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত ॥৵০]

মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম সংগৃহীত ৫৲
[বিতং—শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী, পানাড়া ময়মনসিংহ—৫৲]

পশ্চিমবাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম সংগৃহীত ১০২৸৵০
[বিতং—পাথর তোড়া গ্রাম—খুচরা সংগৃহীত ২৲ ; খড়ার গ্রাম—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দালাল ॥০ শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল ॥০ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মণ্ডল ॥০ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বাবলী ১৲ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কর্ম্মকার ১৲ শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ ১৲ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্দ্র চৌধুরী ১৲ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কর্ম্মকার ১৲ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভোল, সিংভূম ২০৲ ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মেট্টে, কুলিয়া ইস্কুল ৫৲ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র জানা, হাতিশাল গোপালনগর ৫৲ ; গ্রাম সাতমৌলি—শ্রীযুক্ত সতীসচন্দ্র সাহা ১৲, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সাহা ১৲ শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র সাহা ॥০ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সাহা ॥০ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সাহা ১৲ ; শ্রীযুক্ত ভবতোষ সাহা, খাগার বাড়িয়া ১৲ ; বিষ্ণুপুর মোক্তার বার ১৲ বিষ্ণুপুর হইতে খুচরা সংগৃহীত ২৲ ; শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় জানা, বাঘাস্থি ৫৲ ; শ্রীযুক্ত রামপদপাল পাঁচাইল ১৲ শ্রীযুক্ত রাসরঞ্জন গুপ্ত, বহড়াগুড়া ১৲ ; শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মিত্র, ইকড়া হাই স্কুল ৭॥০ ; শ্রীযুক্ত ডাঃ শান্তকুমার চিয়াড়, M. H. S. কাশীপুর ২৪৲ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় A. S. M. রাঙ্গামাটি ৪৲ ; দামোদরপুর কলিয়ারী ষ্টাফ হইতে শ্রীযুক্ত রমানাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফতে প্রাপ্ত ৮৸৵০ ; জনৈকভক্ত, রাজহাটি ৪৲ ; শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র আঢ্য ঐ ২৲ ।]

মোট	১৭৯৷৵১০
পূর্ব্বজমা	১৩৯৷৵০
সর্ব্বমোট	৩১৮॥৵১০

আকিয়াব গৌর-নিতাই ষ্টোর হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজহরি ওয়াদ্দেদার মহাশয় ১০ জোড়া নূতন কাপড় বন্যার্ত্ত সাহায্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

প্রাপ্ত অর্থাদির ব্যয়ের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ)

দানপ্রাপ্তি

উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গ্রাঃ পাটিকাপাড়া—শ্রীযুক্তাঃ ত্রিকুল দাস ২৲ ; ইন্দ্রনাথ দাস ১৲ ; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ শালুক দাস গোবিন্দ দাস সেরপেটু চিত্রকর গেদাই দাস গঙ্গাপ্রসাদ দাস ঢেপু দাস ক্ষেপু দাস গুলমস্ত সিদ্ধনারায়ণ সরকার ললিতা দাস্যা ; সংগৃহীত ২১০ । গ্রাঃ নাটাবাড়ী—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ কালীশঙ্কর বর্ম্মন হরিপ্রসাদ বর্ম্মন উপেশ্বর রায় অছিরউদ্দিন মহম্মদ বাটাই পাইকার পেল্‌কা বর্ম্মন ; সংগৃহীত ৬॥৵০ ।

গ্রাঃ রাজপুর—সংগৃহীত ১॥৴০। গ্রাঃ বৈরাতী—শ্রীযুক্ত ধনাই দাস ১৲ সংগৃহীত ৷৷৴০। গ্রাঃ নলধন্দরা—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ গেন্দদাস পাগ্লা দাস পাইকার খছরা দাস মহাতাবুদ্দিন মিঞা; সংগৃহীত ১৷৴০। গ্রাঃ গাংধর—শ্রীযুক্তাঃ বৈদ্যনাথ পাটোয়ারী ১৲ হরপতি পাটোয়ারী ১৲। গ্রাঃ চাঁদামারী—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ হরনাথ দাস সীতানাথ প্রামাণিক আজিমুদ্দিন আহম্মদনরেন্দ্রনাথ বর্ম্মন পেনকেটু দাস ধনমন্ত দাস; সংগৃহীত ১৸০। গ্রাঃ পাটপিমু—শ্রীযুক্ত জগমোহন গিদাল ১৲ সংগৃহীত ৷৷৴০। গ্রাঃ বালাগ্রাম—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দাস ১৲ সংগৃহীত ৷৷০। গ্রাঃ কাছামারী—শ্রীযুক্ত নিপুছা দাস ১৲ সংগৃহীত ।০। গ্রাঃ টাংটাঙ্গি—শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ পাইকার ১৲। গ্রাঃ জীবরামেরকুটী—শ্রীযুক্ত নজি মহম্মদ ১৲ শ্রীযুক্ত কেদার দাস পাইকার ১৲। গ্রাঃ চক্রকপাড়া—শ্রীযুক্ত কুঞ্জ নারায়ণ পাইকার ১৲ সংগৃহীত ।০। গ্রাঃ পাটছড়া—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ পদ্মনাথ পাইকার ভব্যনাথ দাস ক্ষুদিরাম দাস চন্দ্রকান্ত দাস নারায়ণ চন্দ্র সাহা সিদ্ধ নারায়ণ দাস; সংগৃহীত ১॥৴০। গ্রাঃ কুর্শামারী—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ গজেন্দ্রনারায়ণ সরকার অভরসা বর্ম্মন অনঙ্গমোহন বর্ম্মন বৈকুণ্ঠনাথ বর্ম্মন গৌরকান্ত কার্কী ভোলানাথ সরকার। গ্রাঃ মাঘপালা—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হনুমান দাস ওসোয়াল কালীপ্রসাদ দাস আহ্লাদচন্দ্র রায় কান্তেশ্বর পাইকার হরচন্দ্র দাস; সংগৃহীত ১৲। গ্রাঃ ফুলিমারী—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ রামধন বর্ম্মন অখিলচন্দ্র সরকার হলেশ্বর সরকার রাজচন্দ্র সরকার সর্ব্বেশ্বর বর্ম্মন। গ্রাঃ রাঙ্গামাটী—শ্রীযুক্তাঃ পর্ব্বানন্দ বর্ম্মন ১৲ দীননাথ সরকার ১৲। গ্রাঃ আবুয়ারপাথার—শ্রীযুক্তাঃ হরমোহন প্রামাণিক ১৲ নীলহরি অধিকারী ১৲ নারায়ণ চন্দ্র প্রামাণিক ১৲। গ্রাঃ দ্বারিয়া—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ বৈশাখ চন্দ্র রায় রামানন্দ রায় রজনীকান্ত রায় অধিকারী কালীকান্ত রায় সত্যানন্দ ঠাকুর জয়হরি রায় পাইকার গৌরকান্ত দাস; শ্রীযুক্ত জয়চাঁদ দাস ২৲ সংগৃহীত ১৸/১০। গ্রাঃ ফুলবাড়ী—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় সরকার ১৫৲ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায় সরকার ৫৲ শ্রীযুক্ত সূর্য্য মোহন রায় ২৲; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ রাবণ চন্দ্র রায় রামানন্দ রায় পাইকার দীনহরি রায় হুর্কা বর্ম্মণ কাল্টু রায় কবিরাজ জয়কান্ত দেবশর্ম্মা চল বর্ম্মণ খগেন্দ্র দাস যাদবচন্দ্র বর্ম্মণ সূর্য্য প্রসাদ বর্ম্মণ জগমোহন রায় শিবচরণ পাইকার ভূষণ চন্দ্র রায় পাইকার টুংমুনাথ সাজুনাথ টাঙ্গুরা বর্ম্মণ হরিচরণ নাথ রামসাগর সিং অভরসা বর্ম্মণ ধর্ম্মনারায়ণ অধিকারী কালীচন্দ্র নাথ সরকার মাধবচন্দ্র রায় সরকার; সংগৃহীত ১১০। গ্রাঃ খলিসাগুড়ি—শ্রীযুক্ত বাণচন্দ্র রায় পাইকার ৪৲। গ্রাঃখালিসাগোসানী—শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনচন্দ্র পাইকার ৩৲ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাইকার ২৲ শ্রীযুক্তরামদাস দাস ২৲; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ টইরা দাস টেরকেটু দাস গঙ্গাপ্রসাদ সরকার কুঞ্জনারায়ণ দাস ফেল্কু দাস মহানন্দ দাস কেটুনাথ দাস পাইকার পদ্মনাথ পাইকার রামমোহন দাস গোবিন্দচন্দ্র রায় সরকার; সংগৃহীত ২৲। গ্রাঃ জামবাড়ী—এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ পাগলা দাস হরিমোহন দাস দীনবর দালাল; সংগৃহীত ৸০ গ্রাঃ ভিতরকামতা—শ্রীযুক্তাঃ মহেন্দ্রনাথ দাস ২৲ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস দালাল ২৲ এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ সূর্য্যমোহন সরকার মধুকণ্ঠ দাস ছুয়াবারিয়া দাস নেরগেন দাস লক্ষ্মীনাথ সরকার ঘুঘুরা দাস বাউরা দাস পচা দাস কবিরাজ; সংগৃহীত ।০। গ্রাঃ বোরভাঙ্গা—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় পাইকার ৫৲ শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বর্ম্মণ ৩৲ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় ৩৲ শ্রীযুক্ত জগমোহন রায় ২৲ শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় সরকার ২৲ শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর দালাল ২৲ শ্রীযুক্ত নন্দহরি রায় ২৲; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ কালীকান্ত

দেবশর্ম্মা পিয়নাথ বর্দ্ধন রাধামোহন রায় কবিরাজ কুঞ্জ নারায়ণ পাইকার সূর্য্যমোহন রায় সরকার কৃষ্ণ চন্দ্র রায় সরকার রোহিনীকান্ত ব্যাপারী পর্ব্বানন্দ রায় গোপাইচন্দ্র রায় গোবিন্দচন্দ্র বর্ম্মণ মনেশ্বর দেবশর্ম্মা ; সংগৃহীত ১।৵০। গ্রাঃ পথীহাগা—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সরকার ১০৲ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় সরকার ১০৲ শ্রীযুক্ত মহানন্দ সরকার ২৲ শ্রীযুক্ত মমতাজউদ্দিন সরকার ২৲ ; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ ভৈরবচন্দ্র রায় কীর্ত্তিনারায়ণ রায় মুকুন্দচন্দ্র রায় কছিনউদ্দিন আহম্মদ ; সংগৃহীত ২৲। গ্রাঃ গোসানী-বন্দর—শ্রীযুক্তাঃ তুলসীরাম ভাগা ২৫৲ উদয়চাঁদ বথেরা ৫৲ প্রাণগোবিন্দ ভৌমিক ২৲ মহেন্দ্রলাল দে সরকার ২৲ রাইমোহন দে সরকার ১৲ মাধবচন্দ্র ঝা ১৲ গ্রাঃ পেটলা—শ্রীযুক্ত কুঞ্জ নারায়ণ মাঝি ১৲ সংগৃহীত ১৲। গ্রাঃ আলোকঝারি—শ্রীযুক্তাঃ গগনচন্দ্র রায় প্রামাণিক ১০৲ হরকান্ত রায় বসুনিয়া ১০৲ মহিমচন্দ্র রায় স্বর্ণকার ৫৲ হরেন্দ্র নারায়ণ বসুনিয়া ৩৲ উদয়-চাঁদ রায় ২৲ বাতাসু রায় পাইকার ২৲ গপাই বর্দ্ধণ ২৲ প্যারীমোহন রায় ২৲ নবীনচন্দ্র রায় পাইকার ২৲ তারামোহন রায় ২৲ ; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ রামচন্দ্র রায় নিগমচন্দ্র রায় বসন্তকুমার রায় খোটাই দাস চন্দ্রমোহন বর্ম্মা নন্দেশ্বর রায় আবদুলছমাদ ব্যাপারী ঝাপুড়া বর্ম্মণ কালীকান্ত রায় সরকার হলাইচন্দ্র রায় পাইকার কাঙ্গাল বর্ম্মণ পাইকার ভদেয়া বর্ম্মণ সূর্য্য নারায়ণ রায় কাপিরউদ্দিন আহম্মদ হেঙ্গা বর্ম্মণ সুরেশচন্দ্র রায় সরকার পদ্মনাথ রায় শ্যামাচরণ বর্ম্মণ চন্দ্রকান্ত বর্ম্মণ কীর্ত্তিনারায়ণ বর্ম্মণ মহিমচন্দ্র বর্ম্মণ শ্রীমতী দেবী কমলেশ্বর দেবশর্ম্মা ১॥০ সংগৃহীত ১॥০। গ্রাঃ ছোট আঠিয়াবাড়ী—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সিংহ ১০৲। গ্রাঃ দ্বিতীয় খণ্ড ভাঙ্গনী—শ্রীযুক্তাঃ রাধাকান্ত সরকার ৫৲ অভয়চন্দ্র দাস ৫৲ চন্দ্রমোহন বর্দ্ধা ৫৲ কালীকান্ত দাস ২৲। গ্রাঃ জগন্নাথ—শ্রীযুক্ত কান্টুরাম বর্ম্মা। ৪৲ গ্রাঃ খারিজা বালাকুড়া—শ্রীযুক্ত গুপ্ত নারায়ণ ব্যাপারী ৫৲। ভেটাগুড়ি—শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর রায় সিংহ ২৲। গ্রাঃ চৌপথিহাট—শ্রীযুক্ত মগরাজ রাবী ১৲

(ক্রমশঃ)

—*—

বিশেষদ্রষ্টব্য

—※—

আসাম ও পূর্ববঙ্গের প্রলয়প্লাবনের কথা কাহারও অবিদিত নাই। সহস্র সহস্র লোক নিরাশ্রয়। সম্ভবতঃ আগামী কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সেবাকার্য্য চালাইতে হইবে। এজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। যাঁহার যাহা সাধ্য, তাহাই লইয়া আর্ত্তসেবায় অগ্রসর হউন। কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করিলে নিম্ন ঠিকানায় তাহা পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও বিপন্নসেবায় ব্যয়িত হইবে। দাতার নাম ও দানের পরিমাণ এই পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশিত হইবে।

অধ্যক্ষ—সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)
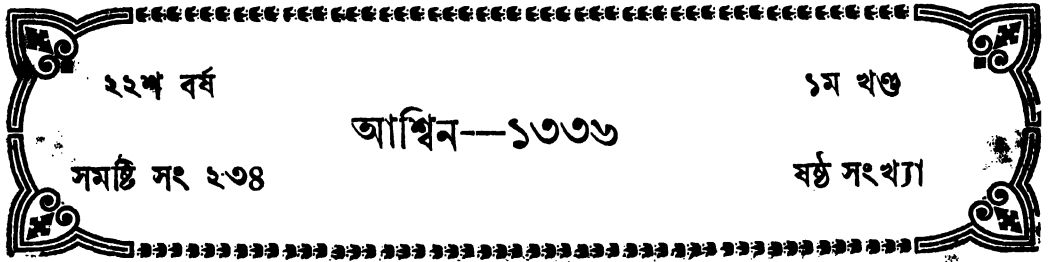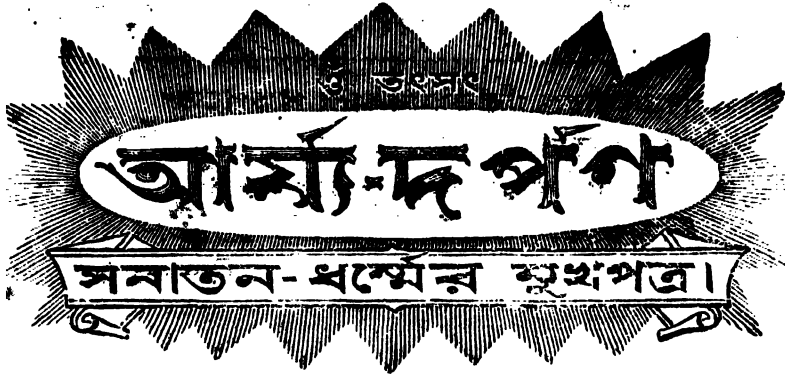
আনন্দ-লহরী

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য)

—*—

রণে জিত্বা দৈত্যান্ অপগতশিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ
নিবৃত্তৈশ্চণ্ডাংশুত্রিপুরহরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ।
বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশিশকলকর্পূরধবলা,
বিলুপ্যন্তে মাতস্তব বদনতাম্বুলকণিকাঃ॥

জিনি রণে দৈত্যগণে, খুলে রেখে শুধু শিরস্ত্রাণ,
পশুপতি-সবিতার নির্ম্মাল্যের না রাখিয়া মান,
ব্রহ্মা-ইন্দ্র-বিষ্ণু, মাগো, বর্ম্ম গায় তোরি কাছে ছুটে—
শ্রীমুখ-তাম্বুল-কণা সকর্পূর খায় লুটে-পুটে।

বিপঞ্চ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং পশুপতে-
স্ত্বয়ারব্ধে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ।
তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরপলপিততন্ত্রীকলরবাং,
নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন
নিভৃতম্॥

ঝঙ্কারিয়া বীণা তার গায় বাণী শিব-গুণ-গাথা ;
সাধুবাদ দাও তারে শুনি, মাগো, দোলাইয়া মাথা,
সুমধুর কলকণ্ঠে ছাপাইয়া তন্ত্রী-কলকলে ;—
লজ্জা পেয়ে বাণী তার বীণাখানি লুকায় নিচোলে !

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া,
গিরীশেনোদস্তং মুহুরধরপানাকুলিতয়া।
করগ্রাহ্যং শম্ভোর্ম্মুখমুকুরবৃন্তং গিরিসুতে,
কথঙ্কারং ব্রূমস্তব চিবুকমৌপম্যরহিতম্॥

আঙুলের ডগা দিয়ে গিরি যারে ছোঁয় স্নেহভরে,
চুম্বনের তরে শম্ভু বারবার তাই তুলে ধরে ;
হর-করে ও আনন-মুকুরের যেন বৃন্তটুক্—
কি বলিয়া বাখানি যে অতুলন ও তোর চিবুক !

ভুজাশ্লেষান্নিত্যাং ত্রিপুর দময়িতুঃ কণ্টকবতী,
তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়ম্।
স্বতঃশ্বেতা কালাগুরুবহলজম্বালমলিনা,
মৃণালীলালিত্যং বহতি যদধো হারলতিকা॥

মুখখানি, আহা মরি ! পদ্ম যেন, গ্রীবা তার নাল--
হরভুজ-আলিঙ্গনে নিত্য তাই কণ্টক-করাল ;
মৃণালের মত ওই হারখানি কণ্ঠেতে নিলীন—
কস্তুরী-অগুরু-পঙ্কে দীপ্তি তার হয়েছে মলিন।*

গলে রেখাস্তিস্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে,
বিবাহব্যানদ্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ।
বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং,
ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে॥

গতিতে, গমকে গীতে সুনিপুণ কণ্ঠে রেখা তিন--
কোন্ গুণে পরাজিল পিককুলে, যেন তারি চিন্;
অথবা রাগিণী যত তিন গ্রামে ঢালে সুধাধার,
কণ্ঠে তোর আঁকা, মাগো, আছে যেন সীমারেখা তার।

মৃণালমৃদ্বীনাং তব ভুজলতানাং চতসৃণাং,
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ স্তৌতি বদনৈঃ
নখেভ্যঃ সন্ত্রস্যন্ প্রথমদলনাদন্ধকরিপো-
শ্চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্পণধিয়া॥

মৃণালের মত তোর সুকোমল বাহু-লতা চারি—
মুগ্ধ-আঁখি পদ্মযোনি চারি মুখে গায় গুণ তারি;
শঙ্করের নখে তার একবার গিয়েছিল শির—
সেই ভয়ে চারি শিরে ভুজছায়া যাচে জননীর।

নখানামুদ্যোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসতাং,
করালান্তে কান্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী।
কদাচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হন্ত কমলং,
যদি ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারুণদলং॥

কত শোভা করতলে, কি করিয়া বল্ মাগো বলি -
নখরাগে পদ্মরাগ-মণিরাগে গিয়াছে যে দলি!
কমলার অলক্তক-রাগে রক্ত হয় যদি দল,
তবে যদি এককণা তুলা তার পায় গো কমল!

সমং দেবি স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনযুগ্মং,
তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রস্রুতমুখম্।
যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ,
স্বকুম্ভৌ হেরম্বঃ পরিমৃষতি হস্তেন ঝটিতি ॥

ষড়ানন-গজানন একসাথে স্তন দুটী পিয়ে ;
ঝরে সুধা, আমাদেরও ক্ষুধা যেন মিটে তাই দিয়ে !
ও দুটীর পানে চেয়ে হেরম্ব তো ভাবে, সর্ব্বনাশ !—
নিজ কুম্ভে দেয় হাত তড়বড়ি !—দেখে পায় হাস !

অমূ তে বক্ষোজাবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ,
ন সন্দেহস্পন্দো নগপতিপতাকে মনসি নঃ।
পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ,
কুমারাবদ্যাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥

স্তন নয়, ও দুটী যে সুধাভরা মাণিকের ঘড়া—
ঠিক জানি, ওরে মেয়ে, হিমগিরি-পুরী-আলো-করা !
কুমার-গণেশ দোঁহে না হলে কি মাতে ওই পানে,—
নববধূ-সুরতের কি যে রস, আজো নাহি জানে !

বহত্যম্ব স্তম্বেরমদনুজকুম্ভপ্রসূতিভিঃ,
সমারব্ধাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।
কুচাভোগো বিম্বাধররুচিভিরন্তঃশবলিতাং,
প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ কীর্ত্তিমিব তে ॥

আনি মুক্তা গজরূপী দানবের কুম্ভ বিদারিয়া,
স্তনতটে দলমল হারখানি গড়িল তা দিয়া ;
বিম্বাধর-অরুণিমা পড়িয়াছে দেখি তার পরে—
শঙ্করের দীপ্ত যশ রাখিয়াছ যেন বুকে করে।

——)*(——

মা!

—*—

তোমার পূজায় আমায় বিভোর করে দাও মা! আমায় যেন আজ তোমার কাজে সম্পূর্ণ নিয়োগ করতে পারি। তোমার স্নেহাশিষ্ আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে অপসারিত করুক।

আনন্দই তোমার আগমনের একমাত্র পরিচয়। "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—তোমার আনন্দ থেকেই যা কিছু সব বিকশিত হয়েছে। মায়ের অন্তরে যা আছে, ছেলের মাঝে স্বভাবতঃই তা ফুটে ওঠে। আজ যে আমাদের প্রাণ অহেতুক আনন্দ জাগছে, আকাশ-বাতাসে আনন্দের লহর বইছে—সবই তোমা থেকে উদ্ভূত মা! আনন্দের অভাব যেখানে, তোমার আগমন সেখানে হয়নি বুঝ্তে হবে। তুমি যেখানে, সেখানে অহর্নিশ আনন্দের কোলাহল।

বাইরের সাজসজ্জা দেখে, তুমি যে এসেছ, এ প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। আনন্দেই জীব বেঁচে আছে, আনন্দেই লীন হবে—তাই বল্‌ছি, তোমা হতেই সৃষ্টি, তোমাতেই লয়। তুমি যাকে ছাড়, তার মাঝে প্রাণ নেই, ছন্দ নেই, সুর নেই—নেই বলতে কিছুই নেই তার মাঝে। এতটুকু আনন্দকণা পেয়েই মনপ্রাণ হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, আর তোমার সমষ্টি আনন্দসাগরে পড়লে না জানি আমি কি হয়ে যাব! আদিতেও তুমি, অন্তেও তুমি—মাঝখানে ক্ষুদ্র অহং-এর সৃষ্টি. এ বিড়ম্বনা নয় কি? আমি যখন তোমার মাঝে আমাকে হারিয়ে ফেলি, তখনই বুঝি—আমি কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য!

তোমার আগমনের আর এক গূঢ় রহস্য—আমায় তুমি জাগিয়ে তোল। অহমিকায় যখন মুগ্ধ হয়ে থাকি, তোমায় তখন ভুলে যাই। আমাকেই একান্ত করে দেখি—ভাবি, আমার মতন বুঝি এ জগতে আর কেউ নাই। তুমি এসেই তো আমার মিথ্যা গর্ব্ব ধূলায় লুটিয়ে দাও মা! বাইরের কলরব থেকে নিজকে গুটিয়ে যখন অন্তরে অন্তরে তোমার ওই অপরূপ রূপসুধা পান করি, তখন যে আমি চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় জোনাকীটীর মত হয়ে যাই! ভুলে যাই, ঘুমিয়ে পড়ি—তাই তুমি জাগাতে আস; নইলে আমাদের সাধ্য কি যে তোমায় ডেকে আনি! আমাদের ডাকে শুধু আসনি তুমি—সন্তানের স্নেহ-ডোরে বাঁধা আছ বলেই এসেছ! আর, না এসে যে থাকতে পার না মা—সন্তানের সুখদুঃখের বেদনাময় নীরব আত্মনিবেদন যে মায়ের প্রাণেই বিশেষ করে বাজে। না চেয়েও যখন তোমাকে পাই, এতেই তো বুঝি, তুমি আমার বুকের ভাষা জান; চাওয়া মাত্র দেওয়ার আকুলতা জাগে তোমার মাঝে।

যেখানেই যাই না কেন, যাই করি না কেন—তুমি আমার সর্ব্বত্রই রয়েছ। আমি—তুমিময়। তোমার সত্তাতেই আমার সত্তা—তোমাতেই আমার সর্ব্বস্ব। শিশু যখন গর্ভে থাকে, মায়ের তৃপ্তিতে তারো তৃপ্তি হয়; মায়ের বুকের রক্ত দিয়েই সন্তানের শরীর গড়ে। তোমার স্নেহ দিয়ে যখন আমায় তুমি গড়ে তুলেছ, তখন আমি আমায় তুমিময় ছাড়া আর কি বলব!

তাই দেখছি, তোমার বাঁধন তুমি না ঘুচালে আমাদের সাধ্য কি যে তা থেকে মুক্ত হয়ে বের হয়ে আসি? আমার বিক্রম—মায়েরই শক্তিতে। তুমি মুক্তির পথ দেখিয়ে না দিলে, আমার পথ আমি হাজার চেষ্টা করলেও তো বের করতে পারব না।

আবেদন জানাতে পারি—সংস্থান করা না করা তোমার ইচ্ছা।

আমি সন্তান—সন্তানের মত থাকবো! আমার মত নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার সুযোগ আর কার? আপদে-বিপদে রক্ষা করতে মায়ের মত আর কে আছে—ভাব দেখি। আমরা যে হেলায়-খেলায় পার হয়ে যেতে পারি! আনন্দময়ীর সন্তান—আনন্দ আছে বলেই তো দুঃখের ঝঞ্ঝার মাঝে পড়েও তাকে অতিক্রম করে আসতে এতটুকুও বাধেনি! টান তো এক দিকের নয় শুধু—মাকে ছেড়ে ছুটে এলে মায়ের দিক থেকে উল্টো টান পড়ে। সাধ্য কি যে না এসে থাকতে পারি? দূরে সরে পড়লেই আশঙ্কা জাগে - আর ফিরতে পারব না বলে হতাশা আসে! সবই ভ্রান্তি—বদ্ধ যদি করে থাকেন, মুক্তিও দেবেন তিনিই। ভাবনা কিসের? নিশ্চিন্ত হওয়াই তো একমাত্র সাধন! আজ সব ভুলে গিয়ে প্রাণ খুলে শুধু আনন্দ করি আর মায়ের কাজ করতে করতে মায়ের নামে মেতে গিয়ে আপনা হারাই—এই তো আমাদের প্রাণের পূজা।

আনন্দের লক্ষণ প্রাচুর্য্যে—প্রয়োজনের অধিক আয়োজনে। তাই মায়ের পূজায় এত আয়োজন, লোক-জনের আসা-যাওয়া। আনন্দের হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে চারদিকে। শিউলি অজস্র ফুল বর্ষণ করছে, স্থলপদ্মের শাখাগুলো ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে—সবদিকেই প্রয়োজনকে ছাপিয়েও আয়োজনের আড়ম্বর। আনন্দেই মানুষ নিজকে নিঃশেষে দান করতে পারে—কেননা তখন তো তার ভাণ্ডার খালি হয় না কিছুতেই! এত ফুল ফুটেছে আজ, পরদিন ভোরে গিয়ে দেখি, আবার সেই ফুলের রাশি! মায়ের চরণে অঞ্জলি হয়ে পড়বে—এর চেয়ে ফুলের সার্থকতা আর কি হতে পারে? শূন্য হচ্ছে না বলেই বিলিয়ে দিয়েও এত সুখ, এত আনন্দ! উপনিষৎ তাই বলেছেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলেও ভাণ্ডার পূর্ণই থাকে। আনন্দ উদার, বিন্দুমাত্র দারিদ্র্য নাই তার মাঝে। আনন্দময়ীর আগমনে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার পূরে গিয়েও আনন্দের বন্যায় জগৎ ভেসে গিয়েছে। যেদিকে তাকাই. কেবল প্রয়োজনের অতিরিক্তই সব দেখি। পূজার আয়োজন করতে, হয়ত দু'এক জন হলেই মিটে যায়, সেখানেও বহুলোকের কলরব। এই তো আনন্দের পরিচয়। আনন্দ শুধু একা একা হয় না—বহুর সম্মিলনেই আনন্দের উদ্ভব। সবার মতি-গতিও একমুখী হওয়া চাই—তবেই আনন্দ জমে ওঠে। মায়ের ভাবে সবাই ভাবিত—তাই সবাই আজ আনন্দে মগন! কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছে না, যার যার অভিরুচি অনুযায়ী কাজ বেছে নিয়েছে, অথচ বিশৃঙ্খলার লেশ নেই কোনও কিছুতেই। বহু হয়েও আজ সবাই এক।

আনন্দে মানুষকে কোমল করে, সুন্দর করে। তাই দেখছি, সমগ্র প্রকৃতির মাঝে একটী অপূর্ব্ব ললিত-মধুর শ্রী দেখা দিয়েছে। শুষ্ক হয়ে যায় অভাবে। আজ তো অভাব নেই কারু; তাই অভাবের পরিচয় যে কঠোরতা মলিনতা. এসব আজ পৃথিবী থেকে পালিয়েছে। আজ সবই পূর্ণ, তাই সবই সুন্দর।

মা যে এসেছেন, এর চেয়ে বেশী প্রমাণ আর কি ভাবে পেতে চাও? পরিপূর্ণতাই মায়ের পরিচয়। দেখছ না কি—কোনদিকে অভাব নাই, দৈন্য নাই, অফুরন্ত ভাণ্ডার—কেবল আন আর দাও! আমরা কেবল বিতরণ করছি—প্রয়োজন পড়লেই ইচ্ছামত, নিজের খুসীমত এনে কেবলই খরচ করছি। কোথা থেকে আসছে, শেষে কি হবে—এসব চিন্তা ভ্রমেও আজ মনে জাগছে না। খরচ করেও দেখি—ভাণ্ডার পূর্ণ। অন্নপূর্ণা মা আমার দশ

হাতে দান করছেন, আমরা আমাদের দুটি হাতে বিলিয়ে আর কতটুকু কমাতে পারব ? মায়ের দেওয়া উপচারেই মায়ের পূজা ; তবু যে আমাদের কত গর্ব্বহীন আনন্দ ! কেননা মা যা দিয়েছেন, তা তো আমারই—ছেলের জন্যই যে মায়ের সব ! আজ বুঝতে পেরেছি, আমি তোর—এই আমার পরম সার্থকতা।

প্রাচুর্য্যের মাঝেই তিনি ধরা দিয়ে রয়েছেন। তিনি আমার একলার নন—জগতের সবাই উদগ্রীব হয়ে উৎসুক নেত্রে তাঁর পানে চেয়ে রয়েছে। সবাই মিলতে পেরেছি—এতেই তো তাঁর পরিচয়। এতদিন যাকে নিন্দা করেছি, অবজ্ঞার চোখে দেখেছি, তার সঙ্গেও আজ সহজভাবে মেলামেশা করতে পারছি। সচেতন-অচেতন প্রতি পদার্থে সবার মাঝে আজ তাঁকে অনুস্যূত দেখতে পাচ্ছি, তাই বাইরের ভেদাভেদ আর দলাদলি উঠে গিয়েছে। সবাই আমরা মায়ের সন্তান বলেই এক হতে পেরেছি। তাঁর শক্তি ছাড়া তো এমন ভাবে বৈশিষ্ট্যের, স্বাতন্ত্র্যের অভিমান চুরমার হয়ে একাকার হয়ে যেতে পারে না কিছুতেই। তাই লোকে বলে, তিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। তোমার যা খুসী তাই করতে পার।

সমাজে হেয় বলে যাকে ঘৃণা করে দুয়ার থেকে বিদায় করে দিয়েছি, আজ তাকে ডেকে এনে আদর-আপ্যায়ন করে তাঁর প্রসাদে তার মনোরঞ্জন করছি। এ রাজ্যে জাতিভেদ নাই—পূজার দিনে মান, গর্ব্ব, সম্ভ্রম, যশ, কোন কিছুর কথাই মনে জাগে না। বিচার করি, সম্মান দিই অন্তর বুঝে—তোমাকে বুঝবার জন্য যার মনে-প্রাণে সত্যিকার আবেগ রয়েছে, তাকেই শ্রদ্ধা করতে প্রাণ চায়।

বাড়ীর কর্ত্তা, যিনি হয়ত আরামের ব্যাঘাত হবে বলে ভোগের সামগ্রী কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারেন নি, আজ তিনিই খালি পায়ে খালি গায়ে দীন বেশে সকলকে আদর-আপ্যায়ন করছেন আর সবার কাছে ক্রটী-বিচ্যুতির দরুণ ক্ষমাভিক্ষা চাচ্ছেন। ভক্তের অপমানে মায়েরও অপমান, তাই বাড়ীর কর্ত্তা ঘুরে ঘুরে দেখছেন, কোন দিক দিয়ে কারও অসন্তুষ্টির কারণ ঘট্‌ছে কিনা। সামান্য একটা পথের ভিখারীকে বিমুখ করতে আজ প্রাণে বাজে। কেননা সে যে কত আশা করে এসেছে মায়ের পূজার বাড়ীতে। ভিখারীকে তুষ্ট করা, ইচ্ছামত পেট ভরে খাওয়ান, এ-ও মায়ের ইচ্ছা—তাই মা অন্নপূর্ণা অন্নে-বস্ত্রে ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমরা কেবল বিলাব—যে যা চায় ! যোগানের ভার তো মা-ই নিয়েছেন !

এক এক জাতির প্রাণে এক এক দেবতার সংস্কার রয়েছে। তাই শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক কত মত, কত ভাবেরই উপাসক রয়েছে। আজকার পূজা সবার হলেও বিশেষ করে বাঙ্গালীর ; বাঙ্গালীর সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মায়ের পূজা—তাই মায়ের আগমনে বাঙ্গালী যেমন করে সাড়া পায়, এমন আর কেউ না ! বাঙ্গালীর প্রাণ মায়ের ভাবে উদ্বুদ্ধ। এমন করে আর কার প্রাণ মায়ের জন্য কাঁদে বল দেখি ? তাই বলছি—দুর্গাপূজা বিশেষ করে বাঙ্গালীর পূজা। আশৈশব তারা মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, শক্তির উপাসনা করেই তারা তৃপ্তি পায়। প্রবাসে থেকেও যার অর্থসামর্থ্য রয়েছে, সে সেখানেই পূজার আয়োজন করে। এমন প্রাণী নেই বাঙ্গলায়, যার প্রাণে আজ মায়ের আগমনীর সাড়া না পড়ে গিয়েছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আজ মায়ের বোধন। মাতৃভাবে সবার প্রাণ উদ্বুদ্ধ—এতগুলো হৃদয়ে আজ একই মন্ত্রের স্পন্দন।

আমাদের যত সহজে মিল হতে পারবে, আর কোন জাতির মাঝেই এমন অনায়াস সুযোগ নাই। আমরা সবাই এক, আমাদের ইষ্ট এক বলে। অপরে যেখান থেকে সঙ্কোচে প্রাণের দৈন্যে পিছিয়ে আসবে,

বাঙ্গালীর প্রাণ সেখানে শক্তিমন্ত্রের তরঙ্গে নেচে উঠবে। মায়ের শক্তিতে বাঙ্গালী সব ক্ষেত্রেই বিজয়ী হয়ে এসেছে। তারা জানে—তাদের ক্ষুদ্র-শক্তির পেছনে মহাশক্তির প্রেরণা রয়েছে। আর সবাই ঘুমালেও, অচেতন হয়ে থাকলেও বাঙ্গালী নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এসেছে। বাঙ্গালীর প্রতি অণু-পরমাণু শক্তির ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত—মায়ের কাছ থেকে সে আজ "মাভৈঃ" বাণী পেয়েছে। চির-দিনই সে পেয়ে এসেছে—মাতৃচেতনা বাঙ্গালীর মর্ম্মসত্য।

* * *

বাঙ্গালী পূজা করে তাঁরই—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।

—যিনি শ্রদ্ধারূপে সকলের হৃদয়ে রয়েছেন।

শ্রদ্ধা হচ্ছে আস্তিক্য-বুদ্ধি, অস্তিত্বে বিশ্বাস। যা নাই তার দরুণ হতাশ সে করে না—আছে, এই গৌরবে তার হৃদয় পুলকে উপচে ওঠে। তুমি যে আছ, তা যে খাঁটী ভাবে জানি। জীবে জীবে যখন শ্রদ্ধারূপে আবিষ্ট হয়ে আছ, তখন অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অবহেলা করব কাকে? অপরকে তুচ্ছ করব, ঘৃণার চক্ষে দেখব, সে যে তোমাকেই করা হবে। আনন্দ-সম্মিলনীতে সবাই আজ শ্রদ্ধার যোগ্য। শ্রদ্ধায় হৃদয় বিনম্র করে। যাকে ভালবাসি, যার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, তাকেই শ্রদ্ধা করি।

যার শ্রদ্ধা আছে, জীর্ণপর্ণকুটীরবাসী হলেও সামান্য কারুকার্য্যহীন মূর্ত্তিপটেই তার গৃহে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁকে পেতে আর কিছুই লাগে না—শুধু শ্রদ্ধা চাই। ইষ্টকে যে টলাতে পারব—সে শুধু শ্রদ্ধার জোরে।

তুমি মা যাকে ভালবাস, তাকে তো বিমুখ করে থাকতে পার না। তাই তোমাকে পেয়েছে আজ শ্রদ্ধাবান্। তুমি যে আছ, সে তা জানে; তুমি যে এসেছ, সে তা দেখতে পাচ্ছে। তোমার প্রতি অনুরাগই তো আমার শ্রদ্ধা। তোমাকে দেখলেই আমার সকল গর্ব্ব বিনম্র হয়ে আসে, কেন কি হয় জানি না—তোমাকে শ্রদ্ধা করে, তোমার পায়ে প্রীতিপূজার অঞ্জলি দিয়ে তৃপ্তি পাই—না দিয়ে থাকতে পারি না—পূজা না করে পারা যায় না—তাই করি। আমি অচেতন হয়ে সবই করে যাই, তুমি আমার বুকের মাঝে সচেতন থেকে সবই গ্রহণ কর। গ্রহণ কর আমার শ্রদ্ধা, আমার পবিত্র হৃদয়।

শ্রদ্ধা জাগে—বীর্য্য থেকে, শক্তি থেকে! যে যত শক্তিশালী, তার প্রাণে তত শ্রদ্ধা। নিজকে দুর্ব্বল ভেবে কোন দিকে পার পাবার যো নেই। এই শ্রদ্ধা যার প্রাণে জেগেছে, তার হৃদয়শতদলেই মায়ের অমূল্য অভয়াসন।

শ্রদ্ধা মানে টান। মায়ের প্রতি ছেলের স্বাভা-বিক টান রয়েছে, তবু যার প্রাণে যত আকুলতা জেগেছে, সেই তত কাছে পেয়েছে মাকে। ঐশ্বর্য্যের গরব কোরো না—মা তো বাইরের আয়োজন চান না। অন্তরের খাঁটী শ্রদ্ধাই যে মায়ের চরণে শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি।

আমরা তোমাকে পেয়েছি সেই সহজরূপে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।

—সবার মাঝে কান্তিরূপে তুমি রয়েছ মা!

যা কিছু সুন্দর, তাতে তোমার অধিষ্ঠান। তুমি তো মা শুধু বাইরের নও,—তুমি সবার প্রাণ, তাই তোমার প্রকাশ যেমনি সতেজ, তেমনি কমনীয়। রূপ দেখে আকর্ষণ—সে ভুল কথা; তোমাকে দেখি বলেই অমন আত্মহারা হই। তোমাকে যে ভালবাসে, রূপে রূপে তোমাকেই যে সে দেখতে পায়।

এ ধরণীর কান্তি এল কোথা থেকে?—তোমার ঐ অক্ষয় সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার থেকে। যেথানে সৌন্দর্য্য, সেখানেই তোমার পূজা। তোমার আগ-মনে অবনী বিচিত্র সাজে সজ্জিত। এ সৌন্দর্য্যের

মাঝেও মোহ রয়েছে, কিন্তু তোমাতে তো সে আশঙ্কা নেই। রূপ দেখে ভুলে যাই, কিন্তু তোমাকে দেখলে পর আর ভুলবার ভয় থাকে না। রূপে শুধু ভুলাতে চায়, আর তুমি দাও চেতনা। রূপ ছাড়িয়েও যে তোমার রূপ, তাই তো তোমার অরূপ কান্তি। আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, আমি চাই তোমাকে। জগৎকে ষড়ৈশ্বর্য্যে প্লাবিত করেও অন্তরে ফুটে উঠুক তোমার কমনীয় কান্তি—সকল ঐশ্বর্য্য মুগ্ধ, স্তব্ধ হোক্। অন্তরে যদি তোমাকে পাই, বাইরে লাভই হোক আর ক্ষতিই হোক, তার দরুণ ভাবি না—কেননা দেখতে পাচ্ছি, তোমার রূপের শান্ত শোভায় জগৎ ছেয়ে গেছে—জীবন-মরণ সমান উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

* * *

আজ মুগ্ধ স্তব্ধ অন্তরের অন্তরে ফুটে ওঠে তোমার সেই রূপ—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।

—লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বভূতে তোমারই অধিষ্ঠান।

তুমি এসেছ বলেই আবার অবনীর লুপ্ত শ্রী ফিরে এসেছে। লক্ষ্মীর বেশেই অসহিষ্ণু সংসারের সকল অসামঞ্জস্যকে তুমি সুসামঞ্জস্যে সুন্দর করেছ। যে সংসারে তুমি নাই, সে সংসার অলক্ষ্মীর বাসস্থান—সকল সম্পদ্ সেখানে দিন দিন ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে, পদে পদে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে, যতটুকু আছে ততটুকুর মাঝেও কত গণ্ডগোল! তবু সে ক্ষণিক ভ্রান্তি তোমার স্পর্শে আজ দূর হয়ে যাচ্ছে—নিরুপমা ক্ষমার প্রতিমা হয়ে তুমি বিশ্বের সকল উপদ্রব স্নেহভরে বুকে তুলে নিয়েছ—আমার অন্তরে বাইরে এক সুরে বেজে উঠেছে। তোমার প্রকাশ যেখানে, সেখানে যে ক্ষুব্ধ অনুযোগ নাই—আছে শুধু নীরবে আত্মত্যাগ, আত্মহারা তপস্যায় সকল বিশ্বে, সকল দৃশ্যে তোমাকেই ফুটিয়ে তোলা—সবাইকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা!

* * *

আবার দেখি তোমায়—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।

—সর্ব্বভূতে দয়ারূপে তুমি অবস্থান করছ।

পরদুঃখ হরণ করবার দরুণ যে ব্যাকুলতা জাগে, মূলেও তুমি। আমার অক্ষমতায় ব্যথিত তোমার হৃদয় হতে ঝরে পড়ে তোমার করুণা। বাধাবিপত্তিতে যখন দিশেহারা হয়ে যাই, জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে, তখন আমার আঁধার বুকে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলে তোমার করুণা। এত দুঃখকষ্ট এ বুকে সহ্য হত না—যদি তুমি আড়াল থেকে আশ্বাস না দিতে!

আমার সহজ-সরল গতি যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, সন্তানের মত আব্দার করতে গিয়ে শতদিক থেকে সঙ্কোচ এসে আমার প্রাণের কথা, বুকের আবেগকে রুদ্ধ করে রাখে—তখন মনে হয়, তুমি কি মা আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছ ক্রমশঃ? তুমি মা করুণাময়ী, তুমি নিজে ভালবেসেই শিখিয়েছ—কেমন করে ভালবাসতে হয়, স্নেহ করতে হয়। আমার বলতে তো কিছুই নাই—সবি যে তোমার। তুমি দিয়েছ বলেই না পেয়েছি। তোমার শক্তিতে শক্তিমান আমরা—তা নইলে প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতাম কেমন করে?—শক্তির মূল আধারই তুমি; প্রলয়ের পর তোমা হতেই জগতের সৃষ্টি। তুমিই মা জীবে জীবে করুণা সঞ্চারিত করে দিয়েছ। তুমি যা দাও, তা পূর্ণ, অক্ষয়, শাশ্বত। নিষ্ঠুরতা দিয়ে তো আমাদের গড়নি। লালন-পালন করেছ স্নেহ দিয়ে, এখনও যে বেঁচে আছি তোমার স্নেহসুধা পান করেই।

তুমি আমায় তোমার মনমত করেই গড়ে তুলেছ—তাই আমার মাঝেও তোমার গুণ থাকবে। দীন, দুঃখী, বিপন্নকে দেখলে আমারও তোমার মত চোখে জল আসবে; নিজে দুঃখে থেকেও পরকে কেমন

করে সুখী করব, এই হবে আমার কামনা। বল, সম্পদ্ যা কিছু দিয়েছ পরকে সুখী করতে। যার প্রাণে অপরের বেদনা এসে আঘাত করেছে, তারি প্রাণ তোমার নিজহাতে গড়া প্রাণ—যেমন মা, তেমনি সন্তান। আমার মাঝেও তুমি আছ—তোমার দয়াতেই সবার মাঝে আজ তোমাকেই পেলাম!

* * *

আমি তোমায় ছাড়া আর কাকে ভাবব মা? তোমার সঙ্গেই আমার প্রথম থেকে পরিচয়—আমি আর কাউকে জানি না, কাউকে চিনি না। আজ তোমার পায়ে নিজকে সঁপে দিয়েছি—আমার ভয় নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই। আমার ব্যষ্টি জীবনের কূল ছাপিয়ে আজ তোমার করুণামৃতধারা বয়ে চলেছে। আমার সমস্ত চাওয়ার দাবী অবিরত অম্লানবদনে হাসিমুখে তুমি মিটিয়ে দিচ্ছ।

আমায় তুমি স্নেহ কর, প্রাণ দিয়ে ভালবাস; তাই সকল আবরণ ফেলে ঠিক আমার মা-টীর বেশে আমায় ধরা দাও। আর তুমি আমায় ফাঁকি দেবেই বা কি করে?—তোমারও মুখ যে তুমি ঢাকৃতে পারবে না। কত সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার লহর আমার জন্য তোমার বুকে বয়ে গিয়েছে, যাচ্ছে—আমি কি তা ভুল্‌তে পারি?

আমি জানি না তোমায় কি করে পূজা করতে হয়। জানি না, এই আমার ভাল—জেনেও তো দেখি, তুমি অজানাই থেকে যাও। আমি যেন অহমিকায় দুর্ব্বিনীত হয়ে না উঠি। আমি যে কিছু জানি না, এইটুকুই আজ প্রার্থনার মন্ত্রে শ্রদ্ধার প্রণতিতে জানাব। আবার ভাবি, এও তো মিথ্যা কল্পনা। আমার সবটুকুর খবর রাখ বলেই তো তুমি আমার মা। কাজ কি আমার বাইরের আয়োজনে? আজ শুধু আমাকেই আমি সমর্পণ করে দেব বলে পূজার মন্দিরে প্রবেশ করেছি। পূজা-অর্চ্চনার রীতিনীতি কিছুই জানি না মা—জেনেছি শুধু আমার তীব্র অহংকে আর তোমাকে। আমাকে আমি ছাড়তে পারি না—এই অক্ষমতাই তোমায় নিবেদন করে দিতে এসেছি। ঠেক্‌তে যখন হবেই তখন তোমাতে গিয়েই শেষ ঠেকা ঠেকতে চাই। যদি কিছু করবার থাকে, সে তুমিই জানবে—আমি নিশ্চিন্ত, মুক্ত।

আজ তুমি আমার পূজা নিশ্চয়ই নিয়েছ—নইলে এমন করে আমার বুক ভরে উঠেছে কি করে? যা ভাবি না, তাই তুমি দেখাও—সহজে ধরা দিতে আস বলেই চমক লেগে যায়। আজ পূজার দিনে, শুভক্ষণে শুধু তোমার একটুমাত্র সকরুণ দৃষ্টিতে যে অনুভূতি জাগল, এর যে আর তুলনা পাই না। আমি শত সাধনা করেও কিছু পেতাম না—তুমি যদি নিজ গুণে না দিতে।

আজ তুমি এসেছ, সবার পূজা নিয়েছ—আমরা প্রাণ পেয়েছি। সকল ভাবনা-চিন্তা থেকে আজ মুক্তি পেয়েছি। তাই আজ প্রাণ ভরে গাইছি শুধু—

"মা আছেন আর আমি আছি—
ভাবনা কি আছে আমার?
মায়ের হাতে খাই পরি—
মা নিয়েছেন আমার ভার।"

শক্তির সন্ধান

—*—

শক্তি কোথায়? শক্তি আমার মাঝেই। বাহির হইতে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে না, আমারই অন্তশ্চর চেতনায় নিগূঢ় হইয়া আছে সে—শুধু তাহাকে চাহিলেই পাই; এমনি সহজ, এমনি অনায়াস, এমনি ধ্রুবা সে!

আমার বাসনাই শক্তির আদি প্রকট রূপ। কাঙাল আমি, তুচ্ছ আমি, তবুও আমার বাসনার একটা সার্থকতা আছে; একটা মূল্য আছে। বাসনা কারণ, কার্য্য সৃষ্টি। আমিও সৃষ্টি করিতে পারি না কি? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিতেছি না কি? সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আশঙ্কা দিয়া আমার জগৎ আমিই গড়িয়া তুলিতেছি না কি?

কিন্তু এই সৃষ্টিতে আমি আনন্দ পাই না যেন। কোথায় যেন আমার প্রতিভা ব্যাহত হইয়া যায়—যাহা চাই, যেমনটী করিয়া চাই, তেমনটী করিয়া পাই না। তাই সন্দেহ হয়, আমি বুঝি শক্তিহীন।

না, শক্তিহীন তুমি নও। বাসনার আদিনির্ঝর যাহা, তাহাতে অবগাহন করিতে পার নাই, তাই তোমার সিদ্ধিতে এই ব্যাঘাত। তুমি স্থূলসেবী, দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া বড় জোর সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত গিয়াছ, তোমার কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা ওইখানে গিয়াই টুটিয়া গিয়াছে। আমি বলি, শুধু সূক্ষ্মে গিয়া থামিলেই হইবে না—তোমাকে সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্মে যাইতে হইবে, কারণজগতে পৌঁছাইতে হইবে; তবেই শক্তিরহস্য তোমার আয়ত্ত হইবে, বাসনা আর তাহার সফলতার মাঝে এই নিত্য দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে।

কোথায় সেই কারণজগতের অনুভব?—দাঁড়াও, বলিতেছি। একটু স্থির হইয়া বস। কেবল অনিশ্চিত সিদ্ধির পেছনে পেছনে ছুটিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছ, এক দণ্ডের তরে একটু সুস্থির হইয়া বস। ভয় নাই, আমি তোমাকে প্রাণসংযম, চিত্তনিরোধ ইত্যাদি কিছুই করিতে বলিব না। শুধু নিজের মনটীকে দূরে ছাড়িয়া দিয়া একটু তফাৎ হইয়া বস। অগণিত চিন্তাতরঙ্গ তোমার মাঝে দুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে, একটু বিবিক্ত হইয়া তাহাদের খেলা দেখ না কেন! ওই দেখ, কত বিচিত্র বাসনা, অন্ধকারের গর্ভ হইতে মৃদুগন্ধবাহী শেফালির মত প্রকাশের পানে ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই ঝরিয়া পড়িতেছে—একটীর পর একটী—তার পর আর একটী—শরতের প্রভাতে শিউলী ফুলের ঝরার মত—তার যেন আর বিরাম নাই! তোমারই মনোজা এই বাসনার পরম্পরা, দেখিয়া আনন্দ হয় না কি? এরা যেন প্রভাতসূর্য্যের স্বর্ণরশ্মির মত, তোমারই চোখের সম্মুখে ঝিল্‌মিল্ করিয়া কাঁপিতেছে;—কিন্তু ওই দেখাতেই সুখ, কঠিন মুষ্টিতে উহাদের বন্দী করিতে যাও—মুঠি ভরিয়া পাইবে পরমশূন্য! মায়ারশ্মি তোমার নাগালের বাহিরে গিয়া আবার তেমনি ঝিল্‌মিল্ করিয়া আনন্দে কাঁপিতে থাকিবে!

এই অগণিত কামনার পেছনে পেছনে দিনরাত ঘুরিতেছে, চঞ্চল আলোকরশ্মিকে তোমার কার্পণ্যের মঞ্জুষায় আটকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছ—পাইয়াছ শুধু আঁধার—গভীর আঁধার। কিন্তু দূরে বসিয়া ইহাদের চপল নৃত্য দেখিতে কি আনন্দ! বাসনা যে কি করিয়া বাস্তবে রূপ নেয়, তাহা জানি না; জ্যোতির্ম্ময় মহান্ত পুরুষের রোমকূপ হইতে বিচ্ছুরিত এই আলোকরশ্মিগুলিও কি করিয়া কলিকে মুঞ্জরিত করে, ওষধিকে সফল করে, ফলকে রসে নিবিড় করে, তাহাও তো জানি না। জানি না কিছুই, তবুও দূর হইতে এই বাসনার বিভ্রম, এই আলোকস্ফুলিঙ্গের চটুল নৃত্য দেখিতে বড় সুন্দর লাগে।

তারপর আরও একটু গভীরে তলাইয়া গিয়া দেখ দেখি, কোথা হইতে এই বাসনা পরম্পরার উদ্ভব? দিনের আলো মিলাইয়া যাইতে না যাইতে আকাশে ফোটে অগণিত তারার ফুল; কোথা হইতে আসে, আবার প্রভাতের আহট পাইতে না পাইতে কোথায় মিলাইয়া যায়? বর্ষার প্রথম বারিসেকে ধরিত্রীর পুলকিত তনু ছাইয়া দেখা দেয় কোটি কোটী তৃণাঙ্কুর—কোন্ রহস্য-লোক হইতে? নিয়া আস না তোমার কার্য্য-কারণের ন্যায়-পরম্পরা—ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে কি? একটী চিন্তার পর আর একটী চিন্তা তোমার চিত্তে ফুটিতেছে—কোন ন্যায়ের বিধান মানিয়া, তাহার সন্ধান পাইয়াছ কি? সম্বন্ধ-তত্ত্ব বা Law of association কিছু দূর পর্য্যন্ত ইহাদের সগোত্র সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াই দেখি কাণা হইয়া যায়। আর সে আবিষ্কারেরই বা মূল্য কতটুকু! কেনই বা অগণিত সম্ভাবিত চিন্তাধারার মাঝে এইটীর জুড়ি ওইটী হইল, কেহ তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিবে কি? অদৃশ্য লোকে বসিয়া এ কোন্ পয়েণ্টস্-ম্যান আপন খেয়ালখুসী মত এ-লাইন হইতে ও-লাইনে এই অপরূপ shunting করিয়া চলিয়াছে, তাহাকে ধরিতে পারিয়াছ কি? আজ বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞান-দম্ভের যুগে এই প্রশ্ন তেমনি উদ্যত রহিয়াছে, যেমন নাকি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তপোবনচ্ছায়ে ঋষির বিস্ময়-বাকুল কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল—

> কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ?
> কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ?
> কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি?
> চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি?

—এ কার খেয়াল-খুসীতে বিবশ হইয়া এই মন ছুটিয়া চলিয়াছে? কার খুসীতে প্রাণে প্রথম প্রগতির প্রেরণা জাগিল? কার খেয়াল-খুসীতে মানুষ এই বাণী উচ্চারণ করিতেছে? কোন দেবতা এই চক্ষু-কর্ণকে কাজে খাটাইতেছে?

সেই অনাদি রহস্য! অন্ধকার হইতে আলোর বিকাশ, কলি হইতে ফুলের ফোটা, নিদাঘ হইতে বর্ষার সঞ্চার, মরণ হইতে জীবনের আবির্ভাব—এক কথায় নাস্তি হইতে অস্তির উৎপত্তি! চোখের সম্মুখে অহরহ এই লীলা দেখিতে পাইতেছি—প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ন্যায়ের যুক্তিতর্ক ধূলায় লুটাইয়া পড়িতেছে—ওই মায়াবিনী আমার ঘটে তাহারই দেওয়া বুদ্ধিকে বিদ্রূপের অট্টহাস্যে খান্-খান্ করিয়া দিতেছে—এ দেখিয়া কি বলিব, কি মীমাংসা করিব?

ওই মায়াবিনীর চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া সমজদার রসিকের মত কখনও বলিয়া উঠি—বলিহারি! যে ভেল্কী তুমি দেখাইলে, বুঝিতেছি, এ তোমার আগাগোড়াই ফাঁকি, তবুও সে ফাঁকি ধরিতে তো পারিতেছি না; আর ধরিয়া ফেলিলেও বুঝি চিত্তের এই চমৎকারটুকু থাকে না! অতএব হে মায়াবিনী, তোমার এই ইন্দ্রজাল অনির্ব্বচনীয়, তুমি অনির্ব্বচনীয়া, এই যে বিস্ফারিত চোখে তোমার এই সম্মোহনের লীলা দেখিতেছি—আমার এই সম্মুগ্ধ দৃষ্টিও অনির্ব্বচনীয়!

অথবা গম্ভীর হইয়া কখনও বলি, চিত্তকে শরবৎ তন্ময় করিয়া এই অস্তি-পদার্থের রহস্য ভেদ করিতে গিয়া পাইলাম নাস্তি! এক মহা শূন্য, বিরাট্ আঁধার—বিষয় নাই, বিষয়ী নাই; তুমি নাই, আমি নাই; কার্য্য নাই, কারণ নাই! নিয়মের কল্পনা, শৃঙ্খলার কল্পনা, পৌর্ব্বাপর্য্যের কল্পনা—সব শুধু মনকে চোখ ঠারা মাত্র। ভাঙ্গিয়া দাও ন্যায়ের ব্যূহ, ছাড় বুদ্ধির দম্ভ—বল নির্ব্বাণ সত্য, শূন্য সত্য! বিরাট্ নাস্তিত্বের কোলে এই জগৎ একটা ক্ষণিক অস্তিত্বের সম্ভাবনা মাত্র। ইহাকে অস্বীকার করাই পৌরুষ। এই সম্ভাবনার একটী প্রান্তকে যদি ধরিতে যাও তো আর কূল-কিনারা পাইবে না, তখন যাহা

খুসী তাহাই সম্ভব হইতে থাকিবে. আর রাশীকৃত মিথ্যা সম্ভাবনার তলায় তলাইয়া গিয়া শুধু ভোগ করিবে অপরিসীম দুঃখ, অশেষ আবর্ত্তন। অতএব সমস্ত সম্ভাবনার সম্ভাবনা চুকাইয়া দিয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া যাও—মহাসূর্য্যের মহাদীপ্তির মাঝে আত্মার খদ্যোত-দ্যুতি নিবিয়া যাক। মায়ার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া অমিত-আভায় জ্বলিয়া ওঠ হে শুদ্ধোদন-সঞ্জাত মহাসম্বুদ্ধ!

আবার কখনও ভাবি, সব শূন্য? যাহা কিছু দেখিতেছি, সব ফাঁকি? বুদ্ধি দিয়া এই মায়াবিনীর রহস্য বেড়িয়া পাই না বলিয়া এই বুদ্ধিকেও বলিব ফাঁকি? এই রহস্য বুঝিবার দরুণই না ওই মায়াবিনী তোমার আমার ঘটে ওই বুদ্ধিটুকু রাখিয়া গিয়াছে। ওই বুদ্ধি দিয়াই তাহার যতটুকু বুঝিতে পারি—ততটুকুই তাহার স্বরূপ। আমার কাছে সবই তত্ত্ব—সবই real। বুদ্ধিও তত্ত্ব. সে যাহা দেখায়, তাহাও তত্ত্ব। যাহা কিছু আমার অনুভবের সীমানায় আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই তত্ত্ব। যাহা তত্ত্ব, তাহা কখনও অতত্ত্ব হইতে পারে না—যাহা সৎ, তাহার কখনো বিনাশ নাই; যাহা অসৎ, তাহারও কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি গোঁড়ার মত এই রহস্যের একটা খুঁটিই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহি না। যেমন এই মায়াবিনীর মায়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ বদ্‌লাইতেছে, আমার বুদ্ধিও তেমনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হইতেছে। এ জগতের সবই রূপান্তর—সবই চঞ্চল। সর্ব্বত্রই অনন্ত রূপে পরিণামিনী প্রকৃতির লীলা। এ লীলা মিথ্যা নয়, এ তত্ত্ব। এই অতিস্থূল নিরেট জগৎ হইতে সুরু করিয়া অশব্দ, অস্পর্শ, অক্ষোভ্য অনুভব পর্য্যন্ত সবই তত্ত্ব। আমার বন্ধনও তত্ত্ব, আমার মুক্তিও তত্ত্ব। তুমিও তত্ত্ব, আমিও তত্ত্ব—তোমাতে-আমাতে যে ভেদ, তাহাও তত্ত্ব। সর্ব্বত্র বাস্তব দেখা, ইহাকেই বলি তত্ত্বজ্ঞান। তবে এই তত্ত্বকে আমি একসা করিয়া ফেলিতে চাহি না; যাহার যাহা সীমা, যাহার যাহা মর্য্যাদা, তাহা লঙ্ঘন করিতে চাহি না। স্থূল বুদ্ধি দ্বারা এই স্থূল জগৎকে গ্রহণ করি, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎকে গ্রহণ করি, আবার অগ্র্যা বুদ্ধি দ্বারা কারণজগৎকে গ্রহণ করি। দেখিলাম, আগুনের শিখা লক্ লক্ করিতে করিতে শূন্যে মিলাইয়া গেল; ইন্ধনে তাপ সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল, শিখায় প্রকট হইয়াছিল, আবার ইন্ধন ভস্মে পরিণত করিয়া কোথায় গেল? নাস্তি হইয়া গেল? নাস্তিত্বই তাহার স্বরূপ ছিল? কোনও কালেই সে ছিল না কি? তাহা হইলে মাঝখান হইতে দেখা দিল কি করিয়া? এই দেখাটা কি ফাঁকি? যাহা সত্যরূপে অনুভূত হয়, তাহা যদি ফাঁকি হয় তো সে ফাঁকি শুধু একটা শব্দাড়ম্বরমাত্র নয় কি? অতএব আমি বলি, যদি তত্ত্বদৃষ্টি নিয়া এ জগৎটাকে দেখ. তাহা হইলে কোথায়ও সে দর্শনে নাস্তিক্যের অবসর থাকিবে না; সব অস্তি—সব আছে—তবে কি না পরিণামভেদে। শূন্যে যাহাকে মিলাইতে দেখিলে, তাহা নাস্তি হইবে কি করিয়া? অব্যক্ত হইতে তাহা আসিয়াছিল, আবার অব্যক্তেই মিলাইয়া গেল। অব্যক্ত তো নাস্তি নয়—বুদ্ধির বিশ্রাম মাত্র, সর্ব্বসম্ভাবনার প্রসূতি সে। সে সব করিতে পারে, তাই তাহাকে বলি প্র-কৃতি। যত কিছু কার্য্য, সমস্তের গর্ভাবাস ওই; তাই তাহাকে বলি মহাকারণরূপিণী—ব্রহ্মযোনিস্বরূপিণী। ফুলের উপাদান, ফলের উপাদান, পত্রের উপাদান, শাখার উপাদান—সমস্ত উপাদানই যাহাতে একরস হইয়া আছে—তাহাকেই বলি মহাকারণ! এ শূন্য নয়; যেমন তোমার সুষুপ্তি শূন্য নয়, নবপ্রভাতের গর্ভাবাসরূপী নিশীথের অন্ধকার যেমন শূন্য নয়। কিছুই মিথ্যা নয়; সব সত্য, সব তত্ত্ব। তবে হাঁ, তত্ত্বের পরিণাম আছে—আমার মাঝেই দেখিতেছি তাহার বিচিত্র পরি-

পাম। এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা বিরাট্ আকারে দেখিতেছি, তাহারই আবার ক্ষুদ্র প্রতিলিপি দেখি আমার এই আমিতে। আমি বিরাটেরই কুক্ষিগত, প্রকৃতির গর্ভাশয়ে একটী স্ফুটন্ত ভ্রূণ মাত্র। কিন্তু তবুও আমার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। প্রকৃতিতে সব একাকার স্তূপ হইয়া আছে, তাহার মধ্য হইতেই কিছু ফেলিয়া, কিছু বাছিয়া আমি এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করিয়াছি। এই স্বাতন্ত্র্যই আমার নিজস্ব সম্পদ্। এ প্রকৃতির দান নয়। বরং প্রকৃতি অনুগতা নারীর মত আমার স্বাতন্ত্র্যকে অনুসরণ করিতেছে। আমার মন-জোগানই তাহার একমাত্র আনন্দ। আমার ভুক্তিতে মুক্তিতে এই স্বাতন্ত্র্যেরই সে পরিচর্য্যা করিতেছে। আয়োজনে আমি প্রকৃতির পরতন্ত্র—সে যাহা হাতে তুলিয়া দেয়, তাহাই আমাকে হাত পাতিয়া নিতে হয়; কিন্তু প্রয়োজনে আমি স্বতন্ত্র—সে প্রয়োজন প্রকৃতির এই ভোগাপবর্গবিধানে আনুকূল্য সম্পাদন মাত্র। এই স্বাতন্ত্র্যই আমার স্বরূপ—এই স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় আমি প্রকৃতিরও অতীত, আমি তত্ত্বেরও তত্ত্ব। স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়া আমার পক্ষে আত্মহত্যা; আমি আত্মঘাতী হইতে পারিব না,—তাই ভোগে, অপবর্গে, অনুরাগে, বিরাগে, ঔদাসীন্যে সর্ব্বত্র আমি বিবিক্ত, সব কিছুতে থাকিয়াও যেন আমি নাই—আমি কেবল—আমি অসঙ্গ—আমি নির্গুণ!

আবার কখনও ভাবি, অত সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিচার করিয়া কি হইবে? স্থূল দৃষ্টিতে এই স্থূল জগৎ দেখিতেছি—এই স্থূলকে ভাঙ্গিয়া কি মায়া-রহস্যের কোনও সমাধান করিতে পারি না? নখে খুঁটিয়া একটা বালুকণাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারি, একটী কেশকে চিরিয়া দুই ভাগ করিতে পারি; আবারও ভাঙ্গিতে পারি, আবারও চিরিতে পারি; এমনি করিয়া অবশেষে এক অবিভাজ্য সত্তায় উপনীত হইতে পারি না কি? সে এত ছোট, এত অণুপ্রমাণ যে গুণের আরোপ ছাড়া তাহাতে বুঝি আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম্মের সমাবেশ করিতে পারি না। বলি, ওই তো পরমাণু; ওই পরমাণু দিয়াই জগৎ গড়িয়া তুলিব। শুধু স্থূল জগৎ নয়, তোমার আমার অন্তর্জ্জগৎও ; কি বাহিরে, কি অন্তরে, দেখি, দ্রব্য যেন অধিষ্ঠান, গুণ তাহাতে আশ্রিত, আর ক্রিয়া তাহাকে নাচাইয়া ফিরিতেছে। বাহিরের দ্রব্য চিরিয়া পাইলাম পরমাণু; তোমার ওই পিণ্ডীভূত মনকে চিরিয়া চিরিয়াও পাইলাম মনের পরমাণু—mind-stuff। বিষয়-সংযোগ মাত্র তাহার ধর্ম। বিষয়ের সংযোগে ওই মনেই সুখ দুঃখরূপে নানা বর্ণরাগ ফুটিয়া উঠে, বিচিত্র অর্থক্রিয়াকারিতায় জগৎটা নড়িয়া-চড়িয়া উঠে। ভূতের পরমাণু জুড়িয়া জুড়িয়া এই ভোগ্য বহির্জগৎ, আবার মনের পরমাণু জুড়িয়া এই ভোক্তা অন্তর্জ্জগৎ। এই অন্তর্জ্জগতেরই শেষ প্রান্তে ওই পিণ্ডীভূত মনের রসায়নরূপে অনুমান করি—তোমার আমার আত্মা! ব্যস্, এই তো জগৎরহস্যের মীমাংসা হইয়া গেল।—কিন্তু না, তবুও তো নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। মূর্ত্তিকে চূর্ণ করিয়া রেণু রেণু করিয়া অমূর্ত্তের কোঠায় আনিয়া ফেলিয়াছি; এখন এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অপ্রতর্ক্য, প্রসুপ্তিবৎ নিগূঢ় অনুভবে জগৎ-জোড়া এই বিচিত্র মূর্ত্তি-বাসনার বীজকে অসঙ্কীর্ণ রাখি কি করিয়া? অণুতে যে সব একাকার হইয়া গেল, বৈশিষ্ট্যের বীজকে রক্ষা করি কি করিয়া? অমূর্ত্ত হইতে মূর্ত্তের উদ্ভব সম্ভাবিত করি কি করিয়া? কি করিয়া পরমাণুর পাশে পরমাণুকে বসাইয়া (!) অরূপ দিয়া রূপ গড়িয়া তুলিব? হে মায়াবিনী, আবার আমার বুদ্ধি তোমার কাছে হার মানিল। আমি জগৎ ভাঙ্গিতে পারি, কিন্তু তোমার অপাঙ্গ-দৃষ্টি ছাড়া ইহাকে গড়িতে পারি না; অণুতে সব একাকার

হইয়া যায়, তুমি ইহার মাঝে "বিশেষ" কিছু না জুড়িয়া দিলে তো আর সৃষ্টিকে খাড়া করিতে পারি না। এই বিশেষটুকুই তোমার রহস্য, নিখিল বৈচিত্র্যের বীজ, "অহং বহু-স্যাং প্রজায়েয়" কল্পনার পরিপূর্ত্তি। তোমার মাঝে এই "বিশেষ" দর্শনই আমার সত্য-দৃষ্টি। আমি বৈশেষিক—এই বিশেষ-রূপা তুমিই আমার সর্ব্বস্ব!

আবার ভাবি, বিশেষ রূপে নিষ্ক্রিয় (passive) বস্তুধর্ম্ম মাত্র আবিষ্কার করিয়াছি ; এ যেন তোমার প্রতিমা। কিন্তু সে প্রতিমাতে প্রাণ-সঞ্চার হইবে কি দিয়া? কাহার এষণায়, কাহার প্রেরণায় এই বস্তুধর্ম্ম কার্য্যকারী (active) হইবে? রূপ-পরিণামের রসায়ন কি? কেন বিশেষ একটা অণুর সঙ্গে বিশেষ আর একটা অণুর যোগ হয়? মনের সঙ্গে বিষয়ের কে যোগ ঘটায়? মনের মাঝেই বা সংস্কারের লেপ (cement) জমে কি করিয়া? যাহা একবার অনুভব করিয়াছি তাহা খোয়া যায় না কেন? স্মৃতির ভাণ্ডারে কেন তাহারা সঞ্চিত হইয়া থাকে? কেনই বা উদ্বোধকের আহ্বানে তিরস্করণী ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে? এই আবার অনন্ত জিজ্ঞাসা—অতৃপ্ত মনের চিরন্তন আকুলি-বিকুলি! হে রহস্যময়ী, আবার তোমার কাছে হার মানিতেছি। কি করিয়া যে তুমি কি কর—কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। বাহিরের এই দৃষ্টিটাকে ভিতরের পানে ঠেলিয়া বহু আয়াসে সূক্ষ্ম জগৎ পর্য্যন্ত আমার ন্যায়োদ্ভাবিত কার্য্য কারণ-পরম্পরাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলাম—কিন্তু তার পরেই দেখি—সব অন্ধকার—সব "অদৃষ্ট"—চোখ থাকিতেও আমি কাণা। হে অঘটন ঘটন-পটীয়সী! তোমার সবই "অদৃষ্ট" বটে! কিন্তু এ রহস্য অদেখা হইয়া রহিল কেন? এ কি আঁধার বলিয়া? না, তোমার ওই মহাজ্যোতিঃ আমার এই দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ধারণা করিতে পারিল না বলিয়া?—জানি না। যাক্, তুমি অদৃষ্টরূপে অলক্ষ্যে থাকিয়াই আমার এই আবর্জ্জিত চিত্তের আকুলতা গ্রহণ কর।

এই মনোদ্বন্দ্বের গোলোকধাঁধায় যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ি, তখন আমারই মাঝে জাগিয়া ওঠে এক মহাতান্ত্রিক, মেঘ-স্তনিত-গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে, ওরে মূঢ়, প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতা চিদানন্দ-লতিকা বিদ্যুদ্বরণী যে মহাশক্তি, ওইটুকু বুদ্ধি দিয়া তুই তাঁহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিবি? খদ্যোতের আলোক দিয়া তুই মহাসূর্য্যের জ্যোতির পরিমাণ করিবি? মনের যিনি মন, যাঁহার মননে তোর এই মন মননশীল, তাঁহাকে তোর মনের বেড়াজালে বন্দী করিবি? হাসি পায় তোর এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া! না, এ তোর স্পর্দ্ধাও নয়,—এ তাঁরই লীলা। সন্তান স্বচ্ছন্দে জননীকে লঙ্ঘন করিতে চায়, জননী নীরবে হাসেন শুধু—এই স্পর্দ্ধার মাঝে সন্তানের মহা-ভবিষ্যতের সূচনা দেখিয়া কোন্ নিগূঢ় কামনায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহা বুঝিতে পারিস্ কি? দেখ্, অখণ্ড দৃষ্টি লইয়া জগতের দিকে চাহিয়া দেখ্—সব শক্তির রূপ—সব পূর্ণ—সব কুলীন—কুলশক্তির স্ফুরণে বিদ্যুন্ময়। ওই দূর্ব্বাদলে, ওই অতসী-অপরাজিতায়, ওই বিল্বে-কদম্বে, ওই গৃধ্রে-কুররীতে, ওই শিবা-মার্জ্জারীতে, ওই ব্রাহ্মণী শূদ্রাণীতে, ওই নটীতে-বারাঙ্গনায়, আমার এই রুদ্রাক্ষ-ত্রিশূলে—সর্ব্বত্র দেখ্ মহাশক্তির বিকাশ! ওরে মূঢ়, জানিস্ না, আধারে আধারে বিদ্যুৎকুণ্ডলী সুপ্ত রহিয়াছে, শৈব-চেতনার সংস্পর্শে এখনি যে তাহা মেরুমজ্জা বিদীর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে, কোটীসূর্য্য-প্রভাস্বর জ্যোতিতে চরাচর মসীবিন্দুর মত মিলাইয়া যাইবে! ওরে, আনখাগ্র-কেশান্ত তুই যে বিদ্যুন্ময়, তুই যে শক্তিময়—তুই যে অন্তঃশাক্ত, বহিঃশৈব, মহা কৌল!

আবার দেখি, এই দুর্দ্দর্শ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ স্নিগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠে—আমারই মাঝে চিরকিশোর চিরকিশোরীর অনাদি আনন্দবিলসিত যুগল-

মাধুরীতে! "মেঘ মাঝে তড়িত জড়িত জনু" সেই লাবণ্য-প্রতিমার পানে চাহিয়া চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারি না—অন্তরের মাঝে প্রশান্ত মহাসিন্ধু যেন দুলিয়া উঠে, প্রতি রোমকূপে যেন আনন্দের অশ্রুধার ঝরিয়া পড়ে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিখানি যদি বা কখনো এই জগতের দিকে ফিরাই তো দেখি—তরুলতায়, পশু-পক্ষীতে, কীট-পতঙ্গে, নর নারীতে উচ্ছলিত ওই সে অনাদিনিধন মিথুনানন্দের সুধা-তরঙ্গিনী।

আমার অঙ্গ এলাইয়া পড়ে, বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, ইন্দ্রিয়গুলি যুগপৎ জ্বলিয়া উঠিয়া এক জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশিখার সৃষ্টি হয়, দেহ আর মনের সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়, ব্যক্ত আর অব্যক্তের সীমা-রেখা কোথায় মিলাইয়া যায়—অনির্ব্বাণ চেতনায় জাগে শুধু আনন্দ—শুধু আনন্দ! আমার শক্তি যে আমাতে—প্রাণে স্ফুরন্ত, লীলায় বিচিত্র, আনন্দে নিটোল!

শক্তি-সাধনা

বাসনার নির্ব্বাণে মহাশক্তির জাগরণ! এ জাগরণ তোমাতে—আমাতে—সকলের মাঝেই সম্ভব। মহাশক্তির জাগরণ!—শুনে লোভ হয় না কি? মনে হয় না কি, ওঃ, বাস্তবিকই যদি আমার শক্তি থাক্‌ত, সামর্থ্য থাক্‌ত, তাহলে কত কিছুই না কর্‌তে পার্‌তাম, মনের সকল কামনা পূর্ণ হত!—

হাঁ, স্বীকার করি সে কথা। মহাশক্তি হৃদয়ে জাগে যদি, অভাব থাক্‌বে কোথায়, অপূর্ণতা থাক্‌বে কোথায়? কিন্তু গোড়ার কথাটী ভুলো না। বাসনা বিসর্জ্জন দিতে হবে, তবে শক্তি জাগবে। কামনা ছাড়তে হবে, তবে কামনা পূরবে।

হেঁয়ালী বলে মনে হয় না কি? তোমার যেমন বুদ্ধি তাতে এ তো হেঁয়ালী ঠেকবেই। কিন্তু আমি যে বুদ্ধির মাথা খেয়েছি, তাই আমি জানি হেঁয়ালী হলেও এ মিথ্যা নয়—নিরেট সত্য। চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিতে পারি—যদি দেখতে চাও।

মোটেই শক্ত কথা নয়। কি চাও, আগে তাই বোঝ। কামনা চাও, না কামনার তৃপ্তি চাও? সুখের উপকরণ চাও, না সুখ চাও? কলরব করে বলো না, উপকরণই চেয়েছিলাম বিশেষ করে; সুখ তো উপরি-পাওনা! ভুল হয় এইখানেই। আনন্দের কত যে নিমিত্ত আছে সে আনন্দময়ীর ভাণ্ডারে, তার হিসাব রেখেছ? সে ভাণ্ডারে তোমায় পৌঁছে দিলে, আমি জানি বাঁশবনে ডোম কাণার মত তোমার দশা হবে। কাঙ্গাল যদি রাজ-বাড়ীতে যায় ভোজ খেতে, শাকে আর পরমান্নে সে বড় তফাৎ দেখতে পায় না।

তাই বল্‌ছিলাম, বাস্তবিক উপকরণ তুমি চাও না; মনে কর যে চাও, সেটা তোমার মনের ভুল। তুমি চাও—সুখ; তুমি চাও—প্রেম। নিঃসন্তান বিধবা বিড়াল পোষে; শুনেছি বিড়ালের নামে লাখটাকা উইলও করে দিয়ে গিয়েছে কে যেন। কোলে ছেলে থাক্‌লে আর বিড়াল পুষ্‌ত না। ছেলেটা আর বিড়ালটা উপকরণ মাত্র, উপলক্ষ্য শুধু। অপত্য-স্নেহটাই আসল, মাতৃত্বের বুভুক্ষার শান্তিই তার প্রয়োজন।

তাই যদি হয় তো, ভেবে দেখ দেখি, তুমি সুখ চাও, না সুখের উপকরণ চাও? ভালবাসাটুকু চাও না ভালবাসার পাত্রটী শুদ্ধ চাও? রাক্কুসে ছেলে বলে আমি হাঁড়িশুদ্ধ খাব। মা হাসে শুধু; হাঁড়িশুদ্ধ ছেলের সামনেই ধরে দেয়। হয়ত দু'গ্রাস খেয়েই ছেলের হয়ে যায়; হাঁড়িটার পানে আর তাকাতেও ইচ্ছা করে না। বাস্তবিক, পাত্রটা চাও না; পাত্রের মাঝে যা আছে তাই চাও। রস পেলে সে মাটীর ভাঁড়ে পেলাম না সোণার পেয়ালাতে পেলাম, তা নিয়ে তো কারু মাথাব্যথা হয় না। কিন্তু অবোধ শিশুদের মাথাব্যথা হয় দেখেছি। ভোজ খেতে গিয়ে দেখ্‌বে কোন্ পাতাটা বড়; সেই পাতায় গিয়ে বস্‌বে। খাবে ওই অত-কটা, কিন্তু পাতাটা বড় চাই।

কামনাবাসনাগুলো জড়িয়ে আছে ওই পাত্রটাতে। ওইটুকুর মমতা ছাড়ানো যা কষ্ট। নেহাৎ ছেলেমানুষ যদি হও তো পাতাটা বড় হল না ছোট হল, তাই নিয়ে অনর্থ বাধিয়ে বস্‌বে। কিন্তু পাত্রের মাঝে যা আছে, তার আস্বাদন একবার পেলে পাত্রের কথা ভুল হয়ে যাবেই। তখনি না আনন্দ!

"আমার মেয়ে—তাই বিশেষ করে তাকে ভালবাসি; আর কারু মেয়ে আমার মেয়ের মত নয়!" কিন্তু কথাটা মিছে। ওই মেয়ের মাঝেই যদি ঠিক-মেয়ের সন্ধান পেতাম, আমার পিতৃত্বের মাঝে যদি খাঁটী বাপটীকে চিনে নিতে পার্‌তাম, তাহলে ওই পাত্রটার ওপর ঝোঁক পড়্‌ত না অত। তখন যে-কোনও বাপ যে-কোনও মেয়েকে ভালবাস্‌লেও আমার বুকও তাতে ভরে উঠতো। জগতের বুক থেকে, আমার বুক থেকে আমার মেয়েকে কেড়ে নিতে পার্‌ত কেউ?

ওই কথাই হল। কামনা জড়িয়ে থাকে পাত্রটাকে; ওতেই না দুঃখ পাই। পাত্রের মাঝে যা আছে, তার প্রতি নজর পড়লে এ দুঃখ আর পেতে হত না।

কামনার নির্ব্বাণে যে আনন্দ জাগে, তা এমনি করে। বাস্তবিক, তোমায় ছাড়তে বল্‌ছি না কিছুই। যে যাতে আনন্দ পায় তাকে তা ছাড়তে বল্‌ব কেন? কিন্তু একটু নজরটা বড় কর, দিল্‌টা দরাজ কর। ওতে তোমারই লাভ। আকর্ষণের মূলে যে ভাব আছে; ওই ভাবটুকু আবিষ্কার কর, ওইটুকু প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে নাও; বস্তুর জন্য আকুলি-বিকুলি একদম ছুটে যাবে। অভাব-বোধ বস্তু-জগতে; ভাব তো পূর্ণতা, তোমার খেয়ালখুসীর রাজ্য। তাই যেখানে বস্তুকে ধরেই আনন্দ পাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে, সেখানে —দোহাই তোমার—একটু মনটাকে তলিয়ে দিয়ে, একটুখানি নিঝুম হয়ে ভাবটাকে ধর্‌বার চেষ্টা কর। তারপর সেই ভাবকে জান যথার্থ বস্তু বলে, আর বস্তুকে জান অবস্তু বলে। ব্যস্, জগতের সঙ্গে তোমার মস্ত বড় একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে; আর তোমাকে কেউ ঠকাতে পার্‌বে না, কাঁদাতে পার্‌বে না। ভালবাসার কান্না থাক্‌বে হয় তো, কিন্তু অভাবের কান্না, দুঃখের কান্না চিরকালের জন্য ঘুচে যাবে।

বস্তুর মূলে ভাবকে ধরে এমনি করে যদি আনন্দের সন্ধান পাও তো দেখবে অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার ওই আনন্দের মাঝে। শক্তির পরিচয় কিসে পাই?—কর্ম্মের স্পন্দনে। কর্ম্ম উৎসারিত হয় আনন্দ থেকে। আনন্দ আর শক্তি একই সত্তার এ পিঠ আর ও পিঠ।

আনন্দের কত রূপ, শক্তির কত লীলা! ছোট-ছেলের দুরন্তপনায় আনন্দ উপচে পড়ে—চোখে, মুখে, সারা অঙ্গে। ওই আনন্দই আবার মায়ে বুকে গিয়ে প্রতিফলিত হয়; বাইরে তার প্রকাশ নাই, কিন্তু গর্ব্বে মায়ের বুকটা ফুলে ওঠে যেন, মনে হয়, ওই ছেলের জন্য আমি কি না কর্‌তে পারি! অন্তঃশীলা শক্তির ওই এক পরখ। বুক যেন দশ হাত হয়ে ওঠে—মনে হয়, আমি কি না করতে পারি! বুক

ঠেলে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় যখন, তখনি মনে হয়—আমি কি না করতে পারি! খুঁটিয়ে দেখবার তর সয় না তখন, হিসাব-নিকাশের খাতাপত্র মেলে বস্‌বার কার্পণ্য-বুদ্ধি টুটে যায়—অফুরন্ত আশা নিয়ে মন শুধু বলে, আমি কি না কর্‌তে পারি!

ওই তো শক্তির ভাণ্ডার—আনন্দের ভাণ্ডার। তোমার দেহ-মনে যৌবনের জোয়ার কখন এসেছে তার খবরই তুমি রাখ না—ভুরু কুঁচকে, কপালের শিরা ফুলিয়ে কখনো ভাবতে বসনি, আমি কোন্‌টা কর্‌তে পার্‌ব, আর কোন্‌টাই বা পারব না, কোন্‌টা উচিত, আর কোন্‌টাই বা অনুচিত; কোনও কুটিল কামনার দ্বন্দ্ব তোমার মাঝে নাই বলেই—তুমি তরুণ, তুমি বুক ফুলিয়ে বল্‌ছ—আমি কি না কর্‌তে পারি! আনন্দ তোমার একমাত্র পুঁজি বলে, কামনা তোমায় ছুঁয়ে যায় নি বলে বাইরের সম্পদে নিঃস্ব হয়েও তুমি রাজ-রাজেশ্বরের মেজাজ নিয়ে বল্‌ছ—আমি সব পারি!

ও শুধু আশার মরীচিকা নয় গো, শুধু যৌবনের উচ্ছ্বাসই নয়। ওরে মূলে যে একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। বিজ্ঞেরা এসে বল্‌বে, মুখে বল্‌ছ বটে বাপু, কিন্তু কাজে নামলে পর বোঝা যাবে কতটা পার।—হাঁ, সে কথা তো মাথা পেতে নিচ্ছিই। হয়ত আমার বিশেষ একটা কাজ আছে জগতে, আমি শুধু তাই পার্‌ব, আর কিছুই হয়ত আমা দ্বারা হবে না; কিন্তু সেই বিশেষটাকে যদি আমার নির্ব্বিশেষ আনন্দধারায় না অভিষিক্ত করে নিই, তাহলে সে যে কোনও কালেই সার্থক হবে না! দুটা জগৎ আমার সম্মুখে; একটা বস্তু-জগৎ, নিরেট, কঠিন, বিশিষ্ট কামনা দ্বারা সীমাবদ্ধ; আবার তাকে ছাপিয়ে রয়েছে আমার ভাব-জগৎ—ওই বস্তুরই প্রাণ, কামনার সংঘাত যেখানে স্তব্ধ, যেখানে আমার অন্তঃপ্রকৃতি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে—আমি সর্ব্বাভীষ্টদাত্রী, আমি সর্ব্বশক্তিময়ী, আমি আনন্দময়ী!

হে শক্তির পূজারী, মরণ-বিজয়ী তরুণ! আত্ম-সমাহিত হয়ে তোমার এই আনন্দময়ী অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান নাও। জান, নির্ব্বিশেষ হতে শক্তি আহরণ করে তবেই বিশিষ্ট কামনার পরিপূরণ হয়। আজ বিশেষ করেই যদি তোমার কিছু করবার, কিছু গড়বার সাধ হয় তো ওই কামনার জঞ্জালে জড়াবার আগে একবার ডুব দাও নিজের মাঝে—সমস্ত হিসাব-নিকাশ, খাতা-পত্র, প্লান-ছক্ ভাসিয়ে দাও আনন্দের দরিয়ায়; শুধু শুধুই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ, প্রাচুর্য্যের অনুভূতিতে উপচে পড়—ভাব, তোমার কামনা নাই, কর্ম্ম নাই, তুমি শিব, তুমি রিক্ত, তুমি আনন্দঘন-বিগ্রহ। এই শিবত্বের আরতিতে সতী শক্তি জেগে উঠবেন তোমার মাঝে; তাঁর অরুণ-কিরণ-স্পর্শে তোমার বুদ্ধির লীলাকমল দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠবে; তার সৌরভে তোমার অহঙ্কার শিবানুভাব-বাসিত হয়ে থাকবে; উষার প্রাক্কালে নিস্তব্ধ আকাশে যেমন আলোক-প্লাবনের পূর্ব্বাভাস আলোড়িত হয়ে ওঠে, তেমনি তোমার সূক্ষ্ম-চেতনা আসন্ন কর্ম্মপ্রেরণার সূচনায় দুলে উঠবে—তারপর স্থূলে আস্‌বে শ্রান্তিহীন, শঙ্কাহীন, বাধা-হীন, অফুরন্ত কর্ম্মের জোয়ার!

দেহকে যদি খাটাতে চাও, আগে দেহাতীতের ভাবনায় তাকে বিদ্যুন্ময় কর; মনকে যদি খাটাতে চাও তো নিস্তরঙ্গ প্রশান্তিতে তাকে আগে নিমজ্জিত করে নাও;—জীবনের প্রতি কর্ম্মের প্রারম্ভে এমনি করে আগে নৈষ্কর্ম্ম্যের ভাবনাকে সঞ্জীবিত করে তোল। দেখবে, দেহ-মন-প্রাণ অবিশ্রান্ত কর্ম্মেও ভেঙ্গে পড়ছে না, আয়াসহীন কর্ম্মে লীলারসিকের অনুভব ফুটে উঠছে তোমার মাঝে।

কামনা ছেড়ে এমনি করে কামনার পরিপূরণ হয়; বাসনাকে রূপ দিতে হলে এমনি করে বাসনার অতীত ভূমি হতে তার মঞ্জুর-পত্র আদায় করতে হয়।

আজ তপস্বী ভারতের সম্মুখে উদ্দাম কর্ম্মের

আদর্শ উপস্থিত হয়েছে। ভয়ে সে পিছিয়ে যাবে? আলস্যের হাই তুলে বল্‌বে, শাস্ত্রে বলেছে, ও সব ঘোর কলির লক্ষণ, অতএব ওসব থেকে সরে থেকেই সাত্ত্বিকতা রক্ষা কর্‌তে হবে? না, শাস্ত্রের মর্য্যাদা সে-ও রক্ষা কর্‌বে, সে-ও প্রমাণ কর্‌বে, এ জগতে ভারতই শুধু কর্ম্মভূমি, আর সব ভোগভূমি।— তার দরুণ সে কি অনাত্মদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন জগৎজোড়া এই কর্ম্মতাণ্ডবের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে? তার যুগ-সঞ্চিত আত্ম-সমাহিত তপস্যা কি শুধু একটা আত্ম-বঞ্চনা মাত্র? না, কর্ম্মের সঙ্গে সমাধিকে যুক্ত করে সে জগৎকে যথার্থ কর্ম্মীর আদর্শ দেখাবে। আত্মদৃষ্টি হতে, নৈষ্কর্ম্যানুভব হতে বিযুক্ত যে কর্ম্ম, তাই ভোগ, তাই বন্ধন, তাই আত্মার আবরণের হেতু; আর আত্মসমাধানের সহিত যুক্ত যে কর্ম্ম, তাই যথার্থ কর্ম্ম, তাই জীবন্মুক্তি, তাই আত্মার নির্ম্মুক্ত প্রকাশ, স্বচ্ছন্দবিহার। যে যুগে ভারত কর্ম্মকে এমনি যোগযুক্ত কর্‌তে পেরেছিল, সেই যুগেই সে উন্নতকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল—বাইর দেখে বিচার করো না, অন্তরের দিকে চেয়ে দেখ. যথার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কোথায় হচ্ছে—যেখানে আত্মা জাগ্রৎ, সেখানে—না যেখানে তিনি মূর্চ্ছিত, সেখানে। ভারতের যথার্থ কামনার পরিতৃপ্তি কি তখনই হয়নি?

আর আজ?—কিন্তু তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কাপুরুষতা। কর্ম্মে, জীবনে, জগতে যদি শক্তি-সঞ্চার কর্‌তে চাও তো আত্মসমাহিত হয়ে শক্তির উৎস আবিষ্কার কর—নিজের মাঝে। আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যাও; তারপর সেই আনন্দ হতে উৎসারিত কর্ম্মকে তাঁরই প্রসাদস্বরূপে জগৎকে বিলিয়ে দাও!

ধর্ম্মদত্তা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

(৩)

সস্নেহে বিশাখের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ধর্ম্ম-দত্তা বল্‌লেন, "অমন করে কেঁদো না। তোমার কান্না দেখলে আমি যে আর নিজকে স্থির রাখতে পারি না। এই পথেই না এতদিন ধরে তুমি মনে মনে আমায় টানছিলে, তবে আর দুঃখ কিসের?"

"কিসের দুঃখ তা জানি না দত্তা। কিন্তু কিছুতেই আমার মন যে প্রবোধ মান্‌ছে না। তুমি ভিক্ষুণী হতে চাইছ, সে জন্য আমার দুঃখ নয়—আমি নিজ হাতে তোমার অঙ্গে চীবর তুলে দিতাম।—কিন্তু তবুও—এ যে কি হল, কিছুই বুঝতে পারছি না যে।......একটা কথাই কেবল আমার বুকের মাঝে আকুলি-বিকুলি করছে।......আচ্ছা, সত্যি কি তুমি আমায় ভালবাস্‌তে?"

বিশাখার দুটী চোখ ছল্‌ছলিয়ে এলো। স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমার কি মনে হয়?"

"কি মনে হয় তা বল্‌তে পারব না—নিজেও যেন তা বুঝে উঠতে পার্‌ছি না। মুখের একটী কথায় এমন করে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাইবে......জানি না, কেন জানি, আমার বুক ঠেলে কেবলি কান্না

পাচ্ছে—দুঃখে নয়, অভিমানে। নিজকে আমার ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ফেল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে! সত্যি বল্‌ব দত্তা, এই ভিক্ষুব্রত ছিল আমার জীবনের সুখের স্বপন। কিন্তু আজ তারি ওপর এমন বিতৃষ্ণায় আমায় সারাটা চিত্ত ভরে উঠেছে! স্বেচ্ছায় যা দিতাম, তা জোর করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কি অধিকার আছে এই শাক্যপুত্রদের! এ কি ভিক্ষা, না ডাকাতি! আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জান—"

স্বামীর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে শান্ত-কণ্ঠে ধর্ম্মদত্তা বল্‌লেন, "ছিঃ, মিছামিছি নিজকে এমন উত্তেজিত করে তুল্‌ছ কেন বল দেখি! কে আমায় তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে? তুমিই না আমায় নির্ব্বাণের পথে তোমার সঙ্গিনী করতে চেয়েছিলে? তুমি আমায় ছাড়তে পারবে কি না সেই সন্দেহ আমার মনের মাঝে ছিল বলে আমার নিজের মনকেও এতদিন আমি বুঝতে চাই নি। আজ সে সন্দেহ দূর করে দিয়ে আমার আঁধার মন আলো করে তুলেছ যে তুমি!—তবে কি তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম? আজ যে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চেয়েছিলে, এটা কি শুধু তোমার ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস? এ-ও কি তোমার অভিমান? কিন্তু এ অভিমানের মূলে কি লুকানো আছে, তা দেখতে পাচ্ছ না? ছেড়ে গিয়েও তাহলে কামনা দিয়ে তুমি আমায় জড়িয়ে থাকতে?"

বল্‌তে বল্‌তে ধর্ম্মদত্তা যেন শিউরে উঠ্‌লেন। একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্‌তে লাগলেন, "তুমি আমার কথা এখন বুঝতে পার্‌বে কিনা জানি না; কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, আজ আমি বুঝতে পার্‌ছি, তোমায় আমি কতখানি ভালবাসি। এতদিন তোমায় ভালবেসেছি শঙ্কা নিয়ে, সঙ্কোচ নিয়ে। তুমি আমার কাছে কামনার বস্তু ছিলে না কোনোদিন, কিছুই চাইনি আমি তোমার কাছে; কিন্তু তবুও আমার ভালবাসার মাঝে কোথায় যেন একটু ভার ছিল, একটা আড়ষ্ট-ভাব ছিল। ভালবেসে আমি আলোর মত উৎসারিত হতে পারিনি। আজ বুঝছি, আজ-কার এই অজস্র আলোক যেমন তোমার দান, তেমনি এতদিনকার ওই আলোর মাঝেকার কালো ছায়াটুকুও তোমারই দান। তুমি দুঃখ পাবে তা জেনেও মিথ্যা স্তোকবাক্যে তোমায় প্রবঞ্চিত করতে চাই না। তোমার ভালবাসায় কামনার কলঙ্ক ছিল, তাই সে কলঙ্কের ছোঁয়াচ আমাতেও লেগেছে। কিন্তু আজ তুমি কামনার ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে নিজকে নির্ম্মুক্তভাবে প্রকাশ করলে যখন, তখন আমারো ভিতরটা আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। আমার জীবনের সত্য কি, তা আমি বুঝতে পেরেছি; আর বুঝতে পেরেছি বলেই বল্‌ছি, আজ তোমায় আমি যতখানি ভালবাসি, এত ভালবাসা বুঝি কখনো বাসিনি। মুহূর্ত্তের দরুণ তোমার মাঝে যে নির্ব্বাণের আলোক জ্বলে উঠেছিল, তাতে তুমিও তোমাকে চিনে নিয়েছিলে, আমিও আমাকে চিনে নিয়েছি। তাই তো আজ ছাড়াছাড়ির কথায় মনে একটুও দুঃখ আস্‌ছে না। ছাড়াছাড়িই বা হবে কি করে? পাশাপাশি দুটী নদীর মত এতদিন বয়ে চলেছি আমরা; কূল ছাপিয়ে এ ওর মাঝে মিশ্‌তে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। আর আজ! আজ অকূল সমুদ্রের মাঝে আত্মহারা হয়ে দুজনায় দুজনাকে সবরকমে পেলাম যে! আজ কি আনন্দ আমার মাঝে তা তোমায় কি বল্‌ব। মনে হচ্ছে, কোনও দুঃখ, কোনও ক্ষতিই যেন আমায় আর পীড়িত করতে পারবে না। এমন কি, এই যে তুমি আমার ঘরছাড়ায় বাদী হয়েছ, এতেও আমার দুঃখ হবে না যেন। আমি মনের মাঝে মুক্তি পেয়েছি, বাইরে মুক্তি নাই বা পেলাম! তুমি যদি তোমার ধর্মদত্তাকে খাঁচায় বন্দিনী করে রাখতে চাও, তবে এই দেহটাকেই পাবে শুধু, মনটাকে তো পাবে না। তাতে দুঃখ তোমারই,

আমাকে কাছে পেয়েও আমার সবটুকু পাবে না তুমি তোমার ওই কামনাক্লিষ্ট মন দিয়ে। কাছে থাকি আর না থাকি, আমি কিন্তু আমার এই মন দিয়ে তোমার সবটুকুই পাব।—এর পরেও কি তুমি আমায় ঘরে আট্‌কে রাখতে চাও? চাও তো বল, সঙ্কল্পভঙ্গের অপরাধ মাথায় নিয়েও তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই করব।"

বিশাখ ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "আমায় কি তুমি এতই স্বার্থপর মনে কর দত্তা যে, আত্মসুখের কল্পনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমি তোমার সুখেরও হন্তারক হব? তোমার চোখে-মুখে যে আলো ফুটে উঠেছে আজ, তার দীপ্তিকে মলিন কর্‌তে আমার বুকে কি একটুও বাজবে না? মানি, আমার ভালবাসায় কামনা আছে, কিন্তু তবুও তার সবটুকুই শুধু কামনা নয়। তোমার সব কথা এখন বুঝতে পার্‌ছি না বটে, কিন্তু একদিন তোমার কাছ থেকেই তা বুঝবার শক্তি পাব, এই ভরসাতেই আমি বেঁচে রইলাম।·········তোমায় ভিক্ষুণী হতে আর আমি বাধা দেব না—চল, আমি নিজেই তোমাকে শাস্তার কাছে নিয়ে যাই।"

"আর তুমি? তুমিও কি এই পথে আস্‌বে না?" প্রশ্ন করেই ধর্ম্মদত্তা উৎসুক হয়ে স্বামীর মুখের পানে চাইলেন।

বিশাখ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর মনের মাঝে যে একটা লড়াই চল্‌ছে, মুখের ওপর তার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। কষ্টে আত্মসংবরণ করে বল্‌লেন, "না, আমি এখন আর ও পথে যেতে চাই না। তোমার কথাই ঠিক—বাস্তবিক আমি কামনায় জর্জ্জরিত। আমি যে ভিক্ষু হতে চেয়েছিলাম, সে আমার দম্ভ, অভিমান আর আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। এই চিত্ত নিয়ে গিয়ে আমি বুদ্ধশাসনকে কলুষিত করতে চাই না। আজ হতে তুমি আমার ধরা-ছোঁবার বাইরে গেলে, তোমার-আমার মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য এক ব্যবধান সৃষ্টি হল—এই বুঝি ভাল হল। তুমি দেবী হয়ে আমার হৃদয়ে ফুটে থাক; তোমাতে-আমাতে যে একটা ব্যবধান রয়েছে এই কথাটাই আমার মনে জেগে থাক্‌—তাহলে আত্মপ্রবঞ্চনা হতে আমি রক্ষা পাব। আজ যদি মনের কামনা প্রচ্ছন্ন রেখে ভিক্ষু হয়ে আমি বেরিয়ে যাই, তাহলে আমার অভিমান বল্‌বে, আমি বুঝি তোমার সমযোগ্য; তাতে সূক্ষ্মভাবে আমার কামনারই তর্পণ হবে, আমার চিত্ত তো শুদ্ধ হবে না, আমি যে তোমার কত নীচে, তা বুঝবার সুযোগ তো আমার হবে না। হয়ত আমার কামনায় তোমাকেও আমি নামিয়ে আনব। শুদ্ধ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ-কঠিন তোমার ভালবাসা, তা জানি; কিন্তু তবুও তুমি মানুষ, তুমি নারী। কাছে থাকলে অলক্ষ্যে তোমার চিত্ত যে আমার দিকে নুইয়ে পড়বে না, এ কথা তুমিই কি জোর করে বল্‌তে পার দত্তা? আমি নিজকে প্রবঞ্চিত করেছিলাম, কিন্তু তোমাকে বঞ্চনা করতে চাই না। আমার দিক থেকে তোমার পথে অণুপ্রমাণ বাধাও আমি সৃষ্টি কর্‌তে চাই না। তাই তোমার-আমার মাঝে যে ব্যবধান আজ সৃষ্টি হল, তাই বজায় থেকে যাক্‌। তুমি ভিক্ষুণী হও, আমি উপাসকই থেকে যাব। তবে তোমার পরিত্যক্ত এই ঐশ্বর্য্য আর আমি ছোঁব না। সংঘের বাইরে থেকেও আমি ভিক্ষুব্রতেরই সাধনা কর্‌ব। কিন্তু যতদিন তুমি আমায় না কাছে ডাক্‌ছ, ততদিন ভিক্ষু-জীবন যেমন আমার কাছে স্বপ্ন হয়েছিল, তেমনি স্বপ্ন হয়েই থাক্‌।······আর একটা কথা তোমায় বলি দত্তা। মহাসম্বুদ্ধকেও একদিন দেবী ভদ্রকাঞ্চনার নিকট ফিরে আসতে হয়েছিল। একদিন তোমাকেও আমার কাছে ফিরে আস্‌তে হবে। আমি চিত্তে ক্ষোভ বা স্পর্দ্ধা নিয়ে এ কথা তোমায় বল্‌ছি না। বাসনার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি বটে, কিন্তু তবুও তোমায় আমি ভালবাসি; একদিন

এই ভালবাসা আমার বাসনার ওপর জয়ী হবেই ; সেদিন তোমাকেও আমার কাছে আসতে হবে। আমি সেই আশাতেই বসে রইলাম।”

ধর্ম্মদত্তা একটা কথাও না বলে মুগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীর প্রদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিশাখ ধর্ম্মদত্তার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে মিনতির স্বরে বললেন, “আমার শেষ একটা অনুরোধ রাখবে বল ?”

ধর্ম্মদত্তা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাইলেন। বিশাখ বললেন, “আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মাঝেও তুমি উদাসিনীর মতই জীবন কাটিয়ে গিয়েছ ; এক দিনের তরেও তোমায় সাজগোজ করতে দেখিনি। আজ যাবার আগে একটীবার তোমায় আমি মনের মত করে সাজিয়ে দেব—তুমি বারণ করবে না বল।”

স্বামীর কাকুতিতে ধর্ম্মদত্তার চোখ দুটী জলে ভরে এল। স্নিগ্ধস্বরে বললেন, “আচ্ছা, এ কি তোমার পাগলামী বল দেখি ! মহাভিক্ষুকের কাছে তুমি আমায় নিয়ে যাবে কি ঐশ্বর্য্যের জাঁক দেখাতে ? এ কি তাঁর শাসনের অবমাননা নয় ?”

“না, এ তাঁর অবমাননা নয় দত্তা। আমি জাঁক দেখাতে তাঁর কাছে যাচ্ছি না তো, আমি যাচ্ছি আমার সর্বস্ব তাঁর পায়ে ঢেলে দিতে। মহাভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রে আমার এই রত্নটী সঁপে দিতে যাচ্ছি বলেই তো তাকে আরো সুন্দর করে উজ্জ্বল করে তুলতে চাইছি, যাতে সে উদাসীনের চোখেও এর মূল্যটী ধরা পড়ে।”

ধর্ম্মদত্তা গম্ভীর হয়ে বললেন, “ছিঃ, অমন কথা বলো না তুমি, ওতে অপরাধ হয় যে। মহাভিক্ষুক যে রত্নদান করছেন, তার বিনিময়ে এমন কি বস্তু তুমি দিতে পার তাঁকে ? তোমার রত্ন তোমার কাছেই রত্ন হতে পারে, তাঁর কাছে কি ?”

“কিছুই নয়, দত্তা ? আমার এই সর্বস্ব-বিসর্জনের কোনও মর্য্যাদাই নাই তাঁর কাছে ? আমার এই রিক্ততার বেদনা তাঁকে একটুও স্পর্শ করবে না কি ? ....এই মানুষটীকে তোমরা কেউ চিনতে পারনি দত্তা। এই মহাবৈরাগীর অন্তরালে যে মহাপ্রেমিক প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে তোমরা কেউ দেখতে পাওনি। মহাবুদ্ধের জয়গাথা আমি পথে-ঘাটে শুনি—কিন্তু আমার মন তাতে সায় দেয় না, তা জান ? আমি দেখছি, বুদ্ধজ্যোতির তীব্রচ্ছটায় সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, তাই আসল মানুষটীকে কেউ চিনতে পারছে না। ভদ্রকাঞ্চনার অক্ষয় প্রেমকে যে হৃদয়ে সঙ্গোপন করে রেখেছে, এই মহাভিক্ষুকের মাঝে আমি সেই মহাপ্রেমিককেই দেখতে পাই। তাই না আমার আশা ছিল, তাঁর পথে চলতে গিয়ে তোমায়ও আমার সঙ্গিনীরূপে পাব। বৈরাগ্যের সঙ্গে প্রেমের সমন্বয় ঘটাতে পারলাম না বলে আজ আমার পরাজয় হল ; কিন্তু তা বলে আমার প্রেম যে গৌরবহীন, সে কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না। আর সে গৌরব জগতের আর কেউ না দিক্, এই মহাপ্রেমিক যে দেবেন, তা আমি জানি। তাই তুচ্ছ হলেও তাঁর দানের কাছে আমার দানকে তুলে ধরতে কোনও লজ্জা নেই দত্তা !......যাক্ সে কথা। এখন বল, আমার এই শেষ অনুরোধটী তুমি রাখবে ?”

ব্যথা, আনন্দ, গর্বের এক বিচিত্র সংঘাত চলছিল ধর্ম্মদত্তার মনে। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, “আচ্ছা, তাই হবে !”

(৪)

ধর্মদত্তা ভিক্ষুণী হয়ে বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করেছেন। মহাপ্রজাবতী গৌতমী ভিক্ষুণীসংঘের অধিনেত্রী ; ধর্মদত্তা তাঁর কাছ থেকেই সমাধি-ভাবনার উপযোগী কর্ম্মস্থান (ধ্যানের অবলম্বন) গ্রহণ করে সাধনা আরম্ভ করলেন। সমাধির যা অগ্রফল বা শ্রেষ্ঠভূমি, তাই তিনি লাভ করবেন, এই তাঁর দৃঢ় সংকল্প।

ধর্ম্মসভায় মহাবুদ্ধের শ্রীমুখের উপদেশ শুনে ধর্ম্মদত্তা বুঝতে পারলেন—

দুটী স্রোতোধারা বয়ে চলেছে এ জগতে—একটী ধরে আমরা এই সংসারসমুদ্রে এসে পড়ছি ; আবার তারই বিপরীতে রয়েছে একটী উর্দ্ধস্রোতোধারা, তাই ধরে আমরা পরিণামে নির্ব্বাণসমুদ্রে পৌঁছাতে পারি। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে যারা মহাবুদ্ধের শাসন মেনে চলেছে, তাদের লক্ষ্য এই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণের পথই আর্য্য পথ, সত্য পথ। এই পথেরই পাশাপাশি দুটী পথ রয়েছে, তাদের ধরে চললে মহা অনর্থ উপস্থিত হয় ; তাই তাদের অনার্য্য পথ জেনে ভিক্ষুরা সাবধানে এড়িয়ে চলবে। মহাবুদ্ধের শাসনের মর্ম্ম যারা গ্রহণ করতে পারেনি, তারা সংঘের বাইরে পড়ে আছে, তাদের বলা যেতে পারে পৃথক্-জন (পোথুজ্জন)। এই পৃথক্‌জনেরা কখনো মনে করে, কেবল কামসুখ উপভোগ করা, মন যা চায়, তাই নিয়ে মেতে থাকা—এই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। কাম ছাড়তে হবে, এই কথা শুনলে তারা আঁৎকে ওঠে ; নির্ব্বাণসুখের বিন্দুমাত্র আভাসও এরা পায় না। সাধারণ লোকে এই পথকেই সুখের পথ মনে করে। সংসারের প্রায় সবাই এই পথেই চলেছে বটে, কিন্তু নির্ব্বাণকামীকে সাবধানে এই যথেচ্ছ কামসুখের পথ এড়িয়ে যেতে হবে। এই হল একটী অনার্য্যপথ।

আরও একটী অনার্য্য-পথ আছে, সেটী কামসুখ-পথের বিপরীত হলেও সত্য পথ নয়। কামনা-বাসনার হাত হতে নিস্তার পাবার জন্য মানুষ কখনো কখনো আত্মপীড়ন আরম্ভ করে। ভাল-মন্দ কাজের বাছাই তারা করতে জানে না, মনটাকে কি করে নির্ম্মল করতে হয় তা বোঝে না, শুধু অন্ধসংস্কারবশে কতকগুলি উৎকট অনুষ্ঠান করে কর্মের জালে নিজকে আরও জড়িয়ে ফেলে। এরাও অনার্য্যপথের পথিক। সংসারের কবল হতে নিস্তার পাব বলে না বুঝে-শুনে নিজকে কেবল দুঃখ দিলেই তো হয় না ; চাই জ্ঞান, চাই সত্যিকার দৃষ্টি। তাই নির্ব্বাণ পথের পথিককে এই অনার্য্যসেবিত দুঃখসাধনার পথও সাবধানে এড়িয়ে যেতে হবে।

একদিকে উচ্ছৃঙ্খল কামসুখ, আর একদিকে সত্যসাধনার নামে না বুঝে-শুনে দুঃখের সাধনা—এই দুয়ের মাঝ দিয়ে নির্ব্বাণের পথ। মহাবুদ্ধ জগৎকে এই 'মজ্ঝিমা পটিপদা' বা মধ্যপথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এই মজ্ঝিমা-পটিপদাই মানুষের চোখ ফুটিয়ে দেয়, জ্ঞান জন্মিয়ে দেয়, তাই একে বলে চক্ষুষ্করণী—জ্ঞানকরণী। এই পথে চললে চিত্ত শান্ত হয়, দিব্য-জ্ঞান ফুটে ওঠে, নির্ব্বাণের গম্ভীর মহিমায় অন্তর স্তব্ধ হয়।

এই পথের আটটী অঙ্গ। আটটী সাধনোপায় গ্রহণ করে এই পথে চলতে হয়। চাই সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি আর সম্যক্ সমাধি।

সম্যক্ দৃষ্টি—জ্ঞানের দৃষ্টি, প্রজ্ঞা-চক্ষুর উন্মেষ। এই দৃষ্টি ফুটলে জগতের পরিণামে যে চারিটী মহাসত্য রয়েছে, তাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ; কর্ম্মই যে জগতের নিয়ামক, এই জ্ঞান হয় ; ইহলোক-পরলোকের সমস্ত রহস্য বুঝতে পারা যায়। এই সম্যক্ দৃষ্টি লাভ করবার জন্য আর বাকী অঙ্গগুলির সাধনা।

সম্যক্ সঙ্কল্পে আসে মনের দৃঢ়তা। চাই নৈষ্ক্রম্যের সঙ্কল্প।—ইহলোকে-পরলোকে কোনও বস্তুতে আমার আসক্তি থাকবে না, এই ভাবটী মনের মাঝে পোষণ করতে হবে। আর চাই অব্যাপাদ-সঙ্কল্প।—আমি কারু অনিষ্ট করতে চাই না, কাউকে দুঃখ দিতে চাই না, সবাই আমার বন্ধু, এই মৈত্রীভাবনায় মনকে ভাবিত রাখতে হবে। আবার চাই অবিহিংসা-সঙ্কল্প—আমি কাউকে হিংসা করব না, ইহলোকে-পরলোকে যেখানে যত জীব দুঃখ পাচ্ছে, সবাই সুখী হোক, ক্লেশের হাত হতে মুক্তি লাভ করুক, আমার মনে সর্ব্বদা এই করুণার ধারা বয়ে যায় যেন। এমনি করে মনের

ভাবনা চিন্তাগুলো খাঁটী করতে হবে, তবেই সম্যক্-সঙ্কল্পের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

সম্যক-সঙ্কল্প হতেই আসে সম্যক-বাক্য। মনটী যার খাঁটী, তার কথাও খাঁটী। সম্যক্-বাক্যের অনুশীলন যিনি করেন, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না (মৃষাবাদবিরতি), দুজনের মাঝে বিবাদের সূত্রপাত হয় এমন কথা বলেন না (পিশুন-বাগ্ বিরতি), কর্কশ কথা বলেন না (পরুষ-বাগ্-বিরতি), আর বাজে কথা বলেন না (সম্প্রলাপ-বিরতি)।

শুধু মনে আর কথায় খাঁটী হলেই হবে না, কাজেও খাঁটী হওয়া চাই। তাকেই বলে সম্যক্ কর্ম্মান্ত। সম্যক কর্ম্মের যিনি আচরণ করেন, তিনি কখনো কোনও প্রাণিহত্যা করেন না (প্রাণাতিপাত-বিরতি), কখনো পরদ্রব্য অপহরণ করেন না (অদত্তাদান-বিরতি), কখনো মিথ্যাকামাচারে রত হন না (কামেষু মিথ্যাচার-বিরতি)।

মানুষ ঘরেই থাকুক আর বনেই যাক, খাওয়ার চেষ্টা তাকে সব জায়গাতেই রাখ্তে হয়। এই জীবিকা-অর্জ্জনের হুতাশে মানুষ কত কাণ্ডই না করে বসে। তাই কি করে আমার পেট চল্ছে, এ বিষয়েও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাকেই বলে সম্যক আজীব। যিনি চিন্তায়, কথায় এবং কাজে খাঁটী, তাঁর জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ও খাঁটী। যারা গৃহী, জীবিকানির্ব্বাহ করতে গিয়ে তারা যদি কথায় এবং কাজে খাঁটী থেকে যায় (যেমন নাকি আগে বলা হল), তাহলেই তারা সম্যক্ আজীবের অনুশীলন করছে বলা যায়। কিন্তু যারা ভিক্ষু, তাদের আরও সাবধান হতে হবে। ভিক্ষুরা গৃহীদের এটা-সেটা দিয়ে তার বদলে আহার সংগ্রহ করবে না; নিজের মাঝে যে গুণ নাই, সেই গুণ জাহির করবার চেষ্টা করে, নির্ল্লজ্জের মত যার-তার কাছে যা-তা চেয়ে বসে, কোনও রকম সিদ্ধাই বা বুজরুকী দেখিয়ে, নিজের বড়াই আর অপর সাধুর নিন্দা করে, দান দিয়ে দান আদায় করে, কিম্বা হাত দেখে, গোণা গুণে ভিক্ষুরা কখনো জীবিকা অর্জ্জন করবে না।

যাঁর চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম এবং জীবিকানির্ব্বাহের উপায় খাঁটী, তাঁর মাঝে জ্বলন্ত উৎসাহের আবির্ভাব হয়। এই উৎসাহকেই বলি ব্যায়াম বা অধ্যবসায়। সম্যক ব্যায়ামের যিনি অনুশীলন করেন, চারটী বিষয়ে তাঁর তীব্র দৃষ্টি থাকে। তিনি জানেন, ভাল-মন্দ দু'রকম সংস্কারই মানুষের মাঝে আছে। আবার সবরকম ভাল-মন্দ সংস্কারই যে মানুষের মাঝে এক সঙ্গে ফোটে, তাও নয়। তাই লক্ষ্য করতে হবে, আমার মাঝে মন্দ সংস্কার কি কি আছে এবং আপ্রাণ চেষ্টায় সেগুলো দূর করতে হবে। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত মন্দ সংস্কার আমার মনে জাগেনি কিন্তু জাগ্বার সম্ভাবনা আছে, আগে থেকেই সতর্ক হয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখা। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত ভাল সংস্কার এখনো আমার মাঝে জাগেনি, তাদের জাগাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। শেষ কথা, আমার মাঝে ভাল যেটুকু আছে, সেটুকুকে ক্রমেই পুষ্ট করে বাড়িয়ে তোলা। মোট কথা, মন্দ সংস্কার (অকুশল ধর্ম্ম) তাড়াতে হবে আর ভাল সংস্কার (কুশল ধর্ম্ম) জাগাতে হবে, এর দরুণ যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা, তাই যথার্থ ব্যায়াম বা অধ্যবসায়। সম্যক্-ব্যায়ামের যিনি অনুশীলন কর্ছেন, তাঁর এই বজ্রদৃঢ় সংকল্প—

কামং তচো ন্হারু চ অট্‌ঠি অবসিস্সতু
উপসুস্সতু মে সরীরে মাংসলোহিতং, যং তং
পুরিসথামেন পুরিসপরক্কমেন পত্তব্বং, ন তং
অপত্বা বীরিয়স্স সণ্ঠানং ভরিস্সতি।

—আমার শরীরের রক্তমাংস শুকিয়ে যাক্, শুধু হাড়-চাম্ড়া আর শিরাগুলি অবশিষ্ট থাক্—তবু

মানুষের শক্তিতে, মানুষের বিক্রমে যা পাওয়া যায়, তা না পেয়ে কিছুতেই আমার এই বীর্য্য, এই উৎসাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না!

মনটী এক জায়গায় স্থির হয়ে বস্‌তে চায় না বলেই না সাধনার পথে আমাদের যত আপদ্ এসে জোটে! কিন্তু যে মন লক্ষ্যসম্বন্ধে নিরুৎসাহ, তা কখনো স্থির হবে না। আচার বিশুদ্ধ হলে চিত্ত তেজঃপূর্ণ ও উৎসাহী হবে। তেজস্বী চিত্তই সহজে লক্ষ্যবস্তুতে নিশ্চল হয়ে যায়। চিত্তকে নিশ্চল কর্‌বার জন্যই সম্যক্ স্মৃতির সাধনা।

সম্যক্ স্মৃতি হতে লাভ হয় সম্যক্-সমাধি। স্তরে স্তরে যেন জগতের তত্ত্ব সাজানো রয়েছে; বাইরে বাইরে খুঁজ্‌লে কেউ তার সন্ধান পায় না, তত্ত্ব সাক্ষাৎকার কর্‌তে হলে ভিতরে ঢুকতে হয়। তত্ত্বের সন্ধানে ভিতরে ঢুকে যেতে পার্‌লেই সমাধি। রূপ-লোকে, অরূপলোকে সমাধিরও কত স্তর রয়েছে; স্তরে স্তরে জগতের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। সকলের শেষ তত্ত্ব নির্ব্বাণ।

এই নির্বাণেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা সম্যক্‌দৃষ্টি ফুটে ওঠে। সে দৃষ্টির সম্মুখে কর্ম্মের রহস্য, জগতের রহস্য কিছুই আর লুকানো থাকে না। পৃথক্‌জনের দৃষ্টি নিয়ে আমরা যা-কিছু দেখ্‌ছি, তারও মূলে যে চারটী আর্য্যসত্য অটল হয়ে আছে, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সেই সত্যই ফুটে ওঠে।

সে আর্য্যসত্য কি?—

জগতের আদি মহাসত্য—দুঃখ। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ; যা চাই, তা পাই না—এ-ও দুঃখ। প্রিয়বস্তুকে ছেড়ে যেতে হয়—এই দুঃখ; যা অপ্রিয়, বাধ্য হয়ে তার সংসর্গ কর্‌তে হয়—এ-ও দুঃখ। এ সবই সত্য কথা; এমন কেউ আছে জগতে, যাকে এ সমস্তই ভোগ কর্‌তে হয় না?

দ্বিতীয় মহাসত্য—দুঃখসমুদয় বা দুঃখের হেতু। দুঃখ যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই দুঃখের হেতুও আছে। গাছের মূল কেটে দিলে যেমন ডালপালা-পাতা সব শুকিয়ে যায়, তেমনি দুঃখের হেতু দূর কর্‌তে পার্‌লে দুঃখও আপনা হতে দূর হয়ে যাবে। তাই সন্ধান কর্‌তে হবে, এই বিচিত্র দুঃখপরম্পরার মূল কোথায়?—তৃষ্ণাই দুঃখের মূল। তৃষ্ণার আর এক নাম বাসনা। এই নামটী বিশ্লেষণ করে দেখলেই আমরা তৃষ্ণার স্বরূপ বুঝ্‌তে পার্‌ব। আঁচলে করে ফুল তুলে নিয়ে এলে পর ফুল না থাক্‌লেও আঁচলে তার বাস থেকে যায়। আমরা বলি, আঁচলটা ফুলের গন্ধে সু বা সি ত; ফুল নাই, কিন্তু তার বাস আছে। চিত্তের সঙ্গে অনুকূল বিষয়ের যোগ হলে সুখানুভব হয়। বিষয় থাকে না, কিন্তু চিত্তে তার বাস বা বাসনা থেকে যায়। যে সুখ একবার ভোগ করেছি, সেই সুখ আবার ভোগ কর্‌বার জন্য একটা লোলুপতা মনের মাঝে রয়েই যায়। কিন্তু অনুকূল বিষয় তো সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। কামনা-ব্যাঘাতের অস্বস্তিতে মন তখন পীড়িত হতে থাকে। তাই দেখি, কামনা বাসনা বা তৃষ্ণাই সমস্ত দুঃখের হেতু।

তৃতীয় মহাসত্য—দুঃখ ও দুঃখের হেতু যেমন আছে, তেমনি সেই হেতুর বিনাশও আছে। দুঃখ-নিরোধ এক মহাসত্য। এই দুঃখনিরোধই নির্ব্বাণ। একদিকে যেমন দুঃখপ্রবাহ অনাদি, অনন্ত; অপর দিকে তেমনি নির্ব্বাণরূপী পরমসুখপ্রবাহও অনাদি, অনন্ত। এই দুটী ধারাই যেন পাশাপাশি চলেছে—একটী ধারা হতে আর একটী ধারাতে উত্তীর্ণ হওয়ার মাত্র অপেক্ষা। দুঃখ যেমন আছে, দুঃখনিরোধরূপী নির্বাণও তেমনি আছে—বরাবর আছে। বাসনার নিরোধে এই নির্বাণ লাভ হয়। সম্যক্‌সম্বুদ্ধেরা এই নির্বাণরসের রসিক।

সম্যক্‌সম্বুদ্ধেরা নির্ব্বাণরস আস্বাদন করে আবার এই দুঃখময় জগতে ফিরে আসেন সেই সুখের বার্ত্তা

জগতে প্রচার করতে। তাঁরা উদাত্তকণ্ঠে জগৎকে ডেকে বলেন, "দুঃখ যেমন আছে, তেমনি দুঃখের উপশমও আছে। সে উপশমের উপায়ও আছে। সেই পথের কথা বলতেই আমি তোমাদের কাছে এসেছি।"

দুঃখনিরোধের উপায়জ্ঞান—এই হল চতুর্থ মহাসত্য। সে উপায় কি, তা পূর্বেই বলে এসেছি। আটটী অঙ্গে বিভক্ত যে বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট আর্য্যপথ (অরিয়ো অট্‌ঠাঙ্গিকো মগ্‌গো), তাই দুঃখনিরোধের উপায়। তাই হল "মঝ্‌ঝিমা পটিপদা, তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্‌খুকরণী, ঞাণকরণী, উপসমায় অভিঞ্‌ঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সম্বত্ততি"—অপ্রবুদ্ধ কাম-সেবা আর অপ্রবুদ্ধ আত্মপীড়ন, দুয়ের মাঝে এই হল আর্য্য-পথ, মহাসম্বুদ্ধেরা বারবার এসে যা জগৎকে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন, যে পথ তোমাদের চক্ষু দেবে, জ্ঞান দেবে; বাসনার উপশম, অলৌকিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নির্ব্বাণে যার পর্য্যবসান।

ধর্ম্মসভায় স্বয়ং সম্যক্‌সম্বুদ্ধের মুখে ধর্ম্মদত্তা মুক্তির এই বাণী শুনলেন। তাঁর জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। কামনার তরঙ্গ ঠেলে এই দুঃখস্রোতকে তাঁর উজিয়ে যেতে হবে—এই হল বুদ্ধের শাসন। সে শাসন তিনি মাথা পেতে নিলেন। (ক্রমশঃ)

ভারতের নারী

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—*—

লণ্ডনে এক ইংরাজমহিলা যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা থেকে রাম তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছেন। ভারতবর্ষের কোনো পত্রিকায় বক্তৃতাটী ছাপা হয়েছিল। বক্তৃতাটী পড়ার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে সব গুজোব আর ভ্রান্ত মত প্রচার করা হয়, তার সম্বন্ধে তোমাদের একটু আভাস দেওয়া। কারু কারু ধারণা, ভারতবর্ষে গিয়ে কোনও কাজ করা অসম্ভব। তারা মনে করে, সেখানে জাতিভেদের এত কড়াকড় যে আমেরিকার কোনও লোক গিয়ে সেখানকার কারু সঙ্গে মিশতে পারে না। যারা কোনও দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখেনি, এমন কতগুলি লোক এই সব গুজোব রটিয়ে বেড়িয়েছে।

যাকে ভালবাসি, তার জন্য মরতে হয় তো তার চাইতে আনন্দ আর কি আছে! ওঃ, সে যে চরম শান্তি, পরম সুখ!

যাকে ভালবাসে, তার দরুণ যে প্রাণ দিতে পারে, সেই না ভালবাসার মর্ম্ম জানে। এই ভালবাসাই হচ্ছে জীবন; মহা কর্ম্মশক্তির উৎস এই ভালবাসা। ভারতবর্ষ এই ভালবাসার কাঙ্গাল। ভারতবর্ষে যে সমস্ত নর-নারী কাজ করতে যাবে, তাদের এই ভালবাসাটুকু থাকা চাই।

যারা ভারতবর্ষে থেকেও ভারতের কিছুই চোখ মেলে দেখে না, তারাই যত মিথ্যা রচনা করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। এ যেন একখানা বইকে অয়েলক্লথ দিয়ে মুড়ে জলে ডুবিয়ে রাখা; বইখানার চারদিকেই জল, কিন্তু তা বলে এক

ফোঁটা জল বইয়ের গায়ে লাগ্‌ছে না। যারা ভারতবর্ষে থাকে, অথচ দেশের লোকের সঙ্গে মেশে না, তারা কখনো সে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারে কি?

যে মেয়েটীর কথা বল্‌ছি, তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন ভারতীয় ধরণে; তিনিই বলছেন ও-দেশের কথা। এই মেয়েটীর মত হৃদয় নিয়ে যদি তোমার ভারতে যেতে! যদি খাঁটী কর্ম্মী হয়ে যাও সেখানে তো ট্যাঁক থেকে একটী আধলাও খসাতে হবে না। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোককে খেতে পরতে দিচ্ছে, এমন লোকের অভাব নাই। ওদেশের লোক গরীব বটে, কিন্তু প্রাণটা বড় দরাজ।

ভারতবর্ষে সাধুদের রাম কখনো টাকা-পয়সা কাছে রাখতে দেখেন নি। সাধুরা রাস্তায় বেরুলে সবাই ধরে নেয়, ওঁরা ক্ষুধানিবারণের দরুণ খাবার ভিক্ষা কর্‌তে বেরিয়েছেন। আর ভারতের প্রত্যেক মেয়েই জানে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া, অভাবগ্রস্ত হয়ে কেউ বাড়ীর সামনা দিয়ে গেলে যথাসাধ্য তার অভাব-পূরণ করা—এ হচ্ছে মেয়েদের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। যে মেয়ের বাড়ীতে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবারণের কোনও সংস্থান নাই, তার বাড়ীর পাশ দিয়ে কোনও সাধু যদি অমনি চলে যান তো কি ব্যাপার ঘট্‌বে, রাম তা জানেন। নিঃসম্বল সাধুকে এক মুঠো অন্ন দিতে পার্‌ল না সে, এই দুঃখে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা বইবে যে! ক্ষুধার্ত্ত হয়ে, অভাবগ্রস্ত হয়ে পথে যে বেরিয়ে পড়েছে, তাকেই তারা জানে সন্ন্যাসী, তাকেই বলে নারায়ণ; শুধু যে স্বামীজীরাই সন্ন্যাসী, তা নয়। ভারতবর্ষে গিয়ে যদি ক্ষুধার্ত্ত হয়ে কোনও মেয়ের কাছে গিয়ে হাত পাত, সে তোমাকে সাধুর মতই সম্মান কর্‌বে। তাদের চোখে, যে অন্নবস্ত্রহীন, সহায়-সম্বলহীন, সেই সন্ন্যাসী।

সাধারণতঃ আমেরিকায় আর ইংলণ্ডে এই কথাই প্রচার করা হয় যে ভারতবর্ষে কেউ স্ত্রীকে ভালবাসে না বা সম্মান করে না। এটা একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা কথা; তোমাদের দেশে স্ত্রীকে যতখানি ভালবাসে বা সম্মান করে, তার চাইতে ও দেশে বেশী করে। এ দেশে দশের সাম্‌নে স্ত্রীকে খুব ভালবাসা দেখানো হয়, সোহাগ করা হয়, চুমো খাওয়া হয়; কিন্তু লোকের চোখের আড়ালে স্ত্রী অনাদৃতা। ভারত-বর্ষে স্ত্রীকে কেউ লোকের সামনে আদর-আর্ত্তি করে না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাকে দেবী বলে পূজা করে।

এ দেশে স্ত্রীর প্রতি সদরের ব্যবহারটাই বড় অন্দ-রের ব্যবহারের চেয়ে; কিন্তু ও দেশে তা নয়। দশের সামনে স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে কেউ ঢলাঢলি করে না, বটে কিন্তু তাকে সুখে রাখবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কর্‌তে স্বামীর চেষ্টার ত্রুটী নাই সেখানে। তবে কিনা ওদেশে মেয়েরা পুরুষের অনুপাতে শিক্ষিতা নয় বটে। কিন্তু এ দেশেই কি মেয়েরা পুরুষের তুলনায় সমান ওজনের শিক্ষা পায়? এ দেশের লোকের তুলনায় ভারতবর্ষের পুরুষদেরই শিক্ষা কম; কাজেই মেয়েদেরও শিক্ষা কম হবে।

ভারতবর্ষে কেউ স্ত্রীকে "আমার স্ত্রী" বলে উল্লেখ করে না। স্ত্রীকে সোজাসুজি স্ত্রী বলে ডাকা ওদেশের দস্তুর নয়। ও রকম সম্বোধন অশ্লীল, লজ্জাকর, নারীর আত্মার অবমাননাস্বরূপ বলে গণ্য হবে। কাজেই ওদেশে কেউ কস্মিন কালে ও কথাটা উচ্চারণ করবে না। স্ত্রীর কথা বল্‌তে হলে ওদেশের লোকে 'ছেলের মা' বলে উল্লেখ করবে, বল্‌বে, "আমার রামের মা", বা "আমার কৃষ্ণের মা" ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে নিয়ম হচ্ছে, কারু প্লেগ হলে আত্মীয়-স্বজন কাউকে তার কাছে আস্‌তে দেওয়া হয় না। এক বাড়ীতে একটী ছেলের প্লেগ হল। গ্রামের

একটী মেয়ে, ছেলেটা যে কুঁড়েয় ছিল, সেইখানে যো-সো করে ঢুকলেন গিয়ে। ছেলেটীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজকে এমনি করে বিপদের মুখে ফেলতে কুণ্ঠিত হলেন না। অবশেষে ছেলের মাকে ছেলের কাছে আসতে দেওয়া হল। ছেলেটীর তখন সময় হয়ে এসেছে। মায়ের পায়ে মাথা রেখে সে যাবার জন্য তৈরী হল। ক্রীশ্চান যদি যীশুর চরণে মাথা রেখে মরতে পায় তো সে যেমন নিজকে ধন্য মনে করবে, হিন্দুও মায়ের পায়ে মাথা রেখে মরা তেমনি তীর্থে মরার সমান বলে গণ্য করবে। যে ছেলে এমনি মায়ের চরণতলে প্রাণবিসর্জ্জন করতে পারে, সে মরণকে ধন্য মানে।

এ দেশে তোমরা ভগবান্‌কে পিতা বলে উপাসনা কর, তোমরা বল, "হে স্বর্গস্থ পিতা।" ভারতবর্ষে ভগবান্‌কে পিতা বলে নয়, মাতা বলে উপাসনা করা হয়। ওদেশের লোকের কাণে "মা" বুলির মত মিঠা বুলি আর কিছুই নাই। "মাতাজী!"—এ হচ্ছে ভগবানের প্রিয়তম সম্বোধন। হিন্দু যখন ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয়, বা অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তখন তার মুখ দিয়ে "My God!" বেরোয় না, বেরোয়—"মা—মাগো!" বিপদের সময়, ব্যথার সময়, হিন্দুর মুখের এই "মা" ডাক তার হৃদয়ের নিগূঢ়তম ভাবের অভিব্যক্তি। "মা" নামে হিন্দুর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত হয়ে ওঠে।

মীরাবাঈ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

——):*:(——

এক রাত্রের দরুণ তাহাকে কাছে পাইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এ আনন্দের বুঝি আর অবধি থাকিবে না, মিলনের এই একটী মুহূর্ত্তই বুঝি আমার কাছে যুগজীবী হইয়া থাকিবে। কিন্তু সখি, সকলই আমার কর্ম্মের ফের। বুঝি দুঃখই আমার চির-জীবনের সাথী। তখন মিলনের মাঝে বিরহের আঁচ পাইয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু সে আঁচ যে এমন করিয়া আগুন হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, এ তো আমি ভাবিতে পারি নাই। চকিতের তরে দেখা দিয়া লুকাইয়া যাওয়া—এই কি প্রেমের রীতি! বন্ধু, এমনি করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আমায় পীড়িয়া মারিবে বলিয়াই কি সেদিন অত করিয়া সোহাগ ঢালিয়া দিয়াছিলে? আজ আমার এই দশা দেখিয়া তোমার প্রাণে কি একটুকুও করুণা হয় না? তুমি কি পাষাণ? বুঝিতে পারিতেছ না কি—

ঘড়ী এক নহিঁ আবড়ে
তুম দরসণ বিন মোয়—
তুম্ হো মেরে প্রাণ জী,
কাসুঁ জীৱণ হোয়।

—তোমাকে না দেখিয়া একদণ্ডও যে আমার সোয়াস্তিতে কাটিতে চায় না বন্ধু! তুমিই যে আমার প্রাণ, তুমি ছাড়া আমার জীবনের অবলম্বন কোথায়?

ধান ন ভাৱে, নীঁদ ন আৱে,
বিরহ সতাৱে মোয়;
ঘায়ল-সী ঘূমত ফিরূঁ রে—
মেরা দরদ ন জানে কোয়।

—মুখে আমার অন্ন রোচে না, চোখে ঘুম আসে না, বিরহ আমায় কুরিয়া খাইতেছে। যেন ঘায়েল হইয়া আমি ঘুরিয়া ফিরিতেছি—আমার ব্যথা তো কেউ বোঝে না!

জো মৈঁ ঐসা জাণতী রে—
প্রীত কিয়ে দুখ হোয়,
নগর ঢঁঢোরা ফেরতী রে,
"প্রীত করো মৎ কোয়!"

—এমন যদি জানিতাম, প্রেম করিলে এত দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা হইলে আমি নগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার করিতাম, "তোমরা কেউ যেন প্রেমে পড়িও না!"

পন্থ নিহারুঁ, ডগর বুহারুঁ,
ঊবী মারগ জোয়।
মীরা কে প্রভু কব রে মিলো গে—
তুম মিলিয়া সুখ হোয়।

—পথ পানে চাহিয়া আছি, আসিবে বলিয়া পথ ঝাঁট্ দিয়া রাখিয়াছি, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। ওগো মীরার প্রভু, তুমি কবে আসিবে আমার কাছে—তোমাকে পাইলে তবে না আমার দুঃখ ঘুচিবে!

ভালবাসিয়া যে এমন করিয়া জলিতে হইবে, তাহা তো জানিতাম না—

সুখের লাগিয়া　　পিরিতি করিলুঁ
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত　　দুখ হবে বল্যা
কোন্ অভাগিনী জানে?
সই, পিরিতি বিষম মানি।
এত সুখে এত　　দুখ হবে বল্যা
স্বপনে নাহিক জানি।
সে হেন কালিয়া　　নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে　　যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন?
বল না বল না　　কি বুদ্ধি করিব
ভাবনা বিষম ভৈল—
হিয়া-দগদগি　　পরাণ-পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল!

মিথ্যা তোমরা আমায় আশ্বাস দিতেছ সখি! কি জ্বালায় যে আমি জ্বলিয়া মরিতেছি, তাহা অপরে পরিমাণ করিবে কি করিয়া?—

হে রী, মৈঁ তো প্রেম-দিৱানী—
মেরা দরদ ন জানে কোয়!
সূলী উপর সেজ হমারী,
কিস বিধ সোণা হোয়;
গগণ-মঁডল পৈ সেজ পিয়া কী—
কিস বিধ মিলনা হোয়!

—ও গো, আমি যে প্রেম-পাগলিনী, আমার ব্যথা তো কেউ বোঝে না! কাঁটার উপর আমার শেজ বিছাইয়াছি, সোয়াস্তিতে শুই কি করিয়া? আকাশের উপর বিছানো আছে বঁধুর শেজ, বল কি করিয়া তাহার কাছে যাই?

ঘায়ল কী গত ঘায়ল জানৈ,
কী জিন লাঈ হোয়।
জৌহরী কী গত জৌহরী জানৈ
কী জিন জৌহর হোয়।

—ব্যথিতের মর্ম্ম ব্যথিতেই জানে, কিসের দরুণ ব্যথা তা সেই বুঝিতে পারে। যে জহুরী, সে জহুরীর গুণ বোঝে, কোনটা যে জহর, তা সে-ই চিনে।

দরদ কী মারী বন বন ডোলুঁ—
বৈদ মিল্যা ন কোয়।
মীরা কী প্রভু! পীর মিটেগী
জব বৈদ সঁৱলিয়া হোয়!

—ব্যথায় অস্থির হইয়া বনে বনে ফিরিতেছি, কিন্তু

কই, বৈদ্যের দেখা তো পাইলাম না। সে শ্যামল যদি আমার বৈদ্য হয়, তবে বুঝি আমার এ ব্যথা ঘুচে।

এই নিদারুণ উৎকণ্ঠা, এই ধিকি-ধিকি পুড়িয়া মরা—এ যে আর সহিতে পারিতেছি না সখি!—আমার—

নীঁদলড়ী নহিঁ আবৈ সারী রাত,
কিস বিধ হোঈ পরভাত।
চমক উঠি সুপনে-সুধ ভূলী—
চন্দ্র-কলা ন সোহাত!
তলফ্ তলফ্ জিব জায় হমারো,
কব রে মিলে দীনানাথ!

—সারারাত চোখে ঘুম আসে না, কখন প্রভাত হইবে সেই প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকি। স্বপ্নে যদি বা তাহার দেখা পাই তো চমকিয়া উঠিতে স্বপ্ন টুটিয়া যায়; আর তখন চাঁদের কিরণও যেন বিষের জ্বালা ছড়াইয়া দেয়। এমনি করিয়া আমার প্রাণ ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতেছে, কবে আমি তাহার দেখা পাইব!

ভঈ হূঁ দিবানী, তন-সুধ ভূলী,
কোঈ ন জানী ম্হারী বাত।
মীরা কহৈ বীতী সোঈ জানৈ—
মরণ জীবণ উন হাথ!

—আমি পাগল হইয়া গিয়াছি—বুঝিতে পারিতেছি না আমার দেহ আছে কি নাই। কেউ আমার কথা বুঝিতে পারিবে না। আমার যা হইয়াছে, তা সেই জানে; জীবন মরণ তাহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি!

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কই আশার এতটুকু ক্ষীণ রেখাও তো দেখিতে পাইতেছি না। আজ আমার যেন সকল অবলম্বন টুটিয়া গিয়াছে, অতীতের এতটুকু স্মৃতিও বুঝি আর বাঁচিয়া নাই। প্রথম-মিলনের সেই সরম-পুলক, সেই চাটু-বচন, সেই আদর-সোহাগ—সব আজ আমার কাছে স্বপ্ন। বুঝি সে-ও স্বপ্ন, আমিও স্বপ্ন! আমার সব গিয়াছে, আছে শুধু তাহার নামের স্মৃতিটুকু। একদিন না দেখিতেই ওই নাম শুনিয়া পাগল হইয়াছিলাম; আজ আমার নিকট হইতে সব কাড়িয়া লইয়া ওই নামটুকুই বুঝি সে রাখিয়া গেল!—

নাতো নাম কো মো সূঁ
তনক ন তোড়্যো জায়।
পানাঁ জ্যূঁ পীলী পড়ী রে
লোগ কহৈ পিণ্ড-রোগ;
ছানে লাঁঘন মৈঁ কিয়া রে,
সাম মিলণ কে জোগ।

—তার সঙ্গে আমার এখন বন্ধন শুধু নামের; এটা যেন মুহূর্ত্তের দরুণও টুটিয়া না যায়। আমার সমস্ত শরীর পুকুরের পানার মত হল্‌দে হইয়া গিয়াছে—লোকে বলে, উহার "পিণ্ড-রোগ" হইয়াছে। কিন্তু তারা তো কেউ জানে না, যদি ব্রত-উপবাসের পুণ্যফলে আমি শ্যামকে পাই, এই আশায় গোপনে আমি যে উপবাস করি।

বাবল বৈদ বুলাইয়া রে
পকড় দিখাঈ ম্হাঁরী বাঁহ;
মূরখ বৈদ মরম নহিঁ জাণে
করক কলেজে মাঁহ॥

—ভয় পাইয়া পিতা আমার বৈদ্য ডাকিয়া আনিয়াছেন, সে আমার নাড়ী টিপিয়া দেখিবে! মূর্খ বৈদ্য তো মর্ম্মের কথা জানে না—সে তো জানে না, এ ব্যথা যে আমার কলিজার মাঝে!

জাও বৈদ ঘর আপণে রে,
ম্হাঁরো নাঁব ন লেয়;
মৈঁ তো দাঘী বিরহ কী রে,
কাহে কূঁ ঔষদ দেয়!

—আমি বলি, ওগো বৈদ্য, তুমি আপন ঘরে ফিরিয়া যাও, আমার নাম আর মুখে আনিও না। আমি যে বিরহের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, মিছামিছি আমায় ঔষধ দিতেছ কেন?

মাঁস গলি গলি ছীজিয়া রে
করক রহ্যা গল আহি;
আঁগুলিয়া মূঁদড়ী ম্হঁরে
আরণ লাগী বাঁহি!

—আমার শরীরের মাংস শুকাইয়া শুকাইয়া মিলাইয়া গেল, হাড়শুদ্ধ খীণাইয়া গেল; কিন্তু ব্যথা গেল কি? আজ আমার এমন দশা, আঙ্গুলের আংটিটা বুঝি হাতের কব্জী দিয়া গলিয়া যাইতে পারে!

রহু রহু পাপী পপিহরা রে,
পিব্বকো নাম ন লেয়;
জে কোঈ বিরহন সাম্হলে
পিব্ব কারণ জিব্ব দেয়!

—ওরে থাম্ থাম্ হতভাগা পাপিয়া! "পিউ পিউ" করিয়া পিয়ার নাম আর নিস্ না তুই। যদি কোনও বিরহিণী তোর ফুকার শোনে তো প্রিয়ের নামে সে প্রাণ দিবে যে!

খিণ মন্দির খিণ আঁগণে রে,
খিণ খিণ ঠারী হোয়;
ঘায়ল জ্যূঁ ঘূমূঁ খড়ী—
ম্হারী বিথা ন বূঝে কোয়!

—ক্ষণে যাই ঘরে, ক্ষণে আসি আঙিনায়; ক্ষণে ক্ষণে পথের পাশে দাঁড়াইয়া থাকি। ঘায়েল্ হইয়া যেন ছট্‌ফট্ করিয়া ফিরিতেছি; আমার ব্যথা কে বুঝিবে?

কাঢ়ি কলেজো মৈঁ ধরূঁ রে
কৌৱা তূ লে জায়;
জ্যাঁ দেসাঁ ম্হাঁরো পিব্ব বসৈ রে—
ৱে দেখত, তূ খায়!

—ওরে কাক, এই আমার কলিজা উপাড়িয়া তোকে দিতেছি, তুই লইয়া যা! যে দেশে আমার বন্ধু আছে, সেইখানে গিয়া তুই ইহাকে খা—সে দেখুক! দেখি, তবুও যদি তাহার প্রাণে একটু বাজে!

ম্হাঁরে নাতো নাম কো রে,
ঔর্ ন নাতো কোয়;
মীরা ব্যাকুল বিরহনী রে—
পিয় দরসণ দীজ্যো মোয়!

—আমার বাঁধন শুধু নামের বাঁধন, আর কোনও বাঁধন তো নাই। ওগো বন্ধু, তোমার এই ব্যাকুলা বিরহিণী প্রিয়াকে একবার তুমি দেখা দাও!

ভাবি সখি আমার কপালের লিখন।—

মনে ছিল, না টুটব নেহা।
সুজনক পিরিতি পাষাণক রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব-গঠীত॥
পহিলহি পিয়া মোর মুখে মুখে হেরল
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম- পাশে তনু গাঁথল
অব তেজল মোর সঙ্গ!
সঙ্গিনী, হাম জিয়ব কথি লাগি!
যা বিনে তিল এক রহই ন পারিয়ে
সো ভেল পর অনুরাগী!
অঙ্গুলক আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি
হার ভেল অতি ভার—
মনমথ বাণহি অন্তর জরজর
সহই না পারিয়ে আর।

ভাবিয়াছিলাম, আমার এ ব্যথার কথা আর কাহাকেও জানাইব না। কিন্তু তোমার কাছে না বলিয়া তো পারিলাম না। সখি, তুমি আমার সকল বেদনার বেদনী, তাই তোমার কাছেই আমার মর্ম্মব্যথা ঢালিয়া দিলাম। তুমিই একবার বিচার করিয়া দেখ, এ জ্বালায় অহোরাত্র যে জ্বলিতেছে, তাহার—

সখি, আর কি কহিতে ডর!
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সে কেন বাসয়ে পর?
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি!
অন্তর বাহির যে জন জানয়ে
তাহারে পরাণ দি।
কানুর পিরিতি কহিতে শুনিতে
পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে!"

কিন্তু, না—তাহার উপর অভিমান করিয়াও এক তিল থাকিতে পারি না যে! কেন যে সে এমন করিয়া মরমে পীড়িয়া মারে তাহা জানি না, কিন্তু তাহার দেওয়া এই ব্যথা বুকে পুরিয়াও তো তাহার উপর রাগ করিতে পারি না। তোমরা আমায় কত শিখাইয়াছ-বুঝাইয়াছ, কিন্তু তাহার ওই "সাঁবরী সুরত, বালী বৈস্", ওই অমিয়-ছানা মুখখানি মনে পড়িতেই যে সব আউলাইয়া যায়!—এত জ্বলিয়া-পুড়িয়াও আমার প্রতীক্ষার অন্ত নাই সখি—

সখী মেরী নীঁদ নসানী হো!
পিয়া কো পন্থ নিহারতে
সব রৈন বিহানী হো!

—আমার চোখের ঘুম কোথায় পলাইয়াছে। বঁধুর পথপানে চাহিয়া চাহিয়া গোটা রাত কখন প্রভাত হইয়া যায়!

সখিয়ন মিল কে সীখ দঈ
মন এক ন মানী হো—
বিন দেখে কল না পরে,
জিয় ঐসী ঠানী হো।

—তোমরা সব সখী মিলিয়া আমাকে কত শিখাইলে-পড়াইলে, কিন্তু আমার মন কিছুই বুঝিতে চায় না। তাহাকে না দেখিয়া এ চিত্ত এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিতেছে না—এমনি বিষম ওর গোঁ!

অঙ্গ ছীন ব্যাকুল ভঈ,
মুখ পিয় পিয় বাণী হো—
অন্তর-বেদন বিরহ কী—
বহ পীর ন জানী হো।

—অঙ্গ ক্ষীণ, ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছি—মুখে কেবল পিয়া পিয়া বাণী; বিরহের এই অন্তর্বেদনা—এই ব্যথা—কে বুঝিবে বল!

জ্যোঁ চাতক ঘন কী রটে,
মছরী জিমি পানী হো—
মীরা ব্যাকুল বিরহনী
সুধ-বুধ বিসরানী হো!

—পিপাসী চাতক যেমন মেঘের দরুণ ফুকারিয়া মরে, মাছ ডাঙ্গায় পড়িলে যেমন জলের দরুণ ব্যাকুল হয়, তেমনি বিরহিণী মীরা আকুল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার শোধ-বোধ চলিয়া গিয়াছে।

বন্ধু, একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখ, কি হালে তুমি আমায় রাখিয়া গিয়াছ।—তুমি আমার সকল সুখ ঘুচাইয়াছ; নিঠুর, তবুও কি তোমার খেলা শেষ হইল না? আর কেন—আর কেন বন্ধু—এইবার একটী বারের তরে কাছে ডাকিয়া লইয়া হাসিয়া কথাটী কও—

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা,
অব মোহিঁ ক্যূঁ তরসায়ো!
বিরহ-বিথা লাগী উর-অন্দর,
সো তুমি আয় বুঝায়ো!

—তোমার দরুণ আমি সকল সুখ ছাড়িয়াছি

বন্ধু, এখন আর কেন আমার তৃষ্ণা বাড়াইতেছ! বুকের ভিতর জমিয়া আছে বিরহের ব্যথা—তুমি আসিয়া সে ব্যথা দূর না করিলে আর কে করিবে?

অব ছোড়্যাঁ নহিঁ বনৈ প্রভূজী
হঁস কর তুরত বুলারো।
মীরা দাসী জনম জনম কী—
অঙ্গ সূঁ অঙ্গ লগাবো।

—প্রভু, আর আমায় ছাড়িয়া গেলে চলিবে না. একটীবার হাসিয়া আমায় কাছে ডাকিয়া লও। জান না কি, মীরা তোমার জন্মজন্মান্তরের দাসী, তোমার অঙ্গসঙ্গের তিয়াসী, একবার অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া দাও—আমায় বুকে জড়াইয়া ধর!

ও কি বন্ধু, আসিতে আসিতে আবার থমকিয়া দাঁড়াইলে কেন? এতদিন পরে আসিতেছ, তাই কি এত লজ্জা—এত ভয়? ভয় কি বন্ধু!—আমার কাছে তোমার লজ্জাই বা কিসের! তোমার পানে চাহিয়া যে আমি আপনা ভুলিয়া যাই, গতদিনের ব্যথার কাহিনী কি আর মনে থাকে? ছিঃ বন্ধু, অমন করিয়া ওখানে দাঁড়াইয়া থাকিও না—

সাজনঘর আবো, মীঠা-বোলা!
কব কী খড়ী খড়ী পন্থ নিহারূঁ—
থাঁহীঁ আয়া—হোসী ভলা!

—ওগো মিঠা-বুলির বন্ধু আমার, এসো—এই যে তোমার জন্য ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছি। এতদিন যে কেন আস নাই, সে কথা আমায় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, তোমার মিষ্টিমুখের একটী সম্বোধন শুনিয়াই যে আমার অভিমান জল হইয়া গেল। উঃ, সেই কোন্ কাল হইতে তোমার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি!—আজ আপনা হইতে আসিয়াছ, ভালই হইল।

আরো নিসঙ্ক, সঙ্ক মত মানো—
আয়াঁহী সুখ রহেলা;
তন-মন বারর করূঁ ন্যোছারব
দীজ্যো স্যাম মোহিলা!

—এসো বন্ধু, ভয় করিও না, নিঃশঙ্কে আমার কাছে এস। তুমি যে আসিয়াছ, এই আমার কত সুখ! আমার তনু-মন সব তোমায় সঁপিয়া দিলাম, শ্যাম, তুমি আমার সব নাও—আমায় সব ভুলাইয়া দাও!

বন্ধু, তোমার অনুরাগে একদিন বিবাগী হইতে চাহিয়াছিলাম – ভাবিয়াছিলাম, ঘর ছাড়িয়া যোগিনী হইয়া দেশে দেশে তোমায় ঢুঁড়িয়া ফিরিব, কিন্তু আমার সে যোগিনী-বেশ হইত ভাণ মাত্র; প্রেমের আগুন যাহার বুকে জ্বলিতেছে, সে বৈরাগিণী হইবে কি করিয়া? – তবে আজ তোমাকে বলি বন্ধু, তুমি কিন্তু খাঁটী যোগী পুরুষ। যোগীর মত অন্তরটা না মারিয়া ফেলিতে পারিলে এত নিঠুর হইতে পারিতে কি? তাই তোমায় আর বন্ধু বলিয়া ডাকিব না, বলিব "যোগী!"—রাগ করিবে না ত বন্ধু? বাস্তবিক, কি নিঠুর তুমি! ভালবাসার বেদনা যে কি, তাহা বুঝি জান নাই কোন দিন, তাই অমন করিয়া কাঁদাইতে পার!—উদাসী বন্ধুর সাথে প্রেম করিয়া কি জ্বালাতেই না জ্বলিলাম! আজ তাই ভাবি—

জোগিয়া রী প্রীতড়ী হৈ
দুখ্ড়া রী মূল;
হিলমিল বাত বনাবত মীঠী
পীছে জাবত ভুল!

—উদাসী যোগীর প্রেমই যত দুঃখের মূল। কাছে আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া মিঠাইয়া মিঠাইয়া কথা বলিতে জানে বটে, কিন্তু চোখের আড়াল হইলেই সব ভুলিয়া যায়।

তোড়ত জেজ্ করত নহিঁ সজনী
জৈসে চপেলী কে ফূল ;
মীরা কহে প্রভু তুম্‌হরে দরস বিন
লগত হিরড়া মেঁ সূল !

—তোরাও তো দেখিয়াছিস্ সখি, কি করিয়া এই উদাসীরা প্রাণ কাড়িয়া নেয় ! নারীর হৃদয় যেন তাহাদের কাছে চামেলীর ফুল—আসিয়াই বোঁটা হইতে ছিঁড়িয়া নিতে ইহাদের আর তর সহে না। কিন্তু তারপর ?………প্রভু, এইটুকু কি বোঝ না, তুমি চোখের আড়াল হইয়া গেলে আমার বুকের মাঝে যে শেল বিঁধিয়া থাকে !

তাও না হয় সহিতাম। কিন্তু—

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জন
ইহা কি পরাণে সয় !
সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া !

এ জ্বালা কোন্ নারীর প্রাণে সয়, বল দেখি ! —কিন্তু সে কি আমার এ বেদনা বুঝিবে ?—

কে আছে বেথিত করে পরতীত
এ দুখ কহিব কারে ?
হয় দুখভাগী পাইয়ে তার লাগি
তবে সে কহিয়ে তারে।
চোরের মায়ে যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে,
কুলবতী হৈয়া পিরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে !

সাধে কি বলি, সখি—

কবহুঁ রসিক্ সনে দরশ হোয় জনি
দরশনে হয় জনি নেহ ;
নেহ বিছেদ জনি কাহুঁকে উপজয়
বিছেদে ধরয়ি যেন দেহ।
যবহুঁ দৈবদোষে উপজয়ে প্রেমহি
রসিক সনে জনি হোয় ;
কানু সে গোপত নেহ করি অব এক
সবহুঁ শিখায়ল মোয় !
হেন ঔখদ সখি কাঁহা নাহি পাইয়ে
জনু যৌবন জরি যায় ?

—রসিকের সঙ্গে যেন কখনও দেখা না হয় ; যদি বা দেখা হয়, তবু প্রণয় যেন হয় না। প্রণয় হইলেও যেন বিচ্ছেদ হয় না ; আর যদিই বা বিচ্ছেদ হয় তো তখন যেন আর এ দেহে না বাঁচিয়া থাকিতে হয়। যদি দৈবের দোষে প্রণয় হয় তো রসিকের সঙ্গে যেন না হয়। কানুর সঙ্গে একবার গোপনে প্রেম করিয়া এই সমস্তই আমার শিক্ষা হইল। আচ্ছা সখি, এমন ঔষধ কি কোথায়ও পাওয়া যায় না, যাহাতে নারীর এই যৌবন জ্বলিয়া যায় ?

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি, কিছু মনে করিও না বন্ধু ! আজ তোমাকে কাছে পাইয়া দুঃখ-সুখের সমুদ্র আমার বুকে উথলিয়া উঠিয়াছে—মনের কোনও কথাই আজ আর আগল দিয়া রাখিতে পারিতেছি না। যদিই বা মনের খেদে তোমায় কটু কথা বলিয়া থাকি তো সে কথা আজ আর ধরিও না বন্ধু। জানই তো, আমি আজ আর স্ববশে নাই !—

পিয়া ইতনী বিনতী সুণ মোরী
কোঈ কহিয়ো রে জায় ;
ঔরন্ সূঁ রস বতিয়াঁ করত হো--
হম সে রহে চিতচোরী ;
তুম বিন মেরে ঔর ন কোঈ—
মৈঁ সরণাগত তোরী !

—বন্ধু, আমার এই মিনতিটী শোন তুমি—দুটী কথা আজ তোমায় বলিব। অপরের সঙ্গে চলে তোমার রসের নাগরালী, আর আমার বেলায় শুধু চিত্তটী চুরী করিয়াই পলাইয়া যাও !—নারীর প্রাণ, অভিমান কি হয় না এতে ?—কিন্তু আমার মান-অভিমানও যে তোমাকে লইয়াই। অভিমান করিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে পারি কই ? তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নাই বন্ধু, আমি যে তোমারই দাসী !

এ কি—এ কি বন্ধু—কোথা যাও! আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিলে বন্ধু!—

জোগী, মৎ জা—মৎ জা—মৎ জা—
পায় পরূঁ—মৈঁ চেরী তেরী হোঁ;
প্রেম ভগতি কো পৈঁড়ো হী ন্যারো—
হম কূঁ গৈল বতা জা!
অগর চন্দন কী চিতা রচাউঁ,
অপণে হাথ জলা জা!
জল বল ভঈ ভস্ম কী ঢেরী—
অপনে অঙ্গ লগা জা!

—ওরে উদাসী বন্ধু—যেও না—যেও না—পায় পড়ি তোমার, আমি চেলা হইয়া তোমার সঙ্গে ফিরিব—অমন করিয়া আমায় ফেলিয়া যেও না! এ পীরিতির পথ যে কেমন, তাহা তো আমি জানি না—তুমি আমায় সে পথ চিনাইয়া দিয়া যাও বন্ধু! আর সঙ্গে যদি না নাও তো চন্দনকাঠের চিতা সাজাইতে বলি, তুমি আপন হাতে সে চিতা জ্বালাইয়া দিয়া যাও! আমি জলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই, সেই ছাই তুমি গায়ে মাখিয়া লইয়া যাও!

নাঃ—গেল সখি—তবু সে চলিয়া গেল!—

গেল গেল, সখি! হায় হায়, শ্যামকে ধরা ত গেল না!
ধরা গেল না—দুঃখ আর গেল না;
গেল না—গেল না—তবু প্রাণ তো গেল না!
বঁধু গেল উপেখিয়ে, প্রাণ র'ল আর কি দেখিয়ে,
কি হবে জীবন রাখিয়ে;—
মরি মরি সহচরি—কি করি তাই বল না—

(ক্রমশঃ)

মাতৃহারা

—):*:(—

তোমাদের মত আমি স্থূলে মাকে পাইনি, চোখে দেখিনি, কিন্তু পাইনি বলেই বুঝি মায়ের প্রতি আমার অমন প্রাণের টান! তোমরা যাই বল না কেন, আমি কিন্তু বেঁচে আছি আমার অদেখা-মায়ের স্নেহাশিষ নিয়েই। জানি না, মাকে শৈশবে হারিয়েছিলাম বলেই আজ আমায় সকলে অমন স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে কিনা; কিন্তু এ কথা ঠিক, মা যদি আড়াল থেকে আমার ওপর স্নেহ বর্ষণ না কর্‌তেন, তবে মাতৃহারা শিশুর প্রাণের নিদারুণ জ্বালা কিছুতেই জুড়াত না। সাধে কি আমি সকল ছেলের সঙ্গেই আনন্দে, গৌরবে বলি—আমারও মা আছে!

মাকে যে তোমাদের দেখাতে পারি না, এতেই আমার আনন্দ। ছোটবেলায় যখন অসহায় পেয়ে তোমরা আস্‌তে আমার ওপর অত্যাচার কর্‌তে, তখনই কেউ না কেউ এসে আমায় অভয় দিয়েছেই, আর তোমরাই তখন তিরস্কৃত হয়েছ; হয়ত তোমাদের আপন মা এসেই উল্টে তোমাদের তিরস্কার করেছেন, আর আমায় সান্ত্বনা দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন। তোমরা বুঝেছ কিনা জানি না, আমি কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি, এ আমার অদেখা-মায়েরই অতুলনীয় স্নেহ তোমাদের মায়ের অন্তরে ফুটে উঠেছে। ঈর্ষা করে আমি কারও স্নেহ কেড়ে আনতে যাই নি—তবু দেখছি আজ আমায় সবাই ভালবাসে!

সমবয়সীরা ঠাট্টা করে বল্‌ত, ওরে তোর মা যে কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে—তোর আবার মা এল

কোথা থেকে? আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেতাম, মা যেন আমার কাছে এসে স্নেহ-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আমি তো দেখছি তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও তফাৎ নাই, তবু যে তোমরা আমায় একটু আড়চোখে দেখ, এতে কিন্তু আমার প্রাণে বড়ই লাগে। আমার অন্তরের অনুভূতির চেয়ে তো তোমাদের মুখের কথাটাই বড় নয়?

দীনতা আমি কখনো স্বপ্নেও অনুভব করি না, বরঞ্চ ভিতরের দিকে যখন তাকাই, আপনাকে অসীম তেজে দৃপ্ত বলেই অনুভব করি; কেননা আমার জীবনের প্রত্যেকটী স্পন্দনের মূলেই যে দেখতে পাই অদৃশ্য-মায়ের অলঙ্ঘ্য মঙ্গল-সঙ্কেত। অশুভ কাজ কর্‌তে গেলে যেমন তোমাদের মা বকেন, শাসন করেন, তোমাদের ফিরিয়ে আনেন—আমিও দেখেছি প্রলোভনে পড়ে যখন চঞ্চল মন অকল্যাণের পথে গিয়েছে, তখনই কোনও-না কোন দিকের বাধা এসে আমায় সে দিক থেকে প্রত্যাবৃত্ত করেছেই করেছে! তবু কি বল্‌ব, আমার মা নাই? এত স্পষ্ট করে প্রতিনিয়ত যাঁর আভাস পাচ্ছি, কাজে-কর্ম্মে যাঁর মঙ্গল-হস্তের আশিষ বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর, তাঁকে আমি অস্বীকার করি কেমন করে? আমার হৃৎ-পিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে যে মায়ের নাম ধ্বনিত হচ্ছে, তবু কি আমি মাতৃ-হারা?

তোমাদের কথা না হয় মেনে নিলাম। আচ্ছা, তাহলে আমি প্রাণে বল পাই কোথা থেকে? জন্মাবধি যে দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তোমাদের মত সুখ-দুঃখ মনোবেদনার কথা জানাবার মত আমারও যদি অমন একটী জায়গা না থাক্‌ত, তাহলে আমি আজ তোমাদের সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে আনন্দে হেসে-খেলে দিন কাটাচ্ছি কেমন করে? তোমরা যখন নিষ্ঠুরের মত বল আমার মা নাই, তখন কিন্তু আমার অজানা-মায়ের মূর্ত্তি আরও বেশী করে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এমনি করে হাসি-তামাসার ছলে যতই আমায় ব্যথা দিয়েছ—মায়ের অনুভূতিতে আমার চিত্ত ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! আজ যে আমার আনন্দ এ ক্ষুদ্র আধারে ধর্‌ছে না—বাইরের মাকে ভিতরে পেয়েছি বলেই!

তোমরা বল্‌বে—এ কি পাগল হল নাকি? আমি কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা খুলে বল্‌ছি—পাগল হয়েছি বলেই, অন্তরের ব্যাকুলতা ঘনীভূত হয়েছে বলেই। তোমাদের মত আমিও মাকে একেবারে ধর্‌তে-ছুঁতেই পাই। সূক্ষ্ম তর্ক-যুক্তি দিয়ে আমার সরল মনকে একটু চঞ্চল করে তুল্‌তে পার—কিন্তু মাতৃভাব যে নিত্যসত্তা; আমার প্রাণ যখন আবার আকুল হবে, মাকে যে তখনই আমি কাছে দেখ্‌তে পাব!

জগতের সবাই বলে—যে গিয়েছে, তাকে কি আর কান্নায় পাওয়া যাবে? আমি কিন্তু তোমাদের নিঃসন্দেহে ভরসা দিতে পারি—চোখের জলের অনর্গল ধারায় যখন বাইরের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে আস্‌বে, তখনই দেখ্‌তে পাবে—যার নাড়ীর সঙ্গে তোমাদের অচ্ছেদ্য যোগ, সে তোমাদের ভিতরেই রয়েছে। জোর করে আমি কাউকে বিশ্বাস করাতে চাই না—কিন্তু আমার প্রাণ একদিন শীতল হয়েছিল এমনি করেই। জগতের সব একদিকে আর আমি এক দিকে—তবু এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌ব না যে, গিয়েছে-মাকে আর পাওয়া যায় না!

মনে পড়ে ছোটবেলায় "বিমাতা" প্লে দেখতে গিয়ে—বিজয়-বসন্তের বুকফাটা কান্না। কাঁদ্‌তে শিখেছি আমি তাদের কাছ থেকেই। বিজয়-বসন্তকে যখন হত্যা করার দরুণ মশানে নিয়ে যায় সেই সময়ের একটী কথা এখনও যেন আমার প্রাণে বিঁধে রয়েছে।—বিজয় বল্‌ছে—"ভাই রে, যার মা নাই, এ জগতে তার কেউ নাই!" এই একটী মাত্র কথায় জহ্লাদের প্রাণও গলে গিয়েছিল। আমার

কিন্তু সেদিন কান্না পেয়েছিল এই কথা মনে করে— নিষ্ঠুর জল্লাদের প্রাণেও কে করুণার ধারা ঢেলে দিল? খাঁড়া ফেলে জল্লাদ মশান ছেড়ে গেল কার প্রেরণায়? তাহলে নিশ্চয়ই রাজাজ্ঞার চেয়েও বড় কিছু রয়েছে?

অসহায়কে যে মা বেশী ভালবাসেন, তার অনুভব হয়েছে আমার সেদিনই; আর সেদিন থেকে আমার প্রাণে কত বল! এই যে শত্রুর হাত থেকে খাড়া পড়ে গেল, একজন চলেছে তোমার সর্ব্বনাশ করবে বলে, মাঝ-পথে এসে তার চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেল, কেউ ইচ্ছা করলেও যে পরের অনিষ্ট সাধন করতে পারে না—আমি তো বলি, এ সবই সন্তানের প্রতি মায়ের কল্যাণশক্তি বর্ষণের নিদর্শন। তবু অন্ধ অবিশ্বাসী লোক বলবে—মা তো নাই! অদ্ভুত কথা নয় কি?

আমি সেই মঙ্গলময়ী জননীরই সন্তান। তাঁর কল্যাণপ্রেরণার অনুভব হতে নিঃশেষে বঞ্চিত হব যেদিন, সেদিন স্বীকার করব—আমার মা নেই। কিন্তু এ কথাও বলি, মা ছাড়া, কল্যাণময়ী শক্তি ছাড়া এ জগৎ চলবেই বা কেমন করে? আমি কিন্তু যেখানেই কল্যাণ দেখি, সেখানেই মায়ের অস্তিত্ব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি। স্থূলের সংস্কার তো ছাড়তে পারি না, তাই সময়ে সময়ে অন্তরের আবেগ ঘনীভূত হয়ে মায়ের রূপ বাইরেও মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এ লুকোচুরী মায়ের সঙ্গে আমার চলছেই!

শরতের নির্ম্মুক্ত নীলাকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ দেখি—কেউ তোমার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ হাসিতে অমিয়ধারা ঢেলে দিচ্ছে কি না! আমি তো বলি—যেদিকে চেয়েই তোমার প্রাণ শান্ত-শীতল হয়ে আসে, সেদিকেই তুমি তোমার মায়ের সাড়া পাও। ফুলের হাসিতে, চাঁদের জ্যোৎস্নায়, আকাশের অনন্ত নীলিমায়—কে চেয়ে আছেন তোমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে? এর উত্তর দাও আগে আমায়—তার পর বলো—মা নাই!

শক্তি-কথা

——):*:(——

সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে সত্যের প্রতি অন্ধ করিয়া ফেলে। জগতে যতপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা আছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতার মত মানুষের চিত্তবিভ্রমকারী বস্তু অতি অল্পই আছে। স্বভাবতই ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাহিত, দুই-চারিজন রসবেত্তা ছাড়া তাহার অনুভব সর্বসাধারণে পায় না; কাজেই ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা রহস্যস্পৃষ্ট মনোভাব তাহাদের থাকা খুবই সম্ভব। এই রহস্য-বোধ হইতেই বিচারহীন নানা উদ্ভট সংস্কারের উদ্ভব হয়। এইগুলিই সাম্প্রদায়িকতার বীজ। ইহার সহিত যখন নাম-রূপের মোহ আসিয়া জোটে, তখন সংস্কার আরও দৃঢ়মূল হয়। রহস্যের সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাও তো মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিতে পারেন না; অথচ তাঁহাদের উপলব্ধি সকলের মাঝে সঞ্চারিত করিবার একটা অদম্য প্রেরণা তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকেন। তত্ত্বানুভবের অভিব্যক্তিতে এমনি করিয়া নাম-রূপের কল্পনা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভিতরের অর্থটী জানা থাকিলে এই নাম-রূপের কল্পনায় এমন একটী মধুর মোহের সৃষ্টি করে, যাহার আরতিকে প্রত্যাখ্যান করা বাস্তবিকই দুষ্কর। কিন্তু

অর্থ জানা না থাকিলে এই মোহই আবার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রহস্যনিবিড় যে মনোভাব কল্পনার মাঝে মুক্তি পাইয়াছিল, তাহাই আবার কল্পনার জালে বন্দী হইয়া সত্যের প্রতি অন্ধ হয়; শুধু বিচারহীন সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া মানুষ মানুষের রক্তপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ধর্ম্মের নামে জগতে এইরূপ ব্যাপার বহুবার ঘটিয়াছে—এমন কি ধর্ম্মবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী-স্বরূপ এই পরম আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষেও।

আমাদের দেশে শক্তিবাদ লইয়া এইরূপ মনোদ্বন্দ্ব বহুদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। অনুভবের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম, দার্শনিকের মনোবৃত্তি লইয়াও যদি শক্তিতত্ত্বের অনুশীলন চলিত, তাহা হইলে এ নিয়া এত বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হইত না। অহরহঃ 'শক্তি' কথাটা ব্যবহার করিতেছি, শক্তি-অশক্তি লইয়া বাদানুবাদ করিতেছি, 'আমার শক্তি' বলিয়া তাহাকে পরমাত্মীয় করিয়াও লইতেছি; আরও একটু উদারভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়া যদি বলি—জগতের সর্ব্বত্রই শক্তির খেলা, বিচ্ছিন্নরূপে অভিব্যক্ত এই শক্তিকে একটা সমষ্টিভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মহাশক্তির কল্পনাও কিছু অযৌক্তিক নহে—তাহা হইলে সে কথাটাও কেহ ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবে না। কিন্তু শক্তির এই অন্তরঙ্গ আস্বাদনকে স্থূলে প্রকটিত করিবার দরুণ যদি ইহার নাম দিই 'কালী' বা 'দুর্গা', যদি বলি 'ইনি শবাকারমহাকালহৃদয়োপরিসংস্থিতা', অথবা 'ইনি সিংহবাহিনী দশপ্রহরণধারিণী'—তবেই সর্ব্বনাশ! তখন দেখিব, ভাবুকতায় ভাবুকতায় গুঁতোগুঁতি লাগিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব এই শক্তিকে তখন ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিবেন, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী অবজ্ঞায় নাক সিঁটকাইবেন, প্রত্নতাত্ত্বিক আসিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন 'তাই ত হে, মূর্ত্তিটা নিতান্ত আধুনিক ঠেকিতেছে না কি? আচ্ছা, বেদের সময় যে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ দিতে পার কি?' তখন শক্তিবাদীও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিবেন না। ফলে সাধনার শান্তি-কুঞ্জে মেছো-হাটা সুরু হইয়া যাইবে এবং ইহার দরুণ কোনও পক্ষই নিজকে লজ্জিত অনুভব করিবেন না!

'Comparative Study' বলিয়া একটা জিনিষের আজকাল আমদানী হইয়াছে। নিরপেক্ষ অনুশীলন দ্বারা সত্য নিষ্কাশন করা ইহার লক্ষ্য; অতএব ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিরোধ অনেকটা প্রশমিত হইবে, পণ্ডিতেরা এরূপ আশা করিয়া থাকেন। জিনিষটা ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনও নেহাৎ কাঁচা। এখনো কেবল কঙ্কাল-সংগ্রহই চলিতেছে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, মূর্ত্তি-রচনাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পশ্চিম হইতে জিনিষটার আমদানী হইয়াছে, সঙ্গে যন্ত্রপাতির লটবহর নিতান্ত কম নয়, আয়োজন-আড়ম্বরেরও কিছু ত্রুটী নাই; কিন্তু তবু ইহার দৃষ্টি নিতান্তই স্থূলে আবদ্ধ। নিখিল মানব-মনের মূলে যে একই ভাবের ক্রিয়া হইতেছে, দেশ-কাল-সভ্যতার আপাতদুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সত্ত্বেও যে মহামানবের মন একই ছন্দে আন্দোলিত হইতেছে, এই অনুভবটী তথাকথিত Comparative Studyর লক্ষ্যস্থল হইলেও আজ ইহা কবির কল্পনা মাত্র—ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক মহলে ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া উপহসিত!

কিন্তু এই Comparative Studyর একটা অন্তঃপন্থাও রহিয়াছে; সে পথে পরিধি হইতে কেন্দ্রে যাত্রা নয়, কেন্দ্র হইতে পরিধিতে ছড়াইয়া পড়া।—আমারই হৃদয়ে যে কীলক রহিয়াছে, তাহা হইতে অগণিত ভাবধারা অরের আকারে পরিধিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আমি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তুল্যভাবে সকলের রসবেত্তা, যুগপৎ আমি বহু ভাবের ভাবুক। যিনি কেন্দ্রে থাকিয়া সব দেখিতেছেন, পরস্পর তুলনা করিয়া পরিধিস্থিত বস্তুসমূহের মর্য্যাদা নিরূপণ

তাঁহার দ্বারাই সম্ভব। যাঁহারা Comparative Study করিতে চাহেন, তাঁহাদের যদি এই অন্তর্দৃষ্টিটুকু না থাকে, তাহা হইলে সমস্তই পণ্ডশ্রমমাত্র হইবে—বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে। পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে যাঁহারা যাইতে চাহিতেছেন (আধুনিক Comparative Studyর ইহাই রীতি), তাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা জানা (known data) হইতে অজানার (unknown) দিকে যাইতেছেন, অতএব তাঁহাদের গবেষণায় ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কেননা তাঁহাদের dataগুলি সবই বাস্তব। জড়বিজ্ঞানের বেলায় কথাটা খুবই খাটে, কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানে শুধু এই একটী ধারা স্বীকার করিলেই চলে না। জড়দৃষ্টিতে যে কেন্দ্র অজ্ঞেয় (unknown), অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাহা তো অজ্ঞেয় নয়—অনির্ব্বচনীয় (inexpressible), জ্ঞেয় এবং জ্ঞাত হইয়াও অনির্ব্বচনীয়; বড়-জোর বলা যাইতে পারে, স্থূলসেবীদের কাছে উহা দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু অজ্ঞেয় কিছুতেই নয়। এই জন্য Comparative Study of Religionsএ আর একটা ধারা থাকা চাই; সেটা হইতেছে, কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে ছড়াইয়া পড়া, অনির্বচনীয় হইতে বচনীয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া।

আমাদের দেশে যে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটী ধারাই অনুসরণ করা হইয়াছে। জানা হইতে অজানার দিকে চলিয়াছেন সাংখ্যকার: আবার অনির্ব্বচনীয় হইতে বচনীয়ের দিকে নামিয়া আসিয়াছেন বৈদান্তিক। শক্তির পূজারী উভয়েই; কিন্তু ইঁহাদের যে কোনও একটী ধারাকে মাত্র স্বীকার করিলে আমাদের দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যাঁহারা পরমার্থরসিক, তাঁহারা এ কথা জানেন; তাই সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক শক্তিবিজ্ঞানকে তাঁহারা বেদান্তের সংশ্লেষণমূলক শক্তিলীলানুভব দ্বারা পূর্ণতর করিয়া নেন। আজকাল যে historic methodএর এত ছড়াছড়ি, তাহার মাঝে দেখি এই synthetic intuitionএর একান্ত অভাব। তাই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সময় সময় এমন আজগুবি কথা বলিয়া বসেন, যাহাতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্ মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারেন না। বাস্তবিক, জগতে কেউ বা দিবান্ধ, কেউ বা রাত্র্যান্ধ; অথচ যাহারা অন্ধ, তাহারাই আলোর ব্যাপারী, ইহাতে হাসি পায় না কি?

এই synthetic intuition জিনিষটা যে মোটেই উপেক্ষার বস্তু নয়, সে সম্বন্ধে California Universityর Proffessor Boodin Hibbert Journalএ একটা বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"......Life always turns out to be a venture of faith. The question is: Does the conviction illumine the world of which we are a part, does it enable us to live? One does not prove the existence of music or poetry or love to those that have the experience.......The quality of divinity is present everywhere to him who is qualified to experience it—as the quality of the artist is present in his work, as the quality of the soul is present in the behaviour of the organism. But the immediate experience of reality in any case needs to be informed, cultivated by intelligent analysis for us to enter consciously into its meaning. And this is a long and ardous process.......We may never in all the ages comprehend God, but the quality of God's life is present everywhere. The soul responds to its influence, as the plant turns to the sunlight and as flowers open to the morning dew."

যাঁহারা আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞানেও scientific analysisএর পক্ষপাতী, তাঁহারা এই কথাগুলিতে আর একটা দিক সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার বিষয় পাইবেন।

যে কথাটা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার ভূমিকাটা বোধ হয় একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু আধুনিক-শিক্ষিত পণ্ডিতেরা (বিশেষতঃ এ দেশী পণ্ডিতেরা) যে ভাবে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হন, তাহাতে মূলেই যদি তাঁহাদের দৃষ্টি অনুদার ও সংস্কারদুষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদেরও যেমন ক্ষতি, দেশেরও তেমনি ক্ষতি। এই মূল মনোবৃত্তিটা শোধরাইবার ইচ্ছাতেই আমাদের এতগুলি কথা বলা।

যাক্, যে কথা বলিতেছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শক্তিকে যদি দার্শনিক তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে তাহাকে অস্বীকার করিবার কোনও উপায়ই থাকে না। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব দিয়া মানুষের ভক্তির ক্ষুধা মিটে না। ভক্তি পূজার দরুণ মূর্ত্তি গড়িতে চায়। মূর্ত্তি রচনা হয় যার যার সংস্কার অনুযায়ী। তার পরেই সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত হয়। কিন্তু যে ভাবকে আমি মূর্ত্তি দিতে চাহিতেছি, তাহা যদি সার্ব্বভৌম হয়, তাহা হইলে যে-কোনও একটী বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে বা বিশিষ্ট পূজা-পদ্ধতিতে তাহাকে গণ্ডীবদ্ধ করা চলে না। আপাততঃ যত বৈষম্যই থাকুক না কেন, যাহার সত্যিকার চোখ ফুটিয়াছে, সে দেখে, সেই একই তত্ত্ব "ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব!"

শক্তির পূজা মূলতঃ বিস্ময়বিগলিত মানবহৃদয়ের আরতিতে। সে বিস্ময় সৃষ্টিতে, সে বিস্ময় প্রলয়ে, সে বিস্ময় জগতের এই বিচিত্র পরিণামে। অনাদি কাল হইতে মানুষ অনুভব করিয়াছে, তাহার চারিদিকে অনন্ত-অপার রহস্যের সমুদ্র; সে সমুদ্র সে মন্থন করিয়া তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। তাই ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সে রহস্যের সম্মুখে নিজকে নোয়াইয়া দিয়াছে, প্রাণের আবেগে স্ফুরিত কল্পনা দিয়া তাহার মূর্ত্তি গড়িয়াছে, কত না উপচারে তাহার পূজা করিয়াছে! যেখানে দেখিব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলে মানুষ এক অতীন্দ্রিয় সত্তার কল্পনা করিয়া ভয়ে-ভক্তিতে তাহার নিকট নত হইয়াছে, সেইখানেই তাহাকে বলিব শক্তির পূজারী। দেশে দেশে, যুগে যুগে ঈশ্বরের বিভিন্ন কল্পনা শক্তি-রহস্যকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা বই আর কি?

কিন্তু এই রহস্যকে মানুষ একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাহিরেও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ভাবকে বস্তুতে পরিণত করিবার প্রয়াস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; অতীন্দ্রিয় তথ্যকেও ইন্দ্রিয়রাজ্যের বিষয়ীভূত করিবার চেষ্টাতে যে ধর্ম্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের (rituals) উদ্ভব, ইহা আমাদের অবিদিত নহে। তাই দেখি, আদি-যুগ হইতে মানবের ঈশ্বরকল্পনার মাঝে মিথুন-ভাবের এত ছড়াছড়ি। অসভ্য, সুসভ্য সকল মানবজাতিরই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলে জগৎপিতা জগন্মাতার কল্পনা। সৃষ্টি-রহস্যই মানুষের মনকে সব চেয়ে বেশী দোলা দিয়াছে। অথচ এই রহস্য একেবারেই তাহার নাগালের বাহির, এ কথাও সে বলিতে পারে না; কেননা সৃষ্টিব্যাপারে—বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক—তাহারও কতকটা হাত রহিয়াছে। এই নিত্যদৃষ্ট মিথুন-জাত সৃষ্টি হইতে জগতের আদি-মিথুন কল্পনা অতি স্বাভাবিক। তবে কিনা সেখানে রহস্য আরও গাঢ়, আরও নিবিড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই আদি-মিথুন শুধু বিস্ময় উদ্রেক করে না, শ্রদ্ধার উন্মেষ করিয়া আমাদের পূজাও গ্রহণ করে।

এই মিথুন-কল্পনার অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন মিশরের আইসিস্ (Isis) ও ওসাইরিস্ (Osiris), ফিনিশিয়ার আশের (Asher) ও আস্তোরেথ (Astoreth), আসীরিয়ার অসুর (Assur) ও আস্তার্তে (Astarte), গ্রীসের ঈথার (Æther) ও হিমেরা (Hemera), জিউস্ (Zeus) ও হিরা (Hera), রোমের জুপিতর্ (Jupiter) ও জুনো (Juno), প্রাচীন পার-

সিকদের উর্বাণ (Urvan) ও ফ্রবিষির (Fravishi) কল্পনা ইত্যাদি সমস্তই সেই শক্তি আর শক্তিমানের প্রতিরূপ। এই আদি-মিথুনের রহস্যময়ী লীলাকে স্থূলে রূপ দিবার জন্য সেই অতীত যুগেও বিভিন্ন দেশে কত নিগূঢ়, দুর্ব্বোধ তান্ত্রিক আচারের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিতে গেলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। ভাবকে বাস্তবে ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া মানুষের ধর্ম্মবোধও যে কতদূর বীভৎস হইতে পারে, তাহার পরিচয় শুধু এই দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায়।

সৃষ্টিরহস্য বুঝিবার আকুলতায় যে মানুষ শক্তি-পূজার প্রবর্ত্তন করিবে, ইহাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নাই। এইভাবে দেখিতে গেলে জগতের সকল ধর্ম্মের মূলেই শক্তিপূজার বীজ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু শক্তিপূজার এই সার্ব্বভৌম প্রকাশ ছাড়া ইহার একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য্যও যে আছে, এবং তাহাও যে সমস্ত মানবেরই সাধারণ সম্পত্তি, ইতিহাস তাহারও প্রমাণ দেয়। শক্তিপূজার মূলে আমরা দুইটী বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করা; দ্বিতীয়তঃ, শক্তিকে বিধাত্রী ও মোক্ষদারূপে প্রচার করা। প্রথমটী মানুষের মাঝে যে anthropomorp ic instinct রহিয়াছে, তাহারই উদাহরণ।—মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষী কল্পনা দ্বারা আবিষ্ট; তাই অতীন্দ্রিয় সত্তাও তাহার কাছে গোড়াতে দেখা দেয়, মানুষেরই আকারে; আবার রসিকেরা বলিবেন, অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধে মানুষ দর্শন রচিয়া, তত্ত্ব ঘাঁটিয়াও শেষকালে দেখিবে, এত করিয়াও সে পুরাপুরি একটা মানুষের বেশী কিছু গড়িতে পারে নাই। কাজেই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে সকল মানুষের ঈশ্বরই যে মানুষরূপে কল্পিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাঁহাকে নারীরূপে কল্পনার মাঝে যে রহস্য নিহিত রহিয়াছে, শক্তিবাদের তাহাই বিশেষত্ব। এই রহস্যেরও দুইটা দিক আছে।

প্রথমতঃ সৃষ্টির বিকাশের দিক দিয়া, অথবা সাংখ্যকারের ভাষায় প্রকৃতির অধঃপরিণামের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা পাই প্রজননশক্তির প্রতীকরূপে নারীকে। বেদে মূর্ত্তির কল্পনা নাই, কিন্তু পৃথিবীকে আদিমাতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; 'বৃষভ' পর্জ্জন্যের রেতঃসেকে এই পৃথিবী কত বিচিত্র জীবনের ভ্রূণে প্রস্ফুরন্তী, সে বর্ণনায় বৈদিক ঋষি মুখরিত। ইউরেনাস্ (দ্যাবা) ও জিয়ার (পৃথিবী) অনাদ্যন্ত-মিলনে অগণিত প্রজোৎপত্তির কথা গ্রীক পুরাণেও আছে। মিশরের আইসিস্ দেবী চন্দ্র-রূপিণী; চন্দ্রের বৃদ্ধিতে নীলনদের জল বাড়িয়া ওঠে, পৃথিবী শস্যশালিনী হয়; অতএব দেবী আইসিস জীবধাত্রী। তাঁহার স্বামী ওসাইরিস্ বৃষভরূপী, প্রজনন-সামর্থ্যের অবতার (বেদেও 'বৃষভ' শব্দের মৌলিক অর্থ তাই); দেবী আইসিস্ তখন গাভী-রূপিণী। বাসন্তী বিষুবসংক্রান্তিতে যখন ধরায় নব-জীবনের সূচনা, তখন ওসাইরিস্‌দেবের পুনরুজ্জীবনে আইসিস্ ও ওসাইরিসের উৎসব। আসীরিয়ার আস্তার্ত্তেও প্রজননশক্তির প্রতীক; তাঁহার অপর নাম মাইলিত্তার (Mylitta) মৌলিক অর্থই তাই; বিশিষ্ট তিথিতে, বিশিষ্ট স্থানে নারীমাত্রেই আস্তার্ত্তের প্রতীকরূপে ভজনীয়। ফিনিসিয়ার আস্তোরেথও প্রজননশক্তি-রূপিণী; তাঁহার শরীরের নিম্নভাগ মৎস্যা-কৃতি; মৎসী একেবারে লক্ষ লক্ষ অণ্ড প্রসব করে বলিয়া প্রজননশক্তির প্রতীক (হিন্দুরও দশাবতারের গোড়ায় মৎস্যাবতার)। এইরূপে মানুষ যুগে যুগে সৃষ্টির মূলে নিহিত প্রজননশক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার পূজা করিয়া আসিয়াছে।

তান্ত্রিক বলিবেন, এই যে প্রজননশক্তির পূজা, ইহাই শক্তির ভুক্তিদা-রূপের পূজা। এই পূজায় মানুষ ভোগের পথে নামিয়া আসে। কিন্তু শক্তির তো শুধু এই একরূপ নয়; শক্তি যে মুক্তিদা ও। যে শক্তি আমাদিগকে নীচের দিকে টানিয়া

নামাইতেছে, সেই শক্তিই আবার উপরের দিকেও ঠেলিয়া তুলিতেছে। শক্তির এই মুক্তিদ রূপকে হিন্দু তান্ত্রিক দশমহাবিদ্যায় এবং বৈষ্ণব ব্রজাঙ্গনায় চিত্রিত করিয়াছে। এইখানেও দেখি, শক্তি নারী-রূপে কল্পিতা।

কিন্তু এই কল্পনার মূল আবিষ্কার করিতে একটু বেগ পাইতে হয়। নারীকে প্রজনন-শক্তির প্রতীক রূপে সহজেই গ্রহণ করা যায়; অতএব যাহারা সৃষ্টি-রহস্যের পূজারী, তাহারা যে মৌলিক সৃষ্টি-শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যে শক্তির বলে আমি সৃষ্টির নিম্নগা ধারাকে উজাইয়া জগৎরহস্যের আদি-প্রস্রবণে উপনীত হই, তাহাকে নারীরূপে কল্পনা করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে, এই জগতের বাস্তবিকা নারীর মাঝেও ঊর্দ্ধগা-প্রেরণার শক্তি নিহিত রহিয়াছে, এবং মানুষ আদিযুগেও ইহা অনুভব করিয়াছ। ভাবুক, কবি, দার্শনিকের পক্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া ইহাকে যাচাই করিতে গেলে নানা রকম আশঙ্কাই উপস্থিত হয়। তবুও এই কল্পনার মূল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

অপরাপর জাতির মাঝে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কতখানি প্রবল ছিল, তাহা আমরা জানি না; সুতরাং যে দেবীকে তাহারা ভুক্তিদাত্রী-রূপে পূজা করিয়াছে, তাঁহাকেই আবার মুক্তিদাত্রীরূপে পূজা করার প্রেরণা তাহাদের মাঝে ছিল কিনা বলা কঠিন। বিশেষতঃ ভুক্তিদার মাঝেই মুক্তিদার আবিষ্কার করিতে হইলে মরমী (mystic) হইতে হয়। অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের Mysticism সম্বন্ধে আমরা খুব কম সন্ধানই রাখি। কিন্তু তবুও যতটুকু জানা যায়, তাহাতেই দেখি, রহস্যতন্ত্র বা Mysticism শুধু আজকালকার লোকেরই সম্পত্তি নয়। মিশরের আইসিস্ দেবীর গর্ভগৃহে দীক্ষার্থীকে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে হইত, কিম্বা প্রাচীন গ্রীসের অর্ফিয়ুস-তন্ত্রে যে সমস্ত গুপ্ত অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহাদের মাঝে দেখিতে পাই, এই নারীবিগ্রহে প্রকটিতা শক্তি-রূপিণীকে কেন্দ্র করিয়াই আত্মশুদ্ধির একটা বিশিষ্ট সাধনা প্রচলিত ছিল। কালে এই সমস্ত সাধনায় নানা কলুষ ঢুকিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু যে প্রজ্ঞার প্রকাশে তান্ত্রিক নারীর মাঝে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়েরই সমন্বয় দেখিতে পায়, সে প্রজ্ঞা যে আদিমানবের চিত্তেও উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। ইহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

মিশরীয় তন্ত্রে এক দেবীর সাক্ষাৎ পাই—ইঁহার নাম, 'মা' বা 'মা-আত্।'* ইনি সত্যস্বরূপিণী ঊর্দ্ধ ও অধোলোকের দেবতাদিগের অধিনেত্রী। মানুষ মরিলে পর তাহার আত্মাকে ইনিই সত্যের মন্দিরে লইয়া যান। সেখানে তাহার পাপ-পুণ্যের বিচার হয়। সত্যের দেবী 'মা'-ই এই বিচারের সাক্ষি-স্বরূপিণী। 'মা'র সম্মুখে নতজানু হইয়া মানবাত্মা যে ভাষায় তাহার আত্মকাহিনী নিবেদন করে, তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী।

ইঁহারই অনুরূপ আর একটী দেবীর সাক্ষাৎ পাই প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে। ইঁহাকে দেবী না বলিয়া তত্ত্ব বলিলেই ভাল হয়, কেননা ইনি অমূর্ত্ত। তথাপি জারাথুস্ত্র-ধর্ম্মে ইনি নারীরূপেই কল্পিত। ইঁহার নাম 'ফ্রবিষি।' শক্তিরূপিণী 'ফ্রবিষি' মানবাত্মার চিরসহচরী। পারসিকধর্ম্মে আত্মার নাম 'উর্ব্বাণ।' 'উর্ব্বাণ' যেন নির্ব্বিশেষ; কিন্তু 'ফ্রবিষি' তাঁহার বিশেষ-বিধায়িকা শক্তি। এই 'ফ্রবিষি'র প্রেরণাতেই 'উর্ব্বাণ' সৎকর্ম্ম দ্বারা অন্ধকারকে (অংগ্র্ মৈন্যুষ) পরাভূত করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিয়া থাকেন। 'ফ্রবিষি' 'অহুর

* নামের সাদৃশ্যটা বিস্ময়কর; শেষের নামটিতে বেদান্তের 'মায়া'র কথা মনে পড়ে। গ্রীক-পুরাণেও এক 'মায়া'দেবী আছেন, তিনি হার্মিসের জননী। হার্ম্মিস্ কোথায়ও কোথায়ও লিঙ্গরূপে পুজিত হইতেন। হার্ম্মিস্ ও আফ্রোডাইটের যুগল মূর্ত্তি গ্রীকপুরাণের অর্দ্ধনারীশ্বর।

মজ্‌দার (জ্যোতির্ম্ময় তত্ত্ব) এই সুন্দর সৃষ্টির পালয়িত্রী। 'উর্ব্বাণ'কে প্রতি পদে পদে তিনি ন্যায়ের পথে কল্যাণের পথে প্রচোদিত করিয়া থাকেন। 'উর্ব্বাণে'র সৃষ্টির পূর্ব্বেও 'ফ্রবিষি' বিদ্যমানা ছিলেন। 'ফ্রবিষি' প্রত্যেক ঘটে ঘটে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে অনুপ্রবিষ্টা। পরবর্ত্তী কালে এই 'উর্ব্বাণ' ও 'ফ্রবিষি' অভেদাত্মকরূপে মিলিত হইয়া মানবাত্মারূপে কল্পিত হইতেন।

প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই 'উর্ব্বাণ-ফ্রবিষি'র কাহিনী কিন্তু বেদের 'পুরূরবা-উর্ব্বশী'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে ধ্বনির সাদৃশ্যও আশ্চর্য্য। উর্ব্বশী-পুরূরবার কাহিনী কালিদাস তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশীয়' নাটকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ইহা একটা Solar myth : উর্ব্বশী ঊষা আর পুরূরবা সূর্য্য ; উর্ব্বশী আর পুরূরবার ছাড়াছাড়ি সূর্য্য আর ঊষার ছাড়াছাড়ি। বৈদিক দেবতার যে নৈসর্গিক ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা বেদের প্রাচীনতম ভাষ্যকার যাস্ক স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা কথা তিনি বলিয়াছেন, যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে চাহেন না। যাস্ক বলেন, অধ্যাত্মপক্ষেও বেদ-বচনের ব্যাখ্যা হইতে পারে। কথাটা যে মনগড়া নয়, তাহার প্রমাণ অনেক আছে। ভিতরের অনেক ব্যাপার বাহিরের ব্যাপারের সঙ্গে এমন খাপ খাওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সহজে বুঝিবার সাধ্য নাই ; কিন্তু একটু সঙ্কেত ধরাইয়া দিলে অর্থ আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে। এই উর্ব্বশী পুরূরবা-সংবাদটী তাহার একটী উদাহরণ।

এই কাহিনীটী বুঝিতে হইলে ইহার সঙ্গে ঋগ্বেদের আর একটী কাহিনী 'যম-যমী-সংবাদ'ও পড়িতে হইবে। দুইটী কাহিনীই যেন এক সত্যেরই এপিঠ আর ওপিঠ। পণ্ডিতেরা যম-যমীর কাহিনীকেও Solar myth বলেন : যম-যমী অর্থে দিবা ও রাত্রি। আমাদের ইহাতে আপত্তি নাই, বরং ইহাতে বুঝিবার সুবিধাই হইবে।

উর্ব্বশী আর পুরূরবার কাহিনীটী এইরূপ।—পুরূরবা মর্ত্ত্যের মানুষ হইয়াও দেবতার মেয়ে উর্ব্বশীকে প্রণয়ে বশীভূতা করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী দেবলোক হইতে নামিয়া আসিলেন মর্ত্ত্যে। বহুদিন দুজনার সুখেই কাটিয়া গেল। শেষে পুরূরবার কি একটা ত্রুটী পাইয়া উর্ব্বশী আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন। পুরূরবা অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়াও তাঁহাকে রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু উর্ব্বশী আশ্বাস দিয়া গেলেন, পুরূরবা মৃত্যুজয়ী হইয়া আবার স্বর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, আপাততঃ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার গর্ভসঞ্জাত পুত্রটীকে তাঁহার কাছে রাখিয়া গেলেন।

যম-যমীর কাহিনীটী এইরূপ।—যম আর যমী ভাই আর বোন। সমুদ্রের মাঝে এক নির্জ্জন দ্বীপে গিয়া যমী যমের সঙ্গ প্রার্থনা করেন, বলেন, গর্ভকাল অবধি তুমি আমার সহচর, অতএব আমরা বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মত। যম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানপূর্বক বলেন, আমার কাছে এমন কথা বলিও না ; দেবতার চরেরা সব দেখিতেছে, এ পাপ গোপন থাকিবে না ; আর আমার ইহাতে প্রবৃত্তিও নাই ; সুতরাং তুমি অপরের কাছে যাও। এই বলিয়া যম যমীকে ছাড়িয়া গেলেন।

এই দুইটী কাহিনীকে Solar myth রূপে গ্রহণ করিয়া যে ব্যাখ্যা করা চলে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; এবং সে ব্যাখ্যাতে আমাদের কোনও আপত্তিও নাই। কিন্তু কথা এই, ইহাতেও ভিতরের তাৎপর্য্যটা ধরা পড়ে না। Solar mythএর তুলনায় এই কাহিনী দুটী যেমন রূপক, তেমনি ভিতরের কথাটার তুলনায় Solar mythটাও রূপক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মকে প্রকৃতি-পূজা বলিয়া রায় দিয়াছেন বটে ; কিন্তু এই প্রকৃতি সব জায়গায় বহিঃপ্রকৃতিই নয়। বেদসূক্তে কত জায়গায় বহিঃপ্রকৃতি এমনি করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে যে, ঋষি আধ-আলো আধ-ছায়া ভাষায় কোন্‌টার কথা যে বলিতেছেন, তাহা ঠাহর করা কঠিন। বিশেষতঃ যেখানে আলো আর ছায়ার কথা উঠিয়াছে, সেখানে সে আলো-ছায়া বাহিরের না ভিতরের, বলা বড় শক্ত। এই আলো-ছায়ার রূপকগুলির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে গেলে শুধু বেদের সংহিতাভাগে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের ভাবধারার সহিতও তাহা মিলাইয়া দেখিতে হইবে। যাজ্ঞিকদের তরফ হইতে যে বেদের একটা ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল, যাস্ক তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আবার এই যজ্ঞ-ব্যাপারটার যে আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ ছিল, ব্রাহ্মণ আর উপনিষৎ তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং বেদের রূপকগুলির আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণতি তেমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়।

এই দুইটী কাহিনীর তাৎপর্য্য আমরা প্রকৃতি-পুরুষের লীলারূপে বুঝিয়াছি।—ভয় নাই, সাংখ্যকারের নামটা টানিয়া আনিয়া anachronismএর দায় ঘাড়ে লইব না। আমরা বলি, সাংখ্যের ওই রূপকেরও বীজ এইখানে। পুরূরবা চিরক্রন্দনশীল মানবাত্মা—নামটার অর্থই তাই।* উর্ব্বশী যদি বাহিরে উষা হন তো অন্তরে তিনি যে কে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরকাল ওই উপরের আলোর পানে চাহিয়া চাহিয়া মানবাত্মা কাঁদিয়া ফিরিতেছে ; ক্ষণেকের তরে তাহাকে পাইয়া হারাইয়াছে, তাই শুধু স্মৃতির বেদনা বুকে লইয়া তার অমন করিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরা। যাঁহারা একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই উষার আবির্ভাব অধ্যাত্মরাজ্যের একটা নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনা ; অনন্তবিথারী (উর্ব্বশী)* অরুণবরুণা উষা বাস্তবিকই চকিতের তরে দেখা দিয়া পুরূরবার মাঝে চির-আকুলতা জাগাইয়া দিয়া যায়। পতঞ্জলি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবেন, এই উর্বশী, এই উষাই মানবের প্রতিভা (যোগসূত্র ৩।৩৩ ও তাহার ভাষ্য)।

উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীতে দেখি, মানুষ ছুটিয়াছে জীবনের পানে, আলোর পানে ; আবার যম-যমীর কাহিনীতে দেখি, মানুষ অন্ধকার হইতে, মরণ হইতে বিবিক্ত হইতেছে—আত্মশক্তির বলে। বেদান্তের ভাষায় বলিতে পারি, উর্বশী বিদ্যারূপিণী, আর যমী অবিদ্যারূপিণী—মানুষ "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতম্ অশ্নুতে।" উর্বশী শুদ্ধ-সত্ত্বা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতি ; যমী মৃত্যুসংসাররূপিণী অন্ধপ্রকৃতি। পুরূরবা সাধক, যম সিদ্ধ ; পুরূরবা সাধকহৃদয়ের চিরন্তনী ব্যাকুলতা, যম সিদ্ধ-হৃদয়ের সংযমশক্তি ; পুরূরবা মৃত্যুর মাঝে থাকিয়াও, মর্ত্ত্য হইয়াও হাত বাড়াইতেছে অমৃতের পানে, আর যম সংসারের উর্দ্ধে, মৃত্যুলোকের অধিপতি, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর। কঠোপনিষদে এই যমকে আবার দেখিতে পাই—মৃত্যুলোকে প্রথম মানুষ-অতিথি, সত্যের নির্ভীক সন্ধানী নচিকেতার গুরুরূপে ; সেখানে নচিকেতাকে যম বলিতেছেন—

জানাম্যহং শেবধিরনিত্যং,
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ;
ততো ময়া নচিকেতশ্চিতোঽগ্নি—
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্।

* "পুরূরবা বহুধা রোরূয়তে" (যাস্ক)। রিজ্জায়তে হি—"প্রাণ এব হি পুরূরবা" ইতি (দুর্গাচার্য্য)।
—নিরুক্ত ১০, ৪৭, ১

* "উর্ব্বশ্যপ্সরা উরু অশ্নুতে, ঊরুভ্যামশ্নুত, উরুর্বা বশোঽস্যাঃ।"—নিরুক্ত ৫, ১৩, ১। প্রথম ব্যাখ্যাটাই সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

—জানি আমি, ধন-সম্পদ্ অনিত্য; সেই ধ্রুব সত্যকে অধ্রুব উপকরণ দিয়া পাওয়া যায় না। তাই, নচিকেতা, আমি অগ্নিচয়ন করিয়া অনিত্য-দ্রব্যের উৎসর্গ দ্বারা নিত্যকে পাইয়াছি।

এই যমই মানুষের কাছে আত্মজ্ঞানের আদি-প্রবক্তা; তিনিই প্রথম মানুষকে মূৰ্দ্ধণ্য সুষুম্না নাড়ী চিনাইয়া দিয়া বলেন, এই পথে যাও, মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবে।

এই তো গেল যমের বৈদিক পরিচয়। পরবর্ত্তী-যুগে পুরাণকার কল্পনা করিয়াছেন, সত্যস্বরূপ আদিত্যের দুর্দ্দর্শ তেজ ধারণা করিতে না পারিয়া সংজ্ঞার যে সঙ্কোচ, সেই সঙ্কোচকে আশ্রয় করিয়া আদিত্য-বীর্য্যে যমের উৎপত্তি। এখানে আর ইহার বিস্তার করিব না; ভাবুক ইহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। মোট কথা, আত্মার সংযমশক্তি, সাধন-শক্তিই যম, ইহা সুস্পষ্ট।*

যমের ভগিনী যমীকে আমরা পরে পাই যমুনারূপে। এই যমুনা মৃত্যুস্রোতরূপে সংসারে প্রবাহিতা। যমুনার পাশেই আবার গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে; উর্ব্বশী আর গঙ্গা দুই-ই নারায়ণের আত্মজা, এই কথাটী মনে রাখিবেন। যোগী বলেন, মানুষের ইড়া আর পিঙ্গলাও গঙ্গা-যমুনা; ইড়া গঙ্গা, বামে; পিঙ্গলা যমুনা, দক্ষিণে; ইড়া চন্দ্ররূপিণী, সুধাস্রাবিণী†; পিঙ্গলা সূর্য্যরূপে (যমুনাও সূর্য্যপুত্রী) রুদ্ররূপে মরণবিধাত্রী। সহজ-সাধক পুনঃ পুনঃ বারণ করিতেছেন, সাবধান, দক্ষিণে যেন যাইও না, ও পথে মরণ। আশ্চর্য্য এই, আদিত্যের পানে যদি মুখ করিয়া দাঁড়াই তো আমাদের নদীরূপিণী যমুনাও থাকে দক্ষিণে, গঙ্গা বামে। যম দক্ষিণদিকের অধিপতি, পুরাণকারেরও ইহা অভিমত। উপনিষদ্ বলেন, দক্ষিণায়নের পথ পিতৃযান, মৃত্যুর সরণি, ধূমাবৃত কৃষ্ণপথ, সংসারাবর্ত্তনের পথ (যমুনাও তাই কালো); উত্তরায়ণের পথ দেবযান, জ্যোতির পথ, অমৃতের পথ, এ পথে গেলে আর ফিরিতে হয় না (স্মরণ করুণ, উষা, উর্ব্বশী এরা জ্যোতির্ম্ময়ী; কালো যমুনার পাশেই গঙ্গার শুভ্র-ধারা; এই গঙ্গা কাশীতে উত্তরবাহিনী বলিয়াই কাশী বিশ্বেশ্বরের মুক্তিক্ষেত্র)।

প্রেমিক বৈষ্ণব কিন্তু এই যমুনার তীরেই তাঁহার বৃন্দাবন স্থাপন করিয়াছেন; ইহাই বৈষ্ণবদর্শনের Realism। কিন্তু এখানেও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতেছে। নদীর স্রোত কেহ নিবারণ করিতে পারে না; কিন্তু রসরাজ তাহা করিয়াছেন। জোর-জবরদস্তি করিয়া নয়, বাঁশীর সুরে তিনি যমুনার স্রোতকে উজান বহাইয়াছেন। তাঁহার অভিন্নস্বরূপ বলরামও তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সে ব্যাপারে বলপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল। আত্মা-রামের স্বরূপ-শক্তিতে আর বল-রামের যোগলব্ধ-শক্তিতে এই তফাৎ!

যম-যমীর তত্ত্বটা পুরাণে কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, এখানে তাহারই একটু আভাস দিলাম। পাঠক দেখিবেন, তথাকথিত scientific method ছাড়াও বেদ বুঝিবার আর একটা method আছে। বেদ বুঝিতে হইলে কেবল philology আর comparative mythologyর দোহাই পাড়িলেই হয় না; মনে রাখিতে হইবে, এই বেদ বুঝিবার চেষ্টাতেই হিন্দুর তন্ত্র-পুরাণের সৃষ্টি, যোগপথের উদ্ভাবন। বেদের interpretation শুধু পুঁথিতে লেখা নয়, উহা সাধন-লভ্য সম্পদও বটে।

এই উর্ব্বশী-পুরূরবা আর যম-যমীর কাহিনী

---

* "যমো যচ্ছতীতি সতঃ। অগ্নিরপি যম উচ্যতে" (নিরুক্ত ১০, ২২, ১)। শেষের কথাটী প্রণিধানযোগ্য।

† বেদে আছে, উর্ব্বশীর নায়ক পুরূরবা 'ঐল' বা ইলার পুত্র। ইলা আর ইড়া এক কথা। পুরূরবার বংশ চন্দ্রবংশ নামে খ্যাত। উর্ব্বশী, গঙ্গা, সোম, অমৃত সমস্তই যে একই তত্ত্ব, ইহা সুস্পষ্ট।

আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি, বৈদিক-ধর্ম্মে শক্তি-সাধনা ছিল কিনা। একই কন্দ-সম্ভূত পারসীক ধর্ম্মের সহিত এই সাধন-রূপকের সাদৃশ্যটীও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিশেষতঃ আলো-ছায়ার রূপকটী তো পারসীক ধর্ম্মের বীজস্বরূপ।

এই সমস্ত প্রসঙ্গ হইতে মোটের ওপর আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম, আদিযুগের মানবও শক্তিকে আত্মার ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণারূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই ঊর্দ্ধ-পরিণামিনী মোক্ষদাত্রী শক্তিকে সে নারীরূপেই কল্পনা করিয়াছে। ভোগদাত্রী সৃষ্টি-বিধাত্রী শক্তিকে নারী কল্পনা করা সহজ, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু শক্তির মোক্ষদরূপ যে নারীরই রূপ, আদি-মানবের মনে এই প্রতিভার স্ফূরণ কি করিয়া হইল, তাহার নিদান খুঁজিয়া বাহির করা বা পাথুরে প্রমাণ আবিষ্কার করা কঠিন। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করেন যে, এই স্ত্রী-পুরুষের কল্পনাটা ব্যাকরণের দৌলতে দর্শনের মাঝে ঢুকিয়া গিয়াছে। দ্যৌঃ, সবিতা, আত্মা, পুরুষ—এই সমস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ; আবার পৃথিবী, ঊষা, শক্তি, প্রকৃতি—এইগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; আবেস্তাতেও 'উর্বণ' (আত্মা) পুংলিঙ্গ শব্দ; 'ফ্রবিষি' (চিৎশক্তি) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। এই শব্দ-মহিমা-বশতঃ স্ত্রী পুরুষ কল্পনার উদ্ভব। কিন্তু এ যুক্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ রহিয়াছে। ওই সমস্ত শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু বুঝাইতে গিয়া আদপেই বা কেন এমন বাছিয়া বাছিয়া স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের আরোপ করা হইল, তাহা তো বোঝা গেল না। দেখিতেছি, শব্দটা উপলক্ষ্য মাত্র; আসল কথা হইল মনোভাব লইয়া। কেন একটা তত্ত্ব মনে পৌরুষের ভাব জাগাইয়া দেয়, এবং কেনই বা আর একটা নারীর ভাব জাগায়, সে তথ্য না বুঝিতে পারিলে শুধু বৈয়াকরণের শব্দ-বিচারে তো এ রহস্যের মীমাংসা হইবে না। Philologistরা ইহা লইয়া যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছেন, কিন্তু নিতান্ত শাব্দিক Philologistও লিঙ্গারোপে personificationর মৌলিক প্রভাব স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। যদি personificationএর প্রভাবই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিষয়টা ভাষাতত্ত্বের এলাকা হইতে আবার মনস্তত্ত্বের এলাকায় আসিয়া পড়ে।

ব্যাপারটা যখন মনোরাজ্যে নামিয়া আসে, তখন আর এ রহস্যের সমাধান বাহিরে না খুঁজিয়া মনের ভিতরই খোঁজা ভাল। সে ভার আপাততঃ রসিক মহাজনদের হাতে সঁপিয়া দিয়া আমরা মনোরাজ্যের বাহিরে দাঁড়াইয়াই আরও দুইটা কথা বলিয়া লই।

জীবনরহস্যের সমস্ত সমাধানের বীজ যে মিথুন-কল্পনায় নিহিত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। উর্ব্বশী-পুরূরবা ও যম-যমীর কাহিনীতে ইহার প্রকট রূপ দেখিতে পাইলাম। ইহার পরেও বাস্তবজগতের রহস্য-সমাধানে মিথুন-কল্পনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে, ইহা ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে আমরা যত্র-তত্র দেখিতে পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, চির-বিরহী পুরূরবার ইষ্টরূপিণী উর্ব্বশীকে সে রূপে আমরা আর ইহার পর দেখিতে পাই না। এক কেন-উপনিষদে দেখি, মোক্ষদা শক্তি আবার নারীমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, বহুশোভমানা হৈমবতী উমারূপে। ব্রাহ্মণাদিতে গায়ত্রীর কথা আছে বটে; তিনিও আরাধনীয়া, কিন্তু সাধকের সহিত তাঁহার সম্পর্কটা কিছু অস্পষ্ট, তাঁহার রূপ তেমন করিয়া যেন প্রাণ মাতায় না। শক্তিসাধনাই যদি মানুষের সকল আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক প্রচেষ্টার তাৎপর্য্য হয় এবং শক্তিমূর্ত্তিতে নারীত্বের আরোপ করা যদি মানব-প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে শক্তির এই রসরূপের অভাবটা যেন চোখে কেমন কেমন ঠেকে।

কিন্তু উপনিষদের যুগেও শক্তিসাধনা, রসের সাধনা লুপ্ত হয় নাই। নির্ঝরিণীর ধারা চলিতে

চলিতে যেমন পাহাড়ের ফাটলে অদৃশ্য হইয়া গিয়া আবার হঠাৎ এক জায়গায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ভারতের শক্তিসাধনারও তাহাই হইয়াছে। সংহিতাতে শক্তির যে রসরূপ দেখিতে পাই, তাহা একটা জাতির সহজ জীবনেরই প্রকাশ। ইহার পরবর্ত্তী যুগ সাধনার যুগ, আত্মসমাহিত তপস্যার যুগ। এই সময় সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ আত্মধ্যানে কাটাইয়া দিয়াছে।

এই তপস্যারও প্রয়োজন ছিল। মর্ত্ত্যভূমিতে থাকিয়া সহজ জীবনকে একান্ত সহজ করিয়া তুলিলে বিকার অবশ্যম্ভাবী; পুরুষকে তখন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইতেই হয়, প্রকৃতির রূপান্তর তখন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই জন্য পুরূরবা সোজাসুজি উর্ব্বশীকে পাইয়াও পাইলেন না; সতীকে বুকে পাইয়াও শিব আবার তাহাকে হারাইলেন। সংহিতার যুগের সহজানন্দের উচ্ছলতার পরেই ভারতবর্ষে অধ্যাত্মরাজ্যে এমনি একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ভারত তখন আর স্রোতে ভাসিতে চাহিল না—সে চাহিল নিজকে জানিতে, জগৎকে জানিতে, সত্যকে জানিতে। উপনিষদের সাধনায় দেখি এই জানার ব্যাকুলতা; এ যেন সতীহারা শিব অন্তরাবৃত্তচক্ষু হইয়া আত্মানুসন্ধানে নিশ্চল, সমাহিত! ঘর-সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতেছে, নারী সেখানে কল্যাণী, গৃহদীপ্তিস্বরূপা; যাগযজ্ঞের বিচ্ছেদ ঘটে নাই, নারী সেখানে পুরুষের সহধর্ম্মিণী; কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষ যেন নিঃসঙ্গ, বিবিক্ত, স্তব্ধ। এই আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টাতেই পুরুষ যেন শক্তি হইতে নারী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিয়াছে। একটা সূক্ষ্ম বিতৃষ্ণার বীজ এইখানে উপ্ত হয়; পরবর্ত্তী যুগে ইহা কিরূপ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত কিরূপে ইহার জের চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আমাদের অবিদিত নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিবেক, এই বিরাগ নিরর্থক নয়। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাও প্রকৃতিরই প্রয়োজন। ইহা শক্তিকে অস্বীকার করা নয়, তাহাকে আরও নিবিড় ভাবে আয়ত্ত করিবার এক অভিনব পন্থা, সতী-বাসনার পূর্ণতর আপ্যায়ন। ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানে শক্তি নিরাকৃত হয় নাই, সেখানে দেখা দিয়াছে তাহার শান্ত রূপ। বাহিরের উর্ব্বশী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পুরূরবার অন্তর সে আলোকিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সতীহারা শিবের অন্তরে সতী ফুটিয়া উঠিয়াছে নিস্তরঙ্গ সমাধি-শক্তিরূপে; বাহিরে সতী নাই, কিন্তু সতী যে শিবের অন্তর জুড়িয়া। এই আত্মসমাহিত মহাযোগীর সম্মুখে গৌরী স্তিমিতা, সাধ্বসকম্পিতা, কিন্তু অনন্ত-প্রেমময়ী। পুরুষ সন্ন্যাসী, আর নারী পতিব্রতা—এই দুইটী তত্ত্বকে মিলাইয়া তখন গৃহস্থালীর পত্তন হইল। আজও সেই আদর্শ ভারতবর্ষকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

ঔপনিষদ ধর্ম্মে শক্তিসাধনার আন্তর রূপ প্রকটিত হইতে দেখি। শক্তি সেখানে রসালসা নয়, বীর্য্যময়ী। মূর্ত্তির বিলাস সেখানে নাই, কিন্তু অমূর্ত্তের গম্ভীর দ্যোতনা আছে। ঔপনিষদ ধর্ম্মের দুইটী বড় দান—প্রাণ এবং আনন্দ। উপনিষদের সর্বত্র এই প্রাণ আর আনন্দের জয়গান। ইহাই শক্তির অন্তরঙ্গ রূপ। প্রাণের উপাসনা আর আনন্দের উপাসনা শক্তিরই উপাসনা; তবে কি না এ উপাসনায় মূর্ত্তি নাই।

এই বিবিক্ত সাধনার চরম পুরস্কার লীলানন্দ। সেই সহজের যুগই আবার ফিরিয়া আসিল, কিন্তু এবার সে আসিল অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপে। ইহাই বৃন্দাবনের লীলা, স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব সেখানে। গীতায় সাধনার শেষ, ভাগবতে সিদ্ধির সূচনা। প্রকৃতি আবার রসময়ী মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের যুগ হইতে মোক্ষদারূপিণী শক্তি আবার

নারীরূপে পুরুষের আরাধনীয়া হইয়া দেখা দিল। বৈষ্ণবেরা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম বেদ বিধির পার; ঠিক কথা। ইহা বেদের প্রতি অবজ্ঞা নয়; ভাগবত-ধর্মে বেদের পরিপূর্ণতা, বেদান্তের প্রোজ্জ্বলতম প্রকাশ। তান্ত্রিক বলেন, যোগে ভোগ নাই, ভোগে যোগ নাই, কিন্তু আমার দর্শনে যোগ-ভোগের সমন্বয়; এ-ও ঠিক কথা। ইহাও যোগের প্রতি, নিরোধের প্রতি অবজ্ঞা নয়, ইহা যোগের চরম ফল। বৈষ্ণব যাহা ভাবে ফুটাইয়াছেন, তান্ত্রিক অসমসাহসে তাহাকে বস্তুতে নামাইয়া আনিয়াছেন। বৈষ্ণবের সাধনা আর তান্ত্রিকের সাধনা এইজন্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত; আর সে সাধনার কেন্দ্রে শক্তি। সন্ন্যাসীও শাক্ত, বৈষ্ণবও শাক্ত, তান্ত্রিকও শাক্ত—সন্ন্যাসীর নিরোধেও শক্তি, বৈষ্ণবের মাধুর্য্যেও শক্তি, তান্ত্রিকের ঐশ্বর্য্যেও শক্তি। পরম্পরাক্রমে উপনিষদ, ভাগবত আর তন্ত্র, অথবা তন্ত্র, ভাগবত আর উপনিষদ—একই শক্তিতরঙ্গের অনুলোম-বিলোম কম্পন মাত্র; সাধক আর সিদ্ধ ভেদে আস্বাদনের পৌর্ব্বাপর্য্য মাত্র ঘটে, নতুবা রস একই।

বাঙ্গালীর মজ্জায় মজ্জায় বৈষ্ণব আর তান্ত্রিকের সাধনা ঢুকিয়া রহিয়াছে। শক্তির সৌন্দর্য্যঘনসারা মূর্ত্তিও বাঙ্গালী দেখিয়াছে, আবার তাহার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিও দেখিয়াছে। কখনো তাহাকে দেখিয়াছে জীবধাত্রী অন্নপূর্ণারূপে, কখনো প্রলয়ঙ্করী করালিনীরূপে, কখনো বা দশপ্রহরণধারিণী মহিষমর্দ্দিনীরূপে, কখনো বা প্রেমবিবশা দিব্যোন্মাদিনী রূপে। মা বলিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে, জায়ারূপে হৃদয়ে তাহার কল্যাণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মেয়ে বলিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। বিশ্বব্যাপী মরণের তাণ্ডবে সে কালীরূপ দেখিয়া শিহরিয়াছে, নীলাকাশের পানে চাহিয়া "তারা" বলিয়া ফুকারিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বরসভাবময়ী ষোড়শী নারীকে রাজরাজেশ্বরী বলিয়া পূজা করিয়াছে; প্রকৃতির শান্ত মূর্ত্তিতে দেখিয়াছে শক্তির ভুবনেশ্বরী রূপ, আবার নখদন্তকরাল বুভুক্ষু জগতের নগ্ন হিংস্রতায় দেখিয়াছে তাহার রুধিরলিপ্তস্তনী ভৈরবী মূর্ত্তি; জগতের ভোগোল্লাসে দেখিয়াছে ছিন্নমস্তাকে, ভোগপরিণামে দেখিয়াছে মরণদূতী ধূমাবতীকে; সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্বে সে দেখিয়াছে শক্তির বগলারূপ, আবার অসত্যের পরাভবে জ্ঞানের স্নিগ্ধ প্রকাশে দেখিয়াছে তাহার শ্যামাঙ্গী মাতঙ্গী মূর্ত্তি; পরিশেষে নিখিল জগতের উপচিত ঐশ্বর্য্যের পানে চাহিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সে দেখিয়াছে বিশ্বের হৃদয়কমলে অধিষ্ঠিতা কমলাকে!

শক্তির সাধনায় রসের স্রোতে বাঙ্গালী ভাসিয়া চলিয়াছে—বৈরাগ্যে সে বিরক্ত, সংযমে বিতৃষ্ণ। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখিতে বলি, প্রকৃতিতে আছে একটা চক্রাকারে আবর্ত্তন; সহজকে অতি সহজ করিয়া তুলিলে বিকার অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী দেখিতেছে না উর্বশী আবার তাহার নয়নের আড়াল হইতে চলিয়াছে; অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিতেছে—

> অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্—
> ন ম অশৃণোঃ—কিমভুগ্ বদাসি ?

—কি করিয়া যে তুমি আমাকে হারাইবে, তাহা আমি জানিতাম; কতদিন সে কথা তোমাকে বলিয়াছি-ও; কিন্তু তুমি আমার কোনও কথাই তো শুনিলে না; আজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া এ সব কি প্রলাপ বকিতেছ?

> পুরূরবো! মা মৃথা! মা প্রপপ্তো!
> মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উক্ষন্!

—পুরূরবা! মৃত্যু কামনা করিও না! অধঃপাতে যাইও না! লোলুপ নেকড়ে-বাঘের মত যত অকল্যাণ যেন তোমাকে না পাইয়া বসে!

কিন্তু এ কথাও বলি, তোমার এই মোহ ক্ষণিক—

ইতি ত্বা দেবা ইম আহুর্, ঐল !
যথেমে, তস্তবসি মৃত্যুবন্ধুঃ ;
প্রজা তে দেবান্ হবিষা যজাতি,
স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়সে !

—হে ইলাপুত্র ! এই দেবতারা তোমাকে এই কথাই বলিতেছেন—ইহাদের মত তুমিও মরণের সঙ্গে মিতালী করিতে পারিবে ; তোমার সন্তান হবিঃ দ্বারা দেবতাদের যজনা করিবে ; তুমিও স্বর্গে গিয়া আনন্দ করিবে !

শক্তি-জয়ী

——):*:(——

সাধনার দুটী আদর্শ। একটী ফুটেছে বৃন্দাবনে, আর একটী কৈলাসে। একদিকে রাধার আরাধনা, আর একদিকে শিবের সাধনা। প্রকৃতির ভাবে সাধনা, আর পুরুষের ভাবে সাধনা। ভাবলোকে দুই-ই সমোজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। যার যেমন আধার, সে তেমনি বীজ বেছে নেবে।

বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ বা পুরুষ কেন্দ্র অথবা সাধ্য। প্রকৃতি সাধিকা—শ্রীমতীরূপে, যশোদারূপে, সুবলাদিরূপে, উদ্ধবাদিরূপে। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই আকর্ষণ করছেন ; আর প্রকৃতি অহংবুদ্ধিশূন্যা হয়ে গুণাতীতের পথে ছুটে চল্‌ছেন।

কৈলাসে দেখি আর এক পিঠের চিত্র। সেখানে প্রকৃতি বা গৌরী কেন্দ্র বা সাধ্য, শিব বা পুরুষ সাধক। কিন্তু সাধনা চল্‌ছে সেই গুণাতীতের ভূমিকায়। সব হরের ভাবে ভাবুক—আপনাকে সংহরণ করে সবাই হর। প্রকৃতি গুণের উপকরণ নিয়ে পেছনে পেছনে ছুটে চলেছেন, কিন্তু হর নিস্তরঙ্গ। এই নিস্তরঙ্গ থাকাটাই ওই ভূমিকার সাধনা, যেমন নাকি অনন্ত আবেগে স্পন্দিত হওয়াটাই হচ্ছে প্রেমের সাধনা। আসল কথা হচ্ছে—শক্তিকে আয়ত্ত কর্‌তে হবে। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন হবে গুণাতীত ভূমিতে। বৃন্দাবনলীলাতেও তাই হয়েছিল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করেও স্বয়ং নির্লিপ্ত, আর গোপিকারা আকৃষ্টা হয়েও গুণাতীতের পথে আত্মসমর্পণে সিদ্ধা।

এখানেও তাই। ধর দাস্যভাবের সাধক রামপ্রসাদের কথা। চাই গৌরীকে মা-রূপে। কিন্তু ছেলের জন্য মায়েরই তো মাথাব্যথা ; ছেলের কি ? তাই রামপ্রসাদ বুক ফুলিয়ে বল্‌লেন, "বৎস পাছে গাভী যেমন—তেমনি পাছে পাছে ধাবা।" এই তো শক্তিজয়। সন্তান এখানে নির্গুণ ; আর মার রূপ তো শুদ্ধ বটেই।

তারপর ধর গৌরীকে কন্যারূপে পাওয়া। কে পেল ?—হিমালয়। বেছে বেছে হিমালয়কে কেন গৌরীর পিতা বলে কল্পনা করা হল ? অমন দুরন্ত মেয়েকে বুকে নিতে হলে হিমাচলের মত অচল অটল হয়ে গুণাতীত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে হবে, নইলে ও মেয়েকে সাম্‌লাবে কে ! আর মেয়ের রূপ তো শুদ্ধই।

তারপর ধর জায়ার সাধনা। শঙ্কর সাধক। প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, মদন ভস্ম করেছেন। কিন্তু শিব ছাড়লে প্রকৃতি আশ্রয় পান কোথায় ? তাই শুদ্ধা-প্রকৃতি গুণসম্বরণ করে শিবের পেছনে পেছনে ছুট্‌লেন, শিবের আত্ম-শক্তির পুঞ্জনে প্রকৃতি মূর্ত্তিমতী হলেন। শিবশক্তির মিলন হল—গুণাতীত ভূমিতে।

এই যে তিনটী ভাবের আশ্রয়—জননী, তনয়া, জায়া, এদের উপাধি ত্যাগ করে সার নিষ্কাশন করতে হবে। তাই হল জ্ঞানীর সাধ্য। ওই হচ্ছে আত্ম-শক্তি; সে শক্তিকে নিজের সঙ্গে অভেদ বলে ধারণা করতে হবে। বৈদান্তিকের শক্তিসাধনার এই নিগূঢ় সঙ্কেত।

গুণাতীত হতে হবে, সমাধিতে প্রকৃতিকে চাই। সমাধিতে বুদ্ধি জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়, তাই হল পুরুষের সত্য-প্রতিষ্ঠা। তেমনি সমাধিতে বাসনাও প্রেমে পর্য্যবসিত হয়; তাই প্রকৃতির সত্য-প্রতিষ্ঠা। প্রেমই প্রকৃতির গুণাতীত স্বরূপ। সমাধিতে জ্ঞানে-প্রেমে আত্ম-সংমিশ্রণ হবে।

পুরুষ তখন কেমন? অবিক্ষুব্ধ—অচঞ্চল; অথচ নিখিল জগতের আনন্দের বন্যা তারি দিকে ছুটে আস্‌ছে, আকুল উচ্ছ্বাসে তাকে জড়িয়ে ধরছ। পুরুষ বা শিব বা অহং স্তব্ধ থেকে, নিথর থেকে প্রেমময়ী গৌরীকে বুকে তুলে নিল, সত্তার অন্তরতম, গভীরতম দেশ পর্য্যন্ত কণ্টকিত হয়ে উঠলো—কিন্তু কোথায়ও অটলতার বিক্ষোভ হল না—সমস্তই অচঞ্চল, মহাসমাধিতে স্তব্ধ। তখন জগৎ নাই; দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি কোনও আধারেরই সত্তা নাই; পুরুষের বৈরাগ্যের আকর্ষণে প্রকৃতি বিবশা হয়ে ধরা দিয়েছে—তার গুণজাল সংহৃত—তাই মহাসমাধিতে জগতের প্রলয়!

আবার এই যুগলে জড়িত অচঞ্চল সত্তারও এক প্রান্ত যেন স্পন্দিত হয়ে উঠল; প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ, বশীভূত পুরুষ যেন একটু তার দিকে টলে পড়লেন, অটল থেকেই টলে পড়লেন—প্রকৃতির সৃষ্টি-বাসনায় স্ফুরিত শক্তির বিলাসে অধিষ্ঠিত হলেন;—আর অমনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল, নির্গুণকে অব্যাহত রেখেও সগুণের বিকার দেখা দিল।

নিরোধ-সংস্কার থাক্‌লেই এই বিকারপরম্পরার দর্শন হয়: নতুবা পূর্ণ তত্ত্ব যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ, সংযোগে-বিয়োগে প্রকৃতি-পুরুষ অনন্ত প্রেমে পূর্ণানন্দময়। এই দুটী তত্ত্ব—সগুণ আর নির্গুণ, সৃষ্টি আর মহাসমাধি; এই দুই নিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব। তাই যাঁরা জীবন্মুক্ত, তাঁরাই অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুবতে—এখানেই তাঁরা ব্রহ্ম আস্বাদন করে থাকেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অচঞ্চল সত্তা অনুভব করে আবার যখন তাঁরা গুণের জগতে নেমে আসেন, তখনও ওই নির্গুণে[র] অনুভাব তাঁদের মাঝে থেকে যায়। সবারই ত্রি[পাদ] অব্যক্ত, একপাদ মাত্র চেতনায় ব্যক্ত; কিন্তু জীবন্[মুক্তের] কাছে ওই অমৃতময় অব্যক্ত ত্রিপাদেরও আবরণ [খসে] গিয়েছে; তাই তাঁরা "জীবন্" অর্থাৎ বেঁচে থে[কে] দেহে বদ্ধ থেকেও মুক্ত। একদিক দিয়ে সা[ধারণ] মানুষের মত ব্যবহার—যেন গুণের অধীন; এক দিক দিয়ে নির্লিপ্ত, ভোগাকাঙ্ক্ষাহীন। এ[ই] শক্তিজয়ী সহজ মানুষ; মহাজনেরা এঁদের ব[িষয়ে] বলেন—"রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ!"

শাক্ত

শক্তি না লভি মুক্তি-কামনা,
          সে যে শুধু পরিহাস,—
দীপ্ত মনের জয়ের সাধনা
          নহে কভু অনায়াস।

সেই তো সত্য-সাধক, পূজারী,
          প্রাণ-বিনিময়ে পায় বল—
দুর্ব্বল মিছে কান্নার ছলে
          খোঁজে বসি কৌশল।

—*—

ভক্তসম্মিলনী

—✱—

ভক্তসম্মিলনীর পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন বর্ত্তমান বর্ষে উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে হইবে, ভক্তগণ ইহা অবগত আছেন। ভক্ত-সম্মিলনীতে যাঁহারা যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কার্ত্তিকমাসের মধ্যেই অত্রত্য আশ্রমাধ্যক্ষকে সবিশেষ জানাইবেন। আত্মীয়-স্বজনগণ কেহ সঙ্গে থাকিলে তাহাও জানাইবেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক আসিলে স্বতন্ত্রভাবে তাহার উল্লেখ করিবেন।

দুগ্ধপোষ্য শিশু বা পীড়িত সঙ্গীর জন্য যদি কেহ কোনও বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে আশ্রমাধ্যক্ষের সহিত পত্রব্যবহার করিয়া জানিয়া লইবেন যে সেরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে কি না।

সম্মিলনীতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ সম্মিলনীর ব্যয়ভার নির্ব্বাহকল্পে জন প্রতি ৫৲ হিসাবে দেয় চাঁদা কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই জমা দিবেন। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে যাঁহাদের টাকা জমা না হইবে, তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে। শিশু ও বালক-বালিকা ব্যতীত আর সকলেরই এই চাঁদা অবশ্য দেয়। টাকা জমা দিবার সময় প্রেরকের নাম-ঠিকানা এবং যে কয়জনের চাঁদা জমা দিতেছেন, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

পল্লী-শাখা-সংঘের সম্পাদকগণের এই বার্ষিক সম্মিলনীতে যোগদান বাঞ্ছনীয়। অর্থাভাবপ্রযুক্ত যদি কোনও শাখা-সংঘের সম্পাদক সম্মিলনীতে যোগদান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিভাগীয় সদস্য বা আশ্রমাধ্যক্ষকে সে বিষয় জানাইলে তাঁহাকে উক্ত চাঁদার দায় হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

ভক্তসম্মিলনীর সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। মনি-অর্ডার কুপনে "সম্মিলনীর সাহায্যার্থে দান" এই কথাটী উল্লেখ করিবেন।

বগুড়া-ষ্টেশন হইতে আশ্রম প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বদিকে করতোয়া-নদীর পরপারে রেলওয়ে-লাইনের পার্শ্বে অবস্থিত (ঠিক ডিস্‌ট্যান্ট্ সিগ্যাল্-এর নিকট)। করতোয়া নদী রেলের পুল অবলম্বনে পার হইতে হয়। পশ্চিম পারের বাজার পর্য্যন্ত গাড়ী করিয়া আসা যায়। বাজার হইতে আশ্রম মাত্র ২০০ গজ হইবে। এইটুকু পদব্রজে ভিন্ন অন্য উপায়ে আসিবার সুবিধা নাই। মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়ায় পাওয়া যায়। যাহার যেরূপ প্রয়োজন হইবে, পূর্ব্ব হইতে জানাইলে ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। ষ্টেশনে কুলী মিলিবে।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী
উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম
পোঃ বগুড়া

—✱—

দানপ্রাপ্ত

পশ্চিম বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রমে—

জেলা—মেদিনীপুর, মোহনপুর—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মাইতী ১৲। গ্রাঃ জগন্নাথপুর—শ্রীযুক্ত তারাপদ মণ্ডল ৷৷৹।

(বর্দ্ধমান—কালনা)

শ্রীসচ্চিদানন্দ সাহা ৫৲, শ্রীঅমূল্যধন সাধুখাঁ ৩৲, দুই টাকা করিয়া—শ্রীসতীশচন্দ্র মালিক, শ্রীদাশরথি দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র কুণ্ডু। এক টাকা করিয়া :— শ্রীপঞ্চানন দত্ত,শ্রীসন্ন্যাসীচরণ প্রামাণিক, শ্রীজহরলাল লাল, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ মোদক, শ্রীপাঁচুগোপাল পাল, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত পোষ্টমাষ্টার, দাস শেঠ কোং, শ্রীপশুপতি সেন, শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, শ্রীদীনবন্ধু সাহা, শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষীরোদা জেলেনী, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল ঘোষ। ৷৷৹ আনা করিয়া— শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী, শ্রীশ্যামাচরণ নায়েক, ক্ষীরোদ বাবু, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ষ্টেশনমাষ্টার। ।৹ আনা করিয়া—টাকার পাল, শ্রীপঞ্চানন স্বর্ণকার, শ্রীরজনীকান্ত দে, শ্রীহরিদাস নাগ, শ্রীপান্নালাল পাল, শ্রীরাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতুলসীচরণ পাল, শ্রীআমীরচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ পাল, শ্রীগোলোকবিহারী দে, শ্রীমাখনলাল বন্ধু, শ্রীকালীপদ সরকার, শ্রীবিপিনবিহারী প্রামাণিক, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সান্নাল। ৵৹ আনা করিয়া—দাশরথি সিংহ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীভারতী মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযামিনী মিত্র, শ্রীতারাপদ ঘোষ, শ্রীহরিপদ সেন, শ্রীকুলের সোল্লারা, শ্রীগগনচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীভূষণ নাথের স্ত্রী।

গ্রাঃ এড়েমারা—শ্রীপরেশনাথ ঘোষ ৩৲ শ্রীচারুবালা ঘোষ ২৲ শ্রীমাধুরীবালা ঘোষ ১৲। গ্রাঃ কেশিয়া—শ্রীরামশরণ ঘোষ ২৷৷৹ শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৷৷৹। গ্রাঃ কোটা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৫৲। মোঃ সর্ডিহা—শ্রীগৌরহরি কর ২৲ শ্রীমহাদেবচন্দ্র পাল ১৲। মোঃ ফতেসিংপুর— শ্রীনিতাইচরণ রাণা ৷৷৹। গ্রাঃ ধুলেডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত ৫১৶৫। গ্রাঃ খামারবাড়িয়া— শ্রীভবতোষ সাহা ৫৲। গ্রাঃ সাতমৌলী—শ্রীহেমচন্দ্র সাহা ১৷৹। গ্রাঃ রাংতামালী—শ্রীচন্দ্রশেখর রাণা ৩৲ শ্রীবিষ্ণুপদ কুণ্ড ৷৷৹ শ্রীমহেন্দ্রনাথ রাণা ৷৷৹

উত্তর বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রমে—

গ্রাঃ দ্বিতীয় খণ্ড পুঁছনী শ্রীযুক্তাঃ রামধন বর্ম্মণ ৫৲ রমণীমোহন পোদ্দার ১৲ কর্ণমোহন অধিকারী। গ্রাঃ পুঁটিমারী—শ্রীযুক্তাঃ চূড়ামোহন অধিকারী ৭৲ হরেকৃষ্ণ পাল ৪৲ রামলাল ব্যাপারী ৩৲ অন্নদাপ্রসাদ কবিরাজ ১৲ লক্ষ্মীকান্ত বর্ম্মণ ১৲ গ্রাঃ ১ম খণ্ড জড়াবাড়ী—শ্রীযুক্তাঃ চন্দ্রমোহন রায় ১০৲ মহেন্দ্রনাথ সিংহসরকার ৫৲ তারামোহন বর্ম্মণ ২৲ সূর্য্যমোহন বর্ম্মণ ২৲ প্রাণনাথ রায় কবিরাজ ২৲ বিসাদু বর্ম্মণ ১৲ রামমোহন বর্ম্মণ ১৲ রামপ্রসাদ ব্যাপারী ১৲। গ্রাঃ ভুল্কী—শ্রীযুক্তাঃ কালানাথ দাস ৩৲ রাধামোহন বর্ম্মণ ৩৲ চন্দ্রমোহন অধিকারী ২৲ গোবিন্দচন্দ্র দাস ২৲ তরণীকান্ত হিসাবিয়া ২৲ এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ সনেশ্বর দেবশর্ম্মা শরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা হরকান্ত বর্ম্মণ বোচা বর্ম্মণ ক্ষুদিরাম বর্ম্মণ নরকান্ত অধিকারী তারামোহন অধিকারী। গ্রাঃ খারিজাবালা ডাঙ্গা—পাঁচ টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ গঙ্গাধর রায় রজনীকান্ত রায় সরকার সিদ্ধেশ্বর বর্ম্মণ (বালাভাঙ্গা) কমলেশ্বর হিসাবিয়া ; শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ অধিকারী ২৲ ; এক টাকা করিয়া শ্রীযুক্তাঃ দীনবর বর্ম্মণ রজনাকান্ত বর্ম্মণ উমেশচন্দ্র রায় মণ্ডল গজেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ গোপালচন্দ্র বর্ম্মণ চকরপতি বর্ম্মণ চন্দ্রকান্ত সরকার হরিশ্চন্দ্র সরকার কেদারেশ্বর হিসাবিয়া গিরিবালা দেবী (কুচবিহার) তারিণীময়ী বর্ম্মাণী (বালাকুড়া)। গ্রাঃ একমুখা—শ্রীযুক্তাঃ মনোহরি রায় ২৲ রামেশ্বর রায় সরকার (মোরঙ্গামারী) ২৲ ; এক টাকা করিয়া— শ্রীযুক্তাঃ রেবতী মোহন রায় পুষ্পকান্ত রায় পাথারীয়া শশীধর দলই রবিচন্দ্র কার্য্যী (দশগ্রাম) ; খুচরা সংগৃহীত ১৲।
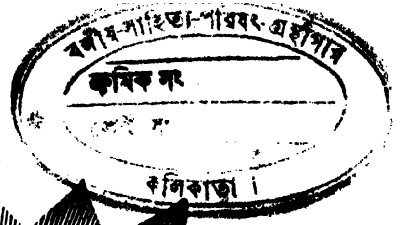
২২শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

কার্ত্তিক—১৩৩৬

সমষ্টি সং ২৩৫ | প্রথম সংখ্যা

অগ্নয়ে

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা ৪।২

—:*:—

[বামদেব-ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

যস্ত্বা দোষা উষসি প্রশংসাৎ
প্রিয়ং বা ত্বা কৃণবতে হবিষ্মান্।
অশ্বো ন স্বে দম আ হেম্যাবান্
তমংহসঃ পীপরো দাশ্বাংসং ॥

হে দেবতা, যে তোমার স্তুতি গায় প্রদোষে-উষায়,
তোমারে তুষিবে বলি কত মত আহুতি সাজায়,
তোমারে যে দেয় হবি, পাপ হতে কর তারে পার—
অশ্ব তুমি-নিজ ঘরে—শোভে গায় স্বর্ণ অলঙ্কার !

যস্ত্ব ত্বামগ্নে অমৃতায় দাশদ্
ঘৃতবস্তুং কৃণবতে যতস্রুক্।
ন স রায়া শশমানো বি যোষৎ
নৈনমংহঃ পরি বরদঘায়োঃ ॥

বৈশ্বানর! হে অমৃত! যে তোমারে অর্পিয়াছে হবি,
দৃঢ় করে ধরি স্রুক্, সেবাছন্দে সঁপিয়াছে সবি,
মুখরিত স্তুতিগানে;—দিও তারে বিত্ত ক্ষয়হীন,
অরাতির হিংসা হতে রক্ষ তারে, রক্ষ চিরদিন!

চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্বি বিদ্বান্
পৃষ্ঠেব বীতা বৃজিনা চ মর্ত্তান্।
রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব
দিতিং চ রাস্বাদিতিমুরুষ্য ॥

কে বা কান্ত, কে অশান্ত মর্ত্ত্যমাঝে জান তো দেবতা
পাতার পিঠের মত—পাপে পুণ্যে? বেছে দাও তা!
দাও ধন আমাদের, বংশদীপ পুত্র কর দান,
দাতার কামনা পূর, অরি হতে কর পরিত্রাণ!

যস্য ত্বমগ্নে অধ্বরং জুজোষো
দেবো মর্ত্তস্য সুধিতংররাণঃ।
প্রীতেদসদ্ধোত্রা সা যবিষ্ঠা
সাম যস্য বিধতো বৃধাসঃ ॥

মর্ত্ত্যবাসী যে তোমার করিয়াছে যজ্ঞ-আয়োজন,
দাঁড়াও বেদিতে তার তুমি সবে হয়ে সুশোভন,
হে তরুণ, কি আনন্দে ভরে ওঠে তার হিয়াখানি;—
বাড়ুক সম্পদ তার; বন্ধু মোরা, ধন্য তারে মানি!

কবিং শশাসু করয়ো অদব্ধা
নিধারয়ন্তো দুর্যাস্বায়োঃ।
অতস্ত্বং দৃশ্যাঁ অগ্ন এতান্
পড্ভিঃ পশ্যেরদ্ভুতাঁ অর্য্য এবৈঃ ॥

তুমি কবি, গুণগানে মুখরিত তাঁরাও তো তাই,
মানুষের ঘরে যাঁরা স্বমহিমায় রচিলেন ঠাঁই।
যজ্ঞস্বামী তুমি অগ্নি, চঞ্চলিত কিরণে তোমার
দেখে নাও উহাঁদের,—এ দৃশ্যের জুড়ি মেলা ভার।

ত্বমগ্নে বাঘতে সুপ্রণীতিঃ
সুতসোমায় বিধতে যবিষ্ঠ।
রত্নং ভর শশমানায় ঘৃষ্বে
পৃথুশ্চন্দ্রমবসে চর্ষণিপ্রাঃ ॥

হে তরুণ! হে বিরাট্! যজ্ঞভূমে নিত্য নীয়মান!
মানুষের ইষ্টদাতা! দিবা তেজে দীপ্ত মহীয়ান্!
ওই তব স্তুতি গায়, করে যজ্ঞ কত আয়োজনে,
দাও রত্ন উহাঁদের খেদ যেন নাহি রয় মনে।

মুক্তির দিশা

—*‡()‡*—

শুনি লোকে বলে, জ্ঞান আর প্রেম দুইটা পথ। কিন্তু দু'য়ে যে তফাৎ কোথায়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পাতার এপিঠ আর ওপিঠ, কিন্তু বোঁটা তো একটাই; এপিঠ নিলে ওপিঠ নেওয়া হইল না, এমন কথা তো বলা চলে না।

প্রেম হইলে কি হয়?—নারদ বলিয়াছেন, প্রেম হইলে প্রেম হয়, আর কিছু হয় না, কেননা প্রেম স্বয়ং ফলস্বরূপ। বাস্তবিক কথাটা বড় গভীর। সাদা কথাতেই বলি, তুমি যদি কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক তো বল দেখি ভালবাসিয়া তুমি কি পাইয়াছ? যদি বল, ভালবাসিয়া সুখ পাই, তাহা হইলে বলিব, যথার্থ ভালবাসা বস্তুটা যে কি তুমি এখনো তাহার আস্বাদন পাও নাই; আজ যদি ভালবাসিয়া দুঃখই পাও তো বলিবে কি যে, ও দুঃখ আমি চাই না? যে বলে, সে ভালবাসে না—সে কামুক, প্রেমিক নয়। ভালবাসিয়া সুখ পাই না দুঃখ পাই, সে কথা বড় স্থূল, বড় অবান্তর। যদি কিছু পাই তো বলিতে পারি, ভালবাসিয়া আমি যেন আমাকে পাই, আমি স্বচ্ছন্দ হই, তৃপ্ত হই, আত্মারাম হই। এই তো শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছি; এক মুহূর্ত্তের তরেও কি বুঝিতে পারি, শ্বাস টানিয়া কি পাইলাম? কিন্তু আজ যদি কেহ আসিয়া আমার নাক-মুখ চাপিয়া ধরে তো বুঝিতে পারিব, ওই শ্বাস প্রশ্বাসটুকুর দাম কত। ভালবাসার শেষটাও এমনি। কোথায় তাহার উদ্ভব, কি তাহার উদ্দীপন, কিসে তাহার পরিণতি—কিছুই জানি না, জানিতেও চাই না; শুধু অনুভব করি, ভালবাসিয়া আমি যেন আমি হইলাম, যাহাকে ভালবাসি তাহাকে পাইলাম না—এ যেন আমিই আমাকে ফিরিয়া পাইলাম। দ্বৈতের মর্ম্মকোষে অদ্বৈতের সুবাস—এরই নাম ভালবাসা।

ঠিক এই অনুভব তো জ্ঞানের। জানিয়া কি হয়? আমি বলি, কিছুই হয় না, জানিয়া শুধু জানা যায় মাত্র। ওদেশের লোকে বলে, Knowledge is Power—জ্ঞানে শক্তি লাভ হয়। মানি সে কথা; কিন্তু বলি, ভালবাসিয়া সুখ পাওয়ার মত ওটাও বড় ছোট কথা। এদেশের ভাবুকেরা বলেন, জ্ঞানে শান্তি লাভ হয়। শক্তি আর শান্তি এক কথাও বটে, আবার এক কথা না-ও বটে। শক্তি বলিতে বুঝি willpower—অবন্ধ্য বাসনা, struggle—লড়াই। কিন্তু কামনা করিয়া, যুদ্ধ করিয়া কি ঘটাইব জগতে? শেষটা যে কি, তাহা জানি না বলিয়াই না কামনা করি; কালের স্রোত কোন দিক বহিয়া চলিয়াছে, তাহার খবর রাখি না বলিয়াই না তাল ঠুকিয়া বলি "যুদ্ধং দেহি!" যদি জানিতাম, এই প্রচেষ্টার এই ফল, এই কালস্পন্দনের এই পরিণাম, তাহা হইলে আপনা হইতেই হাত-পা গুটাইয়া আসিত, নিজের ইচ্ছায় খড়কুটাটুকু পর্য্যন্ত নড়াইবার সামর্থ্য থাকিত না, কেননা আমার ইচ্ছা বলিয়া একটা বালাই-ই যে থাকিত না।

যদি বল, শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, তাহার খবর কি কেহ জানে? সর্ব্বজ্ঞের মস্তিষ্কও কি জগতের সকল খুঁটিনাটীর খবর পূর্ণ প্রকটরূপে ধারণা করিতে পারে?—স্বীকার করি, পারে না। কিন্তু তবু জগতের এই অসংখ্য ছোট-খাট ব্যাপারের জমা-খরচ করিয়া মোট ফলটা যে কি দাঁড়ায়, জ্ঞানী সেটা জানেন। সে কথাটা এই—যাহা হইবার তাহাই হইতেছে, যাহা হইবার নয়, তাহা হইবেও না। কথাটা বোকার না স্যায়ানার, তাহা ধরা শক্ত। কিন্তু কামনা-বাসনার সঙ্গে যতই লুটোপুটী খাও না কেন, শক্তি-দম্ভে যতই আস্ফালন কর না কেন, তোমার দড়ির দৌড়

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। যে জানে, সে জানে—হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাটাই কর্ম্মতাণ্ডবের চরম পুরস্কার। অনন্ত গতিতে যে লাস্যপরা, সে মায়া; আর অনন্ত স্থিতিতে যে নির্ব্বিকার, সে মায়ী বা মহেশ্বর। জানাই মানে চুপ হইয়া যাওয়া।

কলরব করিয়া বলিও না—এ জড়ের দর্শন, এ দর্শনে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। সর্ব্বনাশ হইবে তো আমি তাহার কি করিব? সর্ব্বনাশ হওয়াটাও আমার কামনা নয়, না হওয়াটাও আমার কামনা নয়। যা সত্য, তা বলিতেই হইবে; কেহ শুনিবে, কেহ শুনিবে না, তবুও তাহা বলিতে হইবে। যে শুনিবে, সে কিছু আমাকে রাজা করিয়া দিয়া যাইবে না; আর যে শুনিবে না, সে-ও কিছু আমায় ফকির করিয়া দিবে না। আকাশ মানেই প্রসার, আলো মানেই প্রকাশ; কাহারও লাভ-লোকসান খতাইয়া ইহাদের তাৎপর্য্য নিষ্কাসন করা চলে না।

তবুও যদি বল, এতে লাভ?—খাঁটী কথাটা যদি তোমাকে শোনাইতেই হয়, তাহা হইলে বলি, লাভ কিছুই না; লোকসানও যে কি, তাহাও বুঝি না; তোমার কারবারের বুলির সেখানে কোনও অর্থই হয় না।

কিন্তু আবার এ-ও বলি, ওই অনর্থের রাজ্য হইতেই তোমার জগতে কত অর্থ ক্ষরিয়া পড়িতেছে। যদি এক ধাপ নীচে নামিয়া আসি তো বলিতে পারি, ওই কিছু-নার মাঝে একটা মস্ত বড় লাভের অঙ্ক লুকাইয়া রহিয়াছে; আর সে লাভটা অপর কাহারও নয়, তোমারি একান্ত নিজস্ব লাভ। কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলি।

দেখ, যদি উত্তেজনা মাপিবার কোনও যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে কুঁড়ি যখন ফুল হইয়া ফোটে, তখন একবার মাপিয়া দেখা যাইত, তাহার উত্তাপ কত ডিগ্রী ওঠে। তোমার নিজকে দিয়াই দেখ না কেন। শিশু ছিলে, কৈশোরে মুঞ্জরিত হইয়া যৌবনে ফুটিয়া উঠিলে—ভাবিয়া দেখ দেখি, কি বিপুল, কি প্রমত্ত উত্তেজনা তাহার মাঝে! এই হইতেই বোঝ, জগতে যাহা কিছু পুষ্টি, যাহা কিছু পরিণাম, তাহারই মাঝে কি তীব্র মাদকতা। বাস্তবতার কবিরা ছন্দে বাঁধিয়া ইহার বন্দনাগান গাহিতেছে—বলিতেছে, এই তো শক্তি, এই তো প্রাণ, এই তো জীবন! আমি বলি, অমন ঢুলু ঢুলু নয়নে নয় ভাই, চোখ দুটী আরও একটু বিস্ফারিত করিয়া দেখ, বলি—এই তো মরণ! শূন্যগর্ভ জলবিম্ব একটুখানি মাত্র দমের পুঁজি লইয়া ফাঁপিয়া উঠিল, অমনি নীলাকাশের ছায়া, তরুলতার প্রতিবিম্ব তাহার মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল, মধ্যাহ্নের সূর্য্য তাহার বুকে জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল, আমি আরও বড় হইব, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আমার বুকে পুরিয়া লইব; অমনি তাহার ক্ষুদ্র বেষ্টনী বিদীর্ণ হইয়া জলে জল মিশাইয়া গেল, বাতাস বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল—মধ্যাহ্ন আকাশে সূর্য্য তেমনি জ্বলিতে লাগিল, নীলিমা তেমনি হাসিতে লাগিল। ভাই, এই তো তোমার ইভলিউশনের শেষ! পরিণামের শেষ এই ফাঁকা, স্পন্দনের শেষ এই স্তব্ধ প্রশান্তি। যতক্ষণ আধারে বন্দী ছিলে, ততক্ষণই ছট্‌ফট্ করিয়া মরিয়াছ, লাভ-লোকসানের বিচার ততক্ষণই ছিল; আধার ভাঙ্গিয়া গেল তো লাভের অঙ্ক শূন্যে মিলাইয়া গেল, লোকসানের আশঙ্কাটাও যে কোথায় ডুব মারিল, তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জীবন আঁকড়াইয়া যাহারা পড়িয়া আছে, তাহারা বিবর্ণমুখে বলিল, পাগলটা মরিল! কিন্তু তুমি তো জান ভাই, ক্ষণিকের মৃত্যু দিয়া তুমি অনন্ত জীবন পাইলে।

বিন্দুর অভিমান ঘুচিয়া গিয়া সিন্ধুর অভিমান—বিন্দুর সেটা লাভ না ক্ষতি বল দেখি? বিন্দু আর ছোট রহিল না, এইটুকু তার দুঃখ; কিন্তু সে যে সিন্ধু হইল, এ তাহার কি? দুঃখ তো নয়ই; সুখও বলিতে ভরসা হয় না। তাই বলি, বিন্দু

যখন সিন্ধুতে মিশায়, তখন তাহার সুখ থাকে, না দুঃখ থাকে, বিন্দুর অভিমান নিয়া তাহা ঠাহর করিতে পারি না ; তাই তো মরণকে ডরাই, নানা আশঙ্কায় অন্তর শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু ওই বিন্দুর বিচার দিয়াই আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ, সিন্ধু-সত্তায় যে বিন্দু লীন হইয়া গেল, সে যে আমার জাগিয়া উঠিল অনন্ত কোটী বিন্দুরূপে ! একটা আমির সুখ-দুঃখের বিচিত্র বেদনা এত মধুর যে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কাঁদে ; আর সেই আমিই যদি অনন্তকোটী বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গে জ্বলিয়া ওঠে নির্ব্বাণের ভূমিকায়—তবে ওরে আত্ম-বিমূঢ় বিন্দু-সত্তার কাঙ্গাল, ভাবিয়া দেখ্ দেখি, তাহাতে সুখ আছে কিনা ! ওই তো জ্ঞানীর মরণ—অনন্তরূপে জীবন পাওয়া ! ওই তো জ্ঞানীর বৈরাগ্য—অনন্ত অনুরাগে জগৎটাকে জড়াইয়া ধরা ! ওই তো জ্ঞানীর ত্যাগ—অনন্তকোটী মিথুনের মর্ম্মকোষে বসিয়া অনন্ত-উৎসারিত সুরতানন্দ ভোগ করা ! বল—হর-হর, ব্যোম্ ব্যোম্—হে মরণ, আমার সমস্ত হরণ কর তুমি, ব্যোমস্বরূপে মিলাইয়া দাও এই ক্ষণিকের আকুলি-বিকুলি !

কামসুখের উত্তেজনায় তোমাদের জীবন খুঁড়িয়া খাইতেছে, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহীন হইয়া তাহারই পেছনে পেছনে ছুটিয়াছ। উত্তেজনার তীব্রতায় তোমাদের সুখের পরিমাণ—এই না জগতের ভোগ ! ইহার মাঝে সত্য আছে স্বীকার করি ; কিন্তু আর একটা সত্যেরও সন্ধান দিতেছি, তাহাও স্বীকার কর। এই যে রিরংসার উত্তেজনা, জীবন বলিয়া যাহার এত বাখান, সে যে মরণের কোলে অভিসার। ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া ওঠে, মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িবে বলিয়া ; খণ্ডের পরিতৃপ্তি বিনাশে। এই বিনাশকে, মহাকালের এই উদ্যত বজ্রকে আগে দেখিতে পাও নাই, তাই ভোগে তোমাদের এত জ্বালা। মরণকে যদি আগে চিনিয়া রাখিতে, মহাপ্রলয়কে যদি জানিতে জীবনের রসায়ন, তাহা হইলে ওই ভোগের উত্তেজনা প্রভাতসমীরণে ফুলের মৃদু শিহরণের মতই কান্ত ও কোমল হইয়া তোমাদের মাঝে ফুটিয়া উঠিত। ভোগাবসানে প্রলয় হইত মহাসমাধির মতই নিশ্চল, নির্ব্বিকার আনন্দের বজ্রকঠোর দ্যোতনা। হে ভোগী, জগৎ-ভোগ হইতে তোমায় বঞ্চিত করিতে চাহি না ; কিন্তু বার বার বলিতেছি, সত্যের অর্দ্ধেকটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যা করিও না ; জীবনের সঙ্গে মরণকে বরণ করিয়া লও, ভোগের সাথে ত্যাগকে, অনুরাগের সাথে বিরাগকে, চঞ্চলতার সাথে প্রশান্তিকে। এক অত্যাশ্চর্য্য সত্য তখন তোমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে—দেখিবে সমস্ত দ্বন্দ্ব মিথ্যা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়া। জীবন-মরণ, অনুরাগ-বিরাগ সমস্ত মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে—আছে শুধু·········কি আছে, তাহা আর বলিতে পারি না—

এই তো জ্ঞান—মেঘমুক্ত সন্ধ্যাকাশের মত নীরব, নিথর, সমাহিত। এই প্রেম—ওই আকাশেরই বুকে অস্তরাগের বৈরাগ্যভরা করুণ দীপ্তির মত। স্তব্ধ হও, শান্ত হও—গভীর হইতে গভীরতর ছায়া নামিয়া আসুক তোমার অন্তরে, সমস্ত কোলাহল আচ্ছন্ন করিয়া দিক্, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাক্, হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যাক্—এক অখণ্ড আকাশ বিরাট্ নাস্তিত্বের জারক রসে তোমাকে জীর্ণ করিয়া ফেলুক !—কোথায়ও কিছু নাই ? কে বলিল—নাই ? ওই আকাশের কোলে ফুটিয়া উঠিল বিশ্বতশ্চক্ষুর কোটী কোটী অনিমেষ আঁখিতারা। আমিও তাই। প্রশান্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের ভূমিকায় ফুটিয়া উঠিল আমার স্তব্ধ চেতনা—ওই বিশ্বতশ্চক্ষুরই একটা শান্ত চাহনির মত। আমার জ্ঞান, তাঁহারই দৃষ্টি ; এ আমি দেখিতেছি না, সবার সাথে এক হইয়া তিনিই দেখিতেছেন। মাটীর কোলে ঝরিয়া পড়িয়াছিলাম একটী তারার ফুল, আজ আবার চেতনা ফিরিয়া পাইয়া লক্ষকোটী নক্ষত্রের সঙ্গে আমিও অসীমের বুকে ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতেছি যে !

এই আমার প্রেমের স্বরূপ! অসীমের বুকে সবার সাথে এক হইয়া অনির্ব্বাণ জ্বলা শুধু! সীমা হইতে অসীমের দিকে তাকাও—দেখিবে জ্ঞানের স্তব্ধ মহিমা; আবার অসীম হইতে সীমার দিকে তাকাও—দেখিবে, অণুতে অণুতে প্রেমের ঝিকিমিকি! জগতে সব কালো, অথবা সবই আলো; বুঝি বা আলোয়-কালোয় অনন্তকাল ধরিয়া অমনি জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে নিত্য-চেতনার মহারাস-মঞ্চে!

স্তব্ধতাই এই লীলাকে বুঝাইবার একমাত্র ভাষা। জ্ঞানই বল, আর প্রেমই বল, মূক হইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে আর তাহার পর্য্যবসান হইতে পারে না। দেহ নিস্পন্দ, প্রাণ নিরুদ্ধ, চিত্ত নিস্তরঙ্গ—তারপর সত্যের প্রকাশ। সে গভীরে অবগাহন করিয়া দেখি, আমার কতটুকুই আর বাহিরে ফুটিয়া উঠিয়াছে? এক ভাগ যদি আমার প্রকাশ পাইয়াছে তো আর ত্রিপাদ যে অব্যক্তলোকে অমৃত হইয়া রহিয়াছে। এই অমৃত-গম্ভীর সত্তার যে সন্ধান না পাইল, সে নিজকে কতটুকু জানিল, পরকে কতটুকু ভালবাসিল? আলোতে ফুল ফোটে; কিন্তু অতলস্পর্শী আঁধার নির্ব্বাণ হইতে আসে তাহার রসের জোগান; বৃন্তে আঘাত করিয়া সে রসধারা হইতে ফুলকে বিচ্ছিন্ন কর, অপর্য্যাপ্ত প্রকাশের মাঝেও ফুল শুকাইয়া মরিবে।

এই অন্ধকারের সীমানায় আসিয়া মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে। হে বিজ্ঞানী, হে রসিক, সমস্ত চেতনাকে উদ্যত রাখিয়া তোমাকে সেখানে জাগিয়া থাকিতে হইবে। যে কোলাহলের মাঝে মানুষ জাগিয়া থাকে, তুমি সেখানে বধির। ইহাতে তোমার লোকসান আছে কি কিছু? জগতের ভোগ হইতে কেহ তোমায় বঞ্চিত করিল কি? মূঢ়ের দল জানে না, যে রস অন্নকে জীর্ণ করিবে, তাহা অন্নপাত্রে পরিবেষিত হয় না, তাহা প্রাণ-শক্তিতে নিগূঢ় হইয়া থাকে। যথার্থ ভোগ এই গূঢ়-শক্তির উদ্বোধনে; যথার্থ জ্ঞান এই বুদ্ধি-খদ্যোতিকার বিলোপে।

জানার জন্য তোমার আকুলি-বিকুলি, আমি বলি এ তো স্বাভাবিক; ভালবাসার জন্য তোমার হিয়া-দগদগি, আমি বলি এ-ও তো সহজ কথা। কিন্তু শুধু ওইটুকুই তোমার সব নয়। তোমার প্রকাশ-তুমির অন্তরালেও একটা অপ্রকাশ-তুমি রহিয়াছে; তোমার সমস্ত কামনা-বাসনার নির্ভর সেইখানে। শুধু তোমারই বা বলি কেন, জগতের সবার অহং ওইখানে পুঞ্জিত। ওইখানে তুমি তোমাকে পাইবে, তোমার ভালবাসার জনকে পাইবে। ওই প্রশান্তিতে যাহার প্রতিষ্ঠা হইল না, দুঃখ তারই—সুখও তারই; কিন্তু আনন্দ তার নয়,—অনাদি কাল তার নয়, অনন্ত দেশ তার নয়।

মরণ-ভীরু, কূলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিস্ কি? শঙ্কায় বারবার পিছু হটিয়া আসিতেছিস্ যে? একবার ঝাঁপাইয়া পড়্ পরিপূর্ণ প্রাণের উল্লাসে—সুধার সমুদ্রে ক্ষণিকের মরণ অনন্ত জীবনে রূপান্তরিত হইবে যে!

তীর্থ-সঙ্গমে

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

——)*:*(——

"ক্রমবিবর্তনবাদ বলছে যে আমরা অপূর্ণ হতে পূর্ণতর হচ্ছি। এতে কি জন্মান্তর প্রমাণিত হচ্ছে?"

এদিক দিয়ে যদি বিচার কর তাহলে বলতে হয়, এমন জন্মান্তর সুরু হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে, আর এর মাঝে পিছু হটা নেই; এমন কি একটা মানুষ যদি কাল শূয়র হয়ে জন্মায়, তবুও না। কাল যে মানুষের শূয়র হওয়ার কথা বলেছিলাম, ওটা একটা সম্ভাবিত উদাহরণ মাত্র। ওতে একটা দিক মাত্র বোঝান হয়েছে। কিন্তু গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হলে দুটো দিকই তো দেখ্‌তে হবে।

বিদ্যার্থীদের যখন গতি-বিজ্ঞান (Dynamics) শেখানো হয়, তখন ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বটাকে আমরা নিরপেক্ষ রেখে আলোচনা করি। অর্থাৎ আমরা ধরে নিই, যেন প্রকৃতিতে আর কোনও নিয়মের ক্রিয়া হচ্ছে না। তারপর একটু অগ্রসর হয়ে অন্যান্য নিয়মকানুনেরও আলোচনা সুরু হয়। তেমনি গত রাত্রে সময় ছিল না বলে কথাটার একটা দিক মাত্র আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু পুরোপুরি আলোচনা করতে হলে আর একটা দিকও দেখা দরকার।

আজকে কেউ অধঃপাতে যাবার চেষ্টা করতে পারে; হাঁ গো, একেবার পশুর মত জীবন কাটাবার দরুণ সে কোমর বেঁধে লাগ্‌তে পারে, জীবন হতে যত কিছু উন্নত প্রেরণা বা সুকুমার বৃত্তি সে একেবারে বেমালুম উড়িয়ে দিতে পারে। আর এমনি করে সে যদি বাস্তবিকই নিজকে একটা বাঁদর করে তুল্‌তে পারে, পশুর কামনা ছাড়া আর কোনও কামনা যদি তার অন্তরে না ঠাঁই পায়, তাহলে অবশ্যি এর পরের জন্মে সে বাঁদর হয়েই জন্মাবে। কিন্তু মানুষ তো তা পারে না। প্রকৃতিতে আরও শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে যে, তারা যে তাকে বাধা দেবে। এই শক্তিগুলি কি? এই যে দুঃখ, কষ্ট, যাতনা বলছ যাদের, তারা হচ্ছে তোমার অধঃপতনের পথের কাঁটা। ওরাই তোমার জাহান্নমে যেতে দিচ্ছে না, কাজেই উন্নতি তোমার অবধারিত; ক্রমবিকাশের জীবন তো উন্নতিরই নামান্তর, কাজেই জীবনের উন্নতি ধ্রুব; আর তার দরুণই এই অবিরাম প্রচেষ্টা এই চিরন্তন সংগ্রাম প্রয়োজন।

বেদান্তও বলছেন, তোমার দেহের মাঝেও অবিরাম এই লড়াই চল্‌ছে। এই যে চিত্তের আন্দোলন, যাতনা, বেদনা, ভাবনা, হতাশা, অধৈর্য্য, ছট্‌ফটানী—যারা তোমার বুক জুড়ে আছে, মনের মাঝে তুমুল তাণ্ডব সুরু করেছে যারা, তারা সবাই উন্নতির পথে তোমায় নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক জানি, এই সব শক্তির ঠেলায় তোমায় এগিয়ে যেতেই হবে। কালকেই তো বলেছিলাম, বাসনার সঙ্গে বাসনার সংঘাতে চিত্তে এই দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়।

একটা ব্যাপারই একজনের কাছে হর্ষের আবার আর একজনের কাছে বিষাদের নিদান হতে পারে। ধর একজন লোকের মাসে হাজার টাকা মাইনে; তার মাইনে কমে যদি পাঁচশ টাকায় দাঁড়ায়, তাহলে ওই পাঁচশ টাকাটাই হল তার দুঃখের কারণ। আবার একজনের মাইনে ছিল একশ টাকা, তার তরক্কী হয়ে পাঁচশ টাকা যদি মাইনে হয়, তাহলে সে যেন হাতে স্বর্গ পাবে, তার সুখশান্তির আর অবধি থাক্‌বে না। তাই বলছিলাম কি, নিরপেক্ষভাবে দেখ্‌তে গেলে কোনও অবস্থাকেই ভালও বল্‌তে পারি না, মন্দও

বল্‌তে পারি না। বল্‌তে গেলে সকল অবস্থাই অনিশ্চিত, কেননা স্বভাবতঃই কোনও কর্ম্ম পাপও নয়, পুণ্যও নয়। সব নির্ভর করছে, চারদিককার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক, তার ওপর। এখন যে অবস্থায় আছ, এ যদি তোমার উন্নতির অনুকূল হয় তো তুমি সুখী; এ যদি তোমার উন্নতির প্রতিকূল হয় তো তুমি দুঃখী। কাজেই এই বিভিন্ন বাসনার সংঘাতেই তোমার উন্নতি-অবনতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; এই বাসনার বিক্ষোভটা পূর্ব্বজন্মের পুঁজি নয়; এটা তোমার এই জন্মের জড়ত্ব কাটিয়ে উঠবার স্বাভাবিক উপায় মাত্র। যদি জড়ত্বেরই জোর বেশী হয়, আত্মশক্তি যদি নির্জ্জীব হয়ে পড়ে, তাহলেই দুঃখ পাও। এই দুঃখকষ্টগুলো হচ্ছে আত্মার স্মারকলিপি। এরা তোমায় যেন হুঁস করিয়ে দেয়, তোমার উন্নত প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমার আধ্যাত্মিক রোগ আরাম করে। দুঃখ-কষ্ট যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ। দুঃখ-কষ্ট না থাকলে কি জীবন উন্নত হত? তাই বেদান্ত বলছেন যে দুঃখের বিধান আছে বলেই জীবের অধোগতির আশঙ্কা নাই। মনে করো না যে তুমি চিরকাল নীচে পড়ে থাকবে, কেবল জাহান্নমের পথেই গড়িয়ে যাবে।

যদি দেখ, কেউ তোমার চেয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে, তাকে ঈর্ষ্যা করা কেন ভাই? একদিন তুমিও যে তার জায়গায় গিয়ে পৌছাবে। যদি দেখ কেউ তোমার চেয়ে বহু নীচে পড়ে আছে, তার প্রতি ভ্রূকুটি করা কেন ভাই? একদিন সেও যে তোমার জাগায় এসে হাজির হবে। দশজন্ম আগে তুমি যেখানে ছিলে, আজ হয়ত এই লোকটী সেই জায়গায় এসেছে; আবার দশজন্ম পরে তুমি যা হবে, ওই লোকটী হয়ত আজ তাই হয়েছে। কাজেই তোমার মাঝে বিশ্বের জন্য দরদ থাকা চাই। কাউকে ছোট নজরে দেখ্‌লে চলবে না। যারা তোমার ওপরে আছে, তাদের ঈর্ষ্যা করো না, তুমিও একদিন সেখানে যাবে। এমনি করে বুদ্ধকে বিশদ করে বেদান্ত তোমার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে দেয়।

*

"যদি দুঃখের বিধান মেনেই আমাদের উন্নতির পথে চল্‌তে হয়, তাহলে বংশানুক্রম-বিধানের (Law of Heredity) মাঝে কোনও সত্য আছে কি? বাপ-মায়ের কোন একটা ব্যাধি থাক্‌লে সন্তানেও তা সংক্রামিত হয়। এর মীমাংসা কি?"

মনে আছে তো, কাল বলেছিলাম যে বাপ-মাও তৈরী করে নিই আমরা নিজেই। ধর, এই লোকটা ব্যাধিগ্রস্ত। মনে কর, ব্যারামটা লোকে যাকে বলে খুবই খারাপ—যদিও বাস্তবিক পক্ষে খারাপ বল্‌তে নিশ্চিত কিছুই বোঝায় না—কেননা জগতে সবই শিবময়। তবুও ধর, এই লোকটার ব্যাধি হচ্ছে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা পাশব-প্রবৃত্তির প্ররোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত। মরার পর এই লোকটা এমন একটা পারিপার্শ্বিক বেছে নেবে, যেখানে তার এই বাসনাগুলো পরিতৃপ্ত হয়। সোজা কথায় বল্‌তে গেলে, ফল ধর্‌বার আগেই এই বাসনাগুলো দেখা দেবে।

আধ্যাত্মিক সন্নিকর্ষের আইন অনুযায়ী এই লোকটা এমন সব লোকের দিকে ছুট্‌বে, এমন বাপ-মা বেছে নেবে, তার দেহটা এমন হবে, যাতে এই বিশেষ বাসনাগুলো সে চরিতার্থ কর্‌তে পারে। কাজেই অনুরূপ ব্যাধিগ্রস্ত বাপ-মায়ের কাছেই তো সে আস্‌বে। এতে বংশানুক্রমবিধানও বজায় থাক্‌ল, কারণ তার দেহের অণু পরমাণুতে এমন সংস্কার আহিত রয়েছে, যাতে তার কামনার পরিপূরণ হওয়া সহজ হয়। ধর, একজন লোক বল্‌ছে, "আমার একখানা বই বের কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।" বই বের কর্‌তে হলে তাকে যেতে হবে ছাপাখানায়; সেখানকার লোকেরা তাকে সব উপাদান জুটিয়ে দেবে, তার হয়ে তারা খাট্‌বে। বংশানুক্রমবিধানটা যেন ছাপাখানারই মত, বাসনার অনুরূপ মালের জোগানদার সে। "একজনের খুন কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে;

যে ছুরী বেচে, সে তার হাতে ছুরীখানা যেন তুলে দিল, আর তাই সে তার দুষ্‌মনের বুকে বসিয়ে দিল। দোষটা তো ছুরী তৈরী করেছে যে তার নয়, কিন্তু ছুরী মেরেছে যে, তার।

বাপ-মা আমাকে এই দেহ দিয়েছে, কেননা আমি যে এই দেহটাই চেয়েছিলাম। যেমনটা চেয়েছি, তেমনটা পেয়েছি—রোগা শরীর হল তো তার কি করব? এখানে একটা কথা ওঠে। বাসনাপূরণের জন্য মানুষ যদি শরীর গ্রহণ করে তো সে বেছে বেছে রোগা শরীরটাই নেবে কেন? কথাটা কি জান, আমাদের কামনা পূরণও করতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কামনা ত্যাগও করতে হবে। মানুষ তার নিয়তিরই নিয়ন্তা। তুমি নীচু বাসনা ছেড়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাগুলো বরণ করে নিচ্ছ কি না, সে তোমার খুসী। দুঃখ-যন্ত্রণা তোমায় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না, বরং তারা মুক্তির পোষ্টাই। দুঃখ পাই বলেই, জেনেই হোক্‌ আর না জেনেই হোক্‌ আমরা আরও সতর্ক হই, চারদিক ভেবে-চিন্তে চলি; কাজেই আপন খুসীতেই তো নীচু কামনা ছেড়ে উঁচু বাসনাকে বরণ করে নিই। তবেই দেখ, দুঃখযন্ত্রণা আমাদের কাবু করছে না তো—তারা আমাদের দিচ্ছে মুক্তির আশা।

একটা লোকের কুপ্রবৃত্তিগুলো বড় প্রবল। এখন কুপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিও চাই, আবার পরিবর্জ্জনও চাই; দুটোই আইন। একের হুকুম, পাশব বাসনার চরিতার্থতা চাই; আচ্ছা তাই হবে। আবার এই ইন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই আস্‌ছে দুঃখ-যাতনা। এই দুঃখ তোমাকে দুর্ব্বলতা হতে বাঁচবে। এই জন্যই যে পারিপার্শ্বিককে মানুষ চায় না, তাও তাকে মেনে নিতে হয়, সয়ে যেতে হয়।

*

"কুবাসনা আর বংশানুক্রমিক ব্যাধির সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তা বুঝলাম। কিন্তু ধরুণ ক্ষয়রোগ, এ তো আমাদের ভোগলিপ্সারই ফল। এর মাঝে কামনার কথা আসে কোথা থেকে?"

দেখ, স্থূ-কু পাপ পুণ্য বললেই একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় না। লোকে যাকে পাপ বা পুণ্য বলে মনে করে, বেদান্ত তাকে তা মনে করে না।

বেদান্ত বলে অপরিমিত আহার বা যে আহারে অজীর্ণ ও তামসিকতা নিয়ে আসে, তাই হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল। এই ভুঁড়িতে একটু গোল থাকে বলেই অধিকাংশ পাপের উদ্ভব হয়। হজমের গোলমাল হলেই মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়, আর তা থেকে পাপে মতি হওয়ার সম্ভবনাটা বেশী হয়। বেদান্ত বলে, যা তোমার ব্রহ্মানন্দকে ব্যাহত বা খণ্ডিত করছে, তাই হচ্ছে পাপ। কাজেই তোমার অধিকাংশ পাপের মূল নিদানই হচ্ছে খাওয়াটা। রাম এই কথাটির ওপর যতটা জোর দেন, আর কোনও প্রচারকই ততটা দেন না বটে, কিন্তু তবুও এটা খাঁটী কথা। শুধু নিজের অভিজ্ঞতা হতেই নয়, বন্ধুবান্ধবের অভিজ্ঞতা হতেও রাম বল্‌তে পারেন, পাকস্থলীটা যদি আরামে থাকে, শরীরটা যদি সুস্থ থাকে, মেজাজও তাহলে বশে থাকে, ইন্দ্রিয় সংযত হয়, বাসনা-কামনা হাতের মুঠোয় থাকে।

আজ একজনকে দেখছ আদর্শ পুণ্যাত্মা পুরুষ, সহস্র প্রলোভন তিনি জয় করেছেন, ইন্দ্রিয়কে বশ করেছেন। তাঁর নির্ম্মল অবদানে এবং বর্ত্তমান আচরণে মুগ্ধ হয়ে মানুষ হয়ত বল্‌বে, "আহা যেন সাক্ষাৎ ভগবান্‌।" আবার কালই হয়ত দেখ্‌বে, ওই মানুষই জঘন্যতম রিপুর দাস।

মানুষ ধাঁ করে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেল্‌তে চায়। তারা একজনের কপালে ছাপ মারবে "সাধু"—আর একজনের কপালে—"দুরাচার!" অথচ কাল যে সাধু ছিল, আজ তার দুরাচার হতে কোনও বাধা নাই; আবার যে ছিল দুরাচার তারও সাধু হতে কোথায়ও আটকায় না তো।

চার্লস্‌ ডিকেন্সের A tale of Two Cities বলে একখানা উপন্যাস আছে। তার মাঝে Sidney

Cartonএর চরিত্র একেবারে অতি জঘন্য করে আঁকা হয়েছে; অথচ এই কার্টনের মৃত্যু এমনি বীরত্বব্যঞ্জক, এমনি মহিমময় যে ওতেই তার সকল অপরাধ, সকল কলঙ্ক ক্ষালিত হয়ে গেছে। টল্‌স্টয় তাঁর একটী নভেলে একটী নারীকে বার বার ব্যভিচারিণীরূপে অঙ্কিত করেছেন; কিন্তু তার মৃত্যুর চিত্রটী এতই মর্ম্মস্পর্শী যে তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একেবারে পাল্‌টে দেয়।

লর্ড বায়রন্‌কে ইংলণ্ডের সবাই ছি-ছিংক্কার করত, রাস্তা দিয়ে তাঁর চলবার উপায় ছিল না। তাঁর সান্নিধ্যকে মানুষ ঘৃণাসহকারে বর্জ্জন করেছে। কিন্তু তাঁর শেষ চিত্রগুলি এমনি উদ্দীপক ও মহিমময় যে ইংরেজজাতি তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারেনি। তবে সব সময়ই আমাদের মরণটাই যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, তা নয়।

লর্ড বেকন যখন লর্ড-সভায় প্রথম বক্তৃতা দিলেন, লোকে শুনে অবাক্ হয়ে গেল। সবাই বল্‌তে লাগ্‌ল, "লোকটা রাতারাতি নাম করে ফেলেছে হে!" কিন্তু সেই বেকনই শেষকালে দেশবাসীর চক্ষুশূল হলেন।

সার ওয়াল্টার স্কটকে প্রথম জীবনে বায়রনের মত বড় কবি বলে কেউ মনে করতে পারেনি। রাজকবিরূপে তাঁর কৃতিত্ব কিছুই নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে তাঁর লেখা এমনই চমৎকার হয়েছিল যে লোকে তাঁকে বলত উপন্যাসসম্রাট।

তাই রাম বলছেন, যাদের সংস্পর্শে আসছ, অনন্ত শক্তি তাদের মাঝে নিহিত রয়েছে, তাদের এই অধ্যাত্ম মহিমায় প্রত্যয় রাখ। মানুষের বিচারক বনো না, কারু সম্বন্ধে একটা মত খাড়া করো না, কাউকে দোষী ঠাউরিয়ে বসো না।

আচ্ছা ধর, এই লোকটা দুষ্টু। তার প্রতি তোমার চিত্তে যেন কোনও কুসংস্কার, ঘৃণা বা বিদ্বেষ না থাকে। তার মাঝে আত্মার অনন্ত শক্তি সুপ্ত রয়েছে, এই বিশ্বাসে তার দিকে এগিয়ে এস। ভুলো না, আজ যে জোচ্চোর, কাল সে মহাবীর, মহাসাধু হতে পারে। কারু স্বভাব মার্কামারা নয় তো। আত্মশক্তির অনন্ত সম্ভাব্যতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে কখনো শ্রদ্ধার অভাব যেন না হয়।

যে কেউ তোমার কাছে আসুক না কেন, তাকেই জান ব্রহ্মস্বরূপ। আবার তোমাকেও তুমি কখনো হীন মনে করো না। আজ যদি জেলে গিয়ে থাক তো কাল লোকমান্য হতেও পার।

বাইবেলের প্রাচীন অংশে সেম্‌সনের কাহিনী আছে। স্বজাতির সে সর্ব্বনাশ করেছিল; কিন্তু এমন শক্তিও তার ছিল যে অতীতকে সে পালটিয়ে দিতে পারত, সব কলঙ্ক মুছে ফেল্‌তে পারত। তোমার মাঝে যে ব্রহ্মস্বরূপ রয়েছেন, যে আত্মার মহিমা, ভগবানের বিভূতি সুপ্ত রয়েছে, তার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুক। ওই সত্যকেই আঁকড়ে ধর—লোকে যা বলে বলুক না—কাণ দিও না তাদের কথায়। তোমার দুর্ব্বলতা কিছুই না—কেননা তুমি ইচ্ছা করলেই তা জয় করতে পার, যা ক্ষতি করেছ, তা পূরণ করতে পার।

আত্মার সম্পদ্ যেখানে আছে, সেখানে সবই আছে; আর এই অধ্যাত্ম সম্পদ্ সবখানেই থাকতে পারে।

ধর্ম্মধ্বজীরা জগতে পাপ-পুণ্যের হিসাবটা ঠিক বুঝতে পারে না। সমস্ত পাপের মূল যা, তাকে তারা উৎখাত করতে পারে না। যে আজ সকল প্রলোভন জয় করেছে, কাল সে ফেরারী খুনী আসামী হতে পারে তো! কর্ম্মানুরূপ দেহগ্রহণের তত্ত্ব দিয়ে এটা বোঝান যেতে পারে।

স্থূলতঃ আমাদের প্রকৃতিগত এই বিপর্য্যয়কে এই ভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে যে, যখন তোমার শরীরটা ভাল থাকে, পেটের গোলমাল না থাকে, তখনই তোমার নৈতিক-চরিত্রও সবল থাকে,

প্রলোভন জয় করা তোমার পক্ষে তখন সহজ। কিন্তু কাল হয়ত তোমার অসুখ করতে পারে, পেট খারাপ হতে পারে, তখন যা তা একটা কিছুতেই তুমি বিচলিত, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেতে পার। এটা সত্যি কথা কিন্তু।

আশ্চর্য্য এই, ধর্ম্মের পাণ্ডা যাঁরা, তাঁরা এই ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে ইজ্জতহানি হবে বলে মনে করেন!

আহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক হবে, তাহলেই ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পারবে। অনুচিত খাদ্যগ্রহণ, অপরিমিত আহার—এই হচ্ছে সকল পাপের মূল। বেদান্তের মতে, আহারে যার সংযম নাই, সে সপ্ত মহাপাতকীর চেয়ে কিছু কম ভোগে না। পেটপূজার ফলেই ওই রকম ব্যাধিগ্রস্ত বাপমায়ের ঘরে জন্ম নিয়ে রোগ ভোগ করতে হয়, আর দুঃখের অগ্নিশুদ্ধিতে ক্রমে সত্যলাভের অধিকার জন্মে।

(ক্রমশঃ)

মানমেয়োদয়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রমাণ-পরিচ্ছেদ

প্রকার ভেদ

আমাদের মতে প্রমাণ ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমিতি, অর্থাপত্তি এবং অভাব ॥৫॥

চার্বাকগণের মতে কিন্তু (প্রত্যক্ষ) **একমাত্র প্রমাণ; বৌদ্ধ ও বৈশেষিকগণ** (প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে) **দুইটী প্রমাণ মানেন; ভাসর্বজ্ঞ ও সাংখ্যগণ** (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই) **তিনটী প্রমাণ এবং উদয়ন প্রভৃতি দার্শনিকগণ** (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই) **চারিটী প্রমাণ স্বীকার করেন; প্রাভাকরগণ** (পূর্ব্বোক্ত চারিটী প্রমাণ ও অর্থাপত্তি এই) **পঞ্চবিধ প্রমাণ এবং বেদান্তী ও আমরা** (ভাট্ট মীমাংসকগণ) (প্রভাকরোক্ত প্রমাণপঞ্চক ও অভাব এই) **ছয়টী প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া থাকি; পৌরাণিকগণ** (পূর্ব্বোক্ত ছয়টী প্রমাণ এবং) **সম্ভব ও ঐতিহ্য এই অতিরিক্ত প্রমাণ দ্বয় স্বীকার করেন—তাই তাঁহাদের মতে প্রমাণ অষ্ট প্রকার ॥৬॥**

ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়। কাহারা

ইন্দ্রিয় ? বলিতেছি।—চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, স্পর্শন (ত্বক্), শ্রোত্র ও মন এই ছয়টী ইন্দ্রিয়।

চক্ষু হইতেছে তারকার অন্তরগত তেজ ; জিহ্বার অগ্রস্থিত তোয়াংশের নাম রসনা ; নাসিকার অভ্যন্তরস্থিত ক্ষিতির অবয়বকে ঘ্রাণ বলা হয় ; সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত বায়ুবিন্দুসমূহের নাম ত্বক্ ; কর্ণোদরস্থিত আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয় ; মন কিন্তু বিভু (সর্ব্বব্যাপী), তথাপি দেহেই কার্য্যকারী হইয়া থাকে ॥৭॥

(এখন এইরূপ কল্পনার হেতু কি, তাহা বলিতেছি)। (হেতু ব্যতিরেকে যখন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তখন) রূপজ্ঞানের কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে ; এইরূপে সামান্যতঃ কারণ সিদ্ধ হইলে পর—দীপ প্রভৃতি তেজোদ্রব্য রূপজ্ঞানের হেতু হয় দেখিয়া—রূপজ্ঞানের (বিশেষ) কারণ চক্ষু তৈজস পদার্থ হইবে, এইরূপ কল্পনা করা হয়। সেইরূপ রসজ্ঞানের কারণ কল্পনা করিতে হইলে, শুষ্ক বস্তুতে জলই রসের অভিব্যক্তির কারণ, ইহা দেখিয়া আমরা রসনাকে আপ্য (জলীয়) দ্রব্য বলিয়া কল্পনা করি। এইরূপে পার্থিব নিম্বত্বগনুলেপন চন্দনগত গন্ধের অভিব্যক্তি সাধন করে দেখিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব কল্পিত হইয়াছে।* ব্যজন-পবন (পাখার বাতাসে) অঙ্গ-সঙ্গত জলের স্পর্শ অভিব্যক্ত করে, ইহা দেখিয়া স্পর্শজ্ঞাপক ত্বগিন্দ্রিয়ের বায়বীয়ত্ব কল্পনা করা হয়। পরিশেষ- (৯) প্রমাণের সাহায্যে শব্দগ্রাহক শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশাত্মক, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, (ক্ষিতি প্রভৃতি) যাহা অন্য ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক, তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক নহে ; তাই তেজঃ প্রভৃতি যখন অন্য ইন্দ্রিয়ের (চক্ষুরাদির) আরম্ভক, তখন তাহার শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উপাদান হইতে পারে না। অথচ বহিরিন্দ্রিয়গুলি যে ভূতাত্মক (*material*), সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব

* মূলে—"চন্দনগতস্য পার্থিবনিম্বত্বগনুলেপনস্য গন্ধাভিব্যঞ্জকত্বদর্শনাৎ"—এই পাঠ আছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাপার দৃষ্টান্তের সহিত সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে না।

(৯) **পরিশেষ**—"...পরিশেষঃ...প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সংপ্রত্যয়ঃ"—যেস্থলে অনেক বস্তুর প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেস্থলে যদি সম্ভাবিত বস্তুসমূহের অন্য সকলেরই (কোন কারণে) নিষেধ হইয়া যায় এবং একটী মাত্র বস্তুই অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই বস্তুটীর জ্ঞানকে পারিশেষ প্রমাণ বলে। আর যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার প্রাপ্তিই নাই বলিয়া তাহার বিধি বা নিষেধ প্রয়োজন হয় না। পরিশেষের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—কোন স্থলে ধূম দেখিয়া সামান্যতঃ অগ্নির অনুমান হইলে, যদি এই অগ্নির কি ইন্ধন ইহা জানিবার কৌতুহল হয়, তবে আমরা অনেক বস্তুই কল্পনা করিতে পারি। মৃত্তিকা, পাষাণ প্রভৃতির সম্ভাবনা না থাকায়, উহাদের কল্পনা অবশ্য করি না ; তাই তৃণ, পর্ণ, কাষ্ঠ প্রভৃতিরই কল্পনা করি। কিন্তু যখন ধূমের বৈজাত্য (peculiarity) আলোচনা করিয়া তৃণ প্রভৃতির নিষেধ করি এবং ইহার ইন্ধন গোময়ই হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া থাকি, তখন আমরা এই পরিশেষ-প্রমাণই অবলম্বন করিয়া থাকি। তাই অন্য সমস্ত সম্ভাবনীয় বস্তুকে বাদ দিয়া একতরের যে নিশ্চয় হয়, ইহাকে পরিশেষ বলে। পরিশেষকে পারিশেষ্যও বলা হয়। ইংরাজী তর্কশাস্ত্রে ইহাকে (Method of Residue) বলে। (ন্যায়মঞ্জরী—পৃঃ ১৩২)

[অন্য ভূতগুলি (*elements*) যখন বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় নির্ম্মাণে পর্য্যবসিত, তখন] অবশিষ্ট আকাশাখ্য ভূত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ই হইবে, (ইহা প্রমাণসিদ্ধ)।

তার্কিকগণ কিন্তু শব্দকে আকাশের গুণ বলিয়া মনে করেন, এবং ঈদৃশ শব্দের গ্রাহক আকাশাত্মক হইবে, এইরূপ অনুমান করেন। কিন্তু শব্দ যে আকাশের গুণ, তাহাই অসিদ্ধ। তাই এরূপ অনুমান অযৌক্তিক।

সুখাদির অপরোক্ষ জ্ঞানের সাধন বিধায় মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কল্পিত হইয়াছে। মনের বিভুত্ব (সর্ব্বগতত্ব) প্রমাণীকৃত হইবে। তথাপি শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইলেই উহা ইন্দ্রিয়রূপে কার্য্যকারী হয় বলিয়া মন শরীরের মধ্যেই কার্য্য (সুখাদি জ্ঞান) সম্পাদন করিয়া থাকে। বাহ্য রূপাদি জ্ঞানেও মনের প্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু চক্ষুরাদির অধীন (১০) হইয়াই তাহাতে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ অনুমানাদিতেও লিঙ্গাদিকে (১১) সহায়-রূপে লাভ করিয়াই মনের প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

এখন চক্ষু ও শ্রোত্র প্রাপ্যকারী (১২) কিনা, এ বিষয়ে মত-বৈষম্য আছে। কিন্তু ইহারাও যখন বহিরিন্দ্রিয় এবং ত্বক্ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব অবিসম্বাদিত, তখন ইহাদেরও প্রাপ্যকারিত্ব (অনুমান সাহায্যে) সাধন করা যাইতে পারে। তাহা হইলে চক্ষু যখন পৃথুকায় পর্বতাদিকে গ্রহণ করে, তখন চক্ষুর অগ্রভাগ যে পৃথু, ইহা কল্পনা করিতে হইবে এবং এইরূপ কল্পনা চক্ষুর তেজঃ-স্বভাব দ্বারাই সিদ্ধ করা যাইতে পারে। আর যখন চক্ষুর উন্মীলনকালেই অতিদূরস্থিত শনৈশ্চরাদির দর্শন হইয়া থাকে, তখন চাক্ষুষ তেজের নির্গমনসময়েই সর্ব্ব-ব্যাপ্ত বাহ্য আলোকের সহিত একীভাব ঘটিয়া থাকে, ইহাও কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু বাহ্য তেজ যখন সর্ব্বব্যাপী, (আর তাহার সহিত চাক্ষুষ তেজের যখন একীভাব হইয়া থাকে), তখন কেরল দেশ হইতেও গঙ্গা দর্শন হইতে পারে, এ আপত্তিও করা যাইতে যাইতে পারে না। কেননা, [অদৃষ্ট (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক]। তাই

(১০) বহির্ব্বস্তু জ্ঞানে মন স্বতন্ত্র ভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে অন্ধ বধির ইত্যাদি ভেদ উড়িয়া যাইত। তাই রূপ প্রত্যক্ষে মন চক্ষুর অধীন, রসজ্ঞানে জিহ্বার অনুবর্ত্তী; শব্দ-জ্ঞানে শ্রবণেন্দ্রিয় সাহায্যেই সমর্থ। "চক্ষুরাদ্যুক্ত-বিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মনঃ॥"

—(তত্ত্ববিবেক, ২০)

(১১) **লিঙ্গাদি**—লিঙ্গ (middle term); নামান্তর—হেতু, গমক, সাধন ইত্যাদি। (বিশেষ বিবরণ—"আর্য্য-দর্পণ," জ্যৈষ্ঠসংখ্যা, ১৩৩৬, "অন্তর্ব্যাপ্তি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

(১২) **প্রাপ্যকারিত্ব**—কারক মাত্রেই কার্য্যের আলম্বন-কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে বলিয়া কারককে প্রাপ্যকারী বলা হয়। কারণকে প্রাপ্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া প্রাপ্য-কারী এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাই ইন্দ্রিয় যখন বিষয়জ্ঞানের কারণ, তখন সে বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়াই তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া দিবে। স্পষ্টই অনুভব করি, জিহ্বা ও ত্বক্ স্বসংশ্লিষ্ট বস্তুরই রস ও স্পর্শ গ্রহণ করে, দূরস্থিত বস্তুর রস বা স্পর্শজ্ঞান সম্ভব হয় না; তখন অন্য সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়ও স্বসংশ্লিষ্ট বস্তুরই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ইহা সামান্যতোদৃষ্ট অনু-

অদৃষ্টের বশে যেটুকু আলোকভাগ গৃহীত হইবে, তাহার সহিতই একীভাব হইয়া থাকে, (সমস্ত আলোকভাগের সহিত হয় না বলিয়া সর্ব্ববস্তু দর্শন হইয়া উঠে না)।

তার্কিকগণ কিন্তু এই দূরদর্শন বেগের আতিশয্যে সংঘটিত হয়, ইহা অনুমান করেন।

মানের (inference by analogy) সাহায্যে অবগত হওয়া যায়। সাংখ্য ও বেদান্তাচার্য্যগণ কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের মতে মনও প্রাপ্যকারী। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক ও মীমাংসকগণ বাহ্যেন্দ্রিয়েরই প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকার করেন। এখন এই প্রাপ্যকারিত্বের সাধক যুক্তি এই যে, যদি ইন্দ্রিয় স্বাভাবিক শক্তির বলে বিষয় গ্রহণ করে বলা যায়, তবে প্রাচীরাদির দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর জ্ঞান কেন হয় না, ইহার সদুত্তর দেওয়া অসম্ভব। যদি বল, ব্যবহিত বস্তু গ্রহণে ইন্দ্রিয়ের শক্তি নাই এরূপ কল্পনা করিব, তাহা হইলে ইহাই বল না কেন, চক্ষু তেজঃস্বভাব, তাহার প্রাচীরাদির দ্বারা প্রতিরোধ হয় বলিয়া ব্যবহিত বস্তুর বস্তুর দর্শন হয় না ? শক্তি যখন অমূর্ত্ত, তখন ব্যবধান তাহার বাধক হইতে পারে না। অপিচ ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরও প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বায়ু দ্বারা উপনীত কুন্দপুষ্পাদির পরমাণুসমূহ নাসিকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেই গন্ধের গ্রহণ হয়, ইহাই কল্পনা করা উচিত। এই কারণেই ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অশুচিদ্রব্য ঘ্রাণে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন; যেহেতু দ্রব্যের পরমাণুসমূহের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণ কিন্তু চক্ষুর্গোলককেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলিয়াছেন; তাঁহারা বলেন যে, যদি চক্ষু তেজঃস্বভাব হয়, তবে গোলকের দোষে তাহার দোষ হইত না এবং গোলকের চিকিৎসায় যে দৃষ্টিশক্তির উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহাও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এ মতের সারবত্তা নাই; গোলক যখন তেজের আধার, তখন তাহার সংস্কারে তৈজস ইন্দ্রিয়েরই উপকার হইয়া থাকে—ইহা কিছু বিচিত্র নয়। আর চক্ষু গোলকমাত্রই হইলে, তাহা অপ্রাপ্যকারী হইবে।

তাহা হইলে অপ্রাপ্ত পর্ব্বতের গ্রহণ ও প্রাপ্ত অঞ্জন রেখার অগ্রহণ কি করিয়া সম্ভব হইবে ? চক্ষু প্রাপ্যকারী, ইহা স্বীকার করিলে কোন বাধাই থাকে না। আর—শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ-স্বভাব বলিয়া তাহার বিষয়-দেশে গমন সম্ভব না হইলেও শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-দেশেই গৃহীত হয়, ইহা কল্পনা করিতে হইবে। শব্দ উৎপন্ন হইলে শব্দান্তরের সৃষ্টি করে, সে আবার অন্য শব্দ সৃষ্টি করে—এইরূপে বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে প্রবাহানীত শব্দ কর্ণপটহে সংশ্লিষ্ট হয়। কেহ কেহ বা কদম্বগোলক-ন্যায়ে একটী শব্দ উৎপন্ন হইলে সর্ব্বদিকে শব্দপ্রবাহ সৃষ্টি হয়—পরে কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলে ধ্বনিজ্ঞান হয়—এরূপ কল্পনা করেন। কারণ তাঁহারা বলেন, বীচিতরঙ্গ তো সর্ব্বদিকে প্রসৃত হয় না, তখন যুগপৎ নানাদিকে অবস্থিত ব্যক্তিগণের শব্দ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, তাই কদম্বগোলক-ন্যায়ে নানাদিকে যুগপৎ শব্দপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, এই কল্পনাই (hypothesis) সাধু।

"বেদান্তপরিভাষা"কারও ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বই স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে ঘ্রাণ, রসন ও ত্বগিন্দ্রিয় স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই বিষয় গ্রহণ করে; কিন্তু চক্ষুর ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও যখন পরিচ্ছিন্ন, তখন তাহার বিষয়-দেশে গমন অসম্ভব নহে। আর বিষয়-দেশে গমন স্বীকার না করিলে 'ভেরীশব্দ শুনিয়াছি' এরূপ জ্ঞান সম্ভব হইত না, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তপরিভাষাকারের এই মত অন্য কোন দার্শনিক গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জানি না।

বৌদ্ধগণ কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়ের একটী স্বাভাবিক শক্তি আছে, যাহার দ্বারা যে বিষয়-বিশেষকে গ্রহণ করে। "বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না হইলেও যদি প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়, তবে তো সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞান হইবে—কারণ সকলই যখন অপ্রাপ্ত, তখন একটীর জ্ঞান হইবে, অপরের হইবে না, ইহার নিয়ামক কি ?" ইহার উত্তরে বৌদ্ধেরা বলেন যে, পদার্থের স্বাভাবিক শক্তিই তাহার বিষয় নিয়মন করে; ইহার নিমিত্ত প্রাপ্তিস্বীকার অনাবশ্যক। আর "সমস্ত কারণই প্রাপ্যকারী" নৈয়ায়িকের এই উক্তিও অসঙ্গত; কারণ, অয়স্কান্ত (চুম্বক) অপ্রাপ্ত লৌহকেই আকর্ষণ করে দেখা যায়। আর প্রাপ্ত হইলেও কাষ্ঠাদির আকর্ষণ করে না। ইহার জন্য

কিন্তু অনন্ত যোজন ব্যবধানে অবস্থিত শনৈশ্চরাদির দর্শন কেবল বেগের সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে, ইহা সম্ভাবনারও অযোগ্য। তাই

শক্তির প্রতিনিয়মই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, অয়স্কান্তের প্রভা লৌহে পতিত হয়, তাই সে লৌহকে আকর্ষণ করে, কারণের অপ্রাপ্যকারিত্ব কোথায়? তাহাও ঠিক্ নয়। কারণ, চুম্বক প্রাপ্ত কাষ্ঠাদিকে আকর্ষণ করে না, লৌহকেই আকৃষ্ট করে. ইহার কারণ কি? যদি স্বভাব-নিয়ম ইহার কারণ হয়, তবে অপ্রাপ্ত হইলেও এই নিয়মের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, মধ্যে একটা প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) স্বীকার করায় অনর্থক গৌরব মাত্র। প্রাপ্তি না থাকিলে দূর, মধ্য ও সমীপস্থিত ব্যক্তিগণের এক কালেই শব্দাদির গ্রহণ হইবে, এ আপত্তির কোন সারবত্তা নাই, কেননা বৌদ্ধগণ শব্দাদির যুগপৎজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই বলেন। তাহা হইলে তীব্র-মন্দাদির জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, দূরত্ব ও নিকটত্ব হেতু যেমন রূপের স্পষ্টত্ব ও অস্পষ্টত্ব জ্ঞান হয়, সেইরূপ শব্দেরও হইবে। কিন্তু রূপেরও তো প্রাপ্তিপূর্ব্বকই জ্ঞান হয়, তখন এ দৃষ্টান্ত অচল—ইহা বলিতে পার না, কেননা যদি প্রাপ্তিপূর্ব্বক জ্ঞান হইত,—সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্টের (দূরস্থের) এক কালে গ্রহণ হইত না; কিন্তু বৃক্ষের শাখা ও আকাশস্থ চন্দ্রের এককালেই জ্ঞান হয়। উদ্দ্যোতকর অবশ্য বলিয়াছেন যে ক্রমেই শাখা ও চন্দ্রের জ্ঞান হয়, কিন্তু শীঘ্রভাবিত্ব নিবন্ধন তাহাদের কালভেদ গৃহীত হয় না। কিন্তু এ মত অগ্রাহ্য। কেননা, শীঘ্রভাবিত্ব ক্রমজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না; তাহা হইলে 'সরঃ', 'রসঃ' প্রভৃতি শব্দের ক্রম গৃহীত হইত না, কারণ বর্ণের উচ্চারণও শীঘ্রই হইয়া থাকে। আর সমস্ত জ্ঞানই যখন ক্ষণিক ও আশুভাবী, তখন কোন কালেই ক্রমজ্ঞান হইতে পারে না। তাই, আশুভাবিত্ব থাকিলে ক্রমের জ্ঞান হয় না, ইহা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু দূরের অগ্রহণ এবং নিকটের গ্রহণ হয়—এই ভেদের কারণ কি? তাহার কারণ, দূর জ্ঞানের বিষয় হয় না, নিকটই হয়। এবং বিষয় হওয়া বা না হওয়া—তাহার কারণ 'সম্বন্ধ' আমরা এ মত উপেক্ষা করিয়াছি।

এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কারণ তাহাদের রূপ ও

নহে, কিন্তু শক্তিস্বভাব। তাহা না হইলে, চক্ষু রূপই গ্রহণ করে, রূপের সহিত এক আধারে স্থিত রসকে গ্রহণ করে না কেন, ইহার কি সমাধান? চক্ষুর সহিত রসের সম্বন্ধ হয় না, রূপের সহিতই হয়, ইহা বলিয়া মূঢ়ের চোখে ধূলা দেওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্বন্ধই বা হয় না কেন, তাহার কি নিয়ামক? যদি বল, বিষয়ের স্বাভাবিক শক্তিই ইহার নিয়ামক, তবে এই শক্তির নিয়মই স্বীকার কর—'সম্বন্ধ' বলিয়া আর এক ব্যাপারকে টানিয়া আনায় লাভ কি?

কিন্তু, একই বস্তুর কি করিয়া স্পষ্ট, অস্পষ্ট, তীব্র, মন্দ এইরূপ ভিন্ন জ্ঞান হয়? ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা রূপ ও রস জ্ঞানেরও বিষয় এক হইতে পারে—এই আপত্তির পরিহারে বৌদ্ধেরা বলেন যে প্রাপ্তি পক্ষেও এ আপত্তি খাটে। বিষয়ের সহিত যখন সম্বন্ধ হইয়াই জ্ঞান হইয়া থাকে, তখন তো একরূপ জ্ঞান হওয়াই উচিত। যদি বল, দূরত্বপ্রযুক্ত বিষয় বা ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্যেই এইরূপ ভিন্ন প্রতীতি হয়, তবে সে কথা তো বৌদ্ধও বলিতে পারেন। আর প্রাপ্তি স্বীকার করিলে, কর্ণকণ্ডূবিনোদনকারী যেমন পালকের শব্দ কাণের ভিতরেই গ্রহণ করেন, সেইরূপ মেঘের শব্দও কাণের ভিতরই গ্রহণ করিবেন। কেননা মেঘের শব্দও তো কর্ণপটহেই গৃহীত হয়—এ কথা প্রাপ্যকারিত্ববাদীরাই বলেন। শব্দের উৎপত্তিস্থান দূরে বলিয়া বিচ্ছিন্নরূপে জ্ঞান হয়—ইহা বলা তো চলে না। কেননা উৎপত্তিস্থানের গ্রহণ হয় নাই; তাই মন যেমন বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়াই জ্ঞান করে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও সেইরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবেই বস্তুজ্ঞান করে—প্রাপ্যকারিত্ব কোথায়?

আর যাঁহারা (বৈদান্তিক ও সাংখ্যগণ) মনকেও প্রাপ্যকারী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত অতীব অশ্রদ্ধেয়। কারণ ক্ষণমাত্রেই মন অতি দূর দেশে কেমন করিয়া যাইবে? তাই—সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান সাহায্যে কুমারিল ও উদ্দ্যোতকর রসনা

স্পর্শ, এই উভয়ই অনুদ্ভূত (১৩) (তাই প্রত্যক্ষভাব তাহাদের অসদ্‌ভাবের গমক হয় না)। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহ (প্রমাণ)-সিদ্ধ হইল। —(ক্রমশঃ)

ও ত্বগিন্দ্রিয়ের বাহ্যত্বদর্শনে চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতির বাহ্যেন্দ্রিয়ত্বকে হেতু করিয়া তাহাদের যে প্রাপ্যকারিত্ব অনুমান করিয়াছেন, সে অনুমানে 'বাহ্যেন্দ্রিয়ত্ব'—এই হেতু ব্যভিচারী; কারণ যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়ত্ব অংশে মিল আছে, অন্য অংশে তেমনি অমিলও আছে। তাই এইরূপ হেতু অপ্রয়োজক (inconclusive)।

প্রাপ্যকারিত্ববাদ অতি জটিল, অথচ ইহার দার্শনিক গুরুত্বও সমধিক। জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে ভাবিয়া এই বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইল। (বেদান্তপরিভাষা—প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, ন্যায়মঞ্জরী—৪৭৮-৭৯ পৃঃ, তত্ত্বসংগ্রহ—কাঃ ২৫১৯-২৫২৮) আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বই স্বীকার করেন; অবশ্য প্রকারভেদ বিলক্ষণ আছে।

(১৩) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়সত্তাব মাত্রই কারণ নহে, কিন্তু তদ্‌গত রূপ-রসাদি ধর্ম্মের উদ্ভূতত্ব বা প্রকাশ থাকা চাই। এই উদ্ভব না থাকিলে ধর্ম্ম ও তদাশ্রিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই যদিও চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজোদ্রব্য, তথাপি তাহার ধর্ম্ম, রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। গুণের এই প্রকাশাবস্থাকে উদ্ভব ও অপ্রকাশাবস্থাকে অভিভব বলা হয়। এই উদ্ভব ও অভিভবের প্রভাবে বস্তুর বিচিত্র রূপ প্রতীত হইয়া থাকে। তাই দেখি, হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে জলীয় দ্রব্য দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত হইলেও কেবল জলের শীত স্পর্শই অনুভূত হয়, তাহার শুক্লরূপের প্রতীতি হয় না। গ্রীষ্মে তেজোদ্রব্যের দ্বারা সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন হইলেও তাহার উষ্ণ স্পর্শই অনুভূত হয়, ভাস্বর রূপের অনুভব হয় না। এইরূপ অগ্নিতপ্ত জলে অগ্নিগুণ উষ্ণস্পর্শের বোধ হয়, ভাস্বর রূপের হয় না। সুবর্ণে অগ্নির ভাস্বর রূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উষ্ণস্পর্শ প্রতীত হয় না। তাই—নয়নরশ্মি তৈজস দ্রব্য হইলেও তাহার রূপ ও স্পর্শ উপলব্ধি হয় না। এ বিষয়ে তো কোন অনুযোগ চলে না। কারণ বস্তুর স্বভাব আমাদের নিয়োগ বা অনুযোগের অপেক্ষা রাখে না। তাই ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন—"দৃষ্টানুমিতানাং চ নিয়োগপ্রতিষেধানুপপত্তিঃ প্রমাণস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ"—ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৫০। (ন্যায়মঞ্জরী, ৪৭৯ পৃঃ, ন্যায়কন্দলী পৃঃ ১৮৯)।

রাসে

আজি ফুল্ল চাঁদিনী রা—তে
মুগ্ধ পরাণ মা—তে,
পূর্ণ করিয়া তৃষিত হৃদয়
রাখিতে চায় সে কাহারে?—
প্রাণ নিঙারিয়া বাসিয়াছে
ভালো যাহারে!

আজি শ্যামল নীরব ঘা—সে,
ফুলের মধুর বা—সে,
কোন্ সে বারতা বহিতেছে ওই—
শুনাইবে তাহা কাহারে?
মর্ম্মরছলে মরমের কথা জানাইছে
তরু যাহারে!

আজি জ্যোৎস্না-মদির রা—কা—
স্বপ্ন-মাধুরী আঁ—কা—
সকল অঙ্গ পুলকিত করি
খুঁজিছে নয়ন কাহারে?
নিঃশেষে বুক বিলাইতে
চায় যাহারে!

আজি নিথর কুসুম-কু—ঞ্জে
দলে দলে অলি গু—ঞ্জে
ফুলে ফুলে তারা প্রচারিছে বুঝি
পেয়েছে আজিকে তাহারে—!
দীরঘদিবস-দীরঘরজনী যাচিয়াছে
শুধু যাহারে।—
বুঝি পেয়েছে আজিকে তাহারে!

দুর্গং পথস্তৎ

—*‡()‡*—

অশ্রান্ত যত্নে, অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া সহজ কথা নয়। চরম সত্যে উপনীত হবার কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই, তাই উপনিষদ্ বল্‌ছেন—"দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" তা বলে যাদের প্রাণে সত্যলাভের পিপাসা জেগেছে, তারা কি আর পথের বিভীষিকায় ফিরে আসে ?—আসল কথা, সত্যকে একান্তভাবে সকলে চায় না !

কৃপালাভের কথা পৃথক্ ; আর ব্যতিক্রম বলে যে কোন-কিছু নেই, তাও অস্বীকার কর্‌ছি না ; কিন্তু কৃপাবর্ষণটা কি—যে ফাঁকি দেয় তারও পরেই হয়, না অক্লান্ত সাধকের ওপর ? এ জগতেও তো দেখতে পাই—ওপরওয়ালা কর্ম্মচারীর ওপর খুসী হন তখনই, যখন সে তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করে। কৃপাটা উপরি পাওনা ; কিন্তু আসলেই যে ফাঁকি দেয়, তার উপরি পাওনা দূরে থাকুক, ন্যায্য পাওনাটাও ভাগ্যে জোটে না। একজন অন্যজনের কাছ থেকে কাজ দেখিয়ে—তাকে তুষ্ট করে—তবে কিছু প্রশংসা অর্জন করে—তার সুনজরে পড়ে। সত্যলাভটাও কি এতই সহজ, রাশীকৃত গলদ রেখেও মানুষ তাকে আয়ত্ত করতে পারবে ? অথচ গুরুর কাছে এসে শিষ্য এই অন্যায্য দাবীটাই করে বসে ! সাধনভজনের নামগন্ধও নাই, ইন্দ্রিয়-সংযমের এতটুকুও চেষ্টা নাই, অথচ এক রাত্রেই তাকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিতে হবে !

পথ দুর্গম বলে সকলে সে পথে যেতেও চায় না। যারা যায় তাদের মাঝেও কেউ কেউ পথ থেকে ফিরে আসে। গীতাকার তাই বল্‌ছেন, "সহস্রের মাঝে কোন একজন তত্ত্বজ্ঞান লাভে যত্নবান্ হয়, আবার সেই সহস্র সহস্র যত্নশীলের মাঝেও কোন এক ব্যক্তি হয়ত আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হয়।" সত্যের কঠোর পরীক্ষায় এমনি করে পথে পথে যাত্রী কম্‌তে থাকে, শেষে হয়ত দুটী একটী মাত্র সেই চরম সত্যে গিয়ে পৌছে। একটু চিন্তা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারি, কতরকম প্রবঞ্চনা নিয়ে তাহলে আমরা সত্যের বড়াই করে থাকি !

যে যাকে যতটুক্ ভালবাসে, সে তার দরুণ ততটুকু ত্যাগ স্বীকার করে। নিজকে ভালবাস, দেশকে ভালবাস, সত্যকে ভালবাস—তার চরম পরীক্ষা, তাদের দরুণ তুমি অনায়াসে মরতে পার কিনা ! এখানেই সত্য-মিথ্যার পরখ হয়ে যায়। দুর্ব্বলের আতঙ্ক হয়, এই বুঝি প্রাণ গেল ! আর যারা সবল, সত্যই একমাত্র যাদের প্রাণ, তারা কিছুতেই দমে না। ইচ্ছা করেই তারা কঠোরতাকে বরণ করে নেয় ; সত্যকে যে তারা প্রাণের চেয়েও বেশী মনে করে, প্রাণ দিয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখায়। ত্যাগের ভিতর দিয়ে যে পাওয়া সেই তো সত্যিকার পাওয়া।

সত্যের দুর্গম পথকে যথার্থভাবে বরণ করে নেওয়ার লোক খুবই কম। কেউ বা লজ্জায় পড়ে, কেউ বা লোকের দেখাদেখি হুজুগে পড়ে সে পথে অগ্রসর হয়। তা না হলে ধর্ম্মপথের যাত্রীসংখ্যা কি কম ?—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সত্যলাভ করেছেন কয়জনা ? সত্যকে উপলক্ষ্য করে ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সৌভাগ্য, পাপক্ষয়, পুণ্য অর্জ্জনের দিকেই সবার লক্ষ্য—একে other-worldliness বা পারলৌকিক বৈষয়িকতাই বলে। এমনি করে পবিত্র আধ্যাত্মিক জগতে যে কত বৈষয়িকতা প্রবেশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নাকি আবার এরাই !

ঠুঁটো পঙ্গুর দল আব্দার ধরেছে, বিকৃত দেহ-মন-বুদ্ধি নিয়েও সত্যের ধারণা হওয়া চাই—তবে না

সত্যের মহিমা আছে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সত্য এমন একটা সহজ বস্তু যাকে পেতে হলে কোন তপস্যার প্রয়োজন হয় না। সত্যলাভ সম্বন্ধে এমনি বিকৃত ধারণাতে সত্যও তাদের কাছে বিকৃত রূপে প্রকাশ পায়। সত্য যেন একটা বিলাসের বস্তু; প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা আমার ষোল আনা বজায় থাকবে, অথচ এর মাঝে ফাঁকতালে সত্যলাভ হয়ে যাবে! ক্ষেত্র তৈরী না করেও ফললাভের দরুণ অতিষ্ঠ ব্যাকুলতা মানুষের কেমন করে আসে, তাই ভাবি। সত্য যেন একটা আজগুবি চীজ্!

চিত্তের চঞ্চলতা স্বাভাবিক, তাই চিত্ত স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কি চাই, তা আমিই বুঝ্তে পারি না। চিত্ত স্থির হয় কিসে? পতঞ্জলি বল্ছেন—অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারাই চিত্ত স্থির হয়। সেই অভ্যাস আবার দীর্ঘকাল এবং নিরন্তর হওয়া চাই। এতখানি কর্‌লে পর চিত্ত আর ব্যুত্থান-সংস্কার দ্বারা অভিভূত হয় না। কাজেই চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের প্রসন্নবাহিতা,—যাকে পাতঞ্জল "স্থিতি" সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা বিনা তপস্যায়, বিনা যত্নে হবার নয়। অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ই ভাবের ঘরে চুরি করে, তাই সাধুত্বের প্রলেপের ভিতর থেকেও অসাধুত্বের সংস্কার উঁকি মেরে ওঠে। কাজেই সত্যানুভূতির যোগ্য দেহ মন-প্রাণ চাই। আর এ সব লাভ করা বিনা তপস্যায় হয় না। চিত্তের স্থিতির দরুণ—প্রযত্ন, বীর্য্য এবং উৎসাহ, এই তিনটাই একাধারে প্রয়োজন।

একটী ইন্দ্রিয়কেও অপরিশুদ্ধ রাখলে চল্বে না, কেননা সত্যের অনুভূতি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় দিয়ে হয় না—সমস্ত দেহই উদ্দীপনাময় হয়ে ওঠে সত্যের আলোকে! অনেকের মাঝে অনেক ভাল গুণও থাকে, আবার দু'একটা অসদ্গুণও লুকিয়ে থাকে, সুযোগ-সুবিধা পেলেই তারা আবার উঁকি মারে। এ সমস্ত ভেজালকে সত্যের আগুনে পুড়ে ছাই করে ফেল্তে হবে। মোট কথা, আমার দিক থেকে যেন আমি কোন মতে সত্যকে ব্যাহত না করি। সাধকের প্রাণে এই সশঙ্ক ব্যাকুলতাটুকু থাকা চাই—কি জানি কোন্ দিকে গলদ সঞ্চিত হয়ে যায়, তার দরুণ সে সর্ব্বদা সাধনানিরত থাক্বে। তাতে বাইরের জগতের সঙ্গেই বা বিরোধ কিসে? সাধনা তো চল্বে অন্তরে অন্তরে।

আজ ভাল আছি, কাল যে মন্দের কবলে না পড়্ব, কে জানে? অবশ্য এ সম্বন্ধেও এক্‌রার দেওয়া চলে, মানুষ নিঃসন্দেহে বল্তে পারে, আর আমার পতনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু সে কোন্ সময়? যখন পর-বৈরাগ্যের উদয় হয়। কাজেই সাধনা আমার কতকাল চল্বে, কে জানে? অকম্প হৃদয়ে বলতে পার্বে—আর আমার পতন হবে না? বেশ তো, তাহলে সিদ্ধের মত সাধনায় বিলাস করেই চল না! সাবধান! আগে বুকে হাত দিয়ে বল, নিজকে ঠকাচ্ছ না তো?

কঠোরতার ভিতর দিয়েও অহেতুক কৃপাই উপলব্ধি হয়। কঠোরতাকে অতিক্রম কর্‌তে গিয়েই দেখি, আমাদের ভিতর কত শক্তি দিয়ে রেখেছেন ভগবান্! শ্রদ্ধায় তখন চিত্ত আপনি বিনম্র হয়ে আসে। আর এসব দেখে-শুনেই সাধক বলেন—সত্যকে লাভ করা সহজ; কেননা সত্যই তো সত্যের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। আবার এমনি মজা, কঠোরতাকে বরণ করে না নিলে এ সত্যের উপলব্ধি হয় না!

স্বামী রামতীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—):*:(—

প্রত্যাবর্ত্তন কথা

—*—

ভাগীরথীর বক্ষঃক্ষরিত অমৃতধারা আকণ্ঠ পান করিয়া অমর হইয়া তীর্থরাম ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর তাঁহার মাঝে বাসনা-কামনার কোনও বিক্ষোভ নাই, সহজানন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতিতে তিনি টলমল! এই দিব্যানুভব লইয়া আবার কেন তিনি লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন, তাহাও বুঝি তিনি জানেন না। মানুষকে এই আনন্দ বিলাইয়া দিবেন, এমন কামনাও বুঝি তাঁহার মাঝে আর অবশিষ্ট নাই। এই দেওয়ানার হাওয়া প্রথম যখন বহিতে সুরু করে, তখন স্বদেশহিতৈষণার উন্মাদনায় রামকে পাইয়া বসিয়াছিল, তিনি গাহিয়াছিলেন—

> হম্ রুখে টুকড়ে খায়েঙ্গে, ভারতপর বারী জায়েঙ্গে;
> হম্ সুখে চনে চবায়েঙ্গে, ভারতকী বাত বনায়েঙ্গে;
> হম্ নঙ্গে উমর্ বিতারেঙ্গে, ভারতপর জান মিটায়েঙ্গে।

—আমি রুক্ষ রুটী খাব, ভারতের জন্য আত্মবলি দেব; আমি শুকনো চানা খেয়ে থাকব, আর ভারতের গৌরবের জন্য লড়ব; বস্ত্রহীন হয়ে জীবন কাটাব, কিন্তু ভারতের জন্য জান্ দেব!

কিন্তু আজ সে আকুলতাটুকুও তাঁহার মাঝে অবশিষ্ট নাই। এখন যে দিব্যোন্মাদ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহা একদিক দিয়া যেমন অনন্ত আবেগে স্পন্দিত, অপর দিক দিয়া তেমনি আকাশের মত প্রশান্ত, উদার। আর কোনও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে, কোনও প্রয়োজনের তাগিদের কাছে তিনি আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। প্রভাত-সমীরণের মত স্বতঃপ্রবাহিত তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ—এ কাহাকেও ডাকিয়া বলে না, ওগো তুমি আমাকে নাও! অথচ যে ইহার সংস্পর্শে আসে, সেই বুঝি মাতাল হইয়া যায়!

ভাববিহ্বল তীর্থরাম গাহিলেন—

> হস্তী-ও-ইল্ম্ হূঁ—মস্তী হূঁ!—
> নহী নাম মেরা;
> কিবরয়াই-ও-খুদাঈ
> হৈ ফকত্ কাম মেরা।
> চশ্মে-লৈলা হূঁ, দিলে কৈস্
> ব দস্তে-ফরহাদ;
> বোসা দেনা হো তো দে লে
> হৈ লবে-জাম মেরা!
> গোশে-গুল্ হূঁ, রুখে-যূসফ্
> দমে-ইসা, সরে-সরমদ্;
> তেরে সীনে মেঁ বসূঁ হূঁ
> হৈ রহী ধাম মেরা।
> হক্কে-মনশূর তনে-শম্‌স
> ব ইল্মে-উল্মা;
> রাহরা বৈহর্ হূঁ ঔর্ বুদ্‌বুদা
> ইক্ রাম মেরা!*

—আমি সচ্চিদানন্দ—আমি পাগল! আমার নাম নাই! আমি বিরাট্—আমি প্রভু; বস্, এই অনুভবই মাত্র আমার কাজ! আমি লয়লার আঁখি, আমি মজ্নুর কলিজা, ফরহাদের হাত! চুম্বন নিতে হয় তো নিয়ে যাও—আমার সমস্ত অধর তোমাদেরই

* সুর—গজল, তাল—দাদ্‌রা।

কাছে! আমি ফুলের পাপড়ি; আমি যুগকের রূপ, ঈশার প্রাণ, সরমদের মস্তক! ওরে, আমি যে তোর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, ওই যে আমার স্বধাম! আমি মন্‌সুরের কণ্ঠ, শম্‌স্ তব্রেজের শরীর, বিদ্বানের বিদ্যা। বাহবা!—আমি মহাপারাবার, আর রাম তারই মাঝে একটা জলের বুদ্‌বুদ্!

এই দেওয়ানার কাছে আত্মপরের ভেদ নাই, স্বদেশ-বিদেশের বিচার নাই, লোক-লোকান্তরের পরোয়া নাই। সুরধুনীর প্রবাহ যেমন কাহারো ইজারামহল নয়, সূর্য্যের কিরণকে যেমন কেহ ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিতে পারে না, তেমনি তীর্থরামের এই বাণীও কাহারো খাস-দখলের মাল নয়! তাই বলিতেছিলাম, এই উদ্বেলিত যৌবন-জলতরঙ্গের কাছে দেশব্রতের সঙ্কল্প, জগদ্ধিতায় কামনাও কোথায় ভাসিয়া যায়;—থাকে শুধু আনন্দ—সৌরকরোজ্জ্বল আনন্দ—মলয়ানিলবিকম্পিত আনন্দ!

একটুও বাসনার দাগ নাই এই নির্ম্মল আনন্দে, এমন কি অতি শুদ্ধ তপঃকৃচ্ছ্রতার বাসনাটুকু পর্য্যন্ত কে যেন মুছিয়া দেয়! তাই তীর্থরাম বলিলেন—

মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—

হম্ নঙ্গে উমর বিতায়েঙ্গে
আনন্দ কী ঝলক্ দিখায়েঙ্গে;
রুখী রোটী খায়েঙ্গে
মস্ত পড়ে রহ্ জায়েঙ্গে;
সুখে টুকড়ে খায়েঙ্গে
সোঽহং হংসো গায়েঙ্গে—

"বস্ত্রহীন হয়ে আমি জীবন কাটাব, আর ছড়িয়ে দেব আনন্দের ঝলক্; রুক্ষ রুটী খাব, আর পাগল হয়ে পড়ে থাক্‌বো কোথায়ও; শুক্‌নো রুটী খাব আর "সোঽহং হংস" গাইব কেবল!"—কিন্তু হায়রে হায়, মেরা আর পেড়া যে আমার পিছু ছাড়তে চায় না, সর্ব্বদাই তারা সেবার দরুণ হাজির। এই তিনটী পঙক্তির শেষের অর্দ্ধেকটুকুও আমার কাছে সত্য হয়েছে, প্রথমার্দ্ধ একেবারে ঝুট্! এমন কি জঙ্গলেও দেখেছি তাই।

বিচিত্র কথা নয় তো! স্বয়ং ভগবানের চুক্তিপত্র যে রহিয়াছে—"তেষাং সততযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্!"—আমাতে সর্ব্বদা যাহারা লাগিয়া রহিয়াছে, তাহাদের যাহা নাই, তাহা জোটাইয়া আনা, আর যাহা আছে, তাহা ফলাইয়া তোলার ভার যে আমিই বহন করি।" বিশ্বাস করা কঠিন বটে, বিশেষতঃ ওই যোগক্ষেমটুকুর লালচ্ যাহাদের যায় নাই। নইলে এ তো তুচ্ছ কথা!—মনে-প্রাণে আমি তোমার; শুকাইয়া মার তো সে তোমার খুসী! ও চিন্তা তো আমার নয়, তোমার; তোমার চিন্তা কেবল আমার!

আনন্দগদ্‌গদকণ্ঠে তীর্থরাম আবার গাহিলেন—

ভাগ তিন্‌হা দে অচ্ছে, জিন্‌হা নূ রাম মিলে!
জদ্ 'মৈ' সী তাঁ দিলবর্ নাসী—
'মৈঁ' নিকসী, পিয়া ঘট্ ঘট্ বাসী;
খসম্ মেরে ঘর বস্‌সে!—
ভাগ তিন্‌হা দে……মিলে!
জদ্ 'মৈ' মার পিছাঁ বল সুট্টিয়াঁ,
প্রেম-নগর চঢ় সেজে সুত্তিয়াঁ;
ইশ্‌ক্ ঢুলারে দস্‌সে!—
ভাগ তিন্‌হা দে……মিলে!
চাদরফক্ক্ শরহ দী সেকাঁ,
অখ্‌খিয়া খোল্ দিলবর্ নূ দেখাঁ;
ভরম শুখ্‌হে, সব নস্‌সে!—
ভাগ তিন্‌হা………মিলে!
ঢূঢ়্ ঢূঢ়্ কে উমর গঁব্বাঈ
জাঁ ঘর অপনে ঝাতী পাঈ
রাম সজ্জে, রাম খস্‌সে!—
ভাগ……………মিলে!

—তার ভাগ্য ভাল, যে রাম পেয়েছে। যেখানে 'আমি', সেখানে বঁধু নাই; 'আমি' যদি বেরিয়ে গেল তো ঘটে ঘটে দেখি আমার বঁধু!—বন্ধু আমার ঘরে যে!

—আমিটাকে ছুঁড়ে ফেলে এসেছি পেছনে; তাই প্রেমনগরে আজ বঁধুর শয়ন বিছিয়েছি।—প্রেম যে আমার হৃদয়ে উছলে ওঠে!

—কর্ম্মের আবরণ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছি; চোখ মেলে দেখেছি আমার প্রিয়তমকে।—ভ্রম-ভ্রান্তি যত ছিল, সব টুটেছে!

—খুঁজে খুঁজে জীবন কেটে গেল; শেষে আপন ঘরে গিয়ে দেখি—সেই!—দিকে দিকে পেয়েছি রামকে!

আপন ঘরে আপন-জনকে পাওয়ার আনন্দ হরিদ্বার হইতে লিখিত এক পত্রে তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন (১৮-১০-৯৮)—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাবরে যার দৃষ্টি পৌঁছেছে, তার হৃদয়ের গ্রন্থি টুটে গিয়েছে, সমস্ত সংশয় ছুটে গিয়েছে, সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে গিয়েছে!

আমার বাইরে যেখানেই চিত্তসমাধান করি না কেন, শুনি—প্রত্যেক পরমাণু হতে অবিরাম উঠ্‌ছে প্রণবের ঝঙ্কার—বল্‌ছে, **তত্ত্বত্তসি, তত্ত্বমসি**—ওরে, তুই সেই—তুই সেই! যদি অন্তরের দিকে মনটী ফিরাই তো সেখানে শুনি বেদান্তের ভেরীধ্বনি—

অহং ব্রহ্মাস্মি—অহং ব্রহ্মাস্মি!

আমি কে? আমি কি? আমার অন্তরের অন্তঃপুরে "কে, কেন, কি"—কিছুরই আওয়াজ পৌঁছে না তো! এখানকার বাঁদরেরা আমার মনটী ছিনিয়ে নিয়েছে, বুদ্ধি গঙ্গার জলে তলিয়ে গেছে, চিত্ত চড়াইয়ে ঠুক্‌রে খেয়েছে, অহঙ্কারকে মাছেরা গিলে খেয়েছে—পাপ হাওয়ায় উড়ে গেছে। সমস্ত সংসার আমি জিতে নিয়েছি—আমার অখণ্ড রাজ্য, মহান্ প্রতাপ!

নাস্মি ব্রহ্ম সদানন্দম্ ইতি যে দুর্ম্মতিঃ স্থিতা।
ক্ব গতা সা ন জানামি, যদাহং তদ্বপুঃ স্থিতঃ॥

আমি সদানন্দ ব্রহ্ম নই, এই দুর্ম্মতি আমায় পেয়ে বসেছিল। সে দুর্বুদ্ধি কোথায় যে মিলিয়ে গিয়েছে, তা তো জানি না। যখনই অহংজ্ঞান ভেসে ওঠে, তখনই দেহের অনুভব আসে।

এই বিদেহীর অনুভব নিয়াই তীর্থরাম আবার লাহোর ফিরিয়া আসিলেন। এই ফিরিয়া আসা তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল না; এমন কোনও সঙ্কল্পও বুঝি ছিল না। কিন্তু অলক্ষ্যে জীবনের সূত্র ধরিয়া যিনি তাঁহাকে পরিচালনা করিতেছেন, আমাদের মত দুর্ভাগা নিরানন্দদের মাঝে এই জয়শ্রীমণ্ডিত সদানন্দ পুরুষকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি বুঝি ভাগবত জীবনের এক অপূর্ব্ব আলেখ্য আমাদের সম্মুখে প্রকটিত করিবেন বলিয়াই তাঁহাকে আবার আমাদের মাঝে ফিরাইয়া পাঠাইলেন।

এতদিন তীর্থরামের জীবনে আমরা দেখিয়াছি আরোহ, এইবার দেখিব অবরোহ। সংসারের প্রতি পূর্ব্বেও তাঁহার বৈরাগ্য ছিল, এখনও সেই বৈরাগ্য নিয়াই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে বৈরাগ্যের মাঝে বিরক্তির ভাবই ছিল প্রবল। একটা কিছু জীবনে চাই, তাই সংসার আর ভাল লাগিতেছে না—এই ছট্‌ফটানীতেই তিনি সংসার হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার যখন তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন, তখন সে বিরক্তি আনন্দময়, মধুর ঔদাস্যে পরিণত হইল; সংসারে তিনি আছেন,

কি নাই, সে খবরও বুঝি তিনি জানেন না। কে যে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সংসারের বাহির করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না,—কিন্তু তবুও সে বৈরাগ্যের মাঝে আত্মাভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল। এখন কে যে তাঁহাকে আবার সংসারে ফিরাইয়া আনিল, তাহার খবরদারীও তিনি করেন নাই ; কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা হইতে একটা তফাৎ এই দেখা যাইতেছে, এখন তিনি যেন আত্মহারা, বিবশ—অভিমানের বাষ্পটুকুও বুঝি তাঁহার মাঝে নাই! সংসার যদি করিতে হয় তো এমনি করিয়াই। তীর্থরামের গৃহস্থালীর এই চরম পূর্ণতা। সংসারে থাকিয়াও কি উন্মত্ত আনন্দে যে তাঁহার দিন কাটিয়াছে, আমরা এখন তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি।—

তীর্থরাম ফিরিয়া আসিয়া আবার লাহোরের মিশন-কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। একদিকে অধ্যাপনাও চলিতে লাগিল, আবার অপর দিকে অদ্বৈতানন্দের আহরণ-বিতরণও চলিতে লাগিল। সংসারে কি হইতেছে না হইতেছে, সেদিকে তাঁহার খেয়াল নাই। কলেজে যান, ছেলে-দের পড়ান ; শুধু কি গণিতই পড়ান? যখন-তখন গণিতের বক্তৃতা বেদান্তের উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়, ক্লাসে বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিয়া যায় যেন! মাস-কাবারে মাহিয়ানার টাকা ঘরে আনেন বটে, কিন্তু খরচ-পত্রের হিসাব কে করে? তাঁহার পাওনাদারেরা তো সংখ্যায় অল্প ছিল না। কলেজের দুঃস্থ ছেলেরা সাহায্য পায়, বাজারের দোকানীদের পাওনা আছে, দেশের খরচও চালাইতে হইবে, আবার এদিকে বাসা-খরচ তো আছেই। এত হিসাব-নিকাশ কে করিতে যাইবে বাপ্! সময় বুঝিয়া প্রার্থীরা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল, বেতনের সমস্ত টাকা তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তীর্থরাম বলিলেন, "নাও যার যা দরকার, নিয়ে নাও!" সেই দিনই হয়ত সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গেল, হাতে একটী কপর্দ্দকও অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু তীর্থরামের তাহাতে কি!

বেতন ছাড়া পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখিয়াও তিনি কিছু কিছু পাইতেন। তাহারও এই ভাবে সদ্গতি হইত। একটা বিষয়ে তীর্থরামের বরাবর নেশা ছিল —সেটা হইতেছে পড়ার বই। "শুক্‌নো চানা" জুটুক আর না জুটুক, বই জোটা কিন্তু চাই। লাহোরের মেসার্স রামকৃষ্ণ এণ্ড্ সন্স নামের এক পুস্তকের দোকানের সঙ্গে তাঁহার এই বন্দোবস্ত ছিল, দর্শন ও গণিত সম্বন্ধে যত নূতন বই বাহির হইবে, সমস্তই তাহারা তাঁহাকে সরবরাহ করিবে। সারা মাস ধরিয়া এমনি করিয়া পুস্তক সংগ্রহ আর অধ্যয়ন চলিত। মাসের শেষে মোটা অঙ্কের বিল আসিত এবং পূর্ব্বরীতিতে তাহা শোধ হইত।

এমনি বেপরোয়া ভাবে সংসার চালানোর ফল এই হইত, কোনো কোনো মাসে খুচরা-খরচের জন্য হাতে একটী কাণা-কড়িও হয় তো থাকিত না ; দুর্দ্দশার চরম দুর্দ্দশা, কখনো কখনো ঘি-আটার সংস্থান করিবার মত সম্বলও হাতে থাকিত না। ফলে কতদিন উপবাসেই কাটিয়া যাইত। কিন্তু তীর্থ-রামের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ আহার জুটিল না—ব্যস্, বই পড়িয়া দিন-রাত পার করিয়া দাও! হয়তো রাত্রে প্রদীপের তেলটুকু পর্য্যন্ত জুটিল না ; তীর্থরাম একটু হা হুতাশও করিলেন না ; ধীরে ধীরে বইখানা হাতে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া ল্যাম্প্ পোষ্টের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার আলোতেই পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন!

এই বেপরোয়া দারিদ্র্যের মাঝে কতখানি রস, তাহা তীর্থরামের এই নিম্নলিখিত পত্রখানা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে (১১-১২-৯৮)—

পত্র লিখ্‌তে এত দেরী হল, তাহার কারণ এই, আমার কাছে একখানাও কার্ড বা খাম ছিল না ; কেন্‌বার পয়সাও হাতে ছিল না। আজ একখানা বইয়ের ভিতর থেকে তিনখানা টিকিট বেরিয়ে পড়্‌ল ; আর তুমি

যে রিপ্লাইকার্ডখানা লিখিয়াছিলে, তাও পেলাম; কাজেই আজ তোমার পত্রের উত্তর দিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়ার অবস্থাটাও এমনি দাঁড়িয়েছে। আজ বাতিতে তেল নাই, সুতরাং রাত্রে আর ঘরে থাকা হবে না, সহরের চার-ধার ফূর্ত্তি করে বেড়ানো যাবে। আমার দুই হাতেই লাড়ু, বুঝেছ?

অবস্থাটা এমনি দাঁড়িয়েছে বলে মনে করো না যে, হায়! হায়! রাম বুঝি ভারী কাঙ্গাল আর দুঃখী। বাইরে এই দারিদ্র্য আর টানাটানি; তবু রাম যে আমীরী করছে গো—সে যে বাদসাই ফলাচ্ছে! এ কথাটা ঠিক বোঝা গেছে, যখন কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ করবার উপায় থাকে না, তখন সে প্রয়োজনটাও খেয়ালে আসে না। (আর বাস্তবিক যখন প্রয়োজন সিদ্ধ কর্‌বার কোনও উপকরণ হাতের কাছে নাই, তখন প্রয়োজনের তাগিদটা অনুভব করা মিথ্যে কাঙ্গালিপনা নয় কি?) আগে ওই প্রয়োজনগুলোর তাগিদ মেটাবার দরুণ বেশ বিচার-বিবেচনা করে নানা রকম ব্যবস্থা করতে হত; আজকাল প্রয়োজন বেচারীরা নিজের গরজে যদি বা সামনে এসে পড়ে, তবেই ওদের ওপর দৃষ্টি পড়ে; নইলে ওদের ভাগ্যে রামের কৃপাদৃষ্টি লাভ কি সোজা ব্যাপার? প্রারব্ধ আর কাল তো আমার সেবক; তাদের যদি প্রয়োজন হয় তো আসুক তারা, রাম বাদসার চরণ চুম্বন করে যাক্। নইলে এই শাহান্‌শাহার কি গরজ যে, কোন্ গোলাম তাঁকে সেলাম দিয়ে গিয়েছে কি না তার খবরদারী করবেন?

(ক্রমশঃ)

যাত্রা-পথে

চল্‌ছি বেয়ে
ভাসিয়ে দেওয়া জীবনখানি নিয়ে
কে জানে হায়,
কোন্ সাগরে পৌঁছবে তরী গিয়ে—
কোন্ সে অজানায়।

হয়ত সেথা
মিল্‌বে না আর এতদিনের পাওয়া –
ভুল্‌তে হবে
এতদিনের পুরাণো গান গাওয়া;
(দুঃখ-সুখের উপকরণ হয়ত নূতন হবে,—)
স্মৃতির রেখা পড়বে মনে, খুল্‌ব হিসাব যবে।

এমনি করেই
এই জীবনের কত বরষ ধরে—
বল্‌ব কেমন করে,
একের পরে আরেক এসে সবাই গেছে সরে—
আজ কারেই মনে পড়ে?

ভাবছি যে তাই
একলা বসে—মহাসাগর-নীরে
কে গণে এই
ঢেউয়ের মালা মিছেই বসে তীরে—
বাতুল নয় সে কিরে?

—):*:(—

অচিন্ পাখী

—*‡()‡*—

উপনিষদে আছে, এক ডালে দুই পাখী বসে, তার মাঝে এক পাখী ফল খায়, আর এক পাখী দেখে।

এই যে নিবৃত্তিপথের দ্রষ্টা পাখী, যাকে ভোগের প্রলোভনে প্রলুব্ধ কর্‌তে পারে না—এই হল আসল, একে জান্‌তে পার্‌লে আর কোন ভাবনা থাকে না। ঋষিরা যে "আত্মানং বিদ্ধি" বলে যাঁকে লক্ষ্য করেছেন—তিনি এই দ্রষ্টা আমি। এই আমি বহির্জগতের জ্ঞেয় পদার্থ নয়, তাই বাহিরের উপকরণ দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না। উপনিষদ্ একে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন—যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য ইত্যাদি। আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে বুদ্ধির কেরামতি দিয়েও যাকে বুঝ্‌বার ঢের বাকী থাকে, এক কথায় বল্‌তে গেলে যিনি অসীম—তাঁকে জান্‌তে হলে অন্তর্দৃষ্টি চাই, শ্রদ্ধা চাই। ভারতীয় দার্শনিক ঋষি এই দ্রষ্টা-আমির অনুসন্ধানেই একদিন উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাই তাঁরা দৃশ্য-জগতের বড় একটা খোঁজ-খবর না রাখলেও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের অজানা কিছুই বুঝি ছিল না। পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় রহস্য যে দেখবার বস্তুটাই নয়; -যে দেখে, বেদান্তে যাকে দ্রষ্টা বলে সংজ্ঞা দিয়েছে সে-ই; এ একেবারে নিছক্ সত্যি কথা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তার ধারা কিন্তু এখানে এসেই বিভিন্ন হয়ে গিয়েছে। একজন বেরিয়েছে এই দ্রষ্টা-পাখীর খোঁজে—যার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু শুধু দেখাতেই যার বিমল আনন্দ; আর একজন বেরিয়েছে ভোগী-পাখীর খোঁজে—যার প্রয়োজন আছে, যার লিপ্সা আছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়ই অনুসন্ধানে বেরিয়েছে বটে কিন্তু পথ দু'টী পরস্পর বিভিন্ন। একজন বাইরের দিকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে ছুটছে, আর একজন ভিতরের দিকে অদম্য আবেগ নিয়ে ছুটছে। লাভ ক্ষতির কথা এখানে তুল্‌ছি না, ঋষি-বাক্যের প্রতিধ্বনি করে বল্‌ছি—"বাঃ, কি চমৎকার! এখান থেকে যে ভোগী-পাখীকেও দেখা যায়, আর তার পেছনে যারা অশ্রান্ত গতিতে ছুটছে, তাদেরও দেখা যায়!"

উপনিষদের যে পাখী নাকি বসে বসে দেখছে, আমার নিজের অন্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বল্‌তে গেলে সেই হল দ্রষ্টা-আমি। ইনি সব দেখছেন—ভাল-মন্দ, সু-কু যখন যাই করি না কেন। এঁর চোখে ধূলি দিয়ে যখন নির্লজ্জ ভোগী-আমি স্পর্দ্ধা দেখাতে যায়, তখন তিনি হাসেন। উত্তেজনা-প্রবণতায় মানুষের হৃদয়বৃত্তি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে, তাই বিমূঢ়াত্মা তার আপন শক্তি বৃদ্ধির মূল কারণ যে সেই শান্ত দ্রষ্টা-পুরুষ, যাঁর ইঙ্গিতে ব্যষ্টি কেন সমষ্টি জগৎই পরিচালিত হচ্ছে—এ কথা বুঝতে পারে না।

একবার যদি এই ভোগী আমি নিরাসক্ত আমির জ্ঞানে ফিরে তাকায়, তাহলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে —মুক্ত কর্ত্তৃত্ব নিয়ে কেমন করে এই বিরাট জগৎকে চালাচ্ছেন তিনি। এই অবাক্ কাণ্ড দেখে ভোগী আমি আর ভোগ কর্‌বে কি—খাওয়া ফেলে সে তখন স্তব্ধ হয়ে কেবল দ্রষ্টা আমির পানেই তাকিয়ে থাকে।

মানুষের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে—এই বিরাট শান্ত দ্রষ্টা পুরুষ রয়েছেন। তিনি আছেন বলেই আমরা চল্‌ছি। এমনি মজা, যাঁর ইঙ্গিতে চল্‌ছি যিনি হৃদয়ে রয়েছেন বলেই আশা-ভরসার তরঙ্গ আমাদের প্রাণে নেচে নেচে উঠ্‌ছে—তাঁর কথা ভুলে গিয়ে চলার গৌরবটাই হয় আমাদের বড় গৌরব। এই তো মায়া, এই তো পতনের বীজ। শান্ত সমুদ্র তার

অবিক্ষুব্ধ হৃদয় পেতে দিয়েছে বলেই তার উপর দিয়ে এই তুফানের সমুদ্রের তাণ্ডবলীলা চলছে ; তেমনি এই উদাসীন দ্রষ্টা পুরুষকে অবলম্বন করেই বিমূঢ়াত্মা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে উঠ্ছে। শান্ত সমুদ্র যেমন চির-কাল শান্ত হয়েই রয়েছে,—তেমনি বিকারের মাঝে, বিক্ষোভের মাঝে সেই অটল মৌনী পুরুষটী স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে একই ভাবে অবস্থান কর্‌ছেন। কাজেই এই উদাসী চিরমুক্ত আত্মারূপী অচিন পাখী—বিশুদ্ধতাই যাঁর অভিব্যক্তির নিদর্শন, তাঁকে পেতে হলে এই মেঘ কাটিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধতার নীল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে হবে। বাহিরের দিকে খুঁজ্‌লে পাব তার ঐশ্বর্য্য বিভূতি, আর অন্তরের দিক দিয়ে খুজ্‌লে পাব স্বয়ং তাঁকে। কাজেই প্রথমেই আমাদের পথ বাছাই করে নিতে হবে।

তিনি আছেন এ কথা ঠিক, কিন্তু সমস্তকে অতি-ক্রম করে। এখানেই আমাদের কঠোরতার প্রয়োজন, তপস্যার প্রয়োজন। কত সুখ-দুঃখের পাহাড় চড়াই উৎরাই করে তারপর মানসসরোবরে এসে পৌছ্‌তে হবে ; তখন দেখ্‌ব যে নীল শতদলের ওপর তিনি বসে আছেন, এ কথা ঠিক ; মানুষ য এত দুঃসহ কষ্টের ভিতর দিয়েও কার অদৃশ্য আকর্ষণে ছুটে চলে, এ কথা তখনই ভাল করে হৃদয়ঙ্গম হবে। সেখানে গিয়ে দেখব—কত বিচিত্র পথ ধরে কত যাত্রী—এই নিঃসঙ্গ দ্রষ্টার আকর্ষণেই ছুটে আস্‌ছে। এই দ্রষ্টা পুরুষ কিন্তু সবাইকে দেখতে পান—অথচ আমরা ধাপে ধাপে উঠি বলে তাঁকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে দেখ্‌তে পাই না। পথ নিয়ে যে যাত্রীদের বিরোধ হয়, উপরে বসে তা-ও কিন্তু তিনি দেখ্‌তে পান। তিনি চুপ করে আছেন বটে—কিন্তু তাঁর এ মৌন শক্তিই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে !

বাইরে থেকে যাকে কঠিন বলে, বিভীষিকার বস্তু বলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, ভিতরে আবার সে-ই স্নেহ করুণার উৎস-স্বরূপ। শুষ্ক কঠিন পাহাড় বলে যাকে আমরা অবজ্ঞা দেখাই, তার বুকের মাঝ থেকেই স্বচ্ছ-শীতল ঝরণার উৎপত্তি। ভোলানাথ উদাসী শিবকে আমাদের শাস্ত্র আনন্দময় বল্‌ছেন। বাস্তবিক এই উদাসীর প্রাণে যে করুণা, যে মমতা, তার বুঝি আর তুলনা হয় না জগতে। নিঃসঙ্গ দ্রষ্টার কথা মনে হলেও অনেকের ভয় হয়। মায়া মমতাশূন্য দ্রষ্টা আমির অনুসন্ধানে যে কি লাভ, তা যারা একবার মায়া-মমতাকে এড়িয়ে না গিয়েছে, তারা তো বুঝ্‌বে না কিছুতেই। উদাসী ভোলানাথের প্রাণই জগতের জন্য বেশী আকুল। সর্ব্বহারা দিগম্বরকে কি সাধে আমরা ভালবাসি ?

জগতের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েও মানুষ এই দ্রষ্টা আমিকেই খুঁজ্‌ছে, তাই নিঃশব্দে সুখ-দুঃখের আঘাত বুক পেতে সহ্য কর্‌ছে। ভোগেও যে বিতৃষ্ণা আসে, তা এই দ্রষ্টা-আমিরই অহেতুক আকর্ষণ। মানুষ কাজকর্ম্ম করে, চলে-ফিরে—হঠাৎ এর মাঝে থেমে গিয়ে কি যেন ভেবে নেয় ; এই ভাবনার সূত্র কার সঙ্গে জড়িত ? কে মন থেকে বলে দেয়, এ পথে চল—ও পথে চলো না ?

অতি কাছে রয়েছেন বলেই চোখ দিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে পাই না। ভুলের পাশে নির্ভুলরূপে, অসতের পাশেই সৎরূপে তিনি রয়েছেন। আবরণকে ভেদ করে তো আমাদের দৃষ্টি অগ্রসর হয় না—তাই ভাল মন্দ এক-একটার মোহে পড়ে তাকেই নিছক্ সত্য বলে আঁক্‌ড়ে পড়ে থাকি। এমনি করে আমিই সাধু হচ্ছি, আবার আমিই অসাধু হচ্ছি ; কিন্তু সাধু অসাধু দুটো অবস্থাকেই দেখ্‌ছেন, এমন একজন নির্লিপ্ত দ্রষ্টা কি নেই ? তাঁর অনুভব কি আমরা দৈনন্দিন কর্ম্মচক্রের মাঝে থেকেও পাই না ?

খাঁচার পাখীর পাশেই কিন্তু মুক্ত পাখীটী বসে আছে। সে বসে বসে বল্‌ছে—নির্লিপ্ততাই আনন্দ—নীচে নেমে পড়ায় নয়, শূন্যে ওড়াতেই আনন্দ। সাথীকে ফেলে মনের আনন্দে সে উড়্‌তেও পারে না,

তাই পাশে বসে বসে কেবল সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষাই করছে। একদিন সে তার সাথীকে নিয়ে নীলাকাশের অন্তহীন পথে উড়ে যেতে পারবে বলেই তার সাথীর এক পাশের ডালে সে অমন চুপটি করে বসে আছে!

অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছুর আস্বাদন পেয়ে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মোহে পড়ে আমরা কেবল ভুলতে থাকি। নীচেই হয় তখন আমাদের বাসা, আর নির্লিপ্ত ভাবে থাকার পিপাসা মোটেই জাগে না প্রাণে। অচিন্ পাখী—দ্রষ্টা আমি মাঝে মাঝে আমাদের সেই আনন্দলোকের বার্ত্তাই কাণে কাণে বলে যায়। যে শুনতে পায়, তারই চমক ভাঙ্গে; আর যে বধির, সে তাই নিয়ে মজে থাকে। এই গগনবিহারী মুক্ত পাখীর কাজই হচ্ছে, যারা খাঁচায় আবদ্ধ, তাদের নিয়েও মুক্তিপথে ওড়া।

এই দ্রষ্টা আমিই তোমাকে নিয়েও একদিন টান দেবে। সাধ্য কি যে আর তুমি ভোগে অচেতন হয়ে থাকতে পার! দুদিন আগে আর দুদিন পরে—প্রত্যেক জীবনেই নির্লিপ্ততা আসে! তখনই বুঝি, ভোগী পাখীটার পাশেই কেন নির্লিপ্ত পাখীটা বসে আছে।

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৬ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।—অত্যধিক শীতের জন্য গতকাল রাত্রে ঘুম হয়নি। এখানে একজন নাথসম্প্রদায়ের সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি সর্ব্বদাই দিনের বেলায় ডান নাক ও রাত্রি বেলায় বাম নাক তুলো দিয়ে বন্ধ করে বায়ু সংযম করেন। রাস্তাচলা, খাওয়া দাওয়া, ছিলিম চড়ান প্রভৃতি সব কাজই নাক বন্ধ করা সত্ত্বেই করে থাকেন। এই বিরুদ্ধ ব্যাপার দেখে আমি তাঁকে বললাম "নাক বন্ধ করে পরিশ্রমের কাজ করতে নাই, বিশেষতঃ ছিলিম চড়ান খুবই খারাপ।" তিনি প্রবীণ, আমি নবীন হয়ে তাঁকে উপদেশ করাতে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আমাকে রূঢ় ভাষায় দু'চার কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি তো আশ্চর্য্য! চুপ করে শুনে গেলাম। পরে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হত, কিন্তু গালি খাবার ভয়ে আমি আর তাঁকে কিছুই বলি নাই। তিনি রাত্রে ৩।টার সময় রওনা হলেন। দেখতে বেশ নধর গঠন বটে! কান ফোঁড়া, তাতে একটি কাচের মোটা চুড়ী পরান আছে।

জ্যোৎস্নায় দিক্-দিগন্ত উদ্ভাসিত—সুন্দর জ্যোৎস্নালোকে পথ অতিক্রম করা কোন কষ্টকর নয়। দিনে রৌদ্রের তাপে ক্লিষ্ট হয়ে পথ চলার চেয়ে রাত্রি বেলা চাঁদের কিরণে সঞ্জীবিত হয়ে পথ চলা খুবই আরামের। তবে এ পথে হিংস্র জন্তুর ভয় কিছু কিছু আছে।

আমি সকালে একটি কুইনাইন খেয়ে বের হয়ে পড়ি। প্রতিদিনই আমি সকলের শেষে বেরহতাম তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। এ পথটা বিকট চড়াই এবং জঙ্গলময়। টিহরী সরকারের তরফ হতে একটি ছোট সাইনবোর্ডে আছে :—

আগারী ভারী জঙ্গল হৈ

এখানে দুটী রাস্তা আছে—একটী পাকদণ্ডী, অন্যটী ক্রমোচ্চ চড়াই, পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। অনেকে পথ ভুল করে পাকদণ্ডীর রাস্তায় যেয়ে উৎকট চড়াইয়ে কষ্ট পান। বাঁ দিকের রাস্তাটি পাকদণ্ডী—আমরা ডানদিকের রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। এখানকার প্রাতঃকালের হাওয়া বাংলা দেশের বসন্তকালের মলয়ের হাওয়ার স্মৃতি জাগিয়ে দিল। টিহরীতে অত্যধিক গরম, এখানে বসন্ত—কিন্তু পাহাড়টি ডিঙ্গিয়ে গেলেই খুব শীত। এ পথটি ভীষণ হলেও কোনরূপ কাঁটা-গাছ বা খারাপ গাছ নাই। ছোট, মাঝারি, বড় অসংখ্য চির্‌গাছে এ দিকের সমুদয় জঙ্গল আবৃত। চির্‌গাছে টিহরী সরকারের আয় সব চেয়ে বেশী। রাত্রিবেলা চির্‌কাঠে আগুন ধরিয়ে পাহাড়ীরা বাতির কাজ চালায়। আমরাও অনেকদিন কেরোসিন তৈলের অভাবে চির্‌কাঠ দিয়ে বাতি জ্বালাতাম। তা ছাড়া চির্‌গাছের হাওয়া বুকের ব্যারাম, সর্দ্দি-কাশি ও যক্ষ্মায় উপকারী। যে সব পাহাড়ে চির্‌কাঠ আছে, সেখানে কাউকেও সর্দ্দিকাশি হতে দেখি নাই। যাদের সর্দ্দি-কাশী ও যক্ষ্মার ব্যারাম আছে, তারা কিছুদিন এ সব দেশে বাস করলে খুব উপকার পাবেন। এ সব পাহাড়ে আগুন জ্বালানো নিষেধ। চির্‌কাঠ কাঁচা অবস্থাতেই ভাল জ্বলে, এতে তৈলের ভাগ অত্যন্ত বেশী, সামান্য একটু আগুন পেলেই, অমনি কাঁচা জ্যান্ত গাছে আগুন ধরে যায়। একটি গাছে কোনরূপে আগুন ধরলে প্রায় যমুনোত্তরীর সমস্ত পাহাড় আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে; শুধু যে পাহাড়ই নষ্ট হবে তা নয়—লোকজন, ঘোড়া, গরু, মহিষ, শস্যাদি, ঘর বাড়ী সমুদয়ই পুড়ে নরনারায়ণের খাণ্ডব-বন দাহনের মত হয়ে যাবে। কোনদিক দিয়ে পথ নাই যে, কেউ পালিয়ে বাঁচবে; এইজন্যই এই পাহাড়ে আগুন জ্বালান নিষেধ। যদি কেউ সিগারেট, বিড়ি, তামাক খেতে চায় বা খাবার তৈরী করে নিতে চায়, তা'হলে তাকে কাজ শেষ করে তৎক্ষণাৎ আগুন নিবিয়ে ফেলতে হবে—নতুবা কোন পাহাড়ী দেখতে পেলে, তাকে ধরে নিয়ে টিহরী সরকারের হাতে দিবে। প্রত্যেক পাহাড়ীর উপরই এই আদেশ আছে।

আমরা ক্রমে ৪ মাইল পথ চড়াই করে পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছে জীবনের প্রথম একটি নূতন জিনিষ দেখে খুবই আনন্দিত হলাম। বরফের পর্ব্বতের নানা প্রকার বিস্তৃত রচনা অনেক বইএ পড়ে থাকলেও এ পর্য্যন্ত সেরূপ দৃশ্য দেখবার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। যারা মুস্‌রী আসেন বা মুসুরী হয়ে এ পথে আসেন, তাঁরা বরফের দৃশ্য দেখে থাকলেও আমরা সে পথে না আসায় এমন চিত্তবিহ্বলকারী দৃশ্য দেখতে পাই নাই। পাহাড়ের শীর্ষদেশ হতে ঈশান কোণে দূরে—অতিদূরে যেন গম্বুজবালা দুটী শিব-মন্দির রয়েছে বলে প্রথমে আমাদের মনে হল। আমি মনে করেছিলাম, ঐ রজত-কিরণোদ্ভাসিত শিব-মন্দিরেই বুঝি আমাদের যেতে হবে। মন্দিরের মত সেই অচল বরফের গম্বুজের ওপর প্রভাত-সূর্য্যের রশ্মি পড়ে কি অপরূপ শোভা যে খুলেছিল, তা অবর্ণনীয়। পরে অনেকবার পাহাড়ের এই জাতীয় দৃশ্য দেখলেও এবারের মত এমন চমৎকার দৃশ্য আর চোখে পড়েনি। শতসহস্র সুনিপুণ শিল্পী বহু যত্নে সহস্র সহস্র বৎসর পরিশ্রম করেও যেন এমন নিখুঁৎ সৌন্দর্য্য গড়ে তুলতে পারবে না। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

যমুনোত্তরীতে যমুনার উৎপত্তিস্থান লক্ষ্যে যাত্রা করলেও কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যমুনা নদীর সঙ্গে আমাদের দেখাই হয় নাই। এতদিন আমরা গঙ্গা নদীর ধার দিয়ে এসে এই বড় চড়াইটী ডিঙ্গিয়ে আজ পাহাড়ের ওপর হতে দূরে পাহাড়ের উপত্যকায় যমুনা দেখতে পেলাম। রসরাজ পূর্ণাবতার ভগ-

বান শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-লীলার কথা স্মরণ হয়ে প্রাণে একটী আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। যমুনা নিশ্চয়ই খুব প্রচণ্ড শব্দে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। কিন্তু দূর থেকে আমাদের কাণে সে শব্দ যেন মৃদুমধুর গম্ভীর মোহনমূরলীধ্বনির মতই বাজতে লাগল।

পাহাড় চড়াই করে আস্তে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল—এখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে বসে বরফাবৃত পর্ব্বতের দৃশ্যে ও যমুনার সুমধুর ধ্বনিতে শ্রান্ত ক্লান্ত শরীর আপনা আপনিই সুস্থ হয়ে উঠলো—খানিকক্ষণ বসে প্রাকৃতিক মধুর দৃশ্য উপভোগ করে, প্রফুল্ল মনে আবার উৎরাই করতে লাগলাম। পাহাড়ের এদিকটার চিরগাছ ওদিকটার চেয়েও অনেক বেশী। চিরগাছের নীচু দিয়ে রাস্তাগুলিও চল্‌তে বেশ। আমরা ক্রমে উৎরাই করে বেলা ৮৷৷০টার সময় ডাণ্ডাল চটীতে পৌছলাম।

ডাণ্ডাল চটী ছিলকার চটী হতে সাড়ে সাত মাইল। এ চটীতে আপেল, ন্যাসপাতি, আলুবখ্‌রা প্রভৃতি গাছ সামান্য আছে, সবই ফলশূন্য।—জলের খুবই অসুবিধা, ছোট্ট একটা মাত্র ঝরণা। যেটা-

ডাণ্ডাল চটী সাড়ে-সাতমাইল

নীর লোকে পূর্ব্বেই চটিটা দখল করে বসে আছে। তিলমাত্র স্থান না পেয়ে তখনই আবার চল্‌তে আরম্ভ করলাম। এ পথটিও উৎরাই,—দু' মাইল উৎরাই করে যাবার পর সিমলী চটীতে যেয়ে পৌছলাম।

সিমলী চটীর স্থানটি বেশ সুন্দর, কিন্তু থাকবার সুবিধা নাই। সামনেই একটি প্রকাণ্ড ঝরণা সশব্দে বয়ে যাচ্ছে। চটীও একটি। সে ঘরটিতে প্রবেশ করে দেখি, দু'জন সাধু সমস্ত

সিমলী চটী জংশন ২ মাইল

ঘরটি দখল করে বসে আছেন। এখানেও স্থানাভাব। অগত্যা আলুবখ্‌রা-গাছের নীচেই আশ্রয় নেওয়া গেল। আমাদের সঙ্গীয় অন্যান্য লোক আস্‌তে প্রায় আরও তিন ঘণ্টা দেরী ছিল। এর মধ্যে পাক শেষ করে রাখ্‌লাম। রাস্তায় কোথাও তরকারী পাই নাই—এখানেও নাই। অরহর ডাল, ঘি, আটা, চাউল, লবণ ভিন্ন অন্য কোন জিনিষ নাই। অরহর ৷৷০ আনা, ঘি ২৲ টাকা, চাউল ।৴০ হতে ৷৷০ আনা, আটা ।৵০ আনা। এখানে শুধু অরহর ডাল ও ভাত খাওয়া গেল—দোকানদারটির কাছে লঙ্কা পর্য্যন্ত নাই। কোন জিনিষ না হলেও শুধু ভাত যেন অমৃতবৎ বোধ হল। এখান হতে একটি পাকদণ্ডী রাস্তা পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে ওদিকে গঙ্গোত্তরীর পথের সঙ্গে মিশেছে। আমরা যমুনোত্তরী হতে এই চটীতে ফিরে এই পাকদণ্ডী চড়াই করে গঙ্গোত্তরীর পথে গিয়েছিলাম। যথাসময়ে সে পথের বিবরণ দেব। চিদানন্দ দাদা ও হরিদাস তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করে, সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রের মধ্যেই সামনের চটীতে গিয়ে জায়গা দখল করতে তিন জনেই বের হয়ে পড়লাম।

এ চটী হতে রাস্তা প্রায়ই উৎরাই। দেড় মাইল উৎরাই করে গঙ্গানী চটীতে যেয়ে পৌছি। গঙ্গানী চটী পথের উপর নয়। যাদের **গঙ্গানী** চটীতে থাকার ইচ্ছা,

গঙ্গানী চটী দেড় মাইল

তাঁরা একটু সতর্ক হয়ে এ পথটুক অতিক্রম করবেন: পাড়াগাঁয়ের পথের মত একটি ছোট পথ বড় রাস্তা হতে নদীর দিকে নেমে যমুনা নদীর ধারে গঙ্গানী চটীতে গিয়ে মিশেছে—অতি সামান্য দূর আধ ফার্লং‌ও হবে না। গঙ্গানী হ'তে যমুনোত্তরী ২৩ মাইল। ২৩ মাইলের মাইল-ষ্টোনের পূর্ব্বেই গঙ্গানী চটীতে যাবার ছোট পথটি। মাইল-ষ্টোন্ ছাড়িয়ে গেলে চটী ছেড়ে চলে যেতে হবে—এই কথাটী মনে রাখ্‌বেন। নতুবা গঙ্গানী চটী হতে ৫ মাইল পথ অতিক্রম করলে পর তবে চটী পাবেন—মাঝখানে কোন চটী নাই। গঙ্গানী চটীই এ পথের সর্ব্বোত্তম চটী। চটীর অতি নিকটেই যমুনা প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিতা। গঙ্গানীতে—একটি ছোট ধর্ম্মশালা—ধর্ম্মশালার নীচে একখানা ও উপরে একখানা ঘর, পিছনে একখানি

দোকান—সামনে একটি মন্দির। মন্দিরের সামনে একটি ছোট কুণ্ড—কুণ্ডের ভিতর সামান্য জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—কুণ্ডটির সঙ্গে যমুনার সঙ্গে যোগ আছে—কুণ্ডের ভিতর ছোট ছোট মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। আমরা মাছগুলিকে আটার গুলি করে খাওয়িয়ে কিছু পুণ্য লাভ করলাম। কুণ্ড সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী শুনতে পেলাম—

"একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করার জন্য সিমলী চটীর বড় চড়াই অতিক্রম করে গঙ্গাস্নান করে আমার এই গঙ্গানী চটীতে ফিরে নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা, পাঠ ও অন্যান্য ক্রিয়াদি করতেন। বৃদ্ধবয়সে ব্রাহ্মণ যখন চলৎ-শক্তিরহিত ও গঙ্গাস্নানে অসমর্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি গঙ্গা-মায়ীর নিকট প্রার্থনা জানালেন—"মা! আমি বৃদ্ধ, শক্তিহীন; চলংশক্তি লোপ পেয়েছে। আমার নিয়ত কামনা ছিল—মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত, তোমার পবিত্র জলে স্নান করে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় অটুট থাকব। কিন্তু জরা-জীর্ণ দশায় আমাকে সে প্রতিজ্ঞা হতে ভ্রষ্ট হতে হচ্ছে। মা, তুমি সন্তানের সংকল্প রক্ষা না করলে আর কে করবে?" ব্রাহ্মণ এই প্রার্থনা করলে সেইদিনই গঙ্গা-স্নানের সময় দৈববাণী হল—"তুমি রোজ আমার যে ঘাটে স্নান করতে আস, সেই ঘাট হতে গঙ্গার একটি ধারা পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে তোমার আশ্রমে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার জায়গায় কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গিয়ে পৌঁছবে। সেই ধারায় স্নান করলে গঙ্গা-স্নানের সম্পূর্ণ ফল ফল্‌বে।" পরদিন দৈববাণীর নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যক্ষ গঙ্গার ধারা দর্শন করেও ব্রাহ্মণের মনের সংশয় দূর হল না। তিনি আবার পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে গঙ্গার সেই ঘাটে গিয়ে স্নান তর্পণ করলেন। তারপর কমণ্ডলু ঘাটে রেখে মার শ্রীচরণে প্রার্থনা জাগলেন, "যদি সত্য সত্যই মা, তুমি কৃপা করে আমার আশ্রমে পৌঁছে থাক, তাহলে দয়া করে, আমার সংশয় ঘুচাবার জন্য আমার এই কমণ্ডলু স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে আমার আশ্রমে রাখ!" পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ কমণ্ডলু আপন আশ্রমে দেখতে পেয়ে, মায়ের অপার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে নানারূপ স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। সেই দিন হতেই গঙ্গার নূতন ধারাতেই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, কর্ম্ম, তর্পণ, পূজাদি সম্পন্ন করতে লাগলেন। একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজা চালাতে লাগলেন। বর্ত্তমান যে মন্দির, তাই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত গঙ্গা-যমুনার মন্দির।

প্রাচীন গঙ্গার সেই ধারাকে চারিদিকে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে কুণ্ডে পরিণত করা হয়েছে; কুণ্ডের জলে সামান্য স্রোতও আছে এবং এক পাশ দিয়ে জল বের হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্রোত কোথা হতে আসে—তা বুঝতে পারি নাই। কুণ্ডটির মধ্যে যদি যমুনার স্রোত প্রবাহিত হত, তা'হলে অনেক দিন পূর্ব্বেই কুণ্ডের জল স্রোত বালি বা মাটী চাপা পড়ে তার অস্তিত্ব লোপ পেত। সুতরাং কিংবদন্তী সত্য বলেই ধারণা হয়।

গঙ্গানী চটীতে পীচ, আখরোট, ন্যাসপাতি, বেদানা, ডালিম, পেয়ারা, আলুবখরা, আম প্রভৃতি নানাবিধ ফলের ও ফুলের গাছ আছে। গাছগুলি বেশ নীচু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; যাত্রীরা তার নীচে বেশ আড্ডা জমিয়ে বসে। হরিদ্বার কুণ্ডের রৌড়ীদীপের গাছের নীচে যেমন অসংখ্য লোক জমায়েৎ হয়ে সাধন-ভজনে কালাতিপাত করতেন—এ জায়গাটীও অনেকটা তেমন। স্থান, জল-বায়ু সমস্তই সাধনার অনুকূল,—যমুনার একটানা অনাহত নাদের সঙ্গে চিত্ত লয় করার উপযুক্ত বটে! স্থানটির রমণীয়তায় মুগ্ধ হতে হয়।

ধর্ম্মশালা হতে প্রায় সিকি মাইল দূরে একজন দোকানদার, নিজের বাড়ীতেই দু'দশজন যাত্রী থাকার ব্যবস্থা করে, কিছু আয়ের পন্থা করে রেখেছে। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার, ধর্ম্মশালার পিছনের দোকান-

চটীর ও বাবা কালীকম্বলীবালার সদাব্রত দেবার মালিকও সেই দোকানদার। কিছু দূরে পাহাড়ের মাঝে সামান্য পরিমাণ মটরের আবাদ হচ্ছে দেখলাম।

ধর্ম্মশালার চাবী দোকানদারের নিকটেই ছিল, কিন্তু সে দিতে চাইল না, অগত্যা আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে, তালাটি সামান্য খট্‌ খট্‌ করতেই তিনি ভদ্রলোকের মত বিনা বাক্যব্যয়ে খুলে গেলেন। আমরা নীচের উপরের ঘর দু'খানা দখল করে বসলাম। চটীর নিয়ম—প্রথমে যে এসে দখল করে বস্‌বে—চটীবালা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য কাকেও স্থান দিতে পারবে না। একটি পাকের ঘর আছে, আমরা সেখানে পাক করে নিলাম।

যমুনার ধারে যতদিন ছিলাম, প্রত্যেক দিন দুই-বেলাই আমি ও হরিদাস-ভায়া "যমুনে এই কি তুমি" এই গানটি গেয়ে গেয়ে কেমন করে যে যমুনোত্তরীর দুর্গম পথ অতিক্রম করেছি, তা' বুঝতেও পারি নাই। মনটি কখনও গানে কখনও বা যমুনার কলতানে বিভোর হয়ে থাকত—পথের কষ্ট মনেই জাগ্‌ত না—আনন্দে সময় কাটত।

(ক্রমশঃ)

দিশারী

তোমার পরশ পেয়েছি, সুতরাং বেঁচে উঠেছি এবার। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে নিদ্রাভিভূত হয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপেও বেঁচে ছিলাম, কিন্তু যে বাঁচাকে কি বাঁচা বলে ?

অন্ধকার-বিসর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দেহে-মনে আসে যেমন একটা অজানিত শঙ্কা, তেমনি মরণসমস্যাঙ্কিত অবিবেকের আঁধারে আপনাকে তলিয়ে দিতেও একটা উদ্বিগ্ন আকর্ষণ আসে। মনে হয়, ঘুমাই—ঘুমাই, একটু ঘুমালে কি আর পিছিয়ে পড়্‌ব ?—কতই বা পড়্‌ব !

এমনি করে ঘুমের কোলে—অজ্ঞানের কবলে—না-বোঝার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পার্‌লাম না—তুমি চমক্‌ ভাঙ্গাতে এলে !

এই বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, নীল আকাশের উদার কোল, স্নেহসঞ্জীবন সমীরণস্পর্শ, জগৎব্যাপী আধ আলো আধ ছায়া এই ভালবাসার মায়াবন্ধন—সমস্ত কোথায় পড়ে থাকে যখন ঘুমিয়ে পড়ি ? প্রাণ-জাগানো আলোকের স্পর্শ পেয়ে যতক্ষণ না জেগে উঠি, ততক্ষণ সবি মিথ্যা, সবি অনাস্বাদিত, সকলি বিফল। এই আলো-বাতাস পৃথিবীতে তখনও থাকে, তখনও অযাচিতে সুষুপ্তিমঙ্গল আপ্যায়নের সহযোগে আমার সেবা করে, কিন্তু জ্ঞানে তাকে গ্রহণ করি না, তার মহিমা বুঝি না। সে নিজে মহিমাময় হলে কি হবে—আমার তপস্যায় অর্জ্জিত ধন তো তখন সে নয়। তাই তার কোন মূল্য নাই যেন। আত্মচেষ্টার যেখানে অভাব, সাধনা সেখানে হীন, দেবতা সেখানে জাগেন না যে !

সুদীর্ঘ জীবনের সবখানিই আঁধার বা মৃত্যু, যদি সেখানে তোমার আবির্ভাব না হয়। এই জীবনের স্তরে স্তরে কত লুকানো আঁধার—কত অতৃপ্ত বাসনার পুঞ্জীভূত বেদনারাশি হৃদয়ের উষ্ণশ্বাসে বাষ্প হয়ে কুজ্ঝটিকারূপে সমগ্র জগৎ আবৃত করে রয়েছে, তোমার প্রেমের অরুণকিরণ-স্পর্শ না পেলে সে ঘোর ঘুচ্‌বে না—হৃদ্‌গগনে চিরনির্ম্মল হাসির ছটা ফুটবে না। জীবনে কত কিছু আয়োজন করছি,

অনুকূল হয়ে সমস্ত এসে আমার কাছে প্রতিভাত হোক্ বলে অহরহঃ কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌ছি। সে যুদ্ধজয়ের কত অস্ত্র, কত আয়োজন, কিন্তু কার্য্যকালে ছদ্মবেশে ক্লীবতা এসে সমস্ত ভুলিয়ে দেয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে হৃদয় তখন তোমার অমৃতগীতা শ্রবণের জন্য আকুল হয়ে আহ্বান করে—"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলে অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোর প্রত্যাশায় তোমার শরণ নেয়। জীবনে ঊষার ছটা দেখা দেয় তখনই, বাঁচার প্রকৃত আশ্বাস পাই সেই সঙ্কট সময়েই। সমস্ত প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে তখন শোনে তোমার সেই অমোঘ বাণী। "কিছু হল না" বলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঘুমের কোলে এলিয়ে পড়াই পরম শ্রেয়ঃ মনে করেছিলাম—তমসাবৃত মনও যেন শত যুক্তি দেখিয়ে ওই এলিয়ে পড়ার দিকেই ঝুঁকেছিল, তুমিই না তখন আমাকে বজ্রদৃঢ় কঠোর স্বরে আমার সমস্ত ভাবকে "অনার্য্যজুষ্ট" বলে মহাতেজে ধিক্কার দিয়ে সমস্ত হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়ে আমায় তোমার বাণী ধারণা কর্‌বার মত দৃঢ় হৃদয় করে গড়ে তুল্‌লে! তবুও তো অভিমান যায়নি—প্রাণপণে সেই তমোকেই আঁক্‌ড়িয়ে ধরে আমার সমস্ত পাণ্ডিত্যবিজৃম্ভিত বুদ্ধির কেরামতী দেখিয়ে নিজের বুদ্ধিকে কত সাধু বলে নিজেই তারিফ করেছি। যে বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ অমৃতলোকের সন্ধান পায়, অজ্ঞান সেই সূক্ষ্মবুদ্ধিকেই নষ্ট করে স্থূল করে ফেলে এমনি করেই বুঝি! তখন সেই দুষ্ট চোখে শুভ্রকেও মসীবর্ণ দেখে—উজ্জ্বল জ্যোতিঃর সম্মুখীন হতে সে মহাশঙ্কিত হয়!

কিন্তু যার জীবনযুদ্ধে তুমি নিজে এসে সারথি হও, তার সকল শঙ্কাই যে দূর হয়ে গিয়ে সব ঘটনাই উৎসাহের, পরমানন্দের কারণ হয়। মরণের কোলে বসেও অমৃতের যোগ্য অধিকারী সে হয়।

তুমি জানিয়ে দিলে—নিতান্ত ক্লীবত্বও যেমন আমার ধর্ম্ম নয়—সীমা ছেড়ে পরম বৃহত্ত্ব, অতিবীরত্বের দাবীর যোগ্যও আমি নই। আর যদিই সেই পরম শক্তিকে আয়ত্ত কর্‌তে হয়, তার কৌশল তুমি শেখালে—মহাযোগ। সে যোগ কি, কোন্ বুদ্ধিকে আশ্রয় করলে তা আয়ত্ত হয়? হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল, তা এই—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতে দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥

সমস্ত কর্ম্ম থেকেও যে কৌশলে তার ফলের লোভ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে চলে, সেই বুদ্ধিমান্। বস্তুতঃ কর্ম্মের সুকৌশলই যোগ। তুমি ইহলোকের সুকৃতি দুষ্কৃতি দুটোই ত্যাগ করে সেই যোগের জন্য নিজকে যোগ্য কর।

নিজকে জন্য আমার অনেক কিছু কর্‌বার দাপাদাপিকে স্তম্ভিত করে তুমি বল্‌লে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

আমার যত কিছু সংকল্প-বিকল্প সব ভেসে গেল, সহস্র বুদ্ধির অজস্র আকর্ষণ হতে তুমি আমায় বাঁচালে। কি করলে হৃদয়ে পরম শান্তি পাব, ওঠা-নামার, আনাগোণার হাত থেকে রেহাই পাব, তার জন্য প্রাণ আকুল হল! পরম সান্ত্বনার সুরে শুন্‌লাম—

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

—যারা খাঁটী বুদ্ধিমান্, সেই মনীষীরা কর্ম্মজাত ফল ছেড়ে দিয়েই বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ যাতায়াতের হাত থেকে রেহাই পেয়ে পরম শান্তি লাভ করেন। যখন আর মোহবশতঃ দেহটাকেই নিজের আত্মা বলে বুঝবে না, তখনই ঠিক বৈরাগ্য হবে। আর এমনি ভাবে লৌকিক কি বৈদিক কোনও বিষয়ে

বিক্ষিপ্ত হয়ে বুদ্ধি যখন আর উদ্‌ভ্রান্ত হবে না, আমার দিকে সমাহিত ও অচল হয়ে থাকবে, তখনই যোগফল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হবে।

সমস্ত কামনা ছেড়ে দিয়ে সুখে-দুঃখে অক্ষুব্ধ হয়ে সমান থাকৃতে পারলেই যে চিত্তে জোর পাওয়া যায় বেশী, তোমার দিকে মনটা থাকে বেশী—এ কথা আজ একটু একটু বুঝ্‌তে পারছি। হাত-পা গুটা-লেই কিছু ছাড়া যায় না, ইন্দ্রিয়গুলি তোমার দিকে গুটিয়ে আনতে পারলেই কাজ করেও দুঃখ পেতে হয় না। বরং প্রসন্ন চিত্তের এক নিবিড় অনুভবে বুদ্ধি প্রশান্ত হয়। অশান্ত মনে সুখ কোথায়? সে কেবল বান্‌চাল দিক্‌হারা নৌকার মত ঘুরতেই থাকে। কিন্তু তোমার পরম ভালবাসায় প্রবুদ্ধ না হলে কোথা থেকে সত্য জীবনের সন্ধান পাব? সবটুকু না দিলে যে তোমার মন ওঠে না! যখন শুনে-ছিলাম, তোমার প্রেমিক দিনকে রাত, রাতকে দিন দেখ, তখন ভেবেছিলাম, সে আবার কি অদ্ভুত কথা! আজ আমার এই নূতন চোখ দিয়ে জগতের পানে তাকিয়ে দেখি—কথা মিথ্যা নয়। সত্যই যে বাঁচাকে বাঁচা বলি, তা যে মরণেরই সামিল; যে দিনকে সাধারণতঃ দিন বলি, সে যে অন্ধকারাবৃত রজনীরই মত, কেননা অনুভবের আলো যখন থেকেও নাই—তখন সবই অন্ধকার। তোমার সে দিব্য জ্যোতিঃর সন্ধান যেখানে মিলে, সে দেশ এত দীপ্ত যে তার কাছে এখানকার সবই আঁধার। এই কোলাহলময় জগতের দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে, সেই নিস্তব্ধ মনোরম ভূমিতে না পৌঁছ্‌লে বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত না হলে, সেই পরম রমণীয়—চির মধুর—চির আনন্দ তো হৃদয়ে জাগে না। আমার জীবনের রজনী যখন শান্ত মধুর, তোমার রাসলীলা তখনই। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় গোপিকা হয়ে আনন্দে মণ্ডলী করে আজ নৃত্য করছে। আর তারই মাঝখানে আমারই কেন্দ্রস্থ হয়ে তুমি বিশ্বোল্লাসী মহা-রাসমণ্ডলে অধিষ্ঠিত। অনন্ত গ্রহোপগ্রহে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আমারই সব জ্যোতির্ম্ময় দেহ—আর দেহীরূপে তুমি অন্তরে থেকে আমার সর্ব্ববিধ রস অনুভব করছ। তাই না আমি চেতন—অহরহঃ আনন্দে চঞ্চল হয়ে জীবনের পরিচয় দিচ্ছি।

আমার লীলা বঞ্চিত আঁধার জীবনে তুমিই যে গো অনুভবের আলো জ্বালিয়ে তোল—ভোরের আলোর মত নীরবে এসে ফুলের হাসি জাগিয়ে যাও আমার ঘুমন্ত বুকে! এই বিশ্বময় যত কিছু আমার আমার জীবনের খেলা—কত সৌন্দর্য্য, কত আনন্দ—কত বেদনা, কত অনুভব—সব রসেরই রসিক যে গো তুমি! সত্য তুমি, কান্ত তুমি, শুভ্র নির্ম্মল তুমি—ওগো, তুমিই আমার সকল দিশার দিশারী!

আলোচনা

——):*:(——

শোনা যায়, পবহারী বাবাকে নাকি যুবক বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, আপনি যে গুহায় বসিয়া তপস্যায় দেহপাত করিতেছেন, ইহাতে দেশের কি লাভ? আপনাদের মত কৃতবিদ্য সাধুরা সমাজে কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতেছেন না কেন? পবহারী বাবা নাকি উত্তর দিয়াছিলেন, বাচ্চা, এখনো তোমার রক্ত গরম, কাজেই চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকিয়া কাজ করা যায় কিনা, সে কথা বুঝিতে পারিবে না। বিবেকানন্দ কি বুঝিয়াছিলেন তাহা জানি না, কিন্তু মুখবন্ধেই

বলিয়াছিলেন, মহতী চিন্তা কখনো বিনষ্ট হয় না, পাষাণগুহায় অবরুদ্ধ থাকিলেও একদিন তাহা পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে এবং উপযুক্ত মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই ধরণের কথাটা পণ্ডিচেরী হইতেও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া এই সেদিনও নবজাগ্রৎ তরুণ-সঙ্ঘ কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-আস্ফালনই না করিল! বাস্তবিক কথাটা একটা ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয় বটে। আজকাল মূর্ত্তকর্ম্মের যুগ, অমূর্ত্ত ভাবনাকে কেহ বড় একটা আমল দিতে চায় না। তুমি মহাকর্ম্মী; চোখের সামনে আর একজন কর্ম্মী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে আর তোমার ছট্‌ফটানী দেখিয়া মিটিমিটি হাসিবে, অথচ তোমার বিশ্বাস, সে পঙ্গুও নয়, দুর্ব্বলও নয়—এরূপ ক্ষেত্রে রাগে কাহার না আপাদমস্তক জলিয়া উঠিতে চায়? শুধু এই কথায় নয়। একেই তো দেশটা কর্ম্মবিমুখ; জীবনের আদর্শ কতকটা সেই নিগ্রোর মত, যে বলিয়াছিল, কাজ করার চেয়ে বসিয়া থাকা ভাল, আর বসিয়া থাকার চেয়ে শুইয়া থাকা আরও ভাল। এ হেন দেশে যদি নিছক ভাবুকতার আদর্শ প্রচার হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই; পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইয়া চোখ বুজিয়া দেশের হিত করিবার লোকের অভাব হইবে না। সুতরাং আদর্শ হিসাবে কর্ম্মবিরতিকে অত্যন্ত উঁচু ঠাঁই দেওয়া নিতান্ত সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। জাতি-সাধনা বলিয়া একটা বালাই তো আমাদের একরকম নাই বলিলেই চলে। আছে ব্যক্তিগত সাধনা; তাহার মাঝেও দেখি, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ যত মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে, কর্ম্মবাদ তাহার সিকিও পারে না। দুইটী মুক্তিমণ্ডপ খাড়া কর; একটীতে উত্তম আহার-বিহার আর কীর্ত্তন নর্ত্তন, ভজন-সাধনের ব্যবস্থা কর, আর একটীতে কঠোর সেবাব্রত উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা কর। দেখিবে, যত মুক্তির উমেদার আসিয়া ঐ কীর্ত্তনের দলে ভিড়িয়াছে! ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনাতেও যাহারা গা বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, জাতিগত মুক্তিসাধনায় তাহারা যে স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিবে, সে ভরসা আর কি করিয়া করা যায়? তাই বলিতেছিলাম, কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া ধ্যান-ধারণায় মশ্‌গুল্ হইয়া থাকিলে জাতীয় প্রগতি সহজে হইবে, একথা বড়-গলায় প্রচার করায় বিপদ্ আছে। কিন্তু সত্যের খাতিরে ইহাও আমরা বলিতে বাধ্য যে, একমাত্র অন্তর্মুখীনতার অভাবই আমাদের জাতীয় জীবনের সমূহ অবনতির মূল। হাতে পায়ে খাটিতেছি না, অথচ একাগ্র ভাবনা দ্বারা অপরে শক্তিসঞ্চার করিতেছি, অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গীর কাছে ইহা আজগুবি ব্যাপার বলিয়া মনে হইলেও ইহার মূলে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। যদি বলি, ভাবই বাস্তবিক কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা হইলে কি বেশী বাড়াইয়া বলা হইবে। ভাব গভীর না হইলে কর্ম্ম কি কখনো টিকিতে পারে? আমাদের কর্ম্মে এত অবসাদ আসে কেন? কর্ম্মে শ্রী নাই কেন? বাস্তবিক কোনও বৃহৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত নই বলিয়াই আমাদের যত দুর্দ্দশা। আজ যাহারা কর্ম্মে উদ্দণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কর্ম্মেই বা প্রেরণা জোগাইল কাহারা? —মুষ্টিমেয় ভাবুকেরা, যাহারা জাতির ব্রাহ্মণ। আজকাল গীতাকে কর্ম্মযোগের উপনিষদ্ বলিয়া প্রচার করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু এই গীতাই কি ভাবুক জীবনের প্রতি অত্যন্ত বেশীমাত্রায় জোর দেয় নাই? এই গীতাই কি অর্জ্জুনকে ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া চোখ উল্‌টাইয়া প্রাণায়াম করিবারও উপদেশ দেয় নাই? নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কথা গীতাতে আছে, নিরগ্নি অক্রিয়ের নিন্দা আছে; সঙ্গে সঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের উন্নত আদর্শের কথাও কি নাই? এগুলি কি পরস্পর-অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি মাত্র?

* * *

বাস্তবিক একচোখা হইয়া কখনও সত্যকে দেখা যায় না; সত্যকে গ্রহণ করিতে হইলে দুই চোখ মেলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু ভাব, অথবা শুধু কর্ম্ম, ইহার কোন একটাই আদর্শ হইতে পারে না। ভাব আর কর্ম্মের মাঝে সামঞ্জস্য ঘটিলে তবে জীবন সুন্দর হইবে, সুশ্রী হইবে। আর এই সামঞ্জস্যের মূলমন্ত্র এই হইবে, ভাবকে করিতে হইবে প্রতিষ্ঠা, আর কর্ম্ম হইবে তাহার অভিব্যক্তি; ভাব যদি জীবনে বারো আনা গভীর হয়, তাহা হইলে চার আনা মাত্র নিটোল কর্ম্মে তাহা আত্ম-প্রকাশ করিবে; কিন্তু সেই চার-আনা পাইয়াই জগৎ ধন্য হইয়া যাইবে। এ যেন কবির কবিতা; কবি যাহা ভাবে, তাহার কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে? কিন্তু প্রকাশ ততই সুন্দর হয়, অপ্রকাশ্য ভাবের চাপ যত গভীর হয়। কর্ম্মযোগেরও ইহাই সঙ্কেত। যে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের বুলি আজকাল পথে-ঘাটে ছড়ায়, তাহারও মূল কথাটা এই। "কর্ম্ম না করিয়া জীব ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না; আমার কর্ত্তব্য নাই, তবুও কাজ নিয়াই আছি, অতএব কর্ম্ম কর—কর্ম্ম কর।"—গীতার এই ধূয়াটার দোহাই খুবই শুনি। কিন্তু এ তো কেবল বাহিরের কথা; এক কর্ম্মযোগকে সফল করিবার জন্য যোগেশ্বর যে আরো কত গণ্ডা যোগের উপদেশ করিয়াছেন, সেগুলি কি বুজরুকি মাত্র? ফলা-কাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম কর, অকর্ত্তা হও, আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর, আমাতে প্রবেশ কর"—এই গুলি কি ফাঁকা বুলি? কেবল মতলব-বাজী লইয়া নয়, সাধন-সম্পদ্ লইয়া যদি এই সমস্ত বাণীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে ভাবকে কর্ম্মের উপরে আসন না দিয়া তো পারি না। এ আদর্শে দেশ উৎসন্ন যাইবে বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিলে চলিবে না; ইহাও আমাদের বুঝিবার ভুল। দেশ ভাবাশ্রয়ী হইয়াছে বলিয়া যে উৎসন্ন গিয়াছে, এ কথা কখনও সত্য নহে। বাস্তবিক কোনও মহৎ ভাবও আমাদের জীবনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই বলিয়াই কর্ম্মে আমরা রস পাইতেছি না। জাঁক করিয়া বলি, আমরা সংসার ছাড়িয়া ভগবান্‌কে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, কিন্তু এ ভগবানও যে আমাদের জীবনে কত বড় ফাঁকি, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। "ঘট্ ঘট্ বিরাজে রাম" বলিয়া চেঁচাইয়া, অথচ মানুষ হইয়া মানুষকে আমরা যতটা ঘৃণা করিতে পারি, এমন বোধ হয় দুনিয়ার আর কোনও জাত পারে না। কথায় কথায় বলি, "হরির সংসার" অথচ সেই সংসার বজায় রাখিতে মিথ্যা মোকদ্দমায় কালীর কাছে জোঁড়া পাঁঠা মানসিক করিতেও ছাড়ি না। এই গুলি কি ভাবের সঙ্গে কর্ম্মের সামঞ্জস্যের ফল? না জীবনে সত্য-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন? গোড়ায় গলদ আছে বলিয়াই তো আমাদের দৈন্য কিছুতেই ঘুচিতে চাহিতেছে না। ফিকিরবাজী করিলে কিছুই হইবে না। অবসাদগ্রস্ত দেশ কর্ম্মী হইয়া উঠুক, কে না তাহা চায়? কিন্তু সেই কর্ম্মের মূলে যদি ভাবরূপী ভগবানের প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে সব মিথ্যা—সব মিথ্যা। আর এই ভগবান জীবন্ত ভগবান হওয়া চাই—আমার সবখানি দিয়া যাঁহার সত্তাকে অনুভব করিতে পারি, যাঁহার ভূমানন্দের বিলাসে আমার ক্ষুদ্র অহমিকা বুদ্বুদের মত বিদীর্ণ হইয়া মিলাইয়া যায়। সেই অমৃত-উৎস হইতে কর্ম্মের শক্তি আহরণ না করিলে আমাদের কর্ম্ম প্রাণ পাইবে কোথা হইতে? ভূমার স্পর্শ লাভ করিবার দরুণ যদি বিবিক্ত সাধনায় জীবনের একদেশ ব্যয়িত করিতে হয়, অসঙ্কোচে তাহা করিব; জগতের স্তুতি-নিন্দা ভ্রূক্ষেপও করিব না, কেননা আমরা সত্যাশ্রয়ী। মূঢ়ের জীবনব্যাপী হাঁসফাঁসের চেয়ে সত্যাশ্রয়ীর ক্ষণেকের কর্ম্মও অমিতবীর্য্যশালী, জাতীয় জীবনের মহা রসায়নস্বরূপ—এ সত্যকে ভুলিলে বিনাশ নিশ্চিত।

* * *

আমাদের পল্লীসমাজ নাকি দলাদলিতে ছারে-খারে যাইতেছে। কিন্তু এ রোগ কি কেবল পল্লীতেই? দলাদলি কোথায় নাই? সম্প্রতি উপচীয়মান ছাত্র-সংঘে ও উদীয়মান রাজনীতিক-মহলে দলাদলির যে সমস্ত নির্লজ্জ নমুনা প্রকট হইতেছে, তাহা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়াই মনে হয়। ভেদ-বুদ্ধিটা আমাদের এমনি মজ্জাগত যে, তাহার ওপর বিদেশী কাল্‌চারের যতই পালিশই চড়াই না কেন, একটু আঘাত পাইতেই ভিতরের রংটী ফুটিয়া বাহির হইতে দেরী হয় না। হাম্‌বড়া ভাব আমাদের মধ্যে অতি প্রবল, আমার কথার উপর অপরে একটা কথা কহিলে অমনি দল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িব—এই তো আমাদের বুদ্ধি। এই অহমিকা-জর্জ্জরিত বুদ্ধি নিয়া কখনো সংঘ-সাধনা হয় কি? আত্মকর্তৃত্বের একটা বিকৃত অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি; আমাদের কাছে আত্মকর্তৃত্ব মানে শুধু একা আমার কর্তৃত্ব, ইহার মাঝে সমবেদনার কোনও কথাই নাই। কিন্তু দল বাঁধিতে হইলেই তো বুঝিতে হইবে, আমার একটা বিশিষ্ট আমি ছাড়া একটা দল-গত উদার আমিও আছে। একা আমার না হইয়া দশের হওয়াটাই না আমার মাহাত্ম্য, ওইখানেই না আত্মত্যাগের, জাতির অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত! কিন্তু মুখে আমরা যতই ত্যাগের বুলি আওড়াই না কেন, কার্য্যতঃ নিজের কাণা-কড়িটিও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই। গতবার কংগ্রেসের বৈঠকে প্রবীণ দলের সহিত তরুণ দলের কর্ম্মনীতি লইয়া মতভেদ হইল, অমনি তরুণ দলের পাণ্ডা বলিয়া বসিলেন, আমরা আলাদা কংগ্রেস্ গড়িব। কংগ্রেসের আজ দুই কুড়ি বছর পার হইয়া গেল, কাজের মাঝে তো কেবল হৈ-চৈ আর বচন, রাজভাষায় যার গালভরা নাম "প্রপাগাণ্ডা"; যে জিনিষ চাহিতেছি, তাহার টিকিটিরও দেখা নাই, অথচ কোন্ ঢঙে তাহা চাহিব, ইহা নিয়াই দলাদলি। দূর হইতে যাহারা এ ব্যাপার দেখে, তাহারা হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। কাজের নামে দেখা নাই, শুধু মত নিয়া কাটাকাটি—এ যে জাতি করিতে পারে, তাহার মত অন্তঃসারশূন্য জাতি কি আর দুনিয়ায় আছে? আজ সাম্যবাদের ধূয়া চারিদিকেই শুনি। কিন্তু সাম্যবাদকে হজম করিবার মত আমাদের ধৈর্য্য কোথায়? পরকে সম্মান করিবার মত আত্মসম্মানজ্ঞান আমাদের জন্মিয়াছে কি? ইকোয়ালিটীর স্বপ্ন বৃথা।—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরের দরকার। গণতন্ত্র নয়, প্রভুতন্ত্রই আমাদের ঠিক সায়েস্তা রাখিতে পারে। একজন জবরদস্ত নেতা যদি রঙ্গপীঠে আসিয়া হাজির হন, আর ভাবুকতার ঢেউ তুলিয়া হউক বা হুম্‌কি দিয়া হউক, আর সকলকে ভেড়া বানাইয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই আমাদের 'প্রপাগাণ্ডা'-বাজীর জয়জয়কার। আশু-মুখার্জ্জী বিশ্ববিদ্যালয়টাকে মুঠোর মাঝে রাখিয়াছিলেন, সি আর-দাস কংগ্রেসকে দাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঘের পিছনে ফেউ ছিলই; কিন্তু তবুও ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে, আমাদের মত অকর্ম্মা, ঈর্ষাতুর, কলহপরায়ণ, ছিদ্রান্বেষী ক্ষুদ্রচেতাদের পক্ষে এই প্রভু-তন্ত্রই আসল দাওয়াই—এখন সে প্রভু সাগরপার হইতেই আসুক বা দেশের মাটী ফুঁড়িয়াই গজাক্। এখনো সংঘ-সাম্য, গণতন্ত্র—সব ফাঁকা বুলি। ছোট ছোট হাম্‌বড়ার উপর চাই একজন কড়া মেজাজের জবরদস্ত হাম্‌বড়া—তবে তো চেঁচামিচি ছাড়িয়া আমরা সুবোধ বালকের মত 'আপন পাঠেতে মন করিব নিবেশ!'

* * *

অমৃতলাল রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, বিদেশী-বর্জ্জনের আন্দোলন যখন সুতিকাগৃহে, তখন যদি শতকরা বিশজন হ্যাট্ মাথায় দিত তো আজ বয়কট্ আর পিকেটিং এর পুরা মরসুমে শতকরা আশী জন হ্যাট্ মাথায় দিতেছে! বৃদ্ধ প্রফুল্লচন্দ্র পশ্চিমের দিকে পেছন ফিরিয়া চীৎকার করিয়া মরিতেছেন—ওগো তরুণ, ওগো সবুজ, বিড়ি ছাড়, বাস্ ছাড়, সিনেমা

ছাড়, থিয়েটার ছাড়, রেস্তোরাঁয় বসিয়া ডিমের ডেভিল খাওয়া ছাড়—নইলে দেশ যে রসাতলে যায়! এই স্বাধিকারপ্রমত্ত তারুণ্যের যুগে এমনি বেরসিকের মত বেসুরা চীৎকারও ছাড়ে মানুষে! বৃদ্ধেরা কি জানেন না, দেশে দেশে যুগে যুগে আজ তরুণের জয়-যাত্রা সুরু হইয়া গিয়াছে—এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে! বাংলার একজন নামজাদা কথা-সাহিত্যিক স্বকপোলকল্পিত আশ্রম-জীবনের ছবি আঁকিয়া ফতোয়া জারী করিলেন—এ হইতেছে মহা আড়ম্বর করিয়া দারিদ্র্য-ব্রতের সাধনা! সে দিন দেখি, একটী তরুণ-পত্র হর্ষ-বিষাদের মাঝে দোল খাইতে খাইতে বলিতেছেন, "এবার পূজার সময়ে সবাই সাজিয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশের গায়েই উঠিয়াছে বিদেশী আভূষণ; পণ্য-পরিবর্জ্জনের প্রসঙ্গে এটা নিতান্তই খাপছাড়া দেখায় বটে; কিন্তু আমরা জাতির ভোগস্পৃহাকে নিন্দা করিতে পারি না, কেননা এই স্পৃহা হইতেই সে নিত্যনূতন ভোগের সন্ধানে ধাবিত হইবে এবং প্রতিহত হইয়া ভোগের উপকরণ অর্জ্জন ও উৎপাদনে মনোযোগী হইবে এবং তাহাতে জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি" ইত্যাদি ইত্যাদি!—বাস্তবিক, কি চমৎকার ফিলসফি! যেদিন হইতে বিদেশী পণ্যে বাজার ছাইয়া গিয়াছে, তাহার পর হইতেই আমাদের ভোগস্পৃহা কত গণ্ডা ঘা খাইয়াছে, তাহার একটা হিসাব রাখিলে মন্দ হইত না। অবশ্য কথাটা ঠিক, বাসনা হইতেই সৃষ্টি-শক্তির স্ফুরণ হয়; কিন্তু এখানে যে বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতি ও বিশ্ব-বাণিজ্যনীতির দৌলতে চমৎকার Division of labourএর ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ কিনা, ভোগের বাসনাটা করিব আমরা, আর সৃষ্টি-শক্তির স্ফুরণ হইবে উহাদের; তাহা হইলে জাতীয় ধনবৃদ্ধি হইবে কাহাদের? দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা ধরিলাম খদ্দর; অমনি বিলাতে, জাপানে সে খদ্দরের নমুনা গিয়া উপস্থিত হইল, পরদিন দেশ বিশুদ্ধ ম্যাঞ্চেষ্টার ও জাপানের খদ্দরে দেশের বাজার ছাইয়া গেল। বাস্তবিক স্পৃহা বুঝিয়া জোগান দিতে উহারা ওস্তাদ; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, ধনাগমটা হয় কাহাদের? একটা ঘটনা মনে পড়িল, ও দেশের আর এ দেশের মনোবৃত্তিতে কতখানি তফাৎ, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ফোর্ডের মোটর জগদ্-বিখ্যাত। ফোর্ড আমেরিকান, ইংলণ্ডে তাহার কারবার খুলিলেন; কিন্তু ইংরেজ জাতি একজোট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, তাঁহার একখানা মোটরও তাহারা কিনিবে না, কেননা ইহাতে ইংলণ্ডের টাকা আমেরিকায় চলিয়া যাইবে। ফোর্ডও চালাক; তিনি ইংলণ্ডেই মোটরের কারখানা খুলিলেন। ইংরেজ দেখিল, মজুরী, মালমসলার টাকাটা সে পায়, ইহাতে বিলাসিতা করিয়াও তাহার ঘরে কিছু থাকে, সুতরাং সে রাজী হইল। এমনি করিয়া তবে ফোর্ডের মোটর ইংলণ্ডে চলিল। এই নিষ্ঠা, এই মনোবেগটুকু আমাদের আছে? আগে অর্জ্জন করিব, তারপর ভোগ করিব, এমনি বীরের মত প্রতিজ্ঞা আমরা করিতে পারি? না ময়ূরের পেখম হইতে পালক ধার করিয়া নিজের পুচ্ছে গুঁজিয়া আহ্লাদে আটখানা হই?

ফকির

—শ্রাদ্ধ—

জীবনে দাগা পেয়েছি অনেক, তাই এ জগতের মধু বুঝি আর তেমন করে মাতিয়ে তোলে না। দিক্‌হারা পথিকের মত একটী একটী করে কত দৃশ্যই অতিক্রম করে চলেছি, কিন্তু কারও মায়ায় চরণ দুখানি কোথাও আর বাঁধা পড়ে না—অজানা কোন্ সুদূরের টান এসে বুকের মাঝে বেজে ওঠে, আর কোথাও তিষ্ঠাবার যো থাকে না। সে যেন বলে—"চল্, চল্—তোকে চল্‌তেই হবে! এ তো তোর জিরুবার জায়গা নয়! চল্, ওরে এগিয়ে চল্!"

অজানার ডাকে আবার চল্‌তে থাকি। জীবন-স্রোত জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে বয়েই চলেছে; কে জানে কোথায় নিয়ে কোন্ দিন কে এসে বল্‌বে—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত—এবার এখানেই তোর এদিককার পথ শেষ। হয়ত সেখানেই এবারকার চলার হিসাব হবে। তারপর তা নিয়ে জগতে যাদের সঙ্গে পথ চলেছি, তাদের মাঝে কত কথা হবে, আমি হয়ত তা শুন্‌তে আসব না।

কিন্তু আজ যাদের ঘিরে মন আমার নিয়ত কত সোণার স্বপন ভাঙ্গা-গড়ায় মত্ত হয়ে রয়েছে, তাদের কেউ কি আমার এই রুক্ষ জীবনের প্রাণ-পাতী আয়েসের একটু ভারও এসে খুশী মনে নিয়ে বলছে,—ওগো আর না—তোমার অমন আত্মোৎ-সর্গের প্রতিদানে এই নিয়ে এসেছি আমার মহাতৃপ্তি ও আনন্দ; আর তোমার অমন মলিন মুখে থাকতে দেব না?

কি করে বলে? ওরাও যে কেউ এখনও চির আনন্দের, সে মহাতৃপ্তির সন্ধান পায়নি। হয়ত বা আমারই সমস্ত শোষণ করে আপন রিক্ততা ঢেকে চলছে। তাই নিষ্ঠুর নিয়তির সুতীক্ষ্ণ পরিহাসে জগৎ থেকে পাই কেবল মর্ম্মপীড়া। যখন ব্যথাতুর প্রাণে সজল নয়নে চারপাশে তাকাই, তখন কোথায় করুণা—বুকফাটা হাহাকারের উষ্ণশ্বাসে মরু-ভূমিপ্রায় ধরণীতে কোথায় সে সান্ত্বনার ছায়া, সুশী-তল প্রস্রবণ! জগৎ একটা বিরাটাকার নিষ্ঠুর দৈত্যের মুখব্যাদান বলে মনে হয়। বিধাতার দান—মানব-হৃদয়ের দয়া, শান্তি, তৃপ্তি—প্রভৃতি অমূল্য ও কোমল বস্তুগুলি পৃথিবীতে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

নিয়ত কোলাহলমুখর এই জগতের বাইরের আবরণরূপে ওই যে সুনীল গগন, বুঝি তা মায়া বলেই সুনীল অর্থাৎ ওখানেও অন্ধকার। শুধু মন ভোলাতে ঐ নয়নলোভন মায়াজাল মেলা রয়েছে। যতই এর বাইরের আবরণ খসে পড়বে, ততই বুঝি তার অস্থি-পঞ্জর করাল আসল মূর্ত্তিটা বেরিয়ে পড়বে! কে বলে তবে জগৎ সুন্দর—মনোহর? বরং জগৎ একটা মহাপ্রতারক হিংস্র দানবের অলীক মায়া!

আজ মনে পড়ে শৈশবের কল্পনাময় সেই মধুর জগৎ। আপন মনে জগৎকে যেমন সাজিয়েছি, তেমনি সেজেছে, যেমন বলিয়েছি, তেমনি বলেছে! —যেমনটী চেয়েছি, ঠিক তেমনটী পেয়েছি।

আর এখন? ভাবি, কোন্‌টা সত্য?—সেই অম্লা-নিত রহস্য ভরা আমার সুন্দর জগৎ, না ঘরকন্নার স্বার্থ-ময় এই বাস্তবের রূঢ় জগৎ? আমার কিন্তু মনে হয়, সেই আমার মনভুলান মধুর ভাবময় জগৎই সুন্দর ও সত্য। আর তাতে যখন আমি তৃপ্তি পেয়েছি, শান্তি ও আনন্দ পেয়েছি, তখন তাই তো আমার শিব। সেই সত্যং শিবম্ সুন্দরম্ রূপে যিনি তখন আমার কাছে ধরা দিয়েছিলেন, তিনিই তো ছিলেন আমার যথার্থ দরদী। প্রবল স্নেহের তৃষ্ণায় আকুল হয়ে কেঁদে উঠতাম, মা হয়ে কোলে নিয়ে বসত যে সে-ই। আবার যখন চঞ্চল শিশুর মন নিয়ে সাথীর সাথে

খেলার জন্য ছুটে যেতাম, তখন সাথী সেজে খেলা দিতে আসত যে, প্রাণের টানে চিনতাম—সে যে আমার সেই মধুময়! এমনি নিত্য নূতনরূপে নব বেশে যে ধরা দিয়েছে, তাঁকে আজ কোন্ মোহে ভুলে গেলাম? আজ যে আমি তাঁরি জন্য ঘরের বা'র—পথের ফকির!

তোমরা হয়ত বলবে, ও তোমার কল্পনা; সুতরাং মিথ্যা। অমন পাগলামী না করে এস আমাদের এই দশের মাঝে। মেনে নিলাম, তোমরা খুব রসিক। কিন্তু কেউ কি এখানে চিরন্তন রসের, চির-মাধুর্য্যের সন্ধান পেয়েছ? কারও ছোঁয়াচে জীবনের সমস্ত শ্রান্তি, সমস্ত ক্লেদ ঘুচে গিয়ে চিরশান্তি পেয়েছ কি? যদি পেয়েই থাক, তবে খুঁজে দেখ, সে ও তোমার এই কল্পনা। নিত্যনূতন রসে যদি তুমি সঞ্জীবিত হয়ে থাক, তবে দেখবে, সে-ও তোমার এই কল্পনারই মহিমা। এই জড়জগৎ কোথায়ও তোমায় আনন্দ দিতে পারত কি, যদি এর পিছনে তোমার সুখানুভূতির কল্পনা না থাকত? তুমি বলবে—কল্পনা কিছু নয়, কারণ তাকে ধরতে-ছুঁতে পারি না; আমি চাই, বালকের মত যা পাব, তাকে চট্‌কিয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে। তোমার কল্পনায় তা কি করে হবে?—আমি চাই জ্যান্ত জীবজগৎ! বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম, শিশুর মত সকলরকমে তুমি স্বাদ পেতে চাও। কিন্তু তাও কি তোমার ঐ স্থূল ইন্দ্রিয় সাহায্যে তুমি পাবে? যে কোন বস্তুকে তুমি গ্রহণ কর, তার বারো আনাই অনুভব হয় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বা দিয়ে। আর সে মন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়েও এই জড় জগতের বস্তুর সঙ্গে মিশতে মিশতে এমনই সংস্কারাপন্ন হয়ে গিয়েছে যে, এখন সূক্ষ্মের চিন্তাতেও স্থূলেরই সাহায্য নিতে হয়। নিরাকারের ধারণা করতে গিয়ে স্থূল আকারেরই আভাস এসে পড়ে। স্থূলে সূক্ষ্মে এমনি জড়িয়ে এ জগৎ রচনা যে, কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা আসছে, তা বলা শক্ত। আর তাই বুঝি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগতের সৃষ্টি আরোহ না অবরোহ ক্রমে, তা নিয়ে মতদ্বৈধ। কিন্তু যেদিক দিয়েই দেখ না কেন, স্থূল কখনও সূক্ষ্ম ভাব বা কল্পনা ছাড়া তোমার অধিগম্য হয় না। কাজেই জগতে যা কিছু গ্রহণ করনা কেন, তা যখন তোমার কল্পনা বা ভাব নিয়েই, তখন সেই ভাবই কেন ক্রমশঃ শুদ্ধ হতে শুদ্ধ হোক্ না! প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি যে কোনও ভোগের বিষয়ে মন নিবিষ্ট না হলে সে বিষয়ে ভোগ সফল হয় না। তবে মনের সাহায্যেই যদি ভোগ করতে হয়, তবে যাতে চির আনন্দ, চির সুখ, এমন ভোগের কল্পনাই ভাল। সে হচ্ছে নিবৃত্তি-পথ।

সংসারে ভোগের আগুনের রোশনাই দেখে প্রবৃত্তিপথাভিমুখী মন আমাদের পতঙ্গের ন্যায় তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ফলে লাভ করে মৃত্যু। আজ পাশ্চাত্যের বীর্য্যোদ্ধত দানবীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মন আমাদের সংসারের এই নিত্য ভোগোপকরণ সংগ্রহে মত্ত। ঘরের কর্ত্তা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাদিন পরিশ্রম করেও পরিবারস্থ কারও মন জুগিয়ে উঠতে পারে না—কারও সুখের প্রতিদানে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কেন? এই পিশাচী তৃষ্ণার আগুন যে বেড়েই চলেছে। যতই পায়, ততই চায়—যেন সে তার ভোগের রূপে জগতের অবশিষ্ট আর সকলের চোখ্ ঝলসিয়ে দিবে। সবাই ঐ সমান চেষ্টা, সুতরাং আগুন ক্রমশঃ বাড়ছে বই কমছে না; মরতে মরতেও হাতের কাছের এই মহা-অমৃত—পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত অমরার ধন আমরা ছোঁব না। এমন করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কিসে আমরা সুখ পাব? এই মৃত-সঞ্জীবনী বা অমৃতের বাণী এনেছিল এই নিবৃত্তিমুখী ফকিরের জাত। আমরা সেই ফকিরের দেশে ফকিরের বংশধর হয়ে জন্মেছি। আমাদের শিক্ষা—ধনার্জ্জন কর, খুব কর, কিন্তু কেবল ভোগেই তা শেষ করো না। নিবৃত্তিমুখী মন নিয়ে সামান্য গ্রহণ করে অপরের

সেবায় তা নিয়োজিত কর। দশের সেবায় দেশের মাঝে তোমার নারায়ণ জাগ্রত কর। এ দেশেরই ক্ষত্রিয় রাজা মন্ত্রী করেন ব্রাহ্মণকে। এই দেশেরই শিক্ষা—ভাবই সত্য; ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ তুচ্ছ। আর সকল তুচ্ছ করেই, ফকীর হয়েই এ মহা বস্তু পেতে হয়, তাই আমি ফকীর।

আজ এই ফকীরের দৃষ্টি দিয়ে জগৎ দেখছি। দেখছি—সত্যই জগৎ সুন্দর, চির আনন্দময়। আমার জ্ঞানে সুখ-দুঃখ, আলোক-আঁধার, জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি-প্রলয় সমস্ত মিলে এক নিখিল চির আনন্দ—চির সুখ—চির অমৃতের উপাদান। জগতে মৃত্যু বলে কিছু তো নাই, সমস্তই যে এক চির, আনন্দের মহা আবর্ত্তন। এই আবর্ত্তনের ঘূর্ণী যে দেখে, সেই মনটাই ফকীর—আর যে মনটা সেই ঘূর্ণীতে পড়ে হাবুডুবু খায়, সেই সংসারী।

——:*:——

দিব্যোন্মাদ

—):*:(—

সত্যলাভের অদম্য পিপাসা যাদের ভিতর জেগেছে, সাময়িক তৃপ্তিতে তাদের মন কিছুতেই সোয়াস্তি পায় না, তাই দেখি, সত্যবস্তুর আকর্ষণে গোপীর মন এত উতলা। বাহিরের দিক থেকে দেখলে গোপী-হৃদয়ের যে আকুলতার স্পন্দন, তা হয়ত বুঝতে পারব না; কিন্তু ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে যদি অনুসন্ধান করি, তাহলে তাদের ইষ্ট-প্রীতি দেখে স্তব্ধ-মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারব না। সত্যকে আস্বাদন করতে গিয়ে মানুষ যে কেন অতৃপ্তির দহনেই কেবল জলতে থাকে, চৈতন্যচরিতামৃতকার তা বেশ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

> অতৃপ্ত হঞা করে সবে বিধাতা নিন্দন—
> "অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন!—
> কোটী নেত্র না দিলেক সবে দিল দুই;
> তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি?"

বিরাটের আস্বাদন করতে গিয়ে যে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ই হয় তার প্রতিবন্ধক, এরই দরুণ এত আক্ষেপ। তখন যাকে পেতে চাই, তার ওপরই হয় অভিমান—কেন সে তাকে পাওয়ার পথটী সুগম করে দিল না? এমনি করে পাওয়া যতই নিবিড় হয়ে আসে, অন্তরের ব্যাকুলতা যেন ততই বাড়তে থাকে। এ ব্যাকুলতার তো পরিসমাপ্তি নাই—তাই গোপী-হৃদয় নিয়ত বিরহানলেই সন্তপ্ত। কোন্ অনির্দ্দেশ্য মাধুর্য্যের আকর্ষণে তার চিত্ত বিহ্বল, তা সে নিজেই জানে না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইষ্টের অনুভূতি হচ্ছে—তন্ময়তা লেগেই আছে, তবু গোপী চঞ্চলা। কৈ আমার প্রেমাস্পদকে তো আমি পূর্ণরূপে পেলাম না! হা, বিধাতা! অসীমকে আস্বাদন করতে কেন সসীম ইন্দ্রিয় দিলে? তখন যা আছে তা যেন মনে হয়, অতি তুচ্ছ হেয়, নগণ্য; আরো চাই বলে প্রাণ-মন উতলা হয়ে উঠে।

খাঁটী-ভক্তের প্রাণে এরূপ দৈন্যের হাহাকার কিছুতেই মিটে না। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার দিক্‌টাই তার চোখে বেশী করে ভাসে। অসীমের আকর্ষণে তার মন-প্রাণও অসীম হয়ে যায়। তাই তার দেহ ভুল হয়ে যায়, একটা করতে গিয়ে আর একটা করে বসে। এমনি করে সে কেবল ভাবের আবেশেই বিভোর হতে থাকে। আর দুঃখ

হয়, অভিমান আসে তাদের উপর, বিরাটের অনুভূতির পথে যারা প্রতিবন্ধক। স্থূল দেহের প্রতি প্রতি একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্যের ভাব আসে। ভক্ত যখন দেহ-মন-প্রাণের ঊর্দ্ধে তুরীয় লোকে উঠে যায়—তখনই যেন তার প্রাণে শান্তি আসে। আবার যখন নেমে আসে, তখনই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—সেই অশান্ত-হৃদয়ের নিদারুণ হাহাকার আবার শুনতে পাই। বহির্দৃষ্টিতে গোপী যেন জড়, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তার যে বিরহের জাগরণ, তার তো বিরাম নাই। প্রতি পলে পলে অন্তরের আকুলতার স্পন্দনে যেন হৃদয় সচকিত। মুখ ফুটে সে কিছুই বলছে না বটে, কিন্তু তার বুকের অস্ফুট ক্রন্দন এসে প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রীতেই আঘাত করছে। কেননা একদিকে যেমন দিশেহারা মন কেবল বাহিরে বাহিরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে—তেমনি আর একদিকে ইষ্টানুরক্ত মন তার প্রেমাস্পদকেই কেবল খুজে বেড়াচ্ছে। আমরা বলি, মন কেবল বাহিরেই ছুটাছুটি করতে ভালবাসে; কিন্তু একবার যদি তলিয়ে দেখি, সত্যি যদি মন প্রেমাস্পদের অনুসন্ধান পায়—তা হলে সে যে কাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখনই তা বেশ বোঝা যায়।

সত্যের পথে যারাই গিয়েছেন, তাঁদের ভিতর এমনি করেই একদিন অতৃপ্তির আগুণ জ্বলেছিল। আর প্রাণে পরিপূর্ণ শান্তি না আসা পর্য্যন্ত ভিতরের আগুণ এমনি দাউ দাউ করেই জ্বলেছে। দেহাতীতকে পেতে হলে দেহ যে কত বড় বাধা, তা আর বলবার নয়। স্থূল দেহের সংস্কারকে একেবারে ভুলে যেতে হলে যে কত বড় সাধনার প্রয়োজন—এ যাদের ভিতর ভূমানন্দের বাসনা না জেগেছে, তারা কিছুতেই বুঝতে পার্ব্বে না। বার বার দেহের সংস্কার ফিরে আসে বলেই, দেহাতীতকে এমন করে মনের দুঃখে ভক্ত অনুযোগ দেয়। আর এ-তো স্বাভাবিক, একবার যারা কোন মতে দেহাতীতের সন্ধান পেয়েছে—যে পাখী একবার পাখা মেলে উড়তে পেয়েছে—তার পক্ষে যে পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে থাকা যে নিদারুণ কষ্টের! তাই ভক্ত-হৃদয়ের আকুলতা থেকে থেকে গুমরে ওঠে। অন্তরে যে কি জ্বালা—পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বেই চিত্ত সর্ব্বদা আন্দোলিত। যখন ভিতরে পাই তখন বাহিরে পাই না, আবার যখন বাহিরে পাই তখন ভিতরে পাই না। এমনি করে পাওয়ার শেষ নাই—আকুলতার পরিসমাপ্তি নাই। এই আকুলতাই একদিন শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদে পরিণত হয়। তখন ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে অনুভূতি জাগে—আবার ক্ষণে ক্ষণেই হা হুতাশা আসে। এমনি করে গণ্ডীবদ্ধ মন তো আর তাকে পেয়ে শেষ করতে পারে না—তাই নিতি নিতি বিরহ মিলনের অপূর্ব্ব হাসি কান্না চলতেই থাকে।

দেহকে লাঞ্ছনা দিতে ইচ্ছা কি হয় সাধে?—এই দেহই তো মিলনের পক্ষে বড় বাধা। নিজের প্রতি তখন অবহেলা না এসে পারে না। কোন কোন ভক্ত প্রাণের জ্বালায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে যায়—কেন? না এই দেহ থেকে তো আস্বাদন চলে না—দেহের স্মৃতিই যে মনকে পীড়ন করে। এই একটুখানি আভাসে পাওয়া, নিমিষের তরে রূপ দর্শন—এতে আরও বেশী করে আকুলতা জাগে—মনে হয় বিধাতা যদি চোখ দিলেনই, তবে কেন কোটী কোটী চোখ দিলেন না?

বিষয়ের আকর্ষণের চেয়ে তাঁর আকর্ষণই বড়; তা না হলে কি এমন করে পতি পুত্র সব বিসর্জ্জন দিয়ে গোপী এমন আত্ম-ভোলা হতে পারে? পুত্রের চেয়ে, বিত্তের চেয়ে যে মানুষ নিজের আত্মাকেই ভালবাসে, এখানেই তার প্রমাণ। একবার যখন তার আকর্ষণের সাড়া পাই—তখন কোথায় থাকে বিষয় আর আশয়—দৈনন্দিনের তুচ্ছ ঘটনার স্মৃতি—সব ফেলে দিয়ে তখন আত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাই। উপনিষদে যে আছে—আত্মা পুত্রের

চেয়ে. বিত্তের চেয়ে সবের চেয়েই বড়, এর প্রমাণ তো আত্মপুরুষানুরাগিণী গোপী রমণীরাই। তাঁরা ইষ্টের দরুণ কি না ত্যাগ কর্‌তে পেরেছেন? গোপীহৃদয়ের আকুলতা প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে এমনি করে জাগে; তখন তারা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ভুলে গিয়েই এমনি করেই আত্মানন্দ-রসে বিভোর হয়। তখন বুঝি, জাগতিক নিয়মের ওপরও কেন ব্যতিক্রমের অসাধারণ প্রভাব। মানুষ সবই করে, সবই দেখে, সবকেই ভালবাসে—কিন্তু একবার যখন মন অন্তর্মুখী হয়ে তাঁর আস্বাদন পায়, তখন সব একেবারে ওলট্-পালট্। ভক্ত তখনই বুঝে বিষয়ের আকর্ষণ বড়—না তাঁর আকর্ষণ বড়!

এত চঞ্চলতা, কিন্তু অবসাদ তো আসে না। ভক্ত একদিকে নিরাশায় চঞ্চল, আবার আশারূপে যে তিনিই আর দিকে বল দিচ্ছেন ভক্তের প্রাণে। দিবা-রাত্র জলুনীর ভিতর দিয়েও এক শান্ত স্নিগ্ধ অপরূপ রসের আস্বাদন হয়। তা না হলে ভক্ত বেঁচে থাকে কেমন করে? আর জ্বালা নাই বা হবে কেন—নিজকে না বুঝে না পেয়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে? ক্ষণিক মত্ততায় তো ভূমানন্দের কথা মানুষ একেবারে ভুলতে পারে না, তাই ভূমার আকর্ষণে এই জগৎকেও বিসর্জ্জন কর্‌তে ভক্তপ্রাণে এতটুকুও দ্বিধা জাগে না। পাওয়ার বস্তুকে পেতে যখন অমন্ আন্তরিক ইচ্ছা হয়,—তখন বাহিরে ভিতরে উন্মাদের মত এমনি করেই ভক্ত ইষ্টকে খুঁজে বেড়ায়।

"যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"—এই হচ্ছে হৃদয়ের শেষ পরিণতি—বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও এটাই গভীর তত্ত্ব। কিন্তু আমরা এই অনন্তের উপলব্ধি পাই যাকে ভালবাসি তারই ভিতর। যাকে ভালবাসি, তার মাঝে অনন্তকে অনুভব করার নামই খাঁটী ভালবাসা। নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে না পার্‌লে তো জীবনে এরূপ ভালবাসার আস্বাদন পাওয়া যায় না। আমি যাকে চাই—সে যদি বিরাট হয়, ভূমা হয়—তাহলে অনন্ত অভিব্যক্তির শাশ্বত অসম্পূর্ণতা তো আমার মাঝে বিরাজ কর্‌বেই। অনন্ত তো তিনিই, আমি যার অবধি পেলেম না!

আরণ্যক

——):*:(——

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা ৩।৩।২

আমি আছি বলে আমার সব আছে—সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, ঘর-বাড়ী এই সব। এই আমিত্বের বোঝা বয়ে বয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত, মুহূর্ত্তের অবসর নাই। আমি না থাকলে কিন্তু আমারও কিছু নাই। ফেলে দাও ঘাড়ের বোঝা—যদি শান্তি চাও, বিশ্রাম চাও। যে তোমাকে সৃষ্টি করেছে, এই বোঝাটা তাকে দিয়ে ভাব দেখি—তোমার কি থাকল, তুমি নামরূপের অতীত শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র, সত্যস্বরূপ কি না? অসংখ্য বুদ্বুদের মত কত কিছু তোমাতে ভাস্‌ছে আবার তোমাতেই লয় হচ্ছে। তুমি সাক্ষী-শ্চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—চিরমুক্ত সদানন্দ?

* *
*

উপাসনায় হঠাৎ বাইরের সুখদুঃখের আঘাতকে

ঠেকিয়ে না রাখলেও অন্তরকে বলীয়ান করে - আঘাতকে সইবার মত শক্তি দান করে। এ উপাসনা বল্‌তে তাঁর সমীপবর্ত্তী হওয়া—এখন সে যেদিক দিয়েই হোক্; বিশ্বময় তাঁকে অনুভব করে সমস্ত সুখদুঃখময় জগৎকে আপনার মাঝে আস্তৃত দেখেই হোক্ বা সমস্ত প্রাণের দৈন্যরাশি ঢেলে তাঁকে ভবভয়হারীরূপে ডেকেই হোক্।

* *
*

এই দেহের শিরায় শিরায় অমৃতের স্রোত বয়ে যেতে পারে, কিন্তু সাধনা ভিন্ন তার ধারণা হয় না। হয়তো সাধনায় হৃদয় প্রথমে কঠোর, শুষ্ক, শূন্য বোধ হতে পারে। কথায় বলে, "যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ—তবু যে না ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস।" সর্ব্বংসহা তেজ চাই। ভক্ত বৈষ্ণব মুখে বলেন—আমি দাসানুদাস, কিন্তু আত্মদমনের মহোজসে অন্তরে অন্তরে তিনি মহাপ্রভু! ভক্তিতে শুধু চিত্ত কোমলই হয় না—প্রাপ্তির প্রতি প্রবল আকর্ষণের অনুভূতিতে অন্য সব ভোগে আবার তার তেমনি বজ্রদৃঢ় ত্যাগশক্তি জাগে। কঠোরে কোমলে সামঞ্জস্যই সাধক জীবনের সত্য

* *
*

জীবনে রসবস্তুর সন্ধান পেতে হলে সাধনা চাই—এ একেবারে খাঁটী কথা। ইন্দ্রিয়-তর্পণও করব, আবার উপরের আলোও পাব, এটা শুধু বেশী বেশী আবদার ছাড়া কিছুই নয়। অনেকে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ভোগ-যোগ মিশিয়ে হরিবোল বলতে চান। কিন্তু আসলে সেই মহাপ্রভুর যে কতখানি কঠোর জীবন, তা ভুলে যান। আমরা দুর্ব্বল বলেই কৃপা ভিখারী তপোভীরু পরনির্ভরশীল। একনিষ্ঠ সবল প্রাণ কখনো কুড়িয়ে পাওয়া সত্য চায় না। সর্ব্বস্ব ছেড়ে না দিলে তাঁর সে আনন্দ পাওয়া যায় না। আর সে আনন্দের ঈষৎ আভাসেও যে দেহ-মন আপ্লুত হয়ে যায়—কোথায় লাগে তখন ইন্দ্রিয় ভোগ!

* *
*

পাঁচ জনকে নিয়ে যারা আছি, তাদের হয়ত এমন হয়—একটা উত্তাল আনন্দ-কলরোলে মাঝে মাঝে এক একটা দিন কেটে যায়; হয়ত বা স্তব্ধ সংযত আনন্দ নয়—পাগল সে আনন্দ। তবুও ভাল, যদি আমরা কর্ম্মের নামে ভয় না পাই। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নালিশ করতে আরম্ভ করলেই বুঝতে হবে, প্রাণশক্তির দৈন্য ঘটেছে। সবি সয়ে নিতে হবে,—প্রাণপুঞ্জ অফুরন্ত হোক্—এই তো আনন্দের লক্ষণ।

* *
*

ভাবই প্রাণ। বস্তুতন্ত্রের দিক দিয়ে দেখলে ত্যাগ একটা অসম্ভব ব্যাপার। কোথাও সোয়াস্তির আশা না পেলে মন কাম্য বস্তু ছাড়তে পারে না। সে জন্য চাই সেদিকে একান্ত টান। সে টান জন্মে মনকে অহরহ ভাবানুভবে নিভৃত ব্যাপৃত রাখলে। শয়নে-স্বপনে বা বিরল অবসরে আপনি এসে যার কথা মনে উদয় হবে, সেই হচ্ছে প্রাণের মানুষ। তখন যদি শুধু এ জগতের ভোগের কথাটাই বেশী করে জাগে, তবে প্রয়াণকালেও ওই ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই যেতে হবে। অথচ এ জীবনেও হয়ত কত আকারে সে ভোগোপকরণ এসে জুটেছে, কিন্তু ভাবগত আত্মচেতনার উদ্বোধন না থাকাতে সে তৃপ্তির অনুভূতি স্থায়ী হয় নি। তাই আগে চাই সর্ব্বদা ইষ্ট বিষয়ের আলাপ-আলোচনা, স্মরণ-মনন, নিদিধ্যাসন, তারপর চাই প্রাপ্তি। এ যেমন ভোগের বিষয়ে, তেমনি যোগের অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে। ভগবান্ বলেন—মন্মনা মামুপাশ্রিতঃ হলে তবেই তাঁকে পাব; জাগতিক বিষয় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তবে ইন্দ্রিয়ের বহিঃবৃত্তিতে স্থূল বিষয়ে টান স্বাভাবিক, আর সেই টানকে ভাগবত

আকর্ষণে পরিণত করতে হলে ঊর্দ্ধমুখী মনন চাই, আর চাই সর্ব্বস্ব ত্যাগ। গাছ তলার ফকির হলেও অন্তরের সে ত্যাগ ভিন্ন ইষ্ট সিদ্ধি হয় না।

* *
*

যে মুহূর্ত্তে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে, তখন থেকে সকলের সেই বিশিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করে তুমিও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে যাও। তোমার দোষ-গুণের অংশ তারাও নেয়। এমন ভাবে অযাচিতে আপনাকে বিস্তার করার সুযোগকে কেবল ঈর্ষ্যা দ্বারা আরও দুষ্ট করে তুলো না। আপনার মনের প্রশান্ত সমাধান দিয়ে তাদের প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন মনকে জয় কর; সমষ্টি মন হতে ক্রমশঃ বিরুদ্ধভাব আপনি মিলিয়ে যাবে। অসত্যানুষ্ঠানও যদি করে থাক, তবে বর্ত্তমানের এই মহান্ সত্যকে আশ্রয় কর, আপনাকে ভাল-মন্দের অতীতে নিয়ে যাও—দেখবে, নির্ম্মম বজ্রও সে হৃদয়স্পর্শে পুষ্পহারে পরিণত হবে।

* *
*

সর্ব্বদা একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার বেগ ধারণ করা চাই। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে ফলিয়ে তুলতে গিয়ে হয়ত সব সময়ে পূর্ণকাম নাও হতে পার—সময় বা সুযোগ মত হয়ত দেশ-কাল-পাত্র তেমন জুটছে না, উপকরণ মিলছে না; কিন্তু ইচ্ছা যদি খাঁটী হয়, তবে সাধ্য কি যে সে ইচ্ছার টানে সিদ্ধি না এসে পারবে! কর্ম্মযোগী বীর সত্য-সাধকের যে কোন ইচ্ছাই যে সত্যসংকল্প। যদি তাকে দিয়ে তা সিদ্ধ না হবে, তবে তার মনে তা আসবেই কেন? যা মনে জেগেছে, তা হতে বাধ্য, এই প্রচণ্ড বিশ্বাস চাই বুকে।

* *
*

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহান্ আত্মা আমার দেহ মনের পিছনে রয়েছেন। তাঁর যে শক্তি বা মহিমার কতটুকু পরিচয় আর এ জীবনটুকুর মাঝে পেয়েছি, যে আমার মাঝে এ শক্তি নাই—আমা দ্বারা এ কাজ হবে না বলে তাঁকে অবিশ্বাস করব? এই জীবনেই সব হতে পারে। যদি বল, এটা আমগাছ—এ থেকে আমই ফল্‌বে, কাঁটাল নয়। আমি বলি, আমি মানুষ—কোনও বিশিষ্ট নাম-রূপের বাঁধনে তিলেকের তরেও বাঁধা নই! কে জানে আমা দ্বারা জগতের কি হবে না হবে! কে আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের তালিকা পেয়ে বিধাতার সৃষ্টি-রহস্য জেনে ফেলেছে, যার উড়ো-মন্তব্য দিয়ে আমাকে আমি বিচার করব!

* *
*

মরে যাও ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার চিহ্ন জগতে রেখে যেতেই হবে, এই হল বিধাতার সৃষ্টি রক্ষার নিয়ম। তাই বংশরক্ষায় জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু দেহজাত সৃষ্টিই গৌরবের নয়, তাই জগৎভরা মহামনীষীদের প্রতিভার দানকে আমরা অক্ষয় অমর বলি। কারণ সেই সম্পদ দিয়ে পরবর্ত্তী বহু জীবনের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে চাই এমনি অপরের মাঝে বেঁচে থাকা। জগৎকে দান না করলে সে বাঁচা সম্ভব হয় না। এ দান ক্রমশঃ দেহের দান, মনের দান, আত্মার দানরূপে জগতের বুকে দৃঢ়-তররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই চাই দেহে মনে প্রাণে প্রতি নিঃশ্বাসে আপনাকে অপরের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া—তবেই বিধাতার সফল দান, সফল সৃষ্টি!

* *
*

বিশ্বাসঘাতক কে?—যে আত্মপ্রতারক। অপ-রকে প্রবঞ্চনা করে তার কাছে মুক্ত থাকা যেতে পারে—কিন্তু আত্ম-অবিশ্বাসী যে নিজের বাঁধন নিজেই আঁকড়ে বসে আছে!

* *
*

অভিব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনা আছে বলেই আমার ভিতর অসীম ব্যাকুলতা। মানুষের মনই মানুষকে

ছাড়িয়ে চলে, অনেক সময় তারই নাগাল পাওয়া ভার; তার ওপর যিনি মন-বুদ্ধির অতীত, তাঁকে পাওয়া তো আরও দুরূহ। নিঃশেষে আমাকে আমি না জানা পর্য্যন্ত তো এ আকুলতা আমার চিরসঙ্গী থাক্‌বেই। মন-বুদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছেও দেখি—পূর্ব্বম্ অর্ষৎ; আত্মা সবকে অতিক্রম করে বসে আছেন। জানার অনন্ত পথ—অনন্ত সুযোগ; তাই পাওয়ার আকুলতাও আমার মাঝে কত বিচিত্র। সুখ-দুঃখ-বেদনায় এক এক অবস্থাতে এক এক রকম অনুভূতি হচ্ছে। সবের ভিতর দিয়েই তো তিনিই ধরা দিচ্ছেন।

* *
*

"আমার সব হয়ে গেছে"—আধ্যাত্মিক জগতে এর চেয়ে বড় ভণ্ডামী আর কিছুই নাই। প্রবঞ্চনাময় ব্যর্থ-জীবন তাদেরই, পাওয়ার চেয়ে পাওয়ার অভিমানেই যারা অভিনয় কর্‌তে পটু। সত্য বিদ্যুতের মত ক্ষণিক চমক দিয়ে যায় অনেকের মাঝেই, কিন্তু এতেই যারা তৃপ্ত—সত্যকে কি তারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছে?

* *
*

সত্যদ্রষ্টার হৃদয় সাগরবৎ নিরবধি—তিনি মহাসাগরকেও জানেন, নদীকেও জানেন। তাই অনুবর্ত্তীর সাময়িক সফলতা-বিফলতায় অটল থাকিয়া নীরব আত্মদানে তাহার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ ও অনুপম প্রেমে আত্মাভিমুখী প্রেরণা জাগাইয়া লক্ষ্যপথ সুগম সাধনে সতত রত।

সংবাদ ও মন্তব্য

আমাদের কথা

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ বর্ত্তমানে "কলিকাতা—৮২ ল্যান্স্‌-ডাউন রোড্, পোঃ ভবানীপুর"—এই ঠিকানায় আছেন। বগুড়া-সম্মিলনীতে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বোধহয় বেশীদিনের দরুণ আর কোথাও যাওয়া হইবে না।

নানা অনিবার্য্য কারণে প্রত্যেক মাসেই পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও এরূপ ঘটে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য ধৈর্য্যশীল সহৃদয় গ্রাহকগণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তপোবন

পোঃ ধারচুলা—আলমোড়া (হিমালয়)

উক্ত আশ্রম তিব্বত সীমানায় শ্রীকৈলাস ও মানসের পথে অবস্থিত। ১৯২৪ সাল হইতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া হিমালয়-বাসী ভুটিয়া, তিব্বতী, নেপালী ও পাহাড়ী এবং কৈলাসযাত্রীদের সেবার্থে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ হইতেছে। এযাবৎ ১৯২৮ সনের শেষ পর্য্যন্ত রোগীর সংখ্যা ৪৫৮০।

আলমোড়া হইতে তিব্বত সীমানা পর্য্যন্ত প্রায় ২৫০।৩০০ মাইলের মধ্যে কোনও চিকিৎসালয় নাই। সেই জন্য এই আশ্রমের বিশেষ উপযোগিতা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। উপস্থিত দরিদ্রনারায়ণগণের ও কৈলাস-যাত্রীদের সেবার্থে একটী Indoor-Hospital ও Rest-House এর বিশেষ আবশ্যক। বহুদূর হইতে চিকিৎসার্থ রোগীগণ আসিয়া স্থানাভাব বশতঃ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। উক্ত কার্য্যের জন্য ১০ হাজার টাকার আবশ্যক। যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতিরক্ষার্থে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াসী হন, তবে ৩৫০৲ টাকার একখানি পাকা পাথরের ঘর তৈয়ার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

যিনি যাহা দান করিবেন, উপরোক্ত ঠিকানায় স্বামী অনুভবানন্দ মঠাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

ভক্তসম্মিলনী

--※--
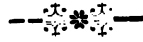
পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—উত্তর-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম, বগুড়া, চেলোপাড়া।

দিন—১১ই হইতে ১৩ই পৌষ, ১৩৩৬; ইং ২৬।২৭।২৮ ডিসেম্বর ১৯২৯।

ট্রেণের সময় নির্দ্দেশ

বগুড়া আসিবার থ্রু ট্রেণ এই দুইখানি মাত্র—আমিনগাওঁ সান্তাহার থ্রু পেসেঞ্জার প্রাতে ৮-৫৫ মিনিটে আমিনগাওঁ ছাড়িয়া রাত্রি ২টা ২৩ মিনিটে বগুড়া পৌঁছায়। আর রাজা-ভাতখাওয়া হইতে একখানি ট্রেণ প্রাতে ৯-১০ ছাড়িয়া কুচবেহার—লালমণির-হাট হইয়া সন্ধ্যা ৮-২৩ মিনিটে বগুড়া পৌঁছায়। ইহা ছাড়া অন্য ট্রেণে আসিলে যাত্রীদের সান্তাহার, কাউনিয়া অথবা বোনার-পাড়া—এই তিনটী জংশনে গাড়ী বদল করিতে হয়।

আপার আসাম অঞ্চলের ভক্তগণ আসাম মেলে আসিলে রাত্রি ৩-৫২ মিনিটে কাউনিয়া পৌঁছিয়া ৪-৫২ মিনিটে বগুড়া-গামী গাড়ী পাইবেন।

উত্তর বাঙ্গালা অঞ্চলের ভক্তগণ ডাউন নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস্ বা দার্জ্জিলিং মেলে আসিলে যথাক্রমে রাত্রি ১০-৫৭ ও ১-৩১ মিনিটে সান্তাহার পৌঁছিবেন। বিকাল ৪-২৬ মিনিটে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস এবং সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটে দার্জ্জিলিং মেল শিলিগুড়ি ছাড়ে।

মধ্য বাঙ্গালার ভক্তগণ (১) ঢাকা বাহাদুরা-বাদ এক্স্‌টেন্‌সন্ লাইনে নারায়ণগঞ্জ কাটি-হার মিক্‌সডে রাত্রি ১১-৫৮ মিনিটে ঢাকায় চাপিলে পরদিন অপরাহ্ণ ২-৫৫ মিনিটে বোনারপাড়া পৌঁছিবেন। (২) আর নারা-য়ণগঞ্জ-আমিনগাওঁ মিক্‌সডে প্রাত ৮-১৩ মিনিটে ঢাকায় চাপিলে রাত্রি ২-১৬ মিনিটে বোনারপাড়া পৌঁছিয়া প্রাতঃ ৭-৪৮ মিনিটে বগুড়া যাইবার গাড়ী পাইবেন। (৩) জগন্নাথগঞ্জ সিরাজগঞ্জঘাট হইয়া আসিতে হইলে সিরাজগঞ্জঘাটে রাত্রি ১০-৩২ মিনিটে উঠিলে রাত্রি ১-২৬ মিনিটে ঈশ্বরদী পৌঁছিয়া ২-২৩ মিনিটে আপ নর্থ বেঙ্গল এক্‌সপ্রেসে চাপিয়া ৩-৫০ মিনিটে সান্তাহার নামিতে পারিবেন। (৪) নারায়ণগঞ্জ-গোয়ালন্দ পথে ঢাকা মেলে উঠিলে রাত্রি ১-২০ মিনিটে পোড়াদহ পৌঁছিয়া ১-৩২ মিনিটে আপ নর্থ বেঙ্গল এক্‌সপ্রেসে সান্তাহার আসিতে পারি-বেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালার ভক্তগণ (১) লাক্‌সাম-চাঁদ-পুর-গোয়ালন্দ পথে চাটগাঁ মেলে অপরাহ্ণ ৪টার সময় পোড়াদহ জংশনে পৌঁছিয়া ৪-২০ মিনিটের সময়ে সান্তাহার পেসেঞ্জারে উঠিলে

সন্ধ্যা ৭-৪৪ মিনিটে সান্তাহার পাইবেন। (২) যাঁহারা এ, বি, রেলের অন্যান্য স্থান হইতে ময়মনসিংহ অথবা টাঙ্গী জংশনে ই, বি, আর এর ঢাকা বাহাদুরাবাদ একস্‌-টেন্‌সন লাইনে উঠিবেন, তাঁহাদের তিস্তা-মুখ বোনারপাড়া হইয়া কাটীহার মিক্সড অথবা আমিনগাঁও মিক্সডে আসাই সুবিধাজনক।

পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গলার ভক্তগণের আসাম মেল, দার্জ্জিলিং মেল অথবা নর্থ বেঙ্গল এক্‌সপ্রেসে আসাই সুবিধা। ঐ তিনটী ট্রেণ যথাক্রমে বেলা ১টা, সন্ধ্যা ৮টা ও সন্ধ্যা ৯টায় শিয়ালদহ ছাড়িয়া অপরাহ্ন ৫-৫৫ রাত্রি ১২-২৩ এবং ভোর ৩-৫০ মিঃ সান্তাহার পৌঁছায়। যে সমস্ত ষ্টেশনে উক্ত ট্রেণ তিনখানি থামে না, সেই সব ষ্টেশনের যাত্রীগণের পক্ষে পার্ব্বতীপুর পেসে-ঞ্জার ও সান্তাহার পেসেঞ্জারে আসাই সুবিধা-জনক। পার্ব্বতীপুর পেসেঞ্জার দিনে ১০-৫৫ এবং সান্তাহার পেসেঞ্জার অপরাহ্ন ৩-১০ মিনিটে শিয়ালদহ ছাড়িয়া যথাক্রমে সন্ধ্যা ৭-৪৪ ও রাত্রি ১২৬ মিনিটে সান্তাহার পৌঁছায়।

সান্তাহার জংশন হইতে বগুড়াগামী ট্রেণ সমূহের সময় নিরূপণ:—

সান্তাহার ছাড়িবে	বগুড়া পৌঁছিবে
১। রাত্রি ১-১৮	রাত্রি ২-৩০
২। প্রাতঃ ৬-০	প্রাতঃ ৭-১২
৩। দিবা ১১-৩৭	দিবা ১২-৫০
৪। দিবা ৩-২০	দিবা ৪-৩৬
৫। সন্ধ্যা ৭-১২	সন্ধ্যা ৮-২৮

কাউনিয়া জংশন হইতে বোনারপাড়া হইয়া বগুড়া:—

কাউনিয়া	বোনারপাড়া	বগুড়া
১। ভোর ৪-৪২	প্রাতঃ ৭-৪৮	প্রাতঃ ৯-৪
২। অপঃ ৪-৭	সন্ধ্যা ৭-৫	সন্ধ্যা ৮-২৩
৩। রাত্রি ১০-১৫	রাত্রি ১-৫	রাত্রি ২-২৩
৪।	অপঃ ৩-১৫	অপঃ ৪-৩৩
৫।	রাঃ ১০-১৬	রাঃ ১১-২৯

বগুড়া হইতে তৃতীয় শ্রেণীর আনুমানিক ভাড়া:—

(১)	ঢাকা ভায়া তিস্তামুখ	৩/১০
(২)	কুমিল্লা ভায়া চাঁদপুর গোয়ালন্দ	৬/৫
(৩)	চট্টগ্রাম ঐ ঐ	৭।৶৫
(৪)	আমিনগাঁও ভায়া কাউনিয়া	৪৶৫
(৫)	তিনসুকিয়া ঐ	১১।/০
(৬)	শিয়ালদহ	৩।৶০
(৭)	শিলিগুড়ি	২৸১০
(৮)	কুচবিহার	২/০
(৯)	ঢাকা ভায়া নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ	৬॥/০

ভক্তগণ সকলেই প্রয়োজনানুরূপ শীত বস্ত্র ও লেপ বিছানাদি সঙ্গে আনিবেন। ষ্টেশনে আশ্রমসেবক উপস্থিত থাকিবে। ষ্টেশনে সব সময় কুলি পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে আশ্রম প্রায় অর্দ্ধ মাইল। ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে হাজির থাকে। সকলকেই প্রায় ২০০ গজ পথ পদ-ব্রজে আসিতেই হইবে, কারণ যান-বাহন চলার উপযুক্ত পথ নাই। আশ্বিন মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রতি পুন-রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন।

বিশেষ কিছু জানিবার থাকিলে পত্র ব্যবহারে জানিয়া লইবেন।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী
অধ্যক্ষ উত্তর-বাঙ্গলা সারস্বত-আশ্রম
বগুড়া

——):*:(——

বন্যার্ত-সাহায্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জগৎসী মধ্য-ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও সম্পাদক ৬৲
বড়গোদা সারস্বত-সংঘ সংগৃহীত ৩৵৹
শ্রীযুত ভীমাচরণ ও অন্নদাচরণ মাইতি বরগোদা ২৲
শ্রীযুত কুমুদিনীকান্ত সাহা, ফরিদপুর ১৲
ঐ সংগৃহীত ২৵৹
শ্রীযুত "ক" ১৲
শ্রীযুতা শঙ্করী দেবী, ফরিদপুর ২৲
শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সরকার, বগুড়া ১৲
শ্রীযুত জ্ঞানদানন্দ ভাদুড়ী মুর্শিদাবাদ ১৲
শ্রীযুত বিশ্বনাথ প্রামাণিক মেদিনীপুর ২৲
শ্রীযুত বনমালী কাঙ্গাল " ২৲
শ্রীযুত মহেশ্বর বেরা " ১৲
শ্রীযুত উদ্ধব মান্না " ১৲
শ্রীযুত লালমোহন ঘোষ " ১৲
শ্রীযুত শশিভূষণ প্রামাণিক, মেদিনীপুর ১৲
শ্রীযুত শ্রীমন্ত প্রধান " ।০
শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র প্রামাণিক " ৹
শ্রীযুত কুমুদ প্রামাণিক " ।০
শ্রীযুত গুণাকর গিরি " ।০
শ্রীযুত গগনচন্দ্র মাইতি " ।০
শ্রীযুত সীতারাম মান্না " ।০
শ্রীযুত শশিভূষণ প্রামাণিক " ।০
শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ সাহু, মেদিনীপুর ।০
শ্রীযুত কুঞ্জলাল সাহা, ফরিদপুর ॥০
শ্রীযুত ভুবনমোহন গোপ " ॥০
শ্রীযুত বরদাকান্ত সাহা " ।০
শ্রীযুত সীতানাথ সাহা কুঠিয়াল ফরিদপুর ।০
শ্রীযুত রামমোহন রায় " ।০
শ্রীযুত মনহর বৈরাগী " ।০
শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ পট্ট " ।০
শ্রীযুত রাজেশ্বর বণিক, ফরিদপুর ।০
শ্রীযুত রাজমোহন বণিক " ।০
শ্রীযুত ইমামদ্দি মীর " ।০
শ্রীযুত অক্ষয়কুমার রায় " ।০
শ্রীযুত অমিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ফরিদপুর ।০
শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ সাহা " ।০
শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সাহা " ।০
অজ্ঞাতনামা ২৲

মোট ৩৫।০

পূর্ব্বজমা ৩১৮॥৶১০

সর্ব্বমোট ৩৫৩৸৶১০

ব্যয়ের বিবরণ—

প্রেসিডেণ্ট, শিলচর রিলিফ-কমিটী
মায় মঃ কমিশন ৪ দফায় ২০২৲
প্রেসিডেণ্ট, শ্রীহট্ট রিলিফ-কমিটি
মায় মঃ কমিশন ২ দফা ৫০॥০
প্রেসিডেণ্ট, নওগাঁ রিলিফ কমিটি
মায় মঃ কমিশন ১০৵০
সেক্রেটারী মেদিনীপুর রিলিফ-কমিটি
খড়কুশমা-শাখা—নগদ ৩১৲
" চাউল ২।০ বাবত ১২॥০
শিলচর রিলিফ্ ফণ্ড—
শ্রীযুত ব্রজহরি ওয়োদ্দেদার মহাশয়ের প্রেরিত
কাপড় পাঠাইবার খরচ ১॥৵০
প্রেসিডেণ্ট —ত্রিপুরা-কংগ্রেস রিলিফ্-কমিটী
মায় মঃ কমিশন ২৫।০
ভিক্ষা সংগ্রহার্থে সেবকগণের যাতায়াত খরচাদি ২।৵৫

মোট ৩৩৫।৵৫

মজুত তহবিল ১৮॥/৫

৩৫৩৸৶১০

মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে সর্ব্বসাধারণপক্ষ হইতে

দানপ্রাপ্তি*

— * —

(১৩৩৪ হইতে ১৩৩৫ সন)

মাসিক চাঁদা হিসাবে—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার জমিদার নারায়ণডহর ময়মনসিংহ ৮০৲ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ঘোষ—এসিষ্ট্যাণ্ট্ ম্যানেজার ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ড ষ্টেট্ ৬৲ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসগুপ্ত ডাক্তার জয়দেবপুর ৫।০ শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরী দেবী জয়দেবপুর ১১৲।

মতিহারী—(বিহার)

মিঃ ডব্লিউ এইচ মেরিক্ ম্যানেজার অব মধুবন ১০৲ মিঃ জে ঈ পিয়ারম্যান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পোলিশ ৫৲ মিঃ জে জেড হজ্ পাদ্রী ২৲ শ্রীযুক্ত টি সি গুহ সিভিল সার্জন ৩৲ শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় ডিঃ মাঃ ২৲ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বর্ম্মা চেয়ারম্যান ২৲।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—প্রজাপতি মিশ্র ভাঃ চেয়ারম্যান, বালমুকুন্দ একজিঃ ইঞ্জিঃ ফণীভূষণ মুখার্জ্জি এস্ ডিও দয়াল. মহেশ্বর দয়াল হেডমাষ্টার, কৈলাসপতি সিনা হেডমাষ্টার, বিশ্বম্ভর দয়াল বর্ম্মা ম্যানেজার—বিহার ব্যাঙ্ক, লালপ্রসাদ ম্যানেজার—কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক বলভদ্রপ্রসাদ সিনা সাঃ ইঃ, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ডিঃ পোষ্টমাষ্টার, ডাক্তার সরযূপ্রসাদ, ডাঃ কমলকৃষ্ণ মিত্র, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার রায়, ডাঃ গিরিজাভূষণ বানার্জ্জী, ডাঃ সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, ডাঃ নলিনচন্দ্র সরকার, ডাঃ রমেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, লেডী ডক্টর্ প্রীতিলতা সরকার, বৈদ্যরাজ রামদহিন পাঠক, উকীল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, উকীল রবীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, উকীল গিরিজাপ্রসাদ, মোক্তার রঘুনাথ লাল, খুসীরাম ভার্গব পোষ্ট সুপারিণ্ট, গণেশপ্রসাদ এক্সাইজ্ সুপারিণ্ট্, বিমলচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ দাস, ছেদী সিনা, মনোরঞ্জন সিনা ডিঃ মাঃ, দেবীলাল সাহা, হরিমোহন বসু, এম্ জোয়াজ হোসেন, এম্ আবদুল রহমান, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বল, জহলাল তহশীলদার, অমরনাথ মুখার্জ্জি, যমুনাপ্রসাদ সাহা, কেদারনাথ মঙ্গলপ্রসাদ সাহ, গণেশপ্রসাদ কার্ত্তিকপ্রসাদ, কমলানাথ দেব, ঈশ্বরপ্রসাদ সাহা, পুরুষোত্তমপ্রসাদ সাহা, যমুনাপ্রসাদ সিনা, ললিতাপ্রসাদ চৌধুরী, রামচন্দ্র মিত্র, বলদেব মণ্ডল, পুনদেওপ্রসাদ সাহা, কমলাপ্রসাদ সাহা, দেবেন্দ্রনাথ সাহা, জনৈক হিতৈষী।

খুচরা সংগৃহীত ১২৲।

মজঃফরপুর (বিহার)

রায়বাহাদুর কে সি সেন ইঃ সুঃ ৫৲ রায়বাহাদুর শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ জমিদার ৫৲ মিঃ ডব্লিউ এস্ হিচ্কন্ সুঃ অব্ পোলিস্ ৫৲ মিঃ ডব্লিউ ভি ডিউক্ প্রিন্সিপাল জি বি বি কলেজ ২৲ মিঃ আর্ এম্ এইচ্ হাডসন্ একজিঃ ইঞ্জিঃ ২৲ মিঃ জে ই বাউন ডি আই জি অব পুলিশ ২৲ মিঃ এ জেঙ্কিন্স এজেণ্ট অব ইম্পিঃ ব্যাঙ্ক ২৲ শ্রীযুত এস্ কে মুখার্জ্জি এঃ ইঞ্জিঃ ২৲ শ্রীযুত পি কে সেনগুপ্ত ডেপুটী অব ইন্কম্ ট্যাক্স ২৲ শ্রীযুত কালীপ্রসাদ সাহা জমিদার ২৲ শ্রীযুত অম্বিকাপ্রসাদ সাহা জমীদার ২৲ শ্রীখগেন্দ্রমোহন কর্ম্মকার ২

* বাহুল্যভয়ে একটাকার অনধিক দাতাগণের নাম পৃথক প্রকাশ না করিয়া স্থানের নামে "সংগৃহীত" উল্লেখ করা হইল।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ :—ডাঃ মনোজমোহন সিনা, ডাঃ মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ডাক্তার বি, বি ঘোষ, ডাক্তার ভূপেশচন্দ্র সরকার, ডাক্তার এস্, কে, সিনা, ডাক্তার কৈলাসবিহারী সহায়, ডাক্তার জে এস্ দত্ত, ডাক্তার গিরিজা নাথ মজুমদার, ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার জানকীনাথ বানার্জ্জি, জেইল ডাক্তার এস পি, দাশগুপ্ত ডাক্তার এস্ বি, লাহা, উকিল যদুনাথ প্রসাদ, উকিল কেশবচন্দ্র বসু, উকিল হরি সাধন ভাদুড়ী, উকিল নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, উকিল অবন্তীনাথ বানার্জ্জি, রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, ভাইস প্রিন্সিপাল, আর পি খোসলা, প্রফেসার শিব নাথ বসু, পরেশচন্দ্র দত্ত, প্রফেসার রজনীকান্ত বসু, প্রফেসার গোষ্ঠবিহারী সিনা, প্রফেসার অতুলানন্দ সেন, প্রফেসার অনন্তমোহন সেনগুপ্ত, প্রফেসার ইউ এস্, ঝা, বালেশ্বর প্রসাদ সিনা, টি, টি, আই, এস্ কে সান্যাল, ডি এস্ পি, নন্দকিশোর জৈন ডি, ম্যাজিঃ মুনসেফ ত্রিবিক্রম সিনা, বৈদ্যনাথ শর্ম্মা এস্ ডি, ও, শ্যামানন্দ নাজির, পরেশনাথ বানার্জ্জি, মোহন প্রসাদ সাহ জমিদার, কানাই প্রসাদ সাহ জমিদার, গঙ্গাধর সাহ জমিদার, ক্ষীরোদেশ্বর বসু জমিদার, যতীন্দ্রনাথ বসু জমিদার, চন্দ্রেশ্বরী প্রসাদ চেয়ারম্যান, অন্নদা প্রসাদ দত্ত, কুলদা প্রসাদ চাটার্জি, শ্যামসুন্দর রায়, শৈলেন্দ্রনাথ পাত্র, রাখাল দাস ঘোষ, অমর কুমার মুখার্জি, মন্মথনাথ দাস, সতীশচন্দ্র চাটার্জি, অত্রিকুমার চাটার্জি, শ্রীশচন্দ্র হালদার, বিজয়কুমার বসু, গোবর্দ্ধননাথ ক্ষেত্রী, রাম মোহন মুখার্জি, পরমেশ্বরপ্রসাদ সাহ, যতীন্দ্রনাথ রায়, যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, টি ডব্লিও সারলিং, আর এস্ হাড্সন্, নক্ষত্রভূষণ সেনগুপ্ত, ঈশ্বরসিং, সতীশচন্দ্র চৌধুরী, কৈলাস বিহারী, বদরী নারায়ণ, পরমেশ্বরী প্রসাদ, মৃণালিনী দেবী, উমেশচন্দ্র সরকার, হরিহরেন্দ্র চরণ প্রসাদ, ব্রহ্মদেব নারায়ণ, সিং বনোয়ারীলাল, আর কে খান্না, শুকদেব নারায়ণ, রাজমোহন তেওয়ারী, মিহিরকুমার চাটার্জি, আশুতোষ চৌধুরী, মুখার্জী লেফিউ এণ্ড কোং, গাঙ্গুলী কর্ম্মকার এণ্ড কোং, চাটার্জি এণ্ড কোং।

জি বি বি কলেজ হোষ্টেল ২৩৲, সংগৃহীত ৩০৲।

বেতিয়া (চম্পারণ)

শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু এঃ ম্যানেজার বেতিয়ারাজ ৩৲। খুচরা সংগ্রহ ১২৲।

এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—ভগবান্‌প্রসাদ সহায় হেডমাষ্টার, ডাক্তার বঙ্কুবিহারী মিত্র, ডাক্তার হারাণচন্দ্র লাহিড়ী, ডাক্তার কালীকুমার সেন, উকিল সুরেন্দ্রমোহন বসু, উকিল যতীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, উকিল বিন্ধ্যাচলপ্রসাদ, অনাদিনাথ সান্যাল, গিরীন্দ্রনাথ মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী, নলিনীরঞ্জন বানার্জ্জী, পবিত্রকুমার চাটার্জী, নলিনীনাথ মুখার্জী, তারিণীচরণ সেন, খগেন্দ্রনাথ মল, নারায়ণদাস সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ যোগদীপ নারায়ণ, রামদাস রাম, রামচন্দ্র প্রসাদ, বি পি ঠাকুর, কুমুদনাথ আদিত্য, বিশ্বেশ্বর নাথ, মনোমোহন ঝা, অম্বিকাপ্রসাদ, অমরপ্রসাদ, জনৈক হিতৈষী।

সমস্তিপুর (দ্বারভাঙ্গা)

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখার্জি ৩৲। দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—ডাঃ হরিপদ ঘোষ, চিন্ময়চরণ সান্যাল, শুকনন্দন সিনা, সুন্দর সিং, রামজনম সিংহ ডিপুটি ম্যাজিঃ। এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—উকিল শ্যামাপদ বানার্জ্জি, উকিল যতীন্দ্রনাথ বানার্জি, উকিল ভূপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, উকিল বিশ্বেশ্বর প্রসাদ সিনা, উকিল লালা মাঙ্গনী রাম, উকিল অবিনাশচন্দ্র নন্দী, উকিল বিষ্ণুচরণ সেন, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ সিনা, ডাঃ এস, কে সহায়, সতীশচন্দ্র সরকার হেডমাষ্টার, শৈলেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, রামকৃষ্ণ সরকার, রঞ্জিরঞ্জন

বসু, অমরনাথ বানার্জি, প্রকাশচন্দ্র চাটার্জি, এ এন্ দে, ফণীন্দ্রনারায়ণ মিহির, নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, উমাপতি রায়, রাধাগোবিন্দ সাহ, হরিচরণ দত্ত, রামদয়াল রাম, চতুর্ভুজ রাম, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী, অনাথনাথ বানার্জি, অতীন্দ্রনাথ মুহুরী, রামাবতার, বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ, রামানুগ্রহ নারায়ণ, মুন্সেফ, বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী কান্তির চৌধুরী, অনুপনারায়ণ কুবর পুলিশ ইন্স্পেঃ যদুনন্দন সিনা, বসন্তলাল গয়াপ্রসাদ, রামাবতার, জে এফ বেরোজ গার্ড, এস্ এম্ আবদুল আলী পুলিশ সাবইন্, মৌজীলাল চৌধুরী, সুশীলচন্দ্র রায়, ননীগোপাল চাটার্জি, রামচরণ মিত্র, অতুলচন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জি, রঘুনন্দন প্রসাদ, জনৈক মোক্তার, রাধাকিষণ প্রসাদ, জনৈক হিতৈষী। সংগৃহীত—রামেশ্বর মিল্স্ ষ্টাফ ১০৲, খুচরা সংগৃহীত ১২৲।

উৎসবে প্রাপ্ত

(ঢাকা জেলা হইতে)

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাসগুপ্ত ২৲। এক টাকা করিয়া :—শ্রীযুক্তাঃ—মদনমোহন চক্রবর্ত্তী, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, অমলচন্দ্র দে, শশীকান্ত দত্ত হৃদয়নাথ দে, অবিনাশচন্দ্র রায় বর্ম্মন্, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস, বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ (ময়মনসিংহ)

লাহেরিয়া সরাই—(দ্বারভাঙ্গা)

শ্রীমৎ প্রভুচরণ ভারতী মোহন্ত দুলালপুর ৫৲ শ্রীযুক্ত আর পি, ঘোষ ক্যাপটেইন ৫৲ শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র গাঙ্গুলী ষ্টেসন মাষ্টার ৫৲ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত নারায়ণ চৌধুরী জমিদার ৪৲ শ্রীযুক্তা হিরণময়ী সেন লেডী ডাক্তার ৫৲ দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল হোষ্টেল ৫৷৵০।

দুই টাকা করিয়া :—

শ্রীযুক্তাঃ—সূর্য্যনারায়ণ সিংহ ডিপুটী ম্যাজিঃ, সত্যসাধন ঘোষ উকিল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস উকিল, গিরীন্দ্রনারায়ণ মিত্র উকিল, লছমনপ্রসাদ উকিল, দামারিস। ঠাকুর দাস, জনৈক পুলিশ ইনেস্পক্টার।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—উকিল বীরেন্দ্রনাথ সেন, উকিল শচীন্দ্র নাথ দত্ত, উকিল ললিতমোহন বানার্জ্জি, উকিল উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী উকিল হরিবান্‌সি সহায়, উকিল চন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, উকিল মোনেলাল চৌধুরী, উকিল পটল লাল, উকিল হরিকৃষ্ণ চৌধুরী, উকিল রামচরণ সিনা, উকিল বিষ্ণুকান্ত ঝা, উকিল বালমুকুন্দ সহায় উকিল জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল প্রিয়নাথ মিত্র, মুনসেফ চারুচন্দ্র কুমারী, হেড্‌মাষ্টার অবধুতচন্দ্র সিংহ, ভবানী প্রসাদ ডেপুটী মাজিঃ, ভবানীচরণ বড়াল ম্যানেজ্যার ইম্পিঃ ব্যাঙ্ক, ডাঃ এস্, পি, নাভাগ, ডাঃ সুধীরকুমার সেন, ডাঃ আশুতোষ মিত্র, ডাঃ মধুসূদন সিনা, ডাঃ রণদাপ্রসাদ সেন ডাঃ কৈলাসচন্দ্র রাও, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শিবা প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্রনাথ সিনা, এম্ ডিঃ সহায়, শম্ভুদয়াল, রাম নেহারা সিংহ, ম্যানেঃ দ্বারভাঙ্গা, জেইলার হেমচন্দ্র সেন, ডাঃ মনোমোহন রায়, ডাঃ যোগেশচন্দ্র পাল, ডাঃ বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য পোষ্টমাষ্টার, বিজয়কুমার মুখার্জি, ধীরেন্দ্রকুমার চন্দ, ভূপতি চরণ মুখার্জি, বাল গবিন্দ, সারদাপ্রসাদ বানার্জ্জি, দিবাকর দত্ত, তারাচাঁদ নাগ। খুচরা সংগৃহীত ১০৲।

২২শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ---১৩৩৬

সমষ্টি সং ২৩৬ | ২য় সংখ্যা

অগ্নয়ে

—*—

ঋগ্বেদসংহিতা—৪।২

—):*:(—

[বামদেব ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

অধা হ যদ্বয়মগ্নে ত্বায়া
পড়্‌ভির্হস্তেভিশ্চকৃমা তনূভিঃ।
রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজো-
ঋ্ঁতং যেমুঃ সুধ্য আশুষাণাঃ ॥

কে আছে মোদের আর ? মনে-প্রাণে তোমারেই চাই,
এ কর-চরণ-তনু তব কাছে সঁপিয়াছি তাই !
রচিয়াছি তব তরে বাহুবলে এ আসন চারু,
তিল তিল করি যথা রচে রথ সুনিপুণ কারু।

অধা মাতুরুষসঃ সপ্ত বিপ্রা
জায়েমহি প্রথমা বেধসো নৄন্।
দিবস্পুত্রা অঙ্গিরসো ভবেম
অদ্রিং রুজেম ধনিনং শুচন্তঃ ॥

জ্যোতির্ম্ময়ী উষসীর অঙ্কপরে মোরা সাতজন
জনমিতে প্রথমেই বেধা অগ্নি ছড়াল কিরণ।
দেবতার পুত্র, দীপ্ত মোরা নাম ধরি অঙ্গিরস—
জলভরা মেঘে হানি, জানি সে তো আমাদেরি বশ।

অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ
প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশুষাণাঃ।
শুচীদয়ন্দীধিতিমুক্থশাসঃ
ক্ষমা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্ ॥

আমাদের পিতৃগণ কারো হতে নহে কভু হীন,
জান তুমি, অকপটে সেবিয়াছে সত্যে চিরদিন ;
স্তুতি গাহি লভিয়াছে দিব্যধাম পুণ্য জ্যোতির্ম্ময়—
উষার অরুণরাগে তমসারে করিয়াছে ক্ষয়।

সুকর্ম্মাণ সুরুচো দেবয়ন্তো-
হয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ।
শুচন্তো অগ্নিং ববৃধন্ত ইন্দ্রম্
উর্ব্বং গব্যং পরিষদন্তো অগ্মন্ ॥

সুকর্ম্মা সুরুচি তারা, দেবতারে সঁপিয়াছে প্রাণ,
দাহি তপে এ জীবনে দেবতার হয়েছে সমান ;
সমিদ্ধিয়া হুতাশনে, ইন্দ্রতরে নিঙাড়িয়া সোম,
মহানন্দে সবে মিলি লভিয়াছে দীপ্ত পরব্যোম।

আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্
দেবানাং যজ্জনিমান্ত্যুগ্র।
মর্ত্তানাং চিদুর্ব্বশীরকৃপ্রন্
বৃধে চিদর্য্য উপরস্যায়োঃ ॥

লক্ষ্মীমন্ত ঘরে যথা পশুপাল দলে দলে থাকে,
দেখে ইন্দ্র—সেই মত দেবতারা এলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
মর্ত্ত্যমাঝে উর্ব্বশীর আগমন হয়েছে সফল—
ভৃত্য আর সন্তানের গৃহস্বামী করেছে কুশল।

অকর্ম্ম তে স্বপসো অভূম
ঋতমবস্রন্নুষসো বিভাতীঃ।
অনূনমগ্নিং পুরুধা সুশ্চন্দ্রং
দেবস্য মর্ম্মৃজতশ্চারু চক্ষুঃ ॥

করিয়াছি সেবা তব, সেই হল কর্ম্ম সুশোভন ;
জ্যোতির্ম্ময়ী উষা ঋতে দিব্য তেজে করে আবরণ।
কম নও, তুমি অগ্নি ! আনন্দ যে বাড়ায়েছে কত !
হে চারু, সুন্দর দেব ! শিরে তুলে নিই তব ব্রত !

এতা তে অগ্ন উচথানি বেধো-
হবোচাম কবয়ে তা জুষস্ব।
উচ্ছোচস্ব কৃণুহি বস্যসো নো
মহো রায়ঃ পুরুবার প্র যন্ধি ॥

হে বিধাতা ! বৈশ্বানর ! স্তুতি তব গাহি বারবার ;
তুমি কবি—যোগ্য নহে, তবু এবে কর অঙ্গীকার।
দীপ্ত হোক শিখা তব ! ধন-রত্নে ফেল আজি ছেয়ে !
এমনি সম্পদ দাও, দেখে যেন থাকে সবে চেয়ে।

—*—

পথিকের কথা

যদি বলি, অত ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছ কেন—একটু স্থির হও, দু'দণ্ড এক জায়গায় হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া দেখই না কেন, জগৎটা কোন্‌ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে!—অমনি হতাশাক্লিষ্ট করুণকণ্ঠে শুনিতে পাইব—কি করি, পারি না যে!

চেষ্টা আছে, অথচ যে পারিতেছে না, তাহাকে টানিয়া তুলিবার পথ আছে। তাহাকে বলা চলে—

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নাই তোর কোনো ভাবনা—
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
ফাগুন কখনো যাবে না!

তবে সে পথ কোনো ঐন্দ্রজালিকের রচা মায়াপথ নয়। আমি কি করিতেছি না করিতেছি—তাহার কোনও হিসাবই রাখিব না, ছন্নছাড়া হইয়া সংসারের দশটা কাজে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তেমনি সাধন রাজ্যেও পুঁজি শুধু কতগুলি এলোমেলো চিন্তা, অসমাপ্ত প্রয়াস, অব্যক্ত আকুলতা—এই ভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন সব আলোতে আলোময় হইয়া উঠিবে; এ ভরসা সচরাচর বড় ফলে না। মানুষের একটা বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাটা অন্ততঃ কিছু দুর পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারে, কিসে কি হয় তার সবটা না বুঝিলেও অন্ততঃ কিছুটা একটা বালকেও বোঝে। এই বুদ্ধিটাকে সংসারের সব কাজে খাটাইব, খাটাইব না কেবল সাধনরাজ্যে, প্রকৃতির হিসাবে এটা নেহাইৎ বেআইনী। তাই বলিতেছিলাম, যেমন ঘর-গেরস্তী গুছাইয়া লইবার একটা অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা সকলের মনেই জাগে, তেমনি মনের অন্দরটা গুছাইয়া লইবার একটা চেষ্টাও থাকা উচিত। মনটা অবাস্তবের এলাকায়, তার ভাবগুলি যেন হাওয়ায় ভাসিয়া চলা মেঘের মত; সবই মানি। কিন্তু তবুও তাহারা একেবারে খামখেয়ালী নয়; একনিষ্ঠা বলিয়া একটা জিনিষ তাহাদেরও ধাতে আছে।

সহসা কিছু হইয়া যাইবে, এই ভাবনাটা যে একেবারে একেবারে ফাঁকি, সে কথা বলি না। আকস্মিকের আবির্ভাব জগতে অহরহ দেখিতেছি। অন্তররাজ্যে ইহাকে আরও অত্যাশ্চর্য্যরূপে দেখিতে পাই। অভাবনীয়ের আবির্ভাবের বিস্ময়ই হইল লীলা-বাদের ভিত্তি; আর লীলা ছাড়া অন্তরের আস্বাদনের সম্পূর্ণতা কোথায়? তাই "সহসা একদা আপনা হইতে" একটা কিছু ঘটিয়া যে আমায় চমকাইয়া দিবে, এই ঔৎসুক্য আমার আছে। কিন্তু তবুও গোড়া হইতেই ওই অনিশ্চিতের আশায় আমি সুনিশ্চিতের নোঙর ছিঁড়িয়া ভাসিয়া যাইতে পারি না। যাহা কিছু ভাবনীয়, তাহার যুক্তিযুক্ত আবির্ভাবের শেষ প্রান্তে অভাবনীয়ের আবির্ভাব ঘটিবে, ইহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। কিন্তু কি যে নিদারুণ দৈব-নির্ভরতায় আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, আমরা যুক্তির পথ, অনুসন্ধানের পথ, খাটুনীর পথটা মোটেই ধরিতে চাহি না। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের এক বর্ণও আলোচনা করিব না, কেবল স্বপ্নাদ্য মাদুলীতে কি করিয়া রোগ আরাম হয়, সেই ফিকিরে ঘুরিয়া মরিব!

চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না, ইহার ঔষধ কি, গীতায় হাজার বার শুনিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, আর অর্জ্জুনের মত শিষ্য; তবুও ফিকির করিয়া একটা সত্যলাভের উপায় আবিষ্কৃত হইল না। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, ঠাকুর, মনকে বাঁধা আর বাতাসকে বাঁধা একই কথা; 'এ কি

সম্ভব? ঠাকুরটী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, হাঁ, অসম্ভবই মনে হয় বটে; কিন্তু জান, অভ্যাস আর বৈরাগ্যে সব হয়!

বৈরাগ্যের কথাটা আপাততঃ ছাড়িয়াই দিলাম। ওই অভ্যাসটা কিন্তু একটা মস্ত বড় জিনিষ। যদি কোন ফিকির থাকিয়া থাকে তো ওই। অভ্যাসে সব হয়; কথাটা শুনিলে কল্পনাসেবী নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, কেননা এ একেবারে নির্জ্জলা শাদা কথা, এতটুকুও ভাবের ঘোর এর মাঝে নাই। কিন্তু উপায় নাই; যদি সত্যিকার ভরসার কোনও কথা থাকে তো ওই—অভ্যাসে সব হয়।

অভ্যাসটা কি?—সোজা উত্তর—বারবার করা। একবার একটা বিষয়ে মনটা বসাইতে গেলে, পারিলে না? আচ্ছা, ঘাব্ড়াইয়া যাইও না, আবার লাগ। আবার ভাঙ্গিয়া পড়িলে তো আবার লাগ। বুক দিয়া পাহাড় ঠেলিতে হইবে; কি করা, উপায় তো নাই, ওই একমাত্র পথ।

তবে অভ্যাসের সঙ্গে যদি একটু বিজ্ঞানের আলোচনা থাকে, তাহা হইলে মনটা একটা অবলম্বন পায়। তাই সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিজ্ঞানের অবতারণাও প্রয়োজন। প্রথমেই একটা ভরসার কথা বলি, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল আছে, ইহা ধ্রুব। সুতরাং সুতরাং দু'দশবার যে হটিয়া আসিয়াছ, ইহাতে যে কিছুই হয় নাই, তাহা মনে করিও না। পাহাড় না নড়ুক, তোমার ছাতি কিন্তু ডবল হইয়াছে।

স্বামী রাম একটী সুন্দর কথা বলিতেন—"নিয়মিত ধ্যান লাগাও। সব দিন কি আর ধ্যান জমিবে? যেদিন জমিবে না, সেদিন জোর তদন্ত কর—কেন জমিল না? তারপর যে বিরোধী হেতুগুলি খুঁজিয়া বাহির করিবে, সেগুলির একটী একটী করিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল। আজকার দিনটা হয় তো তোমার এমন করিয়াই গেল; ভজনে আনন্দ পাইল না; কিন্তু মস্ত বড় লাভ হইল এই যে, কালকার আনন্দের জন্য আজ রাস্তা সাফ করিয়া রাখিলে।" লাখো কথার এক কথা!

কিছুতেই নিরুৎসাহ হইতে নাই। ডালকুত্তার মত শত্রুর টুঁটি কামড়াইয়া ধরিব, মাথা কাটিয়া নিলেও কামড় ছাড়িব না—এমনি গোঁ থাকা চাই। "কিছুই হইতেছে না, কিছুই হইল না"—ও সব কি বুলি রে তোর? ও তো পিছাইয়া পড়া শুধু। আপশোষ করিলেই কি সব হইয়া যাইবে? কিছু হইতেছে না দেখিয়াও জোর করিয়া বলিতে হইবে, তবুও জানি, হইবে—নিশ্চয় হইবে! এত জোর করিতে বলি কিসের জোরে?—না এ তোমার নিজের এলাকা। আরে বাপু, এ তো আর পরের মন নয় যে সাধা-সাধি করিতে, ফিকির-ফন্দী করিতেই দিন গুজরাণ্। এ তোমার নিজের মন—এর ওপর কর্ত্তৃত্ব তোমার আছেই আছে। জগতে আর কিছুর ওপরই তোমার হুকুম খাটে না, এমন কি তোমার এই দেহ-টার ওপরেও না। কিন্তু মনটার ওপর খাটে; ষোল আনা না খাটুক, এক পাই খাটে। তা ওই এক পাই-ই সই; ওই এক পাইকে পুঁজি করিয়া ষোল আনা দখল করিতে হইবে। ভড়্কাইয়া গেলে চলিবে কেন?

দুর্ব্বল মনের পেছনে একটা শক্ত মনের ঠেকা থাকে তো কাজ খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়। পথের সাথী থাকিলে পথের কষ্ট গায়ে বাধে না। অবশ হইয়া মাটীতে পড়িলে সে তোমায় টানিয়া তোলে, তার শক্তি দেখিয়া তোমার প্রাণে শক্তি আসে। এই জন্যই সৎসঙ্গ প্রয়োজন। সাধনার ইমারতের মস্ত বড় দুই খুঁটী—সাধু আর শাস্ত্র। নাম শুনিয়া চটিয়া যাইও না, মনে করিও না তোমাদের মার্জ্জিত রুচির মালঞ্চে আমি দুইটা প্রাচীন কুসংস্কারের ঝাড় আমদানী করিতেছি। সাধু বলিতে আমি বুঝি মানুষ, আর শাস্ত্র বলিতে বুঝি কথা। মানুষ কি কখনো মানুষ ছাড়িয়া থাকিতে পারে গো? সংসা-

রের প্রতি খুঁটিনাটিতে মানুষ মানুষের সহায়, মানুষ মানুষের বন্ধু; আর ওই অগম পথেই কি কেউ তার সাথী নাই? যদি ছাতি ফুলাইয়া বল, না আমি একলা পথের মুসাফির, আমার কোনও ঠেক্‌নার দরকার নাই; সে তো ভাল কথা, ছাতিতে যার জোর আছে, মতলবী কথা বলিয়া তাহার ছাতির জোর কমাইয়া দিতে যাইব কেন? কিন্তু যে দুর্ব্বল, তাহার সাথী প্রয়োজন; আর কিছু না হউক, ওই অগম পথে একজন ভালবাসার লোকের বড় প্রয়োজন। মানুষের বুকের ব্যথা তো তোমরা জান না; আসঙ্গের পিপাসা যে তার কত প্রবল, সে কথা যে দরদী সেই জানে।

থাক্, যে কথা বলিতেছিলাম। ওই সাধুই বল, গুরুই বল, আর মানুষই বল, সে আর কোন দিক দিয়া বল পাইতেছে না, ওইটাতেই তার বড় প্রয়োজন। তবে এইখানেও একটা কথা বলিয়া রাখি— কথাটা ভরসার কথাও বটে, হুঁসিয়ারীর কথাও বটে। সাধু খুঁজিতে গিয়া দেখিও আবার যেন আজগুবির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িও না। তোমার চাই একটী মানুষ, যে মানুষ তোমার দরদ বুঝিবে; তটস্থ হইয়া নয়, প্রাণ খুলিয়া যাহার কাছে সব কথা বলিতে পারিবে। উপাধির বহর দেখিয়া যদি সাধু-গুরু বাছাই করিতে যাও, তাহা হইলে বোধহয় ঠকিবে। হয়ত সারা জীবন ঢুঁড়িয়াও তোমার খেয়াল-মাফিক বহরের সাধু-গুরু জুটিয়া উঠিবে না। আর মনে হইতে থাকিবে, হায় কিছু হইল না; নয়ত তেমন কাহাকে পাইলেও কৃতার্থ হইয়া গেলাম ভাবিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাতেও তোমার বড় ইষ্ট-সিদ্ধি হইবে না। পাটোয়ারী-বুদ্ধি নিয়া যে চলে. তার এমনি করিয়া গুরু মিলেও না, আবার মিলেও; কিন্তু লাভ উভয় ক্ষেত্রেই সমান। প্রাণটী সরল রাখ, আকাঙ্ক্ষাটী সদা-জাগ্রৎ রাখ; মনের মানুষ মিলিতে কোনও বেগই পাইতে হইবে না। আর সে মানুষ তোমার ঘরের কানাচেই পাইবে—সে একেবারে সহজ মানুষ, কোন আজগুবি-প্যাটার্ণ-দাগা নয় মোটেই।

মানুষের কথায় আর একটা কথাও বলি। এক রকম ছেঁদো বিশ্বাস আছে। তাহার ধরণটা এই।— নাম শুনিয়া ছুটিয়া গেলাম মহাপুরুষ গুরু করিতে। যে দিন গুরু করিলাম, সেই দিন হইতে একেবারে নিশ্চিন্তি। আগে বা যা একটু আকুলি-বিকুলি ছিল, এইবার সব ঠাণ্ডা। নিজের চেষ্টা-চরিত্র সব শিকায় উঠিল। মনকে বুঝাই, সার গুরু পাইয়াছি, আর কি চাই! সব ভার তাঁর উপর ফেলিয়া আমি এখন খালাস।—কথাটা যেমন বড়, তার ফাঁকিটাও তেমনি বড়। সব ছাড়িয়া দাও আমার ওপর—এই কথাটা বুঝাইতে শ্রীকৃষ্ণকে আঠার অধ্যায় বলিতে হইয়াছিল, আর তাও অর্জ্জুনের মত শিষ্যের কাছে, আর সেই যুগে। আর এ যুগে একটা কাণা-কড়ির মমতা যে ছাড়িতে পারে না, সে যে কি করিয়া বলে, ঠাকুর, আমার সব ভার তোমার, আর এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গুরু পাইলেই সব হইয়া গেল, এই জ্বলন্ত বিশ্বাস লাখে একজনারও হয় কিনা সন্দেহ। আর আজকাল দেখ, পথে-ঘাটে অমন বিশ্বাসীর ছড়াছড়ি। সব অকর্ম্মার ধাড়ি, তাই কেবল ফাঁকিবাজী, কেবল সস্তায় কাজ হাঁসিল করিবার মতলব। কিন্তু এ কথাটা কি মনে থাকে না যে. কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে নিজের দা'য়েই ধার হইবে না!

সাধুর কথা এই পর্য্যন্ত। তার পর শাস্ত্র। বলিয়াছি, শাস্ত্র মানে কথা—মানুষের কথা। মানুষকে সব সময় কাছে পাই না; কিন্তু কথাটা সহজেই পাইতে পারি। ওই কথার স্মরণ-মনন, ওতে প্রাণে জোর আনে, তাই ওটা একান্ত প্রয়োজন। আগেকার ভাষায় ওটাকে বলিত— স্বাধ্যায়। সব দেশে, সব ধর্ম্মে স্বাধ্যায় অধ্যয়নের

রেওয়াজ আছে, কেবল নব্য হিন্দুরই দেখি এ বিষয় আজ কাল কিছু মন্দা দৃষ্টি। কথার উৎস যদি তোমার বুকে খুলিয়া গিয়া থাকে তো কথাই নাই, তোমার আর স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন কি? তা যদি না হইয়া থাকে, নিষ্ঠার সহিত স্বাধ্যায় অধ্যয়ন কর—প্রতিদিন প্রভাতে অন্ততঃ এক ছত্রও সন্ত-বাণী মনে গাঁথিয়া লও, আর সারা দিনের কাজ কর্ম্মের মাঝে ওই বাণীর প্রেরণাটী জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা কর—ভারী আরাম পাইবে।

মনের আর একটা রহস্যের কথা বলি। বলিয়াছি তো, চেষ্টাটাকে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিতে হইবে উৎসাহ দিয়া, সত্য ভাবনা দিয়া। কিন্তু যেখানেই টানাহ্যাঁচড়া আছে, সেইখানেই অবসাদও আছে। নবীন সাধককে এইটুকুও খেয়াল রাখিতে হইবে। এক এক সময় মন নামিয়া পড়িবেই। কোনও কুভাব নিয়া যে নামিয়া পড়িবে তা নয়; হয়ত পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুভাবে মন ভরপূর ছিল; কিন্তু এখন আর হাজার ঠেলাঠেলিতেও নড়িতে চাহে না। এই অবস্থায় ভয় পাইতে নাই, কিম্বা বুঝি সব গেল মনে করিয়া ঘাব্ড়াইয়া যাইতে নাই। মাঝে মাঝে ওইটুকু প্রয়োজন; একটু দম না নিয়া মন ছুটিতে পারে না—উপরের দিকেও না, নীচের দিকেও না। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখ, মনের ওই আসন্ন অবস্থাতেও একটী চৌকিদার মন কিন্তু পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পেছনে পেছনে আসিতেছিল; নতুবা মন যখন মুস্ড়াইয়া গেল, তখন সে খবরটাই বা বুদ্ধির কাছে পাঠাইয়া দিল কে? অবসন্ন মনের অবলম্বন ওই সাক্ষী মন—ওই নিঃশব্দ চৌকিদারটী। কোনও ভাবনাই যখন আসে না, তখন মনকে ঘাঁটাইও না; সব ভাবনাই অতলে তলাইয়া যাইতে দাও। সুপ্ত শিশুর শিয়রে মা যেমন করিয়া বসিয়া থাকেন, জাগরণের প্রতীক্ষা নিয়া, তেমনি করিয়া জাগিয়া থাক। আবার মন সচেতন হইয়া উঠিবে, সুপ্তির ভাণ্ডার হইতে নূতন বল, নূতন তেজ সঞ্চয় করিয়া আবার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে দেখা দিবে।

জীবনটাকে যেমন বাহির হইতে এলোমেলো দেখায়, বাস্তবিক সে কিন্তু তেমন এলোমেলো নয়। এর মাঝেও ছন্দ আছে, সামঞ্জস্য আছে; দিন আছে, রাত আছে; সৃষ্টি আছে, প্রলয় আছে। এইটুকু ধরিতে পারিলেই সিদ্ধির পথে বারো-আনা আগাইয়া গেলে বলিতে হইবে। কিন্তু এটুকু ধরিবে কে? ওই যে বলিয়াছি সাক্ষী মন। তাহার সঙ্গে একবার ভাব জমাইয়া লইতে হইবে। তবে তাহার দেখা চুপি-চুপি। সেখানে তোমার কেউ নাই—শঙ্কা-ভয়, প্রীতি-মমতা, সাধ্য-সাধন কিছুই নাই। নবোঢ়ার কাছে স্বামি-শয্যার মত সে এক অনির্ব্বচনীয় সাধনকম্পিত রহস্য লোক। গভীর হইতে গভীরে—আরো গভীরে তলাইয়া গিয়া সেই লোকের একটু খানি স্পর্শ লইয়া আসিতে হইবে। যেদিন তাহা পারিবে, সেই দিনই সকল রকমে তোমার কাছে আশ্চর্য্য সার্থক হইয়া উঠিবে। ওই গুহাহিতের ছোঁয়াচ পাইয়া এই প্রকাশের জগতেরও শ্রী ফিরিয়া যাইবে।

তীর্থ-সঙ্গমে

—*‡()‡*—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"ধরুন এক পরিবারে ছয়টী লোক। তার মাঝে একজন সাধু, একজন চোর, একজন সুস্থ, একজন রোগা—এ কি করে হয় ?"

ব্যক্তিগত ভাবে জাতকের এই হের-ফেরটা এই ভাবে হয়। একটা বিষয় কিন্তু বরাবর ঠিক থাকে। একজন ছাপাখানায় কাজ করে, একজন পালিসের কাজ করে, একজন তেলের কলে কাজ করে, একজন চালের কলে ইত্যাদি। বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে সবাই আছে বটে, কিন্তু তবু একজায়গায় তাদের মিল আছে। সবাই এক দোকান হতেই কাপড় কেনে। কাজেই এক হিসাবে যদি আমাদের মাঝে হের ফের থাকে তো আর এক জায়গায় যে মিল থাকবে না, এ কথা তো বল্‌তে পার না।

এক পরিবারের সব সন্তানের মাঝেই একটা বিষয়ে মিল আছে; সে হচ্ছে তাদের বাপ-মায়ের প্রতি টান। এ জায়গায় সবাই ঠিক। ওই বাড়ীর প্রতি বা ওই পারিপার্শ্বিকের প্রতি তাদের একটা আসক্তি ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদের বাসনা-কামনায় তফাৎ ছিল। তাই এ জগতে কেউ আসে এই রাস্তা দিয়ে, কেউ বা আসে ওই রাস্তা দিয়ে, কিন্তু সবাই এসে চৌমাথায় মিলেই।

* *
*

"এ দেহ ছেড়ে যাওয়ার পরও কি সূক্ষ্ম জগতে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় ?"

বেদান্ত বলে, পরজন্মে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। নিজকে পূর্ণ করে গড়ে তুলবার সুযোগ পাই সেই ভবিষ্যৎ জীবনে, নূতন করে দেহ ধারণ করে। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে স্বপ্নকালটা যেমন, সূক্ষ্ম-লোকে অবস্থানটাও তেমনি

"যারা এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছে তাদের আধ্যাত্মিক সাহায্য করা যায় ?"

হাঁ, তা পারা যায় বই কি। তাদের ছবি বা মনে মনে তাদের প্রতিমূর্ত্তি সামনে রেখে যদি গভীর তন্ময়তার সঙ্গে চিন্তা কর যে, তারা ব্রহ্মস্বরূপ, তাহলে তাদের সাহায্য করা হয় বই কি! তোমার শুভ চিন্তা দ্বারা যদি তাদের ভাবিত কর, তাদের সম্বন্ধে যদি উন্নত ধারণা পোষণ কর তো—তুমি তাদেরও ভাল করতে পার, নিজেরও ভাল কর।

"বৈষয়িক ব্যাপারে তারা কি কখনো আমাদের সাহায্য করে ?"

এই স্থূল জগতে অপর লোক যদি তোমার সাহায্য করতে পারে বলে মনে কর, তাহলে যারা মৃত, তারাও সাহায্য করতে পারবে না কেন ? কিন্তু বেদান্ত বলে, এই স্থূল জগতেও তো তুমিই তোমার হিত করছ, অপরে তো নয়; তাহলে মরা মানুষের তো কথাই নাই। মরা মানুষকে দিয়েই হোক-আর জ্যান্ত মানুষকে দিয়েই হোক্‌, আসলে তো তুমিই তোমার হিত করছ।

বেদান্ত তাই বল্‌ছে, বাইরে হাত্‌ড়ে বেড়িও না কিছুই, আপন কেন্দ্রে ঠিক হয়ে থাক; তোমার মাঝেই সব আছে, খুঁজে বের কর। যদি পাওয়ার উপযুক্ত হও তো চাইতেই হবে

না, কামনার ধন বয়ে দিয়ে যাবে তোমার দুয়ারে। তারা আপনি এসে হাজির হবে। যদি লায়েক হও তো সাহায্য আলবৎ পাবে।

তারপর সেদিন যে কথাটা হচ্ছিল। একজন লোক এমন পারিপার্শ্বিকের মাঝে আছে যে, সেখানে থেকে ভারতবর্ষকে ভাল না বেসে সে থাকতে পারে না, ভারতের ভাবে সর্ব্বক্ষণ তাকে অনুপ্রাণিত হতেই হচ্ছে; সে এমন সব বই পড়ছে, এমন লোকের সঙ্গ করছে, যারা ভারতের স্মৃতিকে সর্ব্বদা তার মনে জাগিয়ে রাখছে। এই লোকটার বাড়ী আমেরিকাতেই হোক্, আর ইংলণ্ডেই হোক্, ভারতবর্ষের ভাবনার ফলে সে ভারতবর্ষেই জন্মাবে কিন্তু। কাজেই আপন ইচ্ছাতেই সে ভারতে এল বল্‌তে হবে।

* *
*

"আচ্ছা, মানুষ কি আবার কুকুর বেড়াল হয়ে জন্মায়?"

কুকুর বেড়াল প্রভৃতি ইতরপ্রাণীর সব নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিকের ওপর। বর্ত্তমান পরিস্থিতি যেমন, সেই অনুযায়ী তাদের ভবিষ্যৎ জন্ম নিয়ন্ত্রিত হবে।

ভারতবর্ষে এক সাধুর কাছে দুজন লোক এল। একটার স্বভাব কুকুরের মত, আর একটার স্বভাব বেড়ালের মত, কিম্বা বল্‌তে পার, একটা কুকুর আর একটা বেড়াল এল সাধুর কাছে। কুকুরটা সাধুকে বল্‌ল, "প্রভো, এ লোকটা একেবারে আস্ত বেড়াল; তেমনি দুষ্টু, তেমনি ধূর্ত্ত, ভারী পাজী লোক এটা। আচ্ছা, পরজন্মে তার কি গতি হবে?" বেড়াল স্বভাবের লোকটা এসেও বল্‌ল, "প্রভো অমুক একেবারে কুকুরের মত পাজী; অষ্ট প্রহর ঘেউ-ঘেউ করছেই। পরজন্মে তার কি গতি হবে?" সাধু কোনও জবাব দিল না। লোক দুইটা প্রায়ই এসে ওই কথাই জিজ্ঞাসা করে। অবশেষে একদিন সাধু বললেন, "বাছা, এ সব প্রশ্ন না করাই ভাল ছিল।" কিন্তু তারা জবাব না পেলে ছাড়বে না কিছুতেই। অগত্যা সাধু বললেন, "দেখ কুকুর, এই বেড়ালটা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গ করছে। তোমার স্বভাবের নকল করতে করতে ও ক্রমে তোমার ধাঁচই পেয়ে উঠ্‌ছে। কাজেই পরজন্মে বেড়ালটা কুকুর না হয়ে আর কি হবে বল? আর ভাই বেড়াল, এই কুকুরটাও তোমার নকল করতে করতে বেড়ালের স্বভাবই পেয়ে যাচ্ছে। কাজেই পরজন্মে এ নিশ্চয়ই বেড়ালই হবে।" তুমি কুকুরের সঙ্গ করছ না বেড়ালের সঙ্গ করছ, সেই বুঝে পরজন্মে তুমি বেড়াল কি কুকুর হবে। থাক্, এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

* *
*

"মৃত্যুর পর আবার কতদিনে পুনর্জন্ম হয়?"

সারাদিন হাজারো রকমের কাজ-টাজ করে একজন ঘুমাতে গেল; পরদিন ভোরবেলায় সে জাগ্‌ল। ঘুমাতে যাওয়াটা হচ্ছে মরণ, আর ভোরে জাগা হল পুনর্জন্ম। যখন ঘুমুতে গিয়েছিলে আর জাগলে, এই দুটো সময়ের মাঝামাঝিটা তোমার কাছে স্বর্গ বা নরক বা সূক্ষ্মলোক ইত্যাদি। এখানে দেখি কেউ ৪।৫ ঘণ্টা ঘুমায়, কেউ ৭।৮ ঘণ্টা, কেউ বা ১০ ঘণ্টা ঘুমায়। শিশুরা বেশী ঘুমায়। বুড়োরা অত ঘুমায় না। যুবকদেরও বেশী ঘুম দরকার হয়। কাজেই মানুষ বুঝে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ বুঝে উনিশবিশ হয়। এ জগতেও যে কতদিন থাকবে, তার তো কোনও ঠিক নাই—কেউ ছেলে-বেলায় মরছে, কেউ মরছে ত্রিশে, কেউ সত্তরে। তেমনি পুনর্জন্মেরও কোনও বাঁধাধরা সময় নাই।

* * *

"এ যুগে কি বেদান্তের অনুভব মিলে? বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার জৌলুষে কি বেদান্তজ্ঞান ফোটে? আপনি আভাস দিয়াছিলেন যে বেদান্তের উপলব্ধি পেতে হলে একটা বিশিষ্ট ধারায় জীবনকে পরিচালিত করতে হবে, হিমালয়ের জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করতে হবে।"

না, না, জঙ্গলে যেতে হবে কেন? লোকে বলে—সময় নাই, সময় নাই। একেই তো নিত্যিকার পেট চালানোর কাজ আছেই, তা ছাড়া আরও কত কিছু ধান্ধা আছে; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের দরুণও তো কত সময় যায়। প্রার্থনারও একটা পদ আছে, "হে ভগবান্, শত্রুর হাত হতে আমায় বাঁচাও।" কিন্তু আজকালকার লোকে যদি প্রার্থনা করে, "হে ভগবান, মিত্রের হাত হতে আমায় বাঁচাও," তাহলে সেইটাই মানায় ভাল। বন্ধুরা যে আমাদের কত সময়ই হরণ করেন! তারপর ভাবনা-চিন্তা তো আছেই।

শেষকালে একটী কথা বল্‌ছি। পড়াশুনা নানা রকমই আছে। কেউ পড়ে তোতার মত—শুধু জীভ্ দিয়ে। কেউ পড়ে হাত দিয়ে,—যেমন যারা কারু, কি চিত্রকর। কারুরা যে বৈজ্ঞানিক নয়, এমন কথা রাম বল্‌ছে না; তবে এমন কারুও আছে, যারা বৈজ্ঞানিক নয়। উদক-বিজ্ঞানের কিছুই জানে না, অথচ সাঁৎরে সমুদ্রের খাড়ি একটা পার হতে পারে, এমন লোকও আছে। আকাশে উড়ে যায় অথচ বায়ুতত্ত্বের কিছুই জানে না, এমনও আছে! যারা ওষুধ তৈরী করে, অনেক সময় ধাতু-বিজ্ঞানের তারা কিছুই জানে না। তাই বল্‌ছি, যারা হাত দিয়া পড়ে, অর্থাৎ যারা কারু, তাদেরও দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চাই না। কেউ আবার পড়েন হৃদয় দিয়ে। জগতে তারাই ক্ষণজন্মা পুরুষ। একটা বিষয় এক নজরেই কেউ বুঝে নিতে পারে; যাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুলে গিয়েছে, তারা সবই দেখতে পায়। তাদেরও আমরা বাদ দিচ্ছি না। কিন্তু তারা যদি কেবল হৃদয় দিয়েই পড়ে, তা হলে তাদের শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বল্‌তে পারি না। যেমন তাদের তীব্র মনোবেগ থাকা চাই, তেমনি বৈদগ্ধ্যও (culture) থাকা চাই। যাতে তাদের জ্ঞান, তাদের সত্যিকার শিক্ষা অপরের মাঝেও সংক্রামিত হতে পারে। শুধু হৃদয়ের আবেগকে অনুসরণ করে চল্‌লে তাদের একরোখা বল্‌ব। তিন দিকে যাদের ধার, এ জগতে তারাই সব চেয়ে কর্ম্মী। যাদের মন, হৃদয়, হাত আর জিভ্ দুরুস্ত হয়েছে, তারাই যথার্থ শিক্ষিত, তারাই বিদগ্ধ।

তেমনি রামও চান, তোমরা সব দিক দিয়ে বেদান্ত অনুশীলন কর—বুক দিয়ে, মাথা দিয়ে, হাত দিয়ে, জিভ্ দিয়ে, অন্তর দিয়ে—সব দিয়ে বেদান্ত অনুশীলন কর। তোমার রক্তধারায় বেজে উঠুক বেদান্তের ঝঙ্কার. তোমার শিরা-উপশিরায় বয়ে যাক্ বেদান্ত, তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ ব্যাপ্ত করুক বেদান্ত, তোমার মস্তিষ্ক নিমজ্জিত হয়ে থাক্ বেদান্তের রসে, তোমার সমস্ত সত্তা বেদান্ত দ্বারা অনুষিক্ত হতে থাকুক। তবেই না তুমি উঠতে পার্‌বে, সব দিক হতে মুক্ত হতে পার্‌বে! তখনই তোমার মাঝে জাগবে সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মানুভূতি, আত্মস্বরূপের অখণ্ড উপলব্ধি। তখনি তুমি মুক্ত!

রাম বল্‌ছেন কি, যদি এ দেহে আর সে দেহে তোমার ভেদ আছে বলে মনে হয়, যদি এমন মনে হয়, অমুক মুখে যা বল্‌ছে, বুকে তার তা নাই, তাতে তোমার কি বয়ে গেল? তার কথাগুলোই তুমি লুফে নাও না—বুক দিয়ে, মাথা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সর্ব্বস্ব দিয়ে সে সত্যকে আঁকড়ে ধর! ওই সত্যে জীবন ঢেলে দাও, উন্নততর, মহত্তর, শিবতর হবে

তুমি। তুমি তাই হও—তাই হও—এই রামের ইচ্ছা!

রামের যদি হাজার দোষ থাকে, হাজারটা ভুল থাকে, তাতে তোমার কি? ভুলভ্রান্তির জন্য তো রামই দায়ী। রাম দিচ্ছেন তোমাকে মহত্তম সত্য! ওই সত্যকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে নাও—আনন্দ উপ্‌চে পড়বে, সমস্ত সংশয়ের পরপারে যাবে তুমি!

ধর, রাম যা প্রচার কর্‌ছেন, তা জীবনে ফলিয়ে তুল্‌তে পারেননি। হয়ত এমন পারিপার্শ্বিকের মাঝে তাঁকে কাটাতে হচ্ছে, যাতে সত্যকে তিনি নিজের মাঝে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ছেন না। কিন্তু তুমি তো সে সত্যের পরখ কর্‌তে পার, তাতে জীবন ঢেলে দিতে পার।

কেল্‌ভিন্, এডিসন্ প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মাথা খাটিয়ে কেবল কাজের ছক্‌টা করে দেন। নক্সা অনুযায়ী কাজ হয়তো হাতে করা যায় না, বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার হয়, সে যন্ত্রের নক্সাও তাঁরা করে দিলেন। তোমার হাত ভাল, তুমি যন্ত্র গড়্‌তে পার। নক্সা তৈরী কর্‌বার সামর্থ্য তোমার না থাক্‌তে পারে, কিন্তু নক্সা-অনুযায়ী যন্ত্র তৈরী তো তুমি কর্‌তে পার, ভাবকে কাজে ফলিয়ে তুল্‌তে পার।

মজুর শ্রেণীর লোকের যত বিপত্তি এইখানে। একটা ছক্ তাদের হাতে দিলে তারা সেটাকে কাজে ফলাতে পারে না। তেমনি যারা বলে, "ইনি মুখে যা বলেন, কাজে যখন তা করেন না, তখন এঁর কথা আমরা শুন্‌ব না"—তাদের যুক্তির কোনও মূল্যই নাই।

একটা লোক পোষ্টাই (টনিক), বা দুধ বা মিঠাই বেচে। সে নিজে পোষ্টাই ব্যবহার করে না বা দুধ-মিঠাই খায় না। তা বলে তুমি ও-সব তার কাছ থেকে কিনবে না?

বেদান্ত বলে, ডাক্তারের অসুখ হয়েছে বলে তুমি তার কাছ থেকে ওষুদ খাবে না, এ কি কথা? হয়ত সে নিজের রোগের কোনও প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌ল না। তুমি যে রোগে কাতর, তার দাওয়াই ডাক্তার জানে; কিন্তু তার নিজের রোগের দাওয়াই হয়ত সে জানে না। নিজকে সে আরাম করতে পারে না, কিন্তু তোমাকে আরাম কর্‌তে পারে তো?

ভারতবর্ষে এবং আমেরিকাতে এমন অনেক লোকের সঙ্গে রামের আলাপ হয়েছে, যারা আগে গ্রন্থকারের খোঁজ না করে কোন বই পড়ে না। অনেকেই বলে, "লোকটা এত সব অপকর্ম্ম করেছে, এখন বই লিখে নিজকে ব্রহ্ম বলে জাহির কর্‌ছে। ও বই পড়ে কি হবে?" রাম বলেন, ভাই, ভুল কর্‌ছ কেন? লোকটা পাজী হতে পারে, কিন্তু যে সত্য সে তোমাকে দিয়েছে, তার বিচার কর, সত্যকে সত্যের খাতিরেই গ্রহণ কর—মানুষের খাতিরে নয়।

ভারতবর্ষে চাকা ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে জল তোলা হয়। কুয়ো থেকে জল উঠে একটা চৌবাচ্চাতে জমা হয়। চৌবাচ্চা হতে ছোট ছোট খাল কেটে জল ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয়। যতক্ষণ জলটা কুয়োয় থাকে, ততক্ষণ ঘাসও গজায় না, গাছও গজায় না, প্রকৃতির শ্যামল শোভাও দেখা যায় না। চৌবাচ্চায় যতক্ষণ জলটা জমা থাকে, ততক্ষণও গাছপালার নাম-গন্ধও থাকে না। কিন্তু জল যখন ক্ষেতে এসে পড়ে, তখন মাটি সরস ও উর্ব্বরা হয়, আর গাছপালাও গজাতে থাকে। কুয়োয় বা চৌবাচ্চায় যখন জল ছিল, তখন গাছপালার খোঁজ ছিল না বলে ক্ষেতে এসে জল পড়লেও গাছপালা গজাবে না—এমন তর্ক কেউ তুল্‌তে পারে?

তাই রাম বল্‌ছেন, যে উৎস থেকেই জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হোক্ না কেন, তোমার কাছে এলে তাকে ফিরিয়ে দিও না।—বলো না, "ভারতবর্ষই যদি জ্ঞানের প্রস্রবণ হয় তো ভারতবাসীরা অপর জাতির তুলনায় এত হীন কেন? সত্যের খাতিরে সত্যকে

গ্রহণ কর। মানুষকে খুসী করবার এই একমাত্র উপায়—আনন্দ পাওয়ার, ভগবান্ পাওয়ার এই একমাত্র পথ। এ তোমায় সব ভাবনা-চিন্তা হতে, দুঃখ বেদনার পঙ্ক হতে টেনে তোলে। এই এক মাত্র পথ—নান্য পন্থাঃ।

খৃষ্টের জীবন মহৎ ছিল বলে সিদ্ধান্ত করে বসো না যে খৃষ্টের শিক্ষাতেই সত্যের প্রকাশ, এ ছাড়া সত্য আর কোথায়ও নাই! মানুষটা দেখ্‌তে অতি সুন্দর যুবা পুরুষ, অথচ সে একটা অকাণ্ড করে বস্‌ল, এ-ও কি কখনো দেখি না? এক জনের কর্ম্ম মহৎ হতে পারে, বাণী উদার হতে পারে, কিন্তু তার যা কিছু তাই যে ভাল, তা তো নয়; তার হাড়-মাংস তো উপাদেয় বলব না।

বাইবেল পড়বার সময় তার মাঝে যা কিছু পাও, তাই খৃষ্টের ঘাড়ে চাপিও না। খৃষ্ট পূর্ণ আদর্শ, তাঁর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু তা বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিও না। বাইবেলকে বাইবেল হিসাবেই যাচাই করতে হবে। সার্ আইজাক্ নিউটনের Principia বইখানাতে অগুণ্‌তি ভুল। তার যুগে নিউটন হয়ত পুরুষোত্তমই ছিলেন, তা বলে তাঁর বইখানা তো বই হিসাবেই বিচার করতে হবে!

তাই রাম বলছেন, রামের পাপ-পুণ্যের বিচারে তোমার কি প্রয়োজন? রামের অধ্যাত্ম-শিক্ষাকে স্বরূপে গ্রহণ কর। বেদান্তের বাণী তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে। তা বলে রাম বলছেন না যে, এ কথাগুলো তাঁর বলে তুমি মেনে নাও। এ বাণী তোমার!

বেদান্ত কারু দাসত্ব নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধের দাসত্ব, ইসলাম মহম্মদের দাসত্ব, পারসিক-ধর্ম্ম জারাথুস্ত্রের দাসত্ব, কিন্তু বেদান্ত কোনও সাধুরই দাসত্ব নয়। বেদান্ত সত্য—সার্ব্বজনীন সত্য!

শীতের দিনে যদি গায়ে রোদ লাগাই তো তার দরুণ সূর্য্যিমামার কাছে বাঁধা পড়ি না, কেননা সূর্য্যিমামা সকলেরই মামা। রাম যদি বেদান্তের আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারেন তো তুমিও এসে তাঁর পাশে আসন নিতে পার। এ আলোতে রামেরও যতখানি অধিকার, তোমারও ততখানি অধিকার। সত্যের ওপর ভারতবর্ষের যতখানি দখল, তোমারও ততখানি দখল। নাও, সত্যকে সত্যস্বরূপেই আপন করে নাও। যদি এতে হিত বোঝ তো একে রাখ; যদি অহিত মনে কর তো পদাঘাতে দূর করে দাও। ইস্‌লাম-ধর্ম আর খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম যেমন করে ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়েছিল—তরোয়াল আর টাকার সাহায্যে, রাম তেমনি করে আমেরিকায় বেদান্ত আমদানী করছেন না। বেদান্ত তোমার নিজস্ব—নাও, জীবনে ফলিয়ে তোল একে!

তোমার বন্ধু যদি রোদ পুইয়ে আনন্দ না পায় তো তুমিও যে পাবে না, তার কোনও হেতু নাই। বেদান্তকে স্বরূপে গ্রহণ কর; বেদান্ত অধিগত কর, জীবনে তাকে ফলিয়ে তোল! ব্যক্তিত্বের মোহ সব ছাড়িয়ে ওঠ! খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ আর রামের দলের গণ্ডী ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়! রাম বলছেন, দাও এই দেহকে দুপায়ে থেঁৎলে! আমি এই দেহ নই—জান, উপলব্ধি কর এই সত্য! আমি সত্যস্বরূপ—আমাকে জেনে মুক্ত হও! এই উপলব্ধি ফুটে উঠুক—ওম্—ওম্—আমিই ওঁকার—আমি জিহোভা, খৃষ্টেরও খৃষ্ট আমি! আমাকে জান—জান, আমিই তুমি। এই উপলব্ধিতে দৃঢ় হয়ে সব ভাবনা-চিন্তার মাথায় চড়! দূর হোক্ যত সব হাঁস্‌ফাস্ আর হুমড়ি খেয়ে পড়া! ওঠ—ওঠ—খৃষ্টের ওপরে, মহম্মদের ওপরে, বন্ধু-বান্ধবের ওপরে—এদেরই একমাত্র গতি বলে মনে করে যারা, তাদের ওপরে!

এরা ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লায়; এরা চঞ্চল। এই সমস্ত প্রতিভাসের মূলে যে সর্ব্বোত্তম সত্যস্বরূপ তাঁকে জান। তাঁকে জেনে মুক্ত হও! ওম্—ওম্!

দুঃখের দর্শন

—শ্রীপ্রী—

সুখ হতে আত্মরক্ষা করবার কল্পনাও কারু মনে জাগে না; কিন্তু দুঃখকে সবাই ডরায়, দুঃখ আসবার ভয়েই অন্তরাত্মা সচেতন হয়ে ওঠেন। এই সচেতন হওয়ার অর্থটা যদি হত যথার্থ আত্মরক্ষা, তাহলে দুঃখের মত বড় বন্ধু আর কাউকেও বল্‌তাম না, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এটা ঠিক ঠিক আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা নয় তো—স্বার্থরক্ষার চেষ্টা। স্বার্থ মানে আত্মার প্রসারের মাঝে একটা অহংএর গণ্ডী। গণ্ডী রচ্‌তে গেলেই তো বিরোধ। বিরোধ করে কখনো শান্তি পাওয়া যায় না, কাজেই সুখও পাওয়া যায় না। তাহলে দুঃখকে তাড়িয়ে দেবার অজুহাতে স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টাকে যখন আমরা উগ্র করে তুলি, তখন বাস্তবিকই দুঃখটাকে তাড়াতে পারি না, তার একটু রকম-ফের করে তাকে আপাততঃ সুসহ করে তুলি মাত্র।

কিন্তু ও তো হল তাত্ত্বিকের কথা। দুঃখকে তাড়াবার যদি কোন উপায়ই না থাকে, তাহলে সেটা কি ভয়ানক কথা! তাই অবোধ মানুষের মন কিছুতেই ও কথাটা মানতে চায় না। দুঃখ তাড়াবার সে কত রকম ফন্দীই আবিষ্কার করেছে, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বাৎলিয়ে বড় বড় দর্শন পর্য্যন্ত রচনা করেছে, কিন্তু যে যতই বলুক না কেন, আসলে দুঃখ ঘোচেনি কারু, ঘুচবেও না কোনও দিন। ওই বড় বড় দর্শনের আঁতের খবর নিয়ে দেখ, সবাই গড়ে বেড়া দিয়ে রেখেছে অর্থাৎ এ জায়গায় যদি ঠাসবুনোনি থাকে তো ওই জায়গায় হাতী চলবার মত ফাঁক! হয়ত কোথাও দুঃখের এমন একটা অদ্ভুত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে সে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে দেখা যায়, রামা-শ্যামা যেটাকে দুঃখ বল্‌ছে, আসলে সেটা দুঃখই নয়; কিন্তু দুঃখ দূর করবার এমনই পথ বার করা হয়েছে, যে পথের হদিশ পেতে গেলে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে সুখটাও বাতিল হয়ে যায়, হয়ত বা সংজ্ঞার লোপই হয়ে যায়!

আসল কথা কি, যেটা আছে, সেটা থাক্‌বেই; তার সঙ্গে আপোষ হতে পারে, কিন্তু তাকে উচ্ছেদ করা চলে না। তাই বলি, যদি দুঃখ থাকে তো জান্‌বে, সেটা চিরকাল আছেই। এই কথাটা জেনে তারপর যদি আনন্দ কর্‌বার মত বুকের পাটা থাকে তো বলি—সাবাস্ বীর! কার দুঃখ গিয়েছে জগতে বল তো? বুদ্ধদেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, জগতের যত দুঃখ ঝেঁটিয়ে বিদায় কর্‌বেন বলে। দুঃখের যে দাওয়াই তিনি আবিষ্কার কর্‌লেন, তাতে রোগ কেন, রোগী শুদ্ধ আরাম হয়ে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু সম্যক্‌সম্বুদ্ধের নিজের দুঃখ কিন্তু ঘুচল না—তাঁর চোখের জল ঝর্‌ল মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। একার দুঃখ দূর করে বেচারী জগতের যত দুঃখ-কষ্টের গন্ধমাদনের তলে তলিয়ে গেল; দিন নাই, রাত নাই, খালি চিন্তা—আহা, কি করে দুঃখীর দুঃখ যাবে!

ন্যায়দর্শন বল্‌ছেন, অপবর্গে দুঃখ যাবে; সাংখ্যদর্শন বল্‌ছেন, বিবেকে দুঃখ যাবে; বৌদ্ধ-দর্শন বল্‌ছেন, নির্ব্বাণে দুঃখ যাবে। সব কেবল ছাড়বার কথা। জগৎ হতে তফাৎ হয়ে যাও, দুঃখ যাবে। কিন্তু চিরকাল কি তফাৎ হয়ে থাকাটাই সত্য, সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য? তাই যদি হবে তো দুঃখ দিয়ে এ জগৎটা ভগবান্ গড়লেন কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমারী তর্কের কালোয়াতীই সুরু হয়ে যাবে। সব কেবল শাক দিয়ে মাছ ঢাকা!

আর তিনটী দর্শনের কথাও বলি।—যারা দুঃখটার নিকাশ অন্যরকমে করেছেন। চার্ব্বাককে

তোমরা গাল দাও বটে, কিন্তু তার কত বড় বুকের পাটা, তা বোঝ না; বৃহস্পতির শিষ্য!—কথাটার মাঝে একটু প্যাঁচ আছে। চার্ব্বাক বলছেন, মাছের মাঝে কাঁটা থাকে, ধানের সাথে খড় থাকে; সুতরাং সুখের সাথে দুঃখ তো থাকবেই, অতএব দুঃখ সহিতেই সুখটা গিল্‌তে হবে। তোমার কাছে আছে মাত্র—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান! অতীত আর ভবিষ্যৎ—সে তো কল্পনা-জল্পনা মাত্র! অনুমান, আগম, সব প্রমাণ কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত; শুধু প্রত্যক্ষ ছাড়া প্রমাণ নাই, বর্ত্তমান ছাড়া কাল নাই; এই নিয়ে বেঁচে থাক! বর্ত্তমান যে সর্ব্বদাই সুখ, কে বল্‌ল? কিন্তু সে যে সর্ব্বদাই দুঃখ, তাই বা কে বল্‌ল? অতএব বর্ত্তমানে সুখও আস্‌তে পারে, দুঃখও আস্‌তে পারে, সুখের সঙ্গে দুঃখও আস্‌তে পারে; অতএব ও সব দুঃখ তাড়ানো ফন্দীবাজী ছেড়ে দিয়ে—বলো, যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ!—চার্ব্বাকের দর্শন থেকে কতকগুলো ব'দ্ issue বের করা হয়েছে, তাইতেই বাজারে তার অত বদ্‌নাম; লোকটা Cynic এবং Satirist। কিন্তু তার প্রত্যক্ষবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে দেখ না দেখি, কেমন লাগে!

চার্ব্বাক যেটা ঢং করে বলেছেন, বেদান্ত সেইটাই শিশুর মত সরল আনন্দে অভিব্যক্ত করছেন, বলছেন—আরে চেয়ে দেখ, জগতে কেবলই আমোদ, কেবলই আনন্দ! আনন্দে তোরা জন্মেছিস্, আনন্দে বেঁচে আছিস্, আনন্দের সমুদ্রে ডুবে মরবি যে! ওরে অমৃতের সন্তান, ব্রহ্মের সেই আনন্দ জেনে তোরা অমৃত হ', নির্ভয় হ'। সে আনন্দের কাছে সুখ দুঃখ দুটারই যে সমান মূল্য। আনন্দের বন্যায় দুঃখও ভেসে যায়, সুখও যে ভেসে যায়। থাকে শুধু অখিল চরাচরব্যাপী আনন্দ—আনন্দ! সুখ দুঃখের বিচার শুধু তোর এই জগতেই তো! সে তো তোর জীবনের সিকি ভাগ মাত্র। তোর জীবনের বারো আনাই যে দ্যুলোকে আনন্দ অমৃত হয়ে রয়েছে। শরবৎ তন্ময় হয়ে যা'—সেই আনন্দে প্রবেশ করে নিশ্চল হয়ে যা! প্রতিদিন সুষুপ্তির নিস্তব্ধতায় সেই আনন্দলোকের আভাস পাচ্ছিস্ তো, তবুও তাকে বিশ্বাস করতে পার্‌ছিস্ না? ওই সুষুপ্তিকে জাগ্রতে নিয়ে আয়; তোরও অমৃত স্বরূপ ত্রিপাদ ব্যাপ্ত করে ওই সুষুপ্তির মত গাঢ় আনন্দে তোকে জড়িয়ে আছে। অনুভব কর এই সত্য! এই পৃথিবীরই দিন-রাত্রির আবর্ত্তন হয়; কিন্তু আদিত্য-লোক নিত্য জ্যোতির্ম্ময়। আদিত্যই বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্ময় ত্রিপাদ দ্বারা তিনি দ্যুলোককে আক্রান্ত করেছেন আনন্দ দ্বারা, শুধু এক পাদ পৃথিবীই না জরা-মরণ দ্বারা লাঞ্ছিত! থাক্ দুঃখ, থাক্ মৃত্যু, থাক্ বিরহ; সে শুধু আমার এক পাদ মাত্র; আমার ত্রিপাদ অমৃত অভয়, আনন্দ! সোঽহং—অহং ব্রহ্মাস্মি!

আনন্দের কলস্বরে যে কথাটা বেদান্ত বলেছেন, সেই কথাটাই বৈষ্ণব বল্‌ছেন, অনুরাগে বিগলিত হয়ে! বল্‌ছেন—ওগো, আমি কি তোমার দুঃখেরে ডরাই? তোমাকে যারা পায়'নি, তারা সুখের বড়াই করতে পারে; কিন্তু আমি যে পেয়েছি, তাই বুক ফুলিয়ে জগতের সামনে আমি দুঃখের বড়াই করছি আজ! তোমার মিলনে যত সুখ, তার শতগুণ যে জ্বালা! কিন্তু সে জ্বালা আমার কাছে অমৃত! তোমার দেওয়া দুঃখ আবার দুঃখ? সে যে আমার মাথার মাণিক!

এই এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শন। বেদান্ত দুঃখকে গ্রাস করলেন বিরাট্ হয়ে, বিভু হয়ে, উর্দ্ধচেতনার অমৃত আনন্দময় সত্যকে ধারণ করে। কিন্তু ভক্ত সেই দুঃখের রূপান্তর করলেন ছোট হয়ে, অণু হয়ে; উর্দ্ধচেতনার আলোড়নেই নয়, এই মানবী চেতনার মাঝেই তিনি এমন এক বীর্য্যশালী রসায়নের আবি-

স্কার করলেন, যাতে দুঃখ দুঃখ হয়ে থাকল বটে, কিন্তু সে আর মানুষকে বিঁধতে পারল না। পরার্থপ্রবৃত্তি এই দুঃখসাধনার মূলমন্ত্র। অহরহঃ জগতে দেখতে পাচ্ছি, প্রেম দ্বারা দুঃখ অমৃতে রূপান্তরিত হচ্ছে, ন্যায়ের যুক্তি উল্‌টে যাচ্ছে। ন্যায় বলছে—যা থেকে দুঃখ হয়, তার উচ্ছেদই কাম্য! অসহন কষ্টে সন্তানকে জন্ম দিয়ে প্রেমময়ী মাতা তাকে বুকে চেপে ধরে বলছেন, আহা রে—, আমার সাতরাজার ধন মাণিক! আকুলকণ্ঠে কেঁদে প্রেমিকা বলছেন—বন্ধু, প্রাণ দিয়েছি তোমার পায়ের তলায়; তাকে পিষে ফেল, যা-খুসী তাই কর, তবুও তুমি আমার প্রাণ-নাথ! অশ্রুজলে এত মাধুরী—তা কে জান্‌ত? এই এই প্রেম এক ফোঁটা পেলে কে চায় তোমার অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি? ভালবাসার দুঃখ, সেবার দুঃখ অমর হয়ে থাক্; আমি নিবৃত্তি চাই না; তোমার স্পর্শে সমস্ত প্রবৃত্তিই আমার বিদ্যুৎ-স্ফুরিত হয়ে উঠুক!

এইগুলিই সত্যিকার দুঃখহরণ দর্শন। দুঃখের উচ্ছেদ কামনা নয়, দুঃখের রূপান্তর চাই। দুঃখ তাড়াতে গিয়ে জগৎ হতে সরে দাঁড়ানো, সে-ও দুঃখের ক্ষণিক-নিবৃত্তি। অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির দোহাই যিনি দিচ্ছেন, সংসারে তাঁরও দুঃখ ঘোচে না, সুতরাং সাধারণের চোখে তাঁর দর্শনে খুঁৎ থেকেই যায়। দুঃখ নিবৃত্তি দর্শনের একদেশ মাত্র; ব্যবহারে যে তার রূপান্তর হয়, সেটা সত্যের অপর দেশ; দুয়ে মিলে দর্শন পূর্ণ।

বাস্তবিক, দুঃখ তাড়ানোর চেষ্টাটা মূঢ়তা মাত্র। ও করে কখনো সত্যের সন্ধান পাবে না। সত্য জিনিষটা সুখ-দুঃখের অপেক্ষায় বাঁচে না, মরে না। প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে সেইখানে। উঁচু ঘাটে তার বেঁধে রাখ্‌তে হবে সর্ব্বদাই; তবে না দুঃখের আঘাতে জীবনে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌বে; সুখ-দুঃখের চিন্তা দুটাই ফিকির মাত্র। ফিকি-রের পেছনে পেছনে ঘুরলে চিত্ত কলুষিত হয়, দুর্ব্বল হয়। তখন দুঃখ তাড়াবার আগাম আয়োজনটাই দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে।

আমার সুখ খোঁজবারও গরজ নাই, দুঃখ তাড়াবারও গরজ নাই; আসবে ওরা খুসী মত, আমি বুক পেতে সয়ে যাব! এই ঢেউএর চূড়ায় উঠেছি, এই তার গর্ত্তে পড়েছি; একই তো আনন্দ! সমগ্রভাবে দেখলে এই আন্দোলনই তো আনন্দ। মহাসমুদ্রের ওপরটাই চঞ্চল; কিন্তু সে তার কতটুকু? সুগভীর তলদেশে যে কত মণি-মুক্তা ফলে রয়েছে, বিনা সৌরকরে আলো হয়ে আছে! ওরে সেই স্তব্ধ, অগম পুরীতে তলিয়ে যা! সর্ব্বক্ষণ না পারিস্ অন্ততঃ সকালে, সন্ধ্যায় আর নিশীথে—একটুখানি সময়ের দরুণ। তাও কি তোর সময় হবে না? দুঃখ তাড়াবার কত ফিকিরই তো করছিস্! একবার আফিমের নেশার মত এই নেশাটারও অভ্যাস করে দেখ্ না! তোর দিনরাত্রির যাট্ দণ্ডের মাঝে দু'দণ্ডই এমনি করে বাজে-খরচ করে দেখ্ না কেন? কিছু হাতে আসে কি না!

আঁধারে

লভিবতে নির্দেশ তব কত ব্যথা বাজে বুকে মোর,
কোন্ অন্তরাল হতে তবু কে মায়াবী—
বুলাইয়া দেয় চোখে যেন অঙ্গে মহানিদ্রা-ঘোর ;
ভাঙ্গিলে স্বপন, মিছে আনমনে ভাবি—

সাথীরূপে সব কাজে তুমি দেখ সবি,
তবে কেন অন্ধকারে ডুবে যায় মন—
আসিলে করাল রূপে মহাকাল-ছবি—
কেন ভুলে সঁপে দিই যা-কিছু তখন ?

তার পরে কেটে গেলে সে মহাজড়তা
দেখি তুমি তখনও শিয়রে জাগিয়া—
প্রসন্ন নয়নে কত মাখিয়া মমতা—
বলে দাও যেন নিতে আশীষ মাগিয়া !

এত যদি ভালবাস, বল কেন তবে
রাখ না তখন কেন গ্রাসিলে মরণ—
সবটুকু ধুয়ে-মুছে নিয়ে যায় যবে—
কোন্ ভরসায় যাব লভিতে শরণ ?

সহে না এ লুকোচুরি, বল আর কত,
মুছে দাও নিজ হাতে কলঙ্ককালিমা—
তোমার জ্যোতিতে পূর্ণ আকাশের মত
ফুটুক নিশান্তে এবার উষার লালিমা !

মানমেয়োদয়

—:*:—

প্রমাণ-পরিচ্ছেদ

—):*:(—

প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা

[ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে ; এখন এই] সন্নিকর্ষ দ্বিবিধ—সংযোগ ও সংযুক্ত-তাদাত্ম্য। তাহার মধ্যে পৃথিবী, জল ও তেজের চক্ষুঃ ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত **সংযোগ** হইলে প্রত্যক্ষ হয় ; বায়ুর ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত **সংযোগ** হইলে, দিক্, আকাশ আর অন্ধকার—ইহাদের চক্ষুর সহিত **সংযোগ** হইলে, শব্দের শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত **সংযোগ** হইলে এবং আত্মার মনের সহিত **সংযোগ** হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মা ও মন উভয়েই বিভু (সর্ব-ব্যাপী) হইলেও ইহাদের মধ্যে অজন্য-সংযোগ (১) ঘটিয়া থাকে, ইহা সাধন করা হইবে,—

---

(১)। অজন্যসংযোগ—ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পরস্পর অসংসৃষ্ট ভাবে অবস্থিত বস্তুদ্বয়ের যদি কোন কারণ বশতঃ পরস্পরপ্রাপ্তি হয়, তবে তাহাকে 'সংযোগ' বলা হইয়া থাকে। 'অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগঈরিতঃ'। তাই বিভুদ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ এ

তাই ইহাদেরও সংযোগই (সন্নিকর্ষ)। যুগপদাদি জ্ঞানের বিষয় কাল এবং এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য, ইহা বলা হইবে; এই জ্ঞান কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়জন্য বলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই কালের সংযোগ হইয়া গ্রহণ হয়. [ইহা সিদ্ধান্ত]। (২) আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-

---

সম্বন্ধ, সংযোগ হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের অপ্রাপ্তি নাই, অথচ অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক-প্রাপ্তির নামই সংযোগ। সমবায়ও অসম্ভাব্য, কেননা একটী বিভু দ্রব্য অপর বিভু দ্রব্যে আশ্রিত—এইরূপ উপলব্ধি হয় না। (ন্যা০ ম০ ৩১২ পৃঃ)। কুমারিলভট্ট কিন্তু এ মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, পরমাণু ও আকাশ দুইই নিত্য এবং অপরটী বিভু, ইহাদের মধ্যে সংযোগ সম্ভব। এইরূপ নিত্য পরমাণুর সহিত নিত্য অথচ বিভু কালের সংযোগ সম্বন্ধও সম্ভবপর; কিন্তু কাল ও আকাশের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, ইহা প্রক্রিয়ামাত্র (technical device), ইহার পোষক যুক্তি নাই। (ন্যা০ ম০ ২৯৯ পৃঃ)। অতএব নৈয়ায়িকেরা মন ও আত্মার সংযোগ সিদ্ধি করিবার দরুণ যে মনের অণুত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অনাবশ্যক। আর যুগপৎ (এককালে) অনেক জ্ঞান হয় না, তাহার কারণ মনের অণুত্ব, নৈয়ায়িকের এ যুক্তিও প্রতীতি-বিরুদ্ধ; কারণ, দীর্ঘশষ্কুলি ভক্ষণ কালে একসঙ্গেই তাহার বর্ণ, আস্বাদ, শীতলত্ব প্রভৃতির বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বশরীরে চন্দনলেপনজনিত সুখের যৌগপদ্যপ্রতীতিও মনের অণুত্বের পরিচায়ক। আর সংযোগ হইতে হইলে উভয়ের বা অন্যতরের কর্ম্ম থাকা আবশ্যক, ইহা আমরা স্বীকার করি না। কারণ, নৈয়ায়িকের যে 'সংযোগজ-সংযোগ', তাহা তো কর্ম্মজন্য নয়। আর যদি বল যে, বিজাতীয় সংযোগের প্রতিই কর্ম কারণ হইয়া থাকে, সংযোগজ সংযোগে কর্ম আবশ্যক হয় না, তাহা হইলে জন্যসংযোগের প্রতিই কর্ম্ম কারণ হয়, ইহাই বল। বিভু দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ কিন্তু অজন্য। তাই নিষ্ক্রিয় হইলেও তাহাদের সংযোগ বাধে না। আর বিভুদ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ কোথাও উপলব্ধি হয় না, একথা বলাও ভ্রম। কারণ, দিক্ এবং আকাশ দুইই বিভু হইলেও, পূর্ব্ব আকাশ, পশ্চিম আকাশ এইরূপ জ্ঞান আমাদের অনুভবসিদ্ধ এবং ইহা দিক্ ও আকাশের সংযোগ না হইলে সিদ্ধ হইতে পারে না। (মানমেয়োদয় ৯০ পৃঃ এবং ভাট্টচিন্তামণি ২০ পৃঃ)।

(২) মীমাংসকদের মতে **কাল** প্রত্যক্ষ এবং সমস্ত জ্ঞানেই কালের অনুভব হইয়া থাকে—'ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে'—ইহা মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত। কাল যুগপদাদি জ্ঞানানুমেয়, ইহা নৈয়ায়িকেরা বলেন। কিন্তু তাহা একেবারেই অসার। কারণ, 'দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত যুগপৎ (এককালে) আসিয়াছে' 'যজ্ঞদত্তের পুত্র পরে আসিয়াছে'—এরূপ জ্ঞানের বিষয় কাল কিংবা অন্য, ইহা চিন্তা করিলে দেখা যায়—কালাতিরিক্ত অন্য কিছু ইহার বিষয় ইহা বলিলে, কালের জ্ঞান না থাকিলে কাল-ভিন্নের জ্ঞান হইতে পারে না। আর কালের সম্বন্ধ যদি জ্ঞাত হয়, তবে কাল জ্ঞানের বিষয়ই হইল। যদি বল, কালের জ্ঞান অনুমানের দ্বারাই হয়, তাহা হইলে এ অনুমানে লিঙ্গ কি? যখন যুগপদাদি জ্ঞান ভিন্ন কিছু নাই, তখন তাহাই লিঙ্গ হইবে। তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়' অনিবার্য্য—কারণ অনুমানটীর স্বরূপ এইরূপই দাঁড়াইতেছে—'যুগপদাদি জ্ঞান কালজন্য, যেহেতু তাহা যুগপদাদি জ্ঞান'। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। আমরা কি 'পর্ব্বত বহ্নিমান্, কারণ তাহা পর্ব্বত' এরূপ অনুমান করিতে পারি?

পক্ষ (minor term) ও হেতু (middle term) ভিন্ন না হইলে অনুমান হইতে পারে না। জার্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ কাণ্ট তাই বলিয়াছেন যে, যৌগপদ্য (Simultaneity) ও ক্রম (Succession) হইতে কালের অনুমান করা যাইতে পারে না; কারণ 'কালে'র জ্ঞান যদি পূর্ব্বে না থাকে, তবে এই অনুমান সম্ভব হয় না। তাই তাঁহার মতে কাল প্রত্যক্ষসিদ্ধ (intuition)। কিন্তু এ প্রত্যক্ষ বহির্বিষয়ের নহে—মনের ভিতর হইতেই তাহা অধিগত হয়। কিন্তু মীমাংসকেরা বাহ্যবাস্তববাদী (Realist) এবং নৈয়ায়িকের ন্যায় বাহ্য সমস্ত জ্ঞানই বাহ্য অনু-

সংযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে তাহাদের আত্মভূত জাতি, গুণ ও কর্ম্মের যে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, সে জ্ঞানের (কারণীভূত) সন্নিকর্ষের নাম সংযুক্ত-তাদাত্ম্য। (৩) এ সম্বন্ধে "সংযুক্তদ্রব্যতাদাত্ম্যই আমাদের মতে রূপ প্রভৃতির প্রতীতির কারণ; তাই আমরা অন্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি"—[কোন মনীষিবিশেষের] এই উক্তি (আনুকূল্য করিতেছে)।

আর যখন জাতি, গুণ ও কর্ম্মের অন্তর্গত সত্তা, রূপত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ গ্রহণ হইয়া থাকে, তখন তাহাদের (সত্তা প্রভৃতির) ও [দ্রব্যের সহিত] পরম্পরাসম্বন্ধে তাদাত্ম্য সম্ভব বলিয়া সংযুক্ত-তাদাত্ম্যই সেখানে সন্নিকর্ষ, ইহা আমরা মনে করি। অথবা যেমন অন্য দার্শনিক (নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক)গণ রূপত্বাদির গ্রহণের নিমিত্ত সংযুক্ত—সমবেত-সমবায় বলিয়া [সম্বন্ধান্তর] স্বীকার করেন, সেইরূপ আমরাও সংযুক্ত-তদাত্ম-তাদাত্ম্য (৪) নামক তৃতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই। জাতি, গুণ ও কর্ম্মের যে তাহাদের স্ব স্ব আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্যই কেবল সম্বন্ধ, ইহা পরে সপ্রমাণ করিব। তাহা হইলে সন্নিকর্ষ দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ [ইহা স্থির হইল]।

তার্কিকগণ কিন্তু তাদাত্ম্যের স্থলে সমবায়কে অভিষিক্ত করিয়া অন্যপ্রকারে সন্নিকর্ষের নিরূপণ করেন, যথা, (১) সংযোগ (২) সংযুক্ত-সমবায়, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়; (৪) সমবায়; (৫) সমবেত-সমবায় এবং (৬) বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব—এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ। তাহার মধ্যে (১) চক্ষুরাদির দ্বারা দ্রব্যের যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহাতে

ভূতি (experience) হইতে সংগৃহীত, এইরূপ মনে করেন বলিয়া 'কাল'কে তাঁহারা বহির্বিষয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দার্শনিকপ্রবর কাণ্ট কিন্তু ইহাকে (form of understanding) মনে করেন। বৌদ্ধের ভাষায় ইহা বিকল্প।

(৩) **সংযুক্ত-তাদাত্ম্য**—ভাট্ট মীমাংসক ও বৈদান্তিকেরা সমবায় স্বীকার করেন না। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে জাতি ও ব্যক্তি, অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী ইত্যাদির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তার্কিকেরা বলেন যে অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না; তাহা 'সমবায়'রূপ একটা নূতনতর সম্বন্ধ। কিন্তু এই 'অযুতসিদ্ধি'র কি অর্থ? পৃথক্‌সিদ্ধি অর্থাৎ নিষ্পত্তি বা জ্ঞানকেই যুতসিদ্ধি বলা হয়, ইহার বিপরীত অযুতসিদ্ধি। ইহা তো একত্বেরই সিদ্ধি হইল। তাহা হইলে সম্বন্ধ কি করিয়া হইবে? কারণ সম্বন্ধ দুইটী ভিন্ন বস্তুর মধ্যেই সম্ভব হইয়া থাকে। তাই মীমাংসকেরা গুণ-গুণী প্রভৃতির সম্বন্ধকে তাদাত্ম্য (ভেদাভেদ, ভা০ চি০ ২৩ পৃঃ) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'গুণ ও গুণী নিষ্পন্ন (accomplished) হইলে তো সম্বন্ধ হইতে পারে না এবং নিষ্পন্ন হইলে যুতসিদ্ধিই হইবে'—'নানিষ্পন্নস্য সম্বন্ধো নিষ্পত্তৌ যুতসিদ্ধতা' (শ্লোকবার্ত্তিক)। তাই জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ 'তাদাত্ম্য' হওয়ায়, ব্যক্তির সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলে, জাতির সহিত ইন্দ্রিয়ের 'সংযুক্ত-তাদাত্ম্য'ই সম্বন্ধ হইবে। বেদান্তপরিভাষাকারও এই মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন (প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, বে০ প০)।

(৪) **সংযুক্ত-তদাত্ম্য-তাদাত্ম্য**—ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ব্যক্তির সহিত জাতির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অর্থাৎ জাতি তাহার (ব্যক্তির) আত্মভূত—'তস্য আত্মা'। জাতির আবার তদ্‌গত সত্তার সহিত তাদাত্ম্যই সম্বন্ধ—তাই, সংযুক্ত-তদাত্ম-তাদাত্ম্য কল্পনা করা হয়।

সংযোগই সন্নিকর্ষ। আর (২) চক্ষুরাদি সংযুক্ত দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত গুণ-ক্রিয়াদির প্রত্যক্ষে [**সংযুক্ত-সমবায়ই** সন্নিকর্ষ]। (৩) (ইন্দ্রিয়)-সংযুক্ত দ্রব্যে সমবেত গুণাদির মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত গুণত্বাদির গ্রহণে [**সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ই** সন্নিকর্ষ]। (৪) শব্দ আকাশের গুণ, তাই আকাশাত্মক শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত **সমবায় সম্বন্ধেই** শব্দের গ্রহণ হয়। (৫) আর শ্রোত্র-সমবেত শব্দে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত শব্দত্ব প্রভৃতির জ্ঞানে [**সমবেতসমবায়ই** সন্নিকর্ষ]। (৬) অভাবের সংযোগ বা সমবায় হইতে পারে না, কারণ, তাহারা কেবল ভাবাত্মক (*Positive*) পদার্থেরই ধর্ম্ম; তাই [চক্ষুরাদি-]সংযুক্ত ভূতলাদির সহিত **বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ** সম্বন্ধেই (৫) অভাবের গ্রহণ হইয়া থাকে। এইরূপ সমবায়েরও সংযোগ সম্ভব হয় না, কারণ, সমবায় দ্রব্য নহে; আর সমবায়ান্তর স্বীকার করিলে অনবস্থা (৬) আসিয়া পড়ে; তাই

---

(৫) বৌদ্ধগণ **অভাবের বস্তুত্ব** স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অভাব কল্পনা-মাত্র। পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটের অনুপলব্ধি হইলে ঘট নাই এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রভাকরও অভাবকে জ্ঞানমাত্র বলিয়াছেন। বৌদ্ধেরা বলেন যে, অভাব যদি বস্তু হয়, তবে তাহার ঘটের স্বরূপের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান হইত, কিন্তু 'ইহা এখন এখানে নাই' এইরূপ দেশ, কাল ও প্রতিযোগীর (যাহার প্রতিষেধ করা হয়) দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়াই অভাবের গ্রহণ হইয়া থাকে। যদি বল, দেশকালাদিসম্বদ্ধ হইয়াই ইহার প্রতীতি হওয়া স্বভাব, তাহাও হইতে পারে না। কারণ দেশকালাদির সহিত ইহার সংযোগ বা সমবায়াদি সম্বন্ধ সম্ভব নহে। আর বিশেষণ-বিশেষ্যভাবও সম্ভব নহে। কারণ বিশেষণবিশেষ্যভাবও অন্য সম্বন্ধ থাকিলেই সম্ভব হয়। যেমন 'দণ্ডী দেবদত্ত,' 'নীল উৎপল' ইত্যাদি স্থলেও প্রসিদ্ধ সংযোগ বা সমবায় বিদ্যমান বলিয়াই এইরূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর প্রতিযোগীর সহিত অভাবের সম্বন্ধও সম্ভব নহে; কারণ, প্রতিযোগী যেকালে থাকে, সেকালে অভাব থাকে না এবং অভাব থাকিলে প্রতিযোগী থাকে না। বিরোধরূপ সম্বন্ধও সম্ভব নহে, কারণ সমসাময়িক বস্তুদ্বয়েরই বিরোধ হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, অভাবের দেশের সহিত বিশেষণবিশেষ্যভাবই সম্বন্ধ। অন্য সম্বন্ধ না থাকিলে বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধ হইতে পারে না। এই নিয়ম ভাবাত্মক পদার্থের বেলায় খাটিলেও অভাবের বেলায় ইহার ব্যত্যয় হইয়া থাকে। আর সম্বন্ধ থাকিলেই কিছু বিশেষণ হয় না। যে ব্যক্তি মাথায় দণ্ড বহন করিয়া যায়, তাহাকে দণ্ডী বলা হয় না। অতএব ব্যাপ্তি বা বাচ্য-বাচকভাবকে যেমন স্বতন্ত্র সম্বন্ধ বলা হয়, ইহাকেও তাহাই বলা উচিত। মীমাংসক ও বৌদ্ধেরা কিন্তু অভাবের বেলায় বিশেষণবিশেষ্যভাব সম্বন্ধান্তর না থাকিলেও সম্ভব হইবে, এ কথা স্বীকার করেন না। কারণ দৃষ্টবিরোধী কল্পনা করা অনুচিত। মীমাংসকেরা অভাবের বস্তুত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষগম্য, ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে অনুপলব্ধির দ্বারাই অভাবের জ্ঞান হয় সত্য, কিন্তু এই অভাব মিথ্যা নহে। কারণ বস্তু সত্য কি মিথ্যা ইহার নিরূপণ করা হয় জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞানের বিষয় হইবে অথচ তাহা মিথ্যা—ইহা অসম্ভব। তাই মীমাংসকেরা 'অনুপলব্ধি' বলিয়া ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করেন।

অনবস্থা—Infinite regress, যে কল্পনার বিরাম নাই; একটী কল্পনাকে রাখিতে গেলে যেখানে অনন্ত কল্পনা স্বীকার করিতে হয়। সমবায়ের ও বস্তুর সহিত **বিশেষণবিশেষ্যভাব** কল্পনা করা হয়। নতুবা অন্য সম্বন্ধ হইতে হইলে সমবায়ই হইবে। এই দ্বিতীয় সমবায়টীর প্রত্যক্ষ করিতে হইলে আর একটী সমবায় এবং তাহার জন্য অন্য একটী, এইরূপ অবিশ্রান্ত কল্পনা করিতে

সমবায় প্রত্যক্ষেও বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই (৭) সন্নিকর্ষ। (তার্কিক মতের ইহাই নিষ্কর্ষ)।

ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটী [সন্নিকর্ষ] কিন্তু নামে মাত্র ভিন্ন। আর সমবায় প্রভৃতি অন্য [তিনটা] সন্নিকর্ষ কিন্তু [একেবারেই] আশ্রয়শূন্য [কল্পনা] ॥৮॥

শব্দ যখন শ্রোত্রের (৮) গুণ হইতে পারে না, তখন সমবায় ও সমবেত-সমবায়াখ্য সন্নিকর্ষের অবকাশই কোথায় ? আর, অভাবের প্রত্যক্ষত্ব সম্ভব হয় না এবং সমবায় শশশৃঙ্গের ন্যায়ই অলীক ; তখন বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবরূপ সন্নিকর্ষও পরিত্যজ্য। আর এক কথা —চক্ষুঃসংযুক্ত বস্তুর সহিত অভাব ও সমবায়ের বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। [কারণ, বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধ হইতে হইলে অপর একটী সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন।]—'দণ্ডী-পুরুষ' ইত্যাদি স্থলেও সম্বন্ধান্তরকে আশ্রয় করিয়াই বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভাব ও সমবায়ের কিন্তু বস্তুর সহিত অন্য সম্বন্ধ সম্ভব হয় না, [তাই উহাদের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষরূপ সম্বন্ধও হইতে পারে না (৯)]।

হইবে। কিন্তু বিশেষণবিশেষ্যভাবও সম্বন্ধান্তরকে অপেক্ষা করে বলিয়া এ কল্পনা অচল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। হরিদাস কুসুমাঞ্জলির টীকায় কিন্তু এই সম্বন্ধকে পরিণামে 'স্বরূপ-সম্বন্ধ' বলিয়াছেন। 'স্বরূপসম্বন্ধ' এই কল্পনাটী নব্যনৈয়ায়িকের প্রকাণ্ড ধীশক্তির পরিচয় দেয়। ইহার বিচার (৯) পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

(৮) ভাট্ট মীমাংসকের মতে **শব্দ** নিত্য, বিভু ও দ্রব্য। নৈয়ায়িকেরা শব্দ অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন ও গুণ, ইহা বলেন। সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া শব্দকে দ্রব্য বলাই উচিত। আর গুণ হইলে আধারের উপলব্ধি না হইয়া গুণের উপলব্ধি হইতে পারে না। কিন্তু শব্দের কোন আধারের উপলব্ধি হয় না। জয়ন্ত ভট্ট বলেন যে, আশ্রিতত্ব গুণত্বের প্রযোজক নহে, কেননা ছয়টী পদার্থেরই আশ্রিতত্ব হইতে পারে। দিক্, কাল, পরমাণু প্রভৃতি ছাড়া ছয়টী পদার্থই আশ্রিত হইতে পারে। আর শব্দের আশ্রয় আকাশ, তাহা কিন্তু অপ্রত্যক্ষ। আধার যখন অপরোক্ষ, তখন শব্দের প্রত্যক্ষত্ব কি করিয়া হইবে ? যেমন, আত্মা পরোক্ষ হইলেও বুদ্ধ্যাদির উপলব্ধি হয়, তেমনি হইবে। "কথমাধারপারোক্ষ্যশব্দপ্রত্যক্ষতেতি চেৎ ? —যথৈবাত্মপরোক্ষত্বে বুদ্ধ্যাদেরুপলম্ভনম্।"

জয়ন্ত ভট্টের এ যুক্তি কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকের নিকট ব্যর্থ। কারণ তাঁহাদের মতে আকাশ প্রত্যক্ষ এবং শব্দ তাহার গুণ হইলে আকাশেরও শব্দজ্ঞানকালে গ্রহণ হইত। আর দৃষ্টান্তও বিশেষণসিদ্ধ, কারণ, ভট্টমতে আত্মা স্বপ্রকাশ ও অহংবুদ্ধিরূপ মানস-প্রত্যক্ষ গম্য।

(৯)—বিশেষণ বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের প্রতি সম্বন্ধান্তরের জ্ঞান কারণ, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন সমবায়রূপ সম্বন্ধই অলীক, তখন তাহার প্রত্যক্ষের জন্য আবার অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা ? বৈশেষিকদের মতে কিন্তু সমবায় অপ্রত্যক্ষ এবং ইহবুদ্ধিলিঙ্গানুমেয় [এবং তাবদ্বৈশেষিকানাং মতেন ইহবুদ্ধিলিঙ্গানুমেয়ঃ সমবায়ঃ, নৈয়ায়িকমতেন তু—ইহবুদ্ধিপ্রত্যক্ষগম্য এব"—তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা—২৬৫ পৃঃ]। মীমাংসকের মতে জাতি ও ব্যক্তির, গুণ ও গুণী প্রভৃতির সম্বন্ধ তাদাত্ম্য, কারণ তাহারা পরস্পর ভিন্ন নহে। কিন্তু প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, 'অযুতসিদ্ধ আধার ও আধেয়ের ইহ-প্রত্যয়হেতু (এখানে ইহা আছে, দ্রব্যে জাতি আছে—এইরূপ জ্ঞানের কারণ) যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায় [অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধারভূতানামিহ-প্রত্যয়হেতুর্যঃ সম্বন্ধঃ স সমবায়ঃ]; কিন্তু এ মত

ঠিক্ নহে। যাহারা অযুতসিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধ হইতে পারে না। আচ্ছা, এই অযুত-সিদ্ধি কি? (১) যুতসিদ্ধির অভাব মাত্র, কিম্বা (২) অপৃথক্ সিদ্ধ, (৩) কিম্বা অভিন্ন আশ্রয়ে আশ্রিতত্ব, অথবা (৪) অপৃথক্‌গতিমত্ত্ব? [জয়ন্ত ভট্ট তাই বলিয়াছেন, পরমাণুসকল নিত্য হইলেও তাহাদের সম্বন্ধ যুতসিদ্ধ, কারণ তাহাদের পৃথক্‌গতি সম্ভব, আর অনিত্য-পদার্থসকলের পৃথক্ অবস্থান থাকায় তাহাদের সম্বন্ধও যুতসিদ্ধি—"নিত্যানাং পরমাণূনাং পৃথগ্‌গতিমত্ত্বং যুতসিদ্ধিঃ, অনিত্যানাং তু যুতাশ্রয়িসমবায়িত্বম"—ন্যাঃ মঃ ২৯৯ পৃঃ] প্রথম দুইটা কল্পই অসম্ভব; কারণ যাহারা অনিষ্পন্ন, তাহাদের বিদ্যমানত্বই নাই, কি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ হইবে? সিদ্ধেরই সম্বন্ধ হয়, অসিদ্ধের হয় না। তাই যাহারা নিষ্পদ্যমান, তাহাদেরও সম্বন্ধ সম্ভব নহে, আর নিষ্পত্তির উত্তরকালে যদি সম্বন্ধ হয়, তবে যুতসিদ্ধিই হইবে। আর যাহারা যুত-(পৃথক্)-সিদ্ধ, তাহাদের পরে সম্বন্ধ ঘটাইবার কারণও উপস্থিত নাই। রজ্জু ও ঘট পৃথক্‌সিদ্ধ হইলেও তাহাদের সম্বন্ধ-হেতু কোন মনুষ্য যেমন দেখা যায়, তেমনি জাতি ও ব্যক্তির কোন সংযোগ দৃষ্ট হয় না। সমবায় যখন নিজেই সম্বন্ধ, তখন তাহার সম্বন্ধঘটকত্ব কি করিয়া হইবে? আর তৃতীয় ও চতুর্থ কল্পও অসম্ভাব্য; কারণ, জাতি ব্যক্তিতে আশ্রিত, ব্যক্তি স্বাবয়বে আশ্রিত, তাই পৃথগ্‌গতি সিদ্ধ হইতেছে। আর যখন সম্বন্ধের হেতু কেহ উপস্থিত নাই, তখন তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধও ঘটিয়া উঠিবে না। আর এক কথা—সমবায় সমবায়ী (জাতি ব্যক্তি প্রভৃতি) হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? ভিন্ন হইলে, উহারা সম্বন্ধ না অসম্বন্ধ? যদি ভিন্ন এবং অসম্বন্ধ হয়, তবে সমবায়ী ও সমবায়ের বিশ্লেষ থাকায় সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠিবে না। আর যদি উহারা পরস্পরসম্বন্ধ হয়, তবে কি সম্বন্ধের দ্বারা উহারা সম্বন্ধ হইবে? সে সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না, কারণ সংযোগ গুণ এবং তাহা দ্রব্যেরই ধর্ম, সমবায় কিন্তু দ্রব্য নহে। আর যদি সমবায়ান্তর স্বীকার কর, তবে অনবস্থা অপরিহার্য্য এবং তাহা অপসিদ্ধান্ত (সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ) হইবে। কারণ সমবায় বৈশেষিকের মতে এক। প্রশস্তপাদ তাঁহার ভাষ্যে এ আপত্তির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইতেছে;—"কি সম্বন্ধে সমবায় দ্রব্যাদিতে থাকে? সংযোগ-সম্বন্ধে নহে, কেননা, সংযোগ গুণ, অতএব দ্রব্যেই তাহা থাকিতে পারে। আর (অন্য) সমবায়ও নহে, কারণ সমবায় এক। অন্য কোন সম্বন্ধও নাই।' [উত্তরে বলিয়াছেন] না, তাদাত্ম্য সম্বন্ধেই থাকে। যেমন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে সৎস্বরূপভাব (সত্তা) স্বরূপতই থাকে, অন্য সত্তা সম্বন্ধে নহে, এইরূপ সম্বন্ধরূপ সমবায়ও স্বরূপেই আধারেই থাকে, কারণ তাহার আধার হইতে তো বিভাগ নাই।" শ্রীধর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বৃত্তির (সম্বন্ধের) অভাব বশতঃ সমবায় থাকে না ইহা নয়, কারণ, তাদাত্ম্যই ইহার বৃত্তি, স্বতই ইহা বৃত্তি (সম্বন্ধ)। সংযোগ যদিও সম্বন্ধ, তথাপি উহা কৃতক বলিয়া উহার অন্য সম্বন্ধে অবস্থান হইয়া থাকে, কারণ কৃতকের (কার্য্যের) কারণের সহিত সমবায় হইয়া থাকে, ইহা ধরাবাঁধা কথা। সমবায় কিন্তু নিত্য, উহার সম্বন্ধান্তর নাই। উহার নিজের স্বভাবেই অবস্থান—"স্বাত্মনা স্বরূপেণৈব বৃত্তির্ন বৃত্ত্যন্তরেণেত্যর্থঃ।" (প্রঃ পাঃ ভাঃ ও ন্যাঃ কঃ ৩২৮—৩৩০ পৃঃ) তাই হরিদাস কুসুমাঞ্জলির ৩।২২ কারিকার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "অভাবের (ইহা অন্য সমস্ত সম্বন্ধেরই উপলক্ষক) অধিকরণের সহিত স্বরূপই সম্বন্ধ, কারণ অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইলে অনবস্থা হইবে। বৈশিষ্ট্য (বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব) বলিয়া অভাবের সম্বন্ধ যদিও কল্পিত হইয়াছে, তথাপি সম্বন্ধধারা স্বীকার করিলে অনবস্থা আসিয়া পড়ে বলিয়া স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে।" ইহা কিন্তু প্রশস্তপাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। স্বরূপ-সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয়েরই স্বরূপই, অন্য কিছু অতিরিক্ত নহে। তাই মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন, "তাই স্বরূপসম্বন্ধ অতিরিক্ত কিছু নয়, কিন্তু তত্তৎকালাবচ্ছিন্ন তত্তদ্‌দেশস্বরূপই [স্বরূপ সম্বন্ধ]। স্বরূপসম্বন্ধের আবার সম্বন্ধান্তর অবশ্য বলিতে হইবে, এবং তাহাদেরও প্রত্যেকেই অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে, তাই অনবস্থা থাকিয়াই গেল, এরূপ আপত্তিও সম্ভব নহে। কারণ, স্বরূপ-সম্বন্ধের সম্বন্ধান্তর নিজ স্বরূপই, অতিরিক্ত কিছু নয়'—(ন্যাঃ কুঃ টীঃ পৃঃ ৮৬)।

মীমাংসকেরা বলেন যে, যদি সমবায়ী পদার্থদ্বয়ের স্বরূপই সমবায়, অন্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইবার আবশ্যকতা না থাকে, তবে আমাদের অভেদবাদই অঙ্গীকৃত

প্রাভাকরগণ কিন্তু সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায় ও সমবায় ভেদে সন্নিকর্ষ ত্রিবিধ—ইহা বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে রূপত্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব না থাকায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ শব্দত্বের অসদ্ভাব বশতঃ সমবেত-সমবায়ও নিষ্প্রয়োজন। আর যখন অভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই, এবং সমবায়ের প্রত্যক্ষত্বও (১০) সম্ভব নহে, তখন বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা অনাবশ্যক। তাঁহাদের এই মত কিন্তু তার্কিকেরা রূপত্বাদির সাধন করিয়া নিঃশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত-প্রকার সন্নিকর্ষই [প্রমাণসিদ্ধ হইল]।

এই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান আবার দুই প্রকার, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। এখন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের অব্যবহিত পরেই দ্রব্যাদির স্বরূপমাত্রকেই অবলম্বন করিয়া যে শব্দসংস্পর্শবর্জ্জিত সম্মুগ্ধ (অস্পষ্ট) জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্পক। [নির্ব্বিকল্পক এই নামের সার্থকতা হইতেছে যে] ইহাতে [বিকল্প অর্থাৎ] বিশিষ্ট কল্পনা থাকে না বলিয়াই ইহাকে নির্ব্বিকল্পক বলা হয়। তাহার (অর্থাৎ এই সংমুগ্ধ বস্তুজ্ঞানের)

হইল এবং ধর্ম্মস্বরূপ সম্বন্ধের অভাবই হইল, কারণ তাহা ধর্ম্মীর অতিরিক্ত হইল না—"অথ সমবায়িনোঃ স্বরূপমেব সমবায়ো নাম্নেন সম্বন্ধনীয় ইত্যুচ্যতে, তর্হি অঙ্গীকৃতোঽভেদবাদঃ। ধর্ম্মস্বরূপানুপ্রবিষ্টস্যাভাবপ্রসঙ্গশ্চ।" [শাস্ত্রদীপিকা-ব্যাখ্যাসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা অঃ ১ পাঃ ১ সূঃ ৪—পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য]।

বৌদ্ধেরা তাই সম্বন্ধীর অতিরিক্ত সম্বন্ধ অলীক কল্পনা—ইহা বলেন। তাঁহারা বলেন, সংযোগ নাই, কিন্তু সংযুক্তদ্রব্য আছে। সংযুক্তদ্রব্য দেখিবার পর সংযোগের যে জ্ঞান হয়, তাহা কল্পনা। আর যদি ধর্ম্মীর (terms) অতিরিক্ত সম্বন্ধরূপ ধর্ম্ম থাকিত, এবং তাহারা যদি ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন হইত—যেমন নৈয়ায়িক মীমাংসকেরা বলেন, তবে ধর্ম্মী ধর্ম্মস্বরূপই হইত, ধর্ম্ম বা ধর্ম্মিস্বরূপই হইত—কিন্তু ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম পৃথক হইলে তাহাদের অভেদ কল্পনা করা ব্যাঘাতদোষদুষ্ট (contradiction)। আর অভাব যদি ভূতলাদি ধর্ম্মীর স্বরূপই হয়, তবে ভূতল অভাবাত্মক হইয়া যাইবে, কিংবা অভাব ভাবাত্মক হইবে। তাই সম্বন্ধ বা অভাব বস্তু নহে, উহা বিকল্প—বস্তু হইলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের অভেদ কি করিয়া হইবে? পাশ্চাত্য দার্শনিক Bradley ও তাঁহার Appearance and Reality নামক গ্রন্থে এইরূপ সম্বন্ধের অলীকত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—"A relational way of thowght—any one that moves by the machinery of terms and relations, must give appearance and not truth." (Ch. III) সম্বন্ধমূলক চিন্তা মাত্রেই যাহা সম্বন্ধী [ধর্ম্মী (Subject) ও প্রতিযোগী]

কল্পনাবলে প্রবৃত্ত হয়—তাহা মায়ার-(অবস্তুর)ই পরিচয় দেয়, সত্যের নহে।"

(১০) প্রভাকরের মতে **সমবায় অপ্রত্যক্ষ**। প্রশস্তপাদও ইহাকে অনুমেয়ই বলিয়াছেন। সত্তাদির যেমন প্রত্যক্ষ বস্তুতে সম্বন্ধান্তর (সমবায়) হয়, ইহার তেমন থাকে না বলিয়া ইহা অতীন্দ্রিয়; আর সমবায়-বিষয়ক সংবেদনও (অনুব্যবসায়ও) হয় না, অতএব ইহবুদ্ধ্যনুমেয় সমবায়। ন্যায়কন্দলীকারও তাই বলিয়াছেন যে 'যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযোগের প্রতিভাস হইয়া থাকে, সেইরূপ সমবায়ের প্রতিভাস হয় না। কারণ সম্বন্ধীদের পিণ্ডীভাবই উপলব্ধ হয়, অতএব ইহা অপ্রত্যক্ষ।' [অতএবাতীন্দ্রিয়ঃ সত্তাদীনামিব প্রত্যক্ষেষু বৃত্ত্যভাবাৎ স্বাত্মগতসংবেদনাভাবাচ্চ। তস্মাদিহবুদ্ধ্যনুমেয়ঃ সমবায় ইতি। প্রশস্তভাষ্য পৃঃ ৩২৯]। ন্যায়কন্দলী—"স্বাত্মগতসংবেদনাভাবাচ্চেতি - যথেন্দ্রিয়েণ সংযোগপ্রতিভাসো নৈবং সমবায়প্রতিভাসঃ, সম্বন্ধিনোঃ পিণ্ডীভাবোপলম্ভনাৎ, অতোঽয়মপ্রত্যক্ষঃ"—৩৩০ পৃঃ।

পর শব্দস্মরণসহকারে 'ইহা রক্ত (লাল)' 'ইহা ঘট' এইরূপ জাত্যাদি-(বিশেষণ)-বিশিষ্ট বস্তুবিষয়ক যে সুব্যক্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা (ইহাতে জাত্যাদিবিশেষণ-বিশিষ্টরূপে কল্পনা বিদ্যমান বলিয়া) সবিকল্পক (১১)।

এখন শাব্দিকেরা (বৈয়াকরণগণ) বলেন যে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অসম্ভব। তাঁহাদের উক্তি এই যে "জগতে এমন কোনও প্রত্যয় (জ্ঞান) হইতে পারে না, যাহাতে শব্দের অনুগম (সম্পর্ক) থাকে না।" (বাঃ পঃ কাঃ ১ শ্লোক ১২৪)। কিন্তু এ মত যুক্তি-হীন। কারণ যদি পূর্ব্বে বস্তুর জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে শব্দস্মরণের হেতুই উঠিতে পারে না। [তাই সবিকল্পক জ্ঞানের কারণী-ভূত শুদ্ধ বস্তুমাত্রবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে]। সৌগত (বৌদ্ধ)-গণ কিন্তু কেবল নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ (প্রমাণ) বলিয়া স্বীকার করেন। এই মতও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, ইহার (সবিকল্পের) প্রত্যক্ষত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; তাই ইহার (প্রত্যক্ষত্ব) নিষেধ করিলে লোকবিরোধ (অনিবার্য্য) হইয়া পড়ে (১২)।

তাই উক্ত হইয়াছে যে 'শশী চন্দ্রশব্দ-বাচ্য, ইহা যিনি নিষেধ করিতে পারেন, তিনিই সবিকল্পকের প্রত্যক্ষত্ব নিবারণ করিতে সাহসী হইবেন' [অর্থাৎ চন্দ্র শব্দের অর্থ শশী নহে, এ কথা বলা যেমন দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নহে, এ কথা বলাও

---

(১১) **সবিকল্পক**—ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের অনন্তর যে বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা নির্ব্বিকল্পক। এই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে সামান্য-বিশেষাত্মক বস্তুর স্বরূপমাত্র গ্রহণ হইয়া থাকে—সামান্য (সত্তা, বস্তুত্ব ইত্যাদি) ও বিশেষ (গোত্ব, অশ্বত্ব) ইত্যাদির নিশ্চয় হয় না, কিন্তু সংমৃগ্ধভাবে (অপৃথগ্‌ভাবে) উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন কিন্তু বিশেষের জ্ঞান হয় না, তাহা হইলে গোপ্রত্যক্ষে 'ইহা অশ্ব নহে' এইরূপ প্রতীতি হইয়া যাইত; সামান্যেরও প্রতীতি হয় না, কারণ অন্যগো-ব্যক্তিতে ইহার অনুবৃত্তি (continuity) উপলব্ধ হয় না। কিন্তু সমস্ত বস্তুই সামান্য-বিশেষাত্মক বলিয়া সামান্যেরও গ্রহণ হয়—কিন্তু নিশ্চয় হয় না। পরে সবিকল্পক জ্ঞানে পূর্ব্বদৃষ্ট সামান্যের চক্ষুরাদিগৃহীত সামান্যের সহিত ঐক্যজ্ঞান হয়—'ইহা গোরুই' এই-রূপ। কিন্তু এই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, কারণ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। কুমারিল ভট্ট ইহার একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন—প্রথমে আলোক হইতে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া যে ঘরের ভিতরে অবস্থিত বস্তুসমূহের জ্ঞান হয়, তাহা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানস্থানীয়। পরে তাহাদের স্পষ্টজ্ঞান সেও, ইন্দ্রিয়-সাহায্যেই হয়—তাহা যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি সবি-কল্পক জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, ইহা বলিতে হইবে। বৌদ্ধেরা কিন্তু—নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে স্বলক্ষণের (Particular) মাত্র গ্রহণ হইয়া থাকে; সামান্য কল্পনামাত্রসিদ্ধ, তাহার জ্ঞান পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত সাদৃশ্য স্মরণ হইলে হইয়া থাকে—ইহা বলেন। (শ্লো° বা° প্রত্যক্ষ, শ্লো° ১১২-১৩১; শাস্ত্রদীপিকা, ১।১।৪৩৭-৪৩ পৃঃ, ভা° চি° পৃঃ ২০-২১)।

(১২) বৌদ্ধেরা সবিকল্পক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলেন না। কুমারিল ভট্ট বলেন, ইন্দ্রিয়ব্যাপারজন্য হইয়াও যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষ না হয়, তবে নির্ব্বিকল্পকও প্রত্যক্ষ হইবে না। আর শব্দব্যবহারের একমাত্র নিয়ামক লোকব্যবহার; কোন্ শব্দের কি অর্থ, ইহা বৃদ্ধব্যবহার হইতেই জানিতে হইবে, যদি ব্যব-হারবিরোধী কল্পনা করা হয়, তবে লোকবিরোধ হইবে। আর লোকবিরোধ যদি দোষের না হয়—তবে চন্দ্র শব্দ শশীকে বুঝাইবে না, অন্য কোন শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। "বৃদ্ধপ্রয়োগগম্যাশ্চ শব্দার্থাঃ সর্ব্ব এব নঃ।

তেমনি]। আর সবিকল্পক জ্ঞানের পরই অর্থক্রিয়া (১৩) সম্ভব হয়, ইহা দেখা যায় এবং অর্থক্রিয়াকারিত্ব(১৩)ই প্রামাণ্যের লক্ষণ। তাই সবিকল্পকের প্রামাণ্য নিবারণ করা অসম্ভব। এখন আপত্তি হইতে পারে যে, 'অর্থ হইতে ইহার অত্যন্ত ব্যবধান না থাকায় সবিকল্পকের অর্থক্রিয়াকারিত্ব দৈবাগত মাত্র (*accidental*), স্বাভাবিক নহে। বস্তুতঃ কিন্তু এই বিকল্প মিথ্যা (ভিন্ন কিছুই নহে); কারণ, ইহার বিষয় সামান্য প্রভৃতি একেবারে অবস্তু।' কিন্তু এই আপত্তি অচল। কারণ, [বিকল্প মাত্রেই যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে] অনুমানও বিকল্প বলিয়া অপ্রমাণ হইবে, [কিন্তু অনুমানের প্রামাণ্য বৌদ্ধেরও সম্মত]। আর সামান্যাদির বস্তুত্বও আমরা [প্রমাণের দ্বারা] সাধন করিব। অতএব সবিকল্পক যে প্রমাণ, ইহা নিশ্চিত।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, '[হৌক্ সবিকল্পক প্রমাণ], কিন্তু তথাপি ইহাকে প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যাইতে পারে না। কারণ, নির্ব্বিকল্পক [প্রত্যয়] মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ থাকে বলিয়া ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জন্য হইতে পারে না। আর পরম্পরায় ইন্দ্রিয়জন্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলে, অনুমান প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষত্ব প্রসক্ত হইবে।' এই আপত্তিও অসম্ভব; কেননা পঙ্কজাদি শব্দের 'প্রত্যক্ষ' এই শব্দেও আমরা যোগরূঢ়ি (১৪) স্বীকার করিব, তাহাতেই অনুমান

তেন যত্র প্রযুক্তোঽয়ং ন তস্মাদপনীয়তে ॥ সিদ্ধানুগমমাত্রং হি কর্ত্তুং যুক্তং পরীক্ষকৈঃ। ন সর্ব্বলোকসিদ্ধস্য লক্ষণেন নিবর্ত্তনম্ ॥" (শ্লোক° বা°, শ্লো ১৩২-১৩৩)

(১৩) **অর্থক্রিয়া**—অর্থ = প্রয়োজন, তাহার ক্রিয়া অর্থাৎ সম্পাদন, প্রয়োজন সম্পাদন **কারিত্বই** প্রমাণের লক্ষণ। সমস্ত প্রমাণব্যবহারের পর্য্যবসান হয় এই অর্থক্রিয়াকারিত্বে—অর্থাৎ, হয় কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয় বা কোন অনর্থের নিবৃত্তি হয়। যখন এই সবিকল্পক জ্ঞানেরই অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভব হয়—তবে তাহাকে অপ্রমাণ বলা অনুচিত। বৌদ্ধেরা অর্থক্রিয়াকারিত্বই সদ্বস্তুর লক্ষণ বলেন, অথচ এই অর্থক্রিয়াকারী সবিকল্পক জ্ঞানকে অপ্রমাণ বলেন, ইহা বিচিত্র—এই কথাই মীমাংসকেরা বলেন। বৌদ্ধেরা বলেন যে, সবিকল্পক জ্ঞানের অর্থক্রিয়াকারিত্ব নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রসাদেই, কারণ মণিপ্রভায় মণিজ্ঞান হইয়া যেমন মণিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সে জ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায় না; সেইরূপ সবিকল্পক নির্ব্বিকল্পকপ্রসূত বলিয়া স্বলক্ষণের প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়, কিন্তু তাহা পরম্পরায়। অনুমানও এইরূপ পরম্পরায় বস্তুপ্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয় বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনুমানের সহিত সবিকল্পকের ভেদ এই যে, অনুমান লিঙ্গদর্শনের পর লিঙ্গের সহিত অবিনাভূত বস্তুর জ্ঞান বলিয়া, তাহার ব্যভিচার হইতে পারে না, কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞানে যে সমস্ত বিকল্প প্রবেশ করিতে পারে, তাহারা যে সকলেই স্বলক্ষণের প্রাপ্তি ঘটাইয়া দিবে, এমন নাও হইতে পারে। আর যদি বস্তুপ্রাপ্তিই প্রামাণ্যের গমক হয়, তবে সবিকল্পককেও প্রমাণ বলা যাইতে পারে; কিন্তু যদি বস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞানই প্রামাণ্যের স্বরূপ হয়—তবে উহারা অপ্রমাণ। অনুমানও এইরূপ পরম্পরামাত্রেই প্রমাণ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে।

(১৪) **যোগরূঢ়ি**—শব্দের দ্বারা যে অর্থের বোধ হয় তাহার প্রতি শব্দই অসাধারণ কারণ। এই অসাধারণ কারণকে করণ বলা হয়। করণের লক্ষণ হইতেছে—যাহা ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণ, ইহা। ব্যাপারী (যাহার ব্যাপার) উভয়েই একই কার্য্য (ফল) সম্পাদন করে—(তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বং ব্যাপারঃ)। এখন শব্দের এই ব্যাপারকে **অভিধা** বলা হয়। বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ এই অভিধাকে প্রসিদ্ধ পদার্থাতিরিক্ত একটী স্বতন্ত্র পদার্থ

প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে গুরু (১৫) বলেন, 'পঙ্কজাদিতে রূঢ়ি নাই ; অবয়বশক্তির (১৪) দ্বারাই পদ্মে [পঙ্কজ শব্দের] প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। আর কুমুদাদিতে [যে পঙ্কজ শব্দের] প্রবৃত্তি হয় না, [তাহার কারণ] ঐ অর্থে [পঙ্কজ শব্দের] প্রয়োগ নাই বলিয়া।' কিন্তু [গুরুর] এই মত যুক্তিহীন ; কেননা, পঙ্কজ শব্দের পদ্ম অর্থে যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার সামগ্রী (১৬) কি, ইহা চিন্তা

বলেন। নৈয়ায়িক কিন্তু ইহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষ বলিয়া আত্মার গুণ ইচ্ছাতেই ইহার অন্তর্ভাব কল্পনা করেন। যাক্, এই অভিধার নামান্তর **শক্তি** ; এই এই শক্তি আবার ত্রিবিধ—কেবলসমুদায়শক্তি, কেবলাবয়বশক্তি এবং সমুদায়াবয়বশক্তিসঙ্কর। যখন অখণ্ড শব্দেরই অর্থ-বাচকত্ব দৃষ্ট হয়—এবং প্রকৃতি-(যাহার উত্তর প্রত্যয় হইয়া থাকে—ধাতু প্রভৃতি)-প্রত্যয় বিভাগ সম্ভব নহে, সেই সমস্ত শব্দে কেবলসমুদায়শক্তি স্বীকার করা হয়। এই কেবল সমুদায়শক্তির নামান্তর কেবলরূঢ়ি। উদাহরণ—ডিত্থ, ডবিত্থ, ইহাদের প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগ সম্ভব নহে।

যেখানে, ধাতু ও প্রত্যয় হইতেই সমস্ত অর্থ পাওয়া যায়—তাহার অতিরিক্ত অর্থ থাকে না, সেখানে পদের অবয়ব, ধাতু (প্রকৃতি) ও প্রত্যয়ের দ্বারাই সমস্ত অর্থের বোধ হয় বলিয়া তাহাকে অবয়বশক্তি বা যোগশক্তি বলে। যেমন—পাচক পাঠক—এখানে পচ্ ধাতুর অর্থ পাকক্রিয়া এবং অক-প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তৃত্ব, তাই 'পাচক' শব্দের অর্থ—পাককর্ত্তা। এখানে ধাতু ও প্রত্যয়ের অতিরিক্ত অর্থের বোধ হয় না। ইহা কেবলাবয়বশক্তি বা যোগশক্তির উদাহরণ। যোগরূঢ়ি কিন্তু অবয়বশক্তি ও সমুদায়শক্তির সংমিশ্রণে (সঙ্করে) প্রাপ্ত। যেমন 'পঙ্কজ' শব্দ ; ইহার অবয়ব বা যোগার্থ হইতেছে, যাহা পঙ্কজনিকর্ত্তৃ অর্থাৎ পঙ্ক হইতে জাত। কিন্তু কুমুদও পঙ্কজাত, অথচ তাহাকে পঙ্কজ বলা হয় না—পদ্মকেই বলা হয়। তাই অবয়বার্থের অতিরিক্ত পদ্মত্ববিশিষ্টরূপ অর্থের বোধ হইয়া থাকে বলিয়া সমুদায়শক্তিও কল্পনা করিতে হইবে। তাই পঙ্কজ শব্দের অর্থ, যাহা পঙ্কজাত ইহা কেবল নহে, কিন্তু যাহা পঙ্কজাত ও পদ্মত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ পদ্ম। প্রত্যক্ষ শব্দের যোগার্থ—যাহা অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে প্রতিগত—(অক্ষং প্রতিগতঃ)। কিন্তু সবিকল্পক যেমন পরম্পরায় অক্ষসম্বদ্ধ, অনুমানও তেমনি। অথচ অনুমানের 'প্রত্যক্ষ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ হয় না। তাই যোগশক্তি ছাড়া রূঢ়িও কল্পনা করিতে হইবে, যাহাতে অক্ষসম্বদ্ধ হইলেও 'প্রত্যক্ষ' শব্দের দ্বারা অনুমানের বোধ হইবে না, কিন্তু সবিকল্পকের হইবে। [রসগঙ্গাধর—পৃঃ ১৪১]

(১৫) **গুরু**—প্রভাকরকে গুরু এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মূলে পণ্ডিতসমাজে একটী কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। প্রভাকর কুমারিল ভট্টের শিষ্য ছিলেন। একদিন কুমারিল শবরভাষ্যের একটী পংক্তিতে 'তত্রাপি নোক্তং' (সেখানেও বলা হয় নাই), অত্র তু নোক্তং (এখানে কিন্তু বলা হয় নাই)—এইরূপ পাঠ দেখিয়া অর্থগ্রহ করিতে পারেন নাই। গুরুকে চিন্তান্বিত দেখিয়া প্রভাকরের বড়ই কৌতূহল হইল। পরে গুরু কোন প্রয়োজনে বাহিরে যাইলে, সেই অবসরে প্রভাকর ভাষ্যের ঐ পাঠ দেখিয়াই গুরুর সংশয় হইয়াছে ইহা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অনুমান করিয়া—ঐ পাঠের 'তত্র অপিনা উক্তম্, অত্র তুনা উক্তম্'—[সেস্থলে 'অপি' এই শব্দের দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে, এখানে 'তু' শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে] এইরূপ পদবিচ্ছেদ করিয়া পুঁথিতে লিখিয়া রাখিলেন। পরে ভট্ট এই পুঁথি দেখিয়া ঝটিতি অর্থ গ্রহণ করিয়া—সংশোধনকর্ত্তার অনুসন্ধানে প্রভাকরের কৃতিত্ব অবগত হইয়া তাঁহাকেই গুরু বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। তদবধি প্রভাকরের 'গুরু' এই আখ্যা প্রচলিত। স্বর্গগত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী কিন্তু দুইজন প্রভাকরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, একজন প্রাচীন, অপরটী নবীন। প্রাচীন প্রভাকরের কিন্তু কুমারিল ভট্টের মতের সহিত অনেক বিষয়ের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

(১৬) **সামগ্রী**—সমগ্রের ভাব অর্থে সামগ্র্য,

করিলে কেবল যোগার্থ মানিলেই চলিবে না, কারণ যোগার্থের কুমুদাদিতেও সম্ভাব থাকায় [পদ্মরূপ অর্থের সহিত] ব্যভিচার [অপরিহার্য্য]। তাই রূঢ়িকেও সামগ্রীরূপে কল্পনা করিতে হইবে। আর যোগার্থও যখন প্রতীতিসিদ্ধ, তখন তাহারই বা কি করিয়া পরিত্যাগ সম্ভব হইবে? অতএব উভয়েরই সিদ্ধি হইল। তাহা হইলে যোগরূঢ়ি শক্তির প্রভাবে প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পকেরই গ্রহণ হইবে, ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা করিলেও অনুমানাদির গ্রহণ হইবে না, ইহা সিদ্ধ হইল।

সবিকল্পক জ্ঞানে দ্রব্য, জাতি, গুণ, কর্ম্ম ও নাম এই পঞ্চ প্রকার বিকল্প হয় (১৭); যথা, 'ইনি বংশীধারী' 'ইনি গোপ' 'ইনি 'শ্যামবর্ণ' 'ইনি গাহিতেছেন' 'ইনি গোবিন্দ'—এইরূপ। প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষও ষষ্ঠ বিকল্প, ইহা কাহারও কাহারও মত। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেননা 'নাম'-কল্পনার মধ্যে ইহার অন্তর্ভাব হইবে। নামের দ্বারা পূর্ব্বানুভূত স্বরূপের স্মরণ হইলে বস্তুকে তাদৃশ স্বরূপবিশিষ্ট বলিয়া যে কল্পনা করা হয়, তাহাকেই 'নাম-কল্পনা' বলা হইয়াছে। তাহা হইলে 'ইনি গোবিন্দ', ইহার অর্থ 'যিনি গোবিন্দশব্দবাচ্য বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত ছিলেন, তিনিই এই [ব্যক্তি]', এইরূপ [দাঁড়াইতেছে]। কিন্তু যখন শব্দবাচ্যত্ব অংশে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বরূপ ও পররূপের ঐক্যজ্ঞানেই তাৎপর্য্য (ইচ্ছা) থাকে। তখন 'তিনিই ইনি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সুস্পষ্ট হইয়া যায়। এই প্রত্যভিজ্ঞা আবার সংস্কারসহকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একজ্ঞানরূপেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা আবার 'তিনি' এই জ্ঞান এবং 'ইনি' এই জ্ঞান, (এই জ্ঞানদ্বয়) উৎপাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'তিনি' এই জ্ঞানজননশক্তি সংস্কার-কৃত এবং 'ইনি' এই জ্ঞানজননশক্তি ইন্দ্রিয়কৃত, [এস্থলে ইহার বিচার] এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আবার বিবক্ষাভেদে কখনও ইন্দ্রিয়ের কখনও বা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ(জ) জ্ঞানের (১৮) করণত্ব হইয়া

স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্-প্রত্যয় করিয়া সামগ্রী এই পদ সিদ্ধ। ইহার অর্থ—কারণ-কূট, অর্থাৎ সমস্ত কারণের একত্র অবস্থান, যাহার অব্যবহিত পরেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। যেমন অঙ্কুরের উৎপাদন-কারণ বীজ, সহকারী-কারণ জল, পবন, ঋতু প্রভৃতি; সমুদয় সমাবেশে অঙ্কুররূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই কারণসমুদায়কে সামগ্রী বলা হয়।

(১৭) এই পঞ্চবিধ **বিকল্পের** কথা দিঙ্‌নাগ বোধ হয় প্রথমে প্রচার করেন। পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি 'নাম'বিকল্পের দ্বারাই সমস্ত গতার্থ হয়, ইহা প্রতিপাদন করেন। আর পাঁচ প্রকার বিকল্প স্বীকার করিলে বৌদ্ধের সিদ্ধান্তবিরোধ হয়—কারণ বৌদ্ধেরা জাতি প্রভৃতি মানেন না। শান্তরক্ষিত তাই অশেষবিধ প্রয়াস করিয়া শেষে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আচার্য্যের এই পঞ্চবিকল্প নামবিকল্পেরই রূপভেদ, কিন্তু আচার্য্য তৈর্থিক-(বিরুদ্ধধর্মাচার্য্য)গণের মতানুরোধে এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা বলিয়াছেন। কুমারিলের এই 'বিকল্প'বাদ বোধ হয় দিঙ্‌নাগ হইতে গৃহীত। তবে দিঙ্‌নাগের মতে যেমন বিকল্পগুলি মিথ্যা, কুমারিলের মতে কিন্তু তাহা নহে।

(১৮) **জ্ঞানের করণত্ব**—বাৎস্যায়নও জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়কে করণ বলিয়াছেন, কিন্তু হান

থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রমাণ (জ্ঞান) প্রত্যক্ষ, ইহা সিদ্ধ হইল।

গুরু (প্রভাকর) বলেন, 'সাক্ষাৎপ্রতীতিই প্রত্যক্ষ। মেয় (জ্ঞেয়), মাতা (জ্ঞাতা) ও প্রমা (জ্ঞান) এই তিনটীতেই অবস্থিত বলিয়া ইহা ত্রিপুট।' এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই 'সাক্ষাত্ত্ব' বলিতে কি বুঝায়? যদি বল, 'কেন, স্বরূপের জ্ঞানই সাক্ষাৎজ্ঞান। ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে (বিষয়ের) নিজ স্বরূপেরই জ্ঞান হয়। আর লিঙ্গাদি (জ্ঞান) হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে পরসম্বন্ধিরূপেই অগ্ন্যাদির ভান (জ্ঞান) হইয়া থাকে বলিয়া, তাহা অসাক্ষাৎজ্ঞান।' তাহাই যদি হয়, তবে নামাদির পরসম্বন্ধিরূপেই [সবিকল্পক বিষয়ের] ভান হয় বলিয়া সবিকল্পকও অসাক্ষাৎজ্ঞান হইবে। আর যদি পরসম্বন্ধিরূপে ভান হইলেও স্বরূপ জ্ঞানও থাকে [বলিয়া তাহা সাক্ষাৎজ্ঞান বল], তবে অনুমানাদিতেও স্বরূপজ্ঞানের (১৯) সদ্ভাব থাকায়, উহারাও সাক্ষাৎ জ্ঞান হইয়া যাইবে। আর আত্মা (জ্ঞাতা) ও স্বাত্মা (জ্ঞান), ইহাদের সমস্ত জ্ঞানেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এ কথার আমরা পরে খণ্ডন করিব, তাই এখানেই নিরস্ত হইতেছি।

(ত্যাগ) ও উপাদান (গ্রহণ)—ইহার প্রতি জ্ঞানকেই করণ বলিয়াছেন। তাই জয়ন্ত ভট্ট 'বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাণম্'—ইহা বলিয়াছেন। পার্থসারথি মিশ্রও "ধূমতজ্জ্ঞানদীনাং প্রমাণত্বং প্রমেয়জ্ঞানং ফলম্, তৎপ্রামাণ্যে তু হানাদিবুদ্ধঃ ফলম্"—এইরূপে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। (ন্যায়রত্নাকর—পৃঃ ৩৬০)

(১৯) অনুমানের বিষয় অর্থাৎ অনুমেয় কি, এ বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগ ও কুমারিল ভট্ট বিশেষ বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই—সাধ্যবিশিষ্ট ধর্ম্মীই অনুমেয়, অর্থাৎ বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতই অনুমানের বিষয় (conclusion)। পক্ষ (minor term), হেতু (middle term), সাধ্য (major term)—এই তিনটীর কারবারেই অনুমান সিদ্ধ হয়। এখন পক্ষ পর্বত তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন তাহার অনুমান হইতে পারে না। হেতুও প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং সাধ্যও সপক্ষে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে দৃষ্টই আছে। তখন কাহার অনুমান হইবে? ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর সম্বন্ধের অনুমান হয়, এ কথাও বলা যায় না। কারণ সাধনবাক্যে সম্বন্ধের নামতঃ বা ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা উল্লেখ থাকে না। ইহা কেহ বলেন না যে, 'পর্ব্বতস্যাগ্নিরস্তি' (পর্ব্বতের অগ্নি আছে) বা 'অগ্নিপর্ব্বতসম্বন্ধোঽস্তি' (অগ্নি পর্ব্বতের সম্বন্ধ আছে)। আর—উদাহরণ-বাক্যেও সম্বন্ধের লিঙ্গের সহিত ব্যাপ্তিও প্রদর্শিত হয় না। আর স্বতন্ত্র ভাবে সম্বন্ধের সাধন হইতে পারে না, কারণ সম্বন্ধমাত্র তো বিদিত। অতএব সম্বন্ধবিশিষ্ট ধর্ম্মীরই অনুমান হইবে, তাহার মধ্যে সম্বন্ধের অন্তর্ভাব থাকায় তাহারও বোধ হইবে, যেমন 'দণ্ডী' এই শব্দে দণ্ড-সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতীত হয়। এখন সাধ্যধর্ম্ম ও ধর্ম্মী—ইহারাই বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন হইয়া অনুমানের বিষয় হইবে। এখন কে বিশেষণ—কে বিশেষ্য, ইহাও বিচার করিয়া ধর্ম্ম বিশেষণ ও ধর্ম্মী পর্ব্বতাদি বিশেষ্য হইয়া থাকে—ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "তস্মাদ্ ধর্ম্মবিশিষ্টস্য ধর্ম্মিণঃ স্যাৎ প্রমেয়তা। সা দেশস্যাগ্নিযুক্তস্য ধূমস্যান্যৈশ্চ কল্পিতা॥" ॥৪৭॥ অর্থাৎ 'বহ্নিমান্ পর্ব্বত' এইরূপ আকারেই অনুমান হইয়া থাকে। উদ্দ্যোতকরের মতে 'অগ্নিমান্ ধূমঃ' এই আকারে অনুমান হয়। ধূম যদি বিশেষ্য হয়, তবে হেতুর পক্ষৈকদেশত্ব হইবে ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ ধূমবিশেষ (particular smoke) পক্ষ এবং ধূমসামান্যই হেতু, তাই হেতু ও পক্ষ এক হইল না। [নমু ধূমবিশেষ্যত্বে হেতোঃ পক্ষৈকদেশতা। নৈতদস্তি, বিশেষে হি সাধ্যে সামান্যহেতুতা॥ ৫০-৫০½] [শ্লোকবার্ত্তিক, অনুমানপরিচ্ছেদ, শ্লোঃ ২৪—৫০½]

এখন দেখা গেল, অনুমানের বিষয় সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট

'কল্পনাপোঢ় (কল্পনাশূন্য) অভ্রান্ত (জ্ঞান) প্রত্যক্ষ' ইহা বৌদ্ধদের লক্ষণ। 'কল্পনাপোঢ়' এই পদের দ্বারা সমস্ত বিকল্পের নিরাস হইতেছে, এবং 'অভ্রান্ত' পদের দ্বারা নির্ব্বিকল্পক হইলেও যে সমস্ত কেশোণ্ডুকাদি-জ্ঞান (২০) ভ্রম বলিয়া অভিমত, তাহাদেরও বর্জ্জন করা হইল। কিন্তু আমরা সবিকল্পকের প্রত্যক্ষত্ব সাধন করিয়াছি; তাই [সবিকল্পকে লক্ষণের অননুগম প্রযুক্ত বৌদ্ধদের প্রত্যক্ষ লক্ষণ] অব্যাপ্তিদোষ-দুষ্ট।

আর, 'ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি (২১) বিষয়ে যোগীদের ও ঈশ্বরের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য না হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান; তাই এই জ্ঞানেরও [লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা] সংগ্রহণ করিবার উদ্দেশে 'অপরোক্ষ-(২২)প্রমাব্যাপ্ত (জ্ঞান) প্রত্যক্ষ" এইরূপ [প্রত্যক্ষের] লক্ষণ করা আবশ্যক', ইহা তার্কিকেরা বলিয়াছেন। [তার্কিকের] এই মত যুক্তিশূন্য, কেননা, প্রত্যক্ষের দ্বারা (কেবল) বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধি হয়, ইহা নিয়ম; তাই অতীত প্রভৃতির প্রত্যক্ষত্ব ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। তাহা হইলে আমাদের কথিত প্রত্যক্ষ-লক্ষণই সমীচীন।

ইন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত সমস্ত দ্রব্য এবং ইহাদের জাতি এবং প্রায় গুণ ও কর্ম্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, ইহা বলা হইবে ॥৯॥

ধর্ম্মী, তাই স্বরূপের জ্ঞান এখানেও আছে। অতএব **স্বরূপজ্ঞান** থাকিলেই যদি সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, তবে অনুমানেরও প্রত্যক্ষত্ব হইবে।

(২০) **কেশোণ্ডুকাদিজ্ঞান**—আমরা অনেক সময়ে আকাশে কেশ বা জালের মত দেখি, তাহা কিন্তু একেবারে অসৎ। এইরূপ অসৎপ্রতীতি ভ্রম। (Hallucinations and Illusions).

(২১) মীমাংসকেরা **যোগিজ্ঞান** স্বীকার করেন না। তাঁহারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং একমাত্র ধর্ম্মপ্রতিপাদকত্ব প্রমাণ করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছেন; যোগীরা যোগপ্রভাবে অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইয়া যদি ধর্ম্মের উপদেশ করেন, তবে ধর্ম্ম বেদমাত্রগম্য, ইহা বলিতে পারা যায় না। এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ ঈশ্বর মানিয়াছেন। মীমাংসকের যোগিজ্ঞানের অনঙ্গীকার প্রৌঢ়িবাদই বলিতে হইবে। এ সমস্ত স্থলে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানভিক্ষুকথিত নীতিই অবলম্বনীয়। তিনি বলেন, যে শাস্ত্রের যে বিষয়ে অবাধিত তাৎপর্য্য, সে শাস্ত্র সে বিষয়ে প্রমাণ। মীমাংসা-দর্শন ধর্ম্মের স্বরূপ ও কর্ম্মকাণ্ডের যাথার্থ্য প্রতিপাদনে কৃতসংরম্ভ, তাই এ বিষয়েই উহার প্রামাণ্য। যোগিজ্ঞান বা ঈশ্বরের অনঙ্গীকার শাস্ত্রান্তরবাধিত, এ অংশে ইহা অপ্রমাণ। এইরূপ সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান ও পুরুষের অসঙ্গত্ব ও বিদ্‌বিভুত্বেই তাৎপর্য্য, ঈশ্বর-অনঙ্গীকারে নহে।

(২২) যোগীদের অতীন্দ্রিয় বা অসন্নিকৃষ্ট বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য নহে, অতএব তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—এই আশঙ্কায় নৈয়ায়িকেরা **অপরোক্ষ** জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকেরা কিন্তু যোগজ-ধর্ম্মরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়া এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য নহে। অতএব ঈশ্বরজ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ-লক্ষণে সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে 'অপরোক্ষ-প্রমাব্যাপ্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ' এইরূপ লক্ষণ প্রস্তাব করিয়াছেন। ঈশ্বরজ্ঞানের প্রামাণ্য ও প্রমাত্ব বা যথার্থানুভবত্ব আছে বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। তাই উদয়ন এইরূপ প্রমিতি প্রভৃতির লক্ষণ করিয়াছেন—

"মিতিঃ সম্যক্‌পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে॥" ৪।৫

মিতি অর্থাৎ প্রমাণফল হইতেছে সম্যক্ পরিচ্ছিত্তি বা যথার্থানুভব। তাহা জন্য বা অজন্য, ইহা অপ্রযোজক। তাই ঈশ্বরজ্ঞান জন্য না হইলেও প্রমিতি হইতে পারে। প্রমাসমবায়িত্ব অর্থাৎ প্রমার আশ্রয়ত্বই প্রমাতৃত্ব; প্রমাতাকে সমবায়ি কারণ হইতে হইবে, ইহা অনাবশ্যক। আর প্রামাণ্য অর্থাৎ প্রমাণত্ব হইতেছে—প্রমার সহিত অব্যভিচার বা নিত্য সম্বন্ধ। এরূপ প্রমার সহিত অযোগব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অসম্বন্ধের অভাব অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ ঈশ্বরজ্ঞানে আছে, তাই ঈশ্বরজ্ঞান প্রমাণ। প্রমাণ হইতে হইলে করণ হইবে, ইহার কোন নিয়ম নাই। তাই প্রমাণ প্রমার সহিত অযোগব্যবচ্ছিন্ন বা অব্যভিচরিত হইলেই হইবে, ইহার করণত্ব অন্যথাসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞানের সহিত প্রমার অযোগব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয় বলিয়াই প্রমাণ; তাই ভ্রমজ্ঞানের জনক ইন্দ্রিয়াদিকে প্রমাণ বলা হয় না। অতএব প্রমার সহিত অযোগব্যবচ্ছিন্ন হইলেই প্রমাণ হইবে—ইহা স্থির হইল। নৈয়ায়িকের প্রামাণ্যলক্ষণের ইহাই সারার্থ। মূলে ইহারই খণ্ডন করা হইয়াছে।

মীরাবাঈ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এ কি ভুল?—সে আসিয়াছে, হাসিয়া কাছে বসিয়াছে, নয়নের জলে হৃদয়ের সকল আকুলতা ঢালিয়া দিয়া তাহার চরণ দুটী ধোয়াইয়া দিয়াছি—এ কি আমার ভুল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—সে কি বাস্তবিক আসে নাই?……… কি জানি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার যেন অন্তরে-বাহিরে জাগরণে-স্বপনে মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া চোখ মুদিতে দেখি, সে অন্তর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখ মেলিতেই আবার কোন্ মেঘের আড়ালে মায়া-ছায়ার মত সে মিলাইয়া যায়!

না, এমনি করিয়াই চিরটা জীবন ও আমায় কাঁদাইবে।—আমি উহার জন্য জলিয়া-পুড়িয়া মরি, তাহাতে উহার কি?—আমার চেয়ে শতগুণে অধিকা আর কতজনই তো উহার আছে—আমাকে ভুলিতে তাহার কতক্ষণ লাগে?—জানি আমি, ওর স্বভাব ভাল মতই জানি—

ঔরন্ সঁ রস বতিয়াঁ করত হৈ,
হমসে রহে চিত-চোরী!

—আর সবার-সঙ্গে তার গলাগলি, রসের তরঙ্গ সেখানে উছলিয়া পড়ে—আমার বেলাতেই না যত চাতুরালী!

কিন্তু তবুও তার জন্যই যে মনটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে!—চেষ্টা করি, কিন্তু কই, তার উপর রাগ করিতে তো পারি না! সেই একদিনের চকিত মিলন আজ কতদিনের স্বপ্ন হইয়া রহিয়াছে, তবুও তো তাহার আশা ছাড়িতে পারি না। এখনও তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, এখনও ভাবি, এ প্রতীক্ষা মিথ্যা হইবে না, সে আসিবে, নিশ্চয় আসিবে।—চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিয়া এখনো তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলি—

দরস বিন দুখন লাগে নৈন।
জব সে তুম বিছরে মেরে প্রভুজী
কবহুঁ ন পায়োঁ চৈন।
সবদ সুনত মেরী ছতিয়াঁ কঁপৈ
মীঠে লাগে তুম বৈণ।

—তোমাকে দেখিতে পাই না, এই দুঃখে আমার দুটী চক্ষু যে ক্ষয়িয়া গেল। যেদিন তুমি আমায় ছাড়িয়া গিয়াছ, সেই দিন হইতেই এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো সোয়াস্তি পাই নাই। আজ বাহিরে এতটুকু শব্দ শুনিতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠে—এই বুঝি তুমি আসিলে; তোমার কণ্ঠস্বর যেন আমার কাণে মধু ঢালে!

এক টকটকী পন্থ নিহারূ
ভঈ ছমাসী রৈন।
বিরহ-বিথা কাসূঁ কহূঁ সজনী
বহ গৈ করবত ঐন্।

—একদৃষ্টে তোমার পথের পানে চাহিয়া থাকি—একটা রাত যেন ছয়মাস, সে যেন আর পোহাইতে চাহে না! আমার বিরহের বেদনা আর কাহাকে বলিব সখি—আমার কলিজার উপর দিয়া যেন দিন-রাত করাত চলিতেছে!

সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি করল মুরারি!

* * *

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদবয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ গুনি প্রাণ কান্দে, না যায় পাতিয়া॥
উঠি-বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ, ছার নারীজাতি।
ধন-জন-যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥

কেহ তো না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া!

* * *

পুন নাহি হেরব সে চান্দ বয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু, না রহে পরাণ।
আর কত পিয়া-গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হইল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ-পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥

এমনি করিয়া আশায়-নিরাশায় দুলিতে দুলিতে আর কত দিন কাটিবে?—

রাম মিলন রো ঘণো উমাবো
নিত উঠ জোউঁ বাটড়িয়াঁ।
দরসণ বিন মোহি পল ন সুহাবৈ।
কল ন পড়ত হৈ আঁখড়িয়াঁ॥

—তাহাকে পাইলে যে কি আনন্দ!—আজ বুঝি সে আসিবে, এই আশা লইয়া নিত্য পথের পানে চাহিয়া থাকি। দিন চলিয়া যায়, সে আর আসে না; অদর্শনের বেদনায় আমার এক তিলও সোয়াস্তি থাকে না, দুটী চোখ যেন আর কিছু-তেই শান্ত হইতে চাহে না!

তলফ্ তলফ্ কে বহু দিন বীতে
পড়ী বিরহ কী ফাঁসড়িয়াঁ।
অব তো বেগ দয়া কর সাহিব
মৈঁ হূ তেরী দাসড়িয়াঁ।

—ছটফট্ করিতে করিতে কত দিন তো কাটিয়া গেল, এখন বিরহের ফাঁস গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে। ওগো স্বামী, আর ভুলাইও না—আমি তোমার দাসী, একটীবার তুমি আমায় দয়া কর

নৈণ দুখী দরশণ কো তরসে
নাভি ন বৈঠে সাঁসড়িয়াঁ।

রাত দিবস যহ আরত মেরে
কব হরি রাখে পাসড়িয়াঁ।

—আমার দুঃখী দুটী নয়ন দরশনের তিয়াসায় শুকাইয়া মরিল, শ্বাস যেন আর ভিতরে থাকিতে চায় না।—দিনরাত তোমার কাছে আমার কেবল এই মিনতি বন্ধু. কবে তুমি আমাকে তোমার কাছে লইয়া যাইবে!

লগী লগন, ছূটন কী নাহীঁ
অব ক্যূ কীজে আঁটড়িয়াঁ।
মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর
পূরো মন কী আসড়িয়াঁ।

—বাঁধন পড়িয়া গিয়াছে, আর কি বাঁধন ছুটিবে? তবে আর কেন অমন বাঁকা পথ ধরিয়াছ? বন্ধু, আর দুঃখ দিও না, এবার মনের আশা পূরাও গো!

মিথ্যা তাহার আশা সখি!—এই বুঝি আমার নিয়তি।—

সজনী, কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নহি পাতিয়াই।
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জিবনক আশা।
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লুঁ
খোয়লুঁ এ তনু আশে।
হিমকর-কিরণে নলিনি যদি জারব
কি করব মাধবি মাসে।
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে।

—কিন্তু এত দুঃখের মাঝেও সেদিন পাইলাম আনন্দের এক ঝলক। সেদিন—

সোরত হী পলকা মেঁ মৈঁ তো
পলক লগী পল মেঁ পিউ আয়ে।
মৈঁ জু উঠী প্রভু আদর দেন কূঁ
জাগ পড়ী পির ঢূঁড় ন পায়ে।
আজ কী বাত কহা কহূঁ সজনী
সুপনা মেঁ হরি লেত বুলায়ে।

—পালঙ্কে শুইয়া ছিলাম, এইমাত্র চোখে পলক লাগিয়াছে, অমনি দেখি, বন্ধু আসিয়াছে; তাহাকে আদর করিব বলিয়া যেই উঠিয়াছি, অমনি জাগিয়া আর তাহাকে খুঁজিয়া পাই না! তবু সেদিনকার ভাগ্যের কথা আর তোমায় কি বলিব সখি, সে তো স্বপ্নে আসিয়াও আমায় ডাকিয়া নিয়া গেল!

শুন শুন কহি পরাণ সজনি
আজুক স্বপন রীত।
পিয়া আসি মোরে আলিঙ্গন করে
আনন্দে আকুল চীত।
বদনে বদন করয়ে চুম্বন
অধরে অধর দিয়া।
ভুজে ভুজ বান্ধি উরে উর ছান্দি
হিয়ার উপরে হিয়া।
হেনই সময়ে চেতন হইল
বুঝিতে নারিলুঁ কাজ।
কিয়ে হয়ে নহে এমত করয়ে
নিচয়ে নাগররাজ!

কিন্তু তবুও এ তো স্বপ্নের মিলন। এ মিলনে যতটুকু সুখ, তার শতগুণ যে দুঃখ। স্বপ্ন টুটিয়া যাইতেই যে—

পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব, কোথা যাব, কি উপায় করি!
পাইয়া পরাণনাথ পুন হারাইলুঁ।
আপন করমদোষে আপনি মরিলুঁ।

আমার এই বুকফাটা দুঃখ, এর এতটুকু আঁচও কি তাহার লাগিতেছে না? সেদিনের কথা কি সে

একেবারেই ভুলিয়া গেল? এতই যদি তার মনে ছিল, তবে আসিবার আশা দিয়া সে আমায় জীয়াইয়া রাখিয়া গেল কেন? সখি, তার মন কি পাষাণ?—বুঝি বা তাই!

দেখো সইয়াঁ হরি মন কাঠ কিয়ো।
আৱন কহি গয়ো অজহুঁ ন আয়ো
করি করি বচন গয়ো!
খান পান সুধ বুধ সব বিসরা
কৈসে করি মৈঁ জিয়োঁ।

—দেখ সখি, সত্যই বুঝি তাহার মন কাঠ হইয়া গিয়াছে। নহিলে আসিব বলিয়া গেল, কিন্তু আজও তো আসিল না; মিছামিছি কেন এত কথা সে বলিয়া গেল? সেই হইতে আমার খাওয়া-দাওয়া ঘুচিয়া গেল, শোধ-বোধ তলাইয়া গেল,—বল তো, আমি বাঁচি কি করিয়া?

বচন তুম্হারে তুমহিঁ বিসারে
মন মেরো হরি লিয়ো।
মীরা কহে প্রভু গিরধর নাগর
তুম বিন ফটত হিয়ো!

—তুমিই কথা দিয়াছিলে, তুমিই আজ তাহা ভুলিয়া গেলে; কেন এমন করিয়া আমার মনটী চুরী করিয়া নিলে? বোঝ না বন্ধু, তোমাকে না দেখিয়া আমার বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে!

বাস্তবিক, ভালবাসিয়া যে এত দুঃখ পাইতে হইবে, সে কথা আগে জানিতাম না। জানিলে কি সাধ করিয়া এ ফাঁদে পা দিতাম? যেথানে অমৃত, সেথানেই যে এত গরল উঠিবে, তাহা কে জানিত? আজ না বুঝিয়াছি—

মীরা মনমানী সুরত সৈল অসমানী।
জব জব সুরত লগে ব্বা ঘর কী
পল পল নৈনন পানী।
জ্যোঁ হিয়ে পীর তীর সম সালত
কসক কসক কসকানী।

—স্বেচ্ছাসুখের যে ভালবাসা, সে যেন ছলকিয়া পড়া জলের স্রোত! তাহার মাঝে স্থিরতা কোথায়? যখনই ওখানকার কথা মনে পড়ে, অশ্রুতে দুনয়ন ভাসিয়া যায়! বেদনা যে আমার বুকে তীরের মত বিঁধিয়া রহিয়াছে, আমাকে পলে পলে খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া মারিতেছে!

রাত দিৱস মোহিঁ নীঁদ ন আৱত
ভাৱে অন্ন ন পানী।
ঐসী পীর বিরহ তন ভীতর
জাগত রৈন বিহানী।

—দিন-রাতের মাঝে আমার চোখে আর ঘুম নাই, মুখে অন্ন-জল রোচে না। বিরহের ব্যথা এমন করিয়া সারা তনু ছাইয়া রহিয়াছে যে, জাগিয়া বসিয়া আমার রাত ভোর হইয়া যায়! তোরা কি জানিস্ সখি—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে?
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে'!
সই, এ কথা কহিলে নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে!
পিয়ার পিরিতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ।
কপট পিরিতি আরতি বাঢ়াঞা
মিরিতি সাধিনু কাজে।
লোকে চরচায়ে কুলের খাঁখার
জগত ভরল লাজে।
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।

কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেলুঁ।

এমন করিয়া আর তো ঘরে থাকিতে পারিতেছি না। গৃহ-পরিজন যেন বেড়া-আগুন হইয়া আমায় বেড়িয়া ধরিয়াছে ; মনের আগুনে আর কত কাল পুড়িয়া মরিব!—মিথ্যা তোমরা আমাকে আর প্রবোধ দিও না ; তোমরা তো জান না—

পরাণ-অধিক জাতি-প্রাণ-ধন
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার সেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বন্ধু বিনে
আর কেহো মোর নয়।
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হইয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়।
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোমরা কুলবতী দেখিলে কুমতি
কুল লইয়া থাক ঘরে!

পথে-ঘাটে ফিরিতে যদিই বা তোরা সে উদাসী বন্ধুর দেখা পাস্, তো তাহাকে একবার এই কথা বলিস্—

জোগিয়া নে কহিয়ো রে আদেস।
আউঁগী মৈঁ নাহিঁ রহুঁ রে
কর জটাধারী ভেস।

—উদাসীকে পাইলে এই কথাই তাহাকে বলিও, আর আমি ঘরে থাকিব না, জটা রাখিয়া যোগিনী হইয়া আমি তাহার কাছে আসিব!

চীর কো ফাড়ুঁ কন্থা পহিরূঁ
লেউঁগী উপদেস।
গিণতে গিণতে ঘিস্ গঈ রে
মেরী উঁগলিয়োঁ কে রেখ।

—আমি শাড়ী ছিড়িয়া কাঁথা পরিব, উদাসী বন্ধুর চেলা হইয়া তাহার নিকট হইতে উপদেশ লইব। আর কতদিন প্রতীক্ষায় ঘরে বসিয়া থাকিব? এই দেখ, তাহার দরুণ দিন গুণিতে গুণিতে আমার আঙ্গুলের রেখাগুলি পর্য্যন্ত ক্ষইয়া গিয়াছে!

মুদ্রা মালা ভেষ লূঁ রে
খপ্পড় লেউঁ হাথ।
জোগিন হোয় জগ ঢূঁড় সূঁ রে
রাবলিয়া কে সাথ।

—যোগিনীর বেশ লইয়া আমি গলায় মালা পরিব, হাতে খাপড়া লইব ; সেই উদাসী বন্ধুর সাথে সমস্ত জগৎ ঢুঁড়িয়া ফিরিব!

প্রাণ হমরা রহাঁ বসত হৈ
য়হাঁ তো খালী খোড়।
মাত পিতা পরিবার সূঁ রে
য়হী তিনকা তোড়।

—আমার প্রাণ পড়িয়া আছে সেইখানে, তাহার কাছে, এখানে তো শুধু এই দেহটা! মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেই বা আমার সম্বন্ধ কি!

আমি যদি ঘরের বাহির হইয়া যাই তো আমায় রোখে কে?—

তেরা কোঈ নহিঁ রোকনহার
মগন হোয় মীরা চলী।
লাজ সরম কুল কী মরজাদা
সির সে দূর করী।
মান অপমান দোউ ধর পটকে
নিকলী হূঁ প্রেম গলী।

—ওরে মীরা, আত্মহারা হইয়া তুই পথে চলিয়াছিস্, আজ তোকে ঠেকায় কে? লজ্জা-সরম, কুলের মর্য্যাদা সব যে তোর ভাসিয়া গেল! মান-অপমান দুয়ের মাথা খাইয়া আজ প্রেমের পথে তুই বাহির হইয়া পড়িয়াছিস্, তোকে আজ রোখে কে?

কিন্তু হায় রে, পদে পদে এত বাধাও জড়াইয়া ধরে! ঘরে আমার এক তিল সোয়াস্তি নাই; পথের বাহির হইয়াও আমার সেই জ্বালা?—এ কি, আমি যে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, কি করিয়া তাহার কাছে যাই, বল!—

গলী তো চার বন্দ হুঈ
মৈঁ হরি সে মিলুঁ কৈসে জায়।
ঊঁচী নীচী য়াহ রপটীলী
পাঁর নহীঁ ঠহরায়!
সোচ সোচ পগ ধরুঁ জতন সে
বার বার ডিগ যায়!

—চারদিক হইতেই যে পথ বুজিয়া আসিতেছে, আমি কি করিয়া তাহার কাছে যাই! উঁচু নীচু এই পিছল পথ, পা যে এখানে দাঁড়াইতে চাহে না। কত ধেয়াইয়া ধেয়াইয়া যত্ন করিয়া পা ফেলি, কিন্তু বার বার যে সে পিছ্‌লাইয়া পড়ে!

ঊঁচা-নীচা মহল পিয়া কা
হম সে চঢ্যা ন জায়।
পিয়া দূর পন্থ ম্হাঁরা ঝীনা
সুরত ঝকোলা খায়!

—বন্ধুর মহল কখনও দেখি উঁচু, কখনো নীচু; আমি যে তাহার কোন সন্ধি পাইলাম না, চড়ি কি করিয়া?······ওঃ, বন্ধু আমার কতদূর! সঙ্কীর্ণ এই পথ, আর অনুরাগ আমার চিত্তকে কেবল দোলা দিতেছে!

কিন্তু তবুও আমি তাহার আশা ছাড়িতে পারিতেছি না। ঘরের বাহির হইয়াছি যখন, আর কি মনে কর, ফিরিয়া যাইব? পথের বাধার কথা বলিতেছ? হায় সখি—

কুল-মরিযাদ   কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠক বাধা?
নিজ-মরিযাদ   সিন্ধু সঞে পঙরলু
তাহে কি তটিনি অগাধা?

সহচরি, মঝু পরিখণ কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি   পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন পূর!
কোটি কুসুম-শর   বরখিয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি?
প্রেম দহন-দহ   যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি।
বন্ধু পদতলে নিজ   জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ?

(ক্রমশঃ)

—:*:—

আত্মসমর্পণ

—):*:(—

আত্ম-সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে আধ্যাত্মিক বল সঞ্চারিত হয়। কাজেই সমর্পণে যাদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয় জড় হয়ে আস্ছে, তাদের সমর্পণে যে ভণ্ডামী আছে—এ অবধারিত সত্য। গুরুর কাছে এসে আত্ম-সমর্পণ করে শিষ্যের দু'রকম অবস্থাই দাঁড়িয়ে যায়। এক দেখি আলসে-কুঁড়ে সেবক—"কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে" এ ধরণের; তারা নিশ্চেষ্ট কেননা তাদের সমর্পিত-জীবন। আর এক ধরণের সেবককে দেখি—তাদের ভিতর কি নিদারুণ আকুলতা, পাওয়ার দরুণ যেন তাদের বুক ফেটে অবিরাম কান্না চল্ছে—কোন্ অনির্দ্দেশ্য প্রেরণার ইঙ্গিতে যেন তারা সদা-চঞ্চল। এ দুয়ের মাঝে কা'দের বল্ব খাঁটী, আর কা'দের বল্ব ভণ্ড? আদর্শ-সেবকের চরিত্র দেখে এটুকু বল্তে পারি, জড়ত্ব জিনিষটা মোটেই তাদের মাঝে স্থান পায় না।

চৈতন্যচরিতামৃতকার দুটী ছত্রে আত্মসমর্পণের বেশ সুন্দর একটী ভাব ব্যক্ত করেছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম-সম॥

সমর্পণ যাকে করি, তার সম হওয়াই সমর্পণের মূল তাৎপর্য্য। যোগ্য হতে যাওয়া, আর যোগ্য করে তোলাই হল সেবক সেব্যের পরস্পর উদ্দেশ্য। সেবক-জীবন সফল হল কিনা তা বুঝব, সেব্যের আদর্শ সেবকের মাঝে সঞ্চারিত হল কিনা তা দেখে। সত্য-দ্রষ্টা মহাপুরুষের আশ্রয় নিয়ে সত্যের প্রতি যাদের অসাধারণ শৈথিল্য এসে পড়েছে, তারা খাঁটী সেবক কিনা, তা সহজেই অনুমেয়। এক কথায় বল্তে গেলে তুমি যদি খাঁটী সেবক হও, তাহলে সেব্যের জীবনের প্রত্যেকটী আদর্শের অমূর্ত্ত প্রেরণা তোমার মাঝে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ তিনি যা চেয়েছিলেন—তুমি তা হবে। এই হল আত্ম-সমর্পণ করে আত্মসম হওয়ার প্রকৃত অর্থ।

মনে-প্রাণে তুমি যার দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছ, সে-ও তোমায় মনে-প্রাণে টান্বে, এ ধ্রুব সত্য। দুটো শুভ-ইচ্ছার মহৎ সম্মিলনেই এ আধ্যাত্মিক বলের উৎপত্তি। তখন সেবক-ভক্ত পথের বাধাকে বাধা মনে করে না, কারও আশঙ্কামূলক কথায় কর্ণপাত করে না, চলার অফুরন্ত বেগ এসে তাকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করে নিয়ে চলে। সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারও হয়, কাজেই ভক্তের আকুলতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে এক অভিনব প্রেরণার উদ্দীপনাও দেখতে পাই। সেবক একদিকে আশায়-আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, অন্যদিকে নিশ্চিন্ত ভরসায় সদা-প্রফুল্ল—শান্ত-স্থির-ধীর। সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে তার ভিতর কিছু সঞ্চিত হয়েছে—তা বাইরে কাজে কর্ম্মে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আনন্দের অফুরন্ত যোগানই সাধনার আগুনে সদা-দগ্ধ সেবকের জীবনের একমাত্র সম্বল। সেবক যে নিত্য-নূতন কিছু পাচ্ছে—তার পরিচয় পাই তার আকুলতার স্পন্দন দেখে—আত্মোৎসর্গ কর্বার অনিবার্য্য আবেগ দেখে। ভিতরে তার অফুরন্ত বল যেন অবিরাম সঞ্চিত হচ্ছে—আর এই অক্ষয় ভাণ্ডারের সম্পদ্ নিয়েই সে কত গর্ব্বিত। আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর আত্মগৌরবও জাগে—এর মূল কারণই হচ্ছে গৌরব করার মত এমন কিছু অমূল্য সম্পদ্ সেবক তখন প্রাণে প্রাণে পায়।

সেবক একদিকে গর্ব্বিত, অন্যদিকে আবার বিনীত। দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর দিয়ে যখন সেবকের চিত্ত শুভ্র-স্বচ্ছ আয়নাটীর মত সাদা হয়ে যায়—তখন ইষ্টদেবের কল্যাণ-ইচ্ছা শুভ্র আলোর মত সেবক-চিত্তের সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিয়ে—প্রতি

কাজে-কর্ম্মে প্রতিফলিত হতে থাকে। এই আলোর রশ্মি পেয়েই সেবকের মুখ-মণ্ডল সদা-প্রফুল্ল।

সমর্পিত জীবনে অল্পে তুষ্টি আস্‌তে পারে না—কেননা সে দেখ্‌ছে, সে যত নির্ম্মল শুভ্র-স্বচ্ছ হচ্ছে—ওপর থেকে ততই তাঁর আলো পাচ্ছে। এমনি করে সেবকের ভিতর—"কৈ এখনও তো ঠিক্ যেন তার মনের মতনটী হতে পারিনি"—এই বলে একটা অনির্ব্বাণ আকুলতার ভাব লেগেই আছে। ইষ্টের কল্যাণ-কামনা এসে—শত পথ দিয়ে সেবকের চিত্তে বেদনার অনুভব জাগিয়ে তুল্‌ছে।

আত্মসমর্পণ যারা করেছে, তাদের ভিতরেই আত্মবলের উদ্বোধন। চৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায় বল্‌তে গেলে—তারাই প্রকাশতত্ত্ব, ইষ্টের অন্তরঙ্গ সহচর। ওপর থেকে তাদের ভিতরই অহরহ প্রেরণা আস্‌ছে—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বলও সঞ্চারিত হচ্ছে—এক মুহূর্ত্তের দরুণও তাদের বিশ্রাম নেই। এমন কি চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলেও তারা কর্ম্ম থেকে অবসর নেন না।

সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই যে ইষ্টদেব তোমায় সম করে নিলেন। এর পর থেকে তো তুমি আর তুমি নও—শুভ্র আয়নার মত বাহিরের দেহটাই পড়ে থাক্‌বে—আর "তুমি" বলে যে একটা কিছু সত্তা ছিল—তা তো ইষ্টের সঙ্গেই একীভূত হয়ে যাবে। বল্‌তে পার অবশ্য একদিক দিয়ে—এ তো তোমার ভিতর দিয়েই তোমার প্রকাশ, কিন্তু এ ক্ষুদ্র বালাইয়ের অভিমান রেখে তোমায় লাভ?

অভিমানের রক্তিম নেশা কাটিয়ে শুভ্র স্বচ্ছ হয়ে ওঠ। সাদা হয়ে যাও—দেখ্‌বে, সব রঙ্গের কি শুভ্র প্রতিফলন হয় তোমার মাঝে। অজীর্ণ নয়, পরিপাক কর্‌তে শিখ। নীলকণ্ঠের মত বিশ্বের হলাহল পান করেও—জগতের কল্যাণ-কামনায় তোমার চিত্ত অক্ষুব্ধ-শান্ত-স্থির-ধীর থাক্‌বে। সেবক হয়ে যে তোমার জীবনে কিছু লাভ হয়েছে তা বুঝ্‌ব দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মের খুঁটিনাটী মিটিয়েও যদি সকলের সঙ্গে অমায়িক-সরল ব্যবহার দেখ্‌তে পাই। সমস্ত বিশৃঙ্খলতাকে অসামঞ্জস্যকে মিটিয়েও যদি উপরি তোমার মাঝে এমন কিছু সদ্‌গুণ দেখি—তবে সেটুকুই বুঝ্‌ব তোমার সঞ্চয়—ওপর থেকে পাওয়া অমূল্য ধন।

তুমি আর তুমি থাক্‌বে না—এই হল সমর্পণের শেষ পরিণতি। কাজেই দীক্ষা যদি ঠিক্ ঠিক্ হয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই তোমার জীবন রূপান্তরিত হতে থাক্‌বে। তখনই তোমার আসল "তুমির" বিকাশ হবে।

অপ্রাকৃত দেহ তো সমর্পিত দেহকেই বলে। এই দেহ দিয়েই না আসল সেবা হয়। যোগ্য আধার বলেই তো যোগ্য সেবার অদম্য বাসনা ভিতরে জেগে উঠ্‌বে। "আমি না হলে তার চল্‌বে না"—এটা কি কম গৌরবের কথা? শ্রীরাধিকার ভিতর এত অভিমান জাগ্‌ত কেন—শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলে।

একদিকে যেমন অজস্র ভাবের আবেগ, আবার অন্যদিকে তেমনি অফুরন্ত কর্ম্মশক্তির বল সঞ্চারিত হবে। একদিকে ভাবের নেশা—অন্যদিকে ঘাড়ে কর্ম্মের বোঝা নিয়ে চল্‌তে হবে—তবে না তোমার ভাব-কর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবক-জীবন! দুটা শক্তির অভিঘাত চল্‌বে তোমার মাঝে—কাজেই বোঝ তোমাকে কত যোগ্য হতে হবে!

ফাঁকি দিয়ে বসে থাকবার অবকাশই যে হবে না তোমার, কেননা তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা যে মহৎ ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে। বসে থাক্‌তে চাইলেও তোমাকে বসে থাক্‌তে দিবে না, এই লড়াই সেবক জীবনে চিরকাল চল্‌বে। কিছু হওয়া না-হওয়ার পরখও তো এই দিয়েই। মোট কথা, তোমার দেহটা তখন তাঁরই ভাবের বাহনস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

ভিতর থেকে হুঙ্কার ছুটবে—গোপীদের গোব-

র্দ্ধন ধারণ করতে যাওয়ার মত "আধ্যাত্মিক-বিক্রম" অনুভব হবে প্রাণে প্রাণে—এক কথায় বলতে গেলে তোমার ভিতর আধ্যাত্মিক বলের ধারণা আসবে তখন। বসে থাকবে তুমি কেমন করে—কেননা তুমি যে অপরের হাতের পুতুল! তোমার জীবনের নিয়ন্ত্রণ-শক্তির ডোর যে ইষ্টের শুভ ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত।

আত্ম-সমর্পণে শুধু ভাবুকতা আনে না—ভাবকে বহন করবার মত যোগ্য শক্তিও উৎপন্ন করে। হজম করার শক্তিকে বাদ দিয়ে যখন প্রলোভনের বস্তুটাই একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে—তখনই পেটের অসুখ, মনের অসুখ। সেবক-জীবনে আর সমস্ত প্রলোভনকে অতিক্রম করতে পারলেও অনেকেই এসে একদিককার নিছক ভাবেই অভিভূত হয়ে পড়েন। বুঝতে হবে—তাঁদের ঠিক সমর্পণ হয়নি।

সমর্পণ যার হবে, ইষ্টের অফুরন্ত আবেশ হবে তার প্রাণে। এ আবেশ সেবক-জীবনে এক অনির্ব্বচনীয় রহস্য। ভাবুকের ভাষায়—

এ আবেশ যেন সেবকের "সর্ব্বেন্দ্রিয়কে গ্রাস করে, চিন্তাকে পথভ্রান্ত করে, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, ভাবরাশিকে আন্দোলিত করে।"

সমর্পণের ফলে "এইপ্রকার নেশা বা আবেশে যাকে না ধরে, তার হাত দিয়ে" প্রকৃত কাজ ফোটে না। "এ যেন কাঁচপোকায় তেল্যাপোকা ধরার মত। আবেশ ঘাড়ে ধরে করায়, না করে নিস্তার নাই।" সমর্পণের "আবেশ যেন ভিয়ানের পাক। এর ভিতর দিয়ে যে শব্দটা আসে, সেটা মিষ্ট, যে অলঙ্কারটা আসে, সেটা মিষ্ট, যে ছন্দটা ফুটে উঠে, তা মধুর।" সমর্পণের ফলে এই আবেশ যদি না প্রাণে জাগত, তবে সেবাব্রত সাধক-জীবন বিড়ম্বনাময় হত।

বিশ্ব ও বিশেষ

—:•:—

জগৎশুদ্ধ সকলকে ভালবাসিব, না যাহারা বিশেষ করিয়া আমার আপনার, তাহাদের জড়াইয়া ধরিব, ইহা একটা চিরন্তন সমস্যা। আদর্শের মোহ অনেক সময় মানুষকে তাহার সামর্থ্য-অসামর্থ্য সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ করিয়া ফেলে। বস্তুর যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতেও অনেক সময় গোল হয়। এই জগৎটাই আমার—এই কথাটা বেশ গালভরা; এই আদর্শ দ্বারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নীড়ছাড়া করা মানব-সমাজের একটা সনাতন রীতি। ফলে আজ দেখি, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যেন গৃহবাসী আর গৃহত্যাগীর দুইটা দল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একদিন ছিল, গৃহবাসী অপেক্ষা গৃহত্যাগীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্রই নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইত; যাহারা ঘরে আছে, তাহারা মায়া-মমতার দাস হইয়া আছে, যাহারা ঘর ছাড়িয়াছে, তাহারা মায়ায় বাঁধন ফস্কাইয়া গিয়াছে, এইরূপ একটা মনোভাব এখনো সমাজে প্রবল। কিন্তু যুগে যুগে এই বিষয়েও নানা শঙ্কা উঠিয়াছে এবং যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার সমাধানও হইয়াছে। একদিন ছিল, যখন ঘরছাড়াদের পক্ষে ভালবাসাটা ছিল একটা গাল। আজ তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। প্রেমও যে একটা ধর্ম্ম, উহাও যে মানুষের মুক্তির পথ প্রসারিত করিয়া দিতে পারে,

এই কথাটা আজকাল একটু অতিরিক্ত জোরের সহিত প্রচার করা হইতেছে—বিশেষতঃ বাংলার intelligentsia মহলে। সুতরাং সমাজের এই মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার দরুণ ঘরছাড়াদেরও ঘর ছাড়িবার একটা অতিরিক্ত অজুহাত দেখানো প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমি মুক্তি চাই, তাই ঘর ছাড়িয়াছি—এ কথাটা বলিলেই চারিদিক হইতে সকলে হাঁ—হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং কথাটাকে একটু মোলায়েম করিয়া বলিতে হয়, "বিশ্ব-জগৎ আমারে মাগিলে কোথায় আমার ঘর" ইত্যাদি; অর্থাৎ বিশেষের বন্ধন আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি বিশ্বকে ভালবাসিব বলিয়া—এই হইল ঘরছাড়াদের আধুনিকতম কৈফিয়ৎ।

কথাটা সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাইকোলজি ঘাঁটিলে ইহার ভিতর হইতে আরো রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রথম কথাটাই এই, ব্যষ্টির প্রেম আর বিশ্বপ্রেম মানবজীবনে এই দুইটী বস্তুর বাস্তব মর্য্যাদা কতটুকু? যাহারা ব্যষ্টিকে জড়াইয়া আছে, কিম্বা যাহারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা কি দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব? একটী মনোভাব থাকিতে কি আর একটী থাকিতে পারে না? মানুষের মনটা একটা complex; অবিমিশ্র একটা মনোবৃত্তির আধিপত্য স্বাভাবিক নয়, অভ্যাসের ফল; অভ্যাসে যাহা দাঁড়ায়, তাহাকেই আমরা আদর্শ বলিয়া প্রচার করি, কিন্তু স্বভাবে যাহা আছে, তাহারও একটা সুষমাপূর্ণ সুসমঞ্জস অভিব্যক্তি হইতে পারে না কি? চিরকাল ভাবুকদের এই সমস্যায় বিচলিত করিয়াছে। আনন্দমঠে জীবানন্দ-শান্তির জীবন একটা প্রহেলিকা; কবি তাহার জ্ঞানবুদ্ধি মত একটা মীমাংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেনই বা এই প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়, আর কবির মীমাংসাই বা কতদূর সঙ্গত, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না।

আমরা বলি, বিশ্ব আর বিশেষ এই দুইটার মাঝে সীমারেখা টানিলে সত্যের অমর্য্যাদা করা হয়, মানব-জীবনের সমগ্র রহস্যের প্রতি অন্ধ হইতে হয়। যে বিশেষকে ভালবাসে, সে বিশ্বকে ভালবাসিতে পারে না, কিম্বা যে বিশ্বকে ভালবাসে, সে বিশেষকে ভালবাসিতে পারে না, এই দুইটীর একটী পক্ষকে মাত্র একান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইলে এক পক্ষে যেমন মূঢ়তা, অপর পক্ষে তেমনি অরসিকতা প্রকাশ করা হয়। মানুষের জীবন বাস্তবিক এমন ভাগাভাগি হইয়া নাই। সমস্ত বিশেষের কেন্দ্র 'আমি'; বিশেষকে ভালবাসাই মানে আমাকে ভালবাসা, সাধু-ভাষায় যাহাকে বলে স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টার একটা মৌলিক নিমিত্ত বটে, কিন্তু উহাই তাহার সবখানি নয়। শুধু নিজের কথা ভাবিয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না, সে ঘরের কথাও ভাবে। নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, মানবজাতির প্রতি—এমনি করিয়া মানুষের কর্ত্তব্যের গণ্ডী ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে। আপনাকে প্রসার করিবার এই মৌলিক প্রেরণা অল্প-বিস্তর সকলের মাঝেই আছে। সুতরাং যে ঘর নিয়া আছে, সে পরের কথা ভাবে না, এ কথা সত্য নয়; অন্ততঃ আজকাল সমাজ-সংস্থান যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে বাধ্য হইয়া মানুষকে পরের কথা অনেকখানিই ভাবিতে হয়।

ঘরে থাকিয়া পরের কথা ভাবিলে ততটা আপত্তি দেখা যায় না; কিন্তু ঘর ছাড়িয়া যদি পরের কথা কেহ ভাবিতে সুরু করিয়া দেয়, তাহা হইলেই মমতা-প্রবণ মানবজাতির মাথায় টনক নড়ে যেন। তখনই নানা ছল ধরিতে হয়, justification খুঁজিতে হয়! যাহারা কড়া আদর্শবাদী, তাহারা বলে, পরের কথা যদি ভাবিতে হয় তো ঘরের কথা একদম ভাবিতে পারিবে না; পাটোয়ারী বুদ্ধির মানুষ জবাবে বলে, বিশ্বশুদ্ধ নর-কে যদি আপন করিয়া লই তো যাহারা

ঘরে আপন ছিল, তাহারাই বা বাদ পড়ে কোন যুক্তিতে? ঘরের লোক কাঁদিয়া বলে, তোমার উপর আমাদের দাবীই সর্ব্বাগ্রে; আমাদিগকে কাঁদাইয়া কি ধর্ম্ম লাভ হইবে মনে কর ইত্যাদি ইত্যাদি! এই সমস্ত বিভিন্নমুখী চিন্তার সংঘাতে মানুষের চিত্ত বিকল হইয়া যায়, এক পক্ষকে সে সন্তুষ্ট করিতে পারে তো আর এক পক্ষকে পারে না; কেহ বা হৃদয়টাকে পিষিয়া ফেলিয়া আত্মাভিমানের বোঝা বাড়ায়, কেহ বা ডুব দিয়া জল খাইয়া একূল ওকূল দুকূল বজায় রাখিবার চেষ্টা করে!

কিন্তু ব্যাপারটা তো আগাগোড়াই ফাঁকি। বিশেষকেই ভালবাসি আর বিশ্বকেই ভালবাসি; একটা অন্ধ হৃদয়াবেগ ছাড়া ভালবাসার আর কোনও তাৎপর্য্য আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে কি? যে দিগ্বিজয়ী পুরুষ বিশ্বের হিতে আপনার প্রাণ উৎসৃষ্ট করিয়া অগ্নিপিণ্ডের মত দেশবিদেশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, আর যে নারী একটীমাত্র ক্ষুদ্র গৃহস্থালীকে আপনার প্রেমে নিবিড় করিয়া নিপুণ ভাবে সাজাইয়া তুলিতেছেন, এই দুইয়ের জীবনকে যদি সত্যের তুলাদণ্ডে তৌল করা যায়, তাহা হইলে কোন্ পক্ষ ভারী হইবে, তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারে? যদি জ্ঞানের দিক দিয়া বিচার করি, তাহা হইলে বলিব, দুটাই তো মায়া! বিশ্বকে ভালবাসিলেই মুক্তি, আর বিশেষকে ভালবাসিলেই বন্ধন, এ শুধু বাহিরের লাভ-লোকসান খতাইয়া রায় দেওয়া মাত্র; সত্যিকার ভালবাসা জিনিষটা কি, তাহার সাধাই বা কি, সাধনই বা কি, কিছুই আমরা তলাইয়া বুঝি নাই, তাই ধাঁ করিয়া একতরফা রায় দিয়া বসিয়াছি।

আগে মানুষটাকে বিচার করি। মানুষ শুধু আত্মাই নয়, বা শুধু দেহই নয়; সে দেহও বটে; আত্মাও বটে; আবার এ দুইয়ের মাঝে যে প্রাণ ও মন রহিয়াছে, তাহাও বটে। জ্ঞানই বল আর প্রেমই বল, তাহার যেমন একটা নিরপেক্ষ সত্তা রহিয়াছে, তেমনি মানুষের জীবনস্তরের অভিব্যক্তি অনুযায়ী একটা আপেক্ষিক সত্তাও রহিয়াছে। সত্য দুইটিতেই পূর্ণ; একদেশদর্শনে সাময়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ স্বস্তি, পূর্ণ শান্তি কখনই মিলিবে না।

নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ প্রেম কি, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াও মানুষ কৃতকার্য্য হয় নাই; হয়ত সচ্চিদানন্দ বা আনন্দময় নিত্যচেতনা এই কথাটী জ্ঞান বা প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ। এই বস্তুটিকে ধরিবার জন্য মানুষ কত সাধ্য-সাধনাই করিতেছে, কিন্তু তবুও তাহার রহস্যের কূলকিনারা পাইতেছে না। বোধ হয় মানুষের পক্ষে কথাটা এই—জ্ঞান আর প্রেম নিরপেক্ষ অখণ্ড সত্তায় যেমন পূর্ণ হইয়া আছে, তেমনি আবার তাহা মানুষের দেহ-মন-প্রাণের ভিতর দিয়াও অভিব্যক্ত হইতেছে; এই দুইটীকে এক সঙ্গে দেখাই সহজ দর্শন বা পূর্ণ তৃপ্তি। নিরপেক্ষ অচঞ্চল সত্তায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া চঞ্চলের মাঝে দিয়া নিজকে প্রবাহিত করিয়া দেওয়াই জীবনের পূর্ণতম আস্বাদন; ইহার উপর আর কোনও কথা নাই। এই কথাটাই ভাঙ্গিয়া বলিতেছি।

ভালবাসা নিয়াই কথাটা উঠিয়াছিল, সুতরাং সেইদিক হইতেই আলোচনা করিব। আমি আত্মা, আমার অনুভবে যদি এই সত্য পূর্ণজাগ্রৎ মহিমায় জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে বলিতে পারিব, জগতের সবার সঙ্গে আমি এক; সে ঐক্য আত্মস্বরূপেরই ঐক্য, তাহাতে কোনও কামনা বা ধর্ম্মের বিক্ষোভ নাই। সমাহিত নিস্তরঙ্গ চিত্তে আমার এই ঐক্যানুভূতি ফুটিয়া উঠে; আমি বিশ্বকর্মা অতএব সর্ব্বব্যাপী, অচঞ্চল, শিব, শান্ত; ইহাকে জ্ঞান বল ক্ষতি নাই, কিন্তু বিষয়-বিষয়ী ভেদ ইহাতে থাকিবে না; ইহাকে প্রেমও বলিতে পার, ক্ষতি নাই,

কিন্তু সে প্রেম আনন্দময় অন্তরঙ্গ অনুভব ছাড়া লীলাচপলতায় কখনো ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। বিশ্ব-প্রেমের গোড়ার কথাটা এই।

এই অনুভব কর্ম্মাতীত ভূমির। কিন্তু এক-দিক দিয়া আমি যেমন কর্ম্মের অতীত, তেমনি আবার কর্ম্মের অধীনও বটে। তাই আমার এই স্বরূপানুভূতি কর্ম্মের সঙ্গে জড়িত হইয়া খণ্ডিত আকারে জগতে প্রকাশ পাইবে। ধর, এই অনু-ভব আমার বিশিষ্ট মনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে; মনের ধর্ম্ম অনুযায়ীই তখন আর আমি নিজকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিতে পারিব না। "আমার মন জগৎকে জড়াইয়া ধরিতে চায়" ইত্যাকার কথা ভাবের খিঁচুড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার বিশিষ্ট মন বিশিষ্ট কর্ম্মেরই ফল এবং বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রেই তাহা সক্রিয়। সুতরাং যে জ্ঞান বা প্রেম আমার মনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহার সহিত আর কতগুলি সমধর্ম্মী বিশিষ্ট মনেরই সংযোগ থাকিবে অর্থাৎ আমার মন দিয়া আমি শুধু আমার মনের মত গুটীকতক মানুষকেই ভালবাসিব, কেননা আমার মনের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। মনকে তাহার সীমার বাহিরে নিয়া যাও, তাহাতে মনের মনস্ব লোপ পাইয়া যাইবে; উহাতে মনোলয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাই পূর্ণ সত্য নয়। অমনীভাব যেমন আমার সিদ্ধ থাকিবে, তেমনি সমনীভাবও পূর্ণায়ত্ত থাকিবে. তবেই না জীবনে পূর্ণ তৃপ্তি, পূর্ণ সামঞ্জস্য আসিবে। তাই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমি যেমন বিশ্বকে আমার মাঝে অনুভব করি, তেমনি আমার মনের ভূমিকায় নামিয়া আসিয়া আমার বিশিষ্ট কয়েকটী অন্তরঙ্গ মনের মানুষকেই অনুভব করি। ইহা লজ্জা নয়, দর্শনের ন্যূনতা নয়, বিজ্ঞানের অবিসম্বাদী সত্য। এই অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বিচার শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেন, মহাপ্রভু করিতেছেন দেখিতে পাইতেছি। অর্ব্বাচীনের মত বলা চলে না, যে ইহাতে তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমে ঘাঁটতি পড়িয়া গেল।

বিপদ্ কোথায়? আরোহ-অবরোহের ক্রম আমরা জানি না, ইহাই বিপদ। মন দিয়া যাহাদের জড়াইয়া ধরিয়াছি, তাহাদের মাঝে যদি আমার মহিমাকে জাগ্রৎ বলিয়া অনুভব না করিতে পারি, তাহা হইলেই বিপদ্। বিলাসের অনুপ্রাণনায় মনের জগতে নামিয়া আসিয়াছি, আত্মদৃষ্টি যদি তাহাতে আচ্ছন্ন হয়, কিম্বা স্বেচ্ছায় স্বারাজ্যভূমিতে উঠিবার শক্তি যদি পঙ্গু হইয়া যায়, তাহা হইলেই বিপদ্। মনের মানুষ পাইয়া যে শুধু মনেরই তৃপ্তি, এবং সে তৃপ্তি মনের পক্ষে পূর্ণ হইলেও আমার দৃষ্টিতে যে খণ্ডিত, এই কথাটা যদি ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেই বিপদ্। নতুবা আত্মজ্ঞান দ্বারা বিশ্বকে গ্রাস করিয়া বিশ্বের মাঝে মনকে লীলায়িত করিয়া তোলার মত জীবনের পূর্ণতম আস্বাদন আর কিছুতেই নাই। বিশ্ব আর বিশেষের, ঘরের আর পরের দ্বন্দ্ব এইখানেই মিটিয়া যায়।

—*—

আরণ্যক

—):*:(—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা ৩।৩।২

চিত্ত একাগ্র হবে ধ্যানে। কোন মূর্ত্তির ধ্যান নয়, রূপের কল্পনা নয়—যেখানে শুধু নির্জ্জনতা আর অনন্ত নীলাকাশের দিগন্তব্যাপী নীলিমা রয়েছে, ধ্যানীর মন মজবে সেখানে। তুমি কিছু চাইবে না, সকলের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশে যাবে—এই তোমার চাওয়া।

যদি ঈর্ষ্যা-অভিমান না থাকে, তবে স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ সার্ব্বভৌম আনন্দ সবাইকে সবাই দিতে পারি। সংযম থাকে না, সমবেদনা হতে, ত্যাগ হতে ভ্রষ্ট হই বলেই তো ভোগের অবসর সুখের হয় না। আনন্দের মাঝে এই বিশেষত্বটুকু আন্‌তে হবে, যাতে সে ত্যাগ-ধর্ম্ম ভুলে না যায়।

* *
*

ভয় করি নিষ্ঠার অভাবকে, শিথিলতাকে। মানুষ দুদিন পরেই লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন হয়ে যায়। তখন আচার দিয়ে মোহকে ঠেকাতে হবে। অবান্তর লক্ষ্য জঙ্গম বস্তু; দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবর্ত্তিত হতে হতে চলেছে। তা হবেই, কিন্তু আসল লক্ষ্য ঠিক রাখ্‌তে হবে; লক্ষ্য রাখ্‌বে—প্রত্যেকটী দিনের যে-কোন পরিস্থিতিরই কেন্দ্রে যেন অটলপ্রতিষ্ঠ থাক্‌তে পারি, আনন্দ বা আত্মনিষ্ঠা হতে বিচ্যুত না হয়ে।

* *
*

জন্মার্জিত সংস্কারে বিস্মৃতি আনে। এক এক সময় এক-একটা ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। এই বহু-মুখী প্রবলতার মাঝেও একটা ঐক্যের সুর আছে—সেটী তোমার ব্যক্তিত্ব। তোমার ব্যক্তিত্বকে যত তুমি মহীয়ান্ কর্‌বে, পারিপার্শ্বিক তত তোমার অনুগত হবে। জগৎ তোমার বিরুদ্ধে নালিশ কর্‌বে না, বরং ত্যাগস্বীকার কর্ব্বে। সংস্কারের অতীত একটা মহামহিম ভাবের মনন সর্ব্বদাই সর্ব্বোর্দ্ধে বজায় রাখা চাই—তা থেকেই অনুভবের দ্বারা খুলে যাবে। গম্ভীর অনুভূতিই ক্ষুদ্রতার সংস্কারকে অপসারিত করে।

* *
*

জগতের সমস্ত অনির্ব্বচনীয় রহস্য পর্য্যায়ক্রমে একটী স্থানে নিবদ্ধ রয়েছে। চিত্ত যখন স্থির থাকে, একটা একটী করে রহস্য একেবারে চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে—তখন আমিই সর্ব্বজ্ঞের মতন বলে দিতে পারি, পরে কি হবে না হবে। আভাসে বুঝি, সমস্ত সমস্যার সমাধানই এ প্রশান্ত চিত্তের মাঝেই রয়েছে। যে যত শান্ত, সে তত জ্ঞানী। নিস্তরঙ্গ সত্তাই সকল রহস্যের বীজ।

* *
*

চিন্তার সঙ্গে চিন্তার যোগ রয়েছে—প্রমাণ পাই পারিপার্শ্বিক থেকে। আমি যে নিছক আমার মাঝেই আবদ্ধ নই, সকলের সংযোগেই যে আমার পরিপূর্ণ স্বরূপ তার প্রমাণ হয়;—আমার ব্যষ্টি-ইচ্ছার অনিবার্য্য আবেগ নিয়েই একলা আমি উর্দ্ধে উঠতে পারি না। "সমগ্র আমি"র সঙ্গে সন্ধি হওয়া চাই, তা না হলে শান্তির মাঝেও বিদ্রোহের উৎপাত আরম্ভ হয়। মোট কথা, কাউকে অস্বীকার কর্‌বার উপায় নাই।

—————:*:—————

বন্যার্ত্ত-সাহায্য

শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দেবী,	বর্দ্ধমান	৫৲
খুচরা সংগ্রহ		৵১৫
পূর্ব্ব জমা		১৮৷৴৫
সর্ব্বমোট		২৩৸০

ব্যয়ের বিবরণ—

প্রেসিডেণ্ট—ত্রিপুরা কংগ্রেস রিলিফ কমিটী

মায় মঃ কমিশন— ২৩৸০

উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে
দানপ্রাপ্তি

জেলা—কুচবিহার

গ্রাঃ দ্বিতীয় খণ্ড ভাঙ্গনী—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত সিংহসরকার ১৫৲ শ্রীযুক্তা মালতীময়ী দাসী ১০৲ শ্রীযুক্তঃ—কৃষ্ণগোবিন্দ বর্ম্মা (১ম দফা) ৪৲ চন্দ্রমোহন সরকার ৭৲ দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—সতীশ চন্দ্র সরকার, সেবারাম দাস, এছার উদ্দিন সরকার; সদানন্দ সরকার, হরচন্দ্র বর্ম্মা, শশীমোহন সিংহ, প্রেমানন্দ বর্ম্মা, শরৎ চন্দ্র বর্ম্মা, উমেশ চন্দ্র কবিরাজ, অভয় চন্দ্র দাস (২য় দফা), যোগেন্দ্র নাথ বর্ম্মা, শ্রীযুক্তা সত্যবতী দাসী। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—নন্দরাম কুড়ি, চন্দ্রকান্ত রায়, কেরু কুড়ি, সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দীনবন্ধু শর্ম্মাধিকারী, কান্দুর কুড়ি, রামনারায়ণ মাঝি, মুকুন্দ চন্দ্র সরকার, গুরুপ্রসাদ সরকার, হরকান্ত কুড়ি, সুকারু কুড়ি রামকিশোর বর্ম্মা, গুপ্তনারায়ণ বর্ম্মা, চন্দ্রমোহন বর্ম্মা, বৈকুণ্ঠ চন্দ্র সিংহ, বোধমোহন সিংহ, বাজার বর্ম্মণ, বোধমোহন বর্ম্মা, কালীকান্ত বর্ম্মা, জগমোহন কুড়ি, মহীকান্ত বর্ম্মা, গপাই বর্ম্মণ, গোবিন্দপ্রসাদ সরকার, ঈশান চন্দ্র কুড়ি, নলাই দাস, মহীকান্ত সরকার, খড়্গানারায়ণ দাস, পদ্মনাথ সরকার; কৃপানাথ সরকার ১॥০, ধর্ম্মনারায়ণ দাস ৮০, উমাচরণ মাঝি ।০ রায়চাঁদ বর্ম্মা ॥০।

গ্রাঃ ছোট আঠিয়াবাড়ী—শ্রীযুক্তাঃ—গিরীশ চন্দ্র অধিকারী ১০৲ মনোমোহন বর্ম্মা (১ম দফা) ১০৲ তম্বুরাম সরকার ৫৲ বিশ্বেশ্বর সরকার ৫৲ খছর মামুদ ব্যাপারী ৫৲ রামনাথ সিংহ (১ম দফা) ৩৲ সুরেন্দ্র নাথ সিংহ ২৲ গৌরকিশোর বর্ম্মা ২৲ লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী ২৲ পথীনাথ বর্ম্মণ ১॥০; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—রামকান্ত দাস, ধৈর্য্যনাথ বর্ম্মা নগেন্দ্র নাথ রায়, চুরকুটু বর্ম্মণ, পর্ব্বানন্দ কুড়ি, শ্রীমন্ত বর্ম্মণ, কৃষ্ণমোহন বর্ম্মা, হরেন্দ্র নাথ বর্ম্মা, পেন্দরা সেখ, মাকা বর্ম্মণ, সীতারাম দাস, খড়্গা নারায়ণ বর্ম্মা; রণমামুদ ॥০ পিসু দাস।০।

গ্রাঃ কিসামৎ দশগ্রাম—শ্রীযুক্তাঃ—বঙ্কিম চন্দ্র বর্ম্মণ ৫৲ সীতেশ্বর সরকার ৫৲ হরিমোহন রায় ৪৲ বজরু বর্ম্মণ ২৲ সতীশ চন্দ্র বর্ম্মণ ২৲ চন্দ্রমোহন রায় প্রামাণিক ২৲ গোদেং চন্দ্র অধিকারী ॥০

গ্রাঃ ১ম খণ্ড ভাঙ্গনী—শ্রীযুক্তঃ—মধুসূদন বর্ম্মা ২৲ গোপাল চন্দ্র সাহা বৈশ্য ২৲ মুকুন্দ চন্দ্র বর্ম্মা ১৲ পচা বর্ম্মা ১৲ নবীন চন্দ্র বর্ম্মা ॥০।

গ্রাঃ টিয়াদহ—শ্রীযুক্তাঃ—সূর্য্যনারায়ণ সিংহ ৪৲ উমেশ চন্দ্র দাস ৩৲ কমলেশ্বর দেবশর্ম্মা ২৲ গজেন্দ্র নাথ শীল ২৲ গৌরচাঁদ বর্ম্মা সরকার ২৲ কেতু বর্ম্মণ ॥০।

গ্রাঃ দিনহাটা দেবোত্তর—শ্রীযুক্তাঃ—চন্দ্রকান্ত বর্ম্মা ৩৲ বিজয় কুমার হিসাবিয়া ১৲ বলাই বর্ম্মণ ১৲ মুকুন্দ বাণিয়া ১৲।

গ্রাঃ লাঙ্গলিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—খগেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা, ধরণীকান্ত সরকার ২৲ পঞ্চানন বর্ম্মা ১৲ কৈলাস চন্দ্র রায় সরকার ১৲। গ্রাঃ সাতকুড়া—শ্রীযুক্তাঃ—ভুবনমোহন সিংহ কবিরাজ ২৲ হরিনন্দন সিংহ কবিরাজ ১৲ কামিনীকুমার সিংহ ১৲। গ্রাঃ কোয়ার্দলদহ—শ্রীযুক্তাঃ—রামকান্ত সরকার ২৲ হাওয়া বর্ম্মণ ২৲ কৃষ্ণপ্রসাদ বর্ম্মা ১৲। গ্রাঃ দুড়াচাপড়ি—শ্রীযুক্তাঃ—পঞ্চানন বর্ম্মা ৫৲ নবীন চন্দ্র বর্ম্মা ১৲ গদাধর বর্ম্মা ১৲ রাজচন্দ্র বর্ম্মা ॥০। গ্রাঃ নগরভাঙ্গনী—শ্রীযুক্তাঃ—সত্যনারায়ণ রায় সরকার ২৲ কালু মামুদ মিঞা ১৲ গমর উদ্দিন ॥০। গ্রাঃ গিতালদহ আঠিয়াবাড়ী—শ্রীযুক্তাঃ—গিরিধর বর্ম্মণ ২৲ কল্পনাথ বর্ম্মণ ১৲। গ্রাঃ ২য়খণ্ড ছিৎপুর—শ্রীযুক্তাঃ—চকরপতি বর্ম্মণ ৫৲ হর কান্ত বর্ম্মা পণ্ডিত ২৲। গ্রাঃ থাংরাখালমারি—শ্রীযুক্তাঃ পদ্মনাথ কুড়ি ১৲ গ্রাঃ কাড়িশাল—শ্রীযুক্তাঃ—যোগেন্দ্র নাথ বর্ম্মা ১৲ হরসুন্দর বর্ম্মা ১৲, গ্রাঃ আবুতারা—শ্রীযুক্ত মনমোহন সরকার ৫৲, গ্রাঃ থাংদশগ্রাম—শ্রীযুক্ত হারিয়া বর্ম্মণ ২৲, গ্রাঃ রাণীরহাট—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল ১৲, গ্রাঃ আঠিয়াবাড়ী—শ্রীযুক্ত কছান উদ্দিন ব্যাপারী ২৲, গ্রাঃ রাখালমারি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মোহন রায় ২৲; গ্রাঃ বড়শাকদল—শ্রীযুক্ত ধৈর্য্যনাথ রায় সরকার ২৲; গ্রাঃ বোরোডাঙ্গা—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় পাইকার (২য় দফা) ৫৲; গ্রাঃ খাং ফুলেশ্বরী—শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত রায় পাইকার ১৲।

——):•:(——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১১ই ১২ই ও ১৩ই পৌষ, বগুড়া সহর উপকণ্ঠে অবস্থিত উত্তরবাংলা সারস্বত-আশ্রমে, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠানুষ্ঠিত ভক্ত-সম্মিলনীর পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে, ইহা ভক্তগণকে অন্যত্র জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ১৫ই পৌষ "নারায়ণী যোগ"। তদুপলক্ষে "মহাস্থানে" দিগ্‌দিগন্ত হইতে করতোয়া-গঙ্গা স্নানার্থী বহু যাত্রীর সমাগম হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনুমান করেন যে, এই মহাযোগে যাত্রীসংখ্যা ২ লক্ষ হইতে তিন লক্ষ পর্য্যন্ত হয়। এই যোগ উপলক্ষ্যে উত্তরবাংলা সারস্বত-আশ্রম গৃহস্থ-ভক্ত শিষ্যগণের সহযোগে একটী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করিয়া নররূপী নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে বাসনা করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে বহু সেবকের প্রয়োজন, সুতরাং তজ্জন্য সেবামোদী ভক্তগণকে সানুনয়ে এই মহৎব্রত উদ্যাপনের জন্য সহায়তা করিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা এই সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের আরও তিন দিন অধিক কাল এখানে অবস্থান করিবার প্রয়োজন হইবে, সুতরাং তদনুসারে প্রস্তুত হইয়া আসিতে চেষ্টা করিবেন।

নিবেদক—

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী

অধ্যক্ষ—উত্তর বাংলা সারস্বত আশ্রম

বগুড়া

২২শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

পৌষ—১৩৩৬

সমষ্টি সং ২৩৫ | তৃতীয় সংখ্যা

অগ্নয়ে

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৪।৫

—:*:—
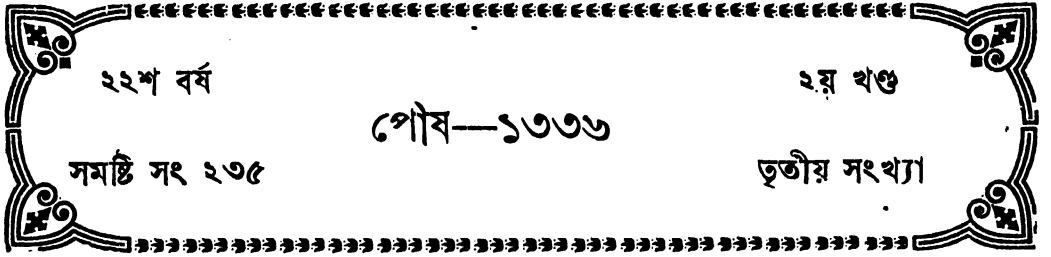
[বামদেব-ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

বৈশ্বনরায় মীড়্হুষে সজোষাঃ
কথা দাশমাগ্নয়ে বৃহদ্ভাঃ।
অনুনেন বৃহতা বক্ষথেন-
উপ স্তভায়দ্ উপমিন্ন রোধঃ॥

দীপ্ততেজা বৈশ্বানর সকলের পুরান কামনা,
কি করিয়া সবে মিলি করি আজি তাঁহার যজনা?
সুবিশাল নিয়ে কায়, এতটুকু খুঁত নাই যাতে,
দ্যুলোকে আছেন ধরে—স্তম্ভ যথা ধরে থাকে ছাতে!

মা নিন্দত য ইমাং মহ্যং রাতিং
দেবো দদৌ মর্ত্ত্যায় স্বধাবান্।
পাকায় গৃৎসো অমৃতো বিচেতা
বৈশ্বানরো নৃতমো যহ্বোঃ অগ্নিঃ ॥

আমি মর্ত্ত্য দীনহীন, আমারে যে দিয়াছেন ধন
স্বধাবান্ এ দেবতা—তাঁর নিন্দা করো না কখন!
মেধাবী, অমৃত তিনি, অনাহত তাঁর দিব্য জ্ঞান,
মানুষের মাঝে বল, যজনীয় কে তাঁর সমান?

প্র তাঁ অগ্নির্বভসত্তিগ্মজম্ভ-
স্তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ সুরাধাঃ।
প্র যে মিনন্তি বরুণস্য ধাম
প্রিয়া মিত্রস্য চেততো ধ্রুবাণি ॥

করাল দশন তব, হে দেবতা, তীব্রজ্বালা দিয়া,
অভক্ত নাস্তিক যারা, তাহাদের মার না দহিয়া!
জ্ঞানদীপ্ত বরুণের প্রিয় ধাম, নাহি তাঁর ক্ষয়,
আমাদের বন্ধু তিনি;—ইহাদের এ-ও নাহি সয়!

সাম দ্বিবর্হা মহি তিগ্মভৃষ্টিঃ
সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান্।
পদং ন গোরপগূঢ়ং বিবিদ্বান্
অগ্নির্মহ্যং প্রেদু বোচন্মনীষাম্ ॥

তীক্ষ্ণতেজা, কল্পতরু, মহাধনী, বীর্য্য অতুলন,
দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী, সে দেবতা, জানে সর্ব্বজন।
গোষ্পদের মত গূঢ় আছে হোথা যে মহতী গাথা,
জেনেছেন তারে তিনি, দিয়াছেন মোরে সে বারতা।

অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যন্তঃ
পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা
ইদং পদম্ অজনতা গভীরম্ ॥

ভ্রাতৃহীনা নারী যথা খুসী মত হেথা-সেথা যায়,
পতিরে বাসে না ভাল কুলশীল সব ধুয়ে খায়;
অমৃতে অসত্যে সেবি এ পাপীরা হয়েছে তেমন,
সুগভীর নরকের খাত এই করেছে খনন!

ইদং মে অগ্নে কিয়তে পাবকা-
মিনতে গুরুং ভারং ন মন্ম।
বৃহদ্দধাথ ধৃষতা গভীরং
যহ্বং পৃষ্ঠং প্রযসা সপ্তধাতু ॥

হে পাবক! দীনহীন, তবু আছি তব সেবা নিয়ে;
পুরায় কামনা মোর সপ্তধাতু ধনরাশি দিয়ে:
হোক্ না সে গুরুভার তবু তারে ছুঁয়ে-নেড়ে যাই;
দাও বিত্ত; মনাগুনে শত্রু যেন পোড়ে দেখে তাই!

—*—

প্রেম

—:—

ভালবাসার বিরুদ্ধে এক কঠিন অভিযোগ আছে—ভালবাসা মুক্তি-পথের বাধা। কৌতুকে হাসিয়া বৈষ্ণব বলেন, সত্যি কি তাই? এই দেখ, তোমার মুক্তিসাধনাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে নিকষিত হেমের মত আমার এই কাম-গন্ধহীন অকৈতব প্রেম। বন্ধনকে সত্য মানিয়া অন্তরের রসে রসাইয়া তাহাকে আমি আপন করিয়া লইয়াছি; আর তুমি মুক্তিকামনায় তাহার বেড়াজালে বন্দী হইয়া ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছ!

অবিশ্বাসীর আর এক অভিযোগ, মানুষে মানুষে যে ভালবাসা, তাই তো যত অনর্থের মূল; ভাল যদি বাসিতে হয় তো এই বস্তু-জগৎ হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া সেই চিরসুন্দরের পানে নিবদ্ধ কর—। জ্ঞানী বলেন, সত্য কথা। কিন্তু চিরসুন্দর তো হাত-পা গুটাইয়া মেঘলোকের ওপারে গম্ভীর হইয়া বসিয়া নাই। তুমি কাণা, তাই এ জগতের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কল্পনা করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছ; আমি দেখি, সেই তিনিই এই হইয়াছেন; মর্ত্ত্য হইয়া তিনি আমার মর্ত্ত্য প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন, আবার সেই মর্ত্ত্যের আড়ালেই অনন্ত, অভয়, অমৃত রূপে তিনি আমার হৃদয়ের সকল অমৃত শুষিয়া লইতেছেন। তুমি দেখিতেছ—বিচ্ছেদ, খণ্ডতা; আমি দেখিতেছি—অবিচ্ছেদ, পূর্ণতা। শুধু মানুষ কেন, আমার প্রেম একটা ক্ষুদ্র কীটকেও যে অনন্ত-ব্যাকুল আগ্রহে জড়াইয়া ধরে! বিশ্বের সকল জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হওয়ার আমার এই চরম পুরুষকার—আজ একটা ছাগশিশুর প্রাণের বিনিময়ে আত্মবিসর্জ্জন দিতে আমার সমস্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠে!

মর্ত্ত্য হইয়া আমি অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছি, সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি; এই আমার মনুষ্যত্বের মহিমা। তাই শিবের জটাজাল ভেদ করিয়া অমৃতলোকপ্রবাহিনী সুরধুনী কি করিয়া মর্ত্ত্যের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আমি মর্ত্ত্যের ভগীরথ, গম্ভীর শঙ্খনির্ঘোষে সেই অমৃতবার্ত্তাই মর্ত্ত্যে ঘোষণা করিতে চাই। স্বর্গে আর মর্ত্ত্যে ব্যবধান রাখিব না—মানুষের হৃদয়ে এই সঙ্গোপন কামনা। ঘোরারাবী রাবণের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই; সংসারে যাহারা কোলাহল করিয়া বেড়ায়, প্রেম তাহাদের কাছে লাঞ্ছিত। মর্ত্ত্যের বুকে অমৃতধারা বহাইলেন রাম, যিনি তোমার-আমার আত্মার আরাম;—প্রমত্ততার আরাব তিনি নন।

দুইটী ধারা আছে—সংযম আর আপ্যায়ন, পেষণ আর পোষণ। কোন্‌টী ভাল, তাহা লইয়া কলরবের আর অন্ত নাই। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট বুদ্ধি লইয়া কি সত্যের সন্ধান মেলে? অবস্থাভেদে দুইই সত্য। এই দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি লইয়া আমাদের কারবার। যদি ইহারা কলুষস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, শুদ্ধি কি প্রয়োজন নয়? প্রমত্ততা যদি আমায় রসাতলের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, সংযম কি প্রয়োজন নয়? কিন্তু তাই বলিয়া সংযমই একমাত্র ধর্ম্ম নয়। মর্য্যাদা-পথের পরেও আছে পুষ্টিপথের কথা। শুদ্ধ অনাবিল দেহ-মনের পক্ষে সংযম অনাবশ্যক; সে দেহ-মনে সংযম জীর্ণ হইয়া গিয়া শ্রীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলুষিত চিত্তের সংযম আয়াস; আর দিব্যভাব-সুবাসিত চিত্তের সংযম অনায়াস।

এই উপকরণ;—কেহ কামতর্পণে তাহাদের বিধ্বস্ত করে, কেহবা প্রেমের আরতিতে তাহাদিগকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। মূঢ়ের উপকরণ বর্জ্জনের

উপদেশ এখানে হাস্যকর। এই দেহ-মন-বুদ্ধি কিছু তোমার পথ আটকাইয়া রাখে নাই। ভাবশুদ্ধি কর, এই দেহই সুধাপাত্র হইয়া উঠিবে, মৃণ্ময় তনুতে চিন্ময়ের দ্যুতি ঝলকিয়া উঠিবে। মনু বলিয়াছিলেন, এই তনুকেই ব্রহ্মের অনুকূল করা যায় এবং করা উচিত। বেদ বলিতেছেন, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ আপ্যায়িত হউক, ব্রহ্মের পানে তাহারা যেন বাধা হইয়া না দাঁড়ায়। এইগুলি জ্ঞানীর কথা, প্রেমিকের কথা।

ভালবাসিতে গিয়া কেহ বা ভয় পায়, কেহ বা উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ততায় আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। অন্ধ সংস্কারে মানুষকে কাণা করিয়া রাখিয়াছে। কবে তাহার চক্ষু ফুটিবে—শিশুর মত বিশ্বস্ত সরল দৃষ্টিতে সে সত্যের পানে চাহিবে?

ভালবাসার তীব্রতম মাদকতা নর নারীর মিথুন সম্পর্কে, দেহের সম্বন্ধটা যেখানে অতিস্থূল। কেহ বা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে ধিক্কার দেয়, কেহ বা চাটু-বচনে তাহার বন্দনা গায়। সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে এই অপরূপ মায়ার সৃষ্টি; মানুষ ইহার রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিল কই?

জড়বাদী বৈজ্ঞানিক বলিলেন, এই দেহের ক্ষুধাটাই আদিম সত্য; যৌন আসঙ্গস্পৃহাই আদিরস। ইহাকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে গিয়া কোথাও মানুষ সৃষ্টি করিতেছে উন্মত্ত মনোবৃত্তি, কুৎসিৎ ব্যাধি, অদ্ভুত স্বপ্নবিকার; কোথায়ও বা ফুটাইয়া তুলিতেছে শৌর্য্য-বীর্য্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, শিল্প কলা, প্রীতি-ভক্তি।

চিন্ময়রস-রসিক বলিলেন, আত্মার আনন্দই আদিরস; দেহ বাধা বলিয়াই ক্ষুধা জাগায়। কামে যে এত উন্মাদনা, তাহার কারণ—প্রেমে আছে অনন্ত তৃপ্তি; আর ওই অনন্ত প্রেমকে ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া এই যৌন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি। বাস্তবিক যদি এই যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়া রাখিতে পার তো পুরুষ-প্রকৃতির সামরস্যজনিত আনন্দ আবার তোমার মাঝে ফুটিয়া উঠিবে। শক্তিহীনের কাম দমনের নিষ্ফল প্রয়াসের তির্য্যক্ অভিব্যক্তি ব্যাধিতে, মনোবিকারে, সে কথাও সত্য। কিন্তু জড়বৈজ্ঞানিক বলিতেছে, দেহটাকে মাজিয়া-ঘষিয়া আত্মার সৃষ্টি; আমি আত্ম-রসিক বলিতেছি, আত্মারই বিভূতি এই দেহ-মন-প্রাণ। দুজনার দর্শনেই তথ্য এক, কিন্তু দেখিবার ভঙ্গীটা আলাদা; আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা হইতেই বাস্তবজগতে আকাশ-পাতাল ব্যবধান লইয়া দুইটী বিভিন্ন আদর্শের আচারপদ্ধতি সৃষ্টি হইতেছে।

ভালবাসায় দেহটাই যে সর্ব্বস্ব, দেহ-সর্ব্বস্ব মানুষকে এ কথা আর নূতন করিয়া শুনাইতেই হয় না, এ সত্য তাহার আজন্মপরিচিত। এই যে আজ সাহিত্য-শিল্পে-কলায় সর্ব্বত্র দেহসর্ব্বস্ব ভালবাসার জয়ধ্বনি উঠিয়াছে, মানুষের কাছে এটা কি একটা বড় আবিষ্কার? জীবনের স্রোত মন্থর হইয়া গিয়াছিল, সংযম-সাধনা অভ্যস্ত আচারে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল; এই দেহসর্ব্বস্বতার দর্শন তাহারই মাঝে একটা আলোড়ন আনিয়াছে, তাই রসপিপাসী মানুষ ব্যাকুল হইয়া ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—মনে করিতেছে, এ বুঝি আধুনিক যুগের এক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার! সমাজের প্রাক্তন জীবন সহজ ও সুস্থ ছিল না বলিয়াই অতি সাধারণ সত্যও আজ অসাধারণত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইতেছে।

সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তি হিসাবেই বলি, সুস্থ সবল ও সহজ পারিপার্শ্বিকের মাঝে যাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, পেষণ-নীতি বা পোষণ-নীতি শিক্ষাদাতার বাতিকরূপে যাহার উপরে সঙ্গীন-চড়াও হইয়া পড়ে নাই, এই দেহবাদটা কিন্তু তাহার কাছে এমন অপরূপ কিছু বলিয়া মনে হয় না। দেহকে সে ঘৃণা করে না, কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। দেহ

তাহার কাছে আত্মার অনুচর মাত্র। আত্মার সহজানন্দে তাহার মাঝে ফোটে প্রেম; সে প্রেম সকলকে আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরে। প্রেম তাহার কাছে যৌন লিপ্সার হাহাকার নয়, তাহা অপরিমেয় অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি। যৌন আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি একটা বয়সের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু প্রেম শিশুর কোরক-জীবনকেও অমৃতময় করিয়া তুলিতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের ভেদটাকে একান্ত দেখাই যৌন লালসার মূল; কিন্তু সুকুমার শিশুর প্রেম সহজেই এই ভেদ অতিক্রম করিয়া যায়।

যদি বল, শৈশবের এই প্রেম অনভিব্যক্ত প্রচ্ছন্ন কামেরই রূপ, তাহা হইলে আমি নাচার; প্রেম হইতে কাম আসিয়াছে, না কাম হইতে প্রেম আসিয়াছে, এ প্রশ্নের মীমাংসা কোনও কালে হইবে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তবুও তোমাকে এই একটা জবাব দিতে পারি, শৈশবে যে প্রেম অঙ্কুরিত হয়, সকল আধারেই পরিণত বয়সে তাহা কামে পল্লবিত হয় না; জগতের সকল মনোবৃত্তিই অবদমিত-যৌনবৃত্তি নয়। তুমিই তো বলিতেছ, যৌনবৃত্তিকে জীর্ণ করিয়া প্রীতিফুল ফোটে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে এই প্রীতিকেই জীবনের রসায়ন রূপে গ্রহণ করিব না কেন? সংযমই তাহা হইলে সমাজিক জীবনের আদর্শ হইবে না কেন? মানুষের দেহটাই সব, এই কথাটা তাহা হইলে তো বড় নয়, কেননা এ কথার মাঝে অভিনবের কোনও ব্যঞ্জনাই নাই তো নাই; বরং এই কথাটাই বড় যে, মানুষ দেহের গণ্ডীতে জন্মিয়াও দেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, কামে তাহার জন্ম হইলেও সে প্রেমের সঞ্জীবনলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

গিরিশ ঘোষের "চৈতন্যলীলা"য় এ সম্পর্কে একটা সুন্দর বর্ণনা আছে। নিমাই গঙ্গাতীরে নৈবেদ্য কাড়িয়া পলাইতেছে; "হরিবোল" বলিয়া মেয়েরা তাহাকে ফিরাইল; তারপর নিমাইর হাতে কিছু কিছু নৈবেদ্য সকলেই তুলিয়া দিল। লক্ষ্মী দেবীকে দেখাইয়া একটী মেয়ে বলিল, "নিমাই এর নৈবেদ্যখানা নে না!" নিমাই একবার আড় চোখে তাকাইয়া বলিল, "ও হরি বলে না, ওর নৈবেদ্য আমি নেব না।" মেয়েটী লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী হরি বল তো!" লক্ষ্মী বলিল, "হরিবোল, হরিবোল—আমি নৈবেদ্য দেব না!" নিমাই তাচ্ছীল্যসহকারে বলিল, "আমি ওর নৈবেদ্য নেব না।" মেয়েরা জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ্ দেখি কি সুন্দর মেয়েটী! বিয়ে করবি একে?" নিমাই ছুটিয়া পলাইল। লক্ষ্মী চিত্রার্পিতের মত তাহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া মেয়েরা বলিল, "তাকিয়ে আছিস্ কেন? ও তো চলে গেল!" লক্ষ্মী বলিল, "ওই কি আমার বর?"

এদিকে পাপ আর ষড়রিপুর সভা বসিয়াছে। পাপের অধিকার কায়েম রাখিবার দরুণ কে কতটুকু সহায়তা করিয়াছে, তাহারই রিপোর্ট দাখিল হইতেছে। কাম বলিল, "ভয় নাই, আমি ওই নূতন অবতারের মাথা খাইয়া দিয়াছি। দেখ নাই, সেদিন গঙ্গাতীরে এক বালিকাকে দেখিয়া উহার কামোদ্দীপন হইয়াছিল?" (কাম বোধ হয় ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিসে সম্প্রতি ডিপ্লোমা পাইয়া আসিয়াছে।) পাপ হাসিয়া বলিল, "মূর্খ, তুমি কাম আর প্রেমে প্রভেদ বোঝ না?"

এই নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বাসরলীলা মহাজনেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা আধ্যাত্মিক রূপক নয়, নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া বিদেহ তত্ত্ব নয়। প্রেমের বাস্তব মাধুর্য্য সেখানে অমৃতস্নিগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; আলোচনায়, অনুধ্যানে হৃদয় নির্ম্মল হয়, এই দেহেরই কূল ছাপাইয়া আনন্দের বাণ ডাকিয়া যায়। এই সেদিনও দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের দাম্পত্যলীলা জগতে এক অতুলনীয় বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। এইগুলি কি?—আধ্যাত্মিক রূপক, না ফ্রয়েডের লিবিডো?

জ্ঞানের উপনিষদে কি পাই? সাংখ্যের মত চিরিয়া চিরিয়া তত্ত্ব বিচার করিয়া, পরপর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া পরাৎপর আত্মায় গিয়া পৌঁছানো নয়; সেখানে দেখি, একেবারেই করামলকবৎ ব্রহ্মের আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই আনন্দে জগৎকে আপ্লুত করা—এই হইল ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞান। ঋষির ইহা সহজ দর্শন। যুক্তি-বিচারের ধাপগুলি ইহার মাঝে খুঁজিয়া পাওয়া যাই'ব না; মস্তিষ্ক এক নিগূঢ় শক্তিতে স্পন্দিত হইয়া প্রকৃতির এক রহস্যাবৃত পথে চলিয়া এই সংবেদন পাইয়াছে। প্রেমেরও এমনি সহজ দর্শন আছে। সেখানে দেহ ছাঁটিয়া, ইন্দ্রিয়কে খাটো করিয়া, মনকে মূক করিয়া প্রেমের আস্বাদন পাওয়া নয়। এই জগৎ যেমন তেমনি রহিয়াছে; বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, তরুণ-তরুণী সবই রহিয়াছে—বাস্তবে যেমন জীবন্ত হইয়া থাকিবার তেমনি রহিয়াছে; অথচ নয়নে এ কি মায়া-অঞ্জন লাগিয়া গেল—দেখি সবি চিন্ময়, সবি মধুময়! ওই যে মাধবীলতা সহকারকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, কুসুমের একপাত্রে ভ্রমরীর পীতাবশেষ মধুটুকু ভ্রমর পান করিতেছে, স্পর্শনিমীলিতাঙ্গী কুরঙ্গীর গায়ে বিমুগ্ধ কুরঙ্গ শৃঙ্গ ঘর্ষণ করিতেছে, কপোতীর চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুট পূরিয়া দিয়া কপোত নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে—সব আমার কাছে পূর্ণ—নিটোল। কোথায়ও কিছু যোগ করিবার নাই, কিছু কাড়িয়া নিবারও নাই; গোধূলির অরুণচ্ছটায় প্লাবিত আকাশের কোণে চিত্রবৎ নিস্পন্দ প্রকৃতির মতই সকলই সমাহিত স্তব্ধ!

এই স্তব্ধ প্রশান্ত ভূমিতেই প্রেমের অনির্ব্বচনীয় অমৃতলোক। মানুষ এখানে মানুষ হইয়া স্বরূপে ফুটিয়া আছে। এখানে সন্তানের শ্রদ্ধা, জননীর বাৎসল্য, সখার প্রীতি, কিশোরীর প্রেম—পূর্ণতার ব্যঞ্জনায় সকলই অপরূপ। ভাবাহুরূপ এর যে কোনও একটিকে গ্রহণ কর, জীবন পূর্ণ হইয়া যাইবে; অথবা সাক্ষি-চেতারূপে ইহাদের সকলের আলম্বনস্বরূপ হও, ধরিত্রী ধন্যা হইবে।

এই প্রেমের প্রকাশে রিরংসাই বাধা। যে সহজ, তাহার কাছে বাধা নয়; কিন্তু সবাই তো আর সহজ নয়। নর আর নারী, এই দুইটি আধারে প্রেম খণ্ডিত হইয়াছে; অনতিবর্ত্তনীয় দুঃখ আর অনির্ব্বচনীয় সুখ, দুয়েরই উদ্ভব এই দ্বৈত হইতে। পরস্পরের সান্নিধ্যে পরস্পরের মাঝে নব-বসন্তের আকুলতা শিহরিয়া উঠিল!—কিন্তু তারপর? জীবন-মরণের সন্ধিতে আসিয়া মানুষ দাঁড়াইয়াছে—দক্ষিণে মরণ, বামে অমৃত। কোন্ পথে সে যাইবে? একটু সংযম, একটু আত্মস্থ ভাব, একটু ধ্যানকুশলতা;—তাহা হইলেই মদনমোহন হইত, অমৃতের দ্বার খুলিয়া যাইত। কিন্তু উত্তেজনায় অন্ধ মানুষের আর তর্ সহে না, আত্মঘাতের উন্মাদনায় এ উহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে; করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া রতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, মুষ্টিপ্রমাণ ভস্মে শুধু কামাতুরের পর্য্যবসান ঘটে।

ভোগের কাঙ্গাল মানুষ, তুমি ভোগ চাও? ভালবাসাতেও ভোগ আছে—অতি স্নিগ্ধ, স্পর্শসুকুমার অমৃতময় ভোগ আছে ভালবাসায়। স্পর্শলোভী বেদনাতুর তুমি, নিবিড় হইতে নিবিড়তর স্পর্শের সন্ধান রাখ কি? প্রাণ-জিৎ ভিন্ন স্পর্শরসিক হইবার স্পর্দ্ধা কে রাখে? মন, মারুত, বিন্দু স্থির হউক, তবে বুঝিবে অতনুর স্পর্শে কি করিয়া এ তনু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, বিন্দুর ব্যাপ্তিতে কি করিয়া সিন্ধু বাঁধা পড়ে। হৃৎপিণ্ডের রক্তোচ্ছ্বাসকেই কেবল স্পর্শরসের উদ্দীপন রূপে গ্রহণ করিয়াছ; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নাড়ীচক্রে সঞ্চরমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহকে ধারণা করিতে শেখ নাই, অন্তরবরুদ্ধ সৌরতের মহিমা যে কি, তাহা তুমি কি বুঝিবে? সম্প্রয়োগকে অনন্ত করিয়া কেহ কোনও দিন তৃপ্তি পাইবে না, প্রেম পাইবে না; ধ্যানপ্রসন্নতা দ্বারা সম্প্রয়োগের অন্তঃসঙ্কোচে বিলাসের

উদ্ভব—ওই বিলাসই প্রেমের দিব্য ভোগ। শেষে আর তাহাও থাকে না, সমস্ত দ্বৈতের সমাধি হয় অদ্বৈতানুভবে।

একটী আদর্শ তোমাদের অনুধ্যানের দরুণ উপস্থিত করিতেছি। বাহিরে তোমরা হও হর-গৌরী—শান্ত, শুদ্ধ, যোগারূঢ়; তোমাদের প্রেমে জগতের চোখে ফুটিয়া উঠুক বিশ্বপিতা আর জগন্মাতার যুগলমাধুরী। অন্তরে তোমরা হও চিরকিশোর-চিরকিশোরী—অন্তর্গূঢ় বিলাসে নিত্য-উদ্বেলিত, অনন্ত আবেগে নিত্য কম্পিত!

তীর্থসঙ্গমে

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"সব মানুষ কি কখনো এক ধর্ম্মের অনুশাসন মেনে চল্‌বে?"

হাঁ-ও বলা যায়, না-ও বলা যায়। ভবিষ্যৎ যুগে ধর্ম্ম যে মানুষকে "শাসন" করবে, তা বল্‌তে পারা যায় না। মানুষ তখন কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না, বরং ধর্ম্মই তখন মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

"সে কি কোনও একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম হবে? মানুষ কি তার অনুশাসন মেনে চল্‌বে?"

না, বলেছিই তো—ভবিষ্যতে ধর্ম্ম মানুষকে শাসন করবে না। ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আইনকানুন, সব হবে মানুষের অধীন। আইন তো আমার জন্য নয়। আইনের ফাঁদে, অনুষ্ঠানের জালে জড়িয়ে পড়ব বলে তো আমার সৃষ্টি হয়নি। ভবিষ্যতে এমন এক ধর্ম্মের আবির্ভাব হবে, যা মানুষকে শাসন করবে না—সেবা করবে।

"একটা" ধর্ম্মের কথা যে বলেছ, তা ঠিক; একই ধর্ম্ম তখন মানুষের সেবা করবে বটে। সে ধর্ম্মটা কি? এ কথার জবাব দেবার আগে রাম তোমাদের বলে রাখছেন—সে ধর্ম্মের কোনও নামকরণ হবে না কিন্তু।

তাহলে সেটা হবে কি? সে হবে বেদান্ত—যা নাকি ধর্ম্মের বিজ্ঞান। বেদান্তই হচ্ছে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম বল্‌তে যদি বোঝ কোনও মতুয়ার বুদ্ধির ফাঁকি, একটা পেটেণ্ট-করা কিছু, যার বজ্র আঁটুনী ফস্কাবার যো নেই—ধর্ম্মের যদি ওই অর্থ তোমাদের মনে থাকে তো ঝেড়ে ফেল ওই কুসংস্কার মন থেকে! এই অর্থে ধর্ম্মের কোন অস্তিত্বই থাক্‌বে না সুদূর ভবিষ্যতে। দেখ, কত লোক আজকাল বিজ্ঞানের আলোচনা করছে, জ্ঞানের উচ্চ ভূমিকায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে নিঃসঙ্কোচে তারা তা অধ্যয়ন করছে। এই সব সংস্কারমুক্ত মানুষ কোনও দলের গোঁড়া নয়। সত্যিকার ধর্ম্ম আমাদের কসে বাঁধবে না, বাঁধন কাটবে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন আমাদের হাতেই তুলে দেওয়া—আমাদের গোলাম বানানো নয়।

ধর্ম্মের সঙ্গে মাঝে নানা নাম ঢুকে গিয়ে জগতের

কি ক্ষতিটাই না করছে! ধর বৌদ্ধ আর খৃষ্টান—এই দুটো নাম। দুয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষকে চার টুক্‌রা করেছিল। চীনে বৌদ্ধদের সাতটা সম্প্রদায়।

একটা লোক বল্‌বে, আমি হিন্দু; বলেই খৃষ্টানকে বা মুসলমানকে গুঁতাতে যাবে? কেন?—না তার হিন্দু খেতাবটা বজায় রাখ্‌তে হবে তো! যদি এদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে দেখ তো এমন হাজার হাজার হিন্দু পাবে, যারা তথা-কথিত খৃষ্টানের চেয়ে শিক্ষায়-দীক্ষায় খৃষ্টানভাবাপন্ন বেশী; অথচ শুধু এক নামের লেবেল আঁটা আছে বলে বিরুদ্ধ ধাতের লোকের সঙ্গে তারা জড়িয়ে আছে।

ভাবী ধর্ম্মের সম্বন্ধে আর একটা কথা। বেদান্ত-সাহিত্য আর বেদান্তজ্ঞান যখন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঢুকে সবাইকে জারিত করে ফেল্‌বে, তখন এমন এক ধর্ম্মের উদ্ভব হবে, যা হবে বিশ্বজনীন। বেদান্ত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম, বিশ্ব ধর্ম্ম—সমস্ত জগতে এ ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়বে। সে যুগ আস্‌ছে। কিন্তু মানুষকে বেদান্ত নামের মোহও কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে। বৌদ্ধ বল, খৃষ্টান বল, মানুকে সব নামের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে।

ধর, তোমার কতগুলি বদ্ধমূল ধারণা আছে। আর একজনের হয়ত ধারণা যে, গির্জ্জা ছাড়া মুক্তির আর পথ নাই। এখন এটা হল গিয়ে তার সঙ্গে তার ইষ্টদেবতার বোঝা-পড়ার কথা। তুমি বাপু তার মাঝে কাঠি দেবার কে? তোমার কি হক্ আছে বল তো?

বেদান্তের একটা আদত শিক্ষাই হল এই যে—ধর্ম্ম হচ্ছে সাধকের সঙ্গে তার ইষ্টের সম্বন্ধ।

* * * *

"যারা আত্মহত্যা করে, তাদের আত্মার কি গতি হয়?"

রাম বলেন, সবাই তো আত্মহত্যা করছে। যে মরছে, সেই তো নিজকে মারছে। যারা অমনি মরে, তাদের কি হয়? বিশেষ কিছুই না। তেমনি যারা আত্মহত্যা করে, তাদেরও আর বিশেষ কি হবে? তোমার প্রারব্ধ না ফুরালে কি মরণ আছে মনে কর? আত্মহত্যা কর্‌লেই নিষ্কৃতি পাবে?

"মরণ হয় কি করে?"

বাসনা অজ্ঞানে মানুকে এমন করে জড়িয়ে ফেলে যে, এই দেহটাকে শেষ করে ফেলবার দরুণ তার একটা ব্যগ্রতা জন্মে যায়। অন্তরের নিভৃত দেশে মৃত্যুকামনা জাগে বলেই তাদের মরণ ঘনিয়ে আসে। এই হচ্ছে আইন, বাসনার ফলে মানুষ রোগ ডেকে আনে; আর রোগশয্যায় যখন আগেকার বাসনার ফল ধরতে থাকে, তখন মানুষের এমনি একটা সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হয় যে, সে মরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যমও তখন এসে হাজির হয়। এ-ও তো আত্মহত্যা।

* *

"এই স্থূল দেহের জ্ঞান থাক্‌তে কি সূক্ষ্ম জগতের স্ফুরণ হয়? একজন থিয়সফিষ্ট আমায় বলেছিলেন যে, তা নাকি হয় না।"

এ কথার জবাবে অনেক কিছুই বলবার আছে। কিন্তু সব খুঁটিয়ে বলবার সময় তো হবে না এখন।

থিয়সফিষ্টও যা বলছে, তা মিছে নয়। স্থূল জগৎ আর সূক্ষ্ম জগৎ পাশাপাশিই রয়েছে। মনের গবেষণা অবশ্য মনে মনেই চলে বটে, কিন্তু আবার এ-ও তো দেখ্‌তে পাচ্ছি, স্থূল জগতে যা কিছু ঘটে, তার সঙ্গে দেহের যেমন যোগ থাকে, তেমনি মনেরও যোগ থাকে। দেহের রাজ্যে মনের কারসাজি অনেক। রেল, জাহাজ, টেলিগ্রাম সমস্তই তোমার মনের কল্পনারই প্রতিরূপ বটে, কিন্তু এই সব স্থূল বস্তুকে স্থূল জগতে আন্‌তে স্থূল দেহেরও মধ্যস্থতা

প্রয়োজন হয়েছে। জাহাজ গড়তে, টেলিগ্রামের তার বসাতে যন্ত্রপাতির দরকার হয়। এখন সর্দ্দার কে?—এই যন্ত্রগুলো, না মনটা? মনটাও একটা যন্ত্র মাত্র—ও কর্ত্তা নয়।

বড় বড় বাড়ী, উচ্চাঙ্গের শিল্প-কলা—এ সব মন দ্বারা কল্পিত হয়ে দেহ দ্বারা গঠিত হয়। তোমার মাঝে একাত্মবোধ জাগাতে হলে দুটোই খাটাতে হবে। একাত্মভাবের অনুভব আর মনোজগতের স্ফুরণ, দুটো আলাদা আলাদা জিনিষ। একাত্মানুভব আনতে হলে দেহ আর মন দুটোকেই বরতরফ করতে হবে। দুটোই সংসার।

* *
*

"ব্রহ্ম যদি সর্ব্বশক্তিমান, আর আমরা যদি ব্রহ্ম-স্বরূপ হই তো চোখ দিয়ে শুনতে পাই না কেন, কাণ দিয়েই বা দেখতে পাই না কেন?"

তুমি তো বল, আমার হাত, আমার নাক, আমার চোখ, আমার পা ইত্যাদি। ওগুলো যদি তোমারই হয় তো তুমিই বা কাণ দিয়ে শোন না কেন, চোখ দিয়েই বা দেখ না কেন? ব্রহ্ম যদি অদ্বৈত এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হন তো তাঁর যা খুসী করুন না কেন!

ব্রহ্ম কোথায়ও নিজকে প্রকাশ করছেন মনের ভিতর দিয়ে, কোথায়ও বা দেহের ভিতর দিয়ে; বিশ্বের সর্ব্বত্র তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন। তিনি যদি কারু হুকুমের চাকর হতেন, তাহলে তোমার খোশ-খেয়ালে চলতেন বটে। যেহেতু তিনি মানুষের আইন বা খেয়াল বা শক্তির অধীন নন, অতএব তাঁর যা খুসী, তিনি ঠিক তাই করছেন, অর্থাৎ তোমার মাঝে থেকে চোখ দিয়েই দেখছেন, আর কাণ দিয়েই শুনছেন।

যে মন ভাবনা-চিন্তা করে, কামনা করে, সে মন তুমি নও। তাই যদি হত, তাহলে অবশ্য তুমি যা খুসী তাই করতে পারতে। তাহলে তুমি দেহের আর মনের কার্য্যক্রমও পাল্টে দিতে পারতে, অর্থাৎ দেহকে দিয়ে মনের কাজ, আর মনকে দিয়ে দেহের কাজ করিয়ে নিতে পারতে। কিন্তু কামনার মন তো তুমি নও। যে ব্রহ্ম এই জগতের যা কিছু সব ঘটাচ্ছেন, তুমিই যে সেই ব্রহ্ম।

মনের ওপর ওঠ। মন কামনাযুক্ত; কিন্তু কামনার আকুলি-বিকুলি তো তুমি নও।

পাখীকে আকাশে ওড়াচ্ছেন যিনি, উদ্ভিদকে বর্দ্ধিত করছেন যিনি, তুমি যে সেই। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ—তত্ত্বমসি! ব্রহ্মত্ব তোমার কোনও ধর্ম্ম নয়—তা হচ্ছে তোমার স্বরূপ!

* *
*

"এই যে সব নানা "লোকে"র কথা শুনতে পাই, এ বিষয়ে চর্চ্চা রাখা প্রয়োজন কি?"

যতদিন পর্য্যন্ত মন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, ততদিনই তোমার খেল্‌না দরকার হয়, আমোদের উপকরণ দরকার হয়। বড় হলে খেল্‌না আর চাও না। তেমনি যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করবে, তখন ওই সব স্থূল জগৎ বা সূক্ষ্ম জগতের খেল্‌নাও আর প্রাণে চাইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত সে জ্ঞান লাভ না করছ, ততদিন ও সব খেল্‌না নিয়ে আমোদ করা ছাড়া আর উপায় কি?

জ্ঞান মানে অজ্ঞানের দাহ। অজ্ঞান আর জ্ঞান একটা সিঁড়িরই আরোহ আর অবরোহ। অজ্ঞান মানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা আর জ্ঞান মানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠা। একটা ব্যাপারই দুটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে মাত্র।

বিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে, আলো আর অন্ধকার দুটো আলাদা আলাদা বস্তু নয়; তাদের মাঝে কেবল পরিমাণের তারতম্য—মূলে জিনিষটা একই। অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ বসে থাকলে পর চোখের মণি

ক্যাকড়া হয়ে যায়; তখন অন্ধকারেই দেখা চলে, আঁধার আলো হয়ে উঠে।

জ্ঞান আর অজ্ঞানকে স্বতোবিরোধী বলে মনে করো না—পার্থক্যটা হচ্ছে পরিমাণগত, বস্তুগত নয়। যতক্ষণ অজ্ঞানে ডুবে আছ, ততক্ষণ সিঁড়ির নীচের ধাপে আছ। নীচের ধাপে থাকবার সময় ওই সব লোক নিয়ে চর্চ্চা না করে তো তুমি পার না। কিন্তু যতই ওপরে উঠ্‌তে থাক্‌বে, ততই ও সব দূর হয়ে যাবে।

***

"Voice of Silenceএ লেখা আছে, 'জড়ের তত্ত্ব আর চৈতন্যের তত্ত্ব কখনো এক ঠাঁই হতে পারে না। দুটোর একটা থাকবে না।' বেদান্ত কি এই কথাই বলে?"

জড়ের তত্ত্ব আর চৈতন্যের তত্ত্বে কখনো মিল হতে পারে না। রামের মনে হয়, ও দুটো কথার সাধারণতঃ যা অর্থ কল্পনা করা হয়, তা থেকে স্বতন্ত্র একটা তাৎপর্য্য আছে। চৈতন্যতত্ত্ব উপলব্ধি কর্‌বার পূর্ব্বে যে জড়তত্ত্বের প্রলয় হয় বলা হয়েছে, তার মানে আমাদের মিথ্যা-অহংএর নিরাস হয়। মিথ্যা অহং হচ্ছে যেন জলের প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মাত্মার ঐক্য হওয়ার পূর্ব্বে এই অহংটুকু যাওয়া চাই। এই অর্থে ওই কথাটা খাঁটি। অজ্ঞান-বিমূঢ় ভাবনাগুলোকে তাড়াতেই হবে। যে অজ্ঞান তোমাকে দেহের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেল্‌ছে, তোমাকে কর্ম্মফলের দরুণ দায়ী কর্‌ছে, আমার বলে সব কিছুর ওপর দখলী-সত্ত্ব জন্মাতে দিচ্ছে, সেই আমিই হচ্ছে জড়তত্ত্ব; একে প্রথম দূর কর্‌তেই হবে। জড়তত্ত্ব আর চৈতন্যতত্ত্ব বল্‌তে যদি এই বোঝ যে—জড় এখানে, আর চৈতন্য অন্য কোথায়ও রয়েছে, কিম্বা জড় একটা বস্তু আর চৈতন্য আর একটা বস্তু, দুটা পৃথক্ পৃথক্, তাহলে কিন্তু ভুল বোঝা হবে। জড় আর চৈতন্যের এক সত্তা, এক তত্ত্ব।

চৈতন্যকেও ভুল বোঝা হয়। দার্শনিকরা যাকে মন বলেন, তাকে যদি চৈতন্য বলে মনে কর, তবুও জড় আর চৈতন্য দুটো আলাদা হয় না কিন্তু—দুটোই এক। দুটোতে গাঢ়তার তারতম্য থাক্‌তে পারে, কিন্তু প্রকারগত পার্থক্য নাই।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, জড় আর মন এক বস্তু। দার্শনিকরা দেখিয়েছেন, শক্তি আর জড় এক জিনিষ।

ইউরোপে লাইব্‌নিট্‌জ্ (Leibnitz) প্রথম এই কথাটা প্রচার করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে দশহাজার বছর আগেও ঋষিরা জান্‌তেন, অণুগুলি শক্তিকেন্দ্র মাত্র। বিজ্ঞান এই মতবাদ গ্রহণ করে এর প্রমাণ উপস্থিত করেছে। লর্ড কেল্‌ভিন্ (Kelvin) তাঁর একটা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে গণিতের অনুপাত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, জড় আর শক্তি একই জিনিষ। জড় আর চৈতন্য তাহলে ফারাক্ হয় কি করে? এমন কি জড় আর মনের কথাই যদি তোল, তাহলেও তারা একই বস্তু।

পাহাড়ে যাও। হিমালয়ে দেখবে, কি সুন্দর, কি মনোরম দৃশ্য! ফুলের সুবাস, পাখীর কাকলি, স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি, সমীরণের মৃদু শিহরণ—এগুলি কি? এগুলি কি জড় নয়? এই জড় পরিণত হচ্ছে—শক্তিতে, চিন্তাতে, উল্লাসে, সঙ্গীতে ভাগবত অনুভূতিতে! এরাই তোমার অন্তরে দিব্য-প্রেরণা জাগিয়ে দিচ্ছে। এই তো দেখছি, তোমার বহির্ভূত জড় তোমার মাঝে দিব্য চিন্তার বিকাশ করছে। এই যে সহর, বাজার, রেল, জাহাজ, বড় বড় বাড়ী, লোকজন এগুলিকেই বা কি বল্‌বে? এরাও তো এক সময় শুধু মনের কল্পনা ছিল। ঘরটা আগে ছিল শিল্পীর মনে; তারপরে না তা বাইরে রূপ ধরেছে!

হিমালয়ে দেখি, স্থূল বস্তু মানস চিন্তাতে রূপান্তরিত হচ্ছে—যেমন নাকি জল বাষ্প হয়, তেমনি করে। এতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে এ দুটোই

এক। যদি জড় মন হতে পৃথক্ হতো, তাহলে মনও জড়কে প্রভাবিত করতে পারত না, জড়ও মনকে প্রভাবিত করতে পারত না।

ফার্সী ভাষাতে একটী সুন্দর কবিতা আছে। তার তাৎপর্য্য এই—"মেঘ হতে অশ্রুবিন্দুর আকারে এক ফোঁটা জল পড়ল। অশ্রুকে জিজ্ঞাসা করা হল, কাঁদছ কেন? সে বলল, আমি এই এতটুকু, একরত্তি প্রাণ! এত ছোট আমি, আর সমুদ্র এত বিশাল! আমার ক্ষুদ্রত্বের কথা ভেবে আমি কাঁদছি। তাকে বলা হল, কেঁদো না, নাম-রূপের মোহে আবদ্ধ হয়ে থেকো না। একবার নিজের মাঝে তাকিয়ে দেখ দেখি, তোমার ভিতরে কে? তুমি কি? তুমি কি জল নও? আর সমুদ্রই বা কি? সে-ও কি জল নয়? তুমি দেশ-কালে আবদ্ধ হয়ে আছ বলে মনে করো না। এই দেশ-কালের বেষ্টনী অতিক্রম করে স্বমহিমায় নিজকে দেখ!"

কালের মাঝে যখন নিজকে আবদ্ধ কর, তখনই তো দুঃখ পাও। সবার ওপর নিজকে টেনে তোল। শুধু জড় আর চেতন এক কেন, জগতে সবাই এক। আত্মার প্রতিষ্ঠা কালের অতীত ভূমিতে। সমস্তটা জগৎ তোমার মাঝে—তোমার স্বপ্নের মাঝে। তুমি ভাবছ, তুমি বুঝি বনে বা পাহাড়ে বা নদীতে; তা নয়, ওরাই যে তোমার মাঝে।

বেদান্ত বলছেন, এই বিশ্বজগৎটাই তোমার মাঝে। সূক্ষ্মলোক, কামলোক, সব তোমার মাঝে। অথচ তুমি ভাবছ, তুমি বুঝি তাদের মাঝে! একটী মেয়ের হাতে আয়না রয়েছে। আয়নাটার পানে চেয়ে দেখে, সে যেন আয়নাটার মাঝে। কিন্তু বাস্তবিক আয়নাটাই তার মাঝে। তেমনি, বাস্তবিক এই জগৎটা তোমার মাঝে, তুমি এই জগতের মাঝে নও। জান—দু'রকম কথা আছে; এক রকম কথা বেরোয় মাথা থেকে, আর একরকম কথা বেরোয় বুক থেকে। মাথা থেকে যে কথা বেরোয়, তা নিয়ে যখন-তখন যেমন খুশী নাড়া-চাড়া করা যায়, কিন্তু বুক থেকে যে কথা বেরোয়, সে স্বতন্ত্র।

নানারকম বাঁশী আছে। কোনটার আওয়াজ ময়ূরের মত, কোনটার বা মোরগের মত, কোনটার বা শূয়রের মত। বাঁশীগুলি পড়ে আছে, যখন যেটা খুসী বাজালেই সেইরকম আওয়াজ বেরুবে। কিন্তু আসল মোরগকে, ময়ূরকে বা শূয়রকে যখন খুসী বাজানো যায় না। তারা তোমার হুকুম মত চলবে না তো। যদি তুমি মোরগকে বল আর চ্যাচাস্ নে, তা সে শুনবে? শূয়র যদি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে সুরু করে, তুমি বললেই কি সে থামবে? ওদের দেশ-কালের বন্ধনে বাঁধা চলে না। হিমালয়ে সঙ্গীত ভেসে যায়, তা চিন্তায় রূপান্তরিত হয়—তারপর কোথায় যে যায়, কেউ জানে না। নষ্ট হয়ে যায় কি? না। গাছেরা তা ধরে রাখে, নদীতে ধরে রাখে, পৃথিবী তা বুকে পূরে রাখে। হাওয়ায় সে চিন্তা সঞ্চারিত হয়, সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে;—যে পর্য্যন্ত না উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পায়, সে পর্য্যন্ত সে চলতেই থাকে।

সব চিন্তা আসছে ব্রহ্ম হতে। এই যে নানাভূত, আভাসমাত্র, কর্ম্মপরতন্ত্র, অভিমানী অহং—এ কি ভাবনা-চিন্তার মালিক? এই অহং যখন দূর হয়ে যায়, সত্য ভাবনা তখনই জাগে।

রামের মতে প্রত্যেক গ্রন্থই অপৌরুষেয় ঈশ্বরের বাণী। শুধু বাইবেলই ঈশ্বরের বাণী নয়; ইমার্সন্-এর বই, সেক্ষপীরের বই, ডারুইনের বই—সব অমনি প্রেরণাসিদ্ধ—সবি বেদতুল্য, কেননা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের অহং না মরে, ততক্ষণ এই সমস্ত বাণী বেরোয় না।

স্বামী রামতীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—):*:(—

তীর্থরামের নিষ্কিঞ্চনতা যেন একটা চ্যালেঞ্জ্। দুঃখ যে তাঁহার কোথায়ও আছে, সে খেয়াল তো নাই ; তবে যদি কেহ তাঁহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয় তো তাহার প্রতি তাঁহার এই জ্বালাময়ী বাণী—

শাহন্-শাহে-জহান্ হৈ,
সায়ল হুআ হৈ তু ;
পৈদাকুনে-জমান্ হৈ
ডায়ল হুআ হৈ তু !
সৌ বার গর্জ হোবে তো
ধো ধো পিয়ে কদম্ ;
ক্যোঁ চর্ণো-মিহরো-মাহ পৈ
মায়ল হুআ হৈ তু ?
খঞ্জর কী ক্যা মজাল কি
ইক্ জখম্ কর্ সকে ?
তেরা হী হৈ খয়াল কি
ঘায়ল্ হুআ হৈ তু !
ক্যা হর্ গদা-ও-শাহ কা
রাজক হৈ কোঈ ঔর ?
অফ্লাসো-তঙ্গদস্তী কা
কায়ল হুরা হৈ তু।
টাইম্ হৈ তেরে মুজরে মেঁ
মৌক্যা কী তাক মে ;
ক্যোঁ ডর সে উস্‌কে মুফ্‌ৎ মেঁ
জায়ল হুআ হৈ তু ?
হম বগল তুঝ সে রহতা হৈ
হর্ আন 'রাম' তো ;
বন্ পরদা অপনী রস্‌ল্ মেঁ
হায়ল হুআ হৈ তু !

—তুই যে দুনিয়ার শাহান্‌সাহ ; তবে ভিখারী হয়ে আছিস্ কেন ? কালের সৃষ্টিকর্ত্তা তুই, আর আজ হলি কিনা ঘড়ীওয়ালার 'ডায়েল্' ! আকাশ, চন্দ্র আর সূর্য্য—এরা তোকে সম্মোহিত কর্‌বে ? ওদের গরজ হয় তো একশ বার এসে তোর চরণ ধুয়ে পাদোদক খেয়ে যাবে ! ছোরার শক্তি কি যে একটীবার তোকে জখম করে ? তুই যে ঘায়েল্ হয়েছিস্, ও তো তোরই খেয়াল ! রাজা আর ভিখারীর অন্নদাতা কি দুস্‌রা আর কেউ ? অথচ দারিদ্র্য আর হীনতাকে তুই স্বচ্ছন্দে মেনে নিলি ! কাল এসে তোর পায়ে পড়ে আছে—সুযোগের প্রতীক্ষায় ; মিছামিছি ওর ভয়ে তুই ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিস্ কেন, বল তো ? আমি রাম যে তোর পাশে আছি সারাক্ষণ ; তুই নিজেই কিনা পর্দ্দা হয়ে মিলনের মাঝে বাধা রচে রইলি !

সংসারের প্রতি তীর্থরামের এই শেষ কথা—আমার বাদশাহী আমার হক্, তুমি সেখানে আমার পায়ের ধূলারও যোগ্য নও !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থরাম যখন কলেজে পড়াইতে যাইতেন, তখন গণিতশাস্ত্র বেদান্তে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। বাস্তবিক, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ! গণিতের সমস্যার মাঝে অলক্ষ্যে কেমন করিয়া বেদান্তের সমাধান আসিয়া ঢুকিয়া গিয়াছে, আর রাম ভাববিগলিতকণ্ঠে ছাত্রদের শোনাইতেছেন—মৌলানারুম্, শম্‌স্‌তব্রেজ্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দিব্যানুভাববাসিত কাব্যমালা ! ছাত্রেরাও শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেছে, আর আচার্য্যের তো

কথাই নাই। মনে পড়ে, গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাংলার নিমাইপণ্ডিতও এমনি করিয়া টোলে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন—ব্যাকরণ পড়াইতে ধাতু ও প্রত্যয় বিভাগ করিতে গিয়া বলিতেন, "ধাতুও কৃষ্ণ, প্রত্যয়ও কৃষ্ণ।" হরিধ্বনির মত্ততায় ব্যাকরণের পাঠ সাঙ্গ হইয়া যাইত।

তীর্থরামের এই দিব্যোন্মাদ ক্রমে বাড়িয়া চলিল। আর তিনি নিজকে তীর্থরাম বলিয়া পরিচয় দেন না, রামও বলেন না, বলেন—"আমি রাম বাদশাহ!" খৃষ্ট, সরমদ্, মনসুর, মজনু প্রভৃতি প্রেম-দেওয়ানাদের সঙ্গে তিনি নিজকে অভেদ বলিয়া ভাবনা করিতেন! তিনি অনুভব করিতেন, আত্মারূপে, ভাবরূপে এরা সবাই এক; কেবল যুগপ্রয়োজনে দেহের আধার-ভেদেই না ইঁহারা ভিন্ন হইয়াছেন; নতুবা দেহ বাদ দিলে এরা সবাই রাম; অথবা সবই রাম! ব্যক্তি মিথ্যা,—ভাব সত্য, ভাব অনন্ত, ভাব বিভু। অসীম অনন্ত এক ব্রহ্ম-পারাবার, তাহাতে তরঙ্গরূপী এই মহাপুরুষেরা। অহং ব্রহ্মাস্মি—আমার সঙ্গে তাঁহাদের ভেদ কোথায়?—অথবা আমিই বা কোথায়? তাঁহারাই বা কোথায়?—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!

অদ্বৈতানুভবের এই মহাদ্যুতি তাঁহার চিত্তে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আর কোথায় থাকে দীনতা, কোথায় থাকে প্রণতি! একটী ব্যাপারে তাঁহার চিত্তের এই ভাবান্তর প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ভগত ধন্নামলজীর কথা বোধ হয় পাঠকদের মনে আছে। এতদিন পর্য্যন্ত ভগতজীর কাছে চিঠি লিখিবার সময় তীর্থরাম পরব্রহ্মবাচক নানা সম্বোধনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন এবং নিজের নাম লিখিতেন—"আপনার দাস তীর্থরাম।" এখন তাহা না করিয়া লেখেন শুধু "রাম।" আর সে 'রাম' শব্দের অর্থই বা কি, তাহাও তিনি ভাঙ্গিয়া বলিলেন—

জিত দেখূঁ তিত ভরিয়া যাম,
পী পী মস্তী আঠোঁ যাম।
নিত্য তৃপ্ত সুখসাগর নাম,
গিরে বনে হম তো আরাম।
দেখা সুনা খপানা কাম,
তীন লোক মেঁ হৈ বিশ্রাম।
ক্যা সোচে, ক্যা সমঝে রাম
তীন কাল জিস্‌কো নিজ ধাম!

—যেখানে দৃষ্টি পড়ছে, সেখানেই পূর্ণতায় উপ্‌চে পড়্‌ছি; আনন্দের সুধা পান করে করে অষ্টপ্রহর মাতাল হয়ে আছি; যেখানে যে-ভাবেই পড়ি না কেন, আমি আরাম; তাই আমার নিত্যতৃপ্ত সুখ-পারাবার নাম এই 'রাম'! দেখ্‌ছি, শুন্‌ছি, কাজ কর্‌ছি—কিন্তু তবুও তিন লোকে আমার বিশ্রাম। 'রাম' ভাব্‌বে কি, বিচার কর্‌বে কি? ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যে তার নিজ ধাম!

কিন্তু অদ্বৈতানুভবের এই মহাবীর্য্য ধারণ করিবার শক্তি সকলের কোথায়? মানুষ ইচ্ছা করিয়াই বড় হইতে চায় না—বড় কথা শুনিতে সে ভয় পায়। কূপমণ্ডুকের দল, নিজের কূপটাকেই মনে করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড; ইহার চেয়েও বড় যে কিছু আছে, সে কথা তো বিশ্বাস করেই না—বরং যে সে কথা শোনাইতে আসে, তাহার গায়ে ধূলি দিয়া মনে করে, বড় পুণ্য-কর্ম্মই বুঝি করিলাম! দাস-মনোভাব এমনি করিয়া মানুষের কলিজা খুঁড়িয়া খাইয়াছে! ধর্ম্মজগতে এক-একটা সম্প্রদায় কি? শুধু কতকগুলি মত আর ব্যক্তির দাসত্ব নয় কি? আর সে দাসত্বের অন্তরালেও কি দম্ভ!—"আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই চরম!" ভক্তির বাহানায় এ কি নির্লজ্জ নাস্তিকতা নয়? মিশন-কলেজে তীর্থরামের অদ্বৈতবেদান্ত-বাণী এইরূপ নাস্তিকতা দ্বারা একবার লাঞ্ছিত হইয়াছিল। ঘটনাটী এই—

বলিয়াছি, তীর্থরাম এখন আর তীর্থরাম গোঁসাই নন, তিনি রাম বাদশাহ! গণিতের ক্লাসেও তিনি

রাম বাদশাহ! ছাত্রেরাও তাঁহাকে ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করে। মিশন-কলেজের রীতি-অনুযায়ী মাঝে মাঝে কলেজের ধর্ম্মসভায় বক্তৃতাদিও হয়। ছাত্রদের আগ্রহে রামও সেখানে বক্তৃতা দেন। একদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল, যীশুখৃষ্টের জীবনী। বক্তৃতা করিতে করিতে রাম বলিয়া উঠিলেন--"হে খৃষ্টানগণ! এই দেখ, তোমাদের খৃষ্ট তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া! --আর যায় কোথায়! পাদ্রীদের বিবেচনায় এত বড় পাষণ্ড-নাস্তিকের উক্তি কলেজ-ভবনকে কোনদিন কলুষিত করে নাই। ইহার আশু প্রতিবিধান হওয়া দরকার। বিশেষতঃ রামের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাভক্তি যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনেরও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তীর্থরাম তখন গণিতের প্রধান অধ্যাপক। পূর্ব্বে একজন ইউরোপীয় এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত যাওয়াতে তীর্থরামকে এই পদ দেওয়া হয়। তখনও পূর্ব্ব অধ্যাপকের ছুটী পুরা হইতে অনেক বাকী। কিন্তু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা তীর্থরামকে জানাইলেন, পূর্ব-বর্ত্তী অধ্যাপকের পুনরাগমন আসন্ন, অতএব এই সময় যদি তীর্থরাম অন্য কোথায়ও একটা চাকরী জুটাইয়া লন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় না। তীর্থরাম তাঁহাদের এই সহৃদয়তায় আপ্যায়িত হইয়া মিশন-কলেজের সহিত সকল সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেন। মিশন কলেজ ছাড়িয়া দিয়া তীর্থরাম গবর্ণমেণ্ট-কলেজে গণিতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। মিশন-কলেজে তাঁহাকে খাটিতে হইত ৫ ঘণ্টা; আর এখানে খাটিতে হয় ২ ঘণ্টা। সুতরাং তীর্থরামের পক্ষে এটা অনুকূল গলহস্ত বই কি!

ইতিপূর্বে তীর্থরামের মদনমোহন নামে এক পুত্র ও সুভদ্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মিশন-কলেজের গোলমাল যখন চলিতেছিল, সেই সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। স্ত্রী তখন মুরলীওয়ালাতে ছিলেন। ভগতজী তীর্থরামের কাছে এই সংবাদ পাঠাইলে তীর্থরাম তাহার জবাবে লিখিলেন—

আপনার পত্র পেয়ে জান্‌লাম, একটী ছেলে হয়েছে। সমুদ্রে যদি একটী নদী এসে পড়ে, তাতে সমুদ্র ফেঁপে ওঠে না; কিম্বা একটী নদীও যদি তাতে এসে না মিশে তো সে চুপসে যায় না। সূর্য্যের আলো যেখানে জল্‌ছে, সেখানে একটী প্রদীপ এনে রাখলেই বা কি, না রাখলেই বা কি? কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা আপনাকে কর্‌তে হবে কেন? আপনি তো জ্ঞানী নন—আপনি যে জ্ঞান-স্বরূপ! শরীরের সাথে আমাদের এতটুকুও সম্পর্ক আছে কি? শরীরের খবর শরীর আর তার সম্পর্কিত যারা, তারা জানে; প্রারব্ধের কথা প্রারব্ধে জানে; আপনার তাতে কি? আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহ-ঙ্কার নই, চিত্ত নই; জিহ্বা-কর্ণ নাসিকা-চক্ষু নই; আকাশ-পৃথ্বী-তেজ-বায়ু নই;—আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব—আমি শিব!"

সংসারে পিতার কাছে এমনতর সম্বর্দ্ধনা কোনও পুত্রই বোধ হয় পায় না। যার যেমন ভাব! সিদ্ধার্থের কাছে যখন খবর আসিল, তাঁহার ছেলে হই-য়াছে, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রাহুলো জাতো, বন্ধনং জাতং"—সিদ্ধার্থের কাছে সন্তান বন্ধন।

তীর্থরাম এই পুত্রের নাম রাখিলেন—"ব্রহ্মানন্দ," কেননা ব্রহ্মানন্দ বাস্তবিকই তাঁহার আত্মজ! লক্ষ্য করিবার বিষয়, পুত্রকন্যার নাম-নির্বাচনেও তীর্থরামের ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমের নূতন

জোয়ার মাত্র আসিয়াছে—এই সময় যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল, তীর্থরাম তাহার নাম রাখিলেন—'মদনমোহন', কেননা মদনমোহনই তখন তাঁহার আত্মজ। ইহার পরে আসিল কন্যা; মদনমোহনের ভগিনী 'সুভদ্রা' ছাড়া আর কি হইবে? আর সংসার-ব্রত উদ্‌যাপনের অন্তিম ক্ষণে আসিল—ব্রহ্মানন্দ।

এই সময় লালা হরলাল ও লালা নারায়ণ দাসের সঙ্গে তীর্থরামের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। লালা নারায়ণ দাস বর্ত্তমানে স্বামী রামতীর্থের প্রধান শিষ্য স্বামী আর্. এস্, নারায়ণতীর্থ। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং সরকারের অধীনে চাকরী করিতেন। বাল্যকালে আর্য্যসমাজীদের তত্ত্বাবধানে ইঁহার শিক্ষা-দীক্ষাদি আরব্ধ হয়। ধর্ম্মের প্রতি চিরকালই ইহার অনুরাগ ছিল। বেদান্ত পড়িবার আগ্রহও ছিল খুব, কিন্তু উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা পাইতেন না। অবশেষে 'রাম বাদশাহে'র সহিত সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয়। তিনি একান্ত অনুগত ভক্তের মত সর্বস্ব রামকে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। পরবর্ত্তী কালে স্বামী রামতীর্থ যখন বিদ্বৎ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হিমালয়বাসী হন, তখনও নারায়ণতীর্থ কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষাদি করিতেন। তীর্থরামের সহিত তাঁহার কিরূপে মিলন হয়, তাহা তিনি নিজেই এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রথমতঃ বেদান্তের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না। আর্য্যসমাজীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলাম বলিয়া ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার উচ্চস্তরের রহস্য বুঝিবার কিছুই শক্তি ছিল না। গীতা এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতাম, শাস্ত্র-পণ্ডিতদের কাছে গিয়া অর্থবিচারও করিতাম; কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যায় আমার চিত্তে শান্তি হইত না। বরং উল্টিয়া আমার চিত্ত নানা সন্দেহ ও তর্কবিতর্কের জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। এই সময় আমার বন্ধু লালা হরলালজীর আগ্রহে আমি রাম-ভগবান্‌কে দর্শন করিতে যাই। প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রেমবিহ্বল মূর্ত্তি ও আনন্দবিগলিত অবস্থা দেখিয়া আমার চিত্ত এমনই নুইয়া পড়িল যে, আমার সমস্ত সংশয়-বিপর্য্যয় যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মাত্র দুইদিন তাঁহার সঙ্গ করিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ নির্মূল হইয়া গেল। তাঁহার কাছে আমি রীতিমত গীতা ও উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম এবং সেই হইতে তনু-মন তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।" (ক্রমশঃ)

আঁধারের তারা

মেঘভরা আকাশের সারাখানি গায়
আভরণ হেন কারা মিটি-মিটি চায়!
নিরাশার আঁধারে কি আশা ঝিকিমিকি
বলে—ওরে তোর তরে জ্বলি ধিকি-ধিকি!
আয়, আয়, ও অভাগা ছুটে তুই আয়—
তোর পথ চেয়ে আছি আকাশের গায়!

জাতীয় জীবনে নারীর স্থান

——):*:(——

আমাদের দেশের নারীর জীবনাদর্শকে জাতীয় জীবনসমস্যার দিক হইতে যাচাই করিবার একটা প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা যায়। নারী-প্রগতির পরিণাম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া থাকেন। নারী-প্রগতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির যে একটা যুক্তি-সিদ্ধ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিষয়টার আদি আর অন্তটা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু মাঝের ধাপগুলাই বড় গোলমেলে ঠেকে। নারীর প্রগতি জাতীয় উন্নতিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে, এ কথা বলাও সহজ, শুনিতেও বেশ; কিন্তু কি করিয়া কোন্ বিশিষ্ট ধারা ধরিয়া ইহা সম্ভবপর হইবে, এ কথা লইয়া মতভেদ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, সামাজিক বিষয়কে ভাবের দিক হইতে আলোচনা করা সোজা; কিন্তু বাস্তবের সহিত তাহার সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। কোনও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধেই সার্ব্বভৌমভাবে একটা শেষ কথা বলিয়া ফেলা একেবারেই অসম্ভব; এমন কি আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত Statistical account দিয়াও একটা সমাজের প্রকৃত অবস্থার যাচাই কখনও নির্ভুল হইতে পারে না। একটা মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে জল্পনা যেমন কোনও অবস্থাতেই নিখুঁত হইতে পারে না, সমাজ সম্বন্ধেও তাই; একটা কথার হাজারটা প্রতিবাদের ছিদ্র থাকিয়াই যায়।—তথাপি সামাজিক সমস্যা নিয়া আলোচনায় একটা লাভ আছে—যদি সে আলোচনাকে আমার ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধির সাফাইরূপে গ্রহণ করি। ইহা ছাড়া, এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা সমষ্টিগত সমস্যার যে কোনও সমাধান হয়, ইহা আমরা মনে করি না।

নারী-প্রগতির আদর্শটা আমরা পশ্চিম হইতে লইয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে মেয়েরা যে ভাবে আছে, সমষ্টি-সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়া আমরা তাহার কোনও মূল্য দিতে নারাজ। আমরা মনে করি, ভারতের নারী যদি ইউরোপের নারী হইত, তাহা হইলে বুঝি আমাদের লজ্জা দূর হইত। সমাজের মাথায় মুষ্টিমেয় নারী-পুরুষকে ইউরোপীয় আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তোলা সহজ-সাধ্য ব্যাপার বটে; কিন্তু তাহাতে জাতির কি লাভ? অভিজাতবর্গের ওই তিল-প্রমাণ সিদ্ধি সমগ্র জাতির পক্ষে রাতারাতি সুলভ হইয়া উঠিতেছে না কেন, বক্তৃতার রঙ্গপীঠ হইতে আমরা এই বিলাপই শুনিতে পাই। কিন্তু গোটা ভারতীয় জাতিটাই ইউরোপীয় জাতিসমূহের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে না কেন, ইহার জবাব কি?

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনোবল, শিল্প-বাণিজ্য, ধনোৎপাদন শক্তি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল দিক দিয়াই ভারতীয় জাতি বর্ত্তমান জগতের পদানত। জাতিগত এই বৈষম্য কি ব্যক্তিতেও বর্ত্তাইবে না? জাতিগত এই হীনতার কাছে নারীর প্রগতি কেন, নরের প্রগতিও কি খর্ব্ব হইয়া রহে নাই? ইংরাজের মেয়ে যা খুসী তাই করিতে পারে, আমাদের দেশের মেয়েরা তা পারে না কেন? তাহার উত্তর শুধু এই নয় যে, ইংরেজের মেয়ে আপন দেশে সকল রকম field পায়, আমাদের মেয়েরা তা পায় না। বরং এই কথার যথার্থ উত্তর এই যে, জগৎটা ইংরেজ জাতির মুঠোর মাঝে বলিয়া ইংরেজ মেয়ের field শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও; এবং সে field তাঁহাকে লড়িয়া পাইতে হয় না, জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে তাহা আপনি তাহার দুয়ারে আসিয়া ধন্না দিয়া থাকে। মাঝে মাঝে দেখি অবলা-বান্ধবেরা

Statistics দেখাইয়া খেদ করেন, "অমুক দেশে মেয়েদের মাঝে এতগুলি শিক্ষয়িত্রী, এতগুলি কেরাণী, এতগুলি কৌঁসুলী; আর আমাদের দেশের মেয়েরা" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কথা হইতেছে কি, অন্যদেশের মেয়েদের এই scopeটা গড়িয়া উঠে তাহাদের খেয়ালে নয়, আবদারে নয়, হুমকিতে নয়—নিছক রাষ্ট্রের তাগিদে; আমাদের দেশে সে তাগিদটা কোথায়? বর্ত্তমান নারী-প্রগতির বিবরণীটা যখন কাগজে-কলমে বাহির হয়, তখন ভাবখানা এমনই দেখা যায়, যেন সকল দেশেই নারীরা পুরুষের উপর টেক্কা দিয়া একটা হক্ আদায় করিয়া লইল। আমরা বলি, অপর দেশের পুরুষেরাও যে এই কথাটা মানিয়া লয়, ইহা তাহাদের spirit of chivalry ছাড়া আর কিছুই নয়, যদি জাতির গরজ না থাকিত, তাহা হইলে এই হক্ আদায় করাটা সহজ হইত না।

আজ মনে কর, কলে-কৌশলে ব্যবস্থাপরিষদে আইন পাশ করাইয়া দশ-বিশ হাজার "শিক্ষিতা" নারীকর্ম্মীর সৃষ্টি করিয়া লইলাম; কিন্তু তাহারা করিবে কি? বিদেশে দূরে থাকুক, এই দেশেই তাহাদের field কোথায়? শুনি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্র, পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ছাত্র নাই; এক বাংলা দেশ হইতে প্রতি বছর যত গ্রাজুয়েট্ বাহির হয়, সমগ্র গ্রেট্‌বৃটেন্ হইতে তাহার অর্দ্ধেকও নাকি বাহির হয় না। কিন্তু তবুও তো চোখের উপর দেখিতেছি, এই এত বড় তথাকথিত efficiency'টা মাঠে মারা যাইতেছে, শিক্ষার বিস্তারে দেশের শ্রী এতটুকুও ফিরিতেছে না। এই ভারতবর্ষের মধ্যেই তো দেখিতেছি, বাঙ্গালী জাতটা আকণ্ঠ বিদ্যায় বোঝাই করিয়াও অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বেহারী, উড়িয়ার কাছে দিন দিন জীবনযুদ্ধে হটিয়া যাইতেছে! বাঙ্গালীর আদর্শের মোহ সফল হইল; কিন্তু তবুও সে ফীল্ড্ পাইল না কেন? পুরুষেরই যখন এই দশা, তখন মেয়েদের ফীল্ড্, স্কোপ্ ইত্যাদি নিয়া অত ডাকহাঁক, অত লম্ফঝম্প, অত অম্বরটিপুনী—সমস্তই অসার মনে হয় না কি? শিক্ষিত-সুসভ্য বাঙ্গালীর সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য করিতকর্ম্মা জাতির যে সম্পর্ক, ভাবুক ভারতবর্ষের সঙ্গে মহাকর্ম্মী ইউরোপীয় জাতিগুলির সেই সম্পর্ক। মূলে এই ভেদটুকু আছে বলিয়াই ওদেশের ছেলেরাও যেমন স্কোপ্ পায়, মেয়েরাও তেমনি পায়; আমাদের দেশের ছেলেরাই রস্তা চুষিতেছে, মেয়েদের আর কি জুটিবে বল? বিশ্বের হাটে ভারতমাতার উপর জোগানোর ভার পড়িয়াছে কতকগুলি কুলী, মজুর আর কেরাণী; মাতা ইউরোপা জোগাইবেন জগজ্জয়ী বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক, দার্শনিক। কাজেই ভারতমাতাকে হাঁড়ি বেড়ীর গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইবার বড় দরকার পড়ে না; কিন্তু মাতা ইউরোপার শুধু হেঁসেল আগলাইয়া বসিয়া থাকিলে তো চলে না। এই যে দুজনার গৃহস্থালীতে এত ব্যবধান—বিজেতা-বিজিতের ব্যবধান, খাদ্য-খাদকের ব্যবধান, খাতক-মহাজনের ব্যবধান—শুধু চুলছাঁটার আর হাওয়া-খাওয়ার ফ্যাশানটা ধার করিয়া আনিলেই কি এই ব্যবধান ঘুচিবে? তোমাদের সে প্রাণ কই? কেবল চায়ের মজলিশে বসিয়া বাপদাদার উপর অম্বরটিপুনী ঝাড়িলেই কেল্লা-ফতে হইবে? বাপদাদারা মূর্খ ছিলেন, অসভ্য ছিলেন, তবুও ঝি-বউ লইয়া সুখে ঘরকন্না করিয়া গিয়াছেন; তোমাদের যে সে সামর্থ্যটুকুও নাই!

আসল কথা হইতেছে কি, এই যে 'ন্যাশন' বলিয়া একটা বস্তু পশ্চিমে গড়িয়া উঠিয়াছে, ওই বালাইটাই আমাদের নাই। এক এক জাতির এক একটা আদর্শের মোহ থাকে; সেই আদর্শই হয় তার অভ্যুদয়ের কারণ। পশ্চিমের যত কেরামতী দেখিতেছি, তাহার মূল হইতেছে ওই ন্যাশন গড়িবার

ক্ষমতা। ভারতবর্ষের এই ক্ষমতাটুকু নাই। বাহ্য জগতের সঙ্গে তাহার কারবার ছিল না বলিয়া যে সে national solidarityর অভাব অনুভব করে নাই, তাহা নয়; ইতিহাস প্রমাণ দেয়, বাহ্য-জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের অতি ঘনিষ্ঠ কারবারই ছিল। কিন্তু তাহার ধরণটা ছিল স্বতন্ত্র। দণ্ডকারণ্য যাহারা colonise করিয়াছিল, তাহারা সেখানে Sugar-plant প্রতিষ্ঠা করে নাই, যজ্ঞশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; Further Indiaকে ভারত-বাসী State-policy দেয় নাই, দিয়াছে culture। কিন্তু স্থূল-জগতে State-Policyরই জয় হয়; তাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া Saracenic সভ্যতার কাছে হিন্দু সভ্যতাকে মাথা নোয়াইতে হইয়াছে—ধর্ম্ম হিন্দুকে বাঁচাইয়াছেও, আবার মারিয়াছেও। গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় যে ideal, সেখানে হিন্দু-ভারত এক, ওইখানে তার Solidarity; কিন্তু সে সংহতি-ভাবে, শাস্ত্রের শ্লোকে; বাস্তবে হিন্দু বড় বিশৃঙ্খল, বড় অকর্ম্মণ্য। হিন্দুর একাত্মবোধ কোথায়? ধর্ম্ম বাঁচাইতে গিয়া হিন্দু একই ভাবে react করে, এইটুকু মাত্র তাহার মাঝে সাম্যের বীজ। এটুকু আত্মরক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আত্ম-সংগঠনের বেলায় এই uniform reactionএর মূল্য বড় বেশী নয়। গত পঞ্চাশ বছরের মাঝে কোনও উদ্যোগমূলক কাজে আমরা হিন্দু massএর কোনও সাড়া পাই নাই; কিন্তু সমাজের সংস্কার-মূলক কোনও তুচ্ছ ব্যবস্থাতেও দেখিয়াছি, সমগ্র হিন্দু massএর টনক নড়িয়াছে। শুধু এই ধরণের negative responseকে পুঁজি করিয়া nation গড়া চলে না।

Spanish Armada বিপুলায়তন হইয়াও ইংরাজের ক্ষুদ্র নৌবলের কাছে বিধ্বস্ত হইয়াছিল কেন, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া ঐতিহাসিকেরা বলেন, স্পেনের যুদ্ধজাহাজগুলি ছিল বেসামাল রকমের প্রকাণ্ড, ঘটোৎকচের মত এক অক্ষৌহিণী চাপিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু নড়িতে-চড়িতে গেলেই বিপদ: ইংরেজের ছোট ছোট জাহাজ, কাঠ-বিড়ালীর মত তড়াক্ করিয়া ঘুরিতে ফিরিতে পারে, তাই সহজেই স্পেনিস জাহাজগুলিকে তাহারা কাবু করিয়া ফেলিল। ভারতবর্ষের দশাটাও সেই রকম। একটা মহাদেশের মত দেশ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন সমাজ—কাজেই নড়িতে চড়িতে ছয় মাস। ইউরোপের জাতিগুলি তাহার তুলনায় কত ছোট, কত চট্‌পটে, কত সহজে সংহত, অতএব কত শক্তিশালী। দুইটা জাতির এই মৌলিক বিভিন্নতা-টুকু সমাজসংস্থানেও আসিয়া বর্ত্তাইয়াছে। প্রত্যেক সমাজের পরিবারই ভিত্তি; কিন্তু সেই পরিবারের স্বরূপ ইউরোপে আর ভারতে বিভিন্ন। ভারতবর্ষীয় সমাজ পরস্পরবিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের একটা নড়্‌বড়ে সমষ্টি; আয়ত্তের বাহিরে বলিয়াই সমষ্টির জন্য তাহার কোনও দরদ নাই। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে একটা পরিবারেই গোটা রাষ্ট্রের একটা প্রতিবিম্ব পড়ে। স্থাবরধর্ম্মী বলিয়া ভারতবর্ষের পরিবারের এতদিন বাহিরটা বাদ দিয়াও দিন কাটি-য়াছে; কিন্তু জঙ্গমধর্ম্মী ইউরোপের পরিবারে চৌদ্দ-আনা কারবারই বাহিরকে লইয়া। নারী পরিবারের নিয়ন্ত্রী উভয়ত্রই; কিন্তু আকৃতিসংস্থানের প্রভেদ-হেতু উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহাতে উভয়ের জীব-নাদর্শেও এত আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা দিয়াছে। এই তফাতের দরুণ ইতিহাস দায়ী।

ভারতের নারীকে ইউরোপের নারীতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে ভারতবর্ষের সমাজ ভাঙ্গিতে হয়; শুধু সমাজ নয়, রাষ্ট্রও ভাঙ্গিতে হইবে, বিশ্বের দরবারে আজ ভারতবর্ষের যে স্থান, তাহার পূর্ণ বিপর্য্যয় না ঘটিলে ভারতবর্ষের সমাজ ভাঙ্গাটা কোনও কাজেই আসিবে না। কিন্তু সে কি সহজ

কথা? আর যতদিন এই কথাটা সহজ না হইতেছে, ততদিন নারী-প্রগতি তো দূরের কথা, নরের প্রগতিটাও অজাযুদ্ধ-ঋষিশ্রাদ্ধের তুল্যমূল্য হইয়া থাকিবে। ইউরোপের কতকগুলি ফ্যাশান ধার করিয়া আনিলে কিছুই হইবে না; ল্যাজে ময়ূর-পুচ্ছ গুঁজিলে কি হইবে, আসলে যে আমরা দাঁড়-কাক! নারীপ্রগতির যতগুলি আদর্শ ওদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটীর সঙ্গে Economics ও Politicsর সমস্যা জড়িত। এই সমস্যাকে ঠেকাইয়া রাখিবারও কোনও উপায় নাই। একদিকে বিত্তসঞ্চয়ের দুর্দ্দম লালসা, আর একদিকে কোনোরকমে দুটী অন্ন খুঁটিয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকা; এই দুইটী আদর্শে লড়াই বাধিয়া গিয়াছে। শক্তি-হীনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা নিজের ঘরের আঙ্গিনা ছাড়িয়া বেশী দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নন, পূর্ব্বপুরুষের গৌরবগাথা গাহিয়া তাঁহারা আত্মতৃপ্তির ভাণ করিতে পারেন বটে; কিন্তু জানিয়া রাখিবেন, তাঁহাদের ঘরেও আগুন লাগিয়াছে। পুড়িয়া মরিতে হইবে সকলকেই—তবে দুদিন আগে আর পিছে।

কি করিয়া এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা বলা বাস্তবিকই কঠিন। রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী যখন নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-নীতির আমদানী করিলেন, তখন মনে মনে সকলেই বুঝিয়াছেন, দুর্ব্বলের পক্ষে আত্মবলের মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া দুর্ব্বলতার আর কি সাফাই হইতে পারে? তাই আমাদেরও গুঁতা খাইয়া সেই সনাতন বিবরে ঢুকিয়া পড়া ছাড়া আর কোনও ভদ্র উপায় হাতে আছে কি? হয়ত এইটাই আসল কথা; এ জাতিটার মরণ বুঝি অনিবার্য্য; হয়তো বা ঘোর কলিতে পশুবলেরই জয়জয়কার হইবে। ওরা পশু, আমরা মানুষ—এই নিরীহ আস্ফালনেরও পথ রাখি নাই; দেখি, আমরাও তো পশু—অথচ সবল পশুও নই; পরিণামে কি আছে, কে বলিতে পারে? এই সমস্ত দিক চিন্তা করিলে তখন মনে হয়, এই যে গণতন্ত্র, নারীপ্রগতি ইত্যাদি নিয়া আমরা লাফা-ঝাঁপি করিতেছি, এ কি রাহুর শিরঃপীড়া নয়? জাতটা বাঁচিবে কিসে, সেই চিন্তাই না বড়; মেয়ে-মর্দ্দের অধিকার-ভাগ তো পরের কথা। কিন্তু আমরা আগেই কালনেমির মত লঙ্কা ভাগ করিতে বসিয়াছি!

পরশ

কাজের ফাঁকে একটুখানি
সেই যে দেখা পাই—
অনেকখানি অর্থ তাতে
অনেক ভুলে যাই।
একটুখানি স্মৃতির রেখা
দাও যে তুমি টানি—
সঙ্গে তাহার অনেকখানি
অর্থ থাকে জানি!
লয় যে তাহাই মনটী কেড়ে
একটী সুরে বাঁধি;—
তারেই সফল কর্‌তে যেন
জীবন্‌ ভরে কাঁদি!

সত্য-সাধক

—):*:(—

জীবনের গতি দুই দিকেই ; অধোদিকেও, উর্দ্ধদিকেও। দৈনিক জীবনে দেখি, সমস্ত বুঝে-শুনেও যেমন মনটাকে কিছুতেই নীচের দিক হতে উপর দিকে টেনে তুল্‌তে পারি না, তেমনি আবার এক এক সময়ে অকারণে কত উচ্চ ভাব সৎ ইচ্ছা বা মহৎ প্রেরণার উদয় হয়। এমনি অযাচিতে মনের উর্দ্ধ-গতির কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা হয়ত দার্শনিক ভাবে তার পূর্ব্বকৃত সুকৃতি-দুষ্কৃতির বোঝা টেনে নিয়ে আস্‌ব, কিন্তু সোজাসুজি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করলে দেখি, এমন কত অজস্র ঘটনা আমাদের আশে-পাশে ঘট্‌ছে যে, সে সমস্তের মূলে কোনও আইন আমরা খুঁজে পাই না, অথচ বেশ একটা ধারায় যেন ক্রমান্বয়ে পর পরই তারা আসে। জীবনের মাঝে এমনি উত্থান-পতন, চিন্তার মাঝে দিবারাত্রি, প্রভৃতি যেন পালা করে একটীর পর একটী জাগ্‌তে থাকে। যখন জীবনে রাত্রি আসে, তখন যেন যা আসে, তাই হতাশাব্যঞ্জক—আশার আলোক জ্বলেও জ্বল্‌ছে না, পেয়েও পাচ্ছি না—এমনি একটা ভাব। কিছুতেই চিত্তের জড়তা, দেহের অবসাদ দূর হচ্ছে না, আবেষ্টনীর মাঝেও কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি চারদিক আঁধার করে ঘিরে বসে। আবার যখন দিন আসে, তখন কেমন করে কোন্ দিক্ দিয়ে কখন যে রাত কেটে গেল, তা টের পাওয়া যায় না। আপনি যেন চারিদিকে আশার আলোকে চরাচর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; দেহে মনে-প্রাণে নূতন উদ্যম, নব-চেতনা ফিরে আসে ; পারিপার্শ্বিকের মাঝেও সে আনন্দে নবীন প্রাণের স্ফুরণ হ । লোকে বলে, ওর কপাল খুলে গিয়েছে !

শাস্ত্রেও বলে, প্রকৃতি উভয়তোবাহিনী। ভোগ অভিমুখীও যেমন তার গতি রয়েছে, তেমনি আবার অপবর্গাভিমুখীও তার প্রগতি রয়েছে। আগে মনে হত, কোনও প্রকার দৈব উপায়ে যদি প্রকৃতির অধঃস্রোতকে একবার বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে বুঝি সে ধাঁ করে হাউইয়ের মত একেবারে স্বর্গে নিয়ে যাবে ; আর বুঝি একটুও নাম্‌তে হবে না — দুঃখ মলিন জগৎটার ত্রিসীমানায়ও বুঝি আর আস্‌তে হবে না। এখন দেখি, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সাধারণতঃ যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণবশতঃ কোনও জিনিষ উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলেও কিছুদূর পর্য্যন্ত আমার দেওয়া বেগ নিয়ে তা উপরে উঠে আবার পৃথিবীর আকর্ষণে মাটীতে এসে পড়ে, তেমনি মানুষের অন্তর্জ্জগতেও নিম্নাভিমুখী কিছু না কিছু টান রয়েছে। তাই উপরে উঠলেও আবার পতনের ভয় আছে। যে যত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, পতনের বেগ তার তত বেশী, এ নিয়মও স্থূল সূক্ষ্ম উভয় জগতেই খাটে। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে এই স্থূল ও সূক্ষ্মশক্তির পরখ করা যায়। মানুষের দৈহিক শক্তি যতই বেশী হোক্ না, তবু সে কিছুতেই এত উর্দ্ধে কিছুকে তুল্‌তে পারে না, যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ গিয়ে পৌঁছায় না। তাই যতই উপরে তোলা হোক্, তা আবার পড়বেই, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে মানুষের এ দৈন্য নাই। নিজের শক্তি যদিচ সীমাবদ্ধ, তবুও মহত্তম অন্য কোনও শক্তির আশ্রয় নিয়ে সে এত উর্দ্ধে উঠে যেতে পারে যে, যেখানে প্রকৃতির আকর্ষণ গিয়ে আর নাগাল পায় না। প্রকৃতি তখন লজ্জাবনতমুখে তার কাছ থেকে সরে যায়। আর যে মহত্তম শক্তির আশ্রয়ে মানুষ এমন ভূমিতে যেতে সক্ষম হয়, তাকেই হিন্দু বলে গুরুশক্তি। গুরু বলতে কেবল এক জন দেহধারীকেই সে বোঝে

না। প্রতিমায় যেমন দেবতার প্রতীক্ কল্পনা করে সে তাঁর পূজা করে, তেমনি গুরুশক্তিবলে সেই মহত্তম শক্তি একজন দেহধারীর অধিগত হয়েছে বলে তাঁকে সেই শক্তির আধার জেনেই মানুষ তাঁর শরণ নেয়। বস্তুতঃ গুরুশক্তি কোনও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর কথা নয়—সমস্ত ধর্ম্মে, সব সম্প্রদায়েই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী রয়েছেন, তিনিই গুরুরূপে সেই পন্থায় অপর দশজনকে টেনে নিয়ে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করান। এই গুরু বল্‌তে ব্রহ্মবিদ্ গুরুকেই উপনিষদে নানারূপে স্তুতি করা হয়েছে। সেখানে যম নচিকেতার গুরু; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের গুরু।

অধঃস্রোত থেকে উর্দ্ধস্রোতের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করা অবশ্য গুরুর কাজ, কিন্তু আবার প্রত্যেক মানুষের মাঝে উর্দ্ধদিকে উঠবার একটা আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে। আকাঙ্ক্ষানুযায়ী মানুষের আদর্শ বড় হয়। আর সে আদর্শে পৌছাবার মত কিছু না কিছু শক্তি তার মাঝে নিহিত থাকেই, নতুবা সে বাসনা তার মনে জাগত না।

'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ' নীতিটা বিধাতার সৃষ্টি রক্ষার যেন একটা মহা সূত্র। আমাদের মনে যে সমস্ত কামনার উদয় হয়, তার সার্থকতা লাভ কর্‌বার মত শক্তি ও আবেষ্টনীর সুযোগ কোনও না কোনও সময়ে এসে পড়বে বলেই যেন আগে থেকে অমন ইচ্ছার উদ্ভব হয়। কিন্তু তা বলে শুধু সাময়িক ইচ্ছার বশেও সব সময় কিছু ঘটে না। সে ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অনেকখানি প্রচেষ্টার দরকার হয়। গুরুশক্তি বা মহতী প্রেরণা যেমন একভাবে উঁচু দিকে নিরন্তর আমাদিগকে প্রচোদিত কর্‌ছে, তেমনি অধোদিকেও ভোগলিপ্সু মনের টান কিছু কম নয়। আবার সূক্ষ্ম-লোকেও যে সমস্ত মিশ্রশক্তি আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রতিনিয়ত আমাদিগকে তাদের দিকে টান্‌ছে, তাদের মাঝেও ভোগ ও অপবর্গ ভেদে দুই শ্রেণীর সহায়ক রয়েছে। যে দিকে আমাদের ঝোঁক বেশী হয়, সেইদিকের সাহায্যকারীরা এসে আমাদের সে বিষয়ে চিন্তার যোগান দেয়। তাই দেখা যায়, যখন কেউ মন্দ একটা কাজ কর্‌ল, তখন কিছুতেই যেন আর সে সাম্‌লিয়ে উঠতে পার্‌ছে না। ক্রমাগত একটার পর একটা মন্দ ব্যাপারই তার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। আমরা বলি, সে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে সে দুর্ব্বল বলে মন্দশক্তিরা তাদের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে বেচারী তাতে বাধা দিয়ে নিজের আসন অটল রাখতে কিছুতেই পার্‌ছে না। উন্নত আশ্রয়ের প্রয়োজন এইখানেই। আমার মাঝে দেবতা, ভূত উভয়ই পাশাপাশি রয়েছে; যার পূজা কর্‌ব, সেই তার কোটে আমায় টেনে আন্‌বে। কিন্তু যদি ভাল-মন্দ বিচারের বিবেক থাকে, তবে আত্মগত সেই গুরুশক্তির সহায়ে প্রাণপণে দেবতার দিকেই মন ছুটবে। সংগ্রামে জয়ী করে যাকে এনে ভিতরে বসাব, সেই পরের রাস্তা বলে দেবে। তবে নিম্ন দিকের পথ সীমাবদ্ধ, তাই মানুষ নরকের কীট হয়ে তৃপ্তি পায় না—পাপের চূড়ান্ত করেও তাকে ফির্‌তেই হয়। কিন্তু স্বর্গ বা অমৃতের পথ অনন্ত বিস্তৃত, তাই সে দিকে যত যায়, তত পায় - কেউ ফির্‌তে চায় না। ভোগের শক্তি মানবের অতি অপ্রচুর—যেমন ধর লোভী, সে আর কত খাবে? মনে যাই থাক্, পেট তো বহু আগেই অক্ষমতার আবেদন পেশ্ কর্‌বে!

সুতরাং অনন্ত জ্যোতিঃর পথেই আমাদের চল্‌তে হবে। জানি, রাত্রিদিন জীবনে স্বাভাবিক, কিন্তু রাত্রিটাকে ঘুমিয়ে পার করে কোনমতে তার দীর্ঘত্ব ভুলে গিয়ে দিবসেই আমাদের কর্ম্মের বিধান। তাই আশার কথা, আলোর কথা, মঙ্গলের কথাই আমরা বল্‌ব, চিন্তা কর্‌ব। আর এই পথকে উজ্জ্বল

রাখবার ক্ষমতা আমাদের আছে কিনা, তাই পরখ করতেই আসে—দুঃখ, বিপদ, অন্ধকার রাত্রি। আত্মগত ঊর্দ্ধশক্তির প্রেরণায় যদি সে আক্রমণ সহ্য করতে পারি, তবে দেখব, অধঃশক্তির স্থায়িত্ব অতি অপ্রচুর। সংগ্রাম করতে করতেই উষার নবারুণ এসে উদয় হবে। সে জ্যোতিঃস্পর্শে লজ্জিত মোহ সব অদৃশ্য হবে। আলোর সঙ্গে জয়, আনন্দ শান্তি এসে হৃদয় জুড়ে বসবে। জয়ের পূর্ব্বে সংগ্রাম, আর সংগ্রামকালে এগুনো পেছুনো স্বাভাবিক। স্কুলের মত ধাঁ করে উপরে ওঠা যায় না—দুহাত ওঠে তো একহাত নামে। কিন্তু বাকী ঐ এক হাত হল তার জয় বা জমা। প্রকৃতির ঊর্দ্ধস্রোতে দেবযানের পথে চলা সুরু হলেও নিবৃত্তি নাই। কে জানে, কোন অনন্তের কোলে আমার বর্ত্তমান অদৃশ্য কোন্ লোকে গিয়ে গতির শেষ হবে। সেখানে কবে গিয়ে কি পাব না পাব, তার ভরসা কি? তাই উপনিষদ্ বলছেন—যা পাব, এই এখানে এখনই পাব, নইলে হারব—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

যদি ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে সত্যলাভ হয়, তবে এখানেই হবে। এখানেই সত্যকে জানব, যদি এখানে না পাই, তবে মহামরণ। দৃঢ়সংকল্পী প্রতি ভূতে ভূতে আনন্দ চয়ন করতে করতে এই লোক পার হয়ে অমৃত লোকেই গমন করেন। সত্য-সংকল্পে দৃঢ়চিত্ত সাধক, এমনি 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' পণ করে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সেই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পের তেজে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়—বিশ্বভুবন জ্যোতির্ম্ময় আনন্দলীলার নিদান হয়। কোটী-সূর্য্য-সমপ্রভ সেই দিব্য তেজের সম্মুখে কোথায় থাকে সেই পূর্ব্ব জীবনের মসীলিপ্ত দুঃখের ইতিহাস, কোথায় থাকে পাওয়া-নাপাওয়ার দ্বন্দ্ব!

——:*:——

শরণাগতি

—*†()†*—

নিজকে সব সময় আর বয়ে বেড়ানো যায় না. কোথাও না কোথাও বোঝা খালাস করবার জন্য মনটা এক এক সময় আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু বোঝা খালাস করে লাভ? সে কি সোয়াস্তি, আরাম?

এইখানেই কিন্তু একটা খটকা। বোঝা নামাতে হলে নুইতে হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু অন্তর কি তাতে দৈন্যভারে পীড়িত হয়, না আনন্দের দ্যুতিতে জলে ওঠে? নুইতে গিয়ে যদি মুখ থুবড়ে পড়েই গেল, তাহলে না নোয়াই বুঝি ভাল ছিল! তার চাইতে বোঝার চাপেও মাথা উঁচু রাখতে গিয়ে যদি ঘাড় ভেঙ্গে পড়তে, তোমার অন্তর্য্যামী বলতেন—বলিহারি!

বাস্তবিক নুই যে, সে তো বুক চিতিয়ে মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াবার দরুণই। বোঝাটা আমার বাইরের; তাই তার ভার বওয়া আমার পক্ষে দৈন্য। কিন্তু যাকে আমার আপন করে নিয়েছি, তার বোঝা তো আমায় নুইতে দেয় না। খাবারের

বোঝা পিঠে বইতে গেলে মাজা বেঁকে যায়; কিন্তু পেটে বইতে পারলে তাই হয় প্রাণের জোগানদার।

শুয়ে পড়াটা শুয়ে পড়া নয়, এই কথাটা বার বার ভুলে যাই বলেই পদে পদে আমাদের কেবল ঠোক্কর খেয়ে মরতে হয়। অর্জ্জুন বল্লেন, হে হৃষিকেশ, আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝ্তে পারছি না, আমি তোমার কাছে প্রপন্ন, তুমি আমায় শাসন কর। সতের অধ্যায় ব্যাপী শাসন চল্ল ভগবানের। কিন্তু গীতার ওই এক ধুয়া—শুয়ে পড়ো না, হৃদয় দুর্ব্বল করো না—ওঠ!

উঠবো বলেই তোমাকে ধরেছি—এই শরণাগতিতে বীর্য্য আছে; এ অনার্য্যজুষ্ট ধর্ম্ম নয়, ফন্দীবাজী নয়। তুমি আমার ষোলআনার ওপর আঠারোআনা; আমার ষোলআনাতেও তো কুলায় না; আরও চাই, তাই তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি। এই হচ্ছে শরণাগত বীরের কথা।

কিন্তু এখন দুর্ব্বলতায় আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরেছে। চাই কেবল ফিকির, সস্তার বেসাতী। তাই শরণাগতির অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আমি কিছু করতে পারব না বাবা, তুমি যা কর!

কথাটা এক হিসাবে ঠিক। বাস্তবিকই তিনিই যা করান, তুমি আমি কি আর করতে পারি! কিন্তু ও কথাটা গোড়ার কথা নয়, ও শেষের কথা। আমার কর্ত্তৃত্ব ঘুচলে তবে না তাঁর কর্ত্তৃত্ব চোখে পড়ে। তখন হা-হুতাশ আস্বে কেন? তমোতে এসেই বা ঘিরে ধর্বে কেন? এতদিন আমিই করছিলাম, ভেবেছিলাম আমি বুঝি একা; তাই পদে পদে ছিল শঙ্কা আর অস্বস্তি। আজ যখন দেখ্ছি, আমার হাতের পেছনে রয়েছে তোমার শক্তি, তবে আর ভয় কি! মত্ত হস্তীর বল এসে পড়্বে না হাতে! বলব, হে রাম, আমি তোমার শরণাগত; যা হচ্ছে এ আমার নয়, তোমার; এতদিন দেওয়ালের ফুটোর ভিতর দিয়ে আলো আস্‌ছিল, আজ দেওয়াল ভেঙ্গে পড়্লো, অজস্র আলোক-পাতকে বারণ করে কে? এই কি শুধু একই দেহে তোমার লীলা? শত সহস্র প্রাণে তোমার প্রেরণা—সব আমি—সব তুমি! কোথায় ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য! ইচ্ছাও যে কর্তে হয় না, প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভের মত দিব্য বাসনার স্ফুরণ আমাতে—সে তো আমার নয়, তোমারই প্রেরণা! হে রাম—আমি তোমার শরণাগত!

বাবা, শরণাগতি কি সোজা কথা! কিছুই কর্‌ব না, অথচ তোমায় দখল করে থাক্‌ব ষোল আনা—এ কি সোজা বুকের পাটা! তাই তো সতের অধ্যায় গীতা পার করে তারপর তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাণে ওই শরণাগতির মন্ত্রটী দিলেন।

আগে বিশ্বরূপ দর্শন হওয়া চাই, তবে শরণাগতি সার্থক হবে। কার শরণাগত হচ্ছ, সে খেয়াল আছে? অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আগে চিন্‌তেন না; তখনও একবার শরণ নিয়ে বলেছিলেন, তুমি আমাকে নিয়ে যা খুসী তাই কর। সে সমর্পণ তো শ্রীকৃষ্ণ সহজে নিলেন না। বিশ্বরূপ দেখে অর্জ্জুনের চমক ভাঙ্‌ল; বল্লেন, এতদিন তোমাকে কি ছোট নজরেই না তোমাকে দেখে এসেছি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি যে জগন্ময়, তা তো জান্‌তাম না। এই অনুভবের পর ভক্তির বীজ বপন করা হল। তারই চরম ফল হল—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—তুমি সকল ধর্ম্ম ছেড়ে আমাকে একমাত্র জেনে শরণাগত হও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি দেবো; শোক করো না।

শরণাগতিরও সর্ত্ত আছে। দেখ্ছি, সকল ধর্ম্ম ছাড়তে হবে। তার মানে? ধর্ম্ম হচ্ছে প্রকৃতির আইন। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতির চব্বিশ

রকমের বাঁধন। বেদান্ত আরও সংক্ষেপ করে বল্লেন, আত্মার পাঁচ রকমের আবরণ, তাই প্রকৃতির বাঁধন। এইগুলিই ধর্ম্ম।—দেহের ধর্ম্ম, প্রাণের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, আনন্দের ধর্ম্ম। প্রত্যেকটা ধর্ম্মই সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তার আর গণ্ডী ছাড়া কিছুই নয়। গণ্ডী পড়েছে বলেই এক বহু হয়েছেন। বহুর মাঝে একেকে না জানাই হচ্ছে পাপের মূল। যদি ধর্ম্ম ছাড়তে পারি, দেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞানের-আনন্দের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারি, একেকে জানতে পারি, তবে পাপমুক্ত হব, তখন আর শোক থাক্‌বে না। সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে যে ঈশ্বর বসে আছেন, যন্ত্রারূঢ়ের মত সকলকে যিনি পরিচালিত করছেন, সেই অন্তর্য্যামীর এই আহ্বান—সকল ধর্ম্ম ছেড়ে আমার শরণাগত হও! আমি তোমার সকল দুঃখ দূর করব।

তাই বলছি, শরণাগতি যে গোড়ার কথা, ওটা এক রকম ফাঁকি; আসলে শরণাগতি হচ্ছে শেষের কথা। শরণাগতি আপনা থেকে আসবে। কুঁদোর মুখে বাঁক থাকে না। এই যে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির এত বড়াই, একদিন এ ভেঙ্গে পড়বেই। সে ভেঙ্গে পড়া তাদের পরাভব নয়, পরম গৌরব। সেই গৌরবের জন্যই তাদের তিলে তিলে প্রস্তুত করা। এই কষ্টটুকু শেষ পর্য্যন্ত আছেই, যে পর্য্যন্ত নাকি তাঁর আনন্দ এসে সব কর্ম্ম হরণ না করছে। শরণাগতি মানে কর্ম্মছুট্‌ নয়। বরং যে শরণ নিতে চায়, তার কাজ আরও বাড়ে। তার পুঁজি ফুরাবার তাগিদ্‌; কাজেই তার ছুটি কোথায়? অহরহ খুঁচিয়ে ফিরতে হবে নিজের আনাচ কানাচ, কোথায়ও যদি একটুকু মমতা বেঁচে থাকে! আমার সব যাবে, তবে তাঁর সব পাব।

তাই বল্‌ছিলাম, শরণ নিতে হলেও যদি কর্ম্ম হতে ছুটি না পাই তো শরণাগতির বাহানা করে মুখ থুব্‌ড়ে পড়া কেন? শরণাগত হয়েছি বলে দীন হব কেন? বরং তাঁর হয়েছি বলে তেজে চিত্ত উদ্ভাস্বর হয়ে উঠ্‌বে। এখন গীতার আদি উপদেশ আর শেষ উপদেশ, দুটো মিলিয়ে শরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি—

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!
> সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ॥

—ক্লীব হয়ো না, এ তোমার সাজে না; তোমার এ হৃদয়দৌর্ব্বল্য তুচ্ছ, একে ঝেড়ে ফেলে ওঠ, শত্রুকে তাপিত কর! সকল ধর্ম্ম ছেড়ে আমাকে এক জেনে শরণাগত হও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব; শোক করো না।

এইটাই সমগ্র গীতা। আমরা শেষের ডাকে যখন আয়েসে গা এলিয়ে দিই, তখন আগের খোঁচাটার কথা মনে থাকে না। তাই শরণাগত হয়েও আমাদের পাপের বোঝা বেড়েই চলে, দুঃখও এক তিল কমে না।

শ্রদ্ধা

—শ্রী—

গীতা বলেন, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" পতঞ্জলির ব্যাসভাষ্যে আছে, "শ্রদ্ধা চিত্তের সম্প্রসাদ, তাহা যোগীকে কল্যাণী জননীর ন্যায় পালন করে।" আরও বলিয়াছেন, "এই শ্রদ্ধা হইতেই চিত্তে বীর্য্য, উৎসাহ বা বলের উৎপত্তি হয়।" কাজেই শ্রদ্ধাকে যে কল্যাণময়ী জননী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ইহা একেবারে ধ্রুব সত্য, কেননা বীর্য্যই আমাদের জীবন। আর এই বীর্য্যের উৎপত্তি শ্রদ্ধা হইতে। কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই, নচিকেতার হৃদয়ে প্রথম শ্রদ্ধারই উদয় হইয়াছিল এবং চরমে এই শ্রদ্ধা দ্বারাই দুর্জ্ঞেয় মৃত্যুতত্ত্বকে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধা হইতেই যে বীর্য্যের উৎপত্তি, নচিকেতার অদম্য উৎসাহ এবং প্রাণের বলই তাহার প্রমাণ। জ্ঞানলাভ দুষ্কর এবং দুরূহ বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাবানই সেই জ্ঞান লাভের একমাত্র অধিকারী।

এই শ্রদ্ধা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধি।" প্রাণে এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই সাধকজীবন দুষ্কর তপস্যার মাঝেও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, নীরস হইয়া যাইতে পারে না। জানার অনেক তাৎপর্য্য আছে, ঔৎসুক্যবশতঃ জানাকে শ্রদ্ধা বলে না; কেননা তাহাতে চিত্তের সম্প্রসাদ হয় না—অগ্র্যাবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় মাত্র। কিন্তু মানুষের জীবন কি কেবল এই বুদ্ধির তৃপ্তিতেই পরিতুষ্ট? মন-বুদ্ধির অগোচর আত্মার অনুভূতি পাওয়ার দরুণ অন্তরে স্বভাবতঃ একটা আকুলতা কি জাগে না?

শ্রদ্ধাকে চিত্তের সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই কঠোর-তপস্বী যোগীর চিত্তেও আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়। কল্যাণী জননী যেমন আপদে-বিপদে সন্তানকে রক্ষা করেন, তেমনি শ্রদ্ধাও আমাদের ঘোর অবিশ্বাসের দুর্যোগে, নাস্তিকতার সন্দেহে আন্দোলিত চিত্তের অশুভ মুহূর্ত্তে আশা এবং ভরসা দিয়া সত্যপথে অটল অচল রাখে।

আমাদের জীবনের পরিপুষ্টি শুধু বাহিরের অন্ন দিয়াই হয় না, মায়ের কল্যাণ-দৃষ্টি, তাঁহার দেওয়া স্নেহাভিষিক্ত অন্নই আমাদের জীবনের একমাত্র পুষ্টির উপাদান। মায়ের কাছে গেলেই যেমন সন্তান আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে, তেমনি অন্তরে অন্তরে যখন আমরা শ্রদ্ধাকে উপলব্ধি করিতে থাকি, তখন সমস্ত সংশয়, কূট তর্ক-যুক্তির অসহ্য জ্বালা নিবারিত হইয়া সমস্ত মুখ-মণ্ডল নিশ্চিত ভরসায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে চিত্তের এই প্রসন্নতাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

চিত্তের সম্প্রসাদ সহজে লাভ হয় না। সমস্ত সংশয় যখন ছিন্ন হইয়া যায়, মানুষের ভিতর শ্রদ্ধা জাগে তখনই। শ্রদ্ধা আপনি জাগে—জাগাইতে হয় না। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে শ্রদ্ধাকে অসাধনের ধনও বলা যাইতে পারে। চোখের সম্মুখে আমরা কত কিছুই দেখিতেছি, কত বিচিত্র ঘটনার স্রোত নিত্য প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু কই সকলের মনেই তো তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জাগে না! সকলের না জাগুক, অনেকের হইয়া একজনের ভিতর এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জাগে—তাহারাই শ্রদ্ধাবান্, বসুধা পবিত্রা হইয়া থাকে তাহাদের দ্বারাই।

কেবল ঔৎসুক্য নিবৃত্তি নয়, প্রাণের জ্বালা ও প্রশ্নের সমাধান হয় কেমন করিয়া, তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। বাহির হইতে আমরা বুদ্ধি দিয়া যাহা জানিতে পারি, তাহাতে একদিকের অভাব মিটে বটে, কিন্তু প্রাণের হাহাকার যেমন তেমনই

থাকিয়া যায়। এই বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক—বুদ্ধির চরম বিকাশের যুগেও দেখিতে পাই প্রত্যেকের প্রাণেই যেন একটা নিদারুণ হাহাকার। অনেকেই আজ Scientific knowledgeকে deadlier weapons of destruction বলিয়া আখ্যা দিতেছেন। এই অভাব, এই আর্ত্তনাদ কিসের?

তৃপ্তি নাই, সন্তোষ নাই, জানার সঙ্গে সঙ্গে কেবল অতৃপ্তির জ্বালাই বাড়িতেছে। কাজেই এই জানাকে তো শ্রদ্ধার জানা বলিতে পারি না। শ্রদ্ধা মানুষকে অন্তর্ম্মুখী করে, চিত্তের সম্প্রসাদ বাড়ায়।

শ্রদ্ধা অন্তর্ম্মুখী আবেগ। শ্রদ্ধা হইতে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহা মানুষকে প্রবৃত্তির দিকে নিয়া যায় না, বরঞ্চ নিবৃত্তি-অভিমুখী করে। বহির্ম্মুখী উৎসাহ-উদ্যমই শ্রদ্ধার একমাত্র নিদর্শন নয়। বুদ্ধিকে জানা নয়—আত্মাকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই শ্রদ্ধাবান্।

ভিতরে যখন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, সাধন-কৃচ্ছ তা তখন আর গায়ে লাগে না। শাস্ত্র ও ঋষি-বাক্যের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেলে কঠোর সাধনাতেও বিতৃষ্ণা অথবা নৈরাশ্য আসে না। 'পাব' এই বিশ্বাস যাহার প্রাণে অটল, তাহার পক্ষে পাওয়ার পথে যে বাধা-বিঘ্ন, তাহা অতীব তুচ্ছ। শ্রদ্ধাবানের কাছে লক্ষ্য খুব উজ্জ্বল, কোন কিছুর আবর্ত্তে পড়িয়া তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস, আর অভ্রান্ত ধারণাই সাধককে গন্তব্যস্থলে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। একবার যাহাদের চিত্তে কোনমতে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছে, শত বাধা-বিপত্তিতেও তাহা আর নষ্ট হয় না। শ্রদ্ধাসম্পন্নের সাধননিষ্ঠা স্বাভাবিক। আর্য্য ঋষিদের কঠোর তপস্যা এবং সংযমের কথা শুনিয়া যেমন আমরা চমকিত হইয়া উঠি—একদিন তাহা মোটেই আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার বিষয় ছিল না। তাঁহাদের কষ্টসহিষ্ণু অবস্থা স্মরণ করিয়া আমাদের ভীত চিত্তে কেবল অবিশ্বাসেরই সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই দুর্ব্বলতার মাঝেও কি আমাদের ভিতর কোন সময় এমন শ্রদ্ধা জাগে না—যখন আমরা বুকে অসীম বল পাই—ভিতরে অপরিমিত বীর্য্যের অনুভব হয়?

জ্ঞান লাভে চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া শান্তি আসিবে। জ্ঞান দ্বারা যদি অশান্তির অনলই নির্ব্বাপিত না হয়, তাহা হইলে গীতোক্ত জ্ঞানীর লক্ষণের সঙ্গে তো সামঞ্জস্য হইল না। গীতাকার বলিয়াছেন—"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।" জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে শান্তি আসিবে—এই শান্তিতেই তো চিত্তের সম্প্রসাদ হইবে। কাজেই জ্ঞানের লক্ষ্যই শান্তি আনয়ন করা।

আমার প্রাণ যাহা চায়, তাহা আছে—এই অটল বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অন্তরের অমূল্য সম্পদ্; যে কোন উপায় অবলম্বনেই তাহার সার্থকতা লাভ হয়। শ্রদ্ধায় তো বিচারের আবশ্যক হয় না, আমি যাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তিনি তো আমার নিকট শ্রদ্ধার যোগ্য হইয়াই ধরা দেন। বাহির হইতে আমরা শ্রদ্ধাবানের কর্ম্মকে অনেক সময় বিস্ময়ের চক্ষে দেখি; কিন্তু অন্তরের দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মাঝে কোন বিস্ময়ের কারণ নিহিত নাই। এইখানে কাঠিয়া-বাবাজীর দীক্ষা নেওয়ার ঘটনাটী স্মরণ হইল। কাঠিয়া-বাবাজী তাঁহার গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন প্রস্তরময় কোন এক পাহাড়ের প্রান্তভাগে। তাহার অতি নিকটেই এক বৃহৎ খাদ ছিল, সেই খাদ অন্যূন পঞ্চাশ হাত গভীর। সেই খাদের নিম্নভাগে নক্ষত্রবেগে একটী পার্ব্বত্য ঝরণা প্রবাহিত হইতেছিল। বাবাজীর গুরু তাঁহাকে সেই ঝরণাটী দেখাইয়া বলিলেন—"তুম্ চেলা হো, তো উসমে কুদ্ পড়।" এই কথা শুনিয়াই বাবাজী

গুরুর আদেশে সেই ঝরণায় লম্ফ প্রদান করিলেন। বাহিরের দিক দিয়া এই অবিচারে আদেশ পালন কার্য্যটিকে নির্ব্বোধের কাজ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু অন্তরে যাহার সত্যলাভের পিপাসা তীব্রভাবে জাগিয়াছে, তাহার কাছে মৃত্যুভয়টা যে কত তুচ্ছ, এই ব্যাপারে তাহারই প্রমাণ পাওয়া গেল। মানুষের ভিতর যখন সত্যলাভের পিপাসা জাগে, তখন এমন করিয়াই মানুষ আকুল হইয়া উঠে। অন্তর যাহা চায়, তাহা পাইতেই হইবে—এই হয় সাধকের মনোভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য বলের উৎপত্তি। ভিতরে বল সঞ্চিত হইলেই কঠোরতাকেও অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। শ্রদ্ধাবানের আসল লক্ষ্য ইষ্টলাভ—পথের বাধা তাহার অদম্য আবেগকে প্রতিহত করিবে কেমন করিয়া?

শ্রদ্ধার প্রধান সার্থকতাই এই যে, ইহা মানুষকে আগ্রহী (earnest) করিয়া তুলে। এই আগ্রহকেই Spiritual enthusiasm—অধ্যাত্ম-উৎসাহ বলে। যিনি এই সাত্ত্বিক উৎসাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যাঁহার সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলে আস্তিক্য-বুদ্ধি রহিয়াছে, তিনি ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব জীবন হইতে পৃথক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? আমাদের জীবনের প্রধান সহায়ই হইবে—এই অদম্য উৎসাহ; কিন্তু উৎসাহের মূল নিদানই শ্রদ্ধা! যে কোন্ দিক দিয়াই উন্নতির পথে আরোহণ করিতে চাই—এই শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের উঠিতে হইবে!

সত্যকে উপলব্ধি করিবার প্রাণপাতী চেষ্টা জাগা চাই। মানুষ অনেক সময় সত্যকে কোন্ পথে পাওয়া যায়, এই ভ্রান্ত উদ্বেগে চঞ্চল হইয়া উঠে; কিন্তু প্রাণের মাঝে অদম্য পিপাসা জাগিয়া উঠিলে যে সত্যলাভের পথ আপনি আবিষ্কৃত হইয়া যায়, ইহা একবারও ভাবিয়া দেখে না। বাহিরে শাস্ত্র চর্চ্চার প্রতি নিরপেক্ষ—অথচ সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, এমন কোনও মহাপুরুষের কথা কি আমরা শুনিতে পাই না? তাঁহারা সত্য সাক্ষাৎকার করিলেন কি করিয়া—অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধায় নহে কি?

অন্তরে এই আগ্রহের ভাব জাগিলেই সামান্য তুচ্ছ কথা, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াও তাহার ভিতর হইতে সত্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়। "বেলা যায়" এই কথাটী শুনা মাত্রই নাকি একজনের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন—হায়! তাই তো, বেলা তো চলিয়া গেল—এই জীবনে কি করিলাম! বাহিরের সামান্য কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই ভাবেই সাধকের ভিতরের সঞ্চিত সত্যলাভের পিপাসা হঠাৎ একদিন প্রবল হইয়া দেখা দেয়। জীবনে যাঁহারা সত্যলাভ করিয়াছেন—তাঁহারা বাহিরের সহায়তা সম্বন্ধে খুব কম আশাই করিয়াছেন—অন্তরের শ্রদ্ধাই ছিল তাঁহাদের সম্বল!

অধ্যাত্ম উৎসাহে মানুষকে এমনি করিয়াই বিহ্বল করিয়া তোলে। তাঁহার অজস্র শক্তি তখন সর্ব্বত্রই সত্যের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে চায়। যাহার মুখ হইতে যে কথাটা শুনা যায়, তাহাই যেন প্রাণের মাঝে লাগিয়া যায়। মনে পড়ে তীর্থরামের একটী ঘটনা। তিনি রাবী নদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় একজন বলিল—ওগো! তুমি যাঁহাকে খুঁজিতেছ, তিনি তোমার অন্তরেই আছেন! হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল—অমনি সত্যানুসন্ধিৎসু সাধক স্বামী রাম—দুই হাতের নখ দিয়া বুক চিরিতে উদ্যত হইলেন—কেননা বুকের ধনকে বুক চিরিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—এই ছিল তাঁহার প্রবল বিশ্বাস। আজীবন জ্ঞানচর্চ্চায় যাহার দিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার

পক্ষে এরূপ কর্ম্ম বিস্ময়কর নহে কি? কিন্তু বিস্ময়কর বলিলে কি হইবে—মানুষের ভিতর এমন একটা অবস্থা আসে, যখন আর সে কিছুতেই যুক্তি-তর্কের ফাঁকা বুলিতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। প্রাণ যাঁহাকে চায়, তাহার দরুণ এমনি করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তখন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা হয়। ইহাই শ্রদ্ধা।

ঋষিযুগে এই শ্রদ্ধাই প্রবল ছিল, কাজেই গুরুমুখ হইতে শ্রবণ মাত্রই শিষ্যের ভিতরে তত্ত্বজ্ঞান সহজেই স্ফুরিত হইয়া উঠিত। তাঁহারাও কম বিচার করেন নাই, তাঁহাদের মাঝেও কম সংশয় উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা তো কিছুতেই অবরুদ্ধ হয় নাই।

বিচার করিয়া বুদ্ধির তৃপ্তি হয়—কিন্তু অন্তরের তৃপ্তিসাধন হয় শ্রদ্ধায়। কাজেই শ্রদ্ধাকেই উদ্দীপিত করিতে হইবে প্রথমে। শ্রদ্ধাই সাধনার ভিত্তি।

বীর্য্যলাভ

—*†()†*—

কায়শুদ্ধি আর মনঃশুদ্ধি শক্তি-সাধনার মূল ভিত্তি। প্রাচীনেরা এই উভয়তঃ শুদ্ধিকেই ব্রহ্মচর্য্য নাম দিয়াছেন। পতঞ্জলি বলিতেছেন, "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ—ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ দেহ-মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে বীর্য্যলাভ হয়। কথাটার স্থূল-সূক্ষ্ম দুই রকম তাৎপর্য্যই আছে। স্থূল তাৎপর্য্যটা বোধ হয় কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে না। যোগসূত্রের ভাষ্যকার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যটা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, এই বীর্য্যলাভ শুধু সঞ্চয় নয়, বিতরণ করিবার ক্ষমতাও। বীর্য্যলাভ তখনই হইয়াছে বলিব, যখন তোমার অনুশাসন অপরের চিত্তের মোড় ফিরাইয়া দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছেন, দুর্ব্বল ধানুষ্কের তীর প্রতিপক্ষের চর্ম্মমাত্র বিদ্ধ করে, তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারে না, কিন্তু লব্ধ-বীর্য্য আচার্য্যের উপদেশ শ্রোতার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিতে পারে।

এই ব্যাপারটাকেই সচরাচর বলা হয়—শক্তি-সঞ্চার। শক্তি কথায় দেওয়া চলে, ইঙ্গিতে দেওয়া চলে, চিন্তায় দেওয়া চলে। তাপের যেমন radiation বা বিকীরণ আছে, শক্তিরও তেমনি স্বাভাবিক একটা বিকিরণ আছে। একটু শক্তি পুঁজি হইলেই মানুষ মাতাল হইয়া পড়ে, আমরা অহরহঃ ইহা চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি। কিছু না জমিতেই খরচ করা—কি দেহের পক্ষে, কি মনের পক্ষে—বড় সাংঘাতিক। শক্তি-ব্যয়ের একটা আনন্দ আছে, মাদকতা আছে। সে আনন্দের লোভেই মানুষ দেহে মনে কিছু না জমিতেই খরচ করিয়া ফেলে। ব্যয়ে যেখানে দুঃখ নাই—আছে আনন্দ, সেখানে পরিণাম-চিন্তা বড় আসে না, নরক-যাত্রার হুমকিতেও মানুষ নিরস্ত হইতে চায় না। এই জন্য মানুষকে কৌশল শিখিতে হয়, বিচারকে মার্জ্জিত করিতে হয়। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা, গুরুত্বের ভূমিকা।

বলিয়াছি, শক্তির radiation বা বিকিরণ

স্বাভাবিক; সুতরাং যে বুদ্ধিমান, সে ব্যয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িবে না। সদ্ব্যয়ই হউক, আর অপব্যয়ই হউক, সেটার দিকে নজর দেওয়া তার নিষ্প্রয়োজন; তাহাকে তাকাইতে হইবে পুঁজির দিকে। মূল আধারটাকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, প্রাণকে উজানমুখে ঠেলিয়া তুলিতে হইবে, তবে উপরের পথ পরিষ্কার হইবে। শক্তি-সঞ্চয় আর শক্তি-বিকীরণের সামঞ্জস্য তখনই হইবে, ধৃতবীর্য্য হওয়া তখনই সম্ভব। ইহার যৌগিক কৌশল আছে, সে কথা এখন বলিতেছি না; ব্যাপারটাকে মনের তরফ হইতেই ব্যাখ্যা করিতেছি।

সৌরজগৎ হইতে একটা উদাহরণ নিই। সকলেই জানেন, সূর্য্য আমাদের সৌরজগতের তাপের ভাণ্ডার। সৌরশক্তিই আমাদের প্রাণ। এই শক্তি তাপরূপে আমাদের মাঝে বিকীর্ণ হইতেছে বৈজ্ঞানিক মহলে একটা প্রশ্ন উঠিল, সূর্য্য তো দেদার তাপ খরচ করিতেছে; এত তাপ সে পায় কোথা হইতে? শেষকালে সে কি ফতুর হইয়া যাইবে? আঁক কষিয়া পণ্ডিতেরা দেখাইলেন, সৌরপিণ্ড সঙ্কুচিত হইতেছে; ঐ সঙ্কোচ হইতেই তাপের সৃষ্টি; কাজেই সেই তাপটুকু সৌরজগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, স্বাভাবিক সঙ্কোচ দ্বারা সেইটুকু আবার নূতন সৃষ্ট হইয়া মোটের উপর তাপের ভাণ্ডার অক্ষয় থাকিয়াই যাইতেছে। অবশ্য এইরূপ করিয়াই একদিন সৌরতাপ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু মহাসূর্য্যের তাপ নিঃশেষ হইবার নয়। এই সূর্য্যকে যদি মহাসূর্য্যের সহিত যুক্ত করা যাইত, তবে ইহারও তাপ নিঃশেষিত হইত না। অনন্ত সঙ্কোচ-শক্তি ও অনন্ত বিকিরণ-শক্তি উভয়ের সামঞ্জস্যে নিত্যজ্যোতির আবির্ভাব হইত। স্থূলে তাহা হয় না; কিন্তু অন্তরে হয়। এই দেহের মাঝেও সেই সঙ্কেত রহিয়াছে। দেহের সৌরকেন্দ্রকে সংযমশক্তি এবং ঊর্দ্ধগা-প্রেরণাদ্বারা মহাসূর্য্য টানিয়া তুলিতে পারিলে শক্তি অক্ষয় হয়, অথচ তার বিকিরণশক্তিও অনন্ত গুণ বাড়িয়া যায়। ইহাই বীর্য্যলাভ।

পতঞ্জলির ওই গোড়ার কথাটাই আবার বুঝিতে চেষ্টা করি। বলিতেছেন, বীর্য্যলাভ হইলে নিজের ভাব অপরের মাঝে সংক্রামিত করা যায়। কেন এমন হয়? বিকিরণ-শক্তির কথা বলিয়াছি, আর একটা শক্তির কথা বলি। সম্মোহনশক্তির কথা সকলেই জানেন। এই শক্তিটার ক্রিয়া কিন্তু সার্ব্বভৌম। এর মূল কথা, সবল দুর্ব্বলকে শুষিয়া নেয়, আত্মসাৎ করে। মাধ্যাকর্ষণের কথা স্মরণ করুন। শুধু জড়জগতে নয়, চিজ্জগতেও মাধ্যাকর্ষণটা আইন। তোমাকে আমি আমার দিকে টানিয়া আনিতেছি, এই ব্যাপারটার নিদান যদি আমার মাঝে আমি খুঁজিয়া দেখি, তো দেখিব—ইহার মূলে নিছক্ আত্মপ্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার আইডিয়াতে বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস যদি থাকে, এবং সেই আইডিয়া যদি তোমার আইডিয়ার চেয়ে ব্যাপক হয়, তাহা হইলে তুমি আমার অনুসরণ করিতে বাধ্য। নেতৃত্বের রহস্য এইখানে—অটুট আত্মপ্রত্যয় ছাড়া নেতৃত্ব কিছুতেই সফল হইতে পারে না।

তার পরেরর কথা, আমার আইডিয়াতেই বা আমার বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে কেন? এইখানে আরও একটি সূক্ষ্মতর শক্তির সন্ধান পাই। আমাদের শাস্ত্রে সেটাকে নাম দিয়াছে—ধ্রুতিশক্তি। চাই ধ্রুবা স্মৃতি—indeliable memory। স্মৃতি কিছু না কিছু সকলেরই আছে, কিন্তু সে স্মৃতি ধ্রুবা নয়। তবুও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, পঞ্চাশ বছর আগেকার কথায় মনের কোণে জমিয়া থাকে, সুযোগ পাইলে আবার বাহির হইয়া আসে। ইহাতে প্রমাণ হয়, যাহা একদিন আছে, তাহা চিরদিনই আছে, এই সত্যভাবনার দ্বারা

আমাদের মস্তিষ্ক অনুভাবিত। সুতরাং ধ্রুবাস্মৃতি—বা ধৃতিশক্তিটা আমাদের মস্তিষ্কের latent power। কিন্তু নানা প্রতিকূলতা দ্বারা আমরা এই শক্তিকে বন্ধ্যা করিয়া রাখিয়াছি। কৌশলে যদি ধৃতিশক্তির উন্মেষ করিতে পারি বা উপনিষদের ভাষায় ধ্রুবাস্মৃতিকে জাগাইতে পারি, তাহা হইলে অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয় জন্মিবে এবং এই আত্মপ্রত্যয় হইতেই সম্মোহনশক্তি বা hypnotic power এর উদ্ভব হইবে। শক্তি সঞ্চার হইবে তখন অনায়াসে। লব্ধবীর্য্য আচার্য্যের বাক্য তখন কাঁচপোকায় আশুলাকে যেমন করিয়া টানিয়া লইয়া যায়, তেমনি করিয়া টানিয়া লইবে।

তাহা হইলে এর পরের কথাই হইল, ধৃতিশক্তি লাভ করা যায় কি করিয়া? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূলতঃ আমাদের মস্তিষ্ক ধৃতিসম্পন্ন। কিন্তু এই শক্তি ব্যাহত হইতেছে নানা দিকের টানে। চরম সত্যের স্বরূপ এক; কিন্তু আপেক্ষিক সত্যের অনন্ত বৈচিত্র্য। আমাদের মস্তিষ্কের সাধারণ খোরাক হইতেছে এই আপেক্ষিক সত্যের গাদা। চরম সত্যের প্রতি মনটী একাগ্র রাখিয়া এই আপেক্ষিক সত্যের গাদা লইয়া কারবার করা ওস্তাদী বটে; কিন্তু মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই কেহ ওস্তাদ হয় না। মস্তিষ্ককে একটা বিষয়ের ধারণায় আমরা মোটেই অভ্যস্ত করি না—বিক্ষিপ্ত বাক্য, বিক্ষিপ্ত চিন্তা, বিক্ষিপ্ত কর্ম্ম দ্বারা ছোট বেলা হইতেই মাথাটাকে ঘুলাইয়া রাখি। ধৃতিশক্তির অপচয় এই করিয়াই হয়। শেষে আর কিছুতেই মন বসিতে চাহে না। যৌবনের প্রারম্ভে এই মন কেবল উড়ু-উড়ু করিতে থাকে, ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধু পান করিয়া বেড়ানোটাই মনে হয় পুরুষার্থ। এই ধৃতিশক্তিহীন চঞ্চল মনই হইল কামের ক্ষেত্র। মনঃস্থির করিবার সঙ্কেত যাহার জানা নাই, কামজয়ের চেষ্টা তাহার কাছে বৃথা। বাসনার হাতছানিতে বারবার সে কুকুরের মত ছুটিয়া যাইবে, আবার চাবুক খাইয়া ফিরিয়া আসিবে।

একমুখী চিন্তাতে চিত্তকে অভ্যস্ত করা, ধৃতিশক্তি লাভের এই একমাত্র উপায়। ইহাকে আমরা যতটা কঠিন মনে করি, বাস্তবিক উহা তত কঠিন নয় কিন্তু। চিত্তকে সাধারণতঃ আমরা চঞ্চল বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু বাস্তবিক সে চঞ্চল হয় অগত্যা; তাহাকে অচঞ্চল হইতে তুমি দাও না বলিয়াই সে অত ছট্‌ফট্‌ করে। একটা বিষয়ে তন্ময় হইতে পারিলে পাঁচটা বিষয়ে সে ছুটাছুটি করিতে ভালবাসে না—recreation হিসাবেও না।

কিন্তু কোন্ বিষয়টীতে যে তাহাকে তন্ময় করিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে, তাই নিয়াই তো গোল। চরম সত্য মূলতঃ এক হইলেও সকলের বুদ্ধিতেই তাহা একরূপে ধরা দেয় না। আর প্রবর্ত্ত-সাধকের পক্ষে বুদ্ধির আপ্যায়নটাও একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই একাগ্র চিন্তার আলম্বনকে কোন্ রস দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া লইব, তাহা প্রণিধানের বিষয়। নিজে এ কাজটা করিতে পারিলে তো ভালই; নতুবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এই বিষয়ের মননও একান্ত হইলে চলে না। উদ্দেশ্য, চিত্তকে একেবারে নির্ব্বিকার করিয়া ফেলা। বেশীক্ষণের জন্য না হউক, যতটুকু পার, তাহাকে ফাঁকা করিবার চেষ্টা কর। প্রথমতঃ ইহাতে তেমন আনন্দ পাওয়া যাইবে না, কিন্তু নির্ম্মল শান্তি পাওয়া যাইবে। এই প্রশান্তিটুকুই ধৃতিশক্তির রসায়ন। শান্তিতে তৃপ্ত হইতে অভ্যাস করিলে আনন্দ আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, এই আনন্দ অহেতুক, অতএব স্বরূপতঃ অপরিণামী অর্থাৎ ইহার যেমন আশ্রয় নাই, তেমনি কোনও ভাঁজও নাই, একটা কিছুতে পর্য্যবসানও নাই। যে যে-ভাবেরই ভাবুক হউক না কেন,

এই নিরালম্ব আনন্দের রসিক না হইতে পারিলে ভাবে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা যদি প্রশান্ত আনন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহা হইলেই বীর্য্যলাভ হয়। পবিত্র দেহ-মন অর্থে যে দেহের নাড়ীচক্র (nervous system) প্রশান্ত, যে মনের বৃত্তি ধারাবাহিক। দেহে বিকার আসিতেছে, মনে কুচিন্তা প্রবেশ করিতেছে, আর আমি তাহাদের লইয়া কেবল ধস্তাধস্তি করিতেছি—ইহাতে কখনও কামজয় করা যায় না। শক্তিহীন হইয়া অবশেষে নিয়তি বলিয়া প্রবৃত্তির হাতে নিজকে ছাড়িয়া দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামনার প্রকাশ আকস্মিক নয়; যখন হইতেই চিত্ত অবান্তর বিষয় লইয়া চঞ্চল হইয়াছে, তখনই উহাতে কামের বীজ উপ্ত হইয়াছে। এই কাম মানসিক; মনের চঞ্চলাবস্থাই (সে অবস্থা যে শুধু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা হইতেই আসিয়াছে, তাহা নয়) কামের ক্ষেত্র। এইজন্য যখন প্রত্যক্ষতঃ কাম-বিষয়ের সহিত সংযোগ থাকে না, তখনও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়; মনে রাখিতে হইবে অবান্তর বিষয় নিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিলেও উহাকে কামাঙ্কুর উৎপাদনের উপযোগী ক্ষেত্ররূপে পরিণত করা হইবে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, সর্ব্বাবস্থাতে প্রশান্তিই কামজয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়।

কাম শুধু মনসিজই নয়, শরীরজ কামও আছে। দুইটাতে তফাৎ আছে; অধিকাংশেই তাহা ধারণা করিতে পারে না। দেহ-মন জুড়ি বাঁধিয়া কাজ করে; তাই অনেক সময় দেহের কাম মনের ঘাড়ে চাপাইয়া, মনের কাম দেহে নামাইয়া আমরা একটা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ফেলি। অনুশোচনা, অকারণ আতঙ্ক, সাধনবীর্য্যের হ্রাস ইত্যাদি তাহার ফল। দেহ আর মন দুইটাকে পৃথক রাখিতে শেখা প্রয়োজন। ওই যে প্রশান্তির কথা বলিয়াছি, তাহার সাধনা হইতেই ইহা সিদ্ধ হইবে। আমার অন্তশ্চেতনার নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া দেহটা চলিতেছে; এই দেহটা যন্ত্র মাত্র; এই বোধটী সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে। সাধারণ অবস্থায় দেহে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহা চিত্তের সবখানিকে আলোড়িত করে। কিন্তু প্রশান্তির সাধনায় চিত্ত তাহার অব্যক্ত-শক্তির সঙ্গোপন ভাণ্ডার খুঁজিয়া পায়। তখন দেখা যায়, দেহটা যেন চিত্তের এক সীমানায় পড়িয়া আছে! এই জায়গায় মনসিজ-কাম আর শরীরজ-কামের পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়, শাসন করাও অতি অনায়াস হয়। সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া সাপ নিয়া খেলা করাও চলে।

ব্রহ্মচর্য্য-বিজ্ঞানের যেটা psychology, তারই এক অংশ মাত্র আলোচনা করিলাম। ইহার একটা physiological trainingও আছে। সে কথা আর এখন নয়। শুধু একটা সঙ্কেত বলিয়া রাখি; আহার শুদ্ধি হওয়া চাই, নিদ্রা শুদ্ধিও হওয়া চাই। ছকটা তাহা হইলে দাঁড়ায় এই :—খাওয়াটা আর ঘুমটার বিষয়ে হুঁসিয়ার; সর্ব্বদা প্রশান্ত থাকিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে চিত্তে অননুভূত পূর্ণ বল পাইবে; সেই বলের প্রসাদে চিত্ত ভাবানুরূপ আলম্বনে একাগ্র হইবে; একাগ্রতা হইতে আসিবে ধ্রুবাস্মৃতি; ধ্রুবাস্মৃতি হইতে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় হইতে সম্মোহন ও বিকিরণশক্তি, অথবা শক্তিসঞ্চারের ক্ষমতা। ইহাই বীর্য্যলাভ বা ব্রহ্মচর্য্যে-প্রতিষ্ঠা।

———:*:———

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—):*:(—

৭ জ্যৈষ্ঠ ২১ মে সোমবার—রাত্রে বেশ শীতে কাটান গেছে। ক্রমেই আমরা শীতের দেশে এসে পড়্‌ছি,—শীতের প্রকোপে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এ পথে চটীর সংখ্যা খুব কম। যেখানে চটী পাওয়া যাবে, সেখানেও হয় তো একজন দোকানদারের একটি ভিন্ন ঘর নাই—আবার ঘরগুলি নিতান্ত ঠুন্‌কো। এ চটীগুলিতে বৃষ্টির সময় ঘর বার সবই সমান হয়ে যায়।

আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সম্মুখের চটীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়্‌লাম। এতদিন যেমন বেগে পথ অতিক্রম করে এসেছি, আজ তার চেয়ে অধিক বেগে চল্‌তে লাগ্‌লাম। আমাদের সঙ্গে ক'জন বৃদ্ধা আছেন, তাঁদের সামান্য সামান্য অসুখ লেগেই আছে; এর ওপর আমরা ক্রমেই হিমাঙ্কে এসে পড়্‌ছি—ক্রমেই শীতের প্রকোপ বাড়্‌ছে। আমাদের সঙ্গে শীতবস্ত্রও কম, এর ওপর যদি চটী না পাই, তা হ'লে কষ্টের একশেষ হবে। আমি সঙ্গীদের পিছনে ফেলে একটি বড় চড়াই করে, ৫ মাইল দুরবর্ত্তী চটী **জগন্নাথ** বা কোৎনোর চটীতে যেয়ে পৌঁলাম। জগন্নাথ চটীটি খুবই ঠাণ্ডা জায়গায় অবস্থিত। জলের বিশেষ সুবিধা।

জগন্নাথ বা কোৎনোর চটী ৫ মাইল

অদূরেই ৩০।৪০ ঘর লোকের বসতি গ্রাম। একজন দোকানদার ও একটিমাত্র চটী। ক্রমে সূর্য্যোদয় হল। বরফে প্রতিফলিত হয়ে, অরুণ আভায় একটি নূতন ভাবের আবেশে হৃদয় উৎফুল্ল করে দিতে লাগলো।

এই জগন্নাথ চটী আস্‌তে ছোট ছোট কয়েকটি চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে—বড় চড়াইও একটি করে এসেছি। যমুনোত্তরীর রাস্তাগুলি খুবই দুর্গম। আমরা গঙ্গানী চটী হতে বের হয়ে দুই মাইল আসার পর একজন বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হল, সে বেচারী কাদের যেন পরিচারিকা। কয়দিন হেঁটে হেঁটে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—পায় পাথরের ঠোক্কর লেগে লেগে ঘা হয়েছে, হাঁটতে খুবই কষ্ট হয়; তবুও প্রাণের দায়ে—চলতে বাধ্য হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে, বড় লোকের সঙ্গে গরীব লোকের তীর্থ যাত্রা করা মহা কষ্টকর। গরীব বলে স্বাধীন ভাবে কোন কাজই করবার উপায় নাই, এমন কি অসুখের মধ্যেও হুকুম মেনে চল্‌তে হবে। শুন্‌তে পেলাম, তাদের সঙ্গীয় লোকজন আরও প্রায় দু'মাইল পথ চলে গেছে। আমি হতাশ হয়ে ভাবলাম—আজ বুঝি এগিয়ে গিয়ে আর চটীতে স্থান পাব না; কিন্তু দুর্ব্বলতা মনে স্থান না দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করে আগের চেয়ে বেগে চল্‌তে লাগ্‌লাম। দেড়-মাইল চড়াই করে যখন পাহাড়ের একেবারে ওপরে উঠেছি, তখন মাইল খানেক দূরে এক দল যাত্রী দেখতে পেলাম। উৎরাই পথে দৌড়িয়ে নামিতে হল। আমরা উৎরাই পথে খুব জোরে দৌড়িয়ে বরাবরই নেমে থাকি, নতুবা পায়ে হাঁটুতে বেশী ব্যথা হয়। উৎরাই পথে প্রায় ঘণ্টায় ৬ মাইল বেগে পথ অতিক্রম কর্‌তে হয়েছে।

জগন্নাথ চটী মাত্র ৫ মাইল। অধিকন্তু খুব ঠাণ্ডা বলে, সেখানে থাকার ইচ্ছা না হওয়ায় চল্‌তে লাগলাম। জগন্নাথ চটী হতে ১॥০ মাইল দুরবর্ত্তী **যমুনা** চটীতে যেয়ে পৌঁছলাম। যমুনা চটীটি সুন্দর জায়-

যমুনাচটী
১॥০ মাইল

গায় যমুনা নদীরই তীরে অবস্থিত। যমুনার তীরে বলেই বোধ হয় যমুনা চটী নাম হয়েছে। চটীতে পৌছেই চটী-বালার সমুদয় দুধ চার আনা সেরে কিনে তখনই আগুন জেলে তারই 'বর্ত্তনে' গরম করতে বসিয়ে দিলাম। দু'টী কম্বল ও গায়ের চাদর খুলে সমুদয় চটীটিতে বিছিয়ে চটীটি দখল করে বসলাম। যদি কেউ চটীতে পৌছে পূর্ব্বেই দখল করে বসে, তা' হলে অন্য কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না—এ দেশের এই নিয়ম।

আজ যমুনা নদীতে নেমে আনন্দে স্নান করলাম। এখানে ভাল চাউল পাওয়া যায় না, মোটা চাউল ॥০ আনা, দুধ ।০ আনা, ডাল ॥০ আনা, আলু ৶০ আনা, ঘি ২॥০ টাকা, চিনি ১৲ টাকা সের। ভাল খোষা-শুদ্ধ মুগ ও খোষাশুদ্ধ উরুদ এবং জঘন্য অরহর।

ক্রমে ক্রমে আমাদের লোক সকলেই এসে পড়ায় আমরা সমুদয় চটীটি বেশ করে দখল করে নেবার পরও অনেক জায়গা বেশী হওয়ায় কয়েক জন হিন্দু-স্থানী বৈষ্ণব সাধুকে ডেকে এনে জায়গা দিলাম। তারাও কয়দিন যাবৎ উৎপীড়নে কষ্ট পাচ্ছেন অথচ তাদের সহায়তা করার কেউ নেই।

আর একদল যাত্রী সেই ভীষণ রৌদ্রে আর কোথাও জায়গা না পেয়ে, অগত্যা মোহান্ত-মহা-রাজকে পাঠিয়ে আমাদের কাছে স্থান ভিক্ষা করলে, আমরাও অম্লান বদনে আনন্দিত হয়ে, তাদের অভি-নন্দন করে, অর্দ্ধেক চটী ছেড়ে দিয়ে নিজেরা কষ্ট করে রইলাম।

আজ সকালে আসার সময়, খুব বড় বড় কয়ে-কটি ঝরণা পার হয়ে এসেছি। এ পথে জলের খুবই সুবিধা। সিমলী চটী হতে দু'মাইল দূরবর্ত্তী ওজরী বা বজ্রী চটী, তার ৪॥০ মাইল পর রাণাগাও, ৬॥০ মাইল পর হনুমান চটী।

আকাশে মেঘ দেখে—যাব কি না যাব এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। ক্রমে মেঘ সরে যাওয়ার পর সঙ্কল্প করে বের হলাম, যদি ওজরী বা বজ্রী চটীতে স্থান না পাই, তা'হলে রাণা-গাও বা হনুমান চটীতে চলে যাব।

যমুনা চটী হতে বের হয়ে, যমুনার উপর দিয়ে পুল পার হয়ে, যমুনা নদীকে ডান হাতে রেখে, আমরা চড়াই করতে লাগলাম। এ কয়দিন যমুনা আমা-দের বাঁ হাতে ছিল, আজ ডান হাতে রেখে চলতে চলতে উৎকট চড়াই ২ মাইল করার পর **ওজরী** বা বজরী চটী পেলাম। তখনও অনেক বেলা ছিল-- স্থানের সুবিধা হওয়ায় এখানেই থাকলাম। চটী-বালা জঙ্গলী গোলাপ গাছ ও নানা প্রকার কাঁটা-গাছ কেটে ২।১ দিন মাত্র হল একটি ঘর পত্তন করেছে। অধিকন্তু ঐ কাঁটা গাছ দ্বারাই ঘরের ছাদ ছেয়ে দিয়েছে। গাছগুলি ভাল করে না কাটাতে

ওজরী বা বজ্রী
চটী ২ মাইল

অনেক বড় বড় গুড়ি মাটী হতে ২।৪।৬ ইঞ্চি উপরে উঠে আছে। ফলে, থাকা খুবই কষ্টকর হলেও জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে থাকতে বাধ্য হলাম। দেখতে-শুনতে ভাল ঘরটি পূর্ব্বেই দখল হয়ে গিয়েছিল।

একটি বড় ঝরণা পাশ দিয়েই কল কল শব্দে নিম্নদিকে যমুনায় আত্মসমর্পণের জন্যই যেন আবেগ-ভরে ছুটে চলেছে। অদূরে পর্ব্বতশীর্ষে প্রকৃতি দেবী যেন বরফের মুকুট পরিয়ে রেখেছেন। বরফের ওপর অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র বর্ণচ্ছত্র বিস্তার করেছে। রং-বেরঙ্গের ঝুমরো ঝুমরো জঙ্গলী গোলাপ ফুলে চারদিক ছাওয়া। অসুবিধা সত্ত্বেও এমন চিত্তাকর্ষক স্থানে না থেকে পারলাম না।

এ চটীটিও খুব উচ্চ স্থানে—পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। যমুনা চটী হতে যে দু'মাইল এসেছি, এ পথটি খাড়া উৎকট চড়াই। রাস্তাগুলি সমতল নয়, উঁচু-নীচু অনেক পাথর এলোমেলো ভাবে পড়ে থেকে

পায়ে বাধে। সকাল বেলা ৬৷৷॰ মাইল পথ অতিক্রম করেও যে কষ্ট অনুভব করি নাই, এ বেলা এই দু'-মাইল আস্‌তে কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট করতে হয়েছে। এ পথের কাঁকরগুলি শ্বেত পাথরের বলেই মনে হল।

এখানে আমরা দোকানদারের নিকট হতে চার সের দুধ কিনে পরমান্ন পাক করে রুটি দ্বারা সদ্ব্যবহার করলাম। বিহারী দাদাও অদূরে পল্লীবাসীদের নিকট হতে, ১৷৷॰ সের খাঁটী দুধ কিনে এনেছিলেন। এখানে জিনিষাদির দর পূর্ব্ববৎ। এ সব শীতপ্রধান স্থানে খুব আলুর চাষ হয়—ক্রমে যতই শীতের দিকে যাচ্ছি, ততই অন্যান্য জিনিষের দাম বেশী হলেও আলুর দাম ক্রমে কম পেতে লাগলাম।

আজ আমাদের ৮½ মাইল পথ আসা হয়েছে। পথগুলি খুবই খারাপ ছিল।

আজ রাত্রে চটীতে শোবার যেমন কষ্ট হয়েছিল, সমস্ত হিমাচল-পথে তেমন কষ্ট আর কোন দিন ভোগ করেছি স্মরণ হয় না। ২।৪।৬।৮ ইঞ্চি গুড়ি রেখে বড় বড় বন-গোলাপের গাছ কেটে নেওয়ায় বন-গোলাপের গুড়িতে এবং অসমতল জায়গার জন্য রাত্রে মোটেই ঘুমাতে পারি নাই। স্থানাভাবে বাহিরের উন্মুক্ত আকাশের নীচেই আড্ডা নিয়েছিলাম।

৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ২২শে মে— আমরা সকাল সকাল বের হলেও কিন্তু চটীর সমুদয় লোক পূর্ব্বেই চলে গিয়েছিল। গতকার রাত্রে এ চটীতে প্রায় ২০০ জন যাত্রী ছিল। সৌন্দর্য্যের জন্যই অনেক লোক এখানে আস্তানা নেয়।

আমরা যমুনার পার দিয়ে চললেও কিন্তু যমুনা নদী আমাদের পথ হতে প্রায় ১ মাইল নীচু দিয়ে চলেছে। যমুনা ডান হাতে রেখে ছোট ছোট চড়াই উৎরাই করে আবার উৎরাই করতে লাগলাম। গত কাল যমুনা চটী হতে যেমন কঠিন চড়াই করে এসেছি, তেমনি কঠিন উৎরাই করে যমুনার পারে পৌছলাম।

আজ পথটি তত খারাপ নয়। যমুনার উপর কাঠের পুল পার হয়ে, যমুনাকে বাঁ হাতে রেখে আবার খাড়া চড়াই করতে লাগলাম। ১½ মাইল খাড়া চড়াই করে **রাণাগাও** চটী পেলাম। চটীটি রাস্তার উপর নয়—খানিকটা পাহাড় চড়ে উপরে যেতে হয়। আমাদের তত সকালে বিশ্রামের দরকার নাই বলে আমরা চড়াই করতে লাগলাম। এখানে চাষীরা বেশ চাষ-আবাদ কচ্ছে—অনেক নটে-শাক জমিতে দিয়েছে। ছোট অবস্থায় ওগুলো দেখতে নটে শাকের মত হলেও বাস্তবিক পক্ষে নটে-শাক নয়—রামদানার গাছ। প্রথম অবস্থায় নটে-শাকের মত দেখা যায় বটে, ক্রমে গাছ বড় হয়ে দু' হাত আড়াই হাত লম্বা হয়। আমরা ওগুলোকে পূর্ব্ব-বাংলার 'ডাঁটা' মনে করে অনেক চটীবালার নিকট হতে নিয়ে তরকারী খেতাম, তরকারী খেতে সুস্বাদু হত না। পরে রামনগরের রাস্তায় ঐ নটে-শাকের মাথায় পোস্তদানার মত ছোট ছোট দানা দেখতে পেয়ে চটীবালাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, ওগুলো রামদানার গাছ। অনেক জায়গায় তার খৈ করে, মোয়া পর্য্যন্ত বিক্রী হতে দেখেছি, আমরাও সেই মোয়া দিয়ে অনেক দিন জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করেছি। বাংলা দেশে এর আবাদ কখনও দেখি নাই।—আবাদ হওয়া উচিত। এর খৈ খুব হাল্‌কা পথ্য, রোগীর উপযুক্ত।

রাণাগাও
৪৷৷॰ মাইল

আমরা অনেকগুলি নটে-শাক কিনে ক্রমে চড়াই করে দুই মাইল যেয়ে **হনুমান** চটী পেলাম। ওজরী বা বজ্রী গ্রাম হতে হনুমান চটী ৬½ মাইল। একটি ঝরণা পাশ দিয়ে চলেছে। একজন দোকানদার,—দুটী পড়া-পাতার ছাউনি ঘর—অতি

হনুমান চটী
২ মাইল

নোংরা। একটি বড় পাথরের নীচেও একখানি ঘরের মত। আমাদের আসার পূর্ব্বেই জায়গা দখল হয়ে গিয়েছিল। আজ এবেলা এখানে থাকার সঙ্কল্প ছিল। প্রত্যহই বিকেলে এ দিকটায় ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ বেশী, কাজেই সামনের চটীতে (যেখানে যমুনোত্তরীর পাণ্ডাদের বাস) যাওয়া স্থির করে যাত্রা করলাম। এখান হতে খড়শালী চটী ৪ মাইল। কিন্তু এই ৪ মাইল পথ চড়াই উৎরাই এত কষ্টকর তা বলবার নয়—হয় তো বা আমরা আজ অতটা পথ এক সঙ্গে অতিক্রম করার জন্যও বেশী কষ্ট মনে হতে পারে; কিন্তু অনেকেই বলেন, এ পথটি খুবই খারাপ। আমরা হনুমান চটী হতে বের হয়ে তিন ঘণ্টা খুব পরিশ্রম করে, এই ৪ মাইল পথ অতিক্রম করে, খড়শালী গ্রামে পাণ্ডাদের বাড়ী পৌছলাম।

টিহরীতে আমরা যমুনোত্তরীর পাণ্ডা ঠিক করেছিলাম, তারা আমাদের সঙ্গে আসতে স্বীকার হয়েছিল। আমরা বিশেষ কিছু দিতে পারবো না বলেই, তাদের নিরস্ত করি। গতরাত্রে চটীতে থাকার সময় সেই পাণ্ডার বাবার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি মেয়েকে শ্বশুরালয় হতে আন্‌তে গিয়েছিলেন। মেয়েটীর বয়স ২০৷২২ বৎসর—লাল টুক্‌টুকে যেন একটি দেবীমূর্ত্তি, কিন্তু এত নোংরা এবং গায়ের অলঙ্কারের এত দুর্গন্ধ যে ভূত-প্রেতও তার কাছে ঘেঁল্‌তে পারে কিনা সন্দেহ। চেহারাটি দেখে কিন্তু দেবীমূর্ত্তির কথা স্বতঃই মনে হয়ে থাকে। আমরা পাণ্ডাটির সঙ্গেই রওনা হয়েছিলাম—সমস্ত পথেই পাণ্ডাটি সাথে সাথে ছিল। মেয়েটির বয়স বেশী হলেও কিন্তু বালকোচিত সরলতা যায় নাই।

খড়শালী
৪ মাইল

এ পথে নানাপ্রকার বন-গোলাপ ফুল, নানা রং-বেরঙ্গের ঝুম্‌রো ঝুম্‌রো অশোকগুচ্ছের শোভায় পথগুলি পাহাড়গুলি সবই শোভায়মান। পাহাড়গুলি রুক্ষ নয়—নানা রকমের সজীব গাছ-পালা, লতা-পাতায় আমাদের জঙ্গলাবৃত পার্ব্বত্য প্রদেশের স্মৃতি আপনিই মনে উদয় হয়। বাংলায় শুধু লাল রঙের অশোক ফুল দেখেছি, এ দেশে কিন্তু নানা রংএর এমন কি একটি ফুলের মধ্যেই তিন চার রকমের রং আছে। এমন অসংখ্য অশোক গাছে, অসংখ্য অশোক ফুলের শোভায় পাহাড়গুলি যেন ফুলের রাণী সেজে বসে আছে। গোমুখীর পথে যেমন অসংখ্য ভূর্জ্জপত্রের গাছের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, এ পথটিতে তেমনি প্রকৃতির স্বরচিত অসংখ্য অশোক-কাননের ভিতর দিয়েই আমরা চলেছি। পাণ্ডা-মহারাজ পথ অতিক্রম করার সাথে সাথে তার দুঃখের কাহিনী বল্‌তে সুরু কর্‌লো—মেয়েটি এমন সুশ্রী হলেও অদৃষ্ট-দোষে স্বামী-পরিত্যাক্তা। তার স্বামী অন্য একজন স্ত্রীলোকের মোহে একদিন রাত্রিবেলা লোকের অগোচরে পাহাড়ের কোন্ প্রদেশে চলে গেছে,—সে আজ দু'বৎসরের কথা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোন খোঁজ-খবর না পাওয়াতে মেয়েটিকে আনার জন্য গিয়েছিল। স্বামী ত্যাগ করার জন্য মেয়েটিকে একটুও চিন্তিত দেখলাম না। স্বামী ত্যাগ করলেও এত আনন্দ তার মুখে কি করে, বুঝ্‌তে পারি নাই। খড়শালীতে বিশেষ অনুসন্ধান করে জান্‌লাম, এ দেশে বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা সধবারও নাকি গোপনে বিবাহ চলে।

খড়শালী গ্রামে পৌছবার পূর্ব্বে একটি বড় ঝরণা পার হতে হয়। ঝরণার উপর সামান্য রকমের কাঠের পুল তৈরী আছে। যারা দেবপ্রয়াগের অলকানন্দা ও ভাগিরথীর সঙ্গমের জলপ্রপাত দেখে শতমুখে প্রশংসা করে থাকেন, তাঁরা এ ঝরণার জলপ্রপাত দেখ্‌লে কি বল্‌বেন জানি না। আমি সমুদয় উত্তরাখণ্ডে এমন ভীষণ গর্জনের জলপ্রপাত আর দেখি নাই। নিকটে দাঁড়িয়ে অত্যুচ্চস্বরে চীৎকার করে কথা বল্‌লেও শব্দ শুনা যায় না —জলের শব্দ এত ভীষণ। জলের দিকে চাইতে

গেলে মাথা ঘুরিয়ে দেয়। অদূরে স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়গুলি বরফের মুকুট মাথায় দিয়ে উৎসুক নয়নে যেন আপনারই সৃজিত জলপ্রপাত উঁকি মেরে দেখছে। যাহোক্, স্থানটী বড় সুন্দর লাগ্‌ল।

জলপ্রপাতের উপরের পুল পার হয়ে, আধ মাইল চড়াই করে পাণ্ডার বাড়ী পৌঁছলাম। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম—তখন পাক করে খাব এমন শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। অথচ এখানে কোন খাবারেরও দোকান নাই যে কিছু খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে পাক করতে লেগে যাব। এই কঠিন পার্ব্বত্য ভূমি আজ বেলা ১টার মধ্যে ১০২ মাইল পথ একদমে অতিক্রম করেছি। সমস্ত উত্তরাখণ্ডের মধ্যে পঁবালী ও গোমুখী ভিন্ন এমন পথ আর কখনও পাই নাই।

খানিক বিশ্রাম করে পাণ্ডার বাড়ীতেই তাদেরই পাকের ঘরে ডাল-ভাত পাক করে নিলাম। অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য ডাল তো মোটেই সিদ্ধ হল না,—চাল ও ডাল সিদ্ধ হল না—ভিতরে শক্ত কিন্তু বাহিরে গলে গেল। আমরা পাক করার পর বাকী সকলে খুব ক্লান্ত হয়ে এসে উপস্থিত হলেন—তৈরী ডাল-ভাত পেয়ে সকলেরই খুব আনন্দ হল। এখানে জলের খুব কষ্ট হলেও দু'টা পয়সার বিনিময়ে এক ঘড়া জল পাওয়া যায়। পাণ্ডাদের বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের ও পাণ্ডাদের জল এনে দিতে বললেই তারা আধ মাইল চড়াই উৎরাই করে এক ঘড়া জল 'কাণ্ডী'তে করে এনে দেয়। আমরা এই ভাবেই জল আনাতাম।

যমুনোত্তরীর যত পাণ্ডা সকলেই খড়শালীতে বাস করেন। এখান হতে উৎকট চড়াই করে ৪ মাইল উত্তরে গেলেই যমুনোত্রী তীর্থ। কিন্তু এই ৪ মাইল যেমন ভীষণ চড়াই উৎরাই, তেমনি অত্যন্ত কষ্টকর; ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য লোকে সে কষ্ট বুঝ্‌বে না। আমরা আজ ১০২ মাইল চলে এসেছি,—আগামী কাল সকালে বের হয়ে যমুনোত্তরী যাব স্থির করলাম।

খড়শালীর বিবরণ

পাণ্ডাদের আবাসভূমি খড়শালী গ্রামটি চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। শীতকালে যখন যমুনোত্তরীর মন্দির বরফাবৃত হয়ে যায়, তখন এই গ্রাম হতেই উদ্দেশ্যে পূজা নির্ব্বাহ হয়ে থাকে। গ্রামে ২৫ ঘর পাণ্ডা আপন স্ত্রী পুত্র পরিবার নাতি পুতি সহ বসবাস কচ্ছেন। দু'টী ধর্ম্মশালা, একটি সোমেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও একটি শনিচরের বৃহৎ মন্দির বিদ্যমান। বাবা কালী-কম্বলীবালার সদাব্রত দিবারও ব্যবস্থা আছে।

গ্রামটি অপরিচ্ছন্ন হলেও চারিদিকে সামান্য সামান্য শাক-সব্‌জির শোভা আছে—সে বোধ হয় বড় বড় ধনী যাত্রীদের মনস্তুষ্টি করে টাকা আদায়ের একটি নূতন পন্থা। পাহাড়ীদের কখনও শাক খেতে দেখি নাই। নিমক লংকা হ'লে দিস্তে-দিস্তে রুটি অনায়াসে গলাধঃকরণ হয়ে যায়।

গ্রাম হতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। অত্যধিক শীতের জন্য ঘরগুলিও নূতন ঢংয়ে তৈরী—প্রায় সমস্তই কাঠের ঘর, কোথাও বা পাথরেরও আছে। ঘরের নীচুতে ৩।৪ হাত বাদ দিয়ে সকলেই উপরে থাকে, নীচে গরু, বাছুর, মহিষ প্রভৃতি এবং জ্বালানী কাঠ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। শীতকালে ৫।৬ ফুট, কোন কোন বৎসর ৮।১০ ফুট পর্য্যন্ত বরফ পড়ে, সে সময় ঘর হইতে কেউ বের হয় না। ঘরে ঢুকবার একটিমাত্র দরজা, তাও আবার এত ছোট—বসে বসে বা উপুড় হয়ে ঘরে ঢুকতে হয়—দাঁড়িয়ে ঢুকবার মত কোন দরজা দেখি নাই। আমাদের তো এসব ঘরে ঢুকতেই বিশেষ কষ্ট হত। আবার ঘরের ভিতরও তথৈবচ—এত নীচু, দাঁড়ান যায় না—মাথায় লাগে।

স্ত্রী পুরুষ প্রায় সকলেই কম্বলের অলষ্টার চড়ায়—ভিতরে কাপড় শূন্য। সেরূপ জগদম্বল অলষ্টার সর্ব্বদা বাংলার কুলী-মজুরদের চড়িয়ে রাখলে হয়তো

২।৩ মাসের মধ্যেই "হরি বোল, হরি বোল" বলে নিমতলার মহাশ্মশানে হাজির করতে হবে। অম্বল-গ্রস্ত রুগ্ন বাঙ্গালীর কথা আর কি বলব? এরা কিন্তু সুহাস্যমুখে অলষ্টার চড়িয়ে সব কাজকর্ম্ম করে থাকে। এ সব অলষ্টারের কম্বল এরা নিজ হাতেই তৈরী করে।

আর একটি নূতন জিনিষ এখানে আছে, যা সমগ্র হিমালয়ে আর কোথাও দেখি নাই—গলগণ্ড রোগ। স্ত্রী পুরুষ প্রায় প্রত্যেক লোকেরই গলায় ঢাক সদৃশ এক একটি গণ্ডমালা বিদ্যমান। হিমালয়ের আর কোথায়ও নাই অথচ এখানে থাকার কারণ কি, বুঝলাম না। (ক্রমশঃ)

সহজের মহিমা

—*†()†*—

দুটীতে নিবিড় ভালবাসা; কত আদর, কত সোহাগ সে ভালবাসা হতে উপচে পড়ছে। দেখে আমার মন ভরে ওঠে, দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। আমি যেন ওদের দু'জনার মাঝেই আছি; দু জনার মাঝেই আছি বলেই যেন কোথায়ও আমি নাই—আমার মাঝে আমি নাই!

হঠাৎ একটা কথা মনে করে বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে ওঠে। আচ্ছা, আমি তো দুজনাকেই পেলাম আমাকে হারিয়ে; কিন্তু ওরা পেল কাকে? যে যাকে চায়, সে যদি তার কাছে একটা বস্তুমাত্র হয়, তাহলে সে পাওয়ার সুখ তো খণ্ডিত। যাকে ভালবাস, তাকে কাছে পেয়েছ; কিন্তু কেমন-ধারা সে পাওয়া? একটা বস্তুকে মাত্র আশ্রয় করে নিজেরই হৃদয়বৃত্তির দুরু দুরু কম্পনটুকু মাত্র অনুভব করা—এই কি পাওয়ার চরম? বিষয়ীর সামনে বিষয় ফুটে উঠলেই পাওয়ার পর্য্যাপ্তি হয়ে গেল? বিষয়কে বিষয়ীতে রূপান্তরিত করতে পারলে না? যে রস তোমার, সেই রস ওই বুকেও; ওখানে এখানকার যে ছায়া পড়েছে, সেই ছায়া আবার পরাবর্ত্তিত হয়ে এখানে ফিরে এসেছে, যাকে ভালবাস, তার মাঝে দেখতে পাচ্ছ তোমারই অপরূপ-সুষমা—এইটুকু কি হয় না? যদি না হয় তো বলব, ও ভালবাসা একটা পদ্ধতিমাত্র; জ্ঞানী যে ওকে বন্ধন বলেন, তা মিছে বলেন না। কিন্তু ভালবাসা মাত্রেই তো বন্ধন নয়; কামের অন্তরালে ঝিকমিক্ করছে প্রেমের দ্যুতিটুকু। ধরতে না পারলে কার ক্ষতি?

আচ্ছা, অত বড় কথাতে না হয় নাই গেলাম। ছোট্ট-খাট্টো একটা কথাই ধরি। সংসারে দেখি—মা ছেলেকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, ভাই বোনকে ভালবাসে, বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে—চারদিকে কেবলই মমতার বন্ধন; কেবলি আকর্ষণ-বিকর্ষণের মেলা। ইষ্ট বলে যদি কাউকে স্বীকার করলে তো তোমার সর্ব্বনাশ; তার পর সুরু হবে—মিলনে সুখ, বিরহে জ্বালা। দুটাকে যদি সমান করে নিতে পারতে, তাহলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তা যখন পারলে না, তখন ভালবাসাই হল কাল। জ্ঞানী এসে বললেন, ওরে ছেঁড়্ ছেঁড়্ বাঁধন ছেঁড়্—কোন্ আঁধারে তলিয়ে যাচ্ছিস্ দেখ্‌ছিস না?

বাস্তবিক, চমকে উঠবার কথাই তো!

কিন্তু প্রেমিক এসে চোখের সামনে মেলে দিলেন বৃন্দাবনের পট! আবার দেখি, ওই ভালবাসার অত্যাচার! সেই মানুষে মানুষে জড়াজড়ি মাখামাখি,

সেই মিলনে শত্রুতা, বিরহে জ্বালা, হাসি-অশ্রু কত কি! বললেন, এই আরাধনা কর্, তোর সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। এই রসের জগৎটাকে ছেড়ে যাব কোথায়? যে জ্ঞানে জগৎটাকে পুড়িয়ে খাক্ করে দেয়, তোকে শুদ্ধ নাস্তি করে দেয়, সে জ্ঞান এখন মাথায় থাকুক। সাধনা যদি করতে হয় তো এই ভালবাসার সাধনাই কর্।

ভালবাসার একটা বিভীষিকা মনের মাঝে লুকানো আছে তো! তাই ভয়ে ভয়ে বলি, আচ্ছা, এই ভালবাসা কি মায়িক জগতের ভালবাসার মতই নয়?

প্রেমিক হেসে বলেন, আদপেই নয়! দেখছিস্ না, ওখানে সব চিন্ময়!

কথাটা বুঝ্‌তে পারি না। আস্তে আস্তে বলি, কিন্তু ব্যবহারটা ঠিক মায়িক জগতের মতই ঠেকছে না কি? এটা কি তাহলে রূপক? এই যেমন জীবাত্মা আর পরমাত্মা—

কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে প্রেমিক বলেন, ওরে ওসব রূপক-টুপক কিছু নয় রে! বল্‌লাম না, এ সোজাসুজি দেখা, সোজাসুজি পাওয়া! তবে কিনা, এটুকু অবশ্য বল্‌তে হবে যে, এ হচ্ছে প্রপঞ্চের বাইরে—

কথাটা তেমনি গোলমেলেই থেকে গেল কিন্তু। সেই সব প্রপঞ্চের ব্যাপারই তো রয়েছে দেখ্‌ছি, অথচ **সোজাসুজিই** দেখ্‌তে হবে এ সব প্রপঞ্চের বাইরে!—এ তো মহামুস্কিলের কথা হল! হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেন অথৈ জলে থৈ পেলাম।—হাঁ, যিনি এই লীলার মূলে, তিনি তো প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিত। তাই তাঁর স্পর্শে সব চিন্ময় হবে না কেন? এই সব ব্যবহার আমাদের প্রতি আরোপিত হলে দোষের হত; কিন্তু তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে তো এর মাঝে আর দোষ থাকতে পারে না, কেননা তিনি যে আত্মারাম—

প্রেমিক গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, এখনো তুই সোজাসুজি দেখ্‌তে পারলি না! জানিস্, মহিমজ্ঞান থাকতে প্রেম ফোটে না। উনি আত্মারাম হতে পারেন তোর কাছে; কিন্তু যারা তাঁকে ভালবাস্‌ছে তাদের কাছে কি? তারা তো অত-শত বোঝে না; প্রাণের টান, তাই ভালবাসে। ব্যস্, সব ল্যাঠা চুকে গেল!

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাণের টানে ভালবাসলেই যদি ল্যাঠা চুকে গেল তো অমন ভালবাসা তো আশে-পাশে কত ছড়ানো আছে দেখছি; কিন্তু তাদের ল্যাঠা তো চুকছে না!

একটুখানি রহস্যময় হাসি হেসে প্রেমিক বলেন, বস্তুশক্তি মানিস্ তো? আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, জিভে মধু ঠেক্‌লে মিঠা লাগেই। তেমনি এমন কেউ থাকতে পারে, যার সংস্পর্শে এলেই ল্যাঠা চুকে যায়, তাকে ভালবাস্‌লে তো চুকেই, গালাগাল দিলেও চুকে। ওই একই ভালবাসা, কিন্তু তাতে আরোপিত হয়ে তা অমৃত হয়ে যায়; কেন হয়, তা কেউ বুঝে উঠ্‌তে পারে না। প্রকৃতির খেয়ালেই বল, আর প্রয়োজনেই বল, অমনি-ধারা অদ্ভুত ঘটনা এক একবার ঘটে যায়। মানুষ তখন তার স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রেখে, তারই পূজা করে ধন্য হয়। কিন্তু যারা তাকে পায়, তারা সোজাসুজিই পায়। তার আকর্ষণ সহজ আকর্ষণ; সোজাসুজি এই কথাটা না বুঝ্‌তে পারলে আর তো বোঝাবার উপায় নাই; ফিকির করে বোঝাতে গেলে আর মাধুর্য্য থাকে না, সহজ বিষম হয়ে ওঠে।

বলে প্রেমিক ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। আমিও সমস্যা বিষম মনে করেই চুপ করে রইলাম।

ওই একটা কথা, ভালবাসার মহিমজ্ঞান বর্জ্জন করার কথা, ও কথা যে আগে শুনিনি, তা নয়। কিন্তু দৈবযোগে হঠাৎ বস্তুশক্তির আবির্ভাব ঘটলে না হয় ওটা খাটলো; কিন্তু আমাদের নিত্যিকার ঘরকন্না তো ওই সহজ রীতিতে চল্‌বে না! অথচ

দেশের লোক বায়না ধরে আছে, সহজকে তারা আরো সহজ করে তুল্‌বে!

ভালবাসার স্বরূপে মহিমজ্ঞান থাক্‌বে না, সে কথা মানি। কিন্তু সাধ্য-সাধনায় থাক্‌বে তো? নইলে সে যে মরণ! একটা অধিকারের বিচার আছে তো? তা ছাড়া দুটীতে যে ভালবাসা, তাদের পরস্পরের প্রতি মহিমজ্ঞান না থাকুক, সব শুদ্ধ সে ভালবাসাটী যদি মহিমাময় না ওঠে, তা হলে কি আর উপায় আছে?

ধর ওই বৃন্দাবনের কথাই। ওখানকার সারা পাত্র-পাত্রী তাদের মহিমজ্ঞান নাই-ই থাক্‌ল, কিন্তু তোমার আমার মহিমজ্ঞানেই না ওর রসটুকু এখনও "শৃঙ্গারকথাব্যপদেশেন নিবৃত্তিপরঃ" হয়ে আছে। নইলে কি রক্ষা ছিল? যেখানে ওই মহিমজ্ঞানটুকু লোপ পেয়ে গেছে, সেইখানেই ব্যভিচারের খরস্রোত বইছে—এ কি চোখের ওপরই দেখ্‌ছি না?

এইখানেই তো সমস্যা। বৈষ্ণবের গানকে বৈকুণ্ঠেই যে তুলে রাখ্‌তে হয়; তাকে মাটীতে নামাই কি করে? জীবনে তার রস সঞ্চয় করি কি করে?

বলি কি, এখানে মহিমজ্ঞান না থাকলে এক দণ্ডও চল্‌বে না। যশোদা গোপালকে যে ভাবে আদর করছেন, যে-কোনও মা-ও তো ছেলেকে সেই ভাবেই আদর করে; তবে তফাৎ হয় কোথায়? বস্তুশক্তির মাহাত্ম্যে আগেরটা সহজ হয়েও নিবৃত্তিপর হচ্ছে; কিন্তু পরেরটায় যখন বস্তুশক্তি বাস্তবিক থাকে না, তখন সহজের মাধুর্য্য বজায় রাখবার দরুণ ওই চিন্ময় বস্তুর আরোপ করা ছাড়া উপায় কি? ত্রেতাযুগে যে রাম দেখেছিল, আর আজ যে ঘটে ঘটে রাম দেখ্‌ছে, দুয়ের দর্শনে সামঞ্জস্য করতে গেলেই যে আন্‌তে হয় ওই মহিমজ্ঞান, ওই চিন্ময় ভাবের আরোপ!

সহজিয়া সহজ দেখ্‌ছেন বটে, কিন্তু কথাটা সর্ব্বসাধারণের মগজে ঢোকে না; তাই ওর প্রচার করতে সাবধান হওয়া উচিত। এই সাবধানতা দেখি—নারদের, শুকের। নারদ বলছেন, গোপীর মহিমজ্ঞান ছিল, নইলে তাদের পতিতা বল্‌তে হয়। শুকও ভাগবতে গোপীদের দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়ে নিয়েছেন, তা শুধুই বাংলা পদাবলীর তরলিত মাধুর্য্য নয়, বেশ বেদান্তের দানা বেঁধেছে তাতে।

কবিরাজ গোস্বামী বড় সুন্দর মীমাংসা করেছেন এ সমস্যার। বলছেন, দাস্য ভক্তিটাকে ছেড়ো না। মহিমজ্ঞান যতই ছেড়ে যাক্ না কেন, দাস্য-ভক্তিটুকু যেন হৃদয়ের কোণায় থাকেই—অবচেতনায় অন্ততঃ যেন থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব-শক্তি শুধু জ্ঞানশূন্য প্রেমই উদ্দীপিত করেনি, আধারবিশেষে জ্ঞানও উদ্দীপিত করেছে; শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে হলে এই কথাটাও ধারণা করবার প্রয়োজন আছে।

নন্দের মাঝে শুদ্ধ বাৎসল্য; কিন্তু উদ্ধবের মহিমজ্ঞানকে তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না। বলছেন, উদ্ধব, **তোমাদের** যে নাকি জগদ্‌ভর্ত্তা, সে কিন্তু **আমার** গোপাল; আমার যেন চিরকাল তার কাছে মনটী বাঁধা থাকে! ছেলের মুখেও যশোদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। একটা কথা আছে, যশোদা একদিন গোপালকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছেন; গোপালের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর বুক আলো হয়ে উঠ্‌ল, মনে হতে লাগ্‌ল, এই আমার ছেলে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর কটাক্ষে বাঁচে মরে; আর ভাব্‌তে ভাব্‌তে মায়ের মন যেন বিশ্বব্যাপী হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এই সময় ঘরের ভিতর একটা বিড়াল ম্যাঁও করে উঠ্‌ল; গোপাল তাড়াতাড়ি মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ওমা, ওটা কি! অমনি যশোদার বিশ্বব্যাপী মন যেন সঙ্কুচিত হয়ে এসে পড়্‌ল ওই অতটুকু গোপালটীর ওপর; তাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, না বাবা, আমি আছি, ভয় কি!

মহিমজ্ঞান আর সহজদর্শনে এই মধুর সামঞ্জস্যটুকু যদি না থাকে তো লাঞ্ছনার আর অন্ত থাকে না। আমার পাঁচ বছরের ল্যাংটা মেয়েটীতে যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর ছায়া দেখ্‌তে পাই, তাতেই না আমার এই মায়িক জগতের ভালবাসাও চিন্ময় হয়ে ওঠে! এবং অনুলোমক্রমে আমার হৃদয়ের শুদ্ধভাবরাশি যে প্রকৃতির প্রেরণায় আমারই আস্বাদনের দরুণ মৃন্ময়ী তনুতে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে ওঠে, এ-ও তো জানি; সেখানেও দেখি, সহজে আর মহিমায় সমন্বয়। বাস্তবিক মহিমাকে সহজ করা আর সহজকে মহিমময় করা—এই দুইটী কোটী জাগ্রৎ না থাক্‌লে আস্বাদনের পূর্ণতা হয় না। জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ও এইখানে। "গুরু নরাকার পরব্রহ্ম"—এই তত্ত্বে এ পূর্ণতম দার্শনিক অভিব্যক্তি।

বাঞ্ছিত

কার পরশে পরাণ আজি এমন উতলা—
এক নিমেষে আঁধার এ ঘর কর্‌ল উজলা?
দিকে দিকে প্রাণ মাতায়ে
কোন্ দরদীর প্রেম-গাঁথা এ—
চল্‌ছে বয়ে দখিণ পবন, কোন্ সে বিভোলা—
যার পরশে পরাণ আজি এমন উতলা?
সুদূরে তার বাজছে বাঁশী,
মন ছাপিয়ে উঠছে হাসি,
কোন্ মধু সে রয় ভুবনে, কোন্ সে নিরালা—
যার পরশে পরাণ আজি এমন উতলা?
কার মাধুরী শিশুর মুখে
সবায় টানে আপন বুকে—
সবার মাঝে সঞ্চরিয়া আপনি অচলা?—
যার পরশে পরাণ আজি এমন উতলা!
তারই বাণী বুকে শুনি,
প্রেমিক পেল রসের খনি,
শুষ্ক ভূমি তার ছোঁয়াচে আজকে সুজলা—
যার পরশে পরাণ আজি আপ্‌নি উজলা!

কুতুবপুর

নিগমানন্দ-সারস্বত মন্দির

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত ঋষিবিদ্যালয় নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতাকল্পে তদীয় জন্মভূমি নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর সবডিবিশনের অধীনে কুতুবপুর-গ্রামবাসীগণের আগ্রহাতিশয়ে তত্রত্য ভৈরব নদীর তটে সুবিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন স্থানে "নিগমানন্দ সারস্বত-মন্দির" নামক উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে ম্যাট্রিকুলেশন (matriculation) পরীক্ষার উপযোগী এইচ্, ই, (হাই ইংলিশ) স্কুল বলিলে ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে না। সুতরাং নিম্নে এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল।

বঙ্গদেশীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহ যেমন সরকারী, অর্দ্ধসরকারী ও বেসরকারী এই তিন ভাগে বিভক্ত, আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ কর্তৃক পরিচালিত ঋষিবিদ্যালয় নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একটী বিশ্ববিদ্যালয় কল্পিত করিয়া তাহার অধীনে তিন শ্রেণীর তিনটী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে জাতীয়, ধর্ম্ম ও নীতির শাসনাধীনে ত্যাগ ও সংযমের ভিতর দিয়া প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে পারে এবং সর্ব্বশ্রেণীরই দেশবাসীগণ যাহাতে আপন আপন সন্তানগণকে ঐ ভাবে শিক্ষিত করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে উক্ত ঋষিবিদ্যালয়কে সর্ব্বতোভাবে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিবার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কুতুবপুর "নিগমানন্দ সারস্বত-মন্দির" তাহারই এক ভাগ।

ঋষি-বিদ্যালয়ের **প্রথম** ও শ্রেষ্ঠ বিভাগ থাকিবে **মঠে**। সেস্থানে প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বনে গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব শূন্য হইয়া একান্ত ভাবে গুরুনির্ভরশীল যুবক সন্তানগণ মঠের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিবে। ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার আদর্শ এই স্থানে পূর্ণভাবে লক্ষ্যস্থানীয় হইবে। ষোড়শ বৎসের ন্যূনবয়স্ক শিক্ষার্থীকে এই বিদ্যালয়ে এই বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইবে না।

মধ্যম বা দ্বিতীয় বিভাগ থাকিবে মঠ এবং মঠের অধীনস্থ বঙ্গের পাঁচটী বিভাগীয় আশ্রম হইতে **স্বতন্ত্র স্থানে** প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষায়তনে দেশের বর্ত্তমান-প্রচলিত রাজকীয় ব্যবস্থার সমস্ত দোষ বর্জ্জন করিয়া

ত্যাগ এবং সংযমের ভিত্তি স্থির রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুকূল নিয়মাধীনে সাত হইতে আঠার বৎসর বয়স্ক বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। রাজকীয় ব্যবস্থাধীন উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য—ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া ঋষিগণের শিক্ষার আদর্শে শিক্ষার্থীগণকে গড়িয়া তোলা হইবে। অধ্যাপক এবং শিক্ষকগণ ভিন্ন অন্যের সহিত শিক্ষার্থীগণের কোন প্রকার সংস্রব না থাকিলেও বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অল্পপরিমিত অবসর-সময়ে তাহারা আপন আপন গৃহে যাইয়া পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত মিশিতে পারিবে—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যানুকূল নিয়মাদি কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিবে না। আদর্শরক্ষায় অসমর্থ বালকের পক্ষে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাজকীয় ব্যবস্থাচালিত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ ও সুবিধা থাকিবে।

তৃতীয় বিভাগ কুতুবপুর-**নিগমানন্দ-সারস্বত মন্দিরে** রাজকীয় ব্যবস্থানুযায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। অধিকন্তু ইহাতে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে। সাধারণ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সৎভাবে এবং সুনিয়মানুবর্ত্তিতায় ছাত্রগণের জীবন পরিচালিত হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। মঠ ও আশ্রমসমূহ হইতে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী উপদেষ্টাগণ মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিবেন। প্রতিষ্ঠাতা পরমহংসদেবও বৎসরে দুই একবার উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রগণকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দান করিবেন। কৃষিশিক্ষার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ইতিমধ্যেই কিছু কিছু আনা হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজী সনের জানুয়ারী মাস হইতেই সমস্ত ক্লাশ খোলা হইয়াছে এবং সুশিক্ষিত, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ কৃতী শিক্ষকগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুদৃশ্য বৃক্ষবাটিকামধ্যে অবস্থিত প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে এবং দরিদ্র দেশবাসীর সুবিধার জন্য বোর্ডিং-চার্জ্জ মাসিক ৬॥০ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হার করা হইয়াছে। আগামী ১৯৩১ সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিদ্যালয়েব ছাত্রগণ বিনা-ব্যয়ে কুতুবপুর "নিগমানন্দ দাতব্যচিকিৎসালয়" হইতে যথাযথ ঔষধ ও উপযুক্ত ডাক্তারের উপদেশ ও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মুসলমান ছাত্রগণের জন্য স্বতন্ত্র বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে অথবা দূরবর্ত্তী স্থানের ছাত্র কিম্বা অভিভাবকগণের বিদ্যালয় এবং বোর্ডিংএ ভর্ত্তি সম্বন্ধে দরখাস্ত করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন এম্-এ

হেড মাষ্টার—কুতুবপুর নিগমানন্দ সারস্বত-মন্দির

পোঃ—কাথুলি, জিলা—নদীয়া

———:*:———

ভক্তসম্মিলনী

পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৩৬

স্থান—উত্তরবাংলা সারস্বত-আশ্রম, বগুড়া

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

—*†()†*—

গত ১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই পৌষ শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে (বগুড়া) ভক্তসম্মিলনীর ১৫শ বার্ষিক অধিবেশন যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জমীদার, ইঞ্জিনিয়ার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলা হইতেই ভক্তসমাগম হইয়াছিল। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতেও দুই একজন করিয়া ভক্তসমাগম হইয়াছিল। সম্মিলিত ভক্তসংখ্যা প্রায় দুই শত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের প্রিয় শিষ্য মধ্যপ্রদেশান্তর্গত বস্তাররাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সিংহ ভঞ্জদেব বাহাদুর বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় সম্মিলনীতে যোগদান করিতে না পারিয়া টেলিগ্রাম দ্বারা সম্মিলনীকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

প্রথম দিবস শ্রীভগবান্ জগদ্গুরুকে সভাপতিরূপে আবাহন করিয়া বন্দনাগীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে বেলা ৯॥ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীযুত হরপ্রসাদ রায় ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ মহারাজ সঙ্ঘস্থিত ব্রহ্মচারী সোনামণি ও ব্রহ্মচারী রামদাসের মৃত্যুতে এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মহাশয় পণ্ডিত গোপীনাথ স্মৃতিভূষণের মৃত্যুতে এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে শোকসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সমবেত ভক্তগণ "জয়গুরু" উচ্চারণ করিয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সভাপতির নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে পর উহা সভা মধ্যে বিতরিত হয়। অনন্তর অন্যান্য বর্ষের ন্যায় আগামী বর্ষের দরুণ প্রয়োজন মত নূতন সদস্যাদি নির্ব্বাচনান্তে মঠ ও আশ্রমগুলির বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও আয়-ব্যয়াদি প্রদর্শন করা হয়। তদনন্তর সংঘের অন্তর্ভুক্ত পল্লী-সংঘ সমূহের কার্য্য-বিবরণীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দানান্তে বেলা ২॥০টায় সভা ভঙ্গ করা হয়।

দ্বিতীয় দিবস যথানিয়মে প্রার্থনা-সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ৯॥০টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ অনুপস্থিত সদস্য ও ভক্তগণের পত্র ও টেলীগ্রামাদি পঠিত হয়। অনন্তর বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় করাইয়া দিলে পর শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ সংঘের উদ্দেশ্য, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য ও সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনা

সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজ পল্লী সংঘের সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া তাহার নিয়মাবলী পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু উকীল মহাশয় মঠের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলেন। তদনন্তর শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ ভক্তসম্মিলনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর আলিঙ্গন ও অভিবাদনান্তে বেলা ২॥০টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় দিবস বেলা ২॥০টার সময় আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয়। পৌষ নারায়ণীর মেলা উপলক্ষ্যে সকলেই ব্যস্ত থাকায় এই সভায় আশানুরূপ লোকসমাগম হয় নাই। আনুমানিক প্রায় ৩০০ লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বগুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেড্ ক্লার্ক ও একাউন্টেন্ট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত হিরণ্যমোহন দাসগুপ্ত বি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় একটী লিখিত অভিভাষণে মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সুন্দরভাবে সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মহাশয় মঠের উদ্দেশ্য, কার্য্যপদ্ধতি ও গৃহস্থজীবন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দাস বি-এল মহোদয় সাধারণের পক্ষ হইতে মঠের কার্য্য-পদ্ধতিকে অভিনন্দিত করিয়া বক্তৃতা করেন। উপসংহারে শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র বি-এল মহোদয় দেশের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার প্রতীকারকল্পে সারস্বত মঠ কি করিতেছেন, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সন্ধ্যা ৫॥০টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। তদনন্তর উপস্থিত জন-মণ্ডলী শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজকে প্রণাম ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সভাস্থান পরিত্যাগ করেন।

এবার সম্মিলনীতে সমাগত সেবক ও ভক্তগণ হইতে করতোয়ার পৌষ-নারায়ণী-যোগ উপলক্ষ্যে স্নানার্থীদিগের সেবার জন্য ৫০ জন সেবকসমবায়ে একটী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। ১৪ই পৌষ এই বাহিনী স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। সম্মিলনীর অধিকাংশ ব্যয়ই ভক্তগণ বহন করিয়াছেন। আগামী-বর্ষে পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে সম্মিলনীর ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

স্বাগতম্

[ভক্তসম্মিলনীর ১৫ শ অধিবেশন উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী দ্বারা পঠিত]

—

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

শ্রীভগবানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগুরু-চরণ বন্দনা করিয়া সমবেত ভ্রাতৃগণকে বগুড়াস্থ ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর পক্ষ হইতে সাদরে আবাহন করিতেছি। এমনি একদিনে ১৪ বৎসর পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের শ্বাপদসঙ্কুল এক নিভৃত বনান্তরালে শান্তি-আশ্রমের মন্দিরে কতিপয় ভক্ত লইয়া সম্মিলনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আর এমনি আর এক দিনে ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত কালনী গ্রামের মন্দির-প্রাঙ্গণে এই সম্মিলনীর জীবনীশক্তি প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সব অতীত কাহিনী হইলেও স্মৃতিপটে আজ এক এক করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; সে স্মৃতি কত মধুর, কত বেদনা ও আনন্দের অশ্রুমাখান! ভাবিতে গেলে মনে হয়, অহেতুক কৃপাসিন্ধু তিল তিল করিয়া দিনের পর দিন কেমন করিয়া তাঁহার ভক্তগণের প্রাণ ভরিয়া উপচিয়া উঠিয়া প্রকাশিত হইতেছেন; নিজকে কেমন করিয়া বিলাইয়া দিয়া অমৃতভাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিদগ্ধ চিত্তের বিষ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নীলকণ্ঠ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন! আমরা হাসিয়া খেলিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতেছি। সত্যের পথে প্রেমের আবেষ্টনীর মধ্যে পুলকে অভিভূত হইয়া যাঁহার ইঙ্গিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি, কালের অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিপদে বিঘ্নের সঞ্চার করিলেও তাঁহারই উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া আমরা সম্মিলিতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি, কর্ম্মের প্রসার দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বাঙ্গলা ও আসাম তথা ভারতময় এই ভাবের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তের সকল প্রকার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার পরিপূরণকল্পে ভক্তগণ অগ্রসর হউক। ইহার পরে কি হইবে, সুদূর ভবিষ্যৎগর্ভে কি আছে—তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর কই? কর্ম্মীর আদর্শ কর্ম্ম করা, ফলে নিঃস্পৃহ থাকা। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"—তোমার কর্ম্মেই অধিকার, ফলে নাই। ইহাই শ্রীভগবানের বাণী এবং কর্ম্মের মূল ও শেষ সূত্র।

অতীতের অভিজ্ঞান, বর্ত্তমানের শক্তি ও ভবিষ্যতের আশা—এই তিনটী কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু যখন কর্ম্ম কোন আদেশানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, তখন আর ভূত-ভবিষ্যতের আলোচনার অবকাশ থাকে না; থাকে একমাত্র বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে কেবলমাত্র আদেশই পালন করিয়া যায়। সৈন্যাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র সৈন্য মৃত্যুর করালগ্রাসে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাই কর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ।

কর্ম্মের সূচনা প্রথম অবস্থায় বীজাকারেই থাকে। এবং দিনের পর দিন বাড়িতে থাকে। কবে যে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ১৩১৯ সনে যখন প্রথম আসাম-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়,

তখন কে জানিত যে, এ কয় বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বিভাগে বিভাগে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইবে? কে জানিত যে, দ্বাদশ জন ধীবরকে শিষ্য রাখিয়া যে যিশুখৃষ্ট ক্রুশে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সারা জগতের অর্দ্ধেক নর-নারী তাঁহারই চরণ-তলে জীবনভার নামাইয়া দিয়া শান্তির অভিলাষী হইবে?

আমাদের অনেকেরই মনে হইতেছে যে, এই ঋষি বিদ্যালয় ও আশ্রমদ্বারা দেশের কি কাজ হইবে? ঋষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জগতের কোন্ কাজে লাগিবে?—পাশ্চাত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশে, প্রাচ্যের এই অতি পুরাতন ধারা কি ফল প্রসব করিবে? বর্ত্তমানে জগৎ জুড়িয়া প্রলয়ের সূচনা হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিপ্লব, ধর্ম্মের বিপ্লব সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে! পুরাতনকে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য একটা প্রবল প্রচেষ্টা সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে। নূতন কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এই ভাঙ্গনের দিনে প্রাচ্যের ভাবধারা—ভারতের প্রাণ, তার ভাব-সম্পদ, শম দমাদি বিদায় লইতে বসিয়াছে। কোলাহলে দিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ-কারিতা নিয়া ভারত আজ তার ধর্ম্ম-বিজ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে। পুরাণের যুগে হিমালয়ের ক্রোড়ে গঙ্গার স্নিগ্ধ-সৈকতে বসিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ভারতে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে এই শিশ্নোদরপরায়ণতার যুগে ক্রমশঃ বিদায় লইতেছে। দেশে একাকারের প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। ভবিষ্যপুরাণের "একবর্ণা ভবেৎ পৃথ্বী" এই শ্লোক ক্রমশঃ সত্যে পরিণত হইতেছে। কিন্তু এই বিপ্লবের অন্তরালে সারস্বত-মঠ ভারতের নিজস্ব সেই পুরাতন ভাবধারা বক্ষে লইয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা এখনই রাতারাতি এই মঠের একটা জগদ্ব্যাপী বিকাশ দেখিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই ভুল করিবেন, সন্দেহ নাই। কারণ বাহিরের দিক হইতে যখন ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিয়া শেষ হইয়া যাইবে, একমাত্র তখনই এই সারস্বত মঠের কর্ম্মধারা অবলম্বন করিয়া পুরাতন নূতন আকারে ফুটিয়া উঠিবে এবং তাহাতেই ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে। গৃহ-কর্ত্রী যেমন ধ্বংসের সময় নানাবিধ বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং বপনের সময় আবার বাহির করিয়া দেন, প্রলয়ে জগৎ ধ্বংস হইলেও মায়ের বুকে সৃষ্টির বীজ লুকাইয়া থাকে;—তেমনি সারস্বত মঠও ভারতীয় ভাবের বীজ রক্ষা করিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

এই সব বিচার আমাদের নিষ্প্রয়োজন। প্রভু দয়া করিয়া যে কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে খাটিয়া খাটিয়া দেহ পাত করিতে পারিলেই মানবজন্ম সার্থক হইবে, সাধন-ভজন সফলতা লাভ করিবে—আর নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় সত্যের অনাবিল আলো ফুটিয়া উঠিয়া গুরুতত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া দিবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ!

* * *

পরিশেষে আমার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, আমরা তাঁহাদের সম্যক্ আদর-যত্ন, বাসস্থান ও আহারাদির আশানুরূপ সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই এবং যাহা করিয়াছি, তাহাতেও নানাবিধ ত্রুটি রহিয়াছে; তাঁহারা যেন নিজ সোদর জ্ঞানে আমাদের এই সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করেন।

ওঁ জয়গুরু

অভিভাষণ

[ভক্তসম্মিলনীর ১৫শ অধিবেশনে সাধারণ-সভার সভাপতি
শ্রীযুক্ত হিরণ্মোহন দাসগুপ্ত বি-এল্ দ্বারা পঠিত]

—):*:(—

"যাঁহাকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ দেবগণ দিব্য-স্তোত্রে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন; সামগায়কগণ সাঙ্গবেদ-উপনিষদ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার গীত গান করিয়া থাকেন; ধ্যানাবস্থিত যোগীগণ তাঁহাতেই অর্পিতমনা হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন; সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত অবগত নহেন, সেই দেবতাকে বারম্বার নমস্কার করি।"

"যাঁহার কৃপা মুককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দময় মাধবকে আমি বন্দনা করি।"

পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ, ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণগণ, আশ্রমবাসী ও ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলি!

আপনাদের এই ভক্তসম্মিলনী-সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতিত্ব করার উপযুক্ত যে আমি মোটেই নই, তাহা নিরন্তর অনুভব করিতেছি এবং যখন এই সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয় আমাকে বলেন, তৎকালেও আমি নিজ অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী ও তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি নাই ও আমার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, যে বংশে একটি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। এই ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই সম্মিলনীর নেতৃপদ যাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিত ও বাগ্মী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, সেই পদে আমার মত মূর্খ ও শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক-রহিত ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়া যে কিরূপ উৎকট স্পর্দ্ধার কার্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। একবার মনে হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও বাগ্মিতার কোনও প্রমাণ দিতে পারে নাই, কোন জনসভায় দুইটী কথা একত্র করিয়া বলিতে পারে নাই, বৃদ্ধ বয়সে সেই কমবক্তাকে বক্তার অধিষ্ঠানে দণ্ডায়মান করিয়া উপহাসাস্পদ করতঃ রঙ্গ দেখাইয়া অতিথিগণের চিত্ত-বিনোদ করা হয়ত সন্ন্যাসী আশ্রমবাসীগণের অভিপ্রায়; কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ আপত্তি সত্ত্বেও যখন স্বামীজী আমাকেই এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাদের বিবেচনায় আমিই ইহার উপযুক্ত বলিয়া রায় দিলেন, তখন মনে হইল সংসারত্যাগী বিষয়বিমুখী-চিত্ত ব্রহ্মচারী হইলে কি হয়, তাঁহারাও মায়াবদ্ধ—স্নেহে তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে; তাই কাণা-ছেলেকে পদ্মলোচন জ্ঞান করিতেছেন, তাঁহাদেরও বিচারশক্তি ক্ষীণ হইতেছে। সুতরাং পরিণামে মহাসভায় উপহাসাস্পদ হইবার সুনিশ্চিত আশঙ্কা থাকিলেও স্নেহের আহ্বান এড়াইতে না পারিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমাকে এই সম্মান-দানজন্য পাশ্চাত্য প্রথায় আমি "ধন্যবাদ" দিতে পারিতেছি না। আমি নিজ অক্ষমতায় ও কার্য্যের গুরুত্বে ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছি। অন্য অবস্থা বা অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, অদ্য বিশেষতঃ আমার পক্ষে সেই দেবদেব মাধবের কৃপাকণা ভিক্ষা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, অসম্ভব যাঁহার কৃপায় সম্ভব হয়, অসাধ্য যাঁহার অনুগ্রহে সাধ্য হইয়া দাঁড়ায়; সেই দেবতা—যাঁহার স্তব ব্রহ্মাদি দেবগণ করিয়া থাকেন, যাঁহার মহিমা বেদাদিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যোগীগণ যাঁহাকে ধ্যানে অবগত হয়েন, যাঁহার অন্ত সুরাসুরগণ পায় না; সেই নারায়ণের নররূপী অংশ আপনারা—আপনাদিগকে বন্দনা করি। আপনারা কৃপা করিয়া আপনাদের কার্য্য আপনারাই সফল করিয়া লউন। আমার যত্ন ও প্রচেষ্টা আপনারা জয়মণ্ডিত করিয়া তুলুন। আমার ত্রুটি, দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা আপনারা আবরিত করিয়া ফেলুন।

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের উদ্দেশ্য কি, এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী ও তাঁহার শিষ্য-বৃন্দের এই মঠস্থাপনের ইতিবৃত্ত ও মঠের কার্য্যা-বলী সম্বন্ধে আমি কোন কথা বিস্তৃত ভাবে আপনাদিগের নিকট বলা আবশ্যক মনে করিতেছি না। উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিবরণী প্রতিবৎসর নিয়মিত ভাবে ইঁহারা প্রকাশিত করেন। বিশেষতঃ এই সমস্ত বিষয় যাঁহারা মঠ ও সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহারাই বলিতে পারেন এবং তাহা অন্যান্য বক্তাগণ প্রকাশ করিবেন। মঠের ও আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা ইহার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে; তবে এই মঠাশ্রিত সম্প্রদায় যে বাণী প্রচার করিতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমি ২।১টা কথা যাহা আমার মনে হইতেছে, তাহাই আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

জীব ত্রিতাপদগ্ধ ও স্বভাবতঃ অতৃপ্ত। জড় জগতেই হউক বা আধ্যাত্মিক জগতেই হউক, জীবাত্মা উন্মাদগতিতে ছুটিয়া চলিয়া 'জগৎ' নাম সার্থক করিতেছে। কিন্তু এই যে দুর্দ্দমনীয় বেগে সে চলিয়াছে, ইহা কোন্ সুখের লালসায়, কোন্ আনন্দের সন্ধানে? কামনা তাহার জন্মিতেছে—পূরণ হইতেছে না, আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে—তৃপ্তি আসিতেছে না, সুখ পাইব আনন্দ পাইব বলিয়া যাহা পাইতেছি তাহাই আস্বাদ করিতেছি—তিক্ত, কটু, কষায় নানাবিধ বিস্বাদ ফল লাভ হইতেছে। দেবানুগ্রহে বা তপঃপ্রভাবে যদি কোন ভাগ্যবান্ সেই আনন্দের সন্ধান কদাচিৎ পাইতেছেন, তিনি তিনি তাঁহার অবলম্বিত উপায় বা পথ নির্দ্দেশ করিয়া অন্যকে তাঁহার অনুভূত সেই বিপুল আনন্দের অংশ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। নিজের মধ্যে সেই আনন্দ সংবদ্ধ করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া শুনাইতেছেন—"শুন শুন অমৃতের পুত্রগণ, আমি সেই সকল অজ্ঞানতার অতীত আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিতে পারিয়াছি। তোমরা আইস, এই পথে অগ্রসর হও—অন্য পথ নাই, অন্য পথ নাই।" কিন্তু সেই অনন্তের সন্ধানে যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই ঋষিগণ বহু, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থাও বিভিন্ন। লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পথ বহু ও বিচিত্র। মহা-সাগরের উদ্দেশ্যে সকলেই চলিয়াছেন। গঙ্গা বহিয়া যে নৌকা চলিয়াছে, তাহাতে গেলে সাগর মিলিতে পারিবে; পদ্মা বাহিয়া দ্বিতীয় যে নৌকা চলিয়াছে, তাহাতে গেলেও তেমনি সাগরে মিলিতে পারিবে; আবার ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া তৃতীয় যে নৌকা চলিয়াছে, তাহাতেও সেই কথা। প্রত্যেক নৌকার মাঝিই বলিতেছে—আমার পথে আইস, আমার অনুসরণ কর, আমি এই পথ চিনি ও জানি। অনন্তের সন্ধানের পথও অনন্ত। পথভ্রান্ত পথিক! আনন্দের সন্ধানে তুমি যে পথেই চলিতে চাও না কেন, যদি "একবার নৌকা, একবার ডাঙ্গা" না করিয়া স্থির হইয়া একটা পথ অনন্যচিত্ত হইয়া অবলম্বন করিয়া থাক, তোমার নৌকা তোমাকে সাগরে পৌছাইয়া দিবে;—কিন্তু চাই তোমার একাগ্র-

চিত্ততা, চাই তোমার সত্যনিষ্ঠা। ভুলিও না, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

ব্রহ্মপুত্রতীরে আসামের নিভৃত জঙ্গল কোকিলামুখ হইতে এই যে স্রোতস্বতী বহিয়া আসিয়া আপনাদের সম্মুখ দিয়া আসাম ও বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে, ইহার ভাবধারা কর্ম্ম ও সাধনা সেই অনন্তের অভিমুখেই প্রবাহিত;—উদ্দেশ্য, সেই আনন্দপ্রাপ্তি, শান্তির সন্ধান। কেবল একা সেই আনন্দ ভোগ করিতে চায় না, আপনাকেও দিতে চায়।

রসরূপী সেই আনন্দের সন্ধানে জীবের প্রচেষ্টা যুগে যুগে নানা ভাবে, নানা উপায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তমোগুণাবলম্বী দানব ও রাক্ষসগণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই আমাদের শেষ লক্ষ্য অবধারণ করিয়া সেই পথে ধাবিত হইতেছে; জড়াতিরিক্ত কিছুরই সত্তা স্বীকার না করিয়া মদ্য-মাংস-মৈথুনাদি মকার উপলক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা আনন্দলাভে ব্যগ্র হইয়াছে। তাহারা ভোগ করার শক্তি ও ভোগের উপাদান অর্জ্জিত হইলে তাহার দ্বারাই আনন্দ লাভ করিবে বলে; তাহারা স্থূলভূতের অতিরিক্ত অন্য কোন সত্তার সন্ধান করিতে ব্যগ্র নহে। বিরোচন ও ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য উপনীত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা পালনান্তেও বিরোচন উপলব্ধি করিলেন, 'অন্নই ব্রহ্ম'—দেহাত্মবাদই সার; কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। রজোগুণাবলম্বী কর্ম্মকাণ্ডের ঋষিগণ বলিলেন, "যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া ও মন্ত্রে দেবতার অর্চ্চনা কর, তোমরা অভীষ্ট লাভ করিবে, স্বর্গে গমন করিবে, আনন্দ লাভ হইবে; প্রাণায়ামে তোমার শক্তি লাভ হইবে, গায়ত্রীতে তোমার তেজ বৃদ্ধি করিবে; তুমি যোগালম্বন করতঃ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হও, পশু হনন কর। ইন্দ্র তোমাকে প্রচুর শস্য দিবেন, তোমার পশু বৃদ্ধি হইবে ও তোমাকে ও তোমার সম্পত্তি শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন, পূষা তোমার পুষ্টি বিধান করিবেন, তোমার কোন কষ্ট থাকিবে না।" সত্ত্বগুণাবলম্বী জ্ঞানযোগী ঋষিগণ তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না; তাঁহারা বলিলেন—"ইহা ক্ষণবিধ্বংসী; অমৃতের সন্ধান চাই, শাশ্বত সত্য চাই।" তাঁহারা দৃঢ়চিত্তে সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন, তারস্বরে বলিলেন—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বে পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥"

"হে পূষন্! সত্যের মুখ যে আপাতমনোরম হিরণ্ময় আবরণে আবৃত; আমি সত্যের স্বরূপ অবগত হইতে চাই। সত্যের আবরণ উত্তোলন করুন।" জ্ঞানমার্গই তাঁহাদের পন্থা হইল, জ্ঞানলাভ একান্ত কাম্য হইল; মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হইল—"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অজ্ঞান তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ জ্ঞানে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।" তাঁহারা জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মবস্তুর সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন; উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ও সাংখ্য দর্শনের আবির্ভাব হইল। মহামুনি গৌতমবুদ্ধ সেই পথেরই অন্য শাখার পথিক। তিনি বলিলেন, "বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডনির্দ্দিষ্ট হিংসা বা কামনা দ্বারা শান্তি লাভ করা যায় না, আনন্দ লাভ ঐ পথে দুষ্কর। তোমরা কামনারই উচ্ছেদ কর; সুখের আশাই অসুখের মূল। জীবের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বকর্মফলজনিত; কামনা ত্যাগ কর, অহঙ্কার ত্যাগ কর, তবেই শান্তিলাভ করিবে ও পরিণামে নির্ব্বাণ লাভ হইবে।" জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "তুমি ও

ব্রহ্মবস্তু অভিন্ন, দ্বৈতজ্ঞান মায়াজনিত ; এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বই নাই—সব মিথ্যা, সব মায়া। জ্ঞান লাভ কর, তোমার ভ্রম দূর হইবে ; তোমার দুঃখ-কষ্ট বলিয়া যে অনুভব হইতেছে, তাহা দূর হইবে।”

ভক্তিযোগী বৈষ্ণবগণ তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। তাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিরস প্রচার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“মায়াকে ভয় কর কেন? এই মায়াই লীলা। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সাধকের চিত্তের যে অভিসার, তাহাই ত মধুর ; তাহাই যে রাসযন্ত্র। আনন্দলাভের জন্য জীবাত্মার যে ব্যগ্রতা ও আকাঙ্ক্ষা, তাহাই ত গোপীনাথের অভিসার। যমুনাতীরে বাঁশী বাজিয়াছে, তাই ত সাধকের মনে আনন্দ লাভের ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। ভগবানের কৃপা হইলে সেই বাঁশীর ডাক তোমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করিবে তব প্রাণ—তখন কি আর এই বিষয় সংসার বা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বা স্বামী-পুত্র শ্বশুর-শাশুড়ী সাংসারিক বন্ধন তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে? তুমি যে শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছ, তাঁহাকে স্বামীরূপে লাভ করার উদ্দেশ্যে ব্রত করিয়া বর গ্রহণ করিয়াছ, তোমার স্বকীয় বলিয়া যে আর কিছুই নাই ; তবে ত তোমার বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে, তোমার চিত্তের মলিনতা দূর হইয়াছে। তবে চিত্তশুদ্ধি হইলেই ভগবদ্দর্শন হয় না, গোপীগণেরও হয় নাই। ভগবান যে ইন্দ্রিয়ের অতীত রসস্বরূপ ; অনুভবের সামগ্রী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন ; বাক্য বা মন তাঁহার নাগাল পায় না। কিন্তু যখন গোপীগণ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, বৃন্দাবনের তরুলতাগুল্মাদিতে পশু পক্ষীতে যখন ব্রহ্মের জাগ্রত-সত্তা জ্ঞান হইয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকটিতে যখন ব্যক্তি বোধে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন শ্রীভগবানের পদচিহ্ন ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটাইল, আনন্দ লাভ হইল, নিজের ব্যক্তিত্ব ও সত্তা ভুলিয়া গিয়া নিজেকেই কৃষ্ণ বোধ করিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া আনন্দলক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভাগবতকার বলেন, এই আনন্দের সন্ধানেই সুখ। অনন্তের সন্ধানে জীবাত্মার এই যে ব্যগ্রতা, ইহাই লীলা। থাকুক মায়া ; আমি চাই আনন্দ, আমি ভোগ করিব আনন্দ! মহাসাগরে কত জল আছে, তাহা পরিমাণ করিবার আমার প্রয়োজন নাই। আমি তীরে বসিয়া আমার তৃষ্ণা মিটাইয়া ভোগ করিব, এই আনন্দ! ভক্তিবাদীর কাছে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ অকিঞ্চিৎকর ; সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্যই তাহার সাধনার চরম। ভক্তিরসের রসিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই রসপ্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিলেন। “নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন”—বর্ত্তমান যুগের ঋষি শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ত্রিধারা সমন্বয় উপদেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্য কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ আবার ইহার এক পদের ব্যাখ্যা দিলেন—“পর্ব্বতগুহায় নারায়ণের সন্ধান করিয়া মরিও না, তোমার সম্মুখেই নররূপী নারায়ণ বর্ত্তমান। উপলব্ধি কর, এই নরেই নারায়ণ আছেন ; এই নরেরই সেবা কর, তোমার নারায়ণ সেবা হইবে, তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে।”

এইরূপ ঋজু কুটিল বক্র নানাবিধ পন্থা নানা ঋষি আনন্দ লাভে ব্যগ্র জীবের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি নিমিত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত-মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব ও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাদের মঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও এক কথায় জনসেবা ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে জ্ঞান ও ভক্তিপথে উন্নতি সাধন করাইয়া তাহাদিগকে জীবের প্রত্যাশিত সেই আনন্দের সন্ধান দান। তাঁহারা বলেন, “আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মচর্য্য ও যোগ শিক্ষায় দেহ-মন শক্তিশালী কর।

ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব! দুঃখ করিও না। নিরাশ হইও না। আইস, যে পথে আমরা যাইতেছি, সেই পথে আইস; আনন্দের সন্ধান মিলিবে। তোমার দেহ মন বলবান্ হইবে। নরে নারায়ণ বোধ কর, নারায়ণ বোধে নরের সেবা কর। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনের সমন্বয়ে সাধনা কর, তোমার চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধি হইবে। তোমার নিজের আনন্দ দশের আনন্দের সহিত ভিন্ন নয়।" ইঁহাদের বার্ত্তা সংক্ষেপতঃ এই। এখন এই মঠের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, আর কি বিশদভাবে বলা আবশ্যক?

এই আশ্রমের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গুরুদেবকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি অজ্ঞান তিমিরান্ধকে জ্ঞানরূপী শলাকা দ্বারা নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন ও যিনি চরাচর বিশ্ব যাঁহা দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের চরণ দর্শন করাইয়া দেন, শঙ্কররূপী জ্ঞানের অবতার বর ও অভয় দাতা নিরোগী সদাপ্রফুল্লরূপী গুরু প্রাপ্তি ও তাঁহাতে ব্রহ্ম জ্ঞান হওয়া বিশেষ ভাগ্যের বিষয়। আর যিনি গুরুতে শ্রীভগবানের বিভূতি বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার তাহা হইবে না কেন? তবে এইরূপ গুরুভাব লাভ শিষ্যের যোগ্যতার উপরই অনেকটা নির্ভর করে। শিষ্যের একাগ্রতা ও আত্মশুদ্ধি না হইলে শ্রীগুরুর কৃপা প্রকাশ হয় না। আবার উপাখ্যানে একাধিক গুরুর বার্ত্তাও শুনা যায়। বৈদিক যুগে সত্যকামের ব্রহ্মবিদ্যা প্রথমে মনুষ্যেতর বৃষ, অগ্নি, পক্ষী ইত্যাদি গুরু হইতেই লাভ হইয়াছিল। আবার •একালে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতেও তাহাই দেখিতে পাই। জীবনে যখন যখন যে ভাবে তাঁহার সাধনার সময় আসিতে লাগিল, তখন তখনই সেই ভাবের গুরু লাভ তাঁহার হইতে লাগিল। আবার দেখা যায়, এই মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ দেবের জীবনীতেও—তিনি যখন উপযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার আবশ্যক অনুরূপ পরশুরাম তীর্থের সন্নিকটে মিস্‌মী-পল্লীর নিকটে গভীর অরণ্য মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে গুরুপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সুতরাং শিষ্যের পক্ষে যেটা অত্যাবশ্যকীয় মনে হয় ও যাহার সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট, তাহা হইতেছে, শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি ও অনন্যভক্তি ও অনন্যচিত্ত হওয়া। গুরু পথ নির্দ্দেশ করেন, শিষ্য সেই পথে চলিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। পরীক্ষা পাশ ছাত্রকেই করিতে হয়, মাষ্টার পথ নির্দ্দেশ করেন মাত্র, স্বয়ং পরীক্ষা দেন না। নিজকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে শ্রীভগবানের ও শ্রীগুরুর কৃপার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না।

শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

যে যে-ভাবেই সাধনা করুন না কেন, একনিষ্ঠতা চাই-ই চাই।

আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করার পূর্ব্বে আমি পুনরায় বিশেষ করিয়া এই মাত্র বলিতে চাই যে, শিষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য—নিজ চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রচিত্ত হওয়া। মন বিক্ষিপ্ত থাকিলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত এবং শিব গড়িতে বানর গড়া বিচিত্র নহে। চিত্তচাঞ্চল্য রোধ করা আয়াস ও সতত চেষ্টাসাধ্য। মনে রাখিবেন যে অক্লান্তকর্ম্মী নিদ্রালস্য সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া যিনি গুড়াকেশ নাম ধারণ করিয়াছিলেন, বাহুবলে কিরাতরূপী শঙ্করকে তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, পুরুষকারের জীবন্তমূর্ত্তি শ্রীভগবানের সখা অর্জ্জুনও সখেদে বলিয়াছিলেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্;
তদহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং।

বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা নিরন্তর চেষ্টার ফলে মনকে সংযত করা সম্ভব বলিয়া শাস্ত্রে বলে; সুতরাং সিদ্ধির পথে গুরুতর অন্তরায় নিরা-

করণ জন্য শিষ্যকে সততই নিজকে গুরুর উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে ; অন্যথায় অবনতি সুনিশ্চিত। মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম অনাচারী শিষ্যের হস্তে পড়িয়া কর্ত্তাভজা ও নেড়া-নেড়ীর দলের সৃষ্টির উদাহরণ আমাদের দেশেই বর্ত্তমান আছে।

এই মঠের বাণী আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, সেই ভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। কোন বিষয়ে আমার কোন ত্রুটি হইয়া থাকিলে, সেই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এই মঠের বাণী জগতে প্রচারকার্য্যে সহায় হউন। যাঁহারা এই মঠের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা যত্নসহকারে এই আশ্রমেই প্রকাশিত পুস্তকাবলী, কার্য্য-বিবরণী ইত্যাদি পাঠ করতঃ ও ইঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া ইঁহাদের উদ্যম জয়যুক্ত করুন ও যাঁহারা অদ্যাপিও এই মঠের বাণী জানিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট এই মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী প্রচার করুন। এই অকিঞ্চনের ইহাই আকিঞ্চন।

পরিশেষে এই প্রার্থনা যে, শ্রীভগবান্ আমাদের সকলেরই শান্তি বিধান করুন। ওঁ শান্তিঃ

—*—

"যমেবৈষ বৃণুতে"

অনুভবের মাঝে দু'য়েরই তো সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমরা চাহিলে তবে তাঁহাকে পাইব, এ কথাও সত্য; আবার তিনি খুশী হইলে দেখা দিবেন—এ কথাও সত্য। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"আমাকে যাহারা পাইতে চায়, তাহাদিগকে আমি এমন বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, যাহাতে তাহারা অনায়াসে আমার দিকে অগ্রসর হইতে পারে।" কাজেই দেখিতেছি আমার উন্মুখীনতা আর তাঁহার মঙ্গল-আকর্ষণ উভয়েরই প্রয়োজন আছে! হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও তাঁহাকে পাইব না, আবার হাত-পা ছুঁড়লেও তাঁহাকে পাইব না—ইহার অর্থই হইতেছে ভিতরের আকুলতা বাড়ানো। সাধন করিয়া যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, সাধন করিয়াই তাহা বুঝা। মোট কথা, আত্ম-প্রবঞ্চনা না থাকিলেই হইল!

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—আত্মা যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁহাকে পায়। কিন্তু এই অহৈতুক কৃপা কি অলস-জড়তায় অভিভূত অলস অদৃষ্টবাদীর ওপরই বর্ষিত হয়, না যাহাদের প্রাণে তাঁহারই প্রেরণা প্রতি-নিয়ত জাগ্রত, তাহাদের ওপরে?—সহজ কথায় বলিলে যাহারা তাঁহার দরুণ আকুল। তাঁহাকে কোন কিছু দিয়াও লাভ করা যায় না—ইহাতেই তো অন্তর্বেদনা আরও গভীর হইবে। ব্যাকুলতা বাড়িবে বই কমিবে না। আমার মনে হয়, শ্রুতি যে বলিয়াছেন—তাঁহাকে প্রবচন দ্বারা, মেধা দ্বারা পাওয়া যায় না—ইহাতে কি দিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহার দরুণ উল্টো একটা জাগ্রত-চেষ্টার উদ্বোধন হইবারই কথা। প্রাণ থাকিতে মানুষ কি করিয়া শুধু একটা কথার ছলনায়ই নীরব-নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে! নিশ্চেষ্টও হইব না, আবার চেষ্টার গৌরবে অভিভূত হইয়াও পড়িব না—ইহাই বোধ হয় ইষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল অনুভব!

একটা সহজ কথা বলি, সাধন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাক্, আর নাই যাক্, সাধন-ভজনে ইন্দ্রিয়ের উগ্র উত্তেজনা প্রশান্তিতে বিলয় হয়, ইহা তো ঠিক্? মোট কথা, শান্তিতে দিনগুলা কাটাইতে পারি। এই সর্ব্বনাশা উপদ্রবের হাত হইতে নিস্তার পাওয়াটাই কি কম লাভ? নিশ্চেষ্ট অবস্থায় যে ইন্দ্রিয়ের উপদ্রব আরও বেশী হয়। কামনায় ভিতর কিল্‌বিল্ করিতেছে, অথচ বাহিরে আমি কর্ম্মত্যাগী; ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি বুঝা যায় না?

আচ্ছা, না হয় মানিলাম, আত্মা যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁহাকে পায়! এই যে বরণ করিতে আসেন—কিসের দরুণ?—সন্তুষ্ট হইয়া তো? সহজ একটা দৃষ্টান্তই ধরি, মনিব ভৃত্যের ওপর খুশী হন কখন?—ভৃত্য যখন তাহার মন-প্রাণ প্রভুর সেবায় উৎসর্গ করিয়া দেয়। এই উৎসর্গ কি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকিলেই হয়? উপরি-পাওনাটা কি এতই সহজলভ্য? কাজেই তাঁহাকে পাইতে হইলে—ত্যাগ করিতে হইবে। আর সেই ত্যাগ দেহ-মন-বুদ্ধি সবকে আপ্রাণ খাটাইয়া তবে! কিছু না করিয়াই যে অহৈতুক কৃপা পাই—ইহা তো হজম করিতে পারি না। কেননা

কল্পনা-প্রবণ মন ইহাতে সায় দিলেও—কর্ম্মঠ ইন্দ্রিয় তো ইহাতে সম্মত হয় না। তাহাদের যে খাটিয়া পাওয়াতেই আনন্দ। সচেষ্ট ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া যাহা অর্জ্জন করি, সচেষ্ট ইন্দ্রিয়ই যে আবার তাহা হরণ করিয়া লয়। অর্থাৎ কাহাকেও অবজ্ঞা করিয়া আমরা কিছু পাইতে পারি না!

আমি যাঁহাকে মনে-প্রাণে চাই, সেই তো আমার প্রিয়। ইহা কি আশ্চর্য্য কথা নয়, আমি একজনকে মনে-প্রাণে আকর্ষণ করিতেছি—অথচ তাহার অন্তরে কোন বেদনাই জাগে নাই। সত্যি-কার আকর্ষণ হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণে বাজিবে। তখন যে আমার প্রতি আকুলতা আরও বাড়িয়া যাইবে। স্পষ্ট সে দেখিতে পাইবে, আত্মা তাহাকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন। যাহারা ভালবাসার এই গোপন-তত্ত্বটা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারা কি ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে? তাহাদের অন্তর কি কখনও নিস্পন্দ অবস্থায় থাকিতে পারে? কাজেই তাঁহার কৃপায়, তাঁহার অহৈতুক আকর্ষণে, আমার অবসাদ, জড়ত্বই যদি তিরোহিত না হইল, তাহা হইলে ভাগবত-প্রেরণায় কি লাভ? চাহিবার মত চাহিতে পারিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না—এইরূপ অসম্ভব কথায় বিশ্বাস হয়?

মন-প্রাণ এক করিয়া যেদিন ডাকিতে পারি, সেইদিন যে তাঁহার অমূর্ত্তরূপও রসঘন-বিগ্রহ-রূপে আমারই সম্মুখে আবির্ভূত হয়। কাজেই কি করিয়া বলি—ডাকিলেও তাহাকে পাওয়া যায় না। ইহারি মাঝে আরও একটু কথা রহিয়া গিয়াছে। ডাকি অবশ্য আমরা অনেক সময়, কিন্তু ঠিক ডাকার মতন ডাকা সকল সময় হইয়া উঠে না; কাজেই পাই আমরা কম, আর না পাওয়াটাই বেশী। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যদি আমাদের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া বলিয়া ওঠে—ডাকিলেও তাহাকে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে ইহা ইহা কি নেমকহারামীর কথা নয়? তাহাকে চাহিয়াও পাই নাই বলিলে বুঝিতে হইবে, চাওয়ার মাঝে কোথায়ও গলদ রহিয়া গিয়াছে।

ভিতর হইতে নিশ্চিন্ত ভাব না আসিলে, জোর করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে? আর যদিই বা হয় তাহা তো ভাণ মাত্র। কোন্ দিন আত্মা কৃপা করিয়া আমাকে মুক্ত করিবেন; এই ভরসাতেই বসিয়া থাকিতে পারা যায়? কি করিয়া কৃপা লাভ হয়, তাহা যখন জানি না, তখন বসিয়া থাকিলেই যে কৃপাপাত্র হইবে, ইহারও তো কোন মানে নাই! বরঞ্চ অস্থিরতা জাগিবার কথা। কেবল ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিবার ইচ্ছাই জাগিবে! নিঃশেষে যেদিন এই ব্যাকুলতা লোপ পাইয়া যাইবে, সেদিনই ইহা বলিলে মানাইবে যে, কোথায়, সাধন করিয়াও তো দেখিলাম, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কোন কিছুই সার্থক হয় না! চরম কথাটা আগে বলিয়া অভিনয় দেখাইবার কি প্রয়োজন?

জীবনের সার্থকতা হয়ত এক-মুহূর্ত্তে, এক-পলকেই হইয়া যায়। তাই বলিয়া কি সাধনার কোন প্রয়োজনই নাই, ইহা বলিতে পারি? আচম্কা একদিন কোন অজানা দেশ হইতে তাঁহার কৃপা হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিল—এই নজিরেই কি আমার দৈনন্দিন সাধনার কোন প্রয়োজন নাই? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হৃদয়ের রক্তকে জল করিয়াই—একদিন হয়ত তাঁহার কৃপায় চিত্ত আনন্দে-বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠিবে। জীবন-ভরা এই সাধনাই করিতে হইবে—কি করিয়া তাঁহার ইচ্ছায় আর আমার ইচ্ছায় মিলন হইতে পারে! এমন করিয়া আমার অজ্ঞাতেই হয়ত একদিন মিলন সুর বাজিয়া উঠিবে! হয়ত তখন যাহা পাইব, তাহাই আমার পক্ষে চরম হইবে—কিন্তু তাহা বলিয়া কি সাধনাকে অবহেলা করিতে পারিব?

তাঁহার মনোমত হইবার দরুণই তো আমার সাধ-

নার প্রয়োজন। দৈনন্দিন সাধনার ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ তাহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। যতক্ষণ আমি আছি, অহংজ্ঞান আছে—ততক্ষণ আমি তাঁহার মনোমত হইতে পারি নাই। তাঁহার মনোমত হওয়াই—আমার অহংএর লয়। তখন আমি স্তব্ধ—অথচ আমারই বুকে তাঁহার শুভ-প্রেরণার উদ্দীপনা। আমাকে আমি যতক্ষণ ভুলিয়া যাইতে না পারি, ততক্ষণই তো আমার সাধনা!

শাস্ত্র দিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু শাস্ত্র চর্চ্চায় মনটা তো অন্ততঃ উচ্চ-চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। হয়ত শাস্ত্রকে উপলক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব। তাহা হইলেই শাস্ত্রকে যে চরম বলা হইতেছে, এমন তো নয়! এই শাস্ত্র দ্বারা মন বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া রাখিলে হয়ত একদিন আমার অজানাতেই তাঁহার প্রসাদে চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। মানুষ কত কথাই তো দিনরাত্র শুনিতেছে, কিন্তু কয়টাকে সে মনে করিয়া রাখিতে পারে? কত শাস্ত্র চর্চ্চাই করিতে হইবে—বুদ্ধিকে কত খোরাকই না দিতে হইবে—তারপর একদিন কোন্ এক শুভ-মুহূর্ত্তে এই বুদ্ধিই হয়ত আত্মার পানে ফিরিয়া তাকাইবে—তখন হয়ত একটা কথাই প্রাণে লাগিয়া যাইবে। এত আয়োজন, এত উপচার কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই কি করিয়া আমি বলিতে পারি, শাস্ত্রচর্চ্চার কোন প্রয়োজন হইবে না? তবে কিনা, কর্ত্তার ঈপ্সিততম কি, তাহা বুঝাই হইল আসল!

যাহাকে পাইতে মানুষ এত ব্যাকুল, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেহ নন, তিনি মনে-প্রাণে-হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈতানুভবস্বরূপ। কাজেই তাঁহাকে মন্ত্র দ্বারা পাওয়া যায় না—হৃদয়ের ভক্তিই হইল তাঁহাকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। এই ভক্তি কি করিয়া অন্তরে উদ্দীপিত হয়—তাহার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। আর এই অনিশ্চয়তার দরুণই তো সাধন-ব্যাকুলতা।

শাস্ত্রের মাঝে যাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজি—তিনিই যখন একদিন হঠাৎ চিত্তের মাঝে সহজরূপে ধরা দেন—তখন যে আত্মনিবেদনের গানে অন্তর উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কৃপা পাই বলিয়াই তো অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মকে বাক্যের অতীত, মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত—এই ভাবে পরিকীর্ত্তিত করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্যই হইল, আমাদের মাঝে যে সব 'বুঝে-ফেলেছি'র অভিমান বারে বারে ঠেলা দিয়া উঠে—তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখা। অর্থাৎ তুমি যতটুকু বুঝেছ—তাহারও অতীত তিনি। অগ্র্যা-বুদ্ধিরও তখন একটা সমর্পণের আকুলতা আসে—আর এই আকুলতাতেই কৃপালাভ। সবকে যাচাই না করিয়া সহজেই আত্ম-সমর্পণের ভাব আসে না। শেষ পর্য্যন্ত শক্তিতে, সামর্থ্যে কুলায় বা নাই কুলায়—মন বুদ্ধির একটা স্পর্দ্ধা আছে! কিন্তু প্রথমেই যখন তুমি বল, আমার মন-বুদ্ধি মরিয়া গিয়াছে—কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করি? আত্মাকে যাহারা লাভ করিতে চায়, আত্ম-দর্শন তাহাদেরই হইয়া থাকে। আমি যাহাকে পাইতে চাই, তাহার বেদনা আমার প্রাণে বাজিবে না, ইহা যে অসম্ভব কথা। কাজেই আত্ম-দর্শনের ব্যাকুলতা যাহাদের ভিতর উদ্দীপ্ত—আত্মা বরণ করেন তাহাদিগকেই। আর নিশ্চেষ্ট-অলস ব্যক্তির মাঝে সাত্ত্বিক অনুভব তো জাগিতেই পারে না। কাজেই আত্মা যাহাদের বরণ করেন—তাহাদের ভিতর নিদারুণ একটা আকুলতা জাগেই। অবশ্য সেই আকুলতার মূলেও তাঁহারই অদৃশ্য আকর্ষণ, ইহাতে আমাদের কিছু কৃতিত্ব নাই।

একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়াই না জাগিয়া থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে বিরাট অবকাশের কল্পনায় যে ঘুম আসে। কিছু করিতে হইবে না—ইহাতে অলস-মন আরও বেশী করে অলস হওয়ার

সুযোগ পায়। যেদিন আত্মার খুসী হইবে, সেই দিনই আমায় বরণ করিয়া লইবেন, প্রথমতঃ ইহা একটু ধোঁয়া ধোঁয়া মনে থাকে, তারপর চিত্তে ঘোর তর আলস্য-জড়ত্ব আসিয়া বাসা বাঁধিয়া বসে। যথা ইচ্ছা—বলিতে গেলে একরকম স্বেচ্ছাচারিতা করিয়াই তখন দিন কাটে; অথচ মুখে বলি, আত্মা তো সাধন-লভ্য নন, তিনি যেদিন কৃপা করিবেন—করিবেনই। ইহা তো শুধু ক্রটী ঢাকিবার ফন্দি মাত্র, আসলে কি অন্তর তোমার এই যুক্তিতেই সন্তুষ্ট?

তিনি জানি অসাধনের ধন, কিন্তু সাধনা করিলে তোমার অন্তর্নিহিত মালিন্য দূরীভূত হইবে, ইহাতে তো আর কোন সন্দেহ নাই? আর পবিত্র হৃদয়েই তো তাঁহার অধিবাস—কাজেই চিত্তকে নির্ম্মল রাখাটা কি একটা বড় কথা নয়? একদিন যে তুমিই তাঁহার বরণযোগ্য না হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

—*—

ভরসা

—*—

দিক্‌হারানো নায়ে আমার
তুমিই দিশারী—
ওগো হৃদয়-বিহারী!

হতাশার এ মরুমাঝে
তুমিই আশার তান—
জাগাও তুমিই এ দীন প্রাণ।

অন্ধকারে গহন বনে
একলা যখন ফিরি,
আমায় শঙ্কা ধরে ঘিরি;

হাতে নিয়ে অভয়প্রদীপ
তুমিই আস আগে—
আমার হৃদয় যে তাই মাগে!

তাই তো আজি ভরসা আমার
অকূল পাথারে—
এই মরণ সাঁতারে!

পঞ্চায়েৎ

—(*)—

বিচার করে দেখলে শঙ্করাচার্য্যের মতে আর বুদ্ধদেবের মতে সুন্দর সমন্বয় পাওয়া যায়।

শঙ্কর বল্‌ছেন—মানুষ তার জীবনের continuum চায়, তাই তাকে পেতে দাও। নিজকে টিকিয়ে রাখা জীবমাত্রেরই স্বভাবগত প্রচেষ্টা, সেই চেষ্টাকে ধরেই সে এগিয়ে চলুক। যা সে চায়, সেই continuum সে দেহে পেল না, মনে পেল না, বুদ্ধিতে পেল না—কোথাও সে দেখ্‌ল না যে তার আমিত্বের ধারা অব্যাহত থাকে। শেষে গিয়ে যখন আত্মায় পৌছাল, তখন সে পূর্ণ হল, দেখ্‌ল—আমিই সব, আমিই বিশ্বে একেশ্বর হয়ে আছি—চিরকাল আছি, চিরকাল থাক্‌ব। তার আত্মার যে continuum, তার তো আর মিলিয়ে যাবার হেতু নাই। এমনি করে আত্মা দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করে সে নিজকে যথার্থ-ভাবে পেল। তার কাছে একমাত্র আমিই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম—আর সব ফাঁকা, সব মায়া!

বুদ্ধদেব কি বল্‌ছেন, সে কথা মুলতুবী রেখেই জান্‌তে পাই, বুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-দর্শনের মতটা হচ্ছে—ঐ যে নিজের succession বা আত্মার continuum খুঁজ্‌ছ, ওটাই তো সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি—'আত্মা' বলে যাকে মান্‌ছ, ওটাই তো তোমার যত আপদ্-বালাই! এই মুহূর্ত্তে যে তুমি আছ, পরমুহূর্ত্তে আর সে তুমি থাক্‌বে না—প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তুমি নূতন। ঝেড়ে ফেল যত অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা—কিছুই তো তোমার নয়! জগতে বিজ্ঞানমাত্র সৎ—ক্ষণে ক্ষণে আস্‌ছে, মুহূর্ত্তের বেশী কিছুই থাক্‌ছে না।

আর বুদ্ধদেব বল্‌ছেন—আত্মা মেনে সাম্‌লাতে যখন পার্‌ছ না, কাজ কি বাপু ও সব মেনে? তোমার সাধ্য কি?—যা একটু কর্ম্ম। তাই কর—অষ্টশীল পালন কর। কাজে কর্ম্মে আচারে-ব্যবহারে খাঁটী হও, সত্য যদি কিছু থাকে, তা আপনি ফুটবে!

বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য—শূন্যে সব বিলীন করে দিতে হবে। শাঙ্করদর্শনের প্রতিপাদ্য ভাব এই যে, শূন্যেই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

দুই-ই এক কথা। বাস্তবিক সর্ব্বশূন্য হতে না পার্‌লে পূর্ণজ্ঞান ফোটে না।

*

* *

পরবর্ত্তী বৌদ্ধদর্শনে আর বুদ্ধদেবের জীবন-লীলায় পার্থক্য আছে। তাঁর action আর তাঁর philosophy আলাদা। "ক্ষণিকং ক্ষণিকং"—ইত্যাদি বাক্য ঠিক বুদ্ধবাণী বলে সমর্থিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই হৃদয়ের সৌকুমার্য্য যার আরম্ভ, বুদ্ধির ছলাকলায় তার দুর্ব্বোধ্য পর্য্যবসান দেখ্‌তে পাই।

এই জাতীয় দর্শনগুলো সাধারণের পক্ষে dangerous। অনেক সমালোচক এর জন্য মূল আচার্য্যকে বিঁধেন বটে, কিন্তু যথার্থ গালিটা তাঁদের প্রাপ্য নয়। বোকামি আমাদেরই। জীবন দিয়ে তাঁদের জীবন বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, তাঁদের কিম্বা তাঁদের দর্শনের দুটোরই সামঞ্জস্য অগ্র্যা বুদ্ধিতে পাওয়া যেতো বৈ কি!

*

* *

যা পেয়েছি, তা সব্বাইকে দিতে হবে। লব্ধ সত্যকে বা জ্ঞানকে popularised করা—এই হচ্ছে বুদ্ধমতের বিশেষত্ব। এই জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের একটা কাহিনী মনে পড়ে।—

এক সাধু এসে তাঁর পঞ্চবটীর পাশে আড্ডা গেড়েছিলেন। খুব ধূমধাম, খুব জপ যাগ কুম্ভকাদির ঠেলা। একদিন শোনা গেল, পাশের বাড়ীর কোন্ "স্থূলা প্রকৃতি"র সঙ্গে লটুখটির কথা। রামকৃষ্ণদেব শৌচে যেতে রাস্তায় দেখা হতে বল্লেন—"কি হে বাপু! তোমার এই কাণ্ড? তুমি না এই এই রকমের সাধু—শুন্ছিলাম?" সে উত্তর কর্‌ল, "আরে, রোসো না—ব্যাপারটা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি! এই ধর, জগৎটাই যদি মিথ্যে হল, তবে শুধু আমার কাণ্ডটুকুই কি সত্যি হয়ে যাবে?"—ইত্যাদি।

সাধারণ বুদ্ধিতে অসাধারণ জ্ঞানের ধারণা এই রকমই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই জায়গায় বুদ্ধদেব যদি হতেন, তিনি অম্‌নি টুঁটি চেপে ধরে বল্‌তেন—"ব্যাটা, রেখে দে তোর জগৎ আর ব্রহ্মে জগা খিচুড়ী! আমি যা বল্‌ছি, তাই কর্।—ব্রত ধর্, শীল পালন কর্ আগে—ওসব হবে পরে! আগে উপযুক্ত হ'!—জ্ঞান-সত্য আপনি ফুটবে।"

বৌদ্ধদর্শনের এইটুকুই বিশেষত্ব। বড় বড় abstruct ideaর বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে রেখে, যতটুকু সাধ্য, তার মাঝেই একটা সুসঙ্গত সুন্দর কর্ম্ম-সাধনায় ইহ-জীবনকে সুস্থিত করা; চরম নিয়ে বা শেষ গৎ নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া তাতে কম। এতেই তো তাঁর ধর্ম্ম এত অনায়াস হয়েছে, তাঁর ভাব, তাঁর দান এমন popularised হয়েছে।

*

* *

মনে কি ছিল, দর্শন কি বল্‌ছে, কি সত্য, কি অসত্য, কোন্‌টা ছোট, কোন্‌টা বড়—এ সব নিয়ে নিয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বুদ্ধদেবের চরিত্রের যে উদারতা, সহিষ্ণুতা, অমায়িক প্রেম, তাঁর উপদেশের যে মাধুর্য্য, জগতের হিতের দরুণ অম্লান অকপট স্বভাব-সঙ্গত প্রচেষ্টা—এর আর তুলনা হয় না।

তাঁর জীবনের এক একটা কাহিনী পড়্‌লে শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে হৃদয় আপ্লুত হয়।

* *

*

একদিনকার একটা ঘটনা।—

তিনি সশিষ্যে রাস্তা দিয়ে চল্‌ছেন। আর ঠিক তাঁদের পাশ দিয়েই দেবদত্তের দল তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের কুৎসা কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। শিষ্যেরা তো অধীর হয়ে উঠ্‌ল। তারা বুদ্ধদেবকে বল্‌ল—"আর তো সহ্য হয় না প্রভু! বলুন, বাধা দিই!"

বুদ্ধদেব স্থির প্রশান্ত অবিচলিত স্বভাব। তিনি মধুর কণ্ঠে বল্‌লেন—"আচ্ছা, বল তো, এতদিন যে আমার কাছে তোমরা রয়েছ, কেউ কি কখনো দেখেছ, কারু নিন্দায় বা অত্যাচারে কোথাও আমি ক্ষিপ্ত হয়েছি কি বাধা দিয়েছি?"

তারা বল্‌ল—"না।"

"আর তোমাদেরও কি কোন দিন তার কোন প্রতিকার কর্‌তে বলেছি?"

শিষ্যেরা বল্‌ল "না।"

তিনি বল্লেন—"তবে থাক্। ওদের যা খুসী ওরা করুক্ না আপন মনে। এ তো জান্‌ছিই—ওরা মিথ্যে বল্‌ছে। আর ওরাও কি তা বুঝ্‌ছে না? তবে বিচলিত হওয়া কেন—বাধা দেওয়া কেন?"

* *

*

আর একদিনের একটা ঘটনা।—

দেবদত্ত বুদ্ধদেবের চিরশত্রু ছিল, এ-তো

জানেই। একবার সে করল কি—বুদ্ধদেবের নামে কুৎসা রটাবে, তাই সুন্দরী নামে এক বেশ্যাকে তাঁর পেছনে নিযুক্ত করলে।

সুন্দরী করত কি—রোজদিন ভোর রাত্রে উঠে খুব সাজগোজ করে বুদ্ধদেবের ঘরের দিক থেকে এসে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে বাড়ীতে চলে যেত।

লোকে জিজ্ঞেস্ করত—"কি সুন্দরী! এত ভোরে—ওদিক থেকে ?"

সুন্দরী বলত—"এই বুদ্ধদেবের কুটীর থেকে আস্‌ছি।"

পর পর ৫।৬ দিন ঐরকম। রোজই ঐ এক কথা। লোকের সন্দেহ হতে লাগল।

কিন্তু শুধু সন্দেহে ফেলেই দেবদত্তের আশ মিটল না। তখন সে একদিন তার লোক দিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করাল। করিয়ে সুন্দরীর শবদেহটা নিয়ে বুদ্ধদেবের কুটীরের পাশে আবর্জ্জনাস্তুপের নীচে চাপা দিয়ে রাখল।

এদিকে রাজার কাছে খবর পাঠাল—সুন্দরীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজা খুঁজবার জন্য লোক লাগালেন।

দেবদত্ত আগে থেকেই ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল—লোকগুলো খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধদেবের ওখান থেকেই তাকে বের করল।

দেবদত্ত রাজাকে জানাল—"এ সব বুদ্ধদেবেরই কীর্ত্তি। কিছুদিন আগ থেকেই সুন্দরীকে সে রোজ বুদ্ধদেবের ওদিক থেকে আস্‌তে-যেতে দেখেছে। নিজের কীর্ত্তি ঢাক্‌বার জন্য নিশ্চয় এ সব তাঁরই কাণ্ড।"

স্থির হল—রাজার কাছে এর বিচার হবে। বুদ্ধদেবের বিচার!—রাজ্যময় হুলস্থূল পড়ে গেল।

শিষ্যেরা অধীর হয়ে এসে ধরে পড়ল—"আর তো চুপ করে থাকা যায় না প্রভু! বলুন, এবারে একটা কিছু করি।"

বুদ্ধদেব সহজভাবে বল্‌লেন—"আচ্ছা, বল তো, তোমাদের কি মনে হয়—এ কাজ আমার ?"

তারা বলল—"না, তবুও—"

বুদ্ধদেব বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"আমিও বলছি—না তবুও তোমাদের কিছু করে কাজ নেই। জানছ, বুঝ্‌ছ, সবি মিথ্যে; তবু কেন? স্থির হয়ে দেখে যাও শুধু! ধীর স্থির হও তোমরা—কিছুতেই অশান্ত হয়ো না! আপনি সব গোলমাল মিটে যাবে।"

এদিকে হয়েছে কি—দেবদত্তের চক্রান্তী সেই লোকগুলো মদ খেয়ে মাৎলামী করতে করতে আসল কথা সব্বার মাঝে ফাঁস্ হয়ে গিয়েছে।

লোক তো দু রকমেরই থাকে—তারা আবার গিয়ে রাজাকে সব বলে দিয়েছে।

তখন রাজা দেবদত্তকেই শাস্তি দিলেন।

দেবদত্ত হেরে গেল। রাজ্যময় বুদ্ধদেবের জয়-জয়কার! সবার আনন্দ দেখে কে ?

শিষ্যেরা সব উচ্ছ্বসিত হয়ে সে সংবাদ তাঁর কাছে বয়ে আন্‌ল। বুদ্ধদেব কিন্তু একটুও উৎফুল্ল না হয়ে বরং স্নেহমাখা তিরস্কারে তাদের বল্‌লেন—"সত্য যা, তা প্রকাশ পেয়েছে; এতেই বা তোমরা মেতে উঠ্‌লে কেন? লাভ ক্ষতি, নিন্দা-স্তুতি—কিছুতেই তো প্রমত্ত হতে নেই তোমাদের!"

এই ছিল তাঁর শিক্ষা, তাঁর সাধুত্ব, তাঁর জ্ঞান; আর এমনি অটল গাম্ভীর্য্য, অকপট উদারতায় মণ্ডিত ছিলেন তিনি!

* *
*

আর এক দিনের এক ঘটনা।—

বৌদ্ধযুগে আশ্রমকে বলা হত "বিহার"। বুদ্ধদেব রোজ রাত্রে তাঁর বিহার 'সংক্রমণ' করতেন।—কে কোথায় কেমন আছে, কার কি অযত্ন হচ্ছে—বিশেষ করে অতিথিদের আর রোগীদের সেবা-

শুশ্রূষার ব্যবস্থা ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না হচ্ছে, এ তিনি রোজই আশ্রমসেবকদের অতর্কিত অবসরে গিয়ে পরিদর্শন করে আস্‌তেন।

একদিন গিয়ে দেখেন—একজন রোগীর ভেদ-বমি হচ্ছে; সে এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, কখন যে শয্যা ছেড়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছে আর উঠ্‌তে পারেনি, সেইখানেই মলমূত্র-মাখা হয়ে পড়ে আছে—অন্ধকারে!

বুদ্ধদেব তাড়াতাড়ি করে আনন্দকে ডাক্‌লেন আলো নিয়ে আস্‌তে।

আনন্দ ছিলেন সেবা-সঙ্ঘের ম্যানেজার।

তারপর নিজেই রোগীকে কোলে করে তুলে নিয়ে ধুইয়ে-মুছিয়ে তাকে প্রকৃতিস্থ করে রেখে এলেন। সে রাত্রে তাঁর আর ঘুম হল না। সেই রাত্রির মাঝেই আরো দু-তিন বার গিয়ে দেখে এলেন।

পরদিন সকালবেলা সবাই যখন তাঁকে প্রণাম কর্‌তে এল, তখন তিনি জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—"তোমরা কেউ কি জান্‌তে তার অবস্থা?"

যারা জান্‌ত, তারা আর কি বল্‌বে?

"যারা তোমরা জান্‌তে, কারু কি একবার মনে পড়েনি তার কথা?"

সব্বাই মাথা হেঁট করে রইল।

ধীরে ধীরে শান্তস্বরে বুদ্ধদেব বল্‌লেন—"দেখ, তোমরা সব মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, সুখ-সংসার ছেড়ে আমার কাছে এসেছ; তোমরা যদি পরস্পর পরস্পরকে না দেখ, তোমাদের কে দেখ্‌বে? তোমরা যদি তোমাদের একজন আর একজনকে ভাল না বাস, আপদে-বিপদে কার কাছে তোমরা দাঁড়াবে? আর তোমাদের পরস্পরের মাঝে যদি ভালবাসা না জাগে, তোমরা যদি কেউ কারু দুঃখ না বোঝ, তবে আমাকে যে তোমরা ভালবাস, তাই বা আমি কি করে বুঝ্‌ব?"

এমনি করে তিনি শিক্ষা দিতেন। মমতায় স্নিগ্ধ সহিষ্ণুতায় পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। তাঁর স্বভাবসুন্দর সরল আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে লোকে সত্যের শরণ নিত, একপ্রাণ হতে শিখ্‌ত।

অনুকরণীয় কিছু যদি থাকে তো এইগুলিই। তাঁর কাছে আত্মা থাকুন আর না থাকুন, ব্রহ্ম শূন্য হয়ে যান বা পূর্ণই হন—তাঁর চারিত্র্যের এই মাধুর্য্য ভোলা যায় না!

তাঁদের আমরা শুধু বিচারই করি—না হয় দূরে উঁচিয়ে রেখে ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যর বরাদ্দ করে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি! কিন্তু অনুকরণ বা অনুপ্রাণতার কোন প্রেরণা বা প্রয়োজন তো অনুভব করি না!

* *
*

পালিসাহিত্যে বুদ্ধদেবের জীবনের এমনিতর কাহিনী কত যে রয়েছে, পড়ে আশ্চর্য্য হতে হয়, মুগ্ধ হতে হয়!

পালি সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের এক মস্ত বড় দিক্। বেদ-বেদান্ত, দর্শন-পুরাণ, কাব্যাদি নিয়ে সংস্কৃত যত বড়, পালি বা প্রাকৃতও তেমনি।

ভারতের এই তিনটীই হচ্ছে 'advanced সাহিত্য—পালি, সংস্কৃত, জৈন।

সনাতন ধর্ম্মের কত অমৃতবিন্দু যে ওই প্রাচ্য সাহিত্যসঞ্চয়ের মাঝে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে অঝোরে ঝুর্‌ছে, তার ইয়ত্তা নেই।

যে খোঁজে, সেই পায়। অনুসন্ধিৎসার অভাবেই আজ আমরা পরমুখাপেক্ষী।

—):*:(—

জীবনের গতি

—):*:(—

জীবনের গতি দুর্লঙ্ঘ্য। আজ যা আছি, কালও তাই বা তদূর্দ্ধে থাকবার হাজার কল্পনা জল্পনা করেও সত্যই যে কাল কি হবে, তা আমরা জানি না। অথচ মজা এই যে, এই না জানা সত্ত্বেও আমরা ভবিষ্য জীবনের রঙীন্ কল্পনায় বর্ত্তমানের জীবন গড়তে থাকি; তার জন্ম বর্ত্তমানে কত আয়োজন কত ক্লেশ সহ্য করি। এই অজানিতের টান মানুষের স্বভাবিক। অজানিতকে যতটুকু পারি, উপযোগ করবার জন্ম মানুষ এত উদ্‌গ্রীব যে, স্থূলে তার প্রত্যাশারও যেন তর সয় না, তাই সে সম্বন্ধে সে নানা কল্পনা জুড়ে দেয়। আর এমনিভাবে মানুষ বিধাতার কার্পণ্যকে ব্যাহত করেও নিজের সুখ চায়। কারণ সে দুর্ব্বল, দুঃখের নামে সে ভয় পায়।

সংস্কৃতে একটা কথা আছে—"উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তথাপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ"—উপায় বা সুখের উপকরণটাই কেবল চিন্তা করতে নাই, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপদের কথাটাও ভাববে। কিন্তু বললে কি হবে, মানুষ দুঃখের চিন্তায় অনভ্যস্ত। সে চায় সুখ, তাই দুঃখের কবলে পড়লেও তা থেকে উদ্ধার পেয়ে সুখটাকেই আবার কি করে জড়িয়ে ধরা যায়, সেই চিন্তাতেই সে আকুল। সুখে দুঃখে সমজ্ঞানের যতই তাকে উপদেশ দাও, দুঃখের কল্পনায় সে প্রথমে অজ্ঞাতসারে আঁৎকে উঠবেই। কেননা দুঃখের চরম যে মরণ, সে তো তা চায় না।—সে চায় অনন্ত কাল আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে। সে নাই অথচ জগৎ চলছে, এমন কল্পনাও সে বিশুদ্ধভাবে করতে পারে না; যতই নিজকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করা যাক না কেন, ঐ একটুখানি আমির দাগ থেকেই যায়। তাই রামকৃষ্ণদেব বলতেন—"আমি যাবার নয়; কাজেকাজেই ছোট আমিকে ছেড়ে বড় আমিকে ধর, নতুবা সে আমিকে তাঁর দাস বা সখা ইত্যাদিরূপে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দাও।" শুধু এই এতটুকু 'আমি'কে নিয়েও মানুষের তৃপ্তি হয় না—তাই সে তৃপ্তির জন্ম উপকরণ জোটাতে থাকে, আর এমনি করে নিঃসম্বল নগ্ন শিশু ক্রমশঃ এই বিরাট্ জগৎ আবিষ্কার করে। বস্তুতঃ অভাব থেকেই আবিষ্কার। ইংরেজীতেও বলে—Necessity is the mother of invention। কিন্তু এ জগৎ থেকে উপকরণ নিয়ে মানুষ আপনার আয়তন আর কতটুকু বাড়বে? যা কিছু সে নিজের সঙ্গে জুড়ে নেয়, তাই যে দুদিন বাদে পুরাণো মলিন হয়ে মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে যায়। তাকে চিরস্থায়ীরূপে বেঁচে থাকতে হলে যে সর্ব্ববৃহতের সঙ্গে যোগ থাকা (everlasting co-existence) চাইই।

সুতরাং বিস্তৃতির ভাব মানুষের স্বাভাবিক। বৈশেষিকের অণুই বল আর বৌদ্ধের শূন্যবাদই ধর, সেখানেও দেখবে—নিজকে বাদ দিতে গিয়ে ফুটে উঠবে জগতের বিরাট রূপ। যে যতটুকু, ততটুকুকে ধরেই জীবন চলে না, তাই সাড়ে তিন হাত মানুষের সাত হাত উঁচু ঘর লাগে, অণুপ্রমাণ মনের বিশ্ব লুটবার আকাঙ্ক্ষা জাগে; বর্ত্তমানের শূন্যতা ভবিষ্যতের পূর্ণতার কল্পনাকে বাধা দিতে পারে না।

অপূর্ণতা বা দুঃখ পূর্ণতারই অংশ। আমরা দুঃখের কল্পনা করতে চাই না, অথচ সুখের কাঙ্গাল; অংশকে বাদ দিয়েই সমগ্রের দিকে হাত বাড়াই। কিন্তু এটা আপাততঃ অসম্ভব হলেও পরিণামে গিয়ে সম্ভব হয়। সমষ্টি আনন্দের সন্ধান পেলে তবেই ব্যষ্টির দুঃখ ভোলা যায়, সমষ্টির দিকে আকুল বেগে যে ধেয়ে চলে, পথের মাঝে ক্ষুদ্র

ব্যষ্টির দুঃখ তার নজরেই আসে না। তাই জীবনের গতি দুর্লক্ষ্য হলেও শান্ত ও প্রসারিত মনের কাছে অলক্ষ্য নয়। যার চিত্ত কতকগুলি সঙ্কীর্ণ কামনায় অহরহঃ আন্দোলিত হচ্ছে, তার দৃষ্টি কিছুদুর গিয়ে বাধা পাবেই। সেই সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে কি করে জীবনের গতি সে বুঝবে? বিক্ষুব্ধ মন তার অতি ক্ষুদ্র পরিধিতে রয়েছে, সেখান হতে তার দৃষ্টি সে পরিধির বাইরে যায় না। কিন্তু যার তেমন কোনও বাসনা নাই, বিক্ষোভের বাধা যার নাই, শান্তসমাহিত মনে বিরাটের দ্রষ্টৃত্বই সেখানে বেশী ফুটবে। সেই বিস্তৃত পরিধির মাঝে—সমষ্টিরূপের কাছে, নিজ ব্যষ্টি-জীবনের ক্ষুদ্রত্ব, তার চলার ভঙ্গী, সীমা প্রভৃতি সকলই সুস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে, কিন্তু আবার তেমনি তার ক্ষুদ্রত্বও অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনের সেই সুখ দুঃখ আর তাঁর কাছে সাধারণ মানুষের মত নিতান্ত দুর্লঙ্ঘ্য থাকে না। জীবনের ছন্দ তিনিই ধরতে পারেন, যাঁর সে গতি সহজ আনন্দে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। নিত্য নূতন অভাবের তাড়নায় যার জীবন দুর্ব্বহ, সে এই সমগ্রদৃষ্টি বা মহাসত্যের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। তার কারণ গীতাকার বলেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

—অসত্য থেকে ভাব হয় না, অভাব থেকেও সত্য হয় না—তত্ত্বদর্শীরা এই উভয়ের প্রান্ত দেখতে পান॥ যেখানে অভাবের তাড়নাই প্রবল, সেখানে সত্যদৃষ্টির মাধুর্য্য কোথায়?

লোকে কথায় বলে, "অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস জীয়ন্তে মরা"—এমন কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসেরও অন্নাভাবে জ্যান্তেমরার দশা হয়েছিল—তাঁর সেই স্বাভাবিক কাব্য-প্রাণের উৎস পর্য্যন্ত অভাবের তাড়নায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভাবের সঙ্গে সখ্য করে তার আশ্রয়ে চতুর্দ্দশ অক্ষৌহিণী সেনাও বধ করা যায়, ভাব চলে গেলে সামান্য দস্যুর হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায় না। তাই বলছিলাম, জীবনে অভাবের দাপটে সুর খুলতে পায় না। প্রায় বারো আনা লোকেরই এই দশা। আজ এটা, কাল সেটা করে বাইরের অভাব কোনও দিন মিটছে না—আর অন্তরের ক্ষুধাও তাই আরও বেড়ে গিয়ে দিন দিন বিশ্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। তার ফলে জীবনে কিছুমাত্র সিদ্ধির দেখা পেলেই তাকে রাক্ষসের মত উপভোগ করা হয়, তাকে জীর্ণ করে পুষ্টি ও তুষ্টিলাভ আর ঘটে না। এর প্রতিবিধানের উপায় বলতে গিয়েই শাস্ত্রকার বলছেন যে, অভাব বা এই স্থূল-জগতের অপূর্ণতা এই স্থূল দিয়েই মিটবে না। এর অভাব থাকবেই—এর প্রান্ত বা চূড়ান্ত পর্য্যন্ত তোমায় শুধু দেখে যেতেই হবে; বরং এর খাঁকতি মিটাতে হলে অন্তরকে ব্যাপ্ত কর। বিপুল হও—মহান্ হও। এমনি করে সেই উদার চিত্তে ভাবেরও চরম মিলবে। অভাব ও দিব্যভাব উভয়কেই কুক্ষিগত করে দ্রষ্টা হও, তবেই ঠিক ঠিক ঠিক তত্ত্ব কি, তা বুঝবে। অভাবের তাড়না যেমন প্রবল, ভাবের উন্মাদনাও তেমনি কম সবল নয়। সামান্য একটু প্রশংসায় চেষ্টার সামান্য সফলতায় যে, চিত্ত উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে ওঠে, অভাবের সামান্য পীড়নেও সেই চিত্তই আবার ততোধিক এলিয়ে পড়ে। আধুনিক কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, বাইরের বস্তুজগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে দুর্ব্বলের মত অমনি নিজের মনে গুটিয়ে আসাতেই আজ প্রাচ্য বা ভারতের এই দুর্দ্দশা। কিন্তু চিত্তের এই সমতা রাখতে যে কতখানি শক্তির দরকার, আর সেই স্থির ও ধীর চিত্ত নিয়ে যে কর্ম্মজগতে কি ঘটানো যায়, অর্জ্জুনের জীবনই তার পরম দৃষ্টান্ত। অভাবের ব্যগ্রতা আর ভাবের আকুলতা, এ দুয়ে রাতদিন তফাৎ। প্রথমটীতে জীবনকে খুইয়ে দেয়,

আর দ্বিতীয়টীতে নিত্য নব নব উন্মাদনায় দেহ মনকে আরও বলশালী করে। যে আবেগ শরীরকে নিস্তেজ করে, বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে, জীবনের চিরদিনকার সুরকে ভুলিয়ে দেয়, তাই অসাত্ত্বিক বা অধর্ম্ম। আর যে আকুলতায় সত্য, তেজ, ধৃতি অদম্য উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে কার্য্যসাধনে তৎপর করে, তাই সাত্ত্বিক বা স্বধর্ম্ম। সাত্ত্বিক তেজ আর রাজসিক তেজের পার্থক্য বুঝা যায় লক্ষ্যের তারতম্য দিয়ে। রাজসিক তেজ নিয়ে যে প্রচেষ্টা, তাতে বেগ থাকে বটে, কিন্তু দৃষ্টি সেটুকুর মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ। আর সাত্ত্বিক তেজের প্রচেষ্টা সে দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ না করে বরং আরও প্রসারিত করে দেয়!

অচঞ্চল জীবনের অবিরাম প্রচেষ্টার মাঝে যে ব্যর্থতা আসে, তাতে তাকে হতাশ বা নিস্তেজ করে না, বরং অদ্বিতীয় বীর যুদ্ধের সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাতে আপনার মাঝে যে দোর্দ্দণ্ড শক্তির উন্মাদনায় মেতে ওঠে, তেমনি বাধাকে উল্লঙ্ঘনের আনন্দে প্রাণ তার ধৃতিমন্ত থাকে। সাধারণ মানুষ কাজ করে আশার উন্মাদনায়; তাই হতাশার বিক্ষোভও সে ক্ষেত্রে বেশী হয়। কিন্তু শান্ত চিত্তের প্রসারিত দৃষ্টিতে মরণকেই নিশ্চিত পরিণামরূপে জেনেও সাধক ভীষ্মের মত যুদ্ধে নাম্‌তে ভয় করে না। কেননা সেখানে জীবনের অনুভূতি এত মহিমময় যে, তার কাছে ক্ষুদ্র এই একটা দেহের বিনাশ অতি তুচ্ছ। আপনাকে বিশ্বময় প্রসারিত করে দাও—জীবনের অনুভূতি কেবল একটা কাব্যকরা কথার মত কথা নয়, তার পরীক্ষা হয় এমনি আত্মাহুতির দহনে। এই জীবন্ত অনুভূতি নিয়েই বুদ্ধদেব ছাগশিশুর জন্য আত্মবলি দিতে গিয়েছিলেন। ব্যষ্টি ভোগের বিন্দুমাত্র লালসা থাক্‌লে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত অমন মরণদুয়ারে বসেও আপন রোগমুক্তির কামনা না করে কেউ বল্‌তে পারে না—ওরে, আমি তোদের এই দশমুখে খাচ্ছি! জীবনের আগাগোড়া বল্‌তে তাঁরা শুধু বর্ত্তমান দেহটারই বয়স ধরেন না; সেখানে তাঁরা দেখেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই অনাদি স্পন্দনবেগে জীবন আরম্ভ ও অনন্ত বিস্মৃতিতে তার শেষ, তার মাঝে বর্ত্তমান দেহটা একটা বিন্দু মাত্র। বিরাটকায় হস্তী নাকি নিজের সবখানি দেহ তার ঐ ক্ষুদ্র চোখ দুটী দিয়ে দেখ্‌তে পায় না—দেখে মাত্র তার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানকে;—অথচ সবটা অঙ্গের অনুভূতি তার দিব্যি রয়েছে, নতুবা কোনও অঙ্গে আঘাত পেলে আঘাতকারীকে সে আক্রমণ কর্‌তে চাইত না। ব্রহ্মদর্শীর দেহ বা জীবনও তেমনি অনন্তাবস্থিত, তার মাঝে বর্ত্তমান দেহটা একটা বিন্দুবৎ—সমস্ত আঘাতেই সাড়া দেয়, কিন্তু আত্মারাম নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করেন। গীতা বলেন, তখন ইন্দ্রিয় শুধু ইন্দ্রিয়ের জন্যই, বিষয় আর তাকে স্পর্শ করে না। অথচ এই ক্ষুদ্র দেহটাকে আশ্রয় করে যে রয়েছে, তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম, এবারের প্রারব্ধ কর্ম্ম ও তার সীমা সব তাঁর নখদর্পণে স্পষ্ট হয়ে আরও অন্যান্য দশটা জীবনের ছবির মত চোখে পড়ে। লোকে তাঁদের কাছে গিয়ে মহাপুরুষের এই শক্তিকে অলৌকিক বলে জ্যোতিষীর কোঠায় ফেলে যেন তাঁদের পরীক্ষা কর্‌তে চায়। কিন্তু যে উপায়ে তাঁদের এই দৃষ্টির অলৌকিক প্রসার হয়, তা হিন্দুর কাছে অহরহঃ ধ্বনিত হয়। হিন্দুর বেদ, দর্শন থেকে আরম্ভ করে আধুনিক মহাত্মারা পর্য্যন্ত প্রত্যেকে জীবনে এই ভূমার সন্ধান দিয়েছেন। কাজেই জীবনের গতি দুর্লঙ্ঘ্য হলেও অলঙ্ঘ্য নয়।

—*—

"গীতাসুধা"

—✲✲✲—

সঙ্কলয়িতার কথা

বিগত ১৯২৪ সনের পৌষ মাসে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে আমি শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত উচাইল জাফর-পুর নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যাই। তখন কথা প্রসঙ্গে জানি-লাম যে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে বহু বৎসরের হস্তলিখিত অনেক পুরাতন পুঁথি আছে। আমি কৌতূহলান্বিত হইয়া আগ্রহসহকারে তন্ন তন্ন করিয়া সেই বইগুলি দেখিলাম। চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কথা সংগ্রহের প্রয়াস ও বৈষ্ণবপ্রিয়তার কথা জানিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে লাগিলাম। বইগুলি একটি পুরাণ দালানের প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকোষ্ঠটি একটি ছোট-খাট লাইব্রেরী বিশেষ। উহাতে পুরাণ, ইতিহাস ও ভক্তিশাস্ত্রের বহু হস্তলিখিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদের একখানা অতি প্রাচীন ও কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপি পাইয়া দেখিলাম যে, শ্লোকগুলি অতি সরল ও সরস পদ্যে অনূদিত হইয়াছে; এমন কি বালক বালিকারাও উহা পাঠ করিয়া গীতার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তখন আমি চৌধুরী মহা-শয়ের অনুমতি লইয়া পদ্যানুবাদের বইখানা লইয়া আসি এবং অতি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কীটদষ্ট অংশের পাঠোদ্ধার করিয়া বইখানা ছাপাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। গ্রন্থে গ্রন্থকার বিশেষ কোন আত্মপরিচয় দেন নাই; তবে নিজের 'আগমবিদ্যাবাগীশ' উপাধিটি স্বীকার করিয়াছেন। গীতার এই প্রাচীন অনুবাদক একজন পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত কবি। ইঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় এই পদ্যানুবাদ গ্রন্থে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইনি অনুবাদ পুস্তকে গীতার প্রচলিত ভাষ্যের উপরেও স্থানে স্থানে সুন্দর টিপ্পনী লিখিয়াছেন। আশা করি, এই গ্রন্থ পাঠে রসিক ভক্ত মাত্রেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন। ইতি

শ্রী হরিধন কাব্যব্যাকরণতীর্থ
হেড্ পণ্ডিত
ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন

গীতাসুধা

মঙ্গলাচরণ

জিনিতে যমের দায়　ধরণী লুটাইয়া কায়
বন্দ গুরুদেবের চরণ।
যাগ-যোগ কর্ম্ম-জ্ঞান　শ্রবণ-মঙ্গল-ধ্যান
গুরু-ভক্তি প্রাপ্তির কারণ॥
ইন্দু-কুন্দ-শ্বেত দেহ　কেবল করুণা-গেহ
শুক্লবর্ণমাল্যানুলেপন।
স্মরণে পূরএ কাম　সহ আর নিজ ধাম
দীনবন্ধু পতিতপাবন॥
নিত্য সুখ-জ্ঞানময়　দুই করে বরাভয়
রক্তবর্ণ শক্তি শোভে বামে।
মনোহর উপহারে　যোগিগণ পূজে যারে
ভবভয় তরি যার নামে॥
তেজিয়া মনের ছদ্ম　ভজ গুরু-পাদ-পদ্ম
গুরু-বাক্যে দৃঢ় করে মন।
ব্রহ্মা আদি যত দেবা　করিয়াছে জপ সেবা
নিজ কর্ম্মে হইল ভাজন॥
অন্বেষিয়া চারি বেদ　যাহার না পায় ভেদ
আগম পুরাণে গুণ গায়।
রাখিতে ভকত-যশ　পার্থ-প্রেমে হৈয়া বশ
রণরঙ্গে তুরঙ্গ হাঁকায়॥
নব-ঘন-শ্যাম কায়　কনক কাঞ্চন তায়
শোভা করে তিমিরে বিজুরি।
রতন-মুকুট মাথে　অতিশয় শোভা তাতে
সুধাময় বচনমাধুরী॥
চাবুক দক্ষিণ করে　বাম হস্তে রজ্জু ধরে
ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ সুদর্শন।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি　অর্জ্জুন সারথ্যে হরি
সুর-নর করে নিরীক্ষণ॥
মিথ্যা অভিমানে লোক　ভুঞ্জে নানা দুঃখ-শোক
পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ক্লেশ।
উদ্ধারের লাগি হরি　অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করি
পরতত্ত্ব কৈল উপদেশ।
মন-বাক্য-অগোচর　পরম ধর্ম্মের পর
গোলোক যাহার নিজ ধাম।
গোপ-গোপী করে সঙ্গে　সদা বিলসএ রঙ্গে
গোপ-বেশ জিনি কোটি কাম॥
নিত্য চিদানন্দময়　নাহি জরা-মৃত্যু-ভয়
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
—এই ত সিদ্ধান্ত দড়　সকল শাস্ত্রের বড়
অথর্ব্বাদি বেদে পরমাণ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন　যার অংশে নারায়ণ
পরতত্ত্ব কারণ-কারণ।
ধন্য বসুদেব নন্দ　ভুবনে আনন্দ-কন্দ
পুত্র ভাবে কৈল আরাধন॥
ছাড় স্বর্গ-ভোগ আশা　পড় ভাই **গীতা**-ভাষা
সদা হরি করহ স্মরণ।
হেলায় তরিবা তবে　পুন না আসিবা ভবে
গুরুপদে দৃঢ় কর মন॥
শ্রবণে দুরিত খণ্ডে　যম পুন নাহি দণ্ডে
বেদ তন্ত্র পুরাণের সার।
বিজ্ঞান ভকতি কাণ্ড　কেবল অমৃত খণ্ড
যাহা পরে শাস্ত্রে নাহি আর॥

প্রথম অধ্যায়, বিষাদযোগ

—*—

ধৃতরাষ্ট্র বলে— "কথা শুন হে সঞ্জয়!
দুর্য্যোধন আদি শত আমার তনয়,
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন,
যুদ্ধের ইচ্ছায় তারা করিয়া মিলন,
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কোন্ কর্ম্ম করে—
বিশেষ করিয়া সব কহিবে আমারে॥"

এই বাক্য শুনিয়া সঞ্জয় মতিমান্
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে করিয়া বাখান—
"পাণ্ডবের সৈন্য দেখি রাজা দুর্য্যোধন
আচার্য্য নিকটে গিয়া কহিল বচন—

'পাণ্ডবের এই সৈন্য বড়ই বিস্তার,
মন দিয়া আপনি দেখুন একবার:—
তোমার সেবক ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি,
ব্যূহ রচনাতে রক্ষা করিছে সম্প্রতি।
ইহাতে আছয়ে বড় বড় ধনুর্দ্ধর—
বিক্রমে বিশাল ভীম-অর্জ্জুন সোসর;
যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ মহামতি,
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান আর কাশীপতি,
পুরুজিৎ-পতি, কুন্তিভোজেশ্বর বীর,
যুধামন্যু, উত্তমৌজা দুই রণধীর,
সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু বীরবর,
প্রতিবিন্ধ আদি পঞ্চ দ্রৌপদী কুমার,
এ সকল মহাবীর করিল গমন।

'আমার সৈন্যের মুখ্য করি নিবেদন:
সকলের অধিক আপনি মহাশয়—
ভীষ্ম পিতামহ, কুরু-কুলের আশ্রয়;
কর্ণ-ধনুর্দ্ধর, কৃপাচার্য্য যোদ্ধাপতি,
অশ্বত্থামা প্রধান আর বিকর্ণ মহামতি,
ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অন্য শূরগণ—
মোর কার্য্য সাধে যারা করি প্রাণপণ,
যুদ্ধে বিশারদ, নানা অস্ত্র শস্ত্র ধরে—
তাহাতে অধিক পিতামহ রক্ষা করে;
তথাপি আমার সৈন্য সমরে বিজয়-
অসমর্থ হেন লাগে শুন মহাশয়!
ভীম রক্ষা করিছে পাণ্ডব-সৈন্যগণ,
সমরসমর্থ হেন লয় মোর মন।

'আপনি আমার হন সৈন্যের প্রধান,
সকল পথেতে থাকো হইয়া সাবধান;
পাছে যেন কেহ আসি না করে প্রহার—
ভীম রক্ষা করে আগে জীবন সবার।'

"তার ইষ্ট জন্মাইতে ভীষ্ম মহামতি
সিংহনাদে করি শঙ্খ পূরে শীঘ্রগতি।
তবে শঙ্খ, ভেরী, কাড়া, অনেক মাদল,
মহাশব্দ এক কালে বাজায় সকল;
শ্বেতবর্ণ অশ্বে টানে মহারথ খান,
তাহাতে রহিয়া পার্থ আর ভগবানে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দ গোবিন্দ করিলা,
দেবদত্ত নামে শঙ্খ অর্জ্জুন পূরিলা;
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম মহাবীর;
অনন্তবিজয় শঙ্খ পূরে যুধিষ্ঠির;
সুঘোষ নামেতে শঙ্খ নকুল পূরিলা;
মণিপুষ্প শঙ্খ সহদেব বাজাইলা।
বড় ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ মহামতি,
শিখণ্ডী, দ্রুপদপুত্র, বিরাট নৃপতি,

সাত্যকি, দ্রুপদ, পঞ্চ দ্রৌপদী-নন্দন,
অভিমন্যু মহাবীর আর রাজগণ
আপন আপন শঙ্খ সবে বাজাইল—
এক কালে মহাশব্দ তুমুল হইল।
আকাশ-পাতাল পৃথ্বী শব্দেতে পূরিয়া,
দুর্য্যোধন প্রভৃতির বিদরিল হিয়া।

যুদ্ধের উদ্‌যোগে আছে ভাই শত জন
দেখিয়া গাণ্ডীব হস্তে করিল তখন।
গোবিন্দের আগে পার্থ কহিল বচন :-
"নিবেদন করি কিছু শ্রীমধুসূদন।"

অর্জ্জুন বলেন, "বাক্য শুন ভগবান্,
দুই সৈন্য মধ্যে মোর রাখ রথখান।
যুদ্ধ অভিলাষ করিয়াছে রাজগণ,
ক্ষণেক করি যে সবাকার দরশন।
দুর্য্যোধন কুবুদ্ধির হিতের কারণ
কোন্ কোন্ রাজা আইলা করিবারে রণ?
কার সঙ্গে যুদ্ধ আমি করিব এখন?
সেই সব বীর আমি করি নিরীক্ষণ।"

এতেক বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ
দুই সৈন্য মধ্যে রথ করাইলা প্রবেশ।
ভীষ্ম, দ্রোণ আদি করি যত রাজগণ,
সকলের অগ্রেতে রথ করিলা স্থাপন।

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণ কহিলা বচন—
"হের দেখি সমরে মিলিলা কুরুগণ।"

দুই সৈন্য মধ্যে পার্থ দেখিল তথাই,
পিতৃব্য, মাতুল, গুরু পিতামহ, ভাই,
পুত্র পৌত্র, মিত্রবর্গ, শ্বশুর, বান্ধব।

সেই সব বন্ধুগণে দেখিয়া পাণ্ডব,
দয়াতে আকুলচিত্ত ভাবিয়া বিষাদ,
গোবিন্দ অগ্রেতে কিছু কহিলা সংবাদ :—

"যুদ্ধে উপস্থিত সব দেখিয়ে স্বজন,
অবশ হইল অঙ্গ, শুকায় বদন;
শরীর কাঁপয়ে, হৈল রোম-হরিষণ;
গাণ্ডীব খসিছে, গাত্র হইছে দাহন;
রহিতে নারিল হেথা—ভ্রম হৈল চিত;
কাতর হইয়া কহি দেখি বিপরীত।

"না চাহি বিজয়, কৃষ্ণ, রাজাসুখ আর,
কোন্ কার্য্যে রাজ্যভোগ জীবন আমার?
রাজ্যভোগসুখ বাঞ্ছা যাহার লাগিয়া,
তারা যুদ্ধে আইল ধন-প্রাণ তেয়াগিয়া।—
আর্য্য পিতৃব্যপুত্র, পিতামহ, ভাই,
মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, জামাই,
বৈবাহিক নরপতি আছে কতজন।
নিবেদি যে শুন প্রভো শ্রীমধুসূদন!
ইহারা আমারে যদি করয়ে প্রহার,
তথাপি আমার ইচ্ছা নাহি বধিবার।
তিন লোক রাজ্য হৈলে নাহি লয় চিত্তে—
কোন্ কার্য্য একা এই পৃথিবী নিমিত্তে?
ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের বধিয়া জীবন
কত বড় প্রীতি মোর হৈবে জনার্দ্দন?
যদ্যপি ইহারা শত ভাই শত্রু হয়,
তথাপি বধিলে পাপ হইবে নিশ্চয়।
অতএব বন্ধুবধ আমি না করিব—
স্বজন বধিয়া সুখী কেমনে হইব?
যদি নাহি দেখে লোভে চিত্ত হইয়া হত,
তবে কুলক্ষয় হবে—দেখি বিপরীত;
আর এক দোষ হবে মিত্রের হরণে,
জানিয়া নিবৃত্ত আমি না হব কেমনে?
কুলক্ষয় কুলধর্ম্ম হইবে বিনাশ—
ধর্ম্ম নষ্ট হৈলে হয় অধর্ম্মের বাস;

অধর্ম্মে জিনিলে দুষ্টা হবে নারীগণ;
বর্ণ সঙ্করের তবে হইবে জনম;
নিজকুল-নাশকের নরকে গমন।—
মোর মনে হেন লয়, করি নিবেদন
ইহা সবাকার স্বর্গবাসী পিতৃগণ
পিণ্ডোদক লুপ্ত হৈয়া পড়িবে তখন।
এই সব সঙ্কর-কারণ দোষগণ,
বিনাশিবে জাতি-কুল ধর্ম্ম সনাতন;
কুলধর্ম্ম নষ্ট মোর হবে জনার্দ্দন।
শুনিয়াছি হয় তায় নরকে গমন।
কি আশ্চর্য্য হায় মহাপাপে দিলো মন—
রাজ্যসুখ হেতু মোরা বধিব স্বজন।
যুদ্ধ না করিব প্রভো! হাতে লইয়া অস্ত্র;
তথাপি হস্তেতে যদি লৈয়া অস্ত্র-শস্ত্র
দুর্য্যোধন আদি হিংসা করয়ে আমারে,
আমার মঙ্গল সেই করিলো নির্দ্ধারে।"
এত বলি পার্থ ধনুঃশর তেয়াগিয়া
রথে বৈসে শোকাকুল হৃদয় হইয়া॥

ইতি সৈন্যদর্শন নামে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

"সোঽহমস্মি"

জন্মস্বত্বের অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত, তাই তোমায় হা-হুতাশ, দুঃখ-দৈন্যে ঘিরে রেখেছে। একবার সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করে বীরের মত বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে বল—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" শুধু ক্ষণিক উদ্দীপনায় নয়—চল্‌তে ফির্‌তে খেতে শুতে তন্ময় হয়ে যাও এই ভাবে। তপঃ-প্রভাবে জাত্যন্তরপরিণাম তো অসম্ভব কথা নয়! এই রক্ত মাংসের শরীর ব্রহ্মের চিন্তায় ব্রহ্মীভূত হয়ে যাবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা এক শরীর অন্য শরীর হয়ে যাওয়া যে সম্ভব!

ভাবনা দ্বারা শুধু কলুষের আবরণকে কাটিয়ে উঠ্‌বে তুমি—স্বরূপ আত্ম তো স্বভাবতঃই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ! তুমি যা আছ তাই থাক্‌বে শুধু গা ঝাড়া দিয়ে ময়লামাটিগুলো ফেলে দিতে হবে তোমার। সাধনার প্রয়োজন এখানেই—তুমি সমস্ত দুর্ব্বলতা কলুষ চিন্তা হতে গা ঝাড়া দিয়ে উপরে উঠে যাবে। কোন্ সময়, কেমন করে ময়লামাটী এসে আবর্জিত হয়েছিল, সে ভাবনা করে দিন গুয়ালে তো চল্‌বে না—এতদিন লক্ষ্য করনি, ব্রহ্মচিন্তা অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি—তাতে আপ্‌শোষের কি প্রয়োজন? এখনো কি আর তোমার আত্ম-আক্ষাৎকারের সময় নাই? আত্মা কি অমন একটি বস্তু যে তাঁকে আগে গেলেই পাওয়া যাবে—আর পরে গেলে পাওয়া যাবে না! আত্মা তো সব সময় এক ভাবেই আছেন, তবে যার ভিতর আত্ম-জিজ্ঞাসা যত শীঘ্র জাগে, সে তত শীঘ্রই আত্মানুভব করে। সদ্য সদ্য এখন একজনের ভিতর আত্মজিজ্ঞাসু ভাব জাগছে না বলেই যে পরে জাগলেও তার আত্মসাক্ষাৎকার হবে না, এমন অসম্ভব রায় তুমি দিতে পার না। তীব্র আবেগে মুহূর্ত্তে তোমার জীবনের ধারা ওলট্ পালট্ হয়ে যেতে পারে।

এ জীবনে কোন দিন এ অনাহুতের আবির্ভাবে

হৃদয় মন উপ্‌চে উঠেনি তোমার? তখন কি তোমার ইন্দ্রিয় মন লোপ পেয়ে গিয়েছিল? না?—কখনই নয়! তাহ'লেই দেখ্‌ছ, তাদের থাকা না থাকাতেও কিছু আসে যায় না—শুধু একটা উচ্চাঙ্গের অনুভূতিতেই সব স্তব্ধ হয়ে যায়। কে ঝাল মিটাবে, শত্রুতা করবে - ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সবার যে তখন তর্পণ হয়ে যায়! ইন্দ্রিয়ের আসল আন্তরিক পিপাসা মিটাতে পারছ না বলেই তারা নানা অকল্যাণ কামনা করে, তোমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলে দিনরাত!

তুমি সব হতে পার—প্রকৃতির মাঝে ভাল মন্দ উভয়ের বীজেই নিহিত। তাই নরাধম হওয়া আর একেবারে ঊর্দ্ধপরিণামে নরাকার পরব্রহ্ম হওয়া—এ দুটাই সম্ভব। জেনে শুনে কেউ কখনো নরকে যেতে চায়? তুমি যে ইচ্ছা করলে ব্রহ্ম হতে পার; কিম্বা ব্রহ্ম তুমি হয়েই আছ—শুধু অনুভব করে নিতে হবে! কাম-প্রেম, স্বর্গ-নরক দুটো যে পাশাপাশি!

শঙ্করাচার্য্য বল্‌ছেন—"অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্‌ যাচে—সোঽহমস্মি ভবামি।" আমি ভিক্ষুক নই যে, প্রভুর কাছ থেকে কাতর প্রার্থনা করে নিজের পাওনা আদায় করবো—ব্রহ্মেতে আর আমাতে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। আমিও যা, তিনিও তা—অহম্‌ ব্রহ্মাস্মি! আর কিছু না, এই দিব্য জ্ঞানটুকু জন্মে গেলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। তখন তোমার ইচ্ছার আবেগের কত জোর! যা ভাববে, যা চিন্তা করবে—সব সত্য হয়ে উঠ্‌বে!

আশ্চর্য্য বিস্মৃতি বটে, আমাকেই আমি চিন্‌তে পারছি না—কত যুগ যুগান্তরের ভয় ভীতির সংস্কারে জুজু করে রেখেছে!

আমি দুর্ব্বল, আমি প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষ—এ সঙ্কীর্ণ ধারণায় আমার বিরাট্‌ পরিধি আমিই সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছি, এখন আমি যাকে দেখ্‌ছি, তার ভয়েই জড়সড়! আমার বুকেই যাদের বসতি, তারাই এখন আমার ভয়ের বস্তু!

অসাধনের ধনকে অবহেলায় অশ্রদ্ধায় হারিয়েছি—তাই এখন সাধনা করে, তপস্যা করে তার অনুভব জাগিয়ে তুলতে হবে প্রাণে! ঋষিযুগে এমন ছিল, বলা মাত্রই ম্যাচের কাঠির মত সমস্ত দেহ ব্রহ্মানুভূতিতে জ্বলে উঠ্‌ত। সেই ঔৎসুক্য সদাপ্রস্তুতির ভাব আমাদের নাই বলেই আজ তা সাধনা করে অর্জ্জন করতে হচ্ছে। আনন্দ যেখানে স্বভাবতঃই উদ্দীপ্ত—সেখানে তো আয়োজনের কোন প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনটা তখন বিলাসেরই নামান্তর মাত্র।

বহুভাগ্যে তুমি মানবজন্ম পেয়েছ—এবার অন্ততঃ এ কথাটা বুঝ্‌তে পেরেছ, তুমি মানুষ—পশু নও! ব্যস্‌—আর মনকে বিগ্‌ড়াতে দেওয়া কেন? যা হবার তা হয়ে গেছে—হেয়ম্‌ দুঃখমনাগতম্‌। সাবধান, আর যেন পুঁজি না হয়। তারপর এ জন্মে না হল—বেশ তো, এবার কতটুকু এগিয়ে রইলে, তার পরজন্মে আবার অগ্রসর হওয়ার সাধনা আরম্ভ হবে। যোগভ্রষ্টের তো পতন নাই—এ কথা তো গীতাতেও আছে!

মোট কথা, সোঽহমস্মি এ সংস্কার নিয়ে তোমার মরতে হবেই—হয়ত বহু দিনের কুসংস্কারে ঠেকে তোমার আর এ অনুভব এ জীবনে হয়ে উঠ্‌বে না—ক্ষতি কি? এর পরের জন্মে জোরসে তোমার ভিতর আত্মানুভবের পিপাসা জেগে উঠ্‌বে! তখন তোমার ঊর্দ্ধ-পরিণাম প্রতিরোধ করবে এসে কে?

পাতঞ্জল-দর্শনে সৌমনস্যকেও আত্ম-দর্শনের একটা উপায় বলা হয়েছে। তার অর্থই হচ্ছে সর্ব্বদা পূর্ণ-পরিতৃপ্ত থাকা। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে—আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সৌম-

নস্য আস্‌বে কি করে?—অন্তরে যার অভাব, তার আবার পূর্ণতার আস্বাদন হয় কিরূপে? কিন্তু সৌমনস্তের অর্থ হচ্ছে—আত্মসাক্ষাৎকার লাভ আমার নিশ্চয়ই হবে, এই নিশ্চয়তায় সদাপ্রফুল্ল বিশ্বাস! সৌমনস্য থেকেই একাগ্রতা আস্‌বে—আর একাগ্রতা হতেই আত্মদর্শন! লক্ষ্য যখন স্থির হয়ে যায়, তখন সাধনাতে যে কত আনন্দ!

সদাশুদ্ধ চিত্তে আত্মার প্রতিফলন হয় সহজে। তোমার ভিতর ভাল চিন্তা আস্‌ছে না, ভাল ভাব পাচ্ছ না, তুমি গুরুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে পার্‌ছ না—সবের মূলে রয়েছে মালিন্য। এ মালিন্য দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতির—কাজেই সাধনা যে আরও বেশী করে কর্‌তে হবে তোমার! কিন্তু এ কথা জেনে রেখো—পরিণামে গিয়ে দেখবে, এ কথাই সত্য—সোঽহমস্মি! বলা মাত্রই অনুভব হয়ে যায়—সাবাস্‌! এই তো চাই। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদেরই যে বংশধর তুমি—তোমার দেহের প্রতি রক্ত-বিন্দুতে বিন্দুতে যে ব্রহ্মানুভূতির অব্যক্ত আনন্দের স্মৃতি!

মনকে সব সময় এ ভাবে চাঙ্গা করে রাখবে। যদিও কেউ ক্ষতি করতে আসে তোমার—তারা যেন তোমার ঔদাসীন্য দেখেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যায়। ঝগড়া করে যদি উত্তর-প্রত্যুত্তর না হয়—তাহলে সে ঝগড়ায় সুখ কিসের? তুমি যদি সাড়া না দাও, তাহলে সব যে আপনি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে!

তুমি নেহাৎ গোমূর্খ বলেও যদি নিষ্কৃতি পাও, তাতেই বা ক্ষতি কি? মোট কথা, যেন কোন দিক দিয়ে অপচয় না ঘটে।

আত্ম-প্রসারণের বিপুল সামর্থ্য এই যৌবনে। প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে অন্ধ হয়ে থাকবার জন্য তোমার জন্ম নয়—তোমাকে অনুভব করতে হবে অহম্‌ ব্রহ্মাস্মি!—আমি ভূমা—বৃহৎ। ওঁ

করুণা

—):*:(—

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারি মতন
স্নিগ্ধ শুভ্র হাসিতে
ভুলিতে পারিবে যবে
হৃদয়ের অসহন জ্বালা;
জাগিবে না ঈর্ষ্যা অসরল,
স্নেহ-আপ্যায়নে নিভাইয়া রোষানল
পারিবে করিতে সবে আপনার;
তখনি বুঝিবে করুণা পেয়েছ বিধাতার!

ভারতের বিবর্ত্তন

বেদের কাহিনী ও বাণী যখন পড়ি, তখন তার মাঝে শিশুর মত সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের দ্বিধাটা কত অস্পষ্ট, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির কি সহজ প্রকাশ, কামনা আর বীর্য্যের কি সুষম স্ফুরণ?—মনে হয়, এই বুঝি জাতির একটা মহান্ জাগরণের যুগ!

ঋষিদের পরেই পাই শ্রীকৃষ্ণকে। সেখানেও ভাল-মন্দের গলাগলি আছে বটে—যার সাফাই গাইতে ভাগবতকার বলেছেন, 'তেজীয়সাং ন দোষায়।' কিন্তু তার চেয়ে সুষ্ঠু দেখি, শ্রীকৃষ্ণে যৌবন শক্তির দুঃসহ প্রকাশ—বসন্তের পীড়নে অশোকের স্তবকে স্তবকে যেমন পুঞ্জে পুঞ্জে উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে—তেমনি করেই ফুটেছে তাঁর ঐশ্বর্য্য!—তিনি মহারাসরসিক, আবার মহাযোগেশ্বর; মহাকূটনীতিবিদ্, আবার নির্লিপ্ত; অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিপাত করালেন, কিন্তু নিজে অস্ত্র ধরলেন না, অথচ গোটা কুরুক্ষেত্রের সারথি তিনি! কামিনী আর কাঞ্চন আহরণে বিতৃষ্ণা বিন্দুমাত্র নাই—অথচ ভোগের তৃষ্ণা কোথাও খুঁজে পাবে না। এমনিতর যত antithesis তাঁর মাঝে—অথচ সবার সামঞ্জস্য ঘটেছে অপরূপ ভাবে!—

এইটাই হল একটা জীবন্ত জাতির দুর্ম্মদ যৌবনের প্রতীক্।

এর পর grand figure হচ্ছেন বুদ্ধ—নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, অথচ করুণাতুর—এক কথায় মহা প্রাণ—a grand soul; সর্ব্বত্র ক্ষান্তি, মৈত্রী, করুণা ক্ষরিত হয়ে পড়্ছে! আর সে করুণার প্লাবনে সব যেন একাকার—অখিল জগতের নির্ব্বাণ-পথ প্রদর্শনে যিনি কাতর, তিনিই আবার ছাগ-শিশুর জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নন!—মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আচার্য্যের আসন হতে বিচলিত হননি—কোথাও এতটুকু দুর্ব্বলতাও তাঁর মাঝে দেখতে পাই না।

একজন সমালোচনার ছলে বলেছিল, বুদ্ধ আর কৃষ্ণের মাঝে আমার বুদ্ধকেই ভাল লাগে। শ্রীকৃষ্ণ জগতে এনেছেন বিপ্লব।—অনার্য্যের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ পদে পদে প্রকাশ পেয়েছে—আর্য্য-মহিমার গৌরব স্থাপনের ব্যগ্রতায় তিনি অনার্য্য-কুলকে ধ্বংস করতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি—অসুর-সভ্যতা, ঋক্ষ-সভ্যতা, দানব-সভ্যতা, গান্ধর্ব্ব-সভ্যতা সব তাঁর হাতে নির্ম্মম ভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে; আর তারই ফলে আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু—অনার্য্যদের হাতে কৃষ্ণপ্রিয়াদের অমর্য্যাদা—আর আমাদের আজ এই দুর্গতি!

এরই পাশে বুদ্ধের চরিত্র কি প্রশান্ত, কি মহান্! কোথাও ক্ষোভ নাই—শান্তি ও মৈত্রীর বাণী অনার্য্য-দের ঘরে ঘরে তিনি পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন;—তাঁর ভিক্ষুদের প্রতি প্রথম ও শেষ আদেশ—এই শান্তির বাণী জগতের সর্ব্বত্র বহন করে নিয়ে যাও, তোমরা!—

আমি বলি, আমাদের মনটা বুড়িয়ে গেছে বলেই অমন মনে হয়। নইলে তুলনার কথা আস্তেই পারে না। বুদ্ধ ভারতের প্রৌঢ়ত্বের বিকাশ। যৌবনের সেই উদ্দামতা নাই, তাকে আবরিত করেছে প্রৌঢ়ত্বের স্নিগ্ধতায়। নইলে এক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বুদ্ধ এ দেশের কম করেন নি।—অনেকে এমন কথাও বলেন, তাঁর অহিংসা ধর্ম্মেই ভারতের পরাধীনতা আরও সহজ করেছে—সাহসী বিজ্ঞানচর্চ্চার

পথ অবরুদ্ধ করে কেবল সুকুমার কলাশিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে। নির্ব্বিচার বৈরাগ্যের ফতোয়া জারী করে তিনি আর্য্য-প্রতিভাকে যে ভাবে নিষ্পেষিত করেছেন, সেটা শ্রীকৃষ্ণের অনার্য্য নিষ্পেষণের চেয়ে কিছু কম নয়। বুদ্ধদেবের এই আত্ম হত্যাকারী নীতিরই তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছিল শঙ্করের কণ্ঠে। বুদ্ধ করুণার অবতার লোকের কাছে—কিন্তু নিজে কি?—একটা icy-cold calmness—সেটা করুণা না নির্ব্বেদ, কি বল্‌ব? একটা ছাগশিশুর জীবন আর একটা mission-এর জীবন যাঁর কাছে তুল্যমূল্য, তাঁর করুণাকে certificate দেওয়া একটু কঠিন বই কি! আর তাঁর philosophy যদি হয় শূন্যবাদ বা ক্ষণিকবাদ, তা হলে তার মত নিরানন্দবাদও তো দুনিয়ায় দেখি না! তাঁর প্রবল সত্যনিষ্ঠায় মানুষের হৃদয় হতে ভগবান্‌কে নির্ব্বাসিত করে তার স্থানে বসিয়েছে শুধু নীতি! এতে কি মানুষ বাঁচে? তাই তাঁর জীবদ্দশাতেই এই রসহীন শুষ্ক নীতিবাদ যে পরিমাণ দুর্নীতির সৃষ্টি করেছিল, তা তাঁর প্রাতিমোক্ষ রচনার ইতিহাস থেকেই বোঝা যায়।—পরবর্ত্তী ইতিহাস না হয় বাদই দিলাম!

তারপর তাঁর সব চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা হচ্ছে—নারীকে গৃহশূন্য করা। আজকালকার sufragist-আন্দোলনকারিণীরা এতে খুসী হতে পারেন বটে, কিন্তু এতে সমাজের যে কত বড় ক্ষতি করেছে, তা বল্‌বার নয়। সমাজ নিঃস্নেহ, নিঃসংযম হয়ে আঁধার নির্ব্বাণের পথেই দিন দিন গড়িয়ে পড়্‌ছিল। নারী কি আত্মতৃপ্তি পেয়েছে নির্ব্বাণে? বিশ্বাস করি না! তারা বুদ্ধকে ব্যক্তি হিসাবে ভালবেসেছিল—তাঁর দর্শনকে ভালবাস্‌তে পারেনি। তাই বুদ্ধের তিরোভাবের পর নারী-শক্তির দ্রুত অমর্য্যাদা ও অবনতিও ঘটেছিল।—

এইগুলি কি কৃষ্ণের চেয়ে হাল্‌কা অপরাধ? সেইজন্য কর্ম্ম দেখে বিচার করার পদ্ধতি আমি ছেড়ে দিতে বলি। বাক্যের যেমন স্ফোট থাকে, তেমনি কর্ম্মেরও স্ফোট আছে। দৃষ্টি দিতে হবে সেই কর্ম্ম স্ফোটে। সেখান হতে বিচার করলে বুদ্ধ বড় না কৃষ্ণ বড়, প্রশ্নই হয় না। আমার জীবনে এক সময় বৈদিক ঋষির আবির্ভাব দেখি, তারপরই দেখি কৃষ্ণ আর বুদ্ধ।—তেমনি দেখি জাতির জীবনে। ভাল-মন্দ এর বাছাই করব কি?

জাতির জরা প্রকাশ পেয়েছে শ্রীচৈতন্যে—যদি কর্ম্ম ধরে বিচার করতে চাও; শিউরে উঠো না। ভাবুকতার দাম যে বাজারে খুব চড়া তা জানি; কিন্তু দেখ দেখি, জাতিটার কি দুর্দ্দশা হয়েছে শ্রীচৈতন্যের অনুকরণ করে! আঠার বৎসর গম্ভীরায় কাটিয়ে তিনি জগৎকে যা দিয়েছেন, তা সাধারণ্যে প্রচার হয়েই তো আজ আমরা নিরুদ্যম, অলস-তন্দ্রাতুর! বিগ্রহকে ভোগ দিবার অছিলায় কেবল লোলুপতাতেই ইন্ধন দিচ্ছি—অথচ শক্তির প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে আছি।—চৈতন্যের কৃপায় আমরা পেলাম একটা কাঁদুনী-সাহিত্য আর গুটি কয়েক খোল-করতাল—বিনিয়ে-বিনিয়ে কান্না—তেমনি নাকি-সুরে রাগিণী ভাঁজা! দেশে একটু-আধটু বীর্য্যের যা এবশেষ ছিল, একেবারে নিঃশেষে তা মুছে গিয়ে গোটা দেশটাই হয়ে বস্‌ল পেলব। আমাদের "সবাই প্রকৃতি—পুরুষ শুধু সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন" নয়—সে ই, যে আমাদের ঠেঙ্গাতে পারে! চৈতন্যের প্রভাবে এই দেশটার কি দ্রুত অধঃপতন হয়েছে দেখ দেখি! আর আমাদেরও কি দশা! মহাপ্রভু জীয়ন্তে অবতার হয়ে দেশের লোকের কী সর্ব্বনাশই যে করে গেছেন—আজ অলিতে গলিতে জীয়ন্ত অবতার! -এ হাঙ্গামা রামচন্দ্রের ছিল না, কৃষ্ণের ছিল না, বুদ্ধের ছিল না!—

এইটাকেই বলি জাতির জরা।—যখন সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু মমতা থাকে। দাঁতে মুড়ি চিবাবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু নাতি-নাৎনী নিয়ে মমতায় হাবুডুবু খাওয়া আছে! একে যদি প্রেম বল তো বল্‌তে পার! আর আজ আমাদের এমনি দুর্দ্দশা হয়েছে, প্রেমে পড়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই। আর সে প্রেমও যৌবনের বলিষ্ঠ ছিনিয়ে-আনা প্রেম নয়, চৌকীর খুঁটা আঁকড়ে ধরে হাপুস্‌নয়নে কাঁদার প্রেম!

—:*:—

আত্ম-পরিচয়

আমাকে আমি জানি না। জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্য যদি কিছু থাকে তো এই যে, "আমি" কে আমি জানি না। একটা নাম রয়েছে, তাই অমুক বলে কেউ ডাকলে সংস্কারবশে উত্তর দিচ্ছি; কিন্তু কে দিচ্ছে, তাকে খুঁজলে কোথাও পাই না। এই দেহটা, এই মনটা জীবনভরা আমার সেবা করে চলছে বটে, কিন্তু সে যেন ছদ্মবেশে। যখনই তাদের জোর করে ধরে জিজ্ঞাসা করি বলি, তোরা কোথা থেকে, কারা এসে এ কার সেবা করছিস্?—তারা শুধু বলে, আমরা শুধু তোমারই—ওগো তোমারই! অথচ সেই তুমিটাই যে তারা কাকে বলছে, আমার কাছে তা সুস্পষ্ট কিন্তু মোটেই নয়!

জীবনভরা এই এক অপরূপ, অতি পরিচিত, অজ্ঞাত রহস্যের মাঝ দিয়ে চলেছি। কাজ তাতে ঠেকে না—কিন্তু জগতের তাগিদ তাতে মিটলেও আমার তাগিদ যেন মিটে না। যাদের আমি চাই, একান্ত আমার করেই চাই। সবটুকু না জানলে একটা অতৃপ্তি থেকেই যায়। তাই বাহিরে আমার দরজার কাছে যে এসে দাঁড়ায়, তাকে আমি ভাল করেই দেখে শুনে চিনে নিতে চাই, একটু কিছু ঘোর থাক্‌লেই তার সঙ্গে আলাপ তেমন জমে না। রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে আসল প্রাণের স্পর্শ সেখানে নিবিড় হয়ে ওঠে না—তাই রসও ফোটে না। কিন্তু রসিক যদি কেউ হয় তো সে হেসেই উঠবে, কারণ, এমনি করে সবাইর মুখ দেখে বুকের সাড়া পেতে গেলেও আমি আমার নিজের মুখই যে দেখি না! আমার এতখানি হুঁসিয়ারীর মাঝে এতটা বেমালুম ফাঁকি কি বিধাতার নির্দ্দয় রসিকতা নয়?

তোমরা হয়ত বল্‌বে—কাজ কি অত পরিচয়ের? কাজ চললেই তো হল, এখন সে যেই আসুক না কেন। আমার মনে হয় বিপরীত। যাকে দিয়ে সব করতে হবে, ভূত ছাড়ানোর সেই আসল সরষেকেই পেল ভূতে! তা হলে তারপর যে কাজগুলি করব, তা যে ওই ভূতাবিষ্টের কাজই হবে! সে তো এক-দিন ছুটে যাবেই—আমার সমস্ত আশা-ভরসায় জলা-ঞ্জলি দিয়ে সে ভূত যখন আত্ম-মূর্ত্তি নিয়ে সরে দাঁড়াবে, তখন সেই নিঃস্পন্দ জড় দেহটা যে মরার সামিলই হয়ে থাকবে! জেনে শুনে তবু তাই করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? শেষে পস্তানোর কথা জান্‌লে কে তাতে এগোয়? বিচার-যুক্তি নিয়ে স্বার্থভরা মন তেমন ভাবে বাইরের কোনও কিছুতেই হাত দেয় না। জগতের খুঁটী-নাটী সব কিছু জানবার চেষ্টাতেই না আজ বিশ্বময় এতখানি লটবহর নিয়ে সে চলেছে! কাজেই এতখানি ফাঁকি তার বরদাস্ত করা কিন্তু সত্যিই অন্যায়।

মনের সাড়া যতদূর পাই, তার গায়ে নির্দ্দিষ্ট কোনও ছাপ দিয়ে বলা চলে না যে, এইটুকু নিয়েই আমির গণ্ডী। ভাবনা-চিন্তার যে ধারা বেয়ে আজ সে চলেছে, চিরদিনই সে ধারাতেই সে থাকে না—নিত্য নূতন রং ফলিয়ে তার বিভিন্ন পথকে সে রঙীন্ করে চলেছে। কাজেই মনটাকেও একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ দিয়ে বলা চলে না যে, সে সাদা কিম্বা কালো। বরং দেখি, সময়বিশেষে সে সাদাও হয়, আবার কালোও হয়। সুখ-দুঃখের অভিঘাতের যে নিত্য নূতন রূপ দেখি, তাতে অসংখ্য ঘটনাপুঞ্জের মাঝে পড়ে মনও যে অনন্তরূপ ধারণ করতে পারে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

তেমনি দেহেরও নির্দ্দিষ্ট রূপ বা আকার নাই।

শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য দেহকে আপন ধরণে গঠিত করে নেয়। সুতরাং তার পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন, এই দেহের প্রতি পরমাণুও নাকি প্রতি মুহূর্ত্তে স্পন্দিত হয়ে প্রতিক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। তা হলে জড় সুতরাং অচল বলে এই স্থূল দেহটার রূপেরও একটা নির্দ্দিষ্ট ছবি পাই না যাতে চিরকাল বলতে পারি যে, হাঁ, এইটাই এর যথার্থ রূপ। সূক্ষ্ম ও চিরচঞ্চল মনকে তো ধরাই দায়!

নিত্য যাদের নিয়ে ঘরে-বাইরে আমার কারবার, সেই পরিচিত দেহ-মনই আমার এমনি বহুরূপী, অথচ তাদের দিয়েই আমি জগতের আর সবকে চিনি। সুতরাং সেই চেনা ও তার ফল স্বরূপে তাদের দিয়ে আমরণ যাই কিছু করি না কেন, সে সব যে কতখানি সত্য, তা বিচারেই বোঝা যায়। এমনি করে ফাঁকি দিয়ে ফাঁক বুজিয়ে নিত্য যে শূন্যে তাশের ঘর করছি, নিয়তির সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় তা যে উড়ে যাবেই—তাতে সন্দেহ করা চলে না। একে তার রসিকতাই বলি আর নিষ্ঠুরতাই বলি, এ আমাদের জানাশোনা চিরকালকার নিয়ম। তবুও ওই ভুলে ভুলে ভুলের রাজ্যেই আমাদের বাস চলেছে। 'ভুলের দেশে আর যাব না' বলে যতই সাবধান হই না কেন, আসল ভুলটাই যে এত কাছে, আসল চোর যে ঘরেরই মাঝে, সে দিকে নজর পড়ে না। বাইরের এটা সেটা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে আপনাকে তৃপ্ত রাখতে গিয়েও যে অহরহঃ একটা অতৃপ্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে, তার মূল যে কোথায়, কি করলে যে পিপাসা মিটে—এ দারুণ পীড়ার পীড়ন থেকে রেহাই পাওয়া যায়, এ সমস্তের সমাধান করিতে গিয়েই একটার পর একটা করে ব্যাপার নিয়ে স্থূল দেহটা জড়িত, আর সূক্ষ্ম মনটা যে তার মাঝে চঞ্চল হয়ে কত দিকে কত কামনার জাল জড়াচ্ছে, তার ইয়ত্তাই নাই। এমনি করে ভুল দিয়ে ভুল ভাঙ্গতে গিয়ে ভুলের বোঝা বেড়েই চলেছে—আর জন্ম-জন্মান্তরে এ ঘর সে ঘর সাত রাজ্য ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

বৈদান্তিক এই ভুলকেই বলেন—সেই ফাঁকি বা মায়া। কামনার জাল গুটাতে না পেরে যতই না কেন তাকে মায়াবাদী বলে গাল দেওয়া যাক, আসলে যে সেটা ফাঁকির উপর ক্ষমা, তাতে সন্দেহ নাই। তিনি জগৎকে অসুন্দর বলছেন না—মহামায়ার কারসাজীতে যে কি অপরূপ শোভা নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে জগৎখানি তাঁকে মুগ্ধ করছে, তা তিনিও দেখছেন, আর তাঁর সেই খেলার সাথে লীলামুগ্ধের মত সায় দিয়ে বাহবাও দিচ্ছেন আবার আসলটাও জানেন। সব জানেন বলেই সে লীলা তাঁর কাছে আরও মধুর, আরও আত্মগত হয়। সাজঘরে যেই হ'রেকে নিয়ে এতক্ষণ ধরে কাণমলা, নাকমলা ইত্যাদি করে করে রগড়ের চূড়ান্ত হচ্ছিল, সেই যে পর্দ্দার এ পারে এসে, দশরথের ছেলে রাম সেজে, 'হা সীতা' বলে এমন প্রাণস্পর্শী কান্না কাঁদতে পারে, এতে তার বাহাদুরী এবং সে যে ভবিষ্যতে আমার দলের একজন বিশেষ সুযোগ্য অভিনেতা হবে, তা ভেবে একটা হৃদ্গত ভাব তার উপরে জন্মে; মায়াধীশ বৈদান্তিকের জগতের প্রতি ক্রমশঃ এমনি একটা মমতা ও স্নেহ এসে সমস্ত ভুলগুলি বিক্ষোভের কারণ না হয়ে লীলাভোগের এমন এক অপূর্ব্ব উপাদান হয়। প্রবর্ত্তকের ঘুরচাকায় নিষ্পেষিত মন মরিয়া হয়ে আর্ত্তনাদ সহকারে তাকে যে আখ্যাই দিক্, স্বয়ং যিনি প্রবর্ত্তক, তাঁর কাছে সমস্তটা সুখ-দুঃখ মিলেই যে একটা নিবিড় আনন্দ। এই সমষ্টি আনন্দের রস না পেয়ে সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে ভোগ করেই তো

এদিক-ওদিক দুদিকে আন্দোলনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। কিন্তু এই দুদিকে গিয়েও আন্দোলনের রস অনুভব হয়, যদি সে দোলনার তত্ত্বটাই পেতে চায়। কাজেই আনন্দ একটুকু নিয়ে নয়, সবটুকু নিয়ে। একদিককার আনন্দই বেদনারূপে সুখ বা দুঃখরূপে গণ্য হয়।

অণু পরমাণুগুলি প্রায় একরকম হয়ে গঠিত হয়ে থাকলেও আমার স্থূল দেহটা আর একটা তেমনি দেহের সাথে মিশে যেতে পারে না—একটা না একটা দেওয়াল যেন সেখানে বাধা দিবেই। কিন্তু সূক্ষ্ম মনের রাজ্যে এটুকুর হাত সহজেই এড়ান যায়। সেখানে দেখি, জগতের যে কোনও মন বা অবস্থার সঙ্গে আমার মনটা মিলিয়ে দিতে পারি। আর এমনি করে মন মিলিয়ে দিয়ের জগতের সমস্ত কবি ও দার্শনিকেরা আপন মনকে গ্রাম্য চাষা থেকে আরম্ভ করে রাজ-রাজড়াদের ভিতর পর্য্যন্ত বিস্তার করে দিয়ে ডাক্তারী এক্স্‌রে-যন্ত্রের মত তার অপরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখছেন। কবি যেখানে যা দেখান, যেন তাই হয়ে যান, আর তাই হয়ে গিয়েই যেন আমাদের মনকেও তেমনি তদঙ্গে অঙ্গীভূত করে নিতে থাকেন। এক সঙ্গে তিনটী মনের ভঙ্গী এক হয়ে যাওয়াতেই সে কার্য্যে রসভঙ্গ হয় না।

এমনি ভাবে যেখানে মনের যোগ হয়, সেখানেই তার যথার্থ পরিচয় হয়। নিত্য ব্যাপারেও দেখি, আমার মন দিয়েই অপরের মনের অবস্থা নির্দ্ধারণ করি। নতুবা প্রত্যক্ষভাবে পরের মন কেউ এই স্থূল জিনিষের মত স্থূলরূপে দেখতে পারে না। আবার আমার মন দিয়ে অপরের মন দেখতে পেলেই নিবিষ্ট হয়ে আমাকে তখনকার জন্য তন্ময় অর্থাৎ তদগত বা সেইরূপ হয়ে যেতে হবে। পূর্ব্বকালে মুনিঋষিরা যে উত্তর জন্ম বা যে কোনও দেহধারীর ভূত ভবি-ষ্যতের কথা বলতেন, তার কারণও এই বিস্তৃতিরূপ মূলসূত্র থেকেই পাওয়া যায়। এমন কি, আজ যে সমস্ত ভূত ও অচেতন বস্তু চেতনবৎ হয়ে বিজ্ঞান সাহায্যে আমাদের মনকে সাড়া দিচ্ছে বা আমাদের কাজে লাগছে, সেই সমস্ত অচেতন বা সুদূর লোকাদির মাঝেও যৌগিক ও নানা উপায়ে আত্মবিস্তার করেই সে সমস্ত বিষয়ে তাঁরা তত্ত্ব সংগ্রহ করতেন। তেমনি যে কোনও দেশে মন বিস্তার করে তার তত্ত্ব জানার কথাও তখন দুর্লভ ছিল না। দেশের মত যে কোনও কালেও আমরা আপনাকে বিস্তার করতে পারি। এ যুগের কবি কত শতাব্দীর পূর্ব্বে আপনাকে নিয়ে তখনকার চিত্রের সঙ্গে আমাদিগকে যুক্ত করেন। তেমনি শুধু কল্পনা বা ইতিহাস নয়—সত্যই মনের মাঝে যে অনন্তকালের সুস্পষ্ট সত্তা আজ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রয়েছে, এই মন যতই স্থির হবে, ততই ক্রমশঃ সে সব সুস্পষ্ট হয়ে সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের ছবিগুলি ভেসে উঠবে। কাজেই সে যুগের বৌদ্ধ জাতক বা মুনি-ঋষিদের অথবা এই যুগেরই যোগী তপস্বী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কথিত পূর্ব্ব জন্ম বা ভবিষ্যৎ জীবন ও জন্মকথা জানা বিচিত্র নয়। একটী প্রাণীই যে ক্রমশঃ উদ্ভিজ্জ-স্তর হতে সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য দেখেও শ্রেষ্ঠ দেহধারীতে পরিণত হয়, এ কথা এখনকার পাশ্চাত্য মুনি-ঋষিদেরই অভিমত। প্রাচ্য মত এই Evolution বা ক্রমোন্নতি মিথ্যা বলেন না, কিন্তু আবার Involution বা অবতরণ বাদ—যেমন তরলজ্যোতিঃপূর্ণ কুণ্ডলী গ্রহ থেকে জ্যোতিষ্কসমূহ বিচ্ছুরিত হয়ে মহাসূর্য্য থেকে ক্রমশঃ এই শান্ত শীতল পৃথিবীর রূপ প্রাপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্ম হতে এই জগতের এমনি ক্রমশঃ পরিণতিও স্বীকার করেন। এই ব্রহ্মের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁরা অনেক কথাই বলে হয়রাণ হয়েছেন, কিন্তু মনের পরিচয় দিতে গিয়ে মনই যে ব্রহ্ম অর্থাৎ সেই বিরাট সমষ্টিস্বরূপ, এ কথাও বলেছেন। সত্যই আমাকে যে শুধু আমার কাজেই পাই, তা তো

নয়!—জগতের যেখানে যা কিছু রয়েছে, হয়েছে বা হচ্ছে ভূত ভবিষ্যতের সেই অনন্তে বিস্তার লাভ করে আছে এই বর্ত্তমান—আর তার মাঝে আমার এই স্থূল দেহ-মন বিশিষ্ট অনন্ত বিন্দুর কেন্দ্রে নিত্য ও অনাদি অনন্তস্বরূপে বিরাজিত—"আমি।"

পাশ্চাত্য জগতের মহাবৈজ্ঞানিকের দল বলছেন—জগতের মূল প্রাণী 'আমি-বা।' আমি বলি, কেন সংশয়—'আমিই বা' কেন?—**আমিই**—সোঽহং—ওই যে প্রতিনিয়ত সর্ব্বত্র জপ হচ্ছে। আমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই। এই ত আমার আত্মপরিচয়।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—

খুব সকাল উঠেই যমুনোত্তরী যাবার জন্ত সাড়া পড়ে গেল। খড়শালী হতে যমুনোত্তরী ৪ মাইলের কিছু বেশী, মাঝারী চড়াই এবং পাকদণ্ডী রাস্তা।

আমরা খড়শালী হতে বের হয়ে এক মাইল পর্য্যন্ত রাস্তার মাঝে মাঝে সামান্ত উৎরাই—প্রায়ই সোজা অতিক্রম করে কাঠের পুলের উপর দিয়ে যমুনা নদী পার হয়ে, যমুনাকে ডান হাতে রেখে ক্রমে চড়াই করে, আবার উৎরাই করতে লাগলাম। এই চড়াইটী বড় নয় এবং কঠিনও নয়। কিন্তু খড়শালী হতে দু'মাইল অতিক্রম করবার পর একটী বড় ঝরণা পার হয়ে যে চড়াই আরম্ভ করলাম, সেটি খুবই কঠিন চড়াই। আজ পর্য্যন্ত এমন উৎকট চড়াই আর পাই নাই।

খাড়া পাহাড়টী উৎকট চড়াই করে, উপরে উঠে ডান হাতে ছোট একটি ভৈরবজীর মন্দির পেলাম।

এক টুক্‌রো ছেঁড়া কাপড়ে ভৈরবজীর পূজা হয়। অর্থ কিছু বুঝ্‌লাম না—পাণ্ডাও বল্‌তে অক্ষম। ভৈরবজী কি শুধু পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ের এক টুক্‌রো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন? আমি অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কেউ কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আমরা কিন্তু সামান্ত পুরাতন পুরাতন এক টুকরো নেকড়া দিয়ে পূজা করতে অক্ষম বিধায়, ভক্তিভরে মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে, ভৈরবজীকে দর্শন ও প্রণাম করে, তাঁর আজ্ঞা নিয়ে ক্রমে অল্প অল্প চড়াই করতে লাগলাম।

এ চড়াই তত কঠিন নয়। চড়াই শেষ করে আবার সামান্ত সামান্ত উৎরাই করতে করতে যে স্থানে মাইলষ্টোন্ শেষ হয়ে গেল, সেখান হতে আরও আধ মাইল দূরে যমুনা দেবীর মন্দির ও তীর্থ দেখ্‌তে পেলাম। হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ এলো, প্রাণে বল এলো;—আমরা নূতন ভাবে, নূতন উদ্যমে, নূতন আনন্দে, উৎফুল্ল হয়ে এতদিনে উদ্দেশ্যস্থানে আসায় কষ্ট শেষ হল মনে করে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে লাগলাম।—আবার খাড়া কঠিন উৎরাই করতে হবে।

যেমন ভাবে খাড়া চড়াই করে এসেছি, ঠিক তেমন ভাবেই আবার সামান্য উৎরাই করতে হবে। এরূপ স্থানে উৎরাই করা খুবই কষ্টকর—পা হড়কে যায়; পড়ে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা—মাঝে মাঝে বরফও আছে; পাহাড় ভিজে, পাথরগুলি পিচ্ছিল, পড়ে যাবার সম্ভাবনা বিশেষ রকম। চড়াই করতে কিন্তু অত ভয় নয়—যত ভয় উৎরাই করতে। মাঝে মাঝে বরফ কেটে সামান্য সামান্য সিঁড়ির মত ৬।৭ ইঞ্চি চওড়া ধাপ করে দিয়েছে। এখানেই পার্ব্বত্য লাঠির উপকারিতা উপলব্ধি করলাম। এক হাতে গাছের শিকড়, লতা-পাতা ডাল-পালা ধরেছি, অন্য হাতে লাঠির ওপর ভর রেখে ধীরে ধীরে উৎরাই করে যমুনার উপর আবার সামান্য পুল পার হয়ে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলাম।

ধর্ম্মশালায় দু'খানা ঘর—তাও অতি কদর্য্য এবং ভাঙ্গা, তবে পাহাড়ের গায় আড়াল হয়ে ছিল বলে, অত্যধিক বৃষ্টিতেও আমাদের গায় জল পড়ে নাই। নতুবা সে দিন কি কাণ্ড হত—ঠাকুরই জানেন!

উত্তরাখণ্ডে যতগুলি তীর্থ আছে, তন্মধ্যে যমুনোত্তরীর অবস্থাই সকলের চেয়ে শোচনীয়। এর প্রধান কারণ, এটি লোকের অজ্ঞাত তীর্থ; দ্বিতীয়তঃ যমুনোত্তরী যাবার কোন সুগম পথ না থাকায় বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু যাত্রী ভিন্ন আর কেউ এই কঠিনতম তীর্থে যেতে চান না। প্রায় ২০ বৎসর হল, টিহরীরাজ গঙ্গোত্তরীর পথের ধরসু-জংশন হতে একটি রাস্তা করে দিয়েছেন বটে, (যে পথে আমরা এসেছি) কিন্তু ভাল চটীর বন্দোবস্ত না থাকায়, এ পথেও তীর্থ যাত্রীরা বিশেষ যাতায়াত করেন না।

যমুনোত্তরীতে কয়েকটী গরম জলের কুণ্ড আছে, যমুনা নদী বরফাবৃত; কোন কোন স্থানে বরফের নীচু দিয়ে কল কল শব্দে যমুনার জল বয়ে যাচ্ছে; উপরে বরফের পুল, অনায়াসে সে বরফের উপর দিয়ে চলাফেরা করা যায়। কিন্তু ভিতরের বরফ এ সময় অল্প অল্প করে গলে যাচ্ছে; বরফ গলে গলে যে জায়গা পাতলা হয়ে যায়, হঠাৎ সে স্থানে পা পড়লে বরফের ভিতর চলে গিয়ে চিরসমাধি লাভ করা আশ্চর্য্য নয়। সেরূপভাবে একেবারে বরফের ভিতর চলে গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য—তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নাই, লোকজন যথেষ্ট সঙ্গে থাকলেও কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। বরফের উপর দিয়ে চলতে হলে অতি সাবধানে, খুব ধীরে ধীরে লাঠি দিয়ে বরফ পরীক্ষা করে চলা উচিত।

এ সব বরফ কিন্তু কলিকাতার তিন পয়সা সেরের মত নয়। অতি ক্ষুদ্র দানা ভাঙা-চিনির মত শিশিরবিন্দু ক্রমে একটির পর একটি করে জমে গিয়ে কঠিনাকার ধারণ করে। খুব বেশী জমে গেলে, উপর দিয়ে হাতী চলে গেলেও ভয় নেই—এমনই শক্ত হয়ে জমে যায়। আমরা বরফের দেশে এসেও আজই প্রথম নূতন বরফের সঙ্গে পরিচিত হলাম। লাঠি-দ্বারা খানিকটা বরফ টুকরো করে খেয়ে নিলাম; মুখ, জীভ, দাঁত সবই অসাড় হয়ে গেল। বরফগুলো মিশ্রীর মত কচ্ কচ্ করতে লাগ্‌লো।

খানিকক্ষণ বরফের উপর অতি সন্তর্পণে ঘুরে স্নানের জোগাড় করলাম। যমুনার জলে প্রথমে স্নান করে, পরে গরম জলের কুণ্ডে স্নানের বিধি। কিন্তু যমুনার জল অত্যধিক ঠাণ্ডা থাকায়, যমুনার জলের সামান্য ছিটে মাথায় দিয়েই স্নানের কাজ সেরে নিয়ে গরম-ঠাণ্ডা মিশ্রিত কুণ্ডে স্নান করতে লাগ্‌লাম। কুণ্ডের জলে প্রায় ২০ মিনিট খুব আরামে স্নান করা গেল। স্নান করে উঠার সঙ্গে সঙ্গে খুব শীত করতে লাগলো। উপরে কয়েকটি গরম জলের কুণ্ড আছে, তা' হতে অনবরত গরম জল বের হচ্ছে—কোন কোন কুণ্ড হতে গরম জল পিচকারীর মত বেগে ৫।৭ হাত উঁচু হয়ে সরু ধারে বের হচ্ছে—কোন কোন কুণ্ডে

যমুনোত্তরী—
৪ মাইল ও
তাহার বিবরণ—

গরম জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। সেই সব গরম জল নালা করে, কতকটা এ কুণ্ডে আনা হয়েছে; অন্য ঠাণ্ডা জলের কুণ্ড হতেও একটী নালা এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়ায় সর্ব্বসাধারণের স্নানের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। নীচে অত্যধিক গন্ধকের (sulpher) পাহাড় থাকার জন্যই বোধ হয়, অত গরম জল বের হচ্ছে। আমরা কিন্তু রীতি মত গন্ধকের গন্ধ পেয়েছি। স্নান করে উঠে দেখি, সমুদয় শরীর লাল হয়ে উঠেছে। কোন দিন খুব বেশী পরিমাণে ভাল সাবান গরম জলের সহিত মাখ্‌লে শরীর যেমন খুব পরিষ্কার হয়ে লাল হয়ে যায়, তেমনি গরম জলের কুণ্ডে sulpher পড়ে খুব পরিষ্কার হয়ে লাল হয়ে উঠেছে। এদেশে ভ্রমণ করতে এসে সকলেরই শরীরে কম বেশী চাম-উকুন হয় ও তার কামড়ানীতে খুবই কষ্ট হয়, শরীরে ঘা হয়ে যায়। থড়শালীর প্রত্যেক লোকেরই শরীরে ঘা আছে। আজ গরম জলে স্নান করাতে চাম-উকুনগুলি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় কিছু দিনের জন্য যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। অনেক যাত্রী শীত-প্রধান দেশ বলে এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য প্রায়ই স্নান করে না—কেউ কেউ আবার এমন লোক আছে, যারা গরম দেশেও ১০।১৫ দিনে একবার স্নান করা বিশেষ কষ্টকর মনে করে থাকে—তার ওপর এ তো ঠাণ্ডা দেশ। তারা এত-দিন পর গরম জল পেয়ে, ভগবানের অপার মহিমা ভেবে, এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা গরম জলের কুণ্ডে স্নান করে নিল। তারা স্নান করার অল্পক্ষণ পরেই কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠ্‌ল—কেউ কেউ বা হুঙ্কার করতে আরম্ভ করে দিল। বেকুবের দলের কাণ্ড দেখে আমরা হাসি রাখতে পারলাম না। আমরা কয়েক-জনকে মানাও করেছিলাম—তারা তখন আমাদের বিদ্রূপ করেছিল, পরে যখন সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল, তখন কিন্তু হাত-জোড়! যে সব যাত্রী এদিকে আস্‌বেন, তাদের অনুরোধ কচ্ছি, তারা যেন গরম জলের কুণ্ডে ঘণ্টা-খানেক ভরে স্নান করে রোগগ্রস্ত হয়ে না পড়েন,—বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বেন। স্নানের সময় তল্পিতল্পা সাবধান করে, বিশেষতঃ টাকা পয়সা খুবই সাবধান করে, বিশ্বস্ত লোকের নিকট রেখে স্নান করবেন। একজন পাণ্ডার ১০।১১ বয়স্ক একটি ছেলে আজই স্নানের কুণ্ডের পাড় হতে একজন গরীব যাত্রীর যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে চম্পট দিয়েছিল—বহুকষ্টে সেগুলি উদ্ধার হয়। এখানে টাকা পয়সা গেলে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে হবে—ভিক্ষাও মিল্‌বে না—পাণ্ডাও দিবে না—নিকটে ডাকঘর বা তারঘর নাই যে তার করে টাকা আন্‌তে পারবেন—তার কর্‌তে হলে টিহরী বা মুসুরী যেয়ে তার কর্‌তে হবে। কাজেই বিশেষ 'সাবধান হওয়া উচিত।

স্নানের কুণ্ডের একটু উপরেই যমুনাদেবীর মন্দির—মন্দিরের পিছনে সূর্য্যকুণ্ড, নারদকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গৌরী-কুণ্ড, গোমুখী প্রভৃতি তীর্থ বিদ্যমান।

সূর্য্যকুণ্ডে পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থে লোকে পিণ্ড দান কর্‌ছে। মন্দিরের উত্তর দিকে গরম জলের কুণ্ডে কাপড়ের গোঁটে চাউল, ডাউল, আলু বেঁধে সিদ্ধ করে ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন কচ্ছে। কেউ বা রুটী, বা পুরী করে কুণ্ডে ছেড়ে দিচ্ছে। রুটী বা পুরী কুণ্ডে ছেড়ে দিবার পর নীচ দিকে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, খানিক পরে ভেসে উঠে—তখন চিম্‌টে দিয়ে তুলে নিলেই খাবার উপযুক্ত হয়, কিন্তু তাওয়ায়-সেকা রুটীর মত কর্‌করে হয় না। কেউ বা লোহা বা বাঁশের সরু ফালি আলুর ভিতর দিয়ে গেঁথে ছেড়ে দিচ্ছে। সেগুলিও নীচে চলে যায়, খানিক পর উপরে ভেসে উঠে। কেউ বা নিজের নিজের আলু ঠিক রাখার জন্য মোটা সূতো দিয়ে বেঁধে দেয়।

আমরা চাউল ও আলু কতকগুলি সিদ্ধ করে নিলাম—সেগুলি খেতে ভাল লাগলো না। এ কিন্তু যমুনাদেবীর প্রসাদ। আমরা প্রসাদস্বরূপ কণিকা-মাত্র খেয়ে নিলাম। পরে ডাল ভাত, আলুকা শাক বানিয়েছিলাম। ডাল, চাল কিছুই সিদ্ধ হল না। আলু ঘিয়ে ভেজে নেওয়ায় খাবারের উপযুক্ত হয়েছিল।

এত উচ্চ প্রদেশে ডাল ভাল সিদ্ধ হয় না; আমরা হিমাচলের অনেক জায়গায় এরকম দেখেছি। মনে হয়, ঐরূপ গন্ধকের গরম জলে সিদ্ধ করে যে জিনিষ খাওয়া যায়, তা উপকারী না হয়ে বরং অপকারী হবে। তবে যদি কারো রক্ত খারাপ হয়ে থাকে, তার পক্ষে ৫।৭ দিন খাওয়া মন্দ নয়—কারণ গন্ধক রক্তপরিষ্কারক।

এখানে গরম জলের কুণ্ডগুলির জল এত গরম যে, হাত দিবার উপায় নাই—টগ্ বগ্ করে ফুটছে।

যমুনোত্তরীতে কোন দোকান নাই; খড়শালী হতে পাণ্ডারাই যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর খোরাকীর জন্য চাউলাদি নিয়ে যমুনোত্তরীতে বিক্রী করে থাকে। খড়শালী হতে দাম সামান্য চড়া। খড়শালীতেও দাম খুব বেশী। তারা একদিন চাউলাদি না দিলেই কিন্তু উপবাসে কাটাতে হবে। দু'টি পয়সার লোভে পাণ্ডারা কত কষ্ট সহ্য করে! তেমন কষ্ট বোধ হয় আমার বাঙ্গালী ভ্রাতাগণ অনাহারে মরলেও করতে স্বীকার হবেন কিনা চিন্তার বিষয়!

এ স্থানে অত্যধিক জঙ্গল—অসংখ্য অশোকের বন। গঙ্গোত্তরী হতে গোমুখী পর্য্যন্ত যেমন অসংখ্য ভূর্জ্জপত্রের বন, এদিকেও তেমনি অশোকের বন। এমন জঙ্গলের দেশেও কিন্তু কাঠের খুব অভাব। প্রত্যেক দিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় সব কাঠই ভিজে যায়, তাই কাঠ মহার্ঘ্য। বিহারীদাদা মুটেদের কিছু দিয়ে পাহাড় হতে কাঠ যোগাড় করেছিলেন; আমরা সমস্ত দিন-রাত সেই কাঠের ধুনী করে, শীতের হাত হতে রক্ষা পেলাম বটে, তার উপর আবার বেলা ১টা হতে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো—এক হাত দূরের জিনিষ দেখাও অসম্ভব, এমন বৃষ্টির ধারা! সুতরাং শীতের প্রকোপ কেমন—সহজেই বুঝে নিন! এভাবে অত কাঠ জোগাড় না হলে, আমাদের শীতে খুব কষ্ট পেতে হত। একদিকে যেমন গরমে ছিলাম, অন্য দিকে তেমনি সেই গুহা-সদৃশ ঘরে ভিজা কাঠের ধূঁয়ায় এবং আগুনের তেজে মাথা আরো গরম হয়ে গেল,—সমস্ত রাত আর ঘুমের নাম গন্ধ নাই—একদিকে সুখ হলেও অন্যদিকে অশান্তি। মায়েদের এক ঘরে দিয়ে আমরা অন্য ঘরে ছিলাম—আজ রাত্রে তীর্থবাস হল। অনেক লোক জায়গা অভাবে খুবই কষ্ট পেয়েছিল, আমরা অনেক-কে জায়গা দিয়াছিলাম, কিন্তু সমস্ত লোককে জায়গা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

আমরা ধরাই-জংশন হতে আসার সময় একজন ভজন-প্রিয় বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু বাবা কালী-কম্বলী-ৱালার সদাব্রতের চিঠি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অতি সৎলোক এবং ভজন-প্রিয়; রোজ সন্ধ্যেবেলা ও সকালবেলা করতাল বাজিয়ে যখন উচ্চৈঃস্বরে ভজন গাইতেন, তখন আমাদের প্রাণেও আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। তাঁকে আমরা বরাবরই সঙ্গে রেখেছি। বাবাজিটির সঙ্গে বৃন্দাবনেও দেখা হয়েছিল, সেখানেও তাকে মাধুকরী করে ভিক্ষা করতে দেখেছি।

গরম জলের ধারা যে স্থানে যেয়ে যমুনা নদীর সঙ্গে মিলেছে, সেই মিলিত স্থানকে **"অসি-সঙ্গম"** বলে। চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য গম্ভীর রম্য। যমুনা নদীর উপরিস্থ বর-ফের উপর দিয়ে চড়াই করে মন্দির হতে প্রায় মাইল খানেক উত্তরে গেলে যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থানে যেয়ে পৌছান যায়। সেখান হতে আবার খাড়া চড়াই করে পাহাড়ে উঠ্তে হয়।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—

যমুনোত্তরী তীর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে ৯৯০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। আমরা খড়শালী হ'তে যে উচ্চ পাহাড়গুলি অতিক্রম করে এসেছি, সেগুলি ১৩।১৪ হাজার ফুটের কম নয়। সে পাহাড়গুলি এত উচ্চে হলেও এখন তাতে বরফ নাই—অথচ যমুনোত্তরী সম্পূর্ণ বরফাচ্ছন্ন। চিরবরফাবৃত প্রদেশের পাদমূলে যমুনোত্তরী তীর্থ বিরাজিত থাকাতেই, যমুনোত্তরীও চিরবরফাবৃত প্রদেশ বলে কথিত। কিন্তু, বৎসরের ৪।৫ মাস প্রায় বরফশূন্য অবস্থায় থাকে।

যমুনোত্তরী—বান্দরপঞ্চ পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত; বান্দরপঞ্চ পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২০৭২০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বান্দরপঞ্চ পর্ব্বতের শিখরারোহণ করা দুঃসাধ্য; তথাপি ঐরূপ বড় পর্ব্বত ভাল করে দেখবার উদ্দেশ্যে, সকালে 'চিদানন্দদা', হরিদাস ভায়া, সারদা ভায়া, বৃন্দাবনের বাবাজী, ও বৃদ্ধ পাণ্ডাটীকে সঙ্গে করে, যমুনোত্তরী হ'তে যমুনা নদীর উপরিস্থিত বরফের উপর দিয়ে ক্রমে চড়াই করতে লাগলাম। পূর্ব্বেই বলেছি, যমুনা নদী বরফাচ্ছন্ন। এই স্থানকেই (যে স্থানে যমুনা দেবীর মন্দির আছে) যমুনোত্তরী বলে, তথাপি এটা কিন্তু যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থান নয়। যমুনার উৎপত্তিস্থান আমাদের দেখবার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় আমরা উপরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

যমুনা নদীর উপরিস্থিত বরফের উপর দিয়ে, ক্রমে চড়াই করে, আধ মাইল যাওয়ার পরই ত্রিধারা দেখতে পেলাম। বরফ যে স্থানে পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে, ঠিক বরফের সেই শেষ স্থান হ'তে পর্ব্বতে আর বরফ নাই, কিন্তু খাড়া, কণ্টকাকীর্ণ ও জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতমালা দিগ্‌দিগন্তপ্রসারিত হয়ে, চারিদিক ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে; উপরে ওঠার কোন সুবিধা নাই,—চারিদিকে ভীষণ কাঁটা এবং খুব খাড়াভাবে অবস্থিত। দুই-চার জন স্থানীয় পাহাড়ী লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে হয় তো উপরে ওঠা যেত; সঙ্গে লোক না থাকায় আর সে চেষ্টা করি নাই।

পর্ব্বতের তিন দিক হ'তে তিনটী ধারা পড়ছে,—

ত্রিধারা মাঝখানের বড় ধারাটির নাম যমুনা-গঙ্গা, দক্ষিণ দিকের ধারার নাম ব্যাস-গঙ্গা ও পশ্চিমদিকের ধারার নাম দেবগঙ্গা। এই তিনটী ধারা যে স্থানে মিলিত হ'য়েছে, সে সঙ্গমস্থলটা দেখতে পেলাম না। বোধ হয়, আমরা যে স্থানে বরফের উপর দাঁড়িয়েছিলাম, সেই স্থানেই বরফের নীচু দিয়ে ধারা তিনটী এসে একত্রে মিশেছে,—পাণ্ডাও তাই বল্‌ল। ভাদ্র মাসে গেলে হয় তো এই ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখা যেতে পারে,—সেও অনিশ্চিত। কারণ সব বৎসর বরফ গলে না,—বরফ না গললে দেখারও উপায় নাই।

বরফে উঠার সময় খুব পা হড়কে যাচ্ছিল, আমরা বরফের উপর দাঁড়িয়েছিলাম। নীচে হতে বরফের ঠাণ্ডা লাগায় পা ঠাণ্ডা হ'য়ে, আড়ষ্ট হয়ে আসছিল, অন্য দিকে আবার উত্তরের বরফাবৃত প্রদেশের অত্যন্ত শীতল হাওয়ায় খুব শীত লাগাতে, অতি শীঘ্র নীচে নামবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম।

বৃদ্ধ পাণ্ডাটি বল্‌লো—বান্দরপঞ্চ-পর্ব্বতের উপরে যে যাত্রীদের নিয়ে উঠেছে, পর্ব্বতের শিখরদেশ সমতল, সেখানে একটি ছোট হ্রদ আছে। সেই হ্রদের পার্শ্বস্থিত চিরতুষারাবৃত একটি পর্ব্বত হ'তে ক্রমশঃ সশব্দে জল বের হচ্ছে। সেই জল ক্রমে হ্রদে জমা হ'য়ে হ্রদটী ভরে গেলে নালা হয়ে নীচে আসে,—সেই নালাই যমুনা নদী।

শীতকালে যমুনা নদী, ধর্ম্মশালা, মন্দিরাদি সমস্তই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। বৈশাখ মাসে বরফ গলতে সুরু হ'লে, যাত্রীগণ যাতায়াত করেন।

আমরা উপরে ঐ ভাবে অধিকক্ষণ দেরী না করে, শীঘ্র নেমে এলাম। নীচে এসেই, গরম জলের কুণ্ডে স্নান করে, বড়মার প্রদত্ত হালুয়া দ্বারা প্রাতর্ভোজন

সমাপনান্তে, তখনই খড়শালীতে ফির্বার জন্য বের হয়ে পড়্লাম।

কাল, যে সব রাস্তা চড়াই করে গেছি, সেগুলি আজ উৎরাই কর্তে হলো, এবং যে রাস্তাগুলি উৎরাই করে গেছি, সে গুলি চড়াই করে আস্তে হয়েছে। এখন আমরা যমুনোত্তরী হ'তে ২০॥০ মাইল নীচে, সিমলী চটী পর্য্যন্ত, যে রাস্তায় এসেছি, সেই রাস্তায় যেয়ে, পরে অন্য রাস্তায় যাব। সিমলী হতে যে রাস্তা আমরা চড়াই করে এসেছি, সেগুলি উৎরাই করে এবং উৎরাই পথগুলি চড়াই করে সিমলী চটী পর্য্যন্ত যেতে হবে।

যমুনোত্তরী হ'তে বের হয়ে পথে একবার বেশ বৃষ্টি পেলাম; একটি বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টির হাত হ'তে রক্ষা পেয়ে, বেলা ১২টার সময় খড়শালী গ্রামে এসে পৌছলাম। বিহারীদাদা আসবার সময় পা হড়্কে পড়ে গিয়ে, কোমরে এমন চোট পেয়েছিলেন, তাতে বাধ্য হয়ে আজ আমাদের এখানেই থাক্তে হল।

খড়শালী
৪ মাইল

যমুনোত্তরীর পাণ্ডাগণ নিরীহ প্রকৃতির গরীব লোক হলেও কিন্তু সুফলের বেলা বেঁকিয়ে বসেছিলেন। আমরা কিন্তু সনাতন প্রথানুযায়ী সুফলের আশা ত্যাগ করতঃ যা' দিবার দিয়ে, রওনা হই। পাণ্ডাগণ অগত্যা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে সুফল দান করেছিলেন।

খড়শালী গ্রামে নানারকম বেতোশাক আপনা আপনিই জমির ও পথের ধারে ধারে হয়েছে দেখ্তে পেয়ে, পাণ্ডার ছেলে-মেয়েদের পয়সা দিয়ে সেগুলি তুলিয়ে এনে, শাকভাজি ও ডাল দ্বারা অর্দ্ধপক্ক অন্নের সহিত দ্বিপ্রহরের ভোজন সমাপ্ত করা গেল।

এখানের মত জিনিষাদির এত চড়া দাম হিমালয়ে আর কোথাও দেখি নাই,—ঘি ৪৲টাকা, চিনি-মিছরী ৩৲টাকা, কেরোসীন ৩৲ টাকা, ডাল ১৷০ আনা, চাউল ১৷০—১॥০ টাকা আটা ৸০ আনা সের হলেও কিন্তু আলু ৴০—৴১০ আনা সের; কারণ এখানে অপর্য্যাপ্ত আলুর চাষ হয়ে থাকে—সবই নৈনিতালী আলু। সমুদয় হিমালয়ের তুলনায় এই স্থানটিতেই জিনিষের দাম সব চেয়ে বেশী,—সে শুধু যাত্রীদের কাছে; তাদের নিজেদের মধ্যে কিন্তু দাম খুব কম।

বিকালে খুব বৃষ্টি হওয়ায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে শয়নে পদ্মলাভ করায়, আজ ৬'পয়সার ছোলাভাজা দিয়ে, জঠরানলের আহুতি প্রদান করতঃ, রাত কাটাতে হ'ল। হিমাচলে প্রবেশ করে আজই প্রথম ছোলাভাজার স্বাদ নেওয়া গেল। ছোলা-ভাজাও ১৲ টাকা সের।

আমরা আজ এখান হ'তে রওনা হয়ে হনুমান চটীতে বা রাণাগাঁও চটীতে যেয়ে থাকব স্থির করেছিলাম। সেই জন্য বৃন্দাবনের মাতাজীগণ যমুনোত্তরী থেকে ফিরে, এখানে আর পাক না করে, হনুমান চটীতে চলে যায়। পরে বিহারীদাদা অসুস্থ হওয়ায় আমরা যেতে পারি নাই। কাজেই, বৃদ্ধা মাতাজীগণের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আজ বাবা কালীকম্বলীবালার ১টা সদাব্রতে আটা আধসের, আলু একপোয়া, ঘি, লংকা লবণ পাওয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

—:*:—

তুমি ভাবছ, শত্রু তোমার বাইরে বাইরে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে— তাই কথায় কথায় কেবল পারিপার্শ্বিকের দোষ দিচ্ছ, আসলে কিন্তু ব্যাপার তা নয়!—ঘরের ইঁদুরেই তোমার ভিতরের বেড়া কাটছে! তাই তো বলছি—"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

আত্মা তোমার শত্রু নন, তুমিই তাকে শত্রু করে তুলেছ! কামনার দুর্নিবার আকর্ষণে যে তুমি অন্যায় আচরণ করছ, আত্মা তো তা চান না। কাজেই ভেবে দেখ তো, তুমিই তোমার আত্মার নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করছ কিনা?

যে মন তোমায় অশুভ কার্য্যে লিপ্ত করছে—সেই মনই তো তোমায় ধর্ম্মকার্য্যেও লিপ্ত করে। কাজেই ইচ্ছা করলে স্বর্গেও তুমি যেতে পার—আবার নরকেও তোমার স্থান হতে পারে। এখন তোমার যা খুসী! অর্থাৎ তোমার সংস্কার—তোমার ইচ্ছা তোমাকে যে দিকে টেনে নিয়ে যায়! কিন্তু তবু বলে রাখি,—তুমি কিন্তু ইচ্ছা করলে ভাল হতে পার!

কথাটা একবার মনের সঙ্গে বুঝেই দেখ না! ইচ্ছা করে যেখানে বাদ সাধতে যাও, সেখানে নিশ্চয়ই তোমার আক্রোশ আছে, অন্যায় বলের উত্তেজনা আছে; কাজেই পরিণামে অমঙ্গল তার অবশ্যম্ভাবী! এখন হয়ত কথাটা ভাল করে বুঝতে পারছ না—আর এখনই বুঝে ফেল, অমন তাগিদা আমারও নাই। কিন্তু শান্ত মনে একবার বিচার করে দেখো!

অন্যায় করে ফেলেছি, তখন মনে ছিল না—ইত্যাদি তো অসাবধানীর কথা। এই বলেই কি তুমি সাফা হয়ে গেলে? এ তো তোমার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য—এ দুর্ব্বলতা পরিহার করতে হবে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!

গীতায় আর একটী সুন্দর শ্লোক আছে—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

কাম-ক্রোধজনিত বেগ যিনি সহ্য করতে সক্ষম, তিনিই যুক্ত, তিনিই যোগী। এই সহ্য-গুণটাই আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। আর মানুষ পশু থেকে পৃথক্ হয়ে গেল তো শুধু সহ্য করার, ত্যাগ করার গুণ থাকাতেই। পশুর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই—যখন যে প্রবৃত্তি জেগে উঠছে, নির্ব্বিচারে তার ইন্ধন জুগিয়ে চলছে। তাদের মাঝে তো আত্মা জাগ্রত নন—তাই ইচ্ছার জোরে বেগকে প্রতিরোধ করবার সামর্থ্যও তাদের নাই। কিন্তু মানুষ আত্মবলে তা পারে।

ক্ষিদে পেলেই খেতে হবে—এ হল অসংযমীর কথা। তারা তৃপ্তি চায় না—কতকগুলি খোরাক চায়। মানুষও পশু হয়ে পড়ে—যখন তার মাঝে এই সংযমটুকু না থাকে!

অনেক সময় দুঃসহ বেগ আসে, কিন্তু একটু সহ্য করে মোড় ফিরিয়ে দিতে পারলে দেখতে পাই—যে শক্তি আমায় অধোদিকে নিয়ে চলছিল, সেই শক্তিই আবার ওপর দিকে তর্ তর্ করে নিয়ে চলেছে!

ছোট্ট ছেলেদের দিয়েই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। হয়ত একটী ছেলে একটা জিনিষের দরুণ কেঁদে আকুল, কিছুতেই আর তাকে মানানো যাচ্ছে না। অমনি

মা এসে বল্লে, আচ্ছা, তুই যদি আর না কাঁদিস্, তাহলে আমি এই এক্ষুণি তোকে সে জিনিষটা এনে দেব। ছেলের মন—মায়ের কথায় অমনি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মা কতকক্ষণ পরে এসে হয়ত দেখেন, ছেলেটী তার অন্য সাথীর সঙ্গে এক খেলায় মেতে গিয়েছে। আর তার সে কথা মনেই নাই। ইন্দ্রিয়ের বেলাও কথাটা খাটে—হয়ত তারা তোমার কাছে এসে কান্না জুড়ে দিল, কিছুতেই আর তাদের দাবিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছ না। বেশ!—তাদের একটু আশ্বাস দাও। তারপর ভিতরে ভিতরে মনটাকে গুটিয়ে এনে তোমার আয়ত্ত করে ফেল। দেখ্‌বে, তারপর আর উৎপাতের সাড়া-শব্দই নাই। তারা যা চায়—তা পেলে তাদের ভিতরকার লালসা-বহ্নি আরও লক্ লক্ করে ওঠে। যে একগুঁয়ে ছেলে মায়ের কাছে এখন একটা অন্যায় আব্দার কর্‌ছে, পরমুহূর্ত্তে সে-ই আবার শান্ত-শিষ্ট ছেলের মত হয়ে যায়। কাজেই ভাল-মন্দ দুটা অবস্থাই আছে!

সত্ত্বগুণে বেদান্তের দ্রষ্টৃত্বও সহজে আয়ত্ত হয়ে পড়ে। তখন সবার আবেদনই শুন্‌ছি—কিন্তু কিছুতেই আমায় টলাতে পারছে না। সুখ আস্‌ছে, দুঃখ আস্‌ছে, উত্তেজনা আস্‌ছে, উদ্দীপনা আস্‌ছে—সবই দেখ্‌ছি। এই নির্লিপ্ত অবস্থাটাই আমাদের সাধনা করে পেতে হবে!

তাহলে শেষ পর্য্যন্ত এই মীমাংসা পেলে, সংযম চাই। ইংরেজীতেও একটা কথা আছে—Strike but hear. দৈনন্দিন জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের এ কথাটী স্মরণ রাখা উচিত। তাহলে কিন্তু অনেক অনিবার্য্য পতন থেকে আমাদের নিষ্কৃতি হয়।

অনেকে বলে, ইন্দ্রিয়-সংযম কি সহজ কথা? কিন্তু আমি বলি, সহজ নয় বলেই কি আরও বেশী করে তা ভাসিয়ে দিতে হবে? যার যতটুকু সংযম-শক্তি, তাই কাজে লাগাও না!

অমনি কিছু হয় না বলেই—সাধনা চাই। এক-নয়, দু'বার নয়—তিন বারের সময় নিশ্চয় কৃতকার্য্য হতে পারা যাবে। অনেকে স্বকৃত অন্যায় আচরণের অনুশোচনা করে বলে—আহা, আগে যদি আমায় কেউ এ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌ত! তাহলেই বুঝা যায়, সে যখন কু-অভিপ্রায়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তখনও তার অপর একটা শুভ ইচ্ছা জাগ্রত ছিল। শত্রুর প্রতাপ বেশী ছিল বলেই সে তখন তাদের কাছেই জব্দ হয়ে পড়েছিল।

ক্ষণিক উত্তেজনায় বিচার করো না—তোমার অন্তর কিসের জন্য লালায়িত, সেটাই একবার ভেবে দেখ। তুমি যা চাও না—তাই বেশী করে চাও বলেই তোমার ভিতর এত জ্বালা। কথাটা শুন্‌তে হেঁয়ালীর মতই হল, কিন্তু একবার ভেবে দেখো, এর মাঝে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা!

"বেশ আছি!"

"বেশ তো আছি"—এই কথা বলিলেই শেষ হইল না; প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও যদি বেশ থাকিতে পার, তাহা হইলেই বুঝিব, তোমার বেশ থাকাটা খাটী—আপেক্ষিক নয়। সকল অবস্থাতেই যিনি সদা-সন্তুষ্টমানসঃ, তিনিই একমাত্র বলিতে পারেন—"বেশ তো আছি!" তোমার মনে হইবে "বেশ আছি"—এ তো নূতন কথা নয়;—ভোগীও ভোগের প্রমত্ততায় মনে করে, বেশ তো মজা লাগিতেছে—এর চেয়ে আর জগতে সুখ কিসের? কিন্তু প্রবৃত্তির উপকরণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও কি ভোগী তখন বলে, "বেশ তো আনন্দে দিন কাটিতেছে আমার?" এই যে আমরা এক এক অবস্থায় এসে ঠেকিয়া মনে করিতেছি, এই তো পরম সুখ—এইখানেই তো চরম—ইহাকেই শাস্ত্রে "অভিনিবেশত্ব" বলা হয় নাই কি? সাংখ্যকার কপিল দেব আমাদের পরম বন্ধু—তিনিই আসিয়া আমাদের অভিনিবেশত্বের মাঝে প্রথম ঘা দিলেন, বলিলেন "ওগো! তোমরা যাহাকে সুখ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছ, তাহাতে যে সুখ নাই—ইহাতেও যে পরিণামে দুঃখ! অতএব তোমাদের মাঝে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া উঠুক—তোমরা পরম শান্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই সোয়াস্তি মনে করিও না।"

কাজেই প্রথমেই আমাদের নিজের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে হইবে—আমাদের পরিণাম কতদূর পর্য্যন্ত, বেশ ধৈর্য্যশীল চিত্তে তাহা দেখিতে হইবে। আর এক কথা, ভিতরে বৈরাগ্যের জ্বালা উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে হইবে—যাহাকে এখন ভাল লাগিতেছে, তাহাকে ছাড়িয়াও চিত্তে প্রশান্তি থাকে কিনা, তাহাই পরীক্ষা করিতে হইবে। আমরা অহরহঃ দুঃখ পাইতেছি; কিন্তু ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এক অভিনিবেশত্ব ছাড়া আর কিছুই পাইব না। কাজেই তোমার ভিতর যদি অস্বস্তি আসিয়া থাকে—সব কিছুকেই নির্ব্বিচারে ভাল না লাগে, তাহা হইলে নিরাশ হইও না—এই জ্বালাই তোমাকে সত্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। এই জ্বালা এই দুঃখবোধ যাহাদের ভিতর জাগিয়াছে, তাহারা পরম ভাগ্যবান্।

একদিন মহারাজ শাক্যসিংহের ভিতরেও এই অতৃপ্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, ভোগে সুখ নাই—তাই সকল ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিলেন। নচিকেতাকেও যম কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মনের অনির্ব্বাণ সত্য-পিপাসা নিবৃত্তি হইল না; সে বজ্রদৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।"

এই যে প্রথমেই নিজের অবস্থার প্রতি একটা ধিক্কার আসে মানুষের, ইহা কিন্তু বড় একটা শুভ লক্ষণ! ইহাতেই ক্রমশঃ আকাঙ্ক্ষা উন্নত এবং প্রবল হইতে থাকে। তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? এই যে প্রবৃত্তির পথে, ঘোর তামসিকতায় ডুবিয়া একাকার হইয়া বলিতেছি, "বেশ তো আছি"—তাহা কিন্তু ঘোর মূঢ়তার লক্ষণ! যে দীপ্তিটুকু দেখিতে পাইতেছি, ইহা কিন্তু উগ্র কামনার রক্তিম আভা, আবার কিছুক্ষণ পরেই ভোগীর হৃদয় অতৃপ্তির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইবে। কাজেই এই ক্ষণিক উত্তেজনায় বড় ভরসা নাই।

প্রথমেই মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়া নিবে। আচ্ছা, তুমি যে বলিতেছ—বেশ, আমি একবার পরখ করিয়াই দেখি না! যদি পরখ করিয়া বোঝ, ইহা তোমার সত্যিকার অনুভূতির কথা—বাস্তবিকই তুমি বেশ আছ এবং থাকিবে, তাহা হইলে বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে থাক। কিন্তু সাবধান, ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়! একটু-খানি ব্যতিক্রম হইলেই যদি তোমার সব পণ্ড হইয়া যায়, তাহা হইলে কিন্তু বুঝিব, পরখ তুমি ভাল করিয়া কর নাই।

তোমার জীবনের তাৎপর্য্য তোমাকে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে। কাজেই অসংখ্য প্রশ্ন উঠিবে তোমার মনে—প্রতি পদে পদে সন্দেহ জাগিবে; তারপর সব অসত্যের এলাকা হইতে তোমার মুক্তি। কে কাহার প্রভুত্ব সহজে ছাড়িতে চায় বল দেখি! মুক্তি দেওয়াও যেমন প্রকৃতির কাজ—আবার তেমনি বদ্ধ করিয়া রাখাও প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় লীলা-রহস্য। প্রত্যেকের প্রত্যেকের প্রতি মোহ রহিয়াছে—ইহাকে কিন্তু ঠিক ভালবাসা বলে না, অথচ আমাদের দৈনন্দিন-জীবনে এই ভালবাসারই অভিনয় চলিতেছে। স্বামী-স্ত্রীর আসল ভালবাসা হইবে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রীর মতন। কেউ কাহাকেও দেহের প্রয়োজনে আটক করিয়া রাখিতে চাহিবে না। এই যে দেহাতীত বিরাট্ আত্মার অনুভব, ইহাই হইল, প্রকৃত ভাল-বাসা। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী দুই জনের ভিতরই এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রব্রজ্যা-গ্রহণকালে বিষয়-আশয় দুই পত্নীর মাঝে বণ্টন করিয়া দিতে যান—তখন মৈত্রিয়ী বলিয়া-ছিলেন—"এই ধন দিয়া আমি কি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? যদি না পারি, তাহা হইলে এই ধন আমার লাগে না—আমি যাহাতে অম-রত্বের সন্ধান পাই, তাহাই আমাকে বলুন।" ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির উপর্যুক্ত পত্নীর কথাই বটে!

আমি বলি না, এই মুহূর্ত্তেই তুমি সব ছাড়িয়া পরম বৈরাগী সাজিয়া বস। বেশ তো, ভোগ করিয়াই দেখ না—ভোগে কি সুখ? ভিতরে যেন সর্ব্বদা বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত থাকে—তাহা না হইলে ভাল-মন্দের তফাৎ তো তুমি বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। ভোগে সুখ নাই, ইহা তো ভোগ করিয়া যাহারা দেখিয়াছে—তাহাদেরই কথা। বিশ্বাস না হয় ক্ষতি কি? নিজেই পরখ করিয়া দেখ না! কিন্তু বেশ লাগাতে যদি তোমার বিচার রহিত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ। এই জায়গায় তোমার হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে!

আর অতৃপ্ত বেদনা যে না জাগিয়া পারে না—বিরাট-বিক্রমশালী কেশরীর মত তুমি, কামনার খাঁচায় নিজকে পুরিয়া রাখিয়াছ! তোমার ভিতর এই বন্ধন ঘুচাইবার একটা সচেষ্ট আকুলতা তো আপনি ভিতর হইতে জাগিবে। যদি না জাগে, তাহা হইলে বুঝিব তুমি মৃত—তোমার হৃদয় নাই। তোমার স্বভাবই যে ব্যাপ্তি, ছড়াইয়া পড়া, তুমি তো এতটুকু দেহেই কেবল আবদ্ধ থাকিতে পার না। এই বেদনা, এই দুঃখ তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্যই! কাজেই দুঃখকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেছ কেন?—সেও যে তোমার পরম বন্ধু!

স্বরূপ-উপলব্ধির প্রথম সূচনাই তোমার অন্তরের অসীম ব্যাকুলতা। তোমার সব আছে অথচ কিছুই নাই, সব পাইয়াছ অথচ কি যেন পাও নাই—এই রকম একটা অবস্থা সর্ব্বদা তোমায় বিহ্বল করে রাখিবে। জীবনের বিস্তার তখন বহির্মুখী না হইয়া অন্তর্মুখী হইবে। যাহা পাই-য়াছ, তাহার তুলনায় যাহা পাও নাই, তাহারই আকর্ষণ হইবে বেশী। কাজেই অন্তর্বেদনা—অন্তঃ-স্ফূর্ত্তি সমভাবে তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া

থাকিবে। তুমি কাঙ্গাল বটে, কিন্তু সামান্য ধনে তৃপ্তি নাই তোমার!

তুমি বলিবে, দুঃখ করিয়া কি লাভ—স্বেচ্ছায় ভিতরে অভাব-বোধ জাগাইয়া তোলার কি প্রয়োজন? বেশ ভালই তো, বৈদান্তিকের মত আজন্ম-আনন্দের আস্বাদন করিয়া যাইতে চাও! কিন্তু বৈদান্তিকের কোন কিছুতেই মোহ নাই—তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়া সে দুঃখকেও পরম-সুখে রূপান্তরিত করিতে জানে। ভাল-মন্দ সব তার কাছে সমান। কোন কিছুতে বাছ-বিচারও নাই, —আবার বিশেষ করিয়া কোন কিছুতে রুচিও নাই! বিবিক্ত না হইয়া নিজের আত্মোপলব্ধি করিতে পার—ইহাই তো সব চেয়ে ভাল। প্রভেদটা যাহার কাছে সহজেই ধরা পড়ে, তাহাকে তো আর প্রভেদ করিয়া দেখাইতে হয় না। বৈদান্তিক জানে, আমি সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াও—"অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"। এই আজন্মসিদ্ধ ভাব হইতে কেহই তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। বৈদান্তিকের ভয় নাই—সে সকলের দরুণ দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে পারে। তাহার বুকে অসীম বল! কিন্তু তোমার হৃদয়ে কি এই অভেদ-মহিমা জাগিয়াছে?

তোমার এই জীবন দিয়াই তুমি আরও কত উন্নত-স্তরের আনন্দ পাইতে পার—দরদী তো এইজন্যই বার বার তোমায় সতর্ক করিতে আসেন। তুচ্ছ সুখে তুমি অচেতন হইয়া আছ—বিপুল আনন্দের আস্বাদন এখনও পাও নাই, কাজেই একটুখানি চেতনা ফিরিয়া আসিলেই যে তোমার কত মঙ্গল! স্বভাবতঃই যদি তোমার সংজ্ঞা ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে তো আঘাত করিয়াই তোমাকে জাগাইতে হইবে। কিন্তু এ কথা জানিও, এই দুঃখ কিম্বা আঘাতই চরম নয় —আঘাতে তোমার জড়তা তন্দ্রা দূরীভূত হইয়া গেলে দেখিতে পাইবে, তোমার অন্তর-রাজ্য নূতন আলোকে উদ্ভাসিত। তখন যে তোমার নব-জন্ম।

যাহা পাইয়াছ, তাহাকে শোধন করিয়া লওয়া-টাকেই আমি নব-জন্ম বলিতেছি! ভিতরে যদি তোমার কোন মালিন্য না থাকে, তাহা হইলে তো দ্রুতই তুমি অগ্রসর হইয়া যাইবে; আর যদি মালিন্য থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে দুঃখে-আবেগে-আকুলতায় চোখের জলে সব সাফা করিতে হইবে। অন্তরের পবিত্রতার দরুণই এই সাধনা-টুকু—তারপর তো আপনা হইতেই তাঁহার করুণায় তোমার নির্ম্মল চিত্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিবে। সত্যের তাপে নিজকে তপ্ত করিয়া সমস্ত কামনার আহুতি দাও তাহাতে। তখন দেখিতে পাইবে, কি করিয়া নব জন্ম লাভ হয়—এই রক্ত মাংসবিশিষ্ট স্থূল দেহ-ধারী মানুষটাই কি করিয়া ভাগবত-দেহ পায়!

অচেতন হইয়া থাকার চেয়ে আমি যদি এ জন্মে সত্য লাভ না করিয়াও যাইতে পারি কিন্তু একটা উচ্চ-সংস্কার নিয়া দেহত্যাগ করিতে পারি, তাহাতেও আমার পরম লাভ। আঘাত দিয়া, দুঃখ দিয়া যে ভাবেই হউক, নিজকে জাগাইয়া তোলাই প্রয়োজন। তুমি ঘুমাইয়া আছ বলিয়াই না তোমাকে জাগাইতে যাওয়া! রাগ করিও না—বিরক্ত হইও না—যাহারা জাগাইতে আসে, তাহারা যে তোমার পরম বন্ধু! সহজ কথায় জবাব পাইলে—কে কাহাকে বিরক্ত করিতে যায় বল!

সংশয় ভিতর হইতেই জাগিবে—আবার তাহার সমাধানও হইবে ভিতর হইতে। তোমার তাহাতে ক্ষতি কি? বরঞ্চ তুমি কোন্‌টা খাঁটী, কোন্‌টা অখাঁটী, তাহা পরখ করিয়া নিবার সুযোগ পাইলে। এই সুবর্ণ-সুযোগ কি স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করিতে

আছে? সরল-বিশ্বাসে খুব সহজে সবই মানিয়া নেওয়াতে একটা সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানতা বলিয়া প্রমাণ পায়, যখন দেখি—ক্রমশঃ আমাদের বুদ্ধি ভোঁতা হইয়া আসে, ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতাই লোপ পায়। তখন যে আশঙ্কা আরও বেশী—মন্দের যখন ক্রিয়া হয় তখনও বলি, "বেশ আছি", আর ভালোর ক্রিয়াতে তো ভাল আছিই। এই অচেতন অবস্থাটাই কি তোমার কাম্য?

বেশ আছি, তুমি কখন বলিতে পার? গীতার ভাষায় বলিতে গেলে যখন তোমার এই অবস্থা আসে—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

তুমি ভাবিও না, এখন যে অজ্ঞানরূপ সুখের ডিমে তা দিতেছ, এই রকম করিয়াই তোমার দিন অতিবাহিত হইবে। তোমার সাধ্য কি তুমি অজ্ঞানে পড়িয়া থাকিতে পার।—কিন্তু নিজেই যদি নিজের অজ্ঞানতা বুঝিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টায় যত্নবান্ হও,—তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ সহজেই হয়। একদিন তো সকলেরই মুক্তি হইবে —কিন্তু তুমি যে এই মুহূর্ত্তে আত্ম-বলে শ্রীগুরু-কৃপায় মুক্ত হইতে পার!

"বেশ আছি"—ইহা কিন্তু সর্ব্বনাশা ভাব তোমার! এই অভিনিবেশত্বকে অতিক্রম করিতেই হইবে।

অন্তরতর

জ্যোৎস্না-প্লাবিত নিঝুম নিশীথে স্তব্ধ কাহার বাণী—
ধেয়ানে মগন বিশ্ব গগন কার তরে না জানি!
কাহার অমন স্নিগ্ধ হাসি, মধুর আকর্ষণ?—
দূরে আছি, তবুও জানি কেন টানে মন!
কোন্ অজানা সুহৃদ্ আমার আড়াল থেকে ডাকে—
আলোর মায়ায় ভুল্‌তে আমি পারি না যে তাকে!

—:(*):—

অন্বীক্ষা

—):*:(—

হৃদয়ের আকস্মিক অলৌকিক উন্মেষে, ভক্তির ব্যাকুলতায়, বিশ্বাসের অটল স্থৈর্য্যে আমরা যাহা পাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দার্শনিকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নয় অর্থাৎ ইহাতেই তাহার আভ্যন্তরীণ সত্য-লাভের দরুণ সংশয় কিম্বা অনুসন্ধিৎসা বিরত হয় না। দার্শনিকের সূক্ষ্মবুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া কূল পাইবে কিনা জানি না, কিন্তু আলোকের ক্ষণিক উন্মেষে যে তাহাকে স্তব্ধ অভিভূত করিতে পারে না—ইহা তাহার কম আশ্চর্য্য শক্তি নয়!

প্রত্যক্ষ না দেখিয়া, যুক্তির আগুনে পরখ না করিয়া কোন কথাই মানিব না—ইহা নির্ভীক সত্যান্বেষী সাধকেরই কথা। বুদ্ধদেবকে আমাদের এত ভাল লাগে, তাহার প্রধান কারণই তাঁহার ভিতর প্রবল আত্ম-শক্তির পরিচয় পাই। তিনি কাহারও কথায় ভুলিলেন না, শাস্ত্র-বাক্যেও তাহার ভিতর শান্তি দিতে পারিল না। এক বৃক্ষমূলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন—"আমি নিজ জীবনে সত্যকে পরখ করিয়া লইব, তবে ছাড়িব।" শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আত্ম-বলেরই জয় হইল! কাজেই "সহসা একদা আপনা হইতে" এই কথায় যেমন একদল কৃপাবাদী সহজেই পরিতুষ্ট হইয়া পড়ে, তেমনি আর এক দল আছে যাহারা বলে, "সহসা কেন, যে তত্ত্বজ্ঞান অকস্মাৎ আমাদের ভিতর উদ্দীপ্ত হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে কি আমরা একটা শৃঙ্খলা পাইব না?" এই শৃঙ্খলা আবিষ্কারের দরুণই অন্বীক্ষা—এক কথায় যাহাকে দর্শন-শাস্ত্রের প্রাণ বলা যাইতে পারে! চরম সত্যকে বাক্য দ্বারা পাওয়া যায় না, মন দ্বারা পাওয়া যায় না, সকলেই তো কেবল "যায় না, যায় নাই" বলেন, কিন্তু মন-বুদ্ধি দিয়া কি পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে কি কাহারও নিষেধ আছে? অকস্মাৎ বন্যার প্লাবনে ঘর-বাড়ী ভাসাইয়া নিয়া যাইবে—এই ভয়ে কি মানুষ বুদ্ধি খাটাইয়া ঘর বাড়ী তৈয়ার করে না? উপনিষদের ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত হইতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ বুদ্ধি আছে, আকস্মিক প্লাবনে যতক্ষণ ভাসিয়া না যাই, ততক্ষণ বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখিতে আপত্তি কি?

একদল বলে, তোমার প্রয়োজন থাকে, তোমার অবিশ্বাস হয়, সাত-ঘাটের জল খাইয়া আস; আর একদল বলে, কাজ নাই আমার এত সরল বিশ্বাসে, সত্য যদি নিরপেক্ষই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও সত্যলাভ হইতে বঞ্চিত হইব না—কিন্তু আমি পরের মুখে ঝাল খাইতে চাই না! কথাটাকে ক্রমশঃই জটিল করিয়া লাভ নাই, কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যাহার ভিতর অন্বীক্ষা প্রবল, তাহার ভাগ্যে সত্যের ভেজাল কোনদিনও পড়ে না। সত্যলাভই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, বিচারের পথে চলিলেও বোধহয় তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ ইহাতে মন-বুদ্ধি মার্জ্জিতই হয়। আত্মানন্দে যে আত্ম-দর্শন, তাহার অবশ্য তুলনা নাই—আর উপনিষদ্ এই অহৈতুক আনন্দকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু এই সহজ আনন্দ লাভ কয়জনার ভাগ্যে ঘটে, তাহাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বৃন্দাবনের লীলা সহজ-লীলা বটে; কিন্তু এই লীলাকে ফুটাইয়া তুলিতে কত সাধ্য-সাধনা করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। উপনিষদের কথা, বৈষ্ণবের কথা, একদিক্ দিয়া বলিতে গেলে চরম—কিন্তু বৃন্দাবন-লীলা বা উপনিষদের অহৈতুক

আনন্দ আধারশুদ্ধি না হইলে উপলব্ধি করিতে যাওয়া বৃথা। বাছ-বিচার না করিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেমন হরিনাম বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন—ইহা একদিকে যেমন প্রভূত শক্তির পরিচয়—তেমনি শক্তির অপব্যয়ও! শুদ্ধ আধারে ভাগবত-আনন্দের ঢেউ স্থায়ী হয়—তাহা না হইলে ক্ষণিক উত্তেজনার মত পরক্ষণেই চিত্তে অবসাদ আনে।

কেহ বলিয়া থাকে, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবৎকৃপা আপনি লাভ হয়, আবার কেহ বলে, ভগবৎকৃপা লাভ হইলে চিত্ত আপনি শুদ্ধ হয়। আত্মবলে বিশ্বাসবান্ এবং কৃপাবাদী দুই ধরণের লোকই আছে। দর্শন মননশাস্ত্র, এবং উপনিষদ্ অনুভবের শাস্ত্র। প্রথম হইতেই এই দুইটী ধারা চলিয়া আসিয়াছে। দুইটী ধারাই যখন সমান গতিতে চলে, তখন আর কোন দিকেই খুঁৎ থাকে না। নচিকেতার চরিত্র এই স্থলে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাহার প্রাণে যেমন সরল বিশ্বাস ছিল, তেমনি, আবার অপ্রমত্ত জিজ্ঞাসাতেও পরিপূর্ণ ছিল। অন্বীক্ষা এবং অধ্যাত্মবিদ্যা সমানভাবে চলিলে হৃদয়ে কোন দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের এখন অন্বীক্ষা নাই বলিতে হইবে—অথচ অনুভবের দিকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক বড় বড় দার্শনিক সিদ্ধান্ত আমাদের অনুভবের মাঝে আমরা পাই—কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারি না বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। এই ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্বীক্ষা-মূলক জ্ঞানান্বেষণ আমাদের আদর্শ হইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য তো উপনিষদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, বাক্যের বাক্য, মনেরও মন রূপ অদ্বৈত ব্রহ্মেরই উপাসক ছিলেন, তাঁহাকে বাক্যদ্বারা পাওয়া যায় না জানিয়াও তো ভাষ্যে-টীকায় তিনি কম বাক্য ব্যয় করেন নাই। অনিশ্চিত, অনির্দ্দেশ্য, যাঁহার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে যে কেহই একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনিই পূজ্য। চরম সত্যে সকলেই উপনীত হইতে পারে না—কিন্তু সত্যলাভ করিবার একটা উপায় পাইলে অন্ততঃ সকলের ভিতরই সত্যলাভের একটা চেষ্টা জাগে। পথ আবিষ্কারের দরুণ যদি ভিতরে একটা চেষ্টা না জাগে, তাহা হইলে পথ আবিষ্কার হইবে কি করিয়া! নিজের জীবনে সত্য উপলব্ধি করিয়া যাওয়া যেমন আমাদের কর্ত্তব্য, তেমনি সত্যলাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যাওয়াটাও অন্য দিকের কর্ত্তব্য। ভিতরে যদি অন্বীক্ষা না থাকে, তাহা হইলে তো এই বিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা জাগ্রতই হইবে না। শাস্ত্রে অনেক কথাই লিখা রহিয়াছে—কিন্তু তাহা নিজের জীবনের সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া কয়জনই বা দেখিয়াছে।

বুদ্ধদেবকে পুনর্জ্জন্ম আছে কি নাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"ইহাস্তি নাস্তীতি য এব সংশয়ঃ পরস্য বাক্যৈর্নামমাত্র নিশ্চয়ঃ। অবেত্য তত্ত্বং তপসা শমেন বা স্বয়ং গ্রহীষ্যামি যদত্র নিশ্চিতম্।" সন্দেহ মিটাইবার জন্য আমি কাহারো কথায় বিশ্বাস করিতে চাই না, তপস্যা ও আত্মসংযম অবলম্বন করিয়া আমি নিজেই তাহার সন্ধান করিয়া লইব! বুদ্ধদেব যে সত্যলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপনিষদের সত্যের চেয়ে ছোট কি বড় সেই আলোচনা করিতে যাওয়া বৃথা—কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমরা সত্যলাভের একটা বিশিষ্ট উপায় জানিতে পারিয়াছি, এই জন্যই তিনি আমাদের নিকট পূজ্য। আগমের দোহাই না দিয়া পরীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা আমরা সত্যলাভের অনেক উপায় আবিষ্কার করিতে পারি। কিন্তু মূলে অন্বীক্ষা প্রবৃত্তি থাকা চাই!

আত্মার তৃপ্তি, বুদ্ধির তৃপ্তি, দুইটা দিকই রহিয়াছে। বুদ্ধির তৃপ্তি কেবল অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারাই হয় না—সে অনেক কিছু জানিতে চায়, যুক্তির সহিত, প্রমাণের সহিত।

শাস্ত্রে কিম্বা আগমে যাহা বলিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার নামই তো অন্বীক্ষা। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তো আর সেই মতকে অস্বীকার করা হইল না। ক্ষণিকের দরুণ একটা সত্যের আভাস পাইয়া লাফাইয়া উঠাতে কোন কিছুই লাভ নাই। এই লাফানোর পর নিশ্চয়ই অবসাদ আসিবে। কিন্তু সত্যলাভ হইলে চিত্তে সর্ব্বদা একটা প্রশান্তির ভাব থাকিবেই। দার্শনিক অন্তর হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া এই প্রশ্নই তুলিয়াছে! এই অনুসন্ধিৎসার ফলেই তাহার গলদ আপনিই ধরা পড়িয়াছে। ভূয়ো-দর্শনেরও ব্যতিক্রম ঘটে—কিন্তু তাহা সচরাচর নহে। রামকৃষ্ণদেব নাকি সাদা জবা গাছে লাল জবা ফুটিতে দেখিয়াছিলেন!

পাতঞ্জল-দর্শনে একটা কথা আছে—"বুদ্ধি-সত্বের আবরণ না থাকিলে জ্ঞানের বা বুদ্ধির আলোক অনন্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যায়, আর জ্ঞান অনন্ত হইয়া পড়ে। কাজেই দেখা গেল, কোন বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতে—সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আমার মাঝে স্পষ্ট সংশয় আছে দেখিতে পাইতেছি—তবু আমি বলিব কি করিয়া যে হাঁ, তুমি যা হা বলিয়াছ—তাহাই ঠিক। সত্য লাভ করিতে যদি তোষামোদীরই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এমন সত্যে আমাদের কি প্রয়োজন?

সংশয় করিলেই যদি আমার মন হইতে সত্য উড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে এমন সত্য লাভ-অলাভ সমান। এক কথায় বলিতে গেলে এই আন্বীক্ষিকী-ন্যায়ই মানুষের ভিতর আত্ম-চেষ্টাকে জাগ্রত করিয়াছে। ন্যায়কে যে বলা হইয়াছে প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্—ইহা বাস্তবিকই ঠিক। কত ভুল ধারণা, কত ভ্রান্ত-সত্যের গর্ব্বে আমরা মূঢ়—কিন্তু ন্যায় আমাদের সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিয়াছে। সত্য-লাভ করিয়াও যদি সত্যকে জীবনে ফুটাইয়া না তুলিতে পারি, তাহা হইলে এমন সত্যলাভ দ্বারা যে কি উপকার হয়, তাহা বুঝি না। যাহা নিব, তাহা বাজাইয়াই নিব।

—:*:*:*:—

নেতি

—*—

শ্রীশঙ্কর জগৎকে 'মায়া' বলে উড়িয়ে দেন নি কোথাও—তাঁর "জগৎ মিথ্যা" বল্‌বার তাৎপর্য্য আছে। এ হতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা (synthetic idea) পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম 'অন্তঃ' নন, 'বহিঃ' নন, 'তৈজস' নন! অর্থাৎ কি তিনি? না এসবকে নিয়েও এদের ছাড়িয়েও তিনি! সমস্ত নেতির সঙ্গে সঙ্গেই থেকে যাচ্ছে পূর্ণাস্বাদ! 'নেতি' বল্‌লেই যে উড়িয়ে দেওয়া হয়, এটা ভুল ধারণা। 'নেতি' বল্‌তে বল্‌তেই মন পূর্ণ হয়ে ওঠে—নিজকে লোপ করে দিতে পার্‌লেই নিজকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া হয়।—সমস্ত নেতি, সমস্ত ত্যাগ, সমস্ত ইহ-তুচ্ছতার মূলেই এমনি-তর একটা রহস্য জীবনের অধ্যাত্ম-ভাণ্ডারে আছে।

নেতি = ন + ইতি। 'ইতি' বল্‌তে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির

সঙ্কীর্ণ ধারণা বোঝাচ্ছে। কালদ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন যে অনুভূতি, দেশদ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে ব্যাপ্তি, নিমিত্ত দ্বারা খণ্ডিত যে আনন্দ—নেতি দ্বারা এদের মায়া টুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই চিরমুক্ত "তৎ" স্বরূপকে পাবার জন্যই "ন ইতি"—তুমি এইটুকুই নও, আরো অনন্ত, অনন্ত হয়ে আছ!

ইতি বল্‌তে বুদ্ধির পর্য্যাপ্তি; সুতরাং নেতির পর যা রৈল, তাকে কল্পনা বল্লেই বা ঠেকায় কে? এ সংশয় হয় বটে!

এইখানেই বুদ্ধির পরও অনুভূতির কথা আসে। আমি যা বুঝে রেখেছি বা বুঝে ফেলেছি, তাই যদি আমার সব হত, তবে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যেতো। অনুভূতি কোথা থেকে আসে, কি নিয়ে আসে, কেমন করে আসে—তা কেউ জানে না। এই কেউ জানেনার রাজ্যে মনকে হারিয়ে ফেলাই নেতি করার উদ্দেশ্য। আর সে রাজ্য যে কল্পনা হয়েও কল্পনামাত্রই নয়, রসিক-হৃদয় তার একনিষ্ঠ সাক্ষী।

তবে হ্যাঁ, এক হিসাবে কল্পনা বল্‌তেও পারি। আবার যদি বলি, কল্পনা নয়, সেকথাও মিথ্যা নয়। সে কল্পনা, এর অর্থ—কল্পনাও তো তারি বুকে—যেন আমি সূর্য্যই দেখ্‌ছি, আকাশ দেখ্‌ছি না। যেমন করেই হোক্, আমার ইহ-বুদ্ধিকে নেতি কর্‌বার যে প্রয়োজন আছেই—একথা ঠেকাতে পার্‌বে না কেউ। আবার কল্পনা নয়, একথার অর্থ—শুধু কল্পনাটুকুই সে নয়, কল্পনাকে অতিক্রম করেও সে রয়েছে—এই অধিকারেই সে নিছক্ কল্পনা নয়। এমনি ধারা হাঁ-নার যুগপৎ সামরস্যই জীবনের উপনিষৎ।

যদি নেতির পর কল্পনারই কল্পনা করি, বুঝ্‌তে হবে, সে কল্পনাও কত বড় শক্তিশালী কল্পনা—প্রতি পদে পদে নেতি নেতি করে উড়িয়ে উড়িয়েও যাকে শেষ করা যায় না—তবু যে থেকেই যায়। এই সীমায় বাঁধা জীবনের মাঝে, "ইতি"-বদ্ধ এতটুকু বুকের মাঝেও সে মধুর উদার কল্পনার পরশ—কি সুন্দর, কি অনাবিল! কল্পনারও এমন একটা মহৎ শক্তি যদি না থাক্‌তো তো আমরা বাঁচ্‌তাম কি!

শাস্ত্রের নেতিবাদ জীবনের সামঞ্জস্যের পানেই অঙ্গুলিসঙ্কেত মাত্র। রিক্ত করে দিলেও সত্যি রিক্ত হয়ে যায় না—অযাচিতে অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে সে উদারতার আমরা ধারণাই কর্‌তে পারি না হয়ত। এই মুহূর্ত্তে যাকে সত্য বলে জান্‌ছি, পরমুহূর্ত্তে তার কোন্ রূপ দেখ্‌ব কে জানে! মনের ধর্ম্মই এই অবিশ্বাস। কত রং-বেরংএর খেলাই চল্‌ছে জীবনে—কিছুকেই চরম ভাব্‌লে চল্‌বে না। তাই হৃদয়ে যে তৃপ্তিই আস্‌ছে, তাকেই বল্‌ছি—ন ইতি, ন ইতি! এই অপ্রমত্ত আত্ম-জাগরণের সূত্রই হচ্ছে নেতির তাৎপর্য্য।

নেতি বল্‌লে সত্যি কি নাস্তি হয়ে যায়? দূরে বসে হিসাব কর্‌লে হয়ত বুদ্ধির বিচারে অঙ্ক মিল্‌বে না। কিন্তু যথেষ্ট বেহিসাবী কার্‌বারও জগতে আছে। বুদ্ধির সমস্ত খণ্ড খণ্ড স্পর্দ্ধার আত্মনিবেদন থেকে যে অখণ্ড শক্তির অনুভব জাগে, ইহ-বিবিক্ত অগ্র্যাবুদ্ধি আমাদের সংশয়াত্মা মনকে সেই অনুভবের দিকেই প্রতিনিয়ত আকর্ষণ কর্‌ছে।

নেতি বলে মুগ্ধ বুদ্ধিকে হার মানিয়ে দিলাম—নস্যাৎ তো হলনা কিছুই—বরং অখণ্ড হয়ে রইল। নেতি নেতি কর্‌তে কর্‌তে শেষ পর্য্যন্ত "নেতি"ও নেতি হয়ে যাবে—শূন্যে-পূর্ণে গলাগলি হয়ে যথার্থ সার্থকতা জেগে উঠ্‌বে। সেই চরম রহস্যটীতে বিশ্বাস নিয়ে একদিন দুদিনের এই এতটুকু জীবনের সমস্ত ইতির জঞ্জালকে নস্যাৎ করে দেবার শক্তি-সাহস প্রাণে জাগে না কি?

যা খুসী!

—(*)—

যা খুসী তা তুমি করতে পার না—স্বভাবতই এমন হবে, পদতলের বালুকণাটী পর্য্যন্ত তোমার বিদ্রোহ করবে। প্রত্যেক জীবনের নিয়তি আর অলঙ্ঘ্য জগদ্বিধান, দুয়ে মিলে একটা সামঞ্জস্যের ক্ষেত্র আছে—তোমার ব্যবহারিক জীবনের কেন্দ্রও হচ্ছে তাই—তার মূল্য তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে তোমার উপায় নাই। হয়ত পরমার্থতঃ যা খুসী তা করতে তুমি পার, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা তোমার সত্যের আইনের অধীন।

যা খুসী কর—এটা স্বেচ্ছাচারের ফতোয়া নয়। সুশৃঙ্খলাতেও তো খুসী হতে পারে। আমরা খুসীর অর্থ সঙ্কীর্ণ করে ফেলি। নতুবা বাস্তবিক যা খুসী করাটাই তো ধর্ম্ম। কর্ম্ম তো অস্বীকৃতের কাঁধে যোয়াল চাপিয়ে দেয়নি—তুমি আপন খুসী-তেই না কাজ কর্‌ছ!—তাই না গুরুসেবা, তাই না কর্ম্মযোগ! বাস্তবিক প্রাণের খুসী যা, তার মাঝে মঙ্গল এবং সত্য ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না। আর এও সত্যি, তুমি যদি তোমার খুসীতে তাঁর দিকে এগিয়ে না যাও, তাঁকে তুমি পাবে না।

খুসী মানেই হল উপকরণনিরপেক্ষ আনন্দ। জাগতিক সুখেও দুঃখ হয় এবং দুঃখে সুখ হয়—এমন অদ্ভুত ভাব মানুষের মাঝে জাগে; ঐটীই খুসী—স্বেচ্ছা, স্বাধীনতা বা তোমার স্বরূপ-প্রকৃতি!

যতক্ষণ মানুষকে তুমি জোর করে কাজ করাও, ততক্ষণ তারা স্বস্তি পায় না। অবশ্য তারা ক্ষুদ্র, নতুবা স্বস্তি কথনো ব্যবহারিক অধীনতা স্বাধীনতার দরকষাকষিতে মাথা ঘামায় না। প্রত্যেককে বিশ্বাস কর, অর্থাৎ তাদের নিজের খুসীতে প্রতিষ্ঠ থেকে কাজ করতে দাও—তখন তারা নিজে নিজেই সব সমস্যাকে নির্ভয়ে স্বীকার করে নিবে। তুমি জোর করে যে বোঝা বওয়াতে পারনি, স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে সে বোঝা তখন তারা—শুধু বয়েই নয়, তার দরুণ সকল ব্যথাকে সয়েও চলবে।

খুসীর ধর্ম্মই হল, স্বীকার করে নেওয়া—প্রত্যাখ্যান করা নয়। সবকেই সে ভালবেসে আপন করে নিতেই প্রস্তুত—কাপুরুষের মত এড়িয়ে চল্‌তে তার লজ্জা। মানুষের মনে এমন এক সুকুমার সহজ অবস্থা আছে, যেখানে থেকে বাস্তবিকই সে জগতের সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করেও অক্লেশে দশের বোঝা একা বইতে পারে। নিজের সেই জায়গাটী চিনে নিয়ে জগতের সব্বাইকে সেখানে অধিকার দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঐ সহজ-প্রাণের নির্ম্মলতায়। সেখানে দুর্ব্বল-সবলে ভেদ নাই;—স্বরূপে থাকলে, মনের আনন্দে থাকলে কোন ভেদ-বুদ্ধি স্বতঃই থাকে না।

খুসী তোমার প্রাণের অদ্বৈতবোধি। সর্ব্বত্র কারণ-নিরপেক্ষ, ফলাকাঙ্ক্ষা-নিরপেক্ষ কার্য্য হওয়া চাই। আকাঙ্ক্ষায় ফলকে কাঁচাতেই পাকিয়ে তোল বলেই কর্ম্মের সুস্বাদ থেকে বঞ্চিত হও। তুমি যখন মনের আনন্দে বা আপন খুসীতে কাজ কর, বাস্তবিক তখন ভেদজ্ঞান তোমার থাকে না। তখন তুমি আত্মহারা হয়ে কাজ কর বলেই সুখ-দুঃখ তোমায় বিচলিত করতে পারে না।

আত্মহারা হওয়া মানেই হল যথার্থ খুসীতে ভরপুর হয়ে ওঠা। যথার্থতঃ কিছুই তোমার তখন

হারায় না—দ্বৈত চলে যায়, দ্বিধা থাকে না—তাই তুমি মুক্ত অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠ হও তখন।

যখন আত্মসত্তায় পরিপূর্ণ তুমি—তখনই তোমার ভিতর যথার্থ খুসীর বিকাশ। সে খুসী শিশুর সরলতা, কৈশোরের সৌকুমার্য্য, যৌবনের দীপ্তি, বার্দ্ধক্যের প্রশান্ত পূর্ণতা—যুগপৎ। জগতের সকল লীলার কেন্দ্রে তখন তুমি। এই অপরূপ রহস্যময় সত্তাকে হৃদয়ে জয়ী করে তুল্‌বার জন্যই জীবনের যত কিছু চেষ্টা। সকল দ্বন্দ্বের চরম এই প্রশান্তি। সকলেই সুখ চায়—অর্থাৎ লৌকিক বিচারে সুখ হোক্ বা দুঃখ হোক্, সে তার যা খুসী তাই করতে চায়। বেশ তো যা খুসী তাই কর; কথা হচ্ছে, ঠিক ঠিক কিসে তুমি খুসী হও, ঐটুকুই সকল দুঃখে সকল বাধার ভিতর দিয়ে বাজিয়ে নাও! সামাল দেওয়া চাই—শেষ পর্য্যন্ত।

কাজের বেলায় কর্‌বে যা খুসী, আর ফলের বেলা বেসামাল হয়ে পরের কাঁধে চাপ্‌বে কৃপাভিক্ষু হয়ে—এটা গৌরবের কথা নয়। আত্মগৌরবের অবিচল মহিমার কাছে জীবনের সকল অলাভ, সকল ক্ষতি তুচ্ছ কর্‌বার ক্ষমতা যার আছে, তারি সে অধিকার, দীন হীনের নয়।

তোমার খুসীর দরুণ পরকে দায়ী তো কর্‌বেই না, উদ্বিগ্নও কর্‌বে না—বরঞ্চ আত্মহারা প্রেমে সকলকে বুকে পূরে নেবে—তাই হল ঠিক ঠিক যা খুসী।

হাঁ, শেষ পর্য্যন্ত এইটাই তুমি পাবে বটে—আমাদের সকল অনুশাসনের মূল কথাই হচ্ছে তাই; কিন্তু তার আগে তিল তিল করে কত যে বেদনা সইতে হবে—পলে পলে নিজকে যাচাই করতে হবে, অমনি কিচ্ছুই হয়ে যাবে না। যা তুমি পেতে চাও, তার দরুণ সর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিতেও তুমি প্রস্তুত কিনা—এই হবে তোমার যা খুসীর শেষ পরীক্ষা!

কর, যা খুসী তা-ই কর—কিন্তু ন বিকম্পিতুমর্হসি;—কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, নীতি, উৎসাহ—সর্ব্বোপরি আত্মবিজয় অব্যাহত রাখা চাই! তোমার খুসীতে সব্বার খুসীতে পরিপূর্ণ মিলন—নির্দ্বন্দ্ব, অদ্বয়, একরস! তাই হচ্ছে যা-খুসীর চরম সিদ্ধি!

অন্তঃসত্তা

—*‡0‡*—

অনুভূতি আর স্মৃতি—এই নিয়ে অন্তর্জীবন। অন্তর-রাজ্যও প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা—একবার আলো, একবার আঁধার আস্‌বেই। এই আলোর সময়টাকেই বলি অনুভূতি, আর আঁধারের সময়টা স্মৃতি। পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর এগিয়ে চলেছে।

আপনা হতে যে আসে, আপনা হতে সে অনেক সময় চলেও যায়। কখন কখন কেন জানি না অকারণ পুলকে অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে—বাইরের কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না রেখেও সে কেবল উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর লোকেই মনকে নিয়ে যায়, কি এক অপরূপ ভাবের স্ফূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র শুধু একরস একক সত্তাকেই উপলব্ধি করতে থাকি; কোন চেষ্টা করতে হয় না, অথচ সব কাজ, সব ভাব আপনা হতেই কেন বা গুছিয়ে আসে। তখন মন তন্ময় হয়ে

যায় তাঁর বাণীতে, দেহ লুটিয়ে পড়ে তাঁর সেবাতে আমার দিক থেকে এতটুকুও আমাকে খরচ করতে হয় না, তবু অপরিসীম দানে অযাচিতে অন্তর ভরে ওঠে।

এ আনন্দ যে কোন কারণে-ঘটা উন্মাদনা নয়—তখন কতরকম কঠোর পরীক্ষাতে নিজকে পেষণ করে দেখেছি, না সে অটুটই থাকে। আমার সঙ্গে সে ভাবের যেন কোন সম্বন্ধ নাই, সে আমার মুখ চেয়ে চলে না, আমার ধার ধারে না—তবু আমাকে তার আবেশে পাগল করে রাখে। তার কথা বলে ফুরানো যায় না; ভেবে কূল পাওয়া যায় না—এতটুকু এই জড় রক্তমাংসের পিণ্ড যেন তখন ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে বিদ্যুন্ময় চেতনায় বিচ্ছুরিত হতে থাকে—তার আপন খেয়ালে। আমি তার চেয়ে কত ক্ষুদ্র, তবু আমার চিন্তা তার কাছে অগ্রাহ্য নয়। আমাকে তার প্রভাবে সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হতে হয় না—স্বতঃ আমার প্রাণ তাতে মিশে যায়, কোথাও হোঁচট খায় না। আরো কত অপরূপ যে তার লীলাবিলাস! মোট কথা, আমি তখন আর আমি থাকি না, আমি তখন একলা হয়েও একা পড়ে যাই না; সঙ্গ থাকে না, সঙ্গী থাকে না, অথচ আমার কোন অভাব বোধ হয় না।

কিন্তু এই যে অদীনসত্ত্ব অনুভূতি—থাকতে যার কথা বলা যায়নি, গিয়েছে বলেই যার কথা বেশী করে মনে হচ্ছে—এ কি যথার্থই আমার নয়? এ কি শুধুই প্রাকৃতিক বিবর্তন? আমাতে আছে অবশ্য প্রকৃতিক বিবর্তন—কিন্তু আমার সবটুকুই কি তাই?

অনুভূতি হারিয়ে ফেলি অবশ্য, কিন্তু নিঃশেষে তো মুছে যায় না সে!—তারি অভাব-জ্বালাই না স্মৃতি হয়ে বুকে আজ তুষের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। তার স্মৃতিতে যে এক মুহূর্ত্ত প্রাণে সোয়াস্তি পাই না—এ কি আমার কম আনন্দ? সুখরূপে সে এসেছিল, দুঃখরূপে সে থেকে গেছে—থেকে গেছে সে-ই তো—অপর কেউ তো নয়? সুখ দুঃখ ছাড়াও এমন কিছু কি আমি পাই না—যা আমার সব চেয়ে আত্মীয়? ঐটুকুই আমার—ঐটুকুকে অস্বীকার করলে আর আমার আমিত্ব থাকে না। আলো-আঁধার আসছে-যাচ্ছে—কিন্তু আমি থেকেই যাচ্ছি।

অনুভূতির এই অম্লান-সত্তাই যথার্থ আমি—আর সব প্রাকৃতিক বিবর্তন। তারাই আমার—আমি তাদের কৃপাপাত্র নই!

আলো-আঁধার কতবার আসছে কতবার যাচ্ছে—এই আসা-যাওয়া যেন অন্ধ, অনতিবর্তনীয়। জগতের এই রুদ্র-সত্যকে লক্ষ্য করেই বুঝি ঋষি তাঁকে বলেছেন—"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।" বাস্তবিক এঁর বিচারে এক ক্রান্তিও ভুল কোথাও নাই—যেখানেই নিজের একবিন্দু দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি, সেখানেই জগৎশুদ্ধ সবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যথার্থ দৃষ্টি তখন খোলে না—নতুবা জানতাম, এই বিদ্রোহীরা আমার শত্রু নয়, পরম মিত্র। তারা যে আমায় তার দিকে এগিয়ে দিল!

সে আলো হতেও আলো—সুন্দর হতেও সুন্দর। যখন তাকে পেয়েছি বলে ভাব, তখনো যে তার কত না পাওয়া থেকে যায়, সে তা বোঝে; তাই তো সুখে আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারে না। অন্তরের অবিচল মহিমায় সকল ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যাবে, নিঃশেষে লুটিয়ে পড়ব তাঁর পায়ে—এই তো অনুভূতি, তাই তো প্রাপ্তি।

স্মৃতিতে এরি ঈষৎ আভাস পাই মাত্র। যখন ভুল করে নেমে আসি, তখন তার দিক থেকে ঐটুকুই জীবনের শরণ। সংসারের কোলাহলেও যে তাকে

ভুল্‌বার যো নেই—অপ্রাপ্তিতেও বিরহের দীপ্তিতে সে থেকে যায়। দৈন্য আমার, কুণ্ঠা আমার—সে চিরপ্রফুল্ল, সদা বদান্য, নিয়ত দক্ষিণ!

যে আলো-আঁধার আস্‌বে যাবে, অটুট আবেগে উভয়কেই তারি হাতের বেদনার দান বলে বুঝ্‌তে হবে। না বুঝে পারি না যে!—একজনকে হৃদয় সঁপে দিলে, সে যদি তোমায় ভালবাসে বলে জান—আর কি জগতে দ্বন্দ্ব থাকে, সে ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু থাকে?

তাঁরই ভালবাসাকে অন্তরে পেয়ে বাহিরকে আমরা ভালবাসি। বাইর-ভিতর এক আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। সেখানে 'না' বল্‌বার কিছুই নাই, কে কাকে ফিরিয়ে দিতে পারে—জানি না। সবি তাঁর, সবি সুন্দর—সবি আমার। আমি যে ভালবাসি!

ভালবাসার অনুভবই তো জীবনের আলো-আঁধারের কেন্দ্র। তুমি যদি কারু কাছে কিছু না চাইতে, কেউ তোমাকে ব্যথা দিতে পার্‌ত কি? চিরকাল বঞ্চিত যদি থাকৃতে হয়, তবু তুমি চাইবে, চাইবে—তুমি যে পূর্ণ, প্রেমে ঢলঢল। আর সত্যি কি জগতে কেউ বঞ্চিত থাকে? কোথাও ব্যর্থ হয় বলেই, ব্যর্থ হবেই বলে চাওয়া—এ অবিশ্বাসকে তো হৃদয় মানে না। তাঁর হৃদয়কে তোমার হৃদয়ে ক্ষণেকের তরেও যদি পেয়ে থাক, সেখানে কি অবিশ্বাসের ছায়ামাত্রও দেখ্‌তে পাও?

এ হৃদয়কে ফুটিয়ে তোল—মন মাতানো ভাব-সৌরভে আপনাতে আপনি মাতোয়ারা হয়ে সে ছড়িয়ে পড়ুক—দিগ্‌দিগন্তে, অনন্তে, আবার প্রতি অণু-পরমাণুটীরও জীবনে! নিজের বুদ্ধি দিয়েই তো নিজে বেঁধে রাখ—আর কেউ তো নয়! কেন এ দাসত্ব? ছিঁড়ে ফেল ভাবনার শৃঙ্খল!—এই যে আনন্দময় তুমি—কোন তো দুঃখ নেই কোথায়ও! তুমি যে ভালবেসেছ—আর তো দৈন্য নেই তোমার!

এই তোমার চরম—এই তো খাঁটী তুমি! এর দিকে তাকিয়ে একবার সবার বুকে ধ্যানস্থ হও—কি দেখ্‌বে?—আর কি অপ্রাপ্তি আছে? তোমার সকল ব্যথার স্মৃতি তলিয়ে গেছে সে অবিরল অনুভূতিতে! তখন আর চাওয়া কি, পাওয়া কি—নিমেষে জীবন-জঞ্জালের যত খণ্ড স্মৃতির খণ্ড-প্রলয় হয়ে গেল যে! রইল শুধু অমৃত, আনন্দ, পূর্ণতা—স্বীকার!

যখন মুগ্ধ হয়ে পান কর, তখনো স্তব্ধ হয়ে অনুভব কর—তবেই সামঞ্জস্য পাবে। অভয় অকম্প অনুভব—বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান তারি মাঝে। কিছু নাই যেখানে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে, সেই-খানেই যে সব আছে। মানুষের জীবন নিত্য-স্পন্দিত রহস্য-পিণ্ড মাত্র—একে পেলাম ভাব্‌লেই শেষ হয়ে যায় না, হারিয়েছি ভাব্‌লেও সে বঞ্চিত করে না;—দেখা, জানা, পাওয়া—এক একটী বিভাব মাত্র, সকল দ্বৈতের নিগরণেই চরম স্বস্তি। ভালবেসে মানুষ এই রহস্যের সাক্ষাৎ পায়। পরিপূর্ণ অনুভূতি পেলেই বিবৃত। শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্ সে স্বভাব—অনির্ব্বচনীয়!

অন্তঃসত্তায় যখন মানুষ পৌঁছায়, এমনি করে সমস্যা আর মীমাংসার যুগলে মূর্ত্তিমন্ত-সমন্বয় হয়ে ওঠে তার হৃদয়। তার পরশে সকল বিক্ষোভ অযাচিতে শান্ত হয়ে যায়—সুখ-দুঃখের স্মৃতি নীরবে আত্ম-বিসর্জ্জন দেয়। দেখ্‌তে পাই, যা আছি, যা হব—দুই-ই এক, দুই পূর্ণ; খণ্ডে-অখণ্ডে প্রেম-পরিণয়। দুঃখ বলে যাকে এড়িয়ে চল্‌ছিলাম, সেই সুখের খনি, আবার যে সুখে হৃদয় অন্ধ হতে চলেছিল, তার সরল ক্রটী-স্বীকারে সকল সমস্যার অকৃত্রিম মীমাংসা।

আর সেখানে গোপন নাই, বন্ধন নাই, ব্যর্থ

বেদনা নাই—সব উন্মুক্ত, সবি সহজ, সবি সার্থক। কৃপণের মত নিজের যে ক্ষুদ্র অধিকারকে আঁকড়ে বসে থেকে প্রত্যাখ্যানের কশাঘাতে পলে পলে জর্জ্জর হতাম, সেখানে কি উদার শান্ত স্বমহিম আত্মগৌরব!

আমার জন্ত কিছুই তো আর চাই না আমি—আমি নিষ্কিঞ্চন, আপ্তকাম! দেনা-পাওনার হিসাব থেকে আমি মুক্ত হয়েছি—সত্যিকার দেওয়া আর সত্যিকার পাওয়ার লীলা তখন সুরু হয়ে গিয়েছে!

হৃদয়ে চিরপ্রকাশ সবিতার মত এই যে বস্তুর সাক্ষাৎ পেলে মন আত্মহারা হয়ে মুক্তি পায়, তাকেই বলি—আমার মনের মন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়। সে কার নয়? কাকে সে বঞ্চিত রেখেছে? তার স্মৃতি বুকে ধরে সকল জ্বালায় উজ্জ্বল হও, সকল সুখে আগুন জ্বালাও! তোমার জীবন দিয়ে তারি যজ্ঞ পূর্ণ হবে—তোমার ইচ্ছায় তারি অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ কর। সেই প্রেমকে খুঁজে পাবার জন্ত যত আকুলি বিকুলিই জীবন ভরা সুখ দুঃখের স্মৃতি; আর তারি ব্যঞ্জনা অনুভবের স্তরে স্তরে—নানা রূপে, নানা বর্ণে, নানা ছন্দে! হৃদয়ের সে রহস্ত অনাদ্যন্ত বিরহ-মিলনে অপরূপ মধুর! তার লীলা চাতুরীর আর পার নাই। খোঁজার অভিমানকে পার পাইয়ে দিয়েই সে খুসী!

সর্ব্বদা শুধু প্রাণে বাজুক—সে আছে, আছে, —আমার সবার অন্তরের অন্তরে সত্যি সত্যি সে আছে!

সে বড় সরল—কাউকে ফাঁকি দিতে জানে না সে! সে শুধু দিয়ে যায়, ফিরে চায় না! এই তার কাজ। হয়ত কতবার তাকে ভুল বুঝেছি, ব্যথা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছ, তবু তোমায় ছাড়েনি সে! জগতে শুধু সে-ই তোমার জনম-মরণের অভঙ্গ সাথী! সত্যি সত্যি সেই তোমায় 'নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে'! যত সব প্রত্যহের কুশাঙ্কুর-বেদনা, তারি কাছে হার মানে।

জগৎ জুড়ে সবাই শুধু তাকেই চেয়ে এসেছে—তারি কথা বলে আসেছে; তবু সে ধরা দেয়নি, তবু সে ফুরায়নি!

সব চেয়ে ছোট্ট হয়ে সে বুক জুড়ায়, আবার সবার বড় হয়ে বুকে করে রাখে। অনুভবে মাখানো থাকে তারি মায়া, অন্তর্দীপ্ত স্মৃতিতে দেখি তারি ছায়া!

অনির্ব্বচনীয় সে সত্তা। তাকে যারা জানে তারা এই বলেই জানে—

> "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং;
> আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ;
> আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি;—
> শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ!"

—অন্তরের বেদন বলেই সবাই জানে তাকে—যে বেদনের আর ব্যাথা হয় না?

আরণ্যক

—※—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০।৭১।৩
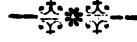
আত্ম-সমর্পণে দেহ-ইন্দ্রিয় জড় হয়ে আসে না; সমর্পণ যদি ঠিক ঠিক হয়ে থাকে, প্রাণে তখন এক অজানা-শক্তির উৎস খুলে যায়। সমর্পণ মানে নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপন নয়—অফুরন্ত কর্ম্ম-শক্তি নিয়ে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করার দিব্য-প্রেরণা অনুভব করা। সমর্পিত জীবনে ছুটো শুভ-শক্তির ক্রিয়া হয়—একটী নিজের শুভ ইচ্ছা, অন্যটী ইষ্টের কল্যাণময় অভিলাষ। তখন যে বসে থাক্‌বার এতটুকু সময়ও পাওয়া যায় না—জীবনটা তখন শুভ্র স্বচ্ছ-নিছক প্রেরণাময় হয়ে ওঠে। মনে হয় সত্যিই তো আমি কেবল বাহনই মাত্র, আমার ভিতর দিয়ে কোন্ অজানা শক্তির লীলাখেলা চল্‌ছে। গোপীরা যখন আত্ম-সমর্পণ করে তন্ময় হয়ে যেত, তখন তারা হুঙ্কার দিয়ে অমিতবিক্রমে বল্‌ত—"এই তো আমরাই শ্রীকৃষ্ণ, আমরাই গোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলাম" ইত্যাদি। আত্ম-সমর্পণ হয় ভালবাসায়, আর ভালবাসায়ই তো শক্তি-সংক্রমণ হয়। কাজেই আত্ম-সমর্পণ মানে জড়ত্ব নয়—ইষ্টের শুভ-ইচ্ছার অনন্ত-অভিব্যক্তির আধারই হবে আমার জীবন। সমর্পণের সার্থকতা তো হবে সেদিনই।

* * *

সুখে-দুঃখে, আঘাতে-উত্তেজনায় নিজকে সংযত রাখার নামই সাধনা। সংযমেই শক্তি বৃদ্ধি—ক্ষোভে শক্তির অপব্যয়। সাধক সর্ব্বদা হুঁসিয়ার থাকবে, কোন কারণে যেন তার চিত্তে ক্ষোভ সঞ্চিত না হয়। অন্তরে আধ্যাত্মিক বল না পেলে কি এ সামঞ্জস্য আসে?

* * *

অকারণে যখন হৃদয়ে বেদনা জাগে তখনই বুঝি, আমার হৃদয়ে অপরেরও অধিকার আছে। অলক্ষ্যে আমার প্রবৃত্তিমুখী মন নিবৃত্তি অভিমুখী হয়ে যায়, দারুণ ইচ্ছার তাড়নাতেও অন্যায় পথে চল্‌তে পারি না, এতেই তো প্রমাণ হয় আমার জীবন শুধু আমারই ছিনি মিনি খেলার সামগ্রী নয়—এর ওপর আর কারও দরদ-দৃষ্টি আছে।

* * *

দ্রষ্টৃত্ব থাকা চাই, তা না হলে পতনের আশঙ্কা আছে। ভালবাসার কথা বল্‌ছ, এ ভালবাসা হতে সব হতে পারে; কিন্তু কেন ভালবাস্‌ছ, কাকে ভালবাস্‌ছ, এ সম্বন্ধে চেতনা থাকা চাই। ভালবাসার মোহ থাক্‌লে যে এ ভালবাসাতেই তুমি বদ্ধ হবে।

* * *

আত্মার কার্য্য আত্মীয়তা করা। বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপন করা তার স্বভাব। "কেবল" হয়ে থাকা আত্মার স্বভাব নয়—আত্মার স্বভাব হচ্ছে সবকে স্বীকার করা—সবার সঙ্গে ঐক্যসূত্র স্থাপন করা। আত্মবিদ্ সকলকেই ভালবাসেন।

* * *

অজ্ঞান শিশুকে ভাল-মন্দের দরুণ দায়ী করা চলে না, কেননা তার মাঝে তখনও অহং বোধ জাগেনি। সংস্কার বিরহিত প্রাণখোলা ভাবের দরুণই সে সকল জবাবদিহী হতে মুক্ত। কিন্তু যার

বুঝ্ আছে সতেরো আনা, তাকে প্রতি পদে পদে বিচার করে চল্‌তে হবেই।

* * *

আমার কাছে আমি উজ্জ্বল থাকতে চাই। দুঃখে, আঘাতে, বেদনায়, পুঞ্জীভূত মূঢ় ভাবে যখন ঘা পড়ে, আমার কাছে আমি তখন তীব্র হয়ে উঠি। কাজেই সুখের চেয়ে দুঃখই আত্ম-সাধকের প্রকৃত বন্ধু।

দান প্রাপ্তি

—:*:*:*:—

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে—

(আকিয়াব) বর্ম্মা

বলিরবাজার—শ্রীযুক্তাঃ— সুরেশচন্দ্র চৌঃ ৫৲, আমির আলী চৌঃ ২৲, রজক আলী চৌঃ ২৲, মহেশ ও রামচন্দ্র ২৲, আমান আলী মিঞা ১৲, ছৈইব এজেন্ট ১৲, ফৈজর আলী হেড্‌মাষ্টার ১৲, খুচরা ১৲।

টেকনাপ—শ্রীযুক্তাঃ—সুরেন্দ্রলাল দাস ২৲, যুবক-সঙ্ঘ ৫৲, থামজাপ্রু চৌঃ ১৲, মুন্সী য়ের আলী ১৲, হরিকৃষ্ণ চৌঃ ১৲, মুন্সী আরমেদ ও আহাম্মদ চৌঃ ১৲, শশীকুমার দে ১৲, রজনীকান্ত সেন ১৲, খুচরা ৩৲।

মংডু—শ্রীযুক্তাঃ—দেবেন্দ্রলাল দাস পোষ্ট-মাষ্টার ৩৸০, রমণীমোহন দাস ৩৲, ক্ষেমেশচন্দ্র চৌঃ ২৲, আদালত সাহেব ২৲, এইচ এস্ টু ২৲, অপর্ণলাল দে ২৲, অপূর্ব্ব নন্দী ২৲, জগৎচন্দ্র পাল ২৲, এলাহি বক্স ২৲, ছেনটু অং ১৲, এস্ সি দে ১৲, যামিনী পাল ১৲, নবীন গৌরহরি ২৲, টি ছি চক্রবর্ত্তি ১৲, ছোনন টু ১৲, টুন অং ১৲, খুচরা ২৷৷০।

আলীচং বাজার—খুচরা ৭৲।

বুথিদং—শ্রীযুক্তাঃ—নবীনচন্দ্র দেব ৫৲ হরিশচন্দ্র দেব ৩৲, ডাঃ টি আর সার্জ্জন ২৲, হেমলাল বরুয়া ১৲, সুদর্শনচন্দ্র দাস ১৲, অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস ১৲, সারদা বিশ্বাস ১৲, সূর্য্যকুমার দে ১৲, মহিরাম দে ১৲, হরেকৃষ্ণ দে ১৲, নন্দ মাড়োয়ারী ১৲, সুরেন্দ্র বিজয় দে ১৲, শ্যামাচরণ চৌঃ ১৲, সতীশচন্দ্র মল্লিক ১৲, সুরেশচন্দ্র দাস ১৲, শশীকুমার ঘোষ ১৲, সারদাপ্রসাদ সেন ১৲, কামিনী নন্দী ১৲, যোগেন্দ্র চৌঃ ১৲, জগৎহরি ওয়াদ্দাদার ১৲, জনৈক উকিল ২৲, খুচরা ২৷৷৶০।

কুতুবপুর

নিগমানন্দ সারস্বত মন্দির

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত ঋষিবিদ্যালয় নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতাকল্পে তদীয় জন্মভূমি নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর সবডিবিশনের অধীনে কুতুবপুর-গ্রামবাসীগণের আগ্রহাতিশয়ে তত্রত্য ভৈরব নদীর তট সুবিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন স্থানে "নিগমানন্দ সারস্বত-মন্দির" নামক উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে ম্যাট্রিকুলেশন (matriculation) পরীক্ষার উপযোগী এইচ্, ই, (হাই ইংলিশ) স্কুল বলিলে ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে না। সুতরাং নিম্নে এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল।

বঙ্গদেশীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহ যেমন সরকারী, অর্দ্ধসরকারী ও বেসরকারী এই তিন ভাগে বিভক্ত, আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ কর্ত্তৃক পরিচালিত ঋষিবিদ্যালয় নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একটী বিশ্ববিদ্যালয় কল্পিত করিয়া তাহার অধীনে তিন শ্রেণীর তিনটী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম ও নীতির শাসনাধীনে ত্যাগ ও সংযমের ভিতর দিয়া প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে পারে এবং সর্ব্বশ্রেণীরই দেশবাসীগণ যাহাতে আপন আপন সন্তানগণকে ঐ ভাবে শিক্ষিত করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে উক্ত ঋষিবিদ্যালয়কে সর্ব্বতোভাবে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিবার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কুতুবপুর "নিগমানন্দ সারস্বত-মন্দির" তাহারই এক ভাগ।

ঋষি-বিদ্যালয়ের **প্রথম** ও শ্রেষ্ঠ বিভাগ থাকিবে **মঠে**। সেস্থানে প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বনে গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব শূন্য হইয়া একান্ত ভাবে গুরুনির্ভরশীল যুবক সন্তানগণ মঠের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিবে। ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার আদর্শ এই স্থানে পূর্ণভাবে লক্ষ্যস্থানীয় হইবে। ষোড়শ বৎসের ন্যূনবয়স্ক শিক্ষার্থীকে এই বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইবে না।

মধ্যম বা দ্বিতীয় বিভাগ থাকিবে মঠ এবং মঠের অধীনস্থ বঙ্গের পাঁচটী বিভাগীয় আশ্রম হইতে **স্বতন্ত্র স্থানে** প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষায়তনে দেশের বর্ত্তমান-প্রচলিত রাজ-ব্যবস্থার সমস্ত দোষ বর্জ্জন করিয়া

ত্যাগ এবং সংযমের ভিত্তি স্থির রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুকূল নিয়মাধীনে সাত হইতে আঠার বৎসর বয়স্ক বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। রাজকীয় ব্যবস্থাধীন উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য—ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া ঋষিগণের শিক্ষার আদর্শে শিক্ষার্থীগণকে গড়িয়া তোলা হইবে। অধ্যাপক এবং শিক্ষকগণ ভিন্ন অন্যের সহিত শিক্ষার্থীগণের কোন প্রকার সংস্রব না থাকিলেও বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অল্পপরিমিত অবসর-সময়ে তাহারা আপন আপন গৃহে যাইয়া পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত মিশিতে পারিবে—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যানুকূল নিয়মাদি কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিবে না। আদর্শরক্ষায় অসমর্থ বালকের পক্ষে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাজকীয় ব্যবস্থাচালিত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ ও সুবিধা থাকিবে।

তৃতীয় বিভাগ কুতুবপুর-**নিগমানন্দ-সারস্বত মন্দিরে** রাজকীয় ব্যবস্থানুযায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। অধিকন্তু ইহাতে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে। সাধারণ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সৎভাবে এবং সুনিয়মানুবর্ত্তিতায় ছাত্রগণের জীবন পরিচালিত হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। মঠ ও আশ্রমসমূহ হইতে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী উপদেষ্টাগণ মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিবেন। প্রতিষ্ঠাতা পরমহংসদেবও বৎসরে দুই একবার উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রগণকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দান করিবেন। কৃষিশিক্ষার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ইতিমধ্যেই কিছু কিছু আনা হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজী সনের জানুয়ারী মাস হইতেই সমস্ত ক্লাশ খোলা হইয়াছে এবং সুশিক্ষিত, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ কৃতী শিক্ষকগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুদৃশ্য বৃক্ষবাটিকামধ্যে অবস্থিত প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে এবং দরিদ্র দেশবাসীর সুবিধার জন্য বোর্ডিং-চার্জ্জ মাসিক ৬৷৷০ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হার করা হইয়াছে। আগামী ১৯৩১ সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিনা-ব্যয়ে কুতুবপুর "নিগমানন্দ দাতব্যচিকিৎসালয়" হইতে যথাযথ ঔষধ ও উপযুক্ত ডাক্তারের উপদেশ ও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মুসলমান ছাত্রগণের জন্য স্বতন্ত্র বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে অথবা দূরবর্ত্তী স্থানের ছাত্র কিম্বা অভিভাবকগণের বিদ্যালয় এবং বোর্ডিংএ ভর্ত্তি সম্বন্ধে দরখাস্ত করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন এম্-এ

হেড্‌মাষ্টার—কুতুবপুর নিগমানন্দ সারস্বত-মন্দির

পোঃ—কাথুলি, জিলা—নদীয়া

—:*:—

চতুর্দ্দশী

—*‡0‡*—

অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইয়া হইয়া দীন-হীন মন আমার আজ কাঙ্গালবেশে শ্রান্ত চরণে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে;—অপরিসীম স্নিগ্ধ উদার মমতার সহিত অকপট ভরসা দিয়া আজ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে হইবে। আমিই যে তার অগতির গতি—আমার ভরসা চরমে রহিয়াছে বলিয়াই এই অকূল বিশ্ব-সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতময় বিপর্য্যয়ের স্রোতে কত শত দৈবদুর্য্যোগের মাঝেও ঘরের বাহির হইয়া নিজকে ভাসাইয়া দিতে সে ভয় করে নাই, তাহা আমি জানি। হয়ত আমারি ভরসায় অন্ধকারকে সে ডরায় না; জগতের আর সবাই যেখানে শশব্যস্ত, সে সেখানে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে আপন বিজয় প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছে—পেছনের স্মৃতি তাহাকে টলাইতে পারে নাই, সম্মুখের ভীতি তাকে দমাইতে সাহস পায় নাই। আপনাকে সে বিশ্বাস করে—ব্যস্, জগতে আর কাহারো কথায় তাহার কাণ দিবার অবকাশ নাই—সে নিজে ঠকিবে, ঠেকিবে, আবার নিজেই শিখিবে। আমিও ছাড়িয়া দিতে ভয় পাই না—ভাবি, তার সংস্কার আমি কি করিব? ছেলেবেলা হইতেই তো দেখিয়া আসিলাম—ওই এক বদ্‌মেজাজ তার। সত্যি কি, যার যার জীবনের ভাল-মন্দ উভয় বীজই তার স্বভাবের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে না? আমরা বৃথা আঁধারে ঢেলা ছুঁড়িয়া প্রকৃতির কৃতিতে বাধা ঘটাই কেন?

মনের মুমূর্ষু আত্মপ্রতিষ্ঠাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে যে কারু তোয়াক্কা রাখে না।—আমার মনে হয়, এই স্বভাবের মাঝেই কোন একটা মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে—জীবনের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একদিন হয়ত ফলে-ফুলে সুশোভিত আত্ম-প্রতিষ্ঠ মহীরুহরূপে তাহাকে দেখিতে পাইব। ধৈর্য্য চাই, ধৈর্য্য চাই—মনকে গড়িতে হইলে ধৈর্য্য চাই;—মানুষকে গড়ার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

যারা জগতে কাউকে বিশ্বাস করে না, তারা ঠকিবে বটে কিন্তু ঠেকিবে না—এই এক ধারণা আমি পোষণ করি। নিজের উপর যাদের অদম্য বিশ্বাস আছে, মেরুদণ্ডহীন গতানুগতিকদের চেয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম যে-কোন বিষয়েই তাহাদের অধিকার প্রশস্ত। অপরের ছায়ায় বাস করিতে তাহারা অশান্তি বোধ করে। বলিতে পার, ইহা অভিমান! কিন্তু আমি অভিমানকে মায়ামাত্র মনে করি; কোন বিশেষ সার্থকতাকে চিনাইয়া দিতেই অভিমান আসে—কার্য্য সিদ্ধ হইলে সে নিজেই সরিয়া পড়িবে! অভিমানের অন্তরালে যে জিনিষটী রহিয়াছে, সেটী নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রসূ। লাঠি মারিয়া অভিমানের মাথা ভাঙ্গিতে গিয়া আত্ম-গৌরবের নির্য্যাতন ঘটাইও না!

অভিমান-বীজ দগ্ধ করিবার যথেষ্ট ঠাণ্ডা উপায় আছে—কাহারো জীবনের স্বাভাবিক প্রগতিকে অব্যাহত রাখিয়াও সুকৌশলে একমাত্র ভালবাসার ইন্দ্রজাল-শক্তিতে তাহা সম্ভব। তাহার দরুণ যে আত্ম সমাহিত পরমার্থ-সাধনা প্রয়োজন হইবে, তাহাকে ব্যবহারিক সংস্কার-প্রচেষ্টার সহিত গুলাইয়া ফেলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন চিত্তকে এই জন্য আমি ছাড়িয়া দিই। কেননা জানি, জগৎটা মূলে সুসমঞ্জস; সেখানে রোগ আর ঔষধ পাশাপাশি। যে ভগবানের কটাক্ষমাত্রে প্রলয় হইতে পারে, অনন্তবিস্তার এই বিচিত্র বিশ্ব-সৃষ্টিটাকে বুক পাতিয়া

দিয়া নীরবে সহ্য করিবার ধৈর্য্য এবং বীর্য্য তাঁহারই আছে। এ জগতে বাস্তবিকই কাহারো কাটা পথে স্বভাবতঃই কেহ চলিতে পারে না বলিয়াই জগৎময় এত বৈচিত্র্য—আর সে বৈচিত্র্য নিত্য নূতন বিস্ময়ের অবদানে অফুরন্ত! মনকে আমি ছাড়িয়া দিলাম—তুমি যা খুশী কর! কেহ কাহাকেও অস্বীকার না করিলেই হইল। মূলে প্রেমের সম্বন্ধ থাকিলে সকল বৈচিত্র্য একই চরমে আসিয়া মিলিবে। আর প্রেমের সম্বন্ধ কি নাই? বল কি! মনকে শত অপরাধে অপরাধী দেখিয়াও তো আমার মমতাস্নিগ্ধ হৃদয়ে বিশ্বাসের বা সমবেদনার এতটুকু ব্যত্যয়ও আমি ঘটিতে দেখি নাই। আমার মনের উপর আমার যে ভাব, এ যদি সত্যিকার ভাব হয়, তবে সবারই মনের উপর সবার ঐ ভাব জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই আছে! একদিন এই আত্মীয়তার ভাব দিয়াই সকলেই ভাবের মাঝে সেই অভিনব সত্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না কি?

কাজেই যার শক্তি আছে, অর্থাৎ যার নিজের উপর শ্রদ্ধা আছে, তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই যেন অগ্রাহ্য রাখিতে হইবে। কেননা, সে যে কাহারও গ্রাহ্য হইবার ভরসা রাখে না, এই আত্মনির্ভর তাহার মাঝে সুস্পষ্ট করিয়া তোলা দরকার। হয় ত কোন ব্যাপারে রোগ বাধাইয়াছে সে, আমি বলি, ঔষধও সে নিজেই খুঁজিয়া বাহির করুক—বিশ্ববিবর্তনের রহস্যময় শক্তিকেন্দ্র তারি হৃদয়ে সে অনুভব করিতে শিখুক।

স্বঘটিত পদস্খলনের দরুণ তাহাকে কোন দিন আমি আপশোষ করিতে বলি না। করিলে তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া আবার সেই দুরন্ত সর্বনেশে আত্ম-প্রত্যয় তাহার মাঝে জাগাইয়া তুলি। তাহাকে বলি—ওরে তুই যে তোর অপরাধ জানিয়াছিস্, এই তো তোর সব চেয়ে বড় লাভ! এর তুলনায় ঐহিক লাভক্ষতির বিচার যে কত তুচ্ছ! হয়ত অনেক দিনের সাঞ্চত সংস্কারের বিকারে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল—নির্ম্মম আঘাত নহিলে ঘোর টুটিত না, তাই তোর প্রতি বিশ্বপ্রকৃতির এ বিদ্রোহ। কিন্তু সে সবি কল্যাণের দরুণ—আপাত সুখ বা আপাত দুঃখ কিছুতেই টলিবার পাত্র নও তো তুমি! আপন বেগে আপনি চলিতে থাক—পেছন পানে ফিরিয়া চাহিও না, আবার অধৈর্য্যও হইও না! ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!

জগতে একমাত্র কল্যাণ—জ্ঞান। সহজ কথায় জানিবার বুঝিবার ভাগ্য যদি না থাকে, না হয় আঘাত পাইয়াই মন ফিরিল, তাহাতে ক্ষতি কি,—অপৌরুষ কি? 'ভাল কথায় ফিরিলে না কেন,' এই বলিয়া অনুযোগ দিবার সময় এখন নয়—বিশ্রম্ভালাপ-অবসরে রহস্যচ্ছলে সে আঘাত হয়ত কোন সুযোগ দেওয়া যাইবে।

আজ যে তোমার মন ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাকে বুকে তুলিয়া লও শুধু! তাহার চিরন্তন কল্যাণীয় মূর্ত্তিকে ধ্যাননেত্রে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছ তুমি—মনকে ঐরূপে জানাই সত্যিকার জানা; ক্ষণিকের ভ্রান্তিতে সে জানাকে টলাইও না।

ক্ষুদ্র দেশ-কালের সংস্কারে সঙ্কীর্ণ, অতীত-ভবিষ্যতের ভাবনায় ব্যস্ত হৃদয় নিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে তুমি পারিবে না। তোমার আবেগের কম্পনও আজ গোপন রাখিতে হইবে। তুমি যে সত্যদৃষ্টি, তুমি যে জগতের কাহাকেও অগ্রাহ্য কর না, এই অটল অনেজৎ নির্ভর হৃদয়ই তোমার মনের সম্মুখে আজ মেলিয়া ধরিতে হইবে। এমন সন্তর্পণে তাহাকে তোমার আশ্রয় দিতে হইবে, যাহাতে কাহারো আত্মসম্মান বোধ তোমার তীব্র স্পর্শে সঙ্কুচিত না হয়, যেন মন শিহরিয়া না উঠে;—শুধু তোমার নিরপেক্ষ মহত্ত্বের মমতা তাহার উদ্বিগ্ন অঙ্গে ঢালিয়া দাও—সেও একান্ত শ্রদ্ধায় তাহা স্বীকার করিয়া পরিতুষ্ট হউক।

ছোটকে ছোট বলিয়া স্বীকার করাই তার প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অর্থেই সত্যদৃষ্টি, সমগ্রদৃষ্টি। -ছোটকে এবং বড়কে অখণ্ড একই রহস্যে যেখানে তুমি সম্মিলিত বলিয়া জান, সেই উদার হৃদয়েই শ্রদ্ধার উদ্ভব। তুমি যাহাকে ঠিক ঠিক জান, যার সমস্তটুকু প্রেম তোমার হাতের মুঠায়, সে কখনো তোমার সম্মুখে বড় সাজিয়া বাহবা লইতে সুখ বোধ করিবে না; কেননা সে তোমার হাতে ছোট রূপেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে—আপনা হইতে ধরা দিয়াছে; প্রেমের বাঁধনে যে বাঁধা পড়িয়াছে, সে কি কখনো ফাঁকি দিতে পারে? তোমার কাজ শুধু—তাকে বুকে তুলিয়া লওয়া। সে যে আত্ম-প্রবঞ্চনা করে নাই, এই গুণে সে ছোট হইয়াও তোমার বুকভরা ভালবাসার সব চেয়ে বড় অধিকারী।

ছোট বড় বিচারটা জগতে কোথায় হয়?—যেখানে স্বার্থ আছে, ঐহিক লাভ-ক্ষতির হিসাবে বেনিয়াকের মত যাঁথা-ঘামানো আছে।

যাঁর দুনিয়ায় কোন অভাব নাই—যিনি সর্ব্বভাবময় আনন্দ-স্বরূপ, তাঁর বিচার তো কখনো "এতটুকু" আর "ততটুকু" দিয়া হইবে না;—তাঁহাকে দিতে হইবে, যতটুকু আছে, ততটুকুই—তোমার সবটুকুই! বেশী নয়, কমও নয়—হাতের পাঁচ না রাখিয়া দিয়াছ কিনা, এইটুকুই হইবে বিচার্য্য। মহত্ত্বের বিচারে এই সমাধান পাই—আমা থেকে আমার দিবার বস্তু আলাদা কিছু নয়, আমি এবং আমার যা-কিছু সব লইয়াই আমি তাঁর!

আজ যদি আমার মন তার সমস্ত দৈন্য, সমস্ত কার্পণ্য ভুলিয়া তৃষিত নিরভিমান হৃদয় লইয়া আমার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়া থাকে, তবেই তো তার সবটুকু সে দিয়া দিল—আর চাই কি? এবার তাহাকে সকল গ্লানি ভুলিয়া বুকে তুলিয়া লও—যতটুকু আত্মসমর্পণ সে করিয়াছে, ততটুকুকেই সার্থক কর। এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবের হৃদয়ে যে শিবের স্ফূর্ত্তি, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার নয়। যেমন করিয়াই হউক, বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিলেই হইল যে, সে চিরতরে বঞ্চিত হয় নাই।

জানি, আজ তাহাকে এত করিয়া বুঝাইয়া-শুনাইয়া শান্ত করিয়া আমার কাছে পাঠাইলাম, কালই হয়ত সে এর চেয়ে বড় একটা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসিয়া আছে,—কিন্তু তাই বলিয়া এক মুহূর্ত্তে যে আলোর চমক্ তাহার প্রাণে খেলিয়াছে, এই অপূর্ব্ব পরমার্থটিকেই বা অস্বীকার করিব, অগ্রাহ্য করিব কি করিয়া? আর সেও তো ইহা ভুলিবে না—সত্যস্বরূপ যে তাহারো বুকে থাকিয়া সত্যের অভিমুখে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন প্রতিনিয়ত, সে যে সচেষ্ট! তার এ অকৃত্রিম চেষ্টার তো কখনো নির্ব্বাণ নাই। অধীর হিতকারিতার মত্ততায় অন্ধ হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত শান্ত সুষমাকে সহসা উদ্ধত করিয়া তুলিব কেন?

মন তো বারংবার দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেই। সংশয়ই দুর্ব্বলতা; অবিশ্বাসই মনের ধর্ম্ম। তবু স্মরণ রাখিতে হইবে—আজ সে প্রত্যাহৃত, আজ তার উদ্ধত দাবী নাই, আজ সে বিনীত শিশিক্ষু। সংশয় আর অবিশ্বাসের অন্ধকারকে ছাড়াইয়াও আরো কিছু পরমার্থ তাহার মাঝে আছে কি না, খুঁজিয়া বাহির কর—তাঁর নাম করিয়া অকুতোভয় আশ্রয়দানে তাহার শরণাগতি সার্থক কর। বিশ্বাস ছাড়া অবিশ্বাসের ঔষধ নাই, উৎসাহ দেওয়া ছাড়া দুর্ব্বলতা ভুলাইবার উপায় নাই।

মনে রাখিও—তোমার নিরুদ্দিষ্ট লক্ষ্যে তোমার যাত্রা। অর্থাৎ তোমাকে যে তিনি কোন্ দিকে টানিতেছেন, তাহা তুমি জান না। সংস্কারবশে নিজের মনগড়া নিত্য নূতন লক্ষ্য খাড়া করাইয়া তাঁর

সাজানো বরং এলো-মেলো করিয়া দিতেছ, তাঁর দেওয়া শক্তির অপব্যবহার করিতেছ—তাই তোমার এত জ্বালা, এত অস্বস্তি! তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে না মিলানো পর্য্যন্ত এ অস্বস্তি তোমার যাইতে পারে না। ব্যক্তিগত ইচ্ছা কাড়িয়া লও—যখন সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভণ্ডুল হইয়া গেলেও প্রাণে এতটুকুও বাজিবে না, তখনই ইচ্ছা করিও। একদিকে হৃদয়ের প্রত্যেকটী ঈগাকে শুদ্ধ কর; সঙ্গে সঙ্গে এই এলোমেলো ইহসুখলুব্ধ জীবনটাকে সমর্পণে গুছাইয়া আনিয়া তাঁহার ইচ্ছা ধারণার উপযোগী কর। এই সমর্পণই চরম সমাধান।

যদি বলিয়া বস, ব্যক্তিগত ইচ্ছা চিনি না—তাহারও জবাব আছে। প্রাণের অস্বস্তিই তাহার চরম জবাব। ব্যক্তিগত ইচ্ছা রাখিলে তুমিই দুঃখ পাইবে। তোমার জন্যই তোমাকে ভাল হইতে হইবে। তুমি ছাড়া আর এ জগতের কেহই তোমার মুখ চাহিয়া থাকে না। তোমার ইচ্ছায় সুখ আহরণ করিয়াও তোমার সুখ নাই; আর তাঁর ইচ্ছায় দুঃখের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াও সুখ!—তোমার বুকের ভিতরই এমন জিনিষ আছে! সেই বলিয়া দিবে—কোন্‌টা তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আর কোন্‌টাই বা তাঁর ইচ্ছা।

বিন্দুতেও স্বাধীনতা, সিন্ধুতেও স্বাধীনতা। জগৎ জুড়িয়া অনন্ত শক্তিকেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই নাই। বিন্দু বিন্দু শক্তির প্রত্যেকটী স্বসম্পূর্ণ—প্রত্যেকটী অণুতেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব নিহিত। তৎপর হইতে পারিলে তোমার এই ব্যষ্টি জীবনের মাঝেই তুমি সমষ্টির রহস্যের সন্ধান পাইতে পার। সবাই তোমারই কথা বলিতেছে, তোমারই ব্যাখ্যা করিতেছে—তোমারই অন্তর্নিহিত উপনিষৎকে যখন তুমি প্রত্যক্ষ কর, সমগ্র জগৎ তোমার আয়ত্ত হইয়া যায় তখনই। নিয়ত সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের ধ্যান কর।

যে অনুভূতি ক্ষণেকের তরেও প্রাণে চমক্ দিয়া গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহারি মনন করিয়া সমস্ত সংস্কারান্ধকার দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। তুমি যখন তোমার ভিতরে জাগিয়া ওঠ—তখনি ঠিক মন বশ হয়; যখন তুমি তোমাকে পাও, তখনি ঠিক তাঁকে পাওয়া হয়।

জগৎ জুড়িয়া সেই একেরই লীলা—সর্ব্বত্র একই রহস্য। বারবার আত্মহারা হইয়া সৃষ্টিই করিয়া যাইতেছি—নতুবা জগৎ টিকে না। জগৎকে প্রত্যাখ্যান নয়—"জগৎ" রূপেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। জীবনটা গোলমেলে মনে হইতেছে—ব্যস্, তাহাই মানিয়া লও—আপনি সে হাতে আসিবে।

তত্ত্ব দৃষ্টিতে সবই এক এবং চিরন্তন হইলেও জীবনটা কখনো চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয়—তাহা হইতে নিত্য নূতন রসের উদ্ভাবন হইতেছে। অন্তরাবৃত্ত হইয়া সে সুধা পান কর—ইহ-পর কল্পনার ঊর্দ্ধে সর্ব্বোচ্চে সে তোমায় লইয়া যাইবে। যথার্থ রস অন্তরে—তাই বাহিরের মন সব সময় তাহার দিশা পায় না, অবিশ্বাস করে। তুচ্ছকে তুচ্ছ ভাব, কিন্তু মহৎ হইতে বঞ্চিত ভাবিও না। * * *

অবিশ্বাসী মনের আমার যখন মোড় ফিরিল, সে এমনি করিয়া আলোয়-অন্ধকারে, জীবে শিবে, তাঁতে-আমাতে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ওরে, সামঞ্জস্য যে তোর নিজেরই মাঝে! তোর প্রেম হইতে জগতের কোন অস্তানই তো বঞ্চিত নয়। আয়, তুই আমার কোলে আয়! জগতের আর কোথায়ও যাহার স্থান না হইবে, আমার হৃদয় যে তারি জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে!

মন যখন সচেতন হইয়া গিয়াছে, আর কোন কথা নাই। এখন সে কিছুতেই নিঃশেষে যাহার-তাহার প্রবঞ্চনায়-প্রলোভনে বিবশ হইতে পারিবে না। নিজের মধ্যে নিজের চরম সে পাইয়াছে।

সমস্ত প্রাকৃত জগৎটা যেমন অলঙ্ঘ্য নিয়মের

কাছে মাথা নত করিয়া বিনা-বাক্যব্যয়ে চলিতেছে, সেও যদি সেইরূপ চলিতে পারিত, তবে কথা ছিল না।—কিন্তু তাহার, নিয়তিই এই—সমস্যার মাঝে আপন খুসীতে সে ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়া চরমে নিজকে বিজয়-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই আজ সে দুঃখী। এ দুঃখ তার শিরোভূষণ। সে যদি ঠকে, সেইটাই বড় বিচার্য্য নয়—আমি দেখিব সে কি চায়! দোষ সে করিয়াছে হয়ত কত, কিন্তু তার দরুণ বেদনাও কি পায় নাই?

যে যত বিপুল সমস্যার বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে পারিয়াছে, সে তত বড়। দুঃখকে সাধারণ জীব প্রত্যাখ্যান করে;—আহা, প্রত্যাখ্যান করিয়া এড়াইবার ক্ষমতা যদি তাহার থাকিত! কিন্তু যিনি আপন খুসীতে এই দুঃখকে বরণ করিয়া নেন, দুঃখ তাঁরই পায়ে মাথা নোয়ায়। এই হিসাবে যার যত দুঃখ বেশী, সেই তত বড় মানুষ বা মহা-পুরুষ। আজ গর্ব্বোদ্ধত অভিমানী মনকে আমার এই আদর্শ দিবারই সময় আসিয়াছে—সে আজ মাথা নোয়াইয়াছে।

আসলে দুঃখ বা দৈন্য তো আনন্দেরই একাংশ মাত্র; নতুবা তুমি তাহাকে সানন্দে বরণ করিলে কি করিয়া? মূলে অদ্বৈত আনন্দ সর্ব্বময়। এই জন্যই দেখি—প্রাণে যত আনন্দ পাই, দুঃখকে সহিয়া লইবার শক্তি তত প্রবল হয়, আপন খুসীতে নিজকে ব্যথার ব্যথী না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আনন্দে আর দুঃখে যে সন্ধি, তাই বেদনা, তাই কাব্য, সেখানেই সংযমের সার্থক প্রকাশ। দুঃখকে সকলেই ঘৃণা করে; কিন্তু যিনি দুঃখকে ভালবাসিয়া অভয় দেন, তিনিই ঋষি—যিনি কাহাকেও বাধা না দিয়া, কাহারও বাধা না হইয়া অবাধে আনন্দের জয়গানে মুখর প্রাণে স্তব্ধেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই ঋষি। এ জগতের সকল মনকে নিজের মনে অধিরূঢ় করিয়া সত্য জানিবার ঔদার্য্য তাঁহারই আছে! নিজের মনকে জানিতে গিয়া সকলের মনকে তিনি জানিয়াছেন। তাঁহার জীবন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-অশরণের শরণ—কাঙালের ঠাকুর নিষ্কিঞ্চন মমতার-মূর্ত্তি ভোলানাথ তিনিই। আমার মন আজ তাঁহারই আশ্রয় লইয়া তাহার সমর্পণ সার্থক করিয়াছে—নিজকে ভুলিতে শিখিয়াছে।

ওরে ভ্রান্ত মন! সুখের বেড়াজালে নিজকে আবদ্ধ করিয়া আজ আর কোন পৌরুষ নাই তোর! এ জগতে সবার চেয়ে অধিক অধীন যে, অথচ সবার সেরা স্বাধীন যে, সে যে ঐ তোর চোখের সম্মুখে; কিছুই করিতে হইবে না—শুধু একটীবার কষ্ট করিয়া চোখ চাহিয়া স্থাখ্!—তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে তোকে গ্রহণ করিতেছেন।

অলঙ্ঘ্য বিশ্ববিধানকে আপনার জ্ঞানে মানিয়া লইয়া আপন ব্যক্তিত্বকে মহিমান্বিত করিয়াছে যে, সে-ই তো নিজের ভিতরে এই ভোলানাথ স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছে।—যিনি সকল ভুলিয়া কেবল বুকে তুলিয়া লইতে জানেন—প্রতিনিয়ত জগজ্জীবের ব্যথিত বেদনায় যাঁর অন্তর প্রেম-সমুজ্জ্বল, যিনি এ বিশ্বের সকল জ্বালায় জ্বলিয়াও সদা স্মিতহাস্যপরায়ণ, সেই নীলকণ্ঠের বরাভয় হস্ত যে অনুপম সমবেদনাভরে তোর পানে উদ্যত রহিয়াছে। মাথা নত করিয়া তাঁহার চরণ চুম্বন কর্—ধ্যাননেত্রে তোরও অন্তরে তাঁরই প্রেম-মহিমাকে জ্ঞান-ভক্তিসমন্বয়ে আত্মহারা হইয়া অনুভব কর্!

ব্যর্থ কামনায় ভ্রান্ত-শ্রান্ত মনকে আমার আজ সেই ভোলানাথের চরণে লুটাইয়া পড়িতে দেখিলাম —আমি নিশ্চিন্ত হইলাম—সাধ্য সাধনের মূঢ় স্পর্দ্ধা নিভিল। দুই জন গলাগলি হইয়া বসিয়াছি—আমি আর আমার মন। দুঃখের কথা ভাবিয়া আমার অনন্ত কোটি জীবনের সেই অনাদি অতীতকে আজ মনে পড়িয়া যাইতেছে—বিরহের রেণু হইয়া হৃদয়-কমলে সে লগ্ন ছিল। জানি না, কি সার্থকতা

তাহার মুখে-চোখে ছিল—প্রথম দৃষ্টিতেই যে মধুর আত্ম-বিনিময়ের সাড়া পাইয়াছিলাম—হয়ত আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু ভোলানাথ আমার কিছুই ভুলিয়া যান নাই। সেদিনকার সে শুভ লগ্নের স্মরণে আবার আমার লুপ্ত জীবন জাগিয়া উঠিল; আমার প্রত্যাহৃত মনকে সে অমৃতের নিশানা পাওয়াইয়া দিয়াই তড়িদ্বেগে সকল আমিত্ব কোথায় মিলাইয়া গেল, বুঝিতে না বুঝিতে হারাইয়া গেলাম।

থাকিল শুধু ভোলানাথ—ভোলানাথের প্রেম; আর আমার আত্মভোলা শিশু মন।

ভোলানাথ, ভোলানাথ! সকল বেদনার অন্তরে অন্তরে তুমি আছ—আমিত্বের মায়ামন্ত্রের প্রাণ হইয়া তুমি আছ—মহাপ্রাণ আত্মসুখভোলা ভোলানাথ তুমি, জগতের সকল বিরহতপ্ত অনুতপ্ত মনের শান্ত-শীতল আশ্রয় হইয়া তুমি আছ, আছ! আমারও আত্মহারা মনের আশ্রয় হইয়া আমারো বুকে আজ তোমাকেই পাইতেছি। * * *

সেদিন ছিল শিবচতুর্দ্দশী। জীবনসমস্যায় সংসার যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতাশ হৃদয়ে বিল্বমূলে বসিয়া ছিলাম; প্রাণে প্রাণে একটা কিছু চাহিতেছিলাম। সে চাওয়া ব্যর্থ হয় নাই; আজ বলিব, কোন চাওয়াই কোন দিন ব্যর্থ হয় নাই—একটা অদ্ভুত রকম ইহ-জগদ্বিধানের বিপরীত দৃষ্টি সেদিন তুমি আমার খুলিয়া দিয়াছিলে। সেই হইতেই সকল জ্বালায় আরো উজ্জ্বল হইতে শিখিয়াছি, অনেক দুঃখ ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া যাইতে শিখিয়াছি। ভোলানাথের প্রভাব আমাকেও যেন সেদিন হইতে কতকটা 'ভোলানাথই' করিয়া তুলিয়াছে।

—১৪ই ফাল্গুন, শিবচতুর্দ্দশী

বিরহের মাধুর্য্য

—***—

ব্যথা বেদনাতেও আনন্দ—এই হচ্ছে বৈষ্ণব-কাব্যের বিশেষত্ব। কাজেই বৈষ্ণবের আনন্দ নিছক আনন্দের মাঝেই নিবদ্ধ নয়—তার সুখেও আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ। বৈষ্ণব-কাব্য এত মধুর, তার প্রধান কারণই হল—ভাবে-অভাবে, বিরহে-মিলনে এমন সমুজ্জ্বল কাব্য আর দেখা যায় না। রাধা চিরকাল বিরহানলে দগ্ধ, অথচ এই অনুনি-পোড়নির মাঝেই যেন তার কত শান্তি। অতৃপ্তির মাঝেও আনন্দে বিহ্বল হয়ে থাকা—এ কি সহজ কথা?

শান্ত প্রাণ অশান্ত হয়ে ওঠে, যখন আমরা পলে পলে অসীমের পরশ পাই। সীমাবদ্ধ-জীব তখনই অসীমের বুকে আপনাকে মিলিয়ে দিতে একান্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতাতেই তো আনন্দ। অন্তরে যখন বিরহানল জ্বলে ওঠে, অসীমের বেদনা যে বেশী করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে তখনই। আমি তখন বিহ্বল—বেদনায় আত্মহারা।

নিজকে হারিয়ে ফেলাতে যে কত আনন্দ, কত সুখ—এ তো যে নিজকে একবার হারিয়ে না ফেলেছে, সে কিছুতেই বুঝবে না। এই যে কখনো পাই—কখনো পাই না, বিদ্যুতের মত ক্ষণিক আনন্দোজ্জ্বল-দীপ্তিতে চিত্ত ঝলসিয়ে ওঠে—

এই তো মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্যের আস্বাদন যে-ই পেয়েছে, সে-ই যে পাগল—দিব্যোন্মাদ!

তৃপ্তির আনন্দের চেয়ে অতৃপ্তির আনন্দই বড়; কেননা তৃপ্তিতে যে তাঁকে পাওয়ার ব্যাকুলতা শেষ হয়ে যায়। অতৃপ্তিতে তো কেবল নব নব রূপে তাঁকে পেতেই থাকি, কাজেই অতৃপ্তি—বিরহই তো ভাল। বিরহে-বিচ্ছেদে যদি মিলনানুভূতির দিব্য পরশ না থাকত, তাহলে এতটুকু বুকে এই অসীম-ব্যথা কি সহ্য হ'ত? ব্যথার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে আনন্দোজ্জ্বল অনুভূতি, তাই মিলনের চেয়ে বিরহই এত মধুর।

সসীমের বুকে অসীমের বেদনা—এই তো সব চেয়ে বড় অনুভূতি। তখন কার না মন-প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, যখন এ দেহ পিঞ্জর ভেঙ্গে-চুরে অসীমের পানে ছুটে যাই? সে আকর্ষণে সব জলাঞ্জলি দেওয়া কঠিন নয়—তার দৃষ্টান্ত তো গোপীরাই। পতি-পুত্র সব ভুলে তারা সেই অদৃশ্য আকর্ষণে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে! এই অদম্য আবেগ সঞ্জাত হয় কিসে—আনন্দে নয় কি?

এই বিরহের তো শেষ নাই। চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন,—

> দোঁহার যে সমরস ভরত মুনি মানে।
> আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥

ব্রজের রসের সাম্য নাই—রসাস্বাদজনিত আনন্দ ক্রমশঃ কেবল বেড়েই চলে। যুগ-যুগান্তর ধরে বিরহ-মিলনের সুর বেজে চলছে—আজ পর্য্যন্ত তার বিরাম নাই। অনুভূতির কি আর শেষ আছে? আস্বাদনের বস্তুও অসীম, আস্বাদনের অনুভূতিও অসীম। কেউ কারও চেয়ে কম নয়! অনাদি অনন্ত মাধুর্য্য—বাঃ, কি সুন্দর!

বৈদান্তিকও দ্রষ্টা, গোপীরাও দ্রষ্টা। রাধা-কৃষ্ণের মিলন-মাধুর্য্য তারাই উপভোগ করছে। মিলনে যে সুখ—মিলন দেখে যে তার চেয়ে আরও বেশী সুখ!

এই মিলনের সুন্দর একটী বর্ণনা দিয়েছেন চরিতামৃতকার—

> বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়
> কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।

আবার বলছেন—

> এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
> মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
> সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে
> বিষামৃত একত্র মিলন।

বাইরে বিচ্ছেদ—অন্তরে মিলন, এই হল অন্তরঙ্গ অনুভূতির কথা। ভিতরে যাকে পাই, বাইরে তাকে পাই না, আবার বাইরে যাকে পাই, ভিতরে তাকে পাই না। অথচ কোনটাকে বাদ দিয়েও পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় না। এই দ্বন্দ্বের দোলাতেই বিরহ-মিলনের আস্বাদন!

রূপ যখন বড় হয়ে ওঠে—অরূপকে যাই ভুলে; আবার অরূপ যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন রূপকে যাই ভুলে। অথচ অন্তর চায়—রূপ-অরূপের একত্র বিলাস। কাজেই সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, এ চলবেই।

এই জ্বালাতেই তো রসাস্বাদন হয়, তাই তো তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। বাইরে অতৃপ্তিরূপ বিষে সকল অঙ্গ ছেয়ে ফেলে, আবার অন্তর শান্ত-স্নিগ্ধ অমৃতরসে প্লাবিত হয়ে যায়। একদিকে অভাবের নিদারুণ আর্ত্তনাদ, অন্যদিকে মিলনের মাধুর্য্য।

বিরহ জাগে তো তাঁকে উপলক্ষ্য করেই, কাজেই যে মুহূর্ত্ত থেকে বিরহ জাগতে আরম্ভ করে, সেই-থেকেই ক্রমশঃ তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একদিকে আমি জ্বলতে থাকি, অন্য দিকে তার পরশ পেয়ে দেহ-মন-প্রাণ ধন্য হয়ে যায়। বিরহকে ভাল লাগে কি সাধে?

সর্ব্বদা একটা ঔৎসুক্য জেগেই থাকে তখন। যাকে চাই তার সাড়া যেন আকাশে-বাতাসে সর্ব্বত্রই

অনুভূত হয়। এই বুঝি এল—এই বলে মন-প্রাণ উল্লাসত হয়ে ওঠে; আবার যখন দেখি, না তিনি আসেননি—তখনই ব্যথায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি। এই পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে সবার চিত্তই তো আন্দোলিত। তবে কি না গোপী হৃদয় এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা, মুহুর্মুহু হুঙ্কার লেগেই আছে।

এই ভাবাবেশে কার চিত্ত না বিহ্বল হয়? তখন যে দেহধারী হয়েও দেহাতীত। এই অব্যক্ত আনন্দের পরই আসে আবার দুঃখ—কেননা আবার দেহজ্ঞান ফিরে আসে। বিরহ মিলন দু'টা অবস্থাই পর্য্যায়ক্রমে আসে—কাজেই কোনটাতেই তো স্থিতি হয় না। আবার স্থিতিটাকে তো মন চায়ও না!

আমাকে আমি আস্বাদন কর্‌তে পার্‌ছি না, পেয়েও পাচ্ছি না—এতেই তো বিরহ। কাজেই দেহকে বল্‌ছি বাধা, মনকে বল্‌ছি বাধা, সবের প্রতিই একটা অবজ্ঞা। কিন্তু এরাই যখন অনুকূল হয়ে ওঠে—তখন এদের নিয়েই আমরা ধন্য হয়ে যাই। এই অপরূপ লীলায় মানুষ চঞ্চল না হয়ে থাক্‌তে পারে?

আস্বাদন করেও আবার অতৃপ্তি বেড়েই ওঠে। তাই বৈষ্ণব কবি বল্‌ছেন,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

এই যে দর্শন—রূপাতীতের দর্শন। কাজেই তাকে দেখেও তো দেখা শেষ হচ্ছে না।

গীতাসুধা

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ

—(*)—

দয়াতে আপ্লুতচিত্ত নেত্র অশ্রুপরিপ্লুত
বিষাদ ভাবেন ধনঞ্জয়।
তবে তারে হৃষীকেশ এই বাক্য উপদেশ
করিলেন হইয়া সদয়—
"কোথা গেল বীর্য্য-শৌর্য্য, চাতুরী গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য—
সকল হইল বিপরীত!
কোন্ হেতু, হেনকালে সশত্রু সঙ্কটজালে
এই মোহ হৈল উপস্থিত?
ক্ষুদ্রজনে যুক্ত হয়— উত্তমে উচিত নয়,
মোর বাক্য শুন ধনুর্দ্ধর!

স্বর্গকীর্ত্তি হৈল নাশ— লোকে হবে উপহাস,
বৃথা শোকে না হইও কাতর।
তোমারে সম্ভব নয়— ক্ষুদ্র শম গ্লানি হয়—
উঠ পার্থ করিতে সমর!"
শুনি গোবিন্দের বাণী যোড় করি দুই পাণি
ধনঞ্জয় করিল উত্তর—
"আমার কুলের আর্য্য পিতামহ দ্রোণাচার্য্য,
গুরুবৃন্দ পরমপুজিত;
বাক্যযুদ্ধ যাঁর সনে, মহা ভয় লাগে মনে—
বাণযুদ্ধ কেমনে উচিত?

সর্ব্বভূত শত হৈতে তাহাতে জাগয় !
যত নদ নদীগণ সমুদ্রেতে পড়ে,
সুস্থির স্বভাব সিন্ধু তথাপি না নড়ে ;
যেন মতে সুখ-দুঃখ সংযোগ হইলে,
স্থিরমতি সেই জন কদাচ না টলে ;
নানা দেশ হৈতে জল সমুদ্রেতে যায়,
সেই মত সর্ব্বকাম তাহারে যোগায় ।
সেজন লভয়ে শান্তি—শাস্ত্রের বচন ।
কামনা করিলে সিদ্ধি না হয় কখন !
উপস্থিত ভোগ দেখি যে করে উপেক্ষা ;
অপ্রাপ্ত ভোগের লাগি না করে অপেক্ষা ;
'এ ধন আমার' 'আমি' এই অহঙ্কার
কদাচিৎ যার নাহি, মুক্তি হয় তার !
বেদের তাৎপর্য্য এই কহিলো তোমারে—
ইহা যেই জানে মোহ না লাগে তাহারে !
জন্ম যে করে তার কিসের অভাব ?
অন্তকালে যদি হয় তবু মোক্ষ লাভ !
শ্রীগুরু চরণ পদ্মে করিয়া প্রণতি ।
পয়ার রচিলোঁ সাংখ্যযোগের বিভূতি ॥
(ইতি সাংখ্যযোগ নামে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)

হারাধন

দুঃখ পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি—সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মনও আজ স্তব্ধ-শান্ত অনুভূতিতে বিলীন—বসে বসে কেবল ভাবছি, আর বিস্ময়ে-পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে—বিধাতার কি ই না শুভ ইঙ্গত রয়েছে প্রত্যেকটী কাজে। হতাশ হয়ে কত কিছু আকাশ-কল্পনাই না করি আমরা—কিন্তু কৈ, আমরা যত অমূলক কল্পনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ি, বিধাতা তো তার মূলে অমন কোন নিষ্ঠুর নিয়তি দিয়ে রাখেন নি ! আমরাই ভুল বুঝি, আবার ভুল যখন ভেঙ্গে যায়, আমাদের অন্তরই শুভপ্রেরণায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে !

যে বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা হয়ত শিথিল কল্পনায় অস্পষ্ট হয়ে থাকত, সে বিশ্বাস যে হারানিধি হয়ে আবার আমার জীবনকে নূতন ব্যঞ্জনা, নূতন প্রেরণা দিচ্ছে—এ কি আমার কম সৌভাগ্য ?

নাস্তিক হয়েছিলাম, কূট তার্কিক হয়েছিলাম—তা বলে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিশ্বাস কি লোপ পেয়েছিল আমার ?" এক এক সময় অভাবের বেদনায় কাতর হয়ে পড়্‌তাম, কিছুতেই আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সামঞ্জস্য করে নিতে পার্‌তাম না—তখনই বিদ্রোহী মন বলে উঠ্‌ত—"থাক্ তোমার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা—এ দিয়ে তোমার হচ্ছে কি ?" অন্ধ মনের কথাতেই তখন সায় দিয়ে চলেছিলাম ! আজ যে জীবনের সে অটল-প্রতিজ্ঞা এক নিমিষে কোন অদৃশ্য শক্তির অমোঘ বিবর্ত্তনে ওলট্‌-পালট্ হয়ে গেছে। আমি দেখ্‌ছি যাকে হারিয়েছিলাম, তাকেই আবার নূতন করে পেয়েছি। কিম্বা অন্তরে তো আমার সে ভাবধারা অক্ষুণ্ণ ছিলই ; আমিই হয়ত অন্ধ ছিলাম—কিম্বা চোখে দেখেও যখন কোন সমস্যার সমাধান কর্‌তে পার্‌তাম না, সবই যখন "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে"—

তখন হয়ত মনের আক্ষেপেই বলতাম—মিথ্যা কথা, ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা এসব নিয়ে কিছু হয় না! আচমকা উজ্জ্বল আলো দিয়ে আমার কি হবে—আমার ঘরের আঁধার দূর করতে প্রতিদিনের দরুণ একটী প্রদীপই যে চাই! আক্ষেপে, পরিতাপে, না বুঝে কত কথাই না বলেছি, আজ তো আমার সে সন্দেহ মিটে গিয়েছে বিনা চেষ্টায়।

হারিয়ে পাওয়ার যে কি মূল্য—হারাধনকে পেয়ে আজ তা বুঝেছি। আমি দূরে ঠেলে দিলেও, নিষ্ঠুরের মত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলেও—আমাকে কেউ কাছে টেনে নিতে, স্নেহ করতে যে প্রতিনিয়ত ব্যগ্র—এ কথাটা তো আগে জানতাম না। স্বেচ্ছায় হোক্, দৈববশেই হোক্, দূরে সরে পড়েছিলাম বলেই না আজ সহসা মিলনে আমার অন্তর বিস্ময়-রসে এমন প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে! এখন দেখছি, শিথিল-বিশ্বাসের চেয়ে শুভ-মুহূর্ত্তে, না অশুভ মুহূর্ত্তে যে অবিশ্বাসের প্রবল বাত্যা এসে আমার যা কিছু ওলট্-পালট্ করে, ভেঙ্গে-চুরে একসা করে দিয়ে গিয়েছিল, তাতে আমার অনেকখানি লাভ, অনেকখানি মঙ্গলই সাধিত হয়েছে!

মোট কথা আজ যাকে ফিরে পেয়েছি—তাকে আর কোনও সন্দেহে, অবিশ্বাসে হারাব না—এ অটল-বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে আমার! অমন করে প্রত্যেক জিনিষকেই যাচাই করে বুঝে নিতে যদি পারতাম, তা হলে কত ক্ষণিক ভাব-অভাবের কুহেলিকা হতে মুক্তি পেতাম!

একঘেয়ে বিশ্বাসের মাঝেও আঘাতের প্রতিধ্বনি হওয়া প্রয়োজন। সব অবাধে মেনে নেওয়ার চেয়ে, প্রতি কথায় যদি কেন প্রশ্ন জাগে, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ কথা ঠিক, শাশ্বত সত্তাকে চিরদিন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আবৃত করে রাখতে পারব না। তার্কিক হই, নাস্তিক হই, প্রাণের কথা একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই পড়বে! তখন হয়ত ফিরে আবার আমাকেই বলতে হবে—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর!"

বেশ তো ভাল কথা, গৌরবের কথা—না মেনে যখন পারব না, তখন মানব। মানব যখন, তখন মন-প্রাণ লুটিয়ে দিয়ে মানব। আমার কাছে আমি তো অধীন নই; তেমনি বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভক্তিতে এরা যদি আমারই হয়ে থাকে, তা হলে এদের না মেনে থাকব কেমন করে? কিন্তু আমার যারা, তারা আমার দুঃখের সময়ও অচেতন থাকবে—এ কথা কিন্তু আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না। আজ যে তারা আমার দুঃসময়েও ফাঁকি দেয়নি, এ কথাটি বুঝতে পেরেছি বলেই না নিঃসন্দেহে সবকে স্বীকার করছি। বুঝতে পারিনি, স্বীকার করিনি—এ তো সহজ কথা! আমার যা থাকবার তা থাকবেই, অবজ্ঞা দ্বারা কি তাকে বিচলিত করতে পারব?

সাধারণতঃ মানুষ বলে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি লোপ পেয়ে যায়! কিন্তু আমি বলি, চিরদিন একভাবে যাওয়াটাই কি সব চেয়ে বড় কথা হল?

আত্মার কথাই ধরা যাক্; যে বুদ্ধির প্ররোচনায় মনটা বিষয়াভিমুখী হয়ে যায়; তাকে যদি আত্মশক্তি উল্টো নিবৃত্তিমুখী না করতে পারে—তা হলে আত্মা-আত্মা বলে লোকমুখে শুনা অদৃশ্য হিতকারী বন্ধুকে স্বীকার করা আর না করাতে লাভ? অল্প বয়সে বুদ্ধির পরিসর অনেক কম থাকে, কাজেই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহজেই উদ্ভূত হয়; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বহির্জগতে বিচিত্র কর্ম্মপথে বিচরণ করতে হয়—এই বৈচিত্র্যের মাঝেও যদি ঐক্য-রস অনুভূত হয়—তা হলে এটা কি তার চেয়ে উন্নত অবস্থা নয়?

সরল-বিশ্বাসে যাকে রস-ঘন-বিগ্রহরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, জ্ঞানের তীক্ষ্ণ বিচারে সব সংস্কার কেটে ছেঁটে যে তাকে আজ তত্ত্বরূপে পেয়েছি—একি আমার কম সৌভাগ্য! বরঞ্চ আজ তাকে আরও বুকের কাছে—আরও নিবিড় করে পেয়েছি! আমা-

রই অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-ভক্তির ঘনীভূত আবেগ মূর্ত্তি ধরে আমাকেই ভুলাত। চিরকাল বিস্ময়ে পুলকে তাকে স্তুতি করে যাওয়াটাই সব চেয়ে বড় কথা হল—আর সে যে আমারই বুকের বেদনা-মথিত অনুভবের মূর্ত্তবিগ্রহ, এ কথাটা জানা কি কিছুই নয়?

হারাইনি কিছুই—নূতন করে পেয়েছি। এখন আর আমার কিসের ভয়, কিসের দৈন্য!

বিবাহিত জীবনে সত্যলাভ

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

"বিবাহিত ব্যক্তির কি সিদ্ধিলাভের আশা আছে? সে কি আত্মোপলব্ধি করতে পারে?"

প্রমাণ করা যেতে পারে, সন্ন্যাসী মুনিঋষির চেয়ে বেদান্ত বেশী দরকার বিবাহিত ব্যক্তির। যারা হিমালয়ে থাকে, তাদের চেয়ে যারা ঘরে থাকে, তাদেরই বেদান্ত দরকার।

প্রত্যেক পরিবারেই দেখবে, স্বামী চায় স্ত্রীকে সুখী করতে, আবার স্ত্রী চায় স্বামীকে সুখী করতে। উদ্দেশ্য খুবই ভাল বটে; কিন্তু ফল কি দাঁড়ায়? তারা পরস্পরের পতনই ঘটায়, নয় কি? আচ্ছা, কার দোষে এমন হয়? তাদের ওই আকিঞ্চনের কি দোষ? তা তো নয়। দোষ তাদের অজ্ঞানতার। কিসে যে পরস্পরের কল্যাণ হবে, তা তারা জানে না। ও হতেই যত দুঃখ আর ঝামেলার সৃষ্টি।

তারা মনে করে, পরস্পরের ইন্দ্রিয়বৃত্তির হীন চরিতার্থতার আয়োজনেই বুঝি সুখ। পরস্পরের অভিমানকে যখন তারা ফাঁপিয়ে তোলে, ভাবে, তাতেই বুঝি সুখ। কিন্তু এমনি করে সুখ পাওয়ার চেষ্টা অজ্ঞানতারই নামান্তর মাত্র। এই অজ্ঞানতা দূর করতে পারলেই গৃহের শান্তি।

মনে রেখো, ভগবানকে বদলানো যায় না, প্রকৃতির আইন টলে না। বিধির বিধান আর প্রকৃতির আইনই হচ্ছে যে, মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করবে। জগতের যত মোহ, সংসারীর যত চূড়ান্ত সংসারীপনা, সবই কিন্তু মানুষকে ব্রহ্মের দিকে প্রচোদিত করছে, মানুষকে ভগবানের সঙ্গে একাকার করে দেবার পথে নিয়ে চল্‌ছে।

বেদান্তের সত্য তোমার কাছে সপ্রমাণ করবার জন্য লাঠী-সোটার দরকার হয় না। প্রকৃতির আইনই হচ্ছে ভগবানের পেয়াদা, আত্মোপলব্ধির পথে তারাই তোমায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওই ঠেলা পেলেই না তুমি তাঁর দিকে চল; আর তখন না চলেও তো আর উপায় নাই!

প্রকৃতির আইন মেনে যদি চল, তবেই তুমি মানুষের কিছু উপকার করতে পারবে। তখন দেখ্‌বে, প্রতি গৃহে, এমন কি জঘন্য কারাগারে পর্য্যন্ত স্বর্গ নেমে এসেছে বা ভগবান্ বিরাজ করছেন।

প্রকৃতির আইন বল্‌ছে, ব্রহ্ম আর আত্মার একত্বোপলব্ধির হচ্ছে যথার্থ জগতের হিত। তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজকে মুক্ত করা, আর নিজকে

মুক্ত করা হচ্ছে নিজকে সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি করা। সমস্ত সিদ্ধির চরম ওই—তুমি আর ব্রহ্ম এক। এই যে মনে করছ, আমি "অমুকের ছেলে"—এ স্বপ্ন বলে ভাবতে হবে, এ হচ্ছে একটা গত কথা; এ ভাবতে পারলেই ব্রহ্ম-মহিমা তোমার মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তোমার দুঃখ ধাক্কাও যে তোমাকে সেই পথে নিয়ে যাচ্ছে। এটা একেবারে গণিতের আইন দিয়ে তোমায় পরখ করিয়ে দিতে পারা যায়; তখন ঠিক বুঝতে পারবে. প্রকৃতির আইনই হচ্ছে যে আমরা স্বরূপোলব্ধি করব। তুমি ওই আদর্শে পৌছাতে পারছ না বলেই না দুঃখ পাচ্ছ। উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত ওখানে পৌছালে তোমার আর পাপের ভয় নাই—তুমি সব কিছুর ওপরে। তুমই ব্রহ্ম, পরিপূর্ণ আত্ম-স্বরূপ।

এক লাফে সিদ্ধি পাওয়া যায় না। একটু সময় লাগে। আজকার এই মানব দেহটা গড়ে তুলতে প্রকৃতির কোটী কোটি বছর লেগেছে।

অতীতে তুমি হয়ত উদ্ভিদ্ ছিলে, কি আফ্রিকার অসভ্য বাসিন্দা ছিলে, হয়ত এ দেশ তোমার ঘর ছিল না—এমনি করে করে না আজ তুমি এই হয়েছ।

একটা ঘর তৈরী করতে যে সময় লাগে, ভঙতে সে সময় লাগে না! যদি বারুদ বা শক্তি প্রচুর থাকে তো এই মুহূর্ত্তেই সেটা চুরমার করে দেওয়া যায়। কিন্তু মুস্কিল এই, সবার এতখানি বারুদ নাই যে ঘরটা উড়িয়ে দেবে!

বেদান্ত বলছেন, স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর কর না কেন, এই দর্শনটা যদি অন্ততঃ তোমার বুদ্ধির সম্পূর্ণ আয়ত্তও থাকে, তা হলেই তোমার জীবনের রূপান্তর হবে, তুমি মুক্ত হবে, আর তোমার বারবার সংসারে আসা যাওয়া করতে হবে না। এ জীবনে ব্রহ্মানুভব করতে আর তোমায় তেমাথায় বসে থাকতে হবে না। মৃত্যুর পর যে সুখপ্রাপ্তির কত শোনা যায়, তা পেতে হলে যারা বেদান্তকে বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করেছ, তাদের উচিত বেদান্তকে কর্ম্মে ফলিয়ে তোলা। তাদের বেদান্ত ভাবতে হবে, বেদান্তে বাঁচতে হবে।

তোমাদের দেশেই বলে, তোমাদের বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় আছে—কর্ম্ম-পথে মুক্তিলাভ; আর নূতন সংহিতায় আছে ভক্তি-বিশ্বাসের পথে মুক্তি লাভ। কিন্তু বাস্তবিক আনন্দ লাভ হয় জ্ঞানের পথে।

কেবল কর্ম্মে মুক্তিলাভ হয় না। কেবল যীশুতে বিশ্বাস রাখলেই মুক্তি হবে না। মুক্তি তোমার নিজের সাধনা; তোমার নিজকে বুঝতে হবে; যে মুহূর্ত্তে নিজকে জানবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি মুক্ত।

জানাও দু'রকম—বুদ্ধি দিয়ে আর অনুভব দিয়ে। অনুভব দিয়ে আত্মাকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান; জীবন্ত বিশ্বাস বা জীবন্ত জ্ঞানে মুক্তি, এই তোমাকে পেতে হবে। এ পথ ছেড়ে দিলে কেবল হাহাকার। ঠিক এই ধরে তোমার চলতে হবে।

সাধারণতঃ ঘর সংসারে কি হওয়া উচিত? স্বামী-স্ত্রীর উচিত আপন আপন মুক্তি-পথ সন্ধান করতে পরস্পরকে সহায়তা করা—যথার্থ এবং পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করা। তারা যদি তাই করে, স্ত্রী যদি স্বামীকে আত্মোপলব্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলে স্ত্রীই হল স্বামীর মুক্তিদাতা খৃষ্ট। এমনি করে স্বামীও স্ত্রীর মুক্তিদাতা হতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ হয় কি? স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছে খৃষ্টস্বরূপে না ফুটে, হয় Judas Isacriot!*

তোমার অজ্ঞানতাই তোমায় টেনে নামাচ্ছে—সংসারের আছ বলে সে যে তোমায় টেনে নামাচ্ছে, তা কিন্তু নয়। সংসার-সম্বন্ধের ব্যভিচার হয় বলে

* Judas Isacriot খ্রীষ্টের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল; বিশ্বাসঘাতকতা করে ত্রিশটী মুদ্রার লোভে সে খ্রীষ্টকে শত্রুহস্তে দেয়।

গুরু বধ না করিলে যদি রাজ্য নাহি মিলে,
তবে নিবেদিহে মহাশয়!
দ্বিজধর্ম্ম করি শিক্ষা আসিয়া খাইব ভিক্ষা—
ইহলোকে সেই শ্রেয়ঃ হয়॥
যদি তারা রক্তলোভে সমরে আইল ক্ষোভে,
তথাপি না হয় উপযোগ।
গুরু বধ মহাপাপ করিয়া পাইব তাপ—
ভুঞ্জিব রুধির-মাখা ভোগ!
কিবা আমি জানি বল, কিবা রাজা দুর্য্যোধন,
নাহি জানি এক নির্দ্ধারণ।
করিয়া যাহার নাশ, জীবনে না করি আশ,
তাহারা সমরে শত জন!
এই তো কার্পণ্য হয়, আর দোষ—কুলক্ষয়,
দুই দোষে সত্য হবে হত।
যুদ্ধ ছাড়ি ভিক্ষা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম,
হয় নয় বেদের সম্মত?
যাতে মোর শুভ হয়— পরলোকে ইষ্ট হয়,
সেই কর্ম্ম করো হৃষীকেশ;—
সেবক শরণাগত যে তোমার অভিমত,
কৃপা করি করো উপদেশ।
অকণ্টক অধিকার— পৃথিবী স্বরগে যার
পাইলেও না দেখি উপায়।
ইন্দ্রিয়-শোষণকর, এই শোক গদাধর,
যে কর্ম্ম করিলে দূরে যায়।"
এত কহি কহে সার— "যুদ্ধ না করিব আর",
শোক মোহে আকুল হইয়া।
কৃষ্ণ আগে এই কথা কহিয়া অর্জ্জুন তথা
মৌনী হয়ে রহেন বসিয়া॥
শুনিয়া এতেক বাণী সর্ব্বদেবশিরোমণি
হাসিয়া কহিলা যদুরায়—
"জন্ম মৃত্যু ভয় নাশা সদা পড়ো গীতা-ভাষা
শ্রবণে শমনভয় যায়।"

* * *

অর্জ্জুনে বিষণ্ণ হেরি প্রভু ভগবান্
নানান প্রকারে তত্ত্ব তাহাকে বুঝান।
সখেদ বিষম শোক করয়ে সর্ব্বদা,
জ্ঞানী হ'য়ে কহ তুমি মূর্খবৎ কথা!
কিবা জ্যান্ত কিবা মরা উভয় কারণ
কদাচৎ শোক না করয়ে বুধজন।
লীলায় শরীর আর ভারতের ভাব
কার্য্য অনুসারে হয়, নাহিক অভাব॥
চিদানন্দময় তনু করণ কারণ;
বেদ না বুঝিয়া বাদ করে অজ্ঞজন॥
তুমি আর যত এই দেখ রাজগণ,
পূর্ব্বেতে আছিলা সব আছয়ে এখন;
পশ্চাতে থাকিবে ইহা জানিও নিশ্চয়—
আত্মা নিত্য জ্ঞানরূপ নষ্ট নাহি হয়॥
কৌমার যৌবন জরা শরীরে যেমন
বিনা যত্নে আসে-যায়, না রহে কখন।
দেহান্তরপ্রাপ্তি হেন যত ব্যবহার;
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানিয়া তাহার॥
ইন্দ্রিয়গণের হেন বিষয় সংযোগ,
তবে হয় শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ ভোগ।
রৌদ্রেতে রহিতে যেন উষ্ণ-পীড়া করে,
শীত লাগে রহিলে যেমতি ভিতরে;
পুনঃ পুনঃ হয় যায় কিন্তু স্থির নয়।
এতেক বুঝিয়া ক্ষমা দেহ ধনঞ্জয়॥
ইহারা যাহাকে দুঃখ না দেয় কখন,
সম সুখ-দুঃখ সেই মুক্তির ভাজন।
অতিশয় সহিতে শরীর নাশ যায়
যদি বল, তবে তার কহি যে উপায়—
অনিত্য শীতাদি ধর্ম্ম না রহে কথন
জন্মজরা মৃত্যুশূন্য আত্মা সনাতন।
দেহ-ধর্ম্ম, আত্ম-ধর্ম্ম উভয়ের ভেদ
দেখিয়া পণ্ডিত জন নাহি করে খেদ।
জগৎরূপী অবিনাশী জানিও তাহারে—

অব্যয়স্বরূপ আত্মা কে নাশিতে পারে ?
সর্ব্বকাল একরূপ, না হয় বিনাশ ;
জীব-আত্মা দেহধারী শুদ্ধ চিদাভাস
মরণ শীতাদি বস্তু এই দেহ তার ;
তত্ত্বদর্শী জনে কহে করিয়া বিচার।
বিনাশরহিত আত্মা নাহি পরিচ্ছেদ ;
সে জনে করয়ে শোক, যে বুঝয়ে ভেদ।
মিথ্যা শোকে নিজ ধর্ম্ম না করিয়ে ত্যাগ
যুদ্ধ করো—শুনহ ভারত মহাভাগ !

'আত্মা মোর' যে কহে, বলে 'আত্মা মরে'
সেই দুই জনা অন্ধ সংসার ভিতরে।
জন্ম-মৃত্যু হ্রাস-বৃদ্ধি পরিণামহীন ;
দেহ নাশে নাহি নাশ সর্ব্বদা নবীন।
যে না কহে 'আত্মা জন্ম মরণ বর্জ্জিত,'
সে কেন মারিতে কাছে হবে উপস্থিত ?
আর কোন জনে যদি কোন জনে মারে,
সে জন প্রবৃত্ত নহে তাহার ভিতরে।

পুরাতন বস্ত্র ছাড়ি নবীন বসন
যেমন সকল লোকে করয়ে গ্রহণ,
হেন মতে জীব জীর্ণ দেহ তেয়াগিয়া
নতুন শরীর পায়, শুন মন দিয়া।
অস্ত্রে নাহি কাটে, অগ্নি না করে দাহন,
জলে নাহি পচে, আত্মা না শোষে পবন,
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য যেই অক্লেদ্য, অশোষ্য ;
সর্ব্বকালে একরূপ থাকয়ে অবশ্য।
সুস্থিরস্বভাব হয় সর্ব্বত্রব্যাপিত ;
ইন্দ্রিয়গোচর নহে আকাররহিত ;
মনের অচিন্ত্য বস্তু নাহিক বিকার ;
এতেক জানিয়া শোক না করিও আর।

দেহের জনমে যদি জন্মকর্ম্ম মান,
দেহ নাশে মৃত্যু ব্যবহার যদি জানো,
তথাপিহ মহাবাহো ! শোক অকারণ—
মরিলে জনম আছে জন্মিলে মরণ।

এই দুই খণ্ডিতে পারে কাহার শকতি ?
যে জন খণ্ডিতে পারে সে লভে মুকতি !

শরীর কারণ অনাদি প্রধান প্রকৃতি ;
প্রলয়ের পর পুনঃ সেইরূপে স্থিতি।
জন্ম-মৃত্যু মধ্যে কিছু কালব্যবহার—
সে বিষয়ে কোন্ শোক, বিলাপ কাহার ?
অলৌকিক বস্তু আত্মা নিত্যসুখময় ;
দেহ অভিমানে তার সুখ-দুঃখ হয়।
তার মূল ত্রিগুণান্তঃকরণসম্বন্ধ—
যাহা হৈতে জন্ম-মৃত্যুরূপ ভববন্ধ।
বাদিয়ার বাজি তুল্য দুর্ঘট ঘটনা,
শাস্ত্র গুরু উপদেশে দেখে কোন জনা ?

আশ্চর্য্যের তুল্য এই বলে কোন জন ;
আশ্চর্য্যের মত কেহো করয়ে করয়ে শ্রবণ ;
দেখিয়া কহিয়া আর করিয়া শ্রবণ,
তথাপি ইহাকে নাহি জানে কোন জন !

আত্মা নিত্য সর্ব্ব দেহে কভু বাধ্য নয় ;
অতএব নহে কিছু শোকের বিষয় !

কম্পিত না হৈও পুনঃ দেখিয়া স্বধর্ম্ম—
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হৈতে বড় কোন্ কর্ম্ম ?
অনায়াসলভ্য মুক্তি স্বর্গের দুয়ার—
সেই বড় ভাগ্য বস্তু ইহা থাকে যার !

যদি এই ধর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ না করিবে,
তবে ধর্ম্মকীর্ত্তি ছাড়ি পাতক ভুঞ্জিবে ;
তোমার অকীর্ত্তি লোকে কহিবে অনেক—
উত্তমের অপযশ মরণাতিরেক।
'ভয়ে যুদ্ধ ত্যজিল' কহিবে বীর সব—,
শ্রেষ্ঠ হৈয়া লঘুস্থানে পাইবে লাঘব।
সামর্থ্য নিন্দিয়ে মন্দ বলিবে অপার—
শত্রুগণ নিন্দিবেক, কোন্ দুঃখ আর ?
মরিলে পাইবে স্বর্গ, নাহি ব্যভিচার ;
জিনিলে করিবা ভোগ রাজ্য অধিকার।
অতএব যুদ্ধে মন করিয়া নিশ্চয়

মিথ্যা শোক ত্যাগ কর কুন্তীর তনয় !
সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়,
সমভাব করি দেখে—নাহি পাপ ভয় !
এই বুদ্ধি দেহ আত্মা তত্ত্বের বিচারে
বিশেষ করিয়া আমি কহিলুঁ তোমারে।
কর্ম্মযোগ বুদ্ধি কহি শুনো মন দিয়া,
যাহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ যাইবে খসিয়া।
আরম্ভ হইলে পুন নাশ নাহি যায় ;
অঙ্গভঙ্গে কদাচিৎ পুণ্য নাহি ব্যয়,
এই ধর্ম্ম অল্প যদি করে অনুষ্ঠান।
মহাভয় হৈতে তবে পায় পরিত্রাণ ॥
ঈশ্বরেতে ভক্তি হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,
দৃঢ়তর চিত্ত এই করিয়া নিশ্চয়,
ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম করি আচরণ—
সেই কর্ম্মযোগ হয় ভক্তির কারণ ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এই এক রূপ ;
অব্যবসায়াত্ম বুদ্ধি অনেক স্বরূপ।
গুণ কর্ম্ম ভেদে যত বাসনা অনন্ত ;
তার ভোগ ভুঞ্জে জীব জীবন পর্য্যন্ত।
বিষলতা পুষ্প যেন দেখিতে সুন্দর,
ঘ্রাণ লৈলে করে সর্ব্ব শরীর জর্জ্জর ;
এই মত জানি তবে বেদে ফলশ্রুতি,
না বুঝিয়া মূর্খ লোক করে তার স্তুতি।
"পাইব অক্ষয় স্বর্গ হইব অমর ;—
আর কোন্ কর্ম্ম আছে উহার উপর ?"
কামেতে আকুল চিত্ত অন্য নাহি জানে ;
স্বর্গভোগ প্রাপ্তিফল বড় করি মানে।
জন্ম কর্ম্ম নাহি যায় হয় পুনর্ব্বার ;
নানারূপ কর্ম্মকাণ্ড অশেষ প্রকার।
হেন কর্ম্ম প্রশংসয়ে যেই বেদগণ,
সে বেদে রাখেন হৈয়া প্রফুল্ল বদন।
কামে-লোভে হরিয়া লইল যার মন,
ঈশ্বরে তাহার নিষ্ঠা না জন্মে কখন।

স্বর্গ আদি যত লোক কেহ সত্য নয় !
কেমনে প্রকারে স্বর্গ ভুঞ্জিবে অক্ষয় ?
ত্রিগুণে সকামী অধিকারী যেই জন,
তাহাকে বুঝয়ে সেই সর্ব্ব-শ্রুতিগণ।
তুমি তো নিষ্কাম হও ফল তেয়াগিয়া,
শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ সমান করিয়া ;
সত্যগুণে কার্য্য হয় যে সব আচার,
সর্ব্বদা সে সব কর্ম্ম কর ব্যবহার ;
রাখিতে প্রস্তুত দিব্য না করি যতন,
অপ্রস্তুত দিব্য লাগি না করি ক্ষোভন—
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী আত্মা পরম ঈশ্বর,
তারে ভজ, এই বিশ্ব জানিয়া ঈশ্বর !
ঘ্রাণ পান সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি যাতে হয় ;
যে জনা সে জনা যায় সেই জলাশয়।
অল্প-জলে সর্ব্ব কর্ম্ম নয় নির্ব্বাহন।
না বুঝিয়া দুঃখ ভুঞ্জে আশ্রমিক জন।
এই মত বেদ জানি ব্রাহ্মণ আচরে,
মোক্ষহেতু ফল যোগ কর্ম্মমাত্র করে।
কর্ম্ম অধিকার আছে আচর এখন,
জ্ঞানী তুমি কর্ম্মফলে নাহি দিবে মন ;
প্রবৃত্ত না হ'য়ো কর্ম্মে ফলের কারণ !
ভববন্ধ কর্ম্ম ভোগে না করো যতন ॥
কর্ত্তা ভোক্তা অভিমান দূরে তেয়াগিয়া,
কর্ম্ম করো ঈশ্বরেতে তৎপর হইয়া।
এইরূপে কর্ম্মফলে হয় জ্ঞানলাভ ;
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তার হয় সমভাব।
'যোগ' শব্দ অর্থ এই সমভাব চিত্তে ;
কর্ম্ম করে ভক্তিযোগ পাবার নিমিত্তে।
ব্যবসায়বুদ্ধি হৈতে শুন ধনঞ্জয় !
কাম্য-কর্ম্ম দূরে রহে অতি তুচ্ছ হয় !
বুদ্ধি হেতু কর্ম্ম করো দড়াইয়া মন—
হীনবুদ্ধি সেই সব ফলাকাঙ্ক্ষী জন !
পুণ্য-পাপ এই দুই জীবের বন্ধন,

ভক্তজনা এই কর্ম্ম করয়ে খণ্ডন।
অতএব কর্ম্ম করো জ্ঞানের কারণে ;
কর্ম্মের কুশলে মোক্ষ—জ্ঞান সর্ব্বজনে ;
কর্ম্মফল ত্যেজি জ্ঞানী ভকত হইয়া,
বন্ধ মুক্ত হৈয়া যায় বৈকুণ্ঠে চলিয়া ॥
দেহ ভৃত্য-পুত্র আদি যত পরিবার,
এ সকলে আত্ম-বুদ্ধি অতি দুর্নিবার !
ভক্তি হ'তে ঈশ্বরের করুণা পাইয়া
যখন তোমার বুদ্ধি যাইবে তরিয়া ;
এ সব শুনিয়া যেবা করে আচরণ,
এ দুইতে তখন নাহিক প্রয়োজন ॥
লৌকিক বৈদিক নানা শুনিয়া উপায়,
নিরবধি সে সব বিষয়ে মন ধায়।
তাহা ছাড়ি যার বুদ্ধি সুস্থির হইবে,
সর্ব্বদা ঈশ্বর ভাবে একান্তে রহিবে,
তখন পাইবে তুমি পরম-ভক্তি যোগ—
যাহা হৈতে খণ্ডিবে সংসারদুঃখ ভোগ ॥
অর্জ্জুন কহেন—হরি ! করি নিবেদন,
স্বভাবসমাধি সিদ্ধ হয় যেই জন,
কিরূপ লক্ষণ তার, কিরূপ কথন ?
কহিবে আমারে তাহা শ্রীমধুসূদন !
সর্ব্বকাম ত্যেজি যবে হয় আত্মারাম,
স্থিরপ্রজ্ঞা বলিয়া তখন হয় নাম।
দুঃখেতে উদ্বেগ নাহি, নাহি সুখে ক্ষোভ ;
রাগ ভয় ক্রোধ-শূন্য কিছু নাহি ক্ষোভ ;
মুনি শব্দে বলে যেই রূপের বিধান,
কোন স্থানে শ্রেয় নাহি, সর্ব্বত্র সমান ;
অন্য হৈতে যবে সুখ দুঃখ উপজয়,
ঈশ্বরেতে মন থাকে নির্ম্মল আশয় ;
করিতে বিরাগী যদি কর এ যতন,
তথাপিহ না হইবে শুন হে অর্জ্জুন !
ক্ষোভ হেতু ইন্দ্রিয় বড় এই দুরাচার,
বশেতে করিয়া চিত্ত লয় ত তাহার ;

তাহাকে করিয়া বশ আমা-পরায়ণ
যে হয়, সে জন যোগী তার স্থির মন !
বিষয় ভাবিলে ক্রমে তাহাতে আসক্তি ;
তাহা হৈতে কাম জন্মে না হয় বিরক্তি ;
কেহ যদি ভঙ্গ করে সেহ ত কামনা,
তবে ক্রোধ হৈতে নষ্ট হয় বিবেচনা ;
শাস্ত্র গুরু উপদেশ না রহে স্মরণ,
মৃত তুল্য থাকে যার বুদ্ধির চেতন।
বিষয়ের এই দোষ করিলে ভাবনা,
তথাপিত ছাড়িতে না পারে কোন জনা !
তবেত ঈশ্বরে নিষ্ঠা জন্মিবে কেমনে ?
উপায় কহিবে তার শুন একমনে—
ইন্দ্রিয় সহিত মন বশ যে করিয়া,
কর্ম্ম-উপার্জ্জিত ভুঞ্জে আসক্তি ত্যেজিয়া ;
এই মত আচার করিলে শান্তি পায়,
তাহার সকল দুঃখ অবশ্য পালায় !
শমভাব হৈয়া তাহার চিত্ত প্রসন্ন,
ঈশ্বরে নিশ্চলা বুদ্ধি হয় ত উৎপন্ন।
অবশ ইন্দ্রিয় যার, যার নাহি বুদ্ধি।
কেমতে ভাবিবে তার চিত্তে নহে শুদ্ধি ?
ঈশ্বরে ভাবনা বিনা নিষ্ঠা সুদুর্ল্লভ ;
শান্তি বিনা নহে মুখ্য-সুখ অনুভব।
সকল ইন্দ্রিয় করে বিষয় ভ্রমণ ;
সে কথা রহুক দূরে যদি একজন
মনের সহিত করে বিষয় সঞ্চার,
সেইক্ষণে হয় প্রজ্ঞা না রহে বিচার !
কর্ণধার সাবধানে বিনা বায়ুবেগে
দৃষ্টান্ত যেমন নৌ যায় নানা দিকে ;
অতএব মহাবাহু ইন্দ্রিয়সকল
যাহার বশেতে, তার বুদ্ধি নিরমল।
জ্ঞান নিষ্ঠা বিষয়ীর রজনী সমান,
তাহাতে জাগয়ে যোগী হৈয়া সাবধান ;
জ্ঞানীর বিষয়ে নিষ্ঠা রাত্রিতুল্য হয়,

তোমরা এত জ্বালা পাও। সংসারের স্ত্রী হচ্ছে একেবারে Judasএর অবতার। সে চায় স্বামী ত্রিশটা মুদ্রার বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করুক! আর নিজে? নিজেও দেহটাকে সাজাতে দু-চার খানা গয়নার দরুণ বা ঘর সাজাতে দু চারটা দরুণ আত্মবিক্রয় করছে। স্বামীর উচিত স্ত্রীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করা; স্ত্রীর উচিত স্বামীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করা। কিন্তু স্বামী চায়, স্ত্রীটা তার বাঁদী হয়ে থাকুক, আর স্ত্রী চায় স্বামীটা হোক্ তার গোলাম! এ চায় তাকে বশ করতে, ও চায় একে বশ করতে!

বলেছি তো একটা গরুকে যদি দড়ি দিয়ে বেঁধে ধরে রাখ্‌তে চাও, তাহলে তুমিই যে শুধু গরুটাকে ধরে রাখ তা নয়, গরুটাও তোমায় ধরে রাখে। সম্পত্তি আর খাসদখল মাত্রেই বন্ধন।

বেদান্ত বলেন, প্রত্যেক সংসারই স্বর্গ হতে পারে, যদি তাতে ওই দখলী-স্বত্ব নিয়ে কামড়াকামড়ি না থাকে—যদি লোকে দিতে চায়, নিতে নয়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কল্যাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কিছু চেয়ো না, কিছুর আশা করো না—সব পাবে। তোমার হৃদয় হবে নন্দনবন।

তুমি বল, আমি এটা চাই, ওটা চাই। তা নয় পেলেই। তারপর যদি জিনিষটা সরিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে তোমার দুঃখ হয়, ওটাকে ফিরে পাবার জন্য তোমার ব্যাকুলতা হয়। বাসনা হচ্ছে একটা ব্যাধি, ও তোমায় এমনি করে শূন্যে টাঙিয়ে রাখে।

তারপর কামনার বস্তু যখন পেয়েছ, তখন সুখও হয়ত পেয়েছ; কিন্তু দোটানার মাঝে পড়ে কি অস্বস্তিতে কাটাতে হয়েছে কতক্ষণ।

যদি কিছু পাবার আশা না করে শুধু দিয়ে যাও, তাহলে দেখ্‌বে দিয়েই সুখ। যাই কিছু দাও না কেন, তাতেই সুখ। নেওয়াতে সুখ খুঁজো না যেন, দেওয়াতে সুখের সন্ধান কর। দেওয়াতে সর্ব্বদাই আনন্দ। গির্জ্জায় পঞ্চাশটা টাকা দিলে; দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেলে মনে শান্তি।

দাতার আসন নাও, দেখবে তুমি আনন্দের বিগ্রহ।

সংসার সুখের হয় কিসে, জান? স্বামী স্ত্রী যদি এই দাতার আসন নেয়, কেউ যদি কারু কাছে কিছু না চায়। তা হলেই তাদের সুখ। দিতে হবে জ্ঞান; স্বামী যতটুকু পারে দিক, না হয়ত স্ত্রী যতটুকু দিতে পারে দিক্। স্বামীর বা স্ত্রীর কর্ত্তব্য তখনই যথাযথ করছ বলব, যখন জান্‌ব, একজন আর একজনকে আরো শুচি ও সুন্দর করে তুল্‌তে চেষ্টা করছ। এটাই হচ্ছে আইন।

ভারতবর্ষে এক মহাপরাক্রমী রাজা ছিলেন। তাঁর আত্মোপলব্ধি কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা জাগল; তার দরুণ তিনি মনে করলেন, পারিবারিক জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া তাঁর কর্ত্তব্য।

তাঁর রাণীর ইচ্ছা তাঁকে দুটো কথা বুঝিয়ে বলেন; কিন্তু রাজা তো শুন্‌বেন না; রাণী আবার তাঁকে কি শোনাবে?

রাজা সব ছাড়লেন, মায় রাজ্য শুদ্ধ; রাণী হলেন রাজ্যের কর্ত্রী। রাজা হিমালয়ে বছরখানেক কাটিয়ে আস্‌তে গেলেন।

এদিকে রাণীর ভাবনা হল, কি করে রাজাকে যথার্থ সুখের সন্ধান দেবেন। তাঁর মনে একটা মৎলব এল। একদিন তিনি সন্ন্যাসিনী সেজে রাজার কুটীর-দুয়ারে গিয়ে হাজির। গিয়ে দেখেন, রাজা গভীর ধ্যানে মগ্ন। রাণী কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। রাজার যখন ধ্যান ভাঙ্‌ল, তখন রাণীকে দেখে তিনি ভারী খুশী। ভাব্‌লেন, এ বুঝি একজন বড় দরের তপস্বিনী; তাই ফুলের অঞ্জলি দিয়ে রাণীকে অভ্যর্থনা করলেন।

রাণীর মনে ভারী আনন্দ। রাজাও ভাবে গদগদ; রাণীকে বল্‌লেন, "আমার উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বুঝি দয়া করে তোমার রূপ ধরে উদয় হয়েছেন?" রাণী বল্‌লেন, "হাঁ, তা বই কি!" রাজার ইচ্ছা,

তপস্বিনী তাঁকে কিছু উপদেশ দেন; রাণীর আর তাতে আপত্তি কি? রাণী বল্‌লেন. "মহারাজ, পূর্ণানন্দ যদি চাও তো তোমায় সব ত্যাগ করতে হবে।" রাজা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "কেন, আমি তো আমার রাজ্য-স্ত্রী পুত্র সব ত্যাগ করেছি।" তপস্বিনী বল্‌লেন, "তুমি কিছুই ত্যাগ করনি মহারাজ!"

রাজা কিছুই বুঝ্‌তে পারলেন না; বললেন, "আমি ত্যাগ করিনি? রাজ্য-পরিবার সব ত্যাগ করিনি?" তপস্বিনী বললেন, "আমার তো মনে হয় না। এখনও তোমার বলে কিছু নাই কি?" রাজা বললেন, "হাঁ, ঠিক! এই কুটীর, এই দণ্ড, আর এই কমণ্ডলু—এগুলি এখনো ছাড়িনি বটে।" তপস্বিনী বললেন, "তা হলে আর তুমি ত্যাগী কিসের? যে পর্য্যন্ত কোনও কিছু তোমার দখলে থাকবে, সে পর্য্যন্ত তুমিও যে তার দখলে। ক্রিয়া থাকলেই প্রতিক্রিয়া থাকবে; সুতরাং কারু দখলে না গিয়ে কাউকে দখল করবার তো উপায় নাই।"

রাজা তখন কুটীর পুড়িয়ে ফেললেন, দণ্ড-কমণ্ডলু জলে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর তপস্বিনীকে বললেন, "কেমন, এইবার ত্যাগী হয়েছি কিনা?" তপস্বিনী বললেন, "এগুলি ছেড়েছ বলেই ত্যাগী হলে? কুটীর পুড়িয়ে ফেলেছ বটে, কিন্তু সাড়ে তিন হাতের মাটীর ঘরটা তো এখনো আছে। ও-গুলি কেন মিছামিছি পুড়িয়ে ফেললে? ওতে তোমার লাভ হল কিছু? তখনও তোমার যে সম্পত্তি ছিল, এখনও তাই থাক্‌ল—ওই সাড়ে তিনহাত মাটীর ঘরখানা!"

রাজা ভেবে-চিন্তে ঠিক কর্‌লেন, শরীরটা পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। কাঠ কুড়িয়ে চিতা সাজিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন, এমন সময় রাণী বাধা দিয়ে বললেন, "মহারাজ, দেহটা পুড়লে কি থাকবে?" রাজা বললেন, "ছাই থাক্‌বে।" "আচ্ছা, সেই ছাই কার?" "কেন, আমার ছাই!" রাণী হেসে বললেন, "তা হলে তোমার বলতে দু-মুঠো ছাইও তো থাক্‌ল! তা হলে দেহটা পুড়িয়ে আর তুমি কি ত্যাগী হলে?"

রাজা ভারী ভাবনায় পড়ে গেলেন। শেষে ব্যাকুল হয়ে রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, কি করে, সর্ব্বত্যাগী হই, বল তো?" রাণী বললেন, "এই দেহটা কার?" রাজা বললেন, "আমার।" "আচ্ছা, তা হলে দেহটা ছাড়। এখন বল, মনটা কার?" "আমার।" "তা হলে মনটা ছাড়।"

এমনি করে ছাড়বার কথায় অবশেষে রাজা ফাঁপড়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তা হলে কে? আমি যদি দেহ নই, আমি যদি মন নই, তাহলে দেহ-মন ছাড়া তো কিছু হব?" অনেক ভাবনার পর রাজা সাব্যস্ত করলেন, "আমি তা হলে অনন্ত, বিভু, ব্রহ্মস্বরূপ। আমি সব ছাড়তে পারি, কিন্তু এই সর্ব্বময়ের অনুভব হতে তো বিচ্যুত হতে পারি না। লোকে বলে, খয়রাতের পরখটা নিজের ঘরে থেকে সুরু হলেই ভাল। তাহলে ত্যাগের পরীক্ষাও সুরু হবে যা আমার অন্তরঙ্গ, তাকে ধরে। আমাকে ছাড়তে হবে—এই মিথ্যা অভিমানটা। মনে করছি, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আর তাইতে তো এই মিথ্যা অভিমানের বোঝা আমার বেড়েই চলেছে। আমার বলে কিছু আছে যে তার কোনও প্রমাণ নাই, অথচ তাই নির্ব্বিবাদে মেনে চলেছি। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র কন্যা, আমার দেহ, আমার মন—দূর হোক্ এই সব ছাই পাঁশ ভাবনা! এ ভাবগুলো ছাড়্‌তে না পারলে তো সিদ্ধিলাভ হবে না।

জঙ্গলে পালালেই কি ত্যাগী হলে ভেবেছ? এটা করব—ওটা করব, এটা আমার—ওটা আমার, মন থেকে এ ভাব তো দূর হচ্ছে না। সন্ন্যাসীরা সব সময় এ ভাব তাড়াতে পারে না; বরং রাজতক্তে গদীয়ান্ রাজারাই কখনো কখনো তা পারে।

সর্ব্বগ্রাসী অভিমানকে যে মারতে পারে, ক্ষুদ্র অহংকে যে বলি দিতে পারে, সেই যথার্থ ত্যাগী। যে সর্ব্বদা জান্‌ছে, এটা আমার, ওটা আমি করেছি—সে আবার ত্যাগী কিসের? ত্যাগী বল্‌ব কখন? যখন এই মহাসত্য মানুষ করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করে—আমি অনন্ত সত্য-স্বরূপ, জগতের শাস্তা, বিধাতা, পিতা আমি, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহনক্ষত্রে দেদীপ্যমান আমি, আকাশ,পবন, সলিল, সব আমারই বিভূতি!

তারপর যে গল্পটা বল্‌ছিলাম। রাজাকে জ্ঞান দিয়ে রাণী আবার রাজ্যে ফিরে গেলেন। এই তপস্বিনীই যে রাণী, রাজা কিন্তু তা জান্‌তে পারলেন না। কিছুদিন পরে রাণী তপস্বিনীর সাজে না গিয়ে রাণীর বেশেই রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং এমন ভাবে চল্‌তে আরম্ভ করলেন, যে রাজার বুঝ্‌তে আর বাকী রইল না—রাণী অপর কারু প্রণয়াসক্ত। এমনি ভাবে কিছুদিন গেল।

একদিন রাণী রাজার কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করে বল্‌লেন, "মহারাজ, আমায় ক্ষমা কর, আমি পাপীয়সী, তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমায় ক্ষমা কর মহারাজ!" রাজা প্রশান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "মেয়ে, কেন অমন করে কাকুতি জানাচ্ছ? তোমার ব্যভিচারে প্রাণে দাগা পেতাম যদি এই দেহে আমার আস্থা থাকৃত, যদি আমি অজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হতাম, যদি মনে কর্‌তাম—তোমার এই দেহটা আমার! এই বাসনায় যদি আমায় পেয়ে বস্‌ত, সব কিছুতে যদি আমার দখলী ছাপ জোরে বসাতাম, তা হলে আমার আজ দুঃখের আর সীমা-পরিসীমা থাকৃত না। কিন্তু এই দেহটার মাঝে স্বামিত্বের কোনও নিদর্শন তো পাচ্ছি না; আমার হাতে তো দড়ি ধরা নাই; না কেউ আমার দখলে, না আমি কারু দখলে; আমি অনন্ত-স্বরূপ! ধর্‌লাম, তুমি না হয় পবিত্রই আছ; কিন্তু তা হলেও তো জগতে আরও অসতী মেয়ে থাকৃতো; তারাও তো আমার মেয়ে! আমি জগজ্জ্যোতিঃ—এই জগৎটাই আমার। তবে আর বিরাগ কিসে, অনুরাগই বা কিসে?"

প্রতিবাসী যদি একটা কু কর্ম্ম করে, তার জন্য তোমার দুঃখ হয় না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যদি সে কু-কাজ করে তো আর জ্বালা-পোড়ার অন্ত থাকে না। এই হচ্ছে দখল-বাজ স্বার্থপর আমির দৌরাত্ম্য।

রাণী রাজ্যে গিয়ে আবার রাজার কাছে ফিরে এসে বল্‌লেন, "মহারাজ, তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপ; কোথায় থাক না থাক, তাতে তোমার কিছু আসে যায় কি? রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ই কি তোমার বেশী আপন হল?" রাজা বল্‌লেন, "আমি সর্ব্বত্রই তো আছি; সব দেহই তো আমার দেহ; এই দেহটা যেমন আমার তেমনি আর সব দেহও আমার। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই দেহটা নাই; যারা সম্যক্ সত্যকে জানে না, তারাই না এই দেহটাকে দেখ্‌ছে।

তোমার ভাবনা দ্বারাই এই জগৎটা সৃষ্ট। গণিত দিয়ে এ কথা প্রমাণ করা যায়। কথাটা দুঃসাহসের বটে, কিন্তু অতি খাঁটী কথা।

আবার রাজাকে সবাই নিয়ে সিংহাসনে বসালো। বিলাসব্যসনের মাঝে, অনিত্য বস্তু দ্বারা বেষ্টিত হয়েও তিনি শুদ্ধ থাকলেন, তিনি আর ইন্দ্রিয়ের দাস নন, বিকারের অধীন নন। এমনি করে পঁচিশ বছর তিনি রাজত্ব করলেন! তিনি কে? রাজাও নন, সম্রাটও নন—তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ!—এরই নাম ত্যাগ।

এই পথের আর কাঁটা-ঝোঁপও তাঁর কাছে যা, ওই কোঠা-বালাখানা আর রেশমে মোড়া গদী-তাকিয়াও তাঁর কাছে তা।

লোকে বলে, এটা ছুঁয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না। ওদেশে বলে, আসক্তি রেখো না; আবার এ-ও বলে, ঘৃণাও রেখো না, ঈর্ষ্যাও রেখো না।

ওদেশে (ভারতবর্ষে) সন্ন্যাস হচ্ছে সত্য লাভের একটা উপায় মাত্র। ব্রহ্মোপলব্ধিতে সত্য লাভ হয়।

সেকী ত্যাগে তা হবে না। দেখ্‌লে তো রাণীর গুণে রাজা নিজের সত্য খুঁজে পেলেন। বিবাহিত জীবন এমনি করেই যাপন করতে হয়—পরস্পরকে সত্য লাভ কর্‌তে সহায় করে ঘরকে নন্দন-কানন করে।

—:*:—

অভিমানের জয়

—*‡0‡*—

"আমি স্বার্থপর; নিজের টুকুই বুঝি। বাইরের কাউকে চিনি না। অন্তরের মণিমন্দিরে যে মায়ার সাক্ষাৎ পেলাম, তার বেশী কোথাও যাই না, কারু পিপাসা অনুভব করি না। ওরে, এই যে তুই প্রাণের পুলক হয়ে আছিস্—আর কোথা তোর অস্তিত্ব, সে প্রশ্ন করব না তো! সৌভাগ্য দিয়ে আমার কাজ নাই। আমি লোভী নই।

অন্তরের অনুভব—সেই তো জীবনের একান্ত সাথী। আর এ ছাড়া যার কথা বল্‌তে যাব, তাই তো মিথ্যা বলে প্রাণে বাজ্‌বে। এতদিন ঢের মিথ্যা কথা বলে এসেছি; আর যাতে বল্‌তে না হয়, এবার তারি চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে। আমি আমাতে ফিরে আস্‌ব।

বহু মহতের সংস্পর্শে এসে তাঁদের প্রতিচ্ছায়া জীবনে পড়েছে—আমার জীবনের মহৎ অংশটুকু তাঁদেরই প্রতিফলিত চৈতন্য। কিন্তু এ চৈতন্য যত মহৎই হোক্ না কেন, এ যে আমার আত্মসত্য নয়—এই জন্য তা মহৎ হয়েও তুচ্ছ, সত্য হয়েও মিথ্যা। অনুভব দিয়ে তাঁদের আত্মসাৎ কর্‌তে পার্‌লাম কই? এতদিন হয়ত এই মিথ্যা গৌরবেরই ভ্রান্ত গরব করে এসেছি—আজ তিনি চোখে আঙুল দিয়ে তা বোঝাচ্ছেন। সত্যি আমি পাইনি—এই না পাওয়ার সত্যি কথাই আমার গৌরব! আমি কারো ভেল্‌কীতে ভুল্‌তে চাই না।

আমি চিরনিঃস্ব—ভ্রান্ত আমার জীবন-গৌরব। যে জোরটা আমার বলে ভাবি, তা তো ঠিক আমার নয়। যদি তা আমার হত, এত দ্বন্দ্ব, এত দুঃখ, এত বেদনা তারও প্রাণে বাজ্‌ত না কি?—সব বুঝি, সব জানি—তবু যে সামাল দিতে পারি না; এর মূলে হয়ত ঐ এক কথা—তোমার মহত্ত্ব তোমার আত্মসত্য নয়, ধার-করা আলো মাত্র। আমার ত্যাগ, আমার তপস্যা তাকে জয় কর্‌তে পারেনি। যতদিন আমি আমার অনুভবের অণুতে অণুতে তাঁদের মিলিয়ে নিতে না পারছি, ততদিন আমার কিসের বড়াই,—কিসের কি?

ধার-করা আলোর শুভ্র সুদিব্য শারদ চন্দ্রিকা ছড়াতে চাই না আমি—আমি হতে চাই এতটুকু জোনাকী। আমি যদি আমার না হলাম, জগৎ-জোড়া সম্পদ্ আর জগজ্জয়ী শক্তি দিয়ে আমি করব কি? চাই না অভয় হতে, অজর অমর হতে—যদি আমার বলে কোন দাবী তোমার উপর আমার না থাকে! * * *

তুমি এসেছ, ভালই করেছ!—হৃদঙ্গন আলো করে দাঁড়িয়ে আছ, স্নিগ্ধ দিঠি অঙ্গে বুলিয়ে দিয়ে সকল জ্বালা হরে নিয়েছ, বেশ করেছ! কিন্তু আমি বলি—সে তো তোমার খুসী! আমি তো শুধু তোমার খুসীর পুতুলই হতে চাইনি কোন দিন—এ কথা তো আজন্মই তোমার জানা আছে! তুমি

সব চেয়ে জান ভাল—আমার প্রাণ কি চায়; আর তারি জন্যে আমার জীবনটা তোমার বুকে কেমন কাঁটার মত বিঁধে আছে! ক্ষণিক স্নেহে ওগো, আজ সবি কি তুমি ভুলে গেছ?

আমার কথা উঠ্‌লেই অন্তরে অন্তরে তুমি কাঁদ, তা জানি; কিন্তু আজো তো আমার মন তাতে গল্‌ল না! আমি যে তোমার কাছেও আমার অহং-এর জয় কামনা করি। এখনো করি!

বিনা উপার্জ্জনে হাতে তুলে দেওয়া দয়ার জিনিস আমি চাইনি কোন দিন।—তুমি যা না দিয়ে থাক্‌তে পার না, সেইটিই আমি চাই! এ তুমি জান।

আমার যদি তোমার জন্য এক বিন্দু গরজ থাক্‌তো, তবে এত দিনেও তোমার আপন হতে পারিনি কেন? তোমার কি সে ভাবনা জাগে না?

কিন্তু আমার দিক থেকে এতদিনে এবার এইটুকু নিঃসংশয় হয়েছি যে, একটা কামনার ধনকে প্রাণ যেমন করে ভালবাসে, তোমাকে তা বাসে না—মোটেই না!

তোমার কথা শুনে কই এক দিনও তো অসহন পুলকে শিহরিত হইনি! তোমায় দেখে তো সত্যি সত্যি মন কখনো নেচে ওঠেনি! তোমার নাম করে যা কিছু এ অন্তরে হয়েছে ঘটেছে, সে সবি ঐ ধারকরা আলো—সবি ঔচিত্যজ্ঞানে অভিনয় মাত্র। হয়ত নরকের ভয়েই তোমাকে ভালবাসার ভাণ করে লোকের কাছে এতদিন ভক্ত সেজে এসেছি! প্রাণে প্রাণে একটুও তো টান হয়নি আমার!

সত্যি কি এ অন্ধ হৃদয়ে হৃদয়ের ছায়া পড়েছিল তোমার?—কৈ, মুখ ফুটে কোন দিনই তো কোন কথা বলনি আমায়! * * *

আর এ ভণ্ডামী নয়। এবার থেকে সত্যি কথা বল্‌ব—কারো ভয়ে, কোন লোভে পথ চল্‌ব না। তুমি যদি তোমার গরজে আমার বুকে ফুটে না ওঠ, তোমায় চাই না! থাক তুমি আড়াল হয়েই চিরদিন। তোমার খুশী তুমিই বোঝ!

বেশ, আমার খুসীর জয় না হয় না হবে—তা বলে সত্যি কথা বল্‌ব না? পরের খুসীর ছায়ায় আয়েসে আরামে আর দিন কাটাতে চাই না—জানি না যার খুসী, তার খুসীর লহর জীবনে বইতে থাক্—পারি লড়্‌ব, না পারি সইব—মুখ ফুটে বল্‌ব না ত কিছুই।

কারো চরণে ভিক্ষার কিছু নাই। যদিও থাকে, সে স্বপ্ন যেন মিথ্যা হয়। যে ধারকরা অলঙ্কারের চটকে মুগ্ধ হয়ে জীবনের তৃপ্তি খোঁজা অকালে স্থগিত রেখেছিলাম, সে মোহ এবার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে আমার কদর্য্য ক্লিন্ন যথাভূত জীবন ফুটে বের হোক্—আমার ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য জঘন্য এতটুকু জীবনবিন্দু চিরকাল বিন্দু হয়েই থাক্, সিন্ধু হতে চাই না আমি! আমার নিজস্ব বিন্দুকেই ঘিরে ঘুরে মর্‌ব, তবু তোমার সিন্ধুতে আত্মহারা হব না!

বস্তুশক্তি যদি জগতের একটা সত্য হয়, তবে আমার অভিমানের জয়ও সুনিশ্চিত। আমি আমার বস্তুটাই চাই—তোমার সঙ্গে আমার সংস্রব থাক্ না থাক্, সে জন্য ভাবি না। তুমি আমায় গ্রাস কর—আমিও তোমায় গ্রাস করি; আমি আজ শূন্য, শূন্য, মহাশূন্য—চাই না পূর্ণ হতে!"

* * * * *

তোমার বুকে বাজ্‌ল।—তুমি নেমে এলে!......

ওগো, আমায় তুমি কৃপা কর না শুধু তুমি যে ভালবাস। আমার অভিমান যত উগ্রই হোক, তোমার ভালবাসাকে ছাড়িয়ে যায় না বলেই তুমি তাকে প্রশ্রয় দাও। আমায় তুমি বল না কিছু—আমার উপর তোমার অটল বিশ্বাস। তুমি তো বস্তু দিয়ে গড়্‌ছ না আমায়—তোমার ভাব আমার জীবনের উপাদান। তা নইলে কি মানুষ এমন অদ্ভুত হয়?

তোমার সিদ্ধি আমার দাবীর বস্তু—তুমি যে আমার অসাধনের ধন !

চাইব না, তবু তুমি দিবে। তোমার গরজ—তোমার দায়! আমার অত্যাচার সইবে তুমি—তুমি যে চেন আমাকে, জান ঠিক ঠিক ! কত অভাবনীয় অযাচিত দানকে প্রত্যাখ্যান করেছি—তবু তুমি ফিরে যাওনি। নীরব তুমি—নীরবেই দিয়ে এসেছ চিরকাল।

তোমার সঙ্গে আমার প্রাণের আলাপ—বাইরের জীবন অভিমানে ঘাড় বাঁকিয়ে থাক্‌বেই তো ! তোমার হৃদয়ে আমার জন্ম চিরন্তন প্রতীক্ষা—আমার ছদিনের উপেক্ষা তাকে টলাতে পার্ব্বে কি ?

এমনি করে বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে সন্ধি হয়ে গেল—আমার দেনা মিটে গেল, তোমার দেনা বেড়ে চল্‌ল। আমার সকল দাবী মিটাবার জন্ম তুমি আছ—তুমি যে বড়, তুমি যে গুরু !

তুমি এত নিকটে যে, তোমার পানে তাকাবার প্রয়োজন পড়ে না। সম্মুখে-পেছনে, নীচে ওপরে আমার কোন কেরামতীই তোমাকে লঙ্ঘন করে যায় না—তুমি আমার নাড়ী-নক্ষত্র জান। তাই তো আমি স্বাধীন, আর তুমি চির পরাধীন—ভালবাসার অধীন !

কোথায়ও অনটন নাই, একটুও সঙ্কোচ নাই—হৃদয় ডোরে বাঁধা আছি। আমার অভিমানের সার্থকতায় তোমার বিজয় কেতন মূর্চ্ছিত হবে না। আবার বলি—তুমি যে বড়, তাই আমার কাছে তোমাকে ছোট করেই তুমি খুসী ! আমার উচ্ছ্রয় তোমারই বিজয় !

আমার সবটুকু জান তুমি—তাই সকল ভার সঁপে দিয়েছ ! তোমার গরবেই গরবী আমি – মুখে আজ আমি আমারই জয় চাই ; কিন্তু অন্তরে কি জান না গো, আমি তোমার কি !

জগৎ না জানুক, জগতের হৃদয় জান্‌ছে—তোমার সঙ্গে আমার ঐ খেলাই চলে এসেছে চিরকাল—তুমি সাধ করে ছোট হয়েছ, আমাকে বড় করেছ ; আবার বিবশ মুহূর্ত্তে অলক্ষিতে বুকে তুলে নিয়েছ ! কাউকে জানিয়ে তোমার কৃতিত্ব তুমি কোন দিনই প্রচার করনি।

জীবন ভরে দেখ্‌ছি শুধু আমায় অভিমানের জয় ; কিন্তু জানি তো এর হৃদয়-রহস্য কি ! শুধু কি আমিই তোমার জ্ঞেয়—তোমাকেও কি আমি জানি না বা জানতাম না ?

"স্বে মহিম্নি"

—(*)—

অদ্ভুত এক আইডিয়ার জগতে বিচরণ করিতেছি বটে ! গত কাল আমার সকল অপূর্ণতা নিয়াও পূর্ণাৎ পূর্ণ ছিলাম, আজ কেমন করিয়া জানি না সব পূর্ণতা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আবার আমি সেই রিক্ত, নিঃস্ব, সেই দীনাতিদীন, সুখ-দুঃখকাতর ! পূর্ণতার আনন্দকেও তবে বিশ্বাস নাই দেখিতেছি ! ঐহিক সফলতার উচ্ছ্বাসে সাময়িক যে হৃদয় নাচিয়া ওঠা—তাহাও অচেতন, অপূর্ণ, অতএব ত্যাজ্য !

সব যখন পূর্ণ মনে হয়, সেও মনে হওয়া মাত্রই ; আবার অপূর্ণ যে মনে হয়, তাহাও তাহার বেশী

কিছু নয়। সবই কি স্বলক্ষণ—সবই কি শূন্য? চিরকাল এই মনে হওয়ার অনুগমন করিতে করিতেই সংসরণের অন্ত পাইব কি? পূর্ণতঃ কিসের অপূর্ণতা অন্তরালে রাখিয়া আমাদের ছলনা করে—অধ্যাত্মসংসারের শিশু চিত্ত সব সময় কি তাহা বুঝিতে পারে? কে তাহার লক্ষ্য—কি তাহার চরম? কে বলিবে?

যুক্তিতে জানি, কোন অবস্থা কখনো স্বরূপ হইতে পারে না—দৃশ্য কখনো দ্রষ্টা হইতে পারে না—চিম্‌টা কখনো নিজকে চিম্‌টি কাটিতে পারে না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এক অবস্থা অপর অবস্থার প্রভাবক, সুতরাং অবস্থা নিত্য সত্য নয়; যা নিত্য সত্য নয়, তা কখনো স্বরূপ হইতে পারে না। এই নেতির বিলয় কোথায়? সংশয়ের নিরাশ কিসে? নিজকে সর্ব্বদা অবিশ্বাস করিয়াই চলিতে হইবে?

কে যেন বলে—হঁা, তাই।

যতদিন তোমার নিজত্ব কতকগুলি দৃশ্য অবস্থামাত্রের সমষ্টি, কতকগুলি ধারণা ও সংস্কারের উপাদানে সংগঠিত, ততদিন সেই অবস্থাভিভূত নিজকে অবিশ্বাস করিলেই তাহাকে ঠিক ঠিক জানা হইবে। জানিবার পিপাসা বস্তুতঃই যাহাদের প্রাণে জাগিয়াছে, তাহারা যাকে-তাকে বিশ্বাস করিতে পারে না—কেননা অনুভবের আভাস কৃত্রিম-প্রাপ্তির ভেল্‌কী চকিতে চিনাইয়া দিয়া যায়।

অবিশ্বাসের পাত্রকে বিশ্বাস করার নাম তো শ্রদ্ধা বিশ্বাস নয়; শ্রদ্ধা হইল আস্তিক্যবোধ—শ্রদ্ধা নিগূঢ় সত্যের প্রতিপাদক ও আবিষ্কারক। যাহার যাহা সত্য, তাহাকে তৎ-তৎ স্বরূপে দেখিতে পারাই শ্রদ্ধার বিশেষত্ব। শ্রদ্ধা কাহাকেও ঠকায় না। আর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ঠেকিবে না কোথায়ও—ইহাই তাহার লক্ষণ।

ব্যাকুলতা জিনিষটা মন্দের ভাল, কিন্তু চরম বলিতে পারি না তাহাকেও। অন্ততঃ প্রথম সোপানে আমরা যে ব্যাকুলতার সাক্ষাৎ পাই, তাহার মাঝে যথেষ্ট ভেজাল থাকে। ব্যাকুলতা যেন ভক্তিশাস্ত্রের 'হৈতুকী' বা 'বৈধী' ভক্তি; একদিন অহৈতুকীতে পর্য্যবসান তাহার অলঙ্ঘ্য নিয়তি। ব্যাকুলতারও সংস্কার প্রয়োজন। নিরপেক্ষ অনুভূতি বা নিষ্কষিত অনুরাগ তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আমাকেও আমি বাজাইয়া লইব; আমিত্বের শেষ আমি-জ্ঞান থাকিতে জানা যায় না—ইহাই সত্যি কথা।

অন্তর রিক্ত হইয়া যায়, একটা কিছু ধরিবার না পাইলে থাকিতে পারি না, ইহাও এক প্রকার ভব-ব্যাধি। 'ভব' শব্দের মানেই হইল হওয়া। একটা কিছু হইয়া উঠিবার জন্য আমাদের প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল, একটা কিছু পাইবার ভরসা সকলেই রাখে। এই ব্যাকুলতাকে ঈহা বলিতে পারি। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, মোক্ষলাভ করিতে হইলে ঈহাকে ছাড়িতে হইবে। তোমার জন্য তুমি ব্যাকুল—ইহাও বন্ধন; কেননা এক হিসাবে ইহা তো তোমার আত্মসত্যের প্রতিই অবিশ্বাস! তুমি নিজকে জান না বলিয়াই পাইতে চাও; জানিলে দেখিতে, অপ্রাপ্ত বলিয়া কিছুই ছিল না; সকল বিরহই তোমার কল্পনা মাত্র।

উক্ত ঈহা বা ব্যাকুলতা যতক্ষণ কল্পিত-কল্পনায় আবদ্ধ থাকে, পক্ষান্তরে উদার কল্পনায় মুক্তি না পায়, ততক্ষণই জড় বুদ্ধির নানা রূপান্তর ঘটিতে থাকে। ইহাই হইল বুদ্ধির গুণবদ্ধ অবস্থা; উপনিষদুক্ত অগ্র্যা বুদ্ধির স্বভাব ইহা নয়। ইহার হ্রাস বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

যাহা বাড়িবে কমিবে, যাহা আসিবে-যাইবে, এমন আধ্যাত্মিক ভ্রান্তিকে কখনো সত্য বলিতে পারি না। বুদ্ধির এই বহুরূপী বৈচিত্র্যের মায়াতেই তো মন বদ্ধ হইয়া আছে।

ইহার নিরাস করিতে হইলে যে কি করা প্রয়োজন, তাহা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তবে প্রাণের প্রাণ হইতে কে যেন বলে—

নিরালম্ব হও, শূন্যপ্রতিষ্ঠ হও। যাহা তোমার জ্ঞেয়, তাহাই অবিশ্বাস্য, তাহাই লক্ষ্যবহির্ভূত। একমাত্র সত্য জ্ঞান হইল অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিশ্বাস—জ্যোতির্ম্ময় আস্তিক্য-বুদ্ধিসহায়ে শরবৎ তন্ময় হইয়া সেই নির্নিমিত্তক বস্তুকে ধারণা কর। সর্ব্বদা আনন্দ অটুট রাখ—কোন আবেশেই মুগ্ধ হইও না। স্তব্ধ হইয়া জীবনের প্রতি স্পন্দনটী পর্য্যন্ত অনুভব কর। যখন তুমি দেখিবে অথচ দেখিবে না—প্রাণের ভিতরে এমন একটা কিছু হইতে থাকিবে, যা অনিবার্য্য, অনিবার্য্য; অস্বাদ্য কি অনাস্বাদ্য, সে বিচার সেখানে নাই।—সেই অত্যদ্ভুত পরম চরম সর্ব্বাধার অনন্ত-অগম্য মহাশূন্যে তুমি অবগাহিত হইয়া আছ। —ওই তো তোমার পূর্ণস্বরূপ, আর সব ভ্রান্তি, সব মায়া। নিজের জীবনের কোন সার্থকতার আবেগে বা ব্যর্থতার কল্পিত অবসাদে এই স্বরূপকে হারাইও না।

স্বরূপতঃ নিজকে তুমি জানিতে পার না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জোর করিয়া শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, যা জানিতেছ তা নয়, যা দেখিতেছ তা নয়, যা বুঝিতেছ তা নয়; অথবা যা শুনিতেছ তাহা নয়- যাহা বলিতেছ, তাহা তো নয়ই! এই নেতি-নেতিরূপ তটস্থ লক্ষণই বর্ত্তমানে তোমার পক্ষে ফলোপধায়ক লক্ষণ।

অথবা সব বিচার-বিবেচনার জঞ্জাল ভুলিয়া যাও, সত্য-প্রাপ্তির সকল সর্ত্ত তুলিয়া লও; তোমার দিক হইতে তুমি রিক্ত হও—পূর্ণ করিবার ভার তাঁর! নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলিয়া মরিবার বা পরকে জ্বালাইবার কোন অধিকার নাই তোমার! তুমি শুধু তন্ময় হইয়া তোমাতে থাক। সকল কাজ আপনা-আপনি গুছাইয়া আসিতেছে। তিনি অন্তর্য্যামী।

শাস্ত্রে যে জ্ঞানকে মুক্তিস্বরূপ বলা হইয়াছে, অজ্ঞানরূপ বন্ধন সেই জ্ঞানেরই ছায়ামাত্র। নিজকে আমরা কতকটা জানি বলিয়াই বাকীটুকু জানিবার জন্য কত চেষ্টা কত দ্বন্দ্ব। একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া দেওয়াও মুস্কিল; আবার আঁধারে ঢিল ছুঁড়িয়াও কিছু হয় না। সর্ব্বদা আশা, সর্ব্বদা প্রতীক্ষা, নিয়ত জাগরণ—কি যে হইবে, কখন হইবে, কোন্ অলক্ষিত মুহূর্ত্তে সত্যস্বরূপের আবির্ভাব হইবে, তিনি কি ভাব পাইয়া ভাবের ভাবী হইয়া কি সর্ত্তে আমার আমাকে বরণ করিয়া লইবেন, জানি না। জানিবার স্পর্দ্ধা আর কতদূর? ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিকে বলি দিয়াই তাঁহার কৃপা পাইতে হইবে। চাই সমনস্ক, সদাশুচি ভাব—মুহূর্মুহুঃ ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, নীরবে প্রতীক্ষা।

এই স্বস্তিকর ভাব হারাইয়াই মুস্কিলে পড়ি। এই যে ক্ষণে-পাওয়া আর ক্ষণে-হারানো, এই দ্বন্দ্বের দোলায় দুলিতে থাকিলে চলিবে না। ধরিয়া লইতে হইবে—কিছুই পাও নাই, কি যে পাইবার আছে, তাহার দরুণও উদ্‌ভ্রান্ত নও। আমার আসনে আমি অটল হইয়া থাকিতে পারিলে শেষ মুহূর্ত্তে যে তাঁরই হৃদয় টলিবে;—কেননা তিনি বড়, তিনিই দাতা! শেষ পর্য্যন্ত মন টিকে না, নতুবা একটা কিছু হইত না কি? গরজ তাঁরি বেশী—ইহাই আমার একান্ত গৌরব, পরিপূর্ণ ভরসা!

যখন প্রাপ্তি আসন্ন, তখনি তুমুল পরীক্ষার ঝড় আসিয়া হৃদয়কে টলাইয়া দিতে চায়—ইহা বারম্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সব চেয়ে ব্যথা যেখানে, তাঁর আসন সেইখানে।

প্রকৃতির দিক হইতে যাহা তোমার প্রতি চরম নির্ম্মমতা বলিয়া মনে কর, তাহার মাঝেও তোমার হৃদয়কে তুমি স্বচ্ছ রাখিয়া পাড়ি দিতে পারে যদি, জোর করিয়া বলিতে পারি—তুমি পাইবেই পাইবে, তোমাকে দিতে তিনি বাধ্য!

আপাতদৃষ্টিতে অপ্রিয় যাহা, যে ব্যতিকরকে তাঁর দয়ার ব্যতিক্রম ভাবিয়া হতাশায় মুহ্যমান হইতেছ, সেইখানেও অটল হও দেখি—বিশ্বাস কর দেখি—তোমার বস্তু তোমার আছেই আছে!

আমাকে টানিয়া লওয়াও তাঁহারই কাজ। অথচ আশ্চর্য্য এই, তাহাতেই মনে হইবে যেন আমিই তাঁহাকে টানিতেছি। আমাতেই তাঁর লীলার প্রকাশ কিনা, তাই এমন হয়। সে বড় মধুর, বড় সুন্দর—এর বেশী কি বলিব? ঐ এক অপূর্ব্ব মায়াময় ভাব উভয়ে আছে বলিয়াই বিরহে মিলনে অলক্ষ্য কাড়াকাড়ি। সত্য এক বই দুই হইতে পারে না—ইহা বিচারে বলে; কিন্তু তাঁর প্রেমের কি গরজ জানি না, এককে দুই করিয়াই জগৎময় প্রাণপ্রিয় আমার আমাকে লইয়া কি মজাই লুটিতেছেন! ঘুরিয়া-ফিরিয়া সবই সেই এক, সকলি সফল, সকলি সহজ!

তাই বলি, যদি কিছু পাইয়া থাকি তাহাও ভ্রান্তি, যদি কিছু হারাইয়া থাকি, তাহাও ভ্রান্তি। সত্যি সত্যি সে যে হারাইবার বস্তু নয়। আমাকে ছাড়িয়া একতিল নড়িবার সাধ্য আমার নাই। যাহা আছে, তাহা চিরকাল আছে!

আবার বলি—আমারই মাঝে আমাকে ঘিরিয়া আমিই ঘুরিয়া মরিতেছি—পলে পলে অমৃতস্বরূপে আমাকেই পাইবার পিপাসায়! এই ঘুরিয়া মরা শেষ হইবে না। হইয়াই বা লাভ কি? এক হিসাবে আমিই তো জন্মে জন্মে ঘুরিয়া ফিরিব!

কে স্থির, কে অস্থির—মাথা ঘামাইয়া কি হইবে? ক্ষেত্রবিশেষ এমন হয়, এমন জটিল ঘটনাতেও মানুষ পড়ে, যেখানে মীমাংসা না খোঁজাই যথার্থ মীমাংসা। কত অকল্পিত ঘটনাই ঘটিতেছে, আরো কত কিছু ঘটিবে!—

যা হবার হইতে থাক্! আমি টলিয়াও টলিব না; অর্থাৎ ক্ষণিকের প্রাপ্তিসুখে গলিয়া পড়িব না, আবার খণ্ড-বিরহের ব্যথাতেও দমিব না। আমি—আমি! বিচার যখন বিশ্বাস কাড়িয়া লয়, বিচার যখন বিভ্রান্ত করে, তখন আমি শূন্য; —আমি কিছু নই, আমি শুধুই আমি—এ জগতে যা কিছু দৃশ্য, তাহাই ত্যজ্য—আমি কিছুই চাহি না — ওম্!

সমস্ত চিন্তার হিজিবিজিতে ঘুলাইয়া গিয়াও এমন কোন সত্য আমাতে অবশিষ্ট থাকিতেছে কিনা, যাহা অবিশ্বাসে বিশ্বাস, সন্দেহে জ্ঞান, দুঃখেও আনন্দ—তাহাই আমি, তাহাই মীমাংসা, তাহাই শিব; তাহারই ভরসায় সেই বস্তুটীর উপর অকাতর নির্ভরেই আমি দিন কাটাইব।—প্রতিনিয়ত পাইয়াও পাইব না, হারাইয়াও হারাইব না—জানি, সেই তো আমার জীবনের সাথী!

আমার অননুভবের ক্ষণে যাহাকে হেলায় হেঁয়ালী বলিয়া উড়াইয়া দিই, অনুভবের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে তাহাই সত্য, সুন্দর, অতি সহজ। ইহা জীবনের অদ্ভুত রহস্য। 'ভাবুকতা' বলিয়া স্বচ্ছন্দে ইহাকে উড়াইয়া দিতে পার, তাহাতে সে কোন আপত্তি করিবে না বা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইবে না। কেননা সে জানে, একদিন জীবনে এই রহস্যময় মীমাংসা আসিতে বাধ্য। যে তোমার এত অবিশ্বাস, সেই তুমিই একদিন মনগড়া তৃপ্তির মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আপন গরজেই নিজের বুকের ভিতরকার এই পরম হেঁয়ালীটীকে আবার সানন্দে বরণ করিবে।

কেহ কাহাকেও সত্য চিনাইয়া দিতে পারে না। তথাপি কলরব করিয়া একটা আনন্দ আছে—সত্যস্বরূপের বুঝি তাহাতে বড় কৌতুক অনুভব হয়; তাই জগন্ময় এই সব কলরবের ব্যবস্থা। যাহা হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইত, তাহার দরুণ জগৎ ঢুঁড়িয়া বেড়াইব—ইহা যদি তোমার খুসীর কথা হয়, কে তোমাকে ঠেকাইয়া রাখিবে? ঠেকাইয়া রাখিয়াও কোন লাভ নাই। মনের দৌড় জানিয়া লইবার দরুণ দুরন্ত মনকে কোথাও কোথাও দৌড়ানও প্রয়োজন।

আকুলি-বিকুলির চরম মীমাংসাটী দৃশ্যরূপে তোমার নিকট হেঁয়ালী; কিন্তু অনুভবরূপে পরম সত্য। তোমার সে খবর তুমিই জান ভাল। আমি শুধু বলিতেছি এই যে,—অনেক ঠেকিয়া-ঠকিয়া

তবে শিখিয়া বলিতেছি যে,—অবস্থাকে কখনো ভয় করিও না—তুমি অবস্থা নও; বরঞ্চ ইচ্ছা করিলে পূর্ণ-অপূর্ণ উভয় অবস্থাকেই তুমি তোমার অধীন করিয়া রাখিতে পার।

মজ্‌লিশ্‌

—*—

বহুদিন আগেকার একটী স্মৃতি।—১৩১৮ সাল। ফাল্গুনের শুক্লা-চতুর্দ্দশী।

অতীতের সে দিনটী আমাদের কাছে মস্ত এক আনন্দের দিন। আমি তো তাকে ভাল করেই মনে রেখে এসেছি। একটা প্রস্তাব করা হয়েছিল—এবার উৎসবের দিন এমন কিছু কর্‌তে হবে, যা কোন দিন হয়নি। সারাদিন উৎসবের কলরবে কাটিয়ে, সংসারের সকল দেনা মিটিয়ে এসে রাত্রে সবাই বকুলতলায় জ্যোছনার আলোয় একত্র জুটেছিলাম। তারপর মহোল্লাসে কেটে গিয়েছিল—কোজাগরে। দিল্‌খোলা আলাপে-আলোচনায় হাস্য-পরিহাসে সহজ মেলা-মেশায় কি যে করেছিলাম আমরা—আর সে করা সত্যি সত্যি একটা নতুন কিছু করা বলে গণ্য হতে পারে কি না, সে বিচার তখন করিনি; কোজাগর-মাহাত্ম্যও তখন বুঝিনি। কিন্তু আজ বুঝ্‌ছি—সে দিনটী ভবিষ্য জীবনের কত সমস্যায় সমাধানরূপে অভিনব মাহেন্দ্রক্ষণ হয়ে ধরা দিয়েছিল। সেদিনকার কথাই দু চারটী বল্‌ব।

সেই দিন থেকেই আমরা সংকল্প করেছিলাম, ভবিষ্যতে বার বার এমনিধারা আনন্দের পরিচয় পরস্পর পরস্পরকে আমরা দেব, সবাই সবার কাছে প্রাণ-খোলা হব। সম্মিলিত হবার একটা শুভ সংকল্প সেদিন থেকেই প্রাণে জেগেছিল। তারপর কত যে ঝড়ঝঞ্ঝা গিয়েছে, পুরোনো সাথীরা কে কোথায় চলে গিয়েছে;—কিন্তু আমি আজো সে স্মৃতি ভুল্‌তে পারিনি; আমার স্বভাবসলজ্জ অমিশুক মন নিজে কিছু কর্‌তে না পার্‌লেও সাথীতে-সাথীতে প্রেম দেখ্‌বার ব্যাকুল প্রতীক্ষায় এখনো কত সন্তর্পণ আশায় বসে বসে দিন কাটাচ্ছে।

অনেকগুলি সত্যের আভাস সেদিন পেয়েছিলাম। আরো হাতে নাতে প্রমাণ যে পাব, সে ভরসাও আজ জেগেছে। আমরা—শুধু আমরা কেন, দেশ জুড়ে সব মানুষের কথাই বলি—মিল্‌তে পারি না বলেই আমরা দুর্ব্বল, প্রাণ খোলে না বলেই আমরা দুর্ব্বল।—নিঃশেষে সব দিয়ে ফেল্‌তে পার্‌তাম তো পেতাম অফুরন্ত!

যার যা আছে, তাই নিয়ে সে রাজা—এই ভাবটীর প্রকাশ হয়, যখন আমরা আনন্দে থাকি। যখন প্রাণ খুলে যায়, তখনি ঠিক বিশ্বের বুকে ব্যক্তির মূল্য সার্থক হয়ে ফুটে ওঠে। এই ক্ষুদ্র জীবনও যে ক্ষুদ্র নয়, এই অনুভব পেয়েই সবার সঙ্গে সেদিন সবাই মিল্‌তে পেরেছিলাম।

যতক্ষণ নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে ছিলাম, বিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ হয়ে ছিলাম, ততক্ষণ নিজের মনটাই ভাল করে বুঝ্‌তে পারিনি—পরেরটা বোঝা তো দূরের কথা।

এক কথায় বল্‌তে গেলে সে দিনকার আমাদের প্রস্তাবিত অভিনব অনুষ্ঠানটির নাম ছিল—"ভাব-বিনিময়।" যেটা আমাদের সঙ্ঘের একটী motto।

সে দিন আমি ছিলাম সব চেয়ে বেশী নীরব। সবাই উঠে যে যার ভাব প্রকাশ কর্‌ল, কিন্তু আমি কেন বা কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হয়ে বসে রইলাম;—যেন আমার কিছু দেবার নাই, পাবার নাই। অথচ এই কথাটা আমার কাছে আমার সব চেয়ে বড় অবিশ্বাস্য কথা। সকলের কাছে প্রাণ খুলে দিতে ইচ্ছা খুবই ছিল, তবু কেন জানি না সে দিন পেরে উঠিনি। আজ বুঝ্‌ছি, একটা প্রচণ্ড অভিমান ছিল বুকের মাঝে বাসা বেঁধে—রুদ্র আমার সে অভিমান হয়ত আজ চূর্ণ করে দিয়েছেন। আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি—জগতের দেনা কিছুই এখনো মিটানো হয়নি; মাত্র খুলে ধরেছি—তাও কত আশায়-আশঙ্কায় আন্দোলিত হয়ে। আরো খুল্‌তে হবে—নিঃশেষে নিজকে উজাড় করে দিতে হবে!

বরাবর দেখে এসেছি—আমি কাউকে সরল-সহজ ভাবে হঠাৎ স্বীকার করে উঠ্‌তে পারি না। তাই সেদিন ভেবেছিলাম, শ্রোতা হয়েই কাটাব—মনে মনেই ভাব-বিনিময় কর্‌ব। কিন্তু বয়স্যেরা এক একজন যখন দুই তিন বার পর্য্যন্ত উঠে আমাকে কটাক্ষ করে করে—বাঙ্গলা দেশের, তথা ভারত-মাতার পর্য্যন্ত মিলনার্ত্ত হৃদয়কে যেন অবিশ্বাসের চক্ষে দেখেই তার বাইরের নিষ্প্রতিক্রিয় নীরবতাকে সপ্রেমে খোঁচা দিয়ে দিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগ্‌লেন, মাঝে মাঝে আবার সাভিপ্রায় অপাঙ্গ-নিক্ষেপে নিক্ষেপে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লেন, তখন আমি নিতান্তই উঠ্‌লাম। সে দিন আমার বল্‌বার কথা এই ছিল—"বল্‌বার কিছুই নাই!" মনে হচ্ছিল, এতেই যদি সবার প্রতি প্রীতি প্রকাশ হয়, মন্দ কি! কিন্তু প্রাণের অতৃপ্তি যে গেল না, সে কথা তখনো বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। তারপর ঘরে এসে কত কেঁদেছি। অনিচ্ছাসত্ত্বে মিলনবিমুখ থেকে প্রাণে বড় বেজেছিল। রাগ উঠ্‌ছিল অন্তর্দেবতার উপর—সে কেন তার মনের মতনটী করে আমায় সাজিয়ে দিল না, কেন এমন অপ্রস্তুত কর্‌ল?

সব্বাই সেদিন প্রাণ খুলে দাঁড়িয়েছিল। কারু হৃদয়ে কার্পণ্যের ছায়াপাত হয়নি। চল্‌বার শক্তি হয়ত অন্তর্দ্দেবতাই দিচ্ছেন, কিন্তু চলার আদর্শ সবার মন থেকেই গ্রহণ করেছিলাম। প্রবন্ধ, কবিতা, বক্তৃতা, সঙ্গীতের কি বিপুল ছড়াছড়ি সেদিন! বাজে খরচ কে বল্‌বে তাকে? সত্যি সত্যি কাজে এসেছিল সেদিনকার অনেক কিছুই—এতদিন পরে তা বুঝ্‌ছি।

মিল্‌তে হলে যে কেমন করে মিল্‌তে হয়, এর আগে তা জান্‌তাম না। অভাব-অভিযোগের পঞ্চায়েৎই দেশ জুড়ে আজ দেখ্‌তে পাই—কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্য্যে সরল আত্মদান যে কি বস্তু, আমাদের ঐ সম্মিলনীতে সেদিন তারই সূচনা পেয়েছিলাম। কোন একটা সংসারিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে সবাই একত্র জোটা—এর মাঝে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু অম্‌নি অম্‌নি অকারণে যার যার আনন্দ তার হৃদয়কে পূর্ণ করেও অপরত্র উৎসারিত হওয়া—আমরা বলি, এই তো ঠিক খাঁটী মিলন।—শুধুশুধুই দিল্‌খোলা মজ্‌লিশ্‌ জমাবার মত প্রাণের প্রাচুর্য্য আমরা অনুভব করি না বলেই হয়ত একটা সংসারের প্রয়োজনে মিলিত হতেও আমাদের এত অক্ষমতা! আমরা অকারণ আনন্দে পূর্ণ থাকতে জানি না বলেই কাজের বেলাতেও ঠুঁটো হয়ে আছি কি না কে জানে!

সেদিন আমাদের যা হয়েছিল, তাকে শুধু "সম্মিলনী" বলা চলে না—"মজ্‌লিশ্‌" বল্‌তেও ইচ্ছা হয়। মনে হয়, "মজ্‌লিশ্‌" কথাটার মাঝে অনেকখানি রস আছে। "সম্মিলনী" করা আজ দেশের

রেওয়াজ হতে পারে; কিন্তু সব সম্মিলনীতেই যে মজ্‌লিশ্‌ জমে ওঠে, এ কথা বিশ্বাস করব না। যদি আমরা প্রাণের আনন্দে মিল্‌তে পারতাম, তবে যথেষ্ট বাজে-খরচ বাদ দিয়েও অনেক কাজের কাজ-এর রসদ মজ্‌লিশ্‌ থেকে পেতাম!

মজ্‌লিশের নাকি সুন্দর একটা অর্থ আছে। সহজ সরল ভাবের বিনিময়ই তার উপাদান—সমাজ-সংস্কারের উগ্র উত্তেজনা নয়। দিন দুয়েকের মাতামাতি নয়, একটা চিরদিনকার চেনাজানা অথচ অদ্ভুত অজানার পরশ সেখানে। আগেকার যুগে যাকে বলা হত—"গোষ্ঠীসুখ"।

নিজ নিজ কাজের সংসার গুছিয়ে এসে তারপর যে প্রাণ হতে প্রাণে উদ্বৃত্ত আনন্দের নিঃস্বার্থ আদান-প্রদান, তাতে মানবাত্মার অন্তরঙ্গতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল কর্ম্ম বা বস্তু ভাব ব্যতিরেকে প্রাণহীন, নীরস। এই মজ্‌লিশের ফলে আমাদের কঠোর কর্ম্মজীবনেও রসের জোগান এনেছিল।

সেদিন থেকে প্রত্যেকের স্বাধীন চিন্তা খোলা-খুলি প্রকাশ করে আমরা যেন ভ্রাতৃঋণ শোধ কর্‌বার জন্যই এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিলাম।

অথবা কোন কিছুর জন্য নয়—অম্‌নি-অম্‌নিই মনের আনন্দে সবার সঙ্গে সবাই মিল্‌ব বলেই এই মজ্‌লিশের উদ্বোধন হয়েছিল। এতে যে খুব একটা সুফল ফল্‌বে, সেটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। বহুদিন ধরে মনটা নানা কারণে খুবি বিমর্ষ ছিল, একটী দিনের প্রণয়-আকর্ষণে সব কালিমা যে কেমন করে সেদিন মন থেকে মুছে গেল, তা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

আজ মনে হচ্ছে, আমরা নিজ হাতে নিজের চোখ ঢেকে অন্ধ হয়ে বসে থাকি, নতুবা আমাদের জীবন যে আলোর ফোয়ারা!

কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্যমূলে আবদ্ধ নয় বলেই এই মজ্‌লিশ্‌ যে প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত না হয়ে অক্ষয় অব্যয় অথচ চিরকিশোর থাক্‌বে—এ আশাও কর্‌তে পারি।

আমাদের তো কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, গড়ে তুল্‌বার স্পর্দ্ধা নাই—সহজ আনন্দে খেয়াল খুশীতে যা হয়।

নিজ নিজ শক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেও সকলে মিলে আমরা একশক্তি হতে পারি এই সহজ আনন্দে বা প্রাণের স্বাভাবিক প্রকাশে। পরস্পরের উপর আমাদের প্রেমের দাবী যে!

যেখানে জোর খাটে, সেইখানেই জোর কর্‌ব—এতে প্রাণ খুল্‌বে বই কি! এ তো অনিচ্ছায় বাধ্য হওয়া নয়—স্বেচ্ছায় নিজকে সবার বাধ্য করা। এর মাঝে কৃচ্ছ্রতার তিক্তবিরক্ত নাই;—শুধু প্রাণের বেগে হৃদয়ের আগল খুলে দাঁড়ানো। হিসাবী মন কি এমন মিনি-পয়সার কারবারেও গররাজী?

মান-অপমান ছোট্ট নজরের কথা—এখানে শুধু দরদ্‌! আমরা পরস্পর যদি পরস্পরের দরদী হই, তবেই মিলন সার্থক। মিলনের আনন্দে মন স্বাভাবিকই উর্দ্ধে ওঠে। শ্রদ্ধা করা এক জিনিষ, আর খাতিরে মান রাখা আর এক জিনিষ। যদি আমরা আত্মনিষ্ঠ সদানন্দ আজন্মসিদ্ধ ভালবাসার সাধক হই, আমাদের মাঝে মিলন না এসে পারে কি?

আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—নিজের ব্যক্তিগত জীবন-টাকে কতটা স্তিমিত করে ফেল্‌বার দরকার ছিল। উদার আত্মদানে হারিয়ে যেত না কিছুই—বরং পূর্ণ হয়ে উপ্‌চে পড়্‌ত। বিশেষের বাঁধনই বাঁধন। চিরমুক্ত হৃদয় আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বদ্ধ-হৃদয়ের অন্তরালে লুকিয়ে আছে; তাকেই জাগাতে হবে, আর একে রাখ্‌তে হবে ঘুম পাড়িয়ে! আমরা যে সবার দরদে দরদী না হয়ে পারি না। মিলনই আমাদের মর্ম্মসত্য।

সমস্ত ভাবের কথা ছেড়ে দিলেও এই ধরণের মিলনে আমাদের কাজকর্ম্মগুলিও অন্ততঃ খানিটানা

না হয়ে প্রাণপূর্ণ সেবার আকারে ফুটে উঠ্‌বে।

যেদিন আমাদের আচার্য্যদেব প্রথম সম্মিলনী করে সকলের মনে একদিকে আত্মনিষ্ঠা অথচ অপরদিকে আত্মমিশ্রণের উপলক্ষ্যে উৎসাহের আগুন ধরিয়ে দিলেন, তারপর থেকে লক্ষ্য করে আস্‌ছি—আমাদের মনের মালিন্য কেমন ধাঁ ধাঁ করে দূর হয়ে যাচ্ছে। সবাই সবার মুখপানে সরল হাসিমাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পার্‌লাম যেদিন, সেদিন আর অক্ষমা রইল না, বুকচাপা অস্বস্তির ঈর্ষ্যানল রইল না—একটা সুন্দর সরস আত্মীয়তার আকর্ষণে প্রত্যেকে প্রত্যেককে আনন্দে স্বীকার করে নিয়ে চিরতরে স্বচ্ছন্দে বহন কর্‌তে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হলাম। ক্ষণেকের মিলনমন্ত্রে কি এক অপরূপ আবেশ প্রাণে খেলে গেল। এক অদ্ভুত ভাবে সে দিনটা কেটেছিল বটে!

যে মিলনের এত আবেশ, সেই মিলনকে হাতে পেয়েও মানুষ অগ্রাহ্য করে কি করে—এ এক রহস্য কিন্তু! আমি তো সেদিন প্রাণ খুলিনি, হাসিমুখে কাউকে বরণ করে আনিনি। কিন্তু প্রাণ কি আমার নীরব ছিল? সে কি সত্যি সত্যি কিছু চায়নি?

যে আমি মিলন চাই, সেই আমি কেন সকলকে বিশ্বাস করি না, কেন অপরের সাদর আপ্যায়নকে প্রত্যাখ্যানের আঘাতে দূরে ঠেকিয়ে রাখি, এ একটা নিরেট্ প্রশ্ন। ঠিক ঠিক জবাবটা পাইনি। যেদিন পাব, সেদিন থেকে ওসব অভিনয় আর করব না। সেদিন থেকে সত্যি সত্যি মিল্‌ব। কে বল্‌বে, আজই আমার সেই দিন এসে পড়েছে কিনা। বিশ্বাস হল, সবাই চায়—তবে আমিও কি চাই না?

অপরের কাছে নিজকে প্রকাশ কর্‌তে ভাল লাগে বটে, কিন্তু ভাল লাগাতে পারব কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারিনি বলেই হয়ত মিলনকে সেদিন ক্যাসাদের মত মনে হয়েছিল।—আমাকে যেমন করে দিতে আমার ভাল লাগে, ঠিক তেমনটী পেতেই যে অপরেরও ভাল লাগ্‌বে—এই কবিসুলভ আত্মবিশ্বাসটুকু সেদিন ছিল না। যেন কতকটা অনাত্মীয়ের মতই ফিরে এসেছিলাম বটে, কিন্তু নিরালায় বসে নিজের এ মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করতে ছাড়িনি। সেই বিশ্লেষণের ফলেই হয়ত সংশ্লেষণের সর্ব্বস্বত্যাগী প্রেরণায় প্রাণ আজ এমন ছিট্‌কে পড়্‌তে চাচ্ছে!

ভাল যে কেন লাগে, তার উত্তর কেউ কোন দিন দিতে পারেনি, পার্‌বেও না। তবে মনে হয়, যে যার স্বভাবের আসনে বসে থেকে যা-ই বলে, যা-ই করে, তাই সকলকে ভাল লাগে—তাতেই তাকে মানায় ভাল। সুতরাং নিজের মর্য্যাদা না হারাই—এইটুকুই লক্ষ্যের বিষয়।

সেদিন যে আমারো বুকের মাঝে অনেক চেষ্টা অনেক কথা বিষম আকুলি-বিকুলি না কর্‌ছিল, তা নয়; শুধু ভয় হচ্ছিল—কি কর্‌তে কি হয়ে যাবে, কিসে কি বলে ফেল্‌ব—হয়ত বা অপ্রিয় হব! বিচার-বিবেচনা অত্যধিক বেড়ে গেলেই কি এমন হয়? না কি ওটা আমারই মনঃকল্পিত সংস্কারের মিলনবিদ্রোহী ইন্দ্রজাল?

শিশুর মত নিঃসংশয়ে তো সেদিন কিছুই কর্‌তে পারিনি। পদে পদে চেয়েছি—বেছে বেছে ভালটা দেব সকলকে। বাছ্‌তে বাছ্‌তে আর কোনটাকেই পছন্দ হয়নি। রসের হাটে অমন দাঁড়িপাল্লা নিয়ে কেউ কখনো বসেছে কি?

ভাল আর মন্দের বাছাবাছির বালাই ছেড়ে দিলেই গোল মিটে যেতো। আমি যে অপূর্ণ—এ তো সকলেই জান্‌ছে; তুমি ঠিক তোমার আসনে থাক্‌লেই তো পার!

অত্যাশায় বা দুরাশায় মনকে বাঙ্গাল করে রেখেছিল। যেখানে শিক্ষার্থী হৃদয়ের হওয়া উচিত ছিল বিনয়নম্র, আত্মনিষ্ঠ, সেখানে অনাহক্ অপরের সঙ্গে তুলনা করে ভাল সাজ্‌তে গিয়েছিলাম।

অভিমানী মনের আজ গোমর ভেঙ্গেছে। যা আছে তার, তাই তাকে সরলভাবে দিয়ে যেতে হবে—পর-

মুখাপেক্ষী সঙ্কোচের ভাব রাখলে চল্‌বে না তো! অপূর্ণ হয়েও পূর্ণ—এইটাই সত্যিকার অনুভব। এই অনুভবই মমতার প্রাণ। আজ কি তুমি নির্ম্মম বলে আত্মপরিচয় দিয়ে সুখী হতে পার?

বুঝ্‌তাম সবি—কিন্তু কাজে হয়ে ওঠেনি। সবার চেয়ে ভাল, এই বিশ্বাসকে কত সন্তর্পণে বুকে আঁকড়ে রেখেছি; আত্মকৃতিত্ব ব্যাহত দেখবার আশঙ্কায় লোক-সঙ্গ পরিবর্জ্জন আমার এক সর্ব্বনেশে বাতিক্। যে কাজে জানি আমি সবার চেয়ে সুদক্ষ, সে কাজে ছাড়া প্রাণ খোলেনি—প্রাণ খোলার এই এক বিট্‌কেল্ সর্ত্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কি ঘোর দুর্ব্বলতা! সবার সঙ্গে ভাবে-কর্ম্মে দলাই-মলাই হতে হতে এ সব ময়লা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে যেতো আরো কত আগে। নিজের বোকামিতেই নিজে অস্ফুট থেকে গিয়েছি—না জানি তাঁর কত আকাঙ্ক্ষাকে বিমুখ করেছিলাম সেদিন!

কিন্তু দেখ্‌তে পেতাম, যত গোপন করে যেতে চাই, আমায় সভায় টেনে বের কর্‌বার উৎসাহটা সবার ব্যবহারে তত প্রবল হয়ে জাগ্‌তে থাকে। এমন ক্ষেত্রে অবশ্য পরাজয়ই আমার কাম্য ছিল, তবু সংকল্প ছিল - আপনা থেকে ধরা দেব না। সকলে আমায় নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘাঁটাঘাঁটি করুক, তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু নিজে কোথাও আগ্রহ দেখাচ্ছি না। কেন এমন হতো?

নিজের এই ব্যক্তিগত দিক্‌গুলোকে অগ্রাহ্য করেও যে দশ জনের সঙ্গে মিল্‌তে পার্‌ব না, এ আশঙ্কা ছিল না। ভাব্‌তাম, সে শক্তিটা আপ্‌নি আসুক। টেনে-হিঁচ্‌ড়ে আন্‌ব না। প্রকৃতি সবই দেখ্‌ছেন। তিনি আমার ধাত্রী। যে দিন দেখ্‌ব, মিলন-পিপাসায় বুক ফাটে-ফাটে হয়েছে, কিছুতেই নিজকে আর ধরে রাখ্‌তে পার্‌ছি না, সে দিন সব্বাইকে জোর করে বুকে টেনে আন্‌ব—শোন্‌বার কথায় কথায় তাদের আচ্ছন্ন করে দেব।

আমার সে প্রতীক্ষা নিরর্থক হয় নি। এতদিনকার সমস্ত কল্পিত উপেক্ষার খাঁটী কৈফিয়ৎ দেবার সময় যেন এসেছে। কত শত উদ্ধত প্রশ্নের মূর্ত্তিমন্ত সমাধান হতে হবে আমাকে, সে প্রেরণা আজ বিলকুল প্রাণ ছেয়ে ফেলেছে।

চাই শুধু মিলন, মিলন! যাদের সঙ্গে আছি, যে জগতের হৃদয়ে বাস কর্‌ছি, তার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতি ভাবনার তন্ত্রে তন্ত্রে নিজকে ছড়িয়ে দিতে হবে। মিল্‌তে হবে—প্রয়োজনার তাড়নায় নয়, প্রাণের প্রেরণায়। সকল কামনা ভস্ম হয়ে গেল, সকল অভিমান ধুলায় লুটিয়ে পড়্‌ল—তোমার বল্‌তে রইল না, রইল না, কিছুই রইল না—আর কেন? বেদনার তীব্রতম অভিঘাতে যে অপূর্ব্ব মিলন-সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ল প্রাণে, আর তো তোমার একলা হবার নাই কিছু!—যা হবে এবার, সবার সঙ্গে হবে—সব্বাইকে নিয়ে হবে।

এমনি করে ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেদিনকার মজ্‌লিশের সমস্তটা তাৎপর্য্য উজ্জ্বল হয়ে চোখে ফুটে উঠ্‌ল। তাঁর কোন্ অভিপ্রায়ের সঙ্গে আমার অভিমানী জীবনের কি সম্পর্ক কোথায় ছিল, আজ সবই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

আমার জীবন দিয়ে সবার জীবনের রহস্য আজ আমি বুকে পেয়েছি। স্মৃতি বলে দিচ্ছে, সেদিনকার সে মজ্‌লিশে তোমার প্রতি যা ছিল তাঁর অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র, আজকার "মজ্‌লিশে" সুস্পষ্ট দিবালোকে তারই সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকাশ।

আমার সর্ব্বাঙ্গতনুমন আজ তাই মিলনের অনুভবে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। যেন সে বল্‌ছে—

> "হৃদয় আজি মোরে কেমনে গেল খুলি!
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
> ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি 'পরে,
> জেনেছি ভাই বলে এ জগৎ চরাচরে!"

ঘরে ফিরে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে একটী কবিতার বই থেকে এই কথা কয়টী সে দিন ডাইরীর পাতায়

লাল কালীতে টুকে নিয়েছিলাম, নিজের বক্তব্যও ছুটী-চারটী তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম; শোনাবার সাহস হয়নি।—আজ কেন বা আপনি তা বাইরে ছড়িয়ে পড়্‌ল, যেন আর ধরে রাখা গেল না।

একাগ্রতা

আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে অনেক বাধা-বিঘ্নই আছে। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি আরও কত কিছু। বাধা-বিঘ্ন যেমন আছে, তেমনি তাহার প্রতিকারের উপায়ও রহিয়াছে। বিক্ষেপ বা দুঃখাদি নিবারণের অনেক উপায়ের কথাই পাতঞ্জল-দর্শনে আছে, তন্মধ্যে "যথাভিমতধ্যানাদ্বা"—ইহাকেও একটী উপায় বলা হইয়াছে। যাহা মনে হইলে তোমার মন প্রফুল্ল হয়, শান্ত হয়, একাগ্রতার দরুণ তাহাকেই ধ্যান করিতে হইবে।

একটা কিছু অবলম্বন ছাড়া আমাদের মন স্থির থাকিতে পারে না—কিন্তু অনেক সময় মন যে অবলম্বন পায়, তাহাতে চঞ্চল মনকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলে—তাহাতেই দুঃখ পাইতে হয়—চিত্তে অশান্তি উৎপন্ন হয়। কাজেই ধ্যানের বিষয় নিয়া প্রথমেই আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। কাহাকে ধ্যান করিলে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ-শান্ত থাকে!

আসল কথা হইল একাগ্রতা নিয়া। তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ—সংবেগ যাহাদের তীব্র, তাহাদেরই শীঘ্র আত্মজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তে এই সংবেগ উৎপন্ন হইলেই একাগ্রতা আসে—আর এই একাগ্রতা থাকিলে যে কোন উপায় অবলম্বনেই সহজে সফলকাম হওয়া যায়। "যথাভিমতধ্যানাদ্বা"—ইহার অর্থই বোধ হয় এই। অর্থাৎ একাগ্রতা থাকিলে যে কোন উপায় অবলম্বনেই সহজে চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়!

অভিমত বস্তু অবলম্বন করিয়াই একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হইবে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একাগ্রতা পরিপক্ক হইয়া গেলে ধ্যানের বস্তুও বিলোপ হইয়া যাইবে। একটা বিষয়ে মনটা একাগ্র হইলে শেষে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই মনকে একাগ্র করিতে পারা যায়। সর্ব্বত্রই চিত্ত প্রয়োগ এবং সর্ব্বত্রই চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিলে আর কোন কিছুতেই মনের চঞ্চলতা থাকে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, একাগ্রতা-শক্তি যাহাদের বেশী, তাহারা সহজেই বিভিন্ন কাজের মাঝেও মনটাকে সহজে গুটাইয়া নিবিষ্ট করিতে পারে। যেমন স্বামী রামতীর্থ, হয়ত অঙ্ক করাইতে গিয়াছেন, ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার চিত্ত তন্ময় হইয়া অজ্ঞাতে ব্রহ্মানন্দরসে ডুবিয়া গিয়াছে। কতদিন যে তিনি অঙ্কের ক্লাসেও আধ্যাত্মিক প্রেরণার উচ্ছ্বাসে কত কিছু আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাকেই যথাভিমত ধ্যানের পরিণতি বলা যাইতে পারে। মন যখন নিজের করায়ত্ত হইয়া পড়ে, তখন যাহাতে মনকে

লাগানো যাইবে, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া যাইবে। এই একাগ্রতা শক্তি যখন প্রবল থাকে, তখন আর মনে কোন সংশয় উঠে না। হয়ত তখন আবেগ-মিশ্রিত ভক্তিপূর্ণ এক ডাকেই, সাধন-ভজন দ্বারাও যাঁহাকে পাওয়া দুষ্কর—তাঁহাকে পাইয়া ফেলি। আর আসলে বলিতে গেলে ইহাই খাঁটী—জীবনভরা সাধন-ভজন করিতে হয় শুধু এই একাগ্রতা, তন্ময়তার দরুণই।

যে-কোন অবস্থার মাঝেই পড়ি না কেন, আপন ভাব বজায় রাখিতে হইলেই একাগ্রতার প্রয়োজন। উপায়টা পরে আবিষ্কৃত; সত্যলাভের দরুণ প্রথমে যে প্রাণে নিদারুণ আকুলতা জাগে, উহাই আসল।

যখন দেখিবে, চিত্ত আর কোথায়ও প্রতিহত হয় না, সর্ব্বত্রই স্থির থাকে, তখনই জানিবে তোমার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে। তখন হয়ত চিত্ত স্থির করিবার দরুণ বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন না করিলেও চলিবে। কিন্তু ইহা চরম অবস্থা, সাধক অবস্থায় একটা কিছুকে অবলম্বন করিয়াই চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে।

প্রথমে সত্যকে বিশিষ্ট স্থানে বা রূপে প্রত্যক্ষ করিবার একটা প্রবল বাসনা থাকে, তাহার পর ক্রমশঃ যখন জ্ঞান বাড়িতে থাকে, তখনই আবার সত্যকে বিশ্বময় দেখিবার একটা নিদারুণ আকুলতা জাগিয়া উঠে। ভিতর হইতে তখন কে যেন বলে—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

আমি যাহাকে বিশিষ্ট ক্ষণে কিম্বা বিশিষ্ট স্থানে লাভ করিয়াছি, তাঁহাকে যদি সর্ব্বত্র শাশ্বতরূপে না পাই, তাহা হইলে তো তাঁহাকে সত্য করিয়া পাওয়া হইল না। বাস্তবিকই আমি যাহাকে পাইয়াছি—তাহাকে কোন সময়ই হারাইতে হইবে না, ইহাই হইল খাঁটী পাওয়া। বৈষ্ণবের ভাষায় বলিতে গেলে—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" ইহাই হইল খাটী দর্শন। কিন্তু প্রথমে নিজের মাঝেই সেই সত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে। উপনিষদেও আছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং, ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

—প্রথমে ব্যষ্টি আধারেই অনুভব করিতে হইবে—শেষে সর্ব্বত্রই সেই অনুভব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

প্রথমে মনটাকে গুটাইয়া আনিতেই হইবে, তাহা না হইলে আমাকে তো আমি ঠিক বুঝিতে পারি না—তারপর সেই সংযম আয়ত্ত হইয়া গেলে আর তাহার দরুণ বেগ পাইতে হইবে না। বলিতে গেলে আমাদের ষোল-আনা দুঃখ এই মনের চঞ্চলতার দরুণই। তত্ত্ব না বুঝিয়া যাহাকে-তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরি—আবার তাহার বিচ্ছেদে একান্ত শোকাতুর হইয়া পড়ি।

ব্যষ্টিতে যাহা রহিয়াছে, সমষ্টিতেও তাহাই। সত্য সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমান। চাই শুধু একাগ্রতা—তীব্র সংবেগ।

চিত্ত স্থির হইলেই আত্মোপলব্ধি হয়। কাজে-কাজেই চিত্তকে স্থির করাই আসল কথা। যাহা তোমার ভাল লাগে—তাহারই ধ্যান করিতে হইবে। মোট কথা, একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়া চিত্তকে তন্ময় করিয়া দিতে পারিলেই হইল। চিত্তকে এক-মুখী করিতে হইলেই এক তত্ত্ব অভ্যাসের প্রয়োজন!

একাগ্রতা যাহার প্রবল, তাহার জীবনের মোড় ফিরাইতে বেশী সময় লাগে না। যে-কোন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়াও তাহারা আপন লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় না। সিদ্ধিলাভের ইহাই হইল একমাত্র উপায়।

কেন্দ্রে লক্ষ্য স্থির থাকিলে, পরিধিতেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে কোন আশঙ্কা থাকে না। যে-কোন উপায় অবলম্বন করিয়া প্রথমে মনটাকে স্থির করিতে পারিলে শেষে যে-কোন বিষয়ের ধ্যানেই চিত্তে আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রবাহ চলিতে থাকে।

—:*:—

সত্যি কি না?

—:*:—

ঐ একটী শব্দের কি কদর্থই না চারিদিকে আজ দেখিতেছি! সরল মনে কথাটী উচ্চারণ করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; খুঁৎখুঁতে মন উহা হইতে নানারূপ খুঁৎএর আরোপিত সত্তা উদ্ভাবিত করিয়া লয়।

আমার মনে হয়, "প্রেম"-শব্দটীর অর্থ খুব ব্যাপক। জগতের ভালমন্দ সমস্তকেই সে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; তার মাঝে সবই আছে। ছোট মন ছোটটুকুই দেখে, কু-মন কু ভাবিয়াই সুখ পায়। কিন্তু ইহা প্রেমের দোষ নয়—ধারণার দোষ। মনকে বড় করিলে প্রেমের সদর্থই সহজে ধরা পড়িত।

ভগবান্‌কে বলা হয়—প্রেমময়। সুতরাং কোন মানুষ যদি প্রেমময় হয়, তাহাকে আমরা ভগবানের বিকাশস্থল মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি।

যত অত্যাচার প্রেমই সহ্য করে; জগতের যত নিরাশ্রয়কে প্রেমই আশ্রয় দিতে সক্ষম। মুস্কিল মুস্কিল বলিয়া সংসার শুদ্ধ লোক যখন চ্যাঁচাইবে, প্রেম তখন মুখ বুজিয়া ঘরের কোণে বসিয়া সন্তর্পণে সেই মুস্কিলের আসানের ব্যবস্থা করিতে থাকিবে। প্রেম সব কিছুকেই একটু বেশী রকম প্রশ্রয় দেয়—ইহাই তাহার দোষ। যুক্তিবাদী মনের তাহা সহ্য হয় না। সে চায় রাতারাতি বিচার—এক্ষুণি রফা! প্রেম বলে—"আহা, কর কি! বেচারী বোঝে নাই—বুঝিলে কি আর—" ইত্যাদি। যদিও যুক্তি ইহার প্রতিবাদ করিতে প্রাণে প্রাণে সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত, তবু সব সময় তার জিৎ হয় না; সে "মুখেন মারিতং জগৎ" করে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায়—"যার জন্য চুরী করি, সেই বলে চোর"—যার হিতের দরুণ যুক্তি মাথা কুটিয়া মরিতেছিল, সে দিব্যি ভাল মানুষটীর মত নির্ব্বিবাদে কখন গিয়া প্রেমেরই কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে! যেন সে বলিতেছে, আমি তোমার উপকার চাই না, শুধু একটু আশ্রয় চাই।

এইরূপে আশ্রয় আর প্রশ্রয় দিতে দিতে প্রেমের বাড়ী বাজে কাজের আবর্জনা আর জঞ্জালে ভর্ত্তি হইয়া উঠিল, তবু তার অধৈর্য্য নাই—সব্বার সহিত প্রেম সর্ব্বদা হাসিমুখ! প্রেমের এ অদ্ভুত দখলী কারবার কার সহ্য হয় বল!

"প্রেম" কথাটীর শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থ বাদ দিয়াই বলিতেছি—আজকাল অধিকাংশ মনে ইহার ব্যঙ্গার্থটাই জাগে না কি? ঠাট্টা বিদ্রূপের ছলে প্রায় ক্ষেত্রেই ইহার প্রকৃত অর্থটাকে আমরা আড়াল করিয়া ফেলি না কি? এমন কি, একটা ছোট ছেলের মুখে পর্য্যন্ত ঐ শব্দটীর মেলো অর্থে উচ্চারণই যখন শুনিতে পাই, তখন এই অপূর্ব্ব মনোবৃত্তির উদ্ভব-কারণ দার্শনিকের মত চিন্তা করিতে গিয়া নিজের গালেই নিজে চড়াইতে ইচ্ছা করে। প্রায় ক্ষেত্রেই ছেলের ভালমন্দ পারিপার্শ্বিকেরই অনুসরণ করে। নিহিত সংস্কারের দোষ আর কতটুকু?

প্রেম সম্বন্ধে মহিমান্বিত সংস্কার আজ উপিয়া গিয়াছে, তার কারণ, খাঁটী প্রেম আজকাল খুব কম। দেশের জন্য সমাজের জন্য চীৎকার করিয়া মরিতেছি, অথচ কেহ কাহারও কথা শুনিতেছে না—আমার মনে হয়, ঠিক ঠিক প্রেমভরে দেশের বা সমাজের হিত আমরা কেহ চাহিতেছি না।

প্রেম শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল—অপরকে প্রীত করা। সমস্ত ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়াও

প্রেমের এই সহজ সরল অর্থটুকু আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রেমের প্রধান অর্থ—স্বার্থত্যাগ, আত্মসুখলালসা ত্যাগ, নিষ্কাম হওয়া—আত্মগত ভাবে ইহা অনুভব করি। এক কথায় আত্মত্যাগই প্রেমের প্রকৃত অর্থ; জগদ্ধিতে তাহার আংশিক বিকাশ মাত্র। প্রেম অর্থাৎ হিত করিবার অহঙ্কারে হিত করা নয়, দিবার আনন্দে দিয়া যাওয়া।

দেশের প্রতি বা সমাজের প্রতি আমাদের মনোভাব হইয়া দাঁড়ায় ইহার উল্টা। ভাল হউক, এইটা খুব জোর-গলায় চাই, কিন্তু নিজে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিব না! আত্মত্যাগবিহীন প্রেমে জগতের হিত কেন হইবে? "জগতের ভাল হউক" বলিয়া নিজের মানসিক সুখটাই কি সেখানে কামনা করা হইতেছে না? সুতরাং ইহা তো নিষ্কাম ভাব হইল না—ইহা মুখের প্রেম, বচনের প্রেম, কিন্তু প্রাণেরও নয়, কাজেরও নয়! জগদ্ধিত আমরা কামনা করি, কিন্তু প্রাণে প্রাণে প্রেমভরে চাহি না বলিয়াই জগদ্ধিত হয় না। নতুবা একথা নিশ্চিত—খাঁটী প্রেম মাত্রেই জগতের শুভমুখী পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ।

কামনায় বাধা পড়িলে ক্রোধের উদ্ভব—ইহা গীতার কথা। মনের ক্ষোভ ক্রোধেরই সুপ্ত রূপ। কাহারও ভাল করিতে গিয়া বাধা পাইয়া যখন ক্ষুব্ধ হই, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারি, তাহার ভালর দরুণ আমার কামনা ছিল, কিন্তু প্রেম ছিল না। অর্থাৎ ভাল করিতে চাহিয়াছি অবশ্য, প্রায়ই ক্ষেত্রেই নিজে কোন ত্যাগস্বীকার করি নাই, অন্ততঃ আত্মতৃপ্তির আশাটী ছাড়ি নাই। অন্তঃসারবিহীন প্রেম কখনো সার্থক হইতে পারে না

ভগবান্ যদি প্রেমময় হন, আর তিনিই যদি জীবজগতের হৃদয়বিহারী হন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়েও প্রেম রহিয়াছে এবং সেই প্রেমই জীবনের একমাত্র সত্য।—ইহা অভ্রান্ত।

"প্রেম" শব্দটীর সমস্ত দার্শনিক বাগাড়ম্বর ভুলিয়া যাও—শুধু দেখ, ভালকে ভাল লাগে, পবিত্রকে সুন্দর লাগে, পরের জন্য দুঃখস্বীকারে সুখ হয়, এমন কোন ভাব তোমাতে আছে কিনা। এমন কোন আত্মদান জীবনে করিয়াছ কিনা, যাহা তোমার মনকে উজ্জ্বলতম অনুভূতির স্পর্শ দিয়া গিয়াছে!—

উহাই প্রেম। ওই তো ভগবানের বিকাশ, জীবের হৃদয়ে শিবের প্রকাশ। ভগবান্ সর্ব্বময়—তোমার প্রেমও সর্ব্বজয়ী। তোমার কাছে তোমার যেটুকু পবিত্র, তাহাই প্রেম।

পরকে ভাল করিবার জন্য যে ত্যাগস্বীকার মানুষ করে, আসলে তাহাতে তার নিজকেই ভাল করা হয়। প্রেমের এই আত্মনিষ্ঠ দিকটা হৃদয়ে সুস্পষ্ট থাকিলে জগদ্ধিত করিতে গিয়া আমরা এত ভুল করিতাম না।

অধীর উত্তেজনায় পুনঃ পুনঃ পরের ভাল করিতে গিয়া কেবল আঘাতই পাইতেছি, আর সেই আঘাতে মুস্ড়াইয়া পড়িতেছি—দেশ বা সমাজের সংস্কারাভিমানীমাত্রেরই হৃদয়ের ব্যথা এই। সবাই ক্ষুব্ধ চিত্তে পরের ভাল করিতে যাইতেছেন, আসলে কেহই ভাল হইতেছে না। পরস্পর কেবল দোষারোপ!

খাঁটী প্রেমের অভাবেই এইরূপ ঘটিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আর প্রেম সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও কত ভ্রান্ত! অথচ জীবনের সারসর্ব্বস্বই তো ওই। কোথাও না কোথাও প্রেম আছে বলিয়াই সংসার আছে! হৃদয়ে হৃদয়ে মঙ্গলমুখী প্রেরণাকেই প্রেমের চিদ্ঘন রূপ বলিতে পারি না কি?

প্রেম সম্বন্ধে কত হাস্যকর মন্তব্যই যে শুনিতে পাই। রাগ হয় নিজের উপরই অবশ্য—আমার প্রেম কেন মন্তব্যকারীদের হৃদয়ের ভ্রান্তিকে জয় করিতে পারিল না? ইহা অভিমান বটে, কিন্তু উচ্চাশী মনের পোষ্য অভিমান।

সেদিন এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন—মহাবিরক্ত হইয়া—"দেখ ভাই! আমার মনে হয়, যে প্রেমে

পড়ে, সেই গোল্লায় যায়! এই দেখ না, সেদিন ছেলেটা নূতন মাত্র আশ্রমে আসিল—বেশ কর্ম্মী, সুন্দর নিয়ম সংযমের বাধা, অমায়িক চরিত্র, সব্বার সঙ্গে সমভাব; দুদিন যাইতে যাইতে যেই সে কাহাকেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিল, অমনি দেখি, সে আর আগের মত নিয়ম-সংযমে চলিতেছে না; কাজ-কর্ম্ম করে তো করে, না করে নাই; আগের সে সবল আত্মনিষ্ঠ-ভাব চলিয়া গিয়া এক অদ্ভুত বিহ্বল-ভাব আসিয়াছে; বিশ্ব-প্রেমের নামে, সহজের নামে গা-ভাসান দিতে শিখিয়াছে; আর সে সরলতা নাই—কাজে-কর্ম্মে আগ্রহ নাই! ইত্যাদি ইত্যাদি—কত আর বলিব? এখন তাহাকে লইয়া কি মুস্কিলে যে পড়িয়াছি, না পারি ফেলিতে, না পারি গিলিতে!"

স্তব্ধ হইয়া বন্ধুর কথাগুলি শুনিলাম। আবার সেই কথাটী মনে জাগিল—প্রেমের কি কদর্থই না দেশের মনে বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে!

কথাগুলি অবশ্যই বন্ধুর অপ্রেমিক মুহূর্ত্তের কথা। সত্যি সত্যি প্রেম যখন থাকে, তখন হাজার মুস্কিলেও মুস্কিল মনে হয় না। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল, আমার বন্ধু কি করিয়া এমন অধৈর্য্য হইলেন! জগতে মানুষ গড়িবার দীক্ষা যাহাদের নিতে হইয়াছে, তাঁহাদের যে মুস্কিল বলিয়া গা বাঁচাইবার কিছু নাই। মানুষ তো মুস্কিল বাধাইবেই, অপটু প্রেম তো ভুল ভ্রান্তি করিবেই। তা বলিয়া তুমি যদি বন্ধু এমন অধৈর্য্য হইয়া পড়, তবে মানুষকে মানুষ করিবে কি করিয়া?

জোরের সঙ্গে বরং এই কথাগুলিই ভাব—না, কোন মুস্কিলই মুস্কিল না! বরং যাহাকে নিয়া যত মুস্কিলে পড়িতে হইতেছে, ধর, সেই তত জীবন্ত! বর্ত্তমানের এই মুস্কিল বাধানো ব্যাপারটী তাহার জীবনী-শক্তিরই একটা তির্য্যক্ বিকাশ বলিয়া মনে গ্রহণ কর; তাহাকে সার্থক প্রকাশে রূপ ধরানো তোমারই প্রেমিক হৃদয়ের কাজ। ধৈর্য্য ধর—প্রতীক্ষা করিতে ভয় পাইও না। জানোয়ারকে মানুষ করিবার পণ যখন করিয়াছ, তখন সময়ে-অসময়ে আঁচড়টা-কামড়টা খাইতে হইবে বই কি!

তুমি যে বলিতেছ, "আগে তো বেশ নিয়মী সংযমী ছিল" আমার মনে হয়, ওটা তার সত্যিকার পরিচয় নয়;—এতদিন সে গতানুগতিক সংস্কারের জালে জড়াইয়া জ্যান্তে মরিয়া ছিল! তুমি কি ভাব, তাহার প্রকৃত স্বভাবটার পরিচয় পাইয়াছিলে? তাহা কিছুতেই নয়; এতদিন তুমি তাহাকে পাইবে কি করিয়া?—যাহাকে বলিতেছ, প্রেমে পড়িয়া গোল্লায় যাওয়া; আমার বিশ্বাস—ঐটাই তার ঠিক ঠিক নিজকে পাইয়া বাঁচিয়া ওঠা, এবার সে মানুষ হইবে। মানুষ যখন ভালবাসিতে শিখিল, তখনই সে তাহার জানোয়ার স্বভাবের উপর রাজা হইল। নিজকে না পাইলে তো নিজকে দেওয়া যায় না। ভালবাসা যে আত্মদানেরই নামান্তর মাত্র। দানের আনন্দে প্রথমটা একটু উচ্ছল করেই। ক্রমশঃ প্রশান্তি আসে। ব্যস্ত কেন?

এতদিন ছিল সে যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ—এবার তাহাতে প্রাণের সঞ্চার হইল। আঁৎকাইয়া উঠিও না বন্ধু, যন্ত্র বাগ মানিতে চলিল—এর পর যেমন খুসী সুর চড়াইও। অতি সন্তর্পণে সঙ্গোপনে তার জীবন্ত হৃদয়ের মন বুঝিয়া বুঝিয়া নিজের কাজ সুরু করিয়া দিও।

প্রেমে যে অস্ফুট আত্মানুভূতির আবেশ তাহার মাঝে জাগাইল, এই তো সেই ত্রিদিবের অমিয়নির্ঝর—তোমার বাছাবাছির বিচারে ব্যস্ত উদ্বিগ্ন মন কি সব সময় তাহাকে চিনিতে পারে? হতাশ হইও না বন্ধু! বাঁধিয়া রাখিয়া বা বাধা দিয়া যদি তাহার ভাল করিতে হয়, সে তো তোমারই অক্ষমতা। তুমি কি জীবনে কাহারও ক্ষমা স্নেহ পাও নাই? আধ্যাত্মিকতারও মোহ আছে; আজ তাহাই কি তোমাকে ভ্রান্ত করিল?—অপ্রেমিক করিল?

এতদিন হয়ত শুধু বুদ্ধির বিচার নিয়া চলিয়াছ, চুলচেরা নীতিবাগীশী আর কৌশলের উপর কৌশল খাটাইয়া নিজের নির্দ্দোষিতা বাঁচাইয়া আসিয়াছে। এই ভাবকে তো প্রেম বলিব না—তুমি যে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিবার ফিকিরে কৃপণ হইয়া ছিলে! অনুদার প্রেমই কাম নয় কি?

তাহার ভিতর প্রেম জাগিয়াছে বলিতেছ, আর তো তোমার কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না—এবার নিজে শুদ্ধ নামিয়া আসিতে হইবে, হৃদয় নিয়া কাজ করিতে হইবে!

এতদিন সে কাহাকেও জানিত না, চিনিত না, বুঝিত না—তার আত্মাপুরুষ এতদিন নানা কৃত্রিমতায় আবৃত হইয়া ছিল; তুমিও কৃত্রিম মৌখিক বুলি দিয়া একটা ধরাবাঁধা নীরস পথে জড়ের মত তাহাকে চালাইয়া আনিয়াছ। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ তো ঘটে নাই!

এ সবই যে প্রবঞ্চনা। নিছক্ শুধু বাইরের সংযোগটা চিরকাল প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চনায় আপাত-সুখ আছে কিন্তু শুভ নাই। জানই তো "চালাকীর দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।"

এতদিন সে তোমার হাতে ছিল মাত্র, প্রাণে তো ছিল না। এবার হাতেও আসিল, প্রাণেও আসিল। দুদিনের জন্য ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া মানুষের কাছ হইতে কাজ আদায় করিতে পার বটে, কিন্তু হৃদয় পাইলে কি? সত্যি সত্যি যদি আজ প্রেমে পড়িয়া থাকে, তবে আমি বলিব—তাহার হৃদয় জাগিতে সুরু করিল।—তোমার ধৈর্য্যশীল প্রতীক্ষমাণ প্রেরণা তাহাকে জয়ী করুক। এর পর এমন দিন আসিবে, তুমিও তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিবে—অর্থাৎ তোমাকেও তাহার মধ্যে পাইবে। সে ঘুমাইয়া ছিল, জাগিয়াছে; শীঘ্রই পথে আসিবে।

অনুদার হৃদয়ই মুস্কিলকে মুস্কিল ভাবিয়া ফতুর হইয়া পড়িতে পারে। 'যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান' একমাত্র প্রেমেরই উদার বক্ষে সম্ভব।

গাঁটের পয়শা খরচ করিয়া পরের জন্য কোন দিন কিছু করিয়াছ? শুধু বাইরের হুমকি ধমকি আর মুখের কথায় মানুষ যখন মানুষকে মানুষ করিতে চায়, তখন শুধু ব্যর্থপ্রেমেরই অভিনয় দেখিয়া ব্যথিত হই। এই করিয়াই তো লক্ষ্য হারাইয়া বসি আমরা।

বন্ধু, যখন ভুল বুঝিয়া নিজকে প্রত্যাখ্যাত ভাবিয়া পিছাইয়া আসিলে—ঠিক প্রেমিকের কাজ তো করিলে না। যত আঘাত পাইবে, তত আরো জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে। প্রেম তো কাহা-কেও ফিরাইয়া দেয় না!

এতদিনে ঠিক হৃদয়ের কারবার সুরু হইল। যাহা ছিল লৌকিক দেনা-পাওনা, এবার সেখানে অলৌ-কিক আদান প্রদান ঘটাইতে নিজে যজ্ঞেশ্বর স্বয়ম্বর হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুকের রক্ত দিতে ভয় পাও, দুঃখ ভাব—ভীরু, প্রেমের অযোগ্য তুমি! অভয় অজর অমর হৃদয় না নিয়া এ পথে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না, জান না কি?

ভয় পাইয়া যাহারা পিছাইয়া যায়, মানুষে মানুষে প্রেম দেখিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, তাহাদের বলি—তোমরা সংশয় করিও না; কাহারও স্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইবার কথা নাই। সংস্কারের সিন্দূরে মেঘ দেখিয়া টলিলে চলিবে না—ধর, ঠিক ঐখানটীতেই কাজ সুরু করিতে হইবে।

যাহারা কোন দিন কারো কিছু করিয়াছে, ঐ সুযোগেই করিয়াছে। যে কোন আধারকে ধরিয়াই হউক না কেন, এই প্রেমের মায়াতে বাঁধা পড়িয়াই যথার্থতঃ মানুষ বাঁচিয়াছে—জীবন্মৃত যন্ত্রবৎ জীবন কোন্ অরূপ যন্ত্রীর করপরশে অমৃত ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছে, অমৃত পাইয়াছে, অমৃত দিয়াছে।

এ জগতে আসিয়া প্রকৃতির নিয়মে তোমার প্রাণটী তুমি পাইয়াছ; এটীকে পূর্ণ করিয়া অপরের

প্রাণেও উদ্বৃত্ত হইয়া থাকিতে পারিলে যদি, তাহাতেই তো সব হইল—আর চাই কি? অমরত্বের আর বাকী কি?

প্রেমের মায়ামন্ত্রে স্বেচ্ছায় মুগ্ধ হইয়া আপন আবেগে নিজকে যাহারা কারো মাঝে সঁপিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহাদের লইয়া যদি তোমার কাজ না চলে, সে তো তোমারই অশক্তি, তোমারই অপ্রেম!

স্বার্থপরের মত একি কথা বলিতেছ বন্ধু—তাহাদের নিয়া তোমাকে মুস্কিলে পড়িতে হয়? তুমি মুস্কিলে পড়, এইটাই হইল বড়—আর নিদ্রিত জীবনে যে আত্মার উদ্বোধন, এইটাই অগ্রাহ্য? মানুষের চেয়ে মানুষের প্রেমকে যাহারা বড় বলিয়া জানে নাই, তাহারা যে প্রবঞ্চিত, অন্ধ!

রাতারাতি কিছু হইল না বলিয়া, সময় বৃথা যাইতেছে ভাবিয়া মানুষের উপর আমরা ক্রুদ্ধ হই, ক্ষুব্ধ সমালোচনায় তাহাকে বিদ্ধ করি। কিন্তু জানি না তো, তার বুকের মাঝে কি হইতেছে—হয়ত সে তোমারই মন-মত হইবার দরুণ পলে পলে একা একা যুঝিয়া মরিতেছে!

একটা সত্যি কথা জানি—প্রেমই সর্ব্বাধার। যত রহস্যময় বৈচিত্র্য জীবনে অনুভূত হইল, সবেরই মূলে প্রেম। নানা আকারে নানা ভাবে মানুষ এই বস্তুটাই চাহিতেছে—চরমে এই বস্তুই পাইবে। প্রেম বিশ্বের মর্ম্মনিলীন সত্য—প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে যাহা সুষুপ্ত হইয়া আছে। সব চেয়ে বড় ভুল প্রেমকে সূত্র করিয়াই ঘটে, আবার সকল সমস্যার চরমও এই প্রেম। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে সকল দৈন্য থাকিয়াও নাই। ভাল-মন্দ সমস্তটুকু শুদ্ধই মানুষকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রেম গুণাতীত।

প্রেম কি না সর্ব্বাধার—তাই তার একটা আসুর দিকও আছে। একদিকে প্রেম শুদ্ধ জ্ঞানময়, আর এক দিকে তারি যত মোহিনী মায়া।

কাজেই বন্ধু, প্রেমে যাহারা পড়িয়াছে, তাহাদেরই বলি—জগদ্রহস্যের সর্ব্বোত্তম পরীক্ষার অর্থী।—দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সমস্যা তাহাদেরই হাতে।

বিশ্বাস কর—মানুষকে বিশ্বাস কর। বরঞ্চ ঠকিয়া যাও, তবুও কাহারো সাধুত্বকে সন্দেহ করিও না। মানুষের যাহা কিছু পাইবার, তাহা এই মানুষের মাঝেই আছে। শাস্ত্রের আত্মতত্ত্বও তাহাই বলে না কি?

আমাদের উচ্চ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে, সংসারকে নন্দনবন করিয়া তুলিবার প্রবল কামনা আছে; কিন্তু বুঝি বা প্রেম নাই! "কামনা আছে অথচ প্রেম নাই" এই কথাটাকেই ঘুরাইয়া বলা যাইতে পারে—"একটা কিছু চাই অবশ্য, কিন্তু তার দরুণ ত্যাগস্বীকারে নারাজ!"

প্রেমের সদর্থ আমাদের জীবনে ফুটিয়া উঠুক—আমরা যেন মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে শিখি, মনের মানুষকেই হৃদয়ের ইষ্ট বলিয়া ধারণা করিতে পারি—তার দরুণ আত্মস্বার্থ ভুলিতে পারি!

আমার কেবলই মনে হয়, প্রেমের অভাবেই আমাদের দেশে কোথাও কোন প্রতিষ্ঠা সার্থক হইতেছে না। এ প্রেম বলিতে দুর্ব্বল হৃদয়ের লালসা নয়—প্রেম বলিতে সবল প্রাণের ত্যাগস্বীকার, কায়মনোবাক্যে নিঃস্বার্থ হইবার সাধনা। ঘটে ঘটে কেহই নিঃস্বার্থ হইতে পারিতেছি না বলিয়াই আজ কোথাও কিছু গড়িয়া উঠিতেছে না, মোটের উপর কাহারো স্বার্থ উদ্ধার হইয়া উঠিতেছে না—এ কথা জোরগলায়ই বলিব।

নিজের মাঝে জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান যাঁহারা পাইয়াছেন, ভগবান্‌কে লাভ করিয়াও আবার মানুষের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহার ভালর জন্য তাহাদের মাঝে যাঁহারা শুধু ভালবাসিবারই নিঃস্বার্থ গরজে নামিয়া আসিয়াছেন, "প্রেম সর্ব্বাধার" এ কথা তাঁহাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সংশয়ঘোর জীবনের

দুর্দ্দিনে তাঁহাদের ঐ কথাগুলি ভাবিয়া প্রাণে বড় বল পাই।

যথেষ্ট পরিমাণ "প্রেমে"র কদর্থ জগতে লক্ষ্য করিয়াছি এবং করিতেছি, তথাপি ঐ সর্ব্বত্যাগী মনের মানুষদের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের বুকনিঙড়ানো দরদের পরিচয় পাইয়া প্রেমের সদর্থটীকেও তো কিছুতেই ভুলিতে পারি নাই।

প্রেম সম্বন্ধে আমার বন্ধুর মত ঐরূপ সংশয়জর্জ্জরিত প্রশ্ন করিবার অনেক লোকই সংসারে আছে; হয়ত আমার ভ্রান্ত বেহুঁশ মনও তাহাদেরই একজন।

আমরা তো কত কথাই শুনি, কত কথাই বলি। প্রেম শব্দের প্রকৃত সদর্থ আত্মত্যাগীরাই জানেন। আমাদের মনেও তাঁহাদের ছায়া পড়ে। আমরা জোর করিয়া কখনই বলিতে পারি না—যতটুকু বলি, ততটুকু সত্যি কি না।

কিন্তু এক ফোঁটা প্রেমের সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন, নিজকে বিলাইয়া দিবার জন্য পাগল হইয়া বিশ্বে যাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।—আমাদের সংশয়বিমূঢ় মনেও যাঁহাদের প্রেমের স্পর্শ হয়ত বা না লাগিয়া থাকিতেছে না, সেই মহাপ্রাণ প্রাণের ঠাকুরদের মুখেও যখন প্রেমেরই জয়গান শুনি, তাঁহাদের জীবনের প্রতি শ্বাসে শ্বাসে পর্য্যন্ত আত্মত্যাগের প্রেরণাই উৎসারিত দেখিতে পাই, তখন তো আর সংশয় থাকে না। পুনশ্চ আমাদের এই সংসারের ঝঞ্ঝাটেও যখন দেখি, এক ফোঁটা প্রেমই হাসিমুখে সকল কাজের জঞ্জাল মাথায় তুলিয়া লইয়া পরকে সুখী করিবার জন্য নিজ সুখ ভুলিয়া ব্যস্ত হইতেছে; গোপনে বুকের মাঝে হাত দিয়া যখন দেখি—একমাত্র প্রেমের পিপাসাই এই জীবনের জীবন, একমাত্র প্রেমবৈচিত্ত্যই সুপ্ত আত্মশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছে, তখন তো আর এ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না যে প্রেমের কোন সদর্থ আছে কি না, প্রেম যথার্থতঃই সর্ব্বজয়ী কি না।

সুতরাং বলিব—প্রেমই সত্য, প্রেমই মীমাংসা। জগতের সমস্ত জ্বালা-জঞ্জাল-অপূর্ণতা-বিরহ-দুঃখাভিঘাতের অত্যাচার প্রেমের জাগরণেই প্রশান্ত হয়।

ঐ অমৃতস্পর্শ কখনো যদি হৃদয় মধ্যে পাইয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই বলিবে, আত্মত্যাগই জগতের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা;—ভাবিয়া দেখ, তোমার জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনার মর্ম্মে মর্ম্মে এ কথা সত্যি কি না?

—"আলোচক"

হিল্লোল

প্রভাতে আজ উঠে দেখি
সবার মুখে হাসি!
দুঃখ-দৈন্য নাই কাহারো
আনন্দলোক-বাসী!

নূতন কথা, নূতন ভাষা
শুনি সবার মুখে;
বিরহ আজ নাই কাহারো,
নাইকো ব্যথা বুকে!

অঢেল হাসির ফোয়ারা আজ
চল্‌ছে জগৎ বেয়ে;
শূন্যমনে কেউ যেন আজ
নাই কারু পথ চেয়ে!

—যে আনন্দ তোমার বুকে
তুল্‌ছে প্রেমের ঢেউ,
সবাই আজি পূর্ণ তাতে—
বঞ্চিত নয় কেউ!

শেষ চিঠি

—(*)—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

* * *

শিবরাত্রি

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিতাসু—

গরবিনী মায়েরা! তোমাদের ক্রমে দুইখানা স্নেহমাখা পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমরা বর্ত্তমানে আর বেশী পত্রাদি লিখিও না, আমিও বেশী লিখিব না; কারণ যতই বেশী পত্র লিখা হইবে, ততই তোমাদের ভিতর আমার স্মৃতি নূতন করিয়া জাগাইয়া দিবে।

তোমাদের চিন্তাস্রোত অলক্ষ্যে আসিয়া হৃদয়ে ধাক্কা দেয়, অজ্ঞাতসারে হঠাৎ আসিয়া মনে ভাসিয়া উঠে;—ইহাতেই বুঝিতেছি যে আমার বিষয় তোমরা বোধ হয় চিন্তা কর, তাই সেই চিন্তা এই সুদূর প্রদেশে আসিয়াও এই কঠোর হৃদয়ে আঘাত করে।

ইহা আমার পক্ষে ভাল নহে। কারণ আমাকে তোমরা যতই উচ্চ মনে কর, আমি তোমাদের অকৃতী সন্তান বই আর কিছুই নই। এবং বর্ত্তমানে আমার এটা সাধন-অবস্থা মাত্র। সুতরাং এই অবস্থায় চিত্তের প্রশান্তভাব ও সন্তুষ্ট এবং ভগবৎমুখে ঐকান্তিক গতিই একমাত্র প্রার্থনীয়। এই সাম্যভাবে বৈষম্য হওয়া মঙ্গল-জনক নহে। ভালবাসায় ভগবানের আসন টলিয়া যায়, তুমি-আমি ক্ষুদ্র জীবের ত কথাই নাই।

আমার স্মৃতি চাপা দিয়া রাখ। আমি জানি, স্মৃতি মুছিলেও যায় না; কারণ চিত্তে উহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে। তথাপি সব দিক বিচারে ভুলিতে চেষ্টা করিও।

আমি তোমাদের কিছুই করি নাই। যদি **কেহ কোন উপদেশ কিম্বা আনন্দ পাইয়া থাক, তাহা শ্রীগুরুদেবের;** আর যদি কেহ মনে কষ্ট পাইয়া থাক, তবে তাহা আমার।—কারণ আমি ক্ষুদ্র জীব, তাঁহার মনমত হইতে পারি নাই। ইহাই জীবত্ব।

এই জগতে সকলেই ভগবানের হাতের "কলের পুতুল"—যখন যেরূপ টিপ দিতেছেন, সেইরূপেই নাচিয়া উঠিতেছে।—অহংকারের কিছুই নাই; কিন্তু অহংকারী জীব তাহা না বুঝিয়া **'আমি-আমার'** জ্ঞানে বন্ধন আরও সুদৃঢ় করিতেছে। যতদিন **তুমি এবং তোমার** জ্ঞান না আসিবে, ততদিন জীবের মুক্তি নাই; জন্ম-মৃত্যু এবং যাতায়াতের শেষ নাই। ভগবান্ যন্ত্র, আমরা যন্ত্রী; তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" যখন যাহা দ্বারা যে কাজ করাইয়া আবশ্যক, ভগবান্ সেইরূপ দেশ-কাল-পাত্রের সংযোগ ঘটাইয়া আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লইতেছেন।

তোমাদের সহিত আমার সংযোগও এইরূপ। ভগবানের ইচ্ছায় তোমাদের কোন প্রাণের অভাব হয়ত আমার দেহ যন্ত্রের ভিতর দিয়া মিটাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহা আমার কিছু নহে—**তোমাদের প্রতি ভগবানের অপার করুণা মাত্র।**

সকলের ভিতরেই সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ বিরাজিত; মন-প্রাণ তাঁহারই শ্রীচরণে ঢালিয়া জীবনের গণা দিনকয়টা কাটাইতে চেষ্টা কর।

জীবের দেহ ত একটা আধার মাত্র। **আধারে কখনো মুগ্ধ হইও না—আধারীকে**

ধর, যিনি সর্ব্বাধারে সম ভাবে বিরাজিত। যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি হইতেছে, চরণে যাঁহাতে আবার লয় হইবে, সেই সচ্চিদানন্দময় নিত্য নিরঞ্জন শ্রীভগবানের ধ্যানে মন প্রাণ ঢালিয়া দাও। বাহিরের কোন জিনিষে মুগ্ধ হইও না। বাহিরের সবই অনিত্য এবং মায়িক; উহাতে আসক্তি বন্ধনের কারণ। সমস্ত ভুলিয়া যাও—শুধু হৃদয়ে তাঁহাকে জাগাও। **"আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি!"** এই গানের সার্থকতা কর। ইহা অপেক্ষা বড় কথা জগতে আর কি আছে? সুতরাং আমার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া সেই চিন্তামণির পদযুগল চিন্তায় নিমগ্ন হও।

তুমি আমার নিকটে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছ। আমি তোমাকে কি উপদেশ দিব? তুমি ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছ এবং তাঁহার চরণ ধ্যান ব্যতীত অন্ত কিছু জান না; ইহা অপেক্ষা উপদেশের আর কি আছে? তোমার যে এই ভাব আসিয়াছে, ইহাতে তুমি ধন্ত এবং তোমার বংশ ধন্ত, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণও ধন্ত হইয়া যাইবে।

সকলেই আপন আপন মৎলব মত ভগবান্‌কে চায়। নিষ্কাম ভাবে কয়জনে তাঁহাকে চায়? **যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসে অথচ কিছু চায় না, তাহাদের চেয়ে বড় কেহ নাই।** ভগবান্ তাহাদের নিকটই ঋণী। তাই "রাধার নিকট কৃষ্ণ ঋণী ছিলেন।" অহেতুকী ভালবাসাই জীবের একমাত্র সাধ্য ও আদর্শ। তুমি যে ভাব ধরিয়াছ, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব- ইহাতেই আত্মবলি দাও, নিজ অস্তিত্ব ভুলিয়া যাও।

স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভগ্ন করিয়া দাও—বিশ্বময় আমিকে ছড়াইয়া দাও। এ জগতের সমস্তই ভগবানের। সুতরাং আমি হিংসা-নিন্দা কাকে করিব? তাহা হইলে যে ভগবানেরই সাধের জীবকে হিংসা করা হইল। তাহাতে কি ভগবান্ কখনো সুখী হইতে পারিবেন? কখনো না।—**বিশ্বময় শত্রুমিত্র ভাল-মন্দ সকলকে ভালবাস—ভালবাসাই তোমার স্বভাব হইয়া যাউক।**

এই লীলার জগতে সকলই ভগবানের লীলা। লীলাময় সকলের ঘটে ঘটে নানারূপে লীলা করিতেছেন। তাই জ্ঞানীগণ ভগবান্‌কে বিশ্বময় দর্শন করিয়া বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া লীলানন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই জগতে ঘৃণার কোন বস্তু নাই —সবই আদরের!

সংসারে থাকা—ভগবানের সাধনা-দুর্গের মাঝে থাকিয়া যুদ্ধ করার মত। তবে "আমি—আমার" ছাড়িয়া "তুমি—তোমার" না করিলে বন্ধনের কারণ হইবে। সুতরাং এই সংসার ভগবানের, এই জ্ঞানে নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে সংসার করিলে ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা গুণক্ষয় হইয়া ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি হইবে।

মনটী সর্ব্বদাই ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিবে। অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ এরূপ করিতে পারিবে। তাহা হইলেই সংসার বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হইবে।

আর উপদেশের দরকার নাই। শুধু উপদেশ শুনিয়া কি হইবে? যাহা ধরিয়াছ, এবং যাহা লিখা হইল, এইটুকু পালন করিতে পারিলেই সব হইবে।

আমার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হইবে না।

* কেও এই শিক্ষা দিয়া তৈরী করিয়া লইবে। তোমাদের অন্তর-রাজ্যের রাজাকে লইয়া তোমরা আনন্দে থাক—ইহার অধিক কিছু চাহি না।

তবে আসি?

তোমাদের—* * *

—*:০:*—

আত্মৌপম্য

—:*:—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"—বিকারের হেতু বর্ত্তমান, কিন্তু তবুও যার মন অটল অচঞ্চল, তিনিই হলেন ধীর। মানব-জীবনের কঠোর পরীক্ষার মাঝে বল্‌তে গেলে এইটাই বোধ হয় চরম।

চোখ বুজে থাকা অসম্ভব—কিন্তু চোখ খুলে দেখার মাঝে অনেক রহস্য আছে। একই বস্তু এক একজনার কাছে এক একরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক, সাধারণতঃ আমরা সব কিছুকেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করি না। কাজেই লোভের বস্তু—লালসার বস্তু আমাদের কেবল প্রলুব্ধই করে। কিন্তু একটা কথা বলি, যে বস্তু দেখে আমাদের হয়ত সংযমের বাঁধন টুটে যায়, ঠিক সেই বস্তু দেখে একজন নির্ব্বিকার আনন্দে আত্মস্থ হয়ে থাক্‌তে পারেন। তা হলেই যারা নির্ব্বিকার—ধীর, তাঁরা ঠিক বস্তুপিণ্ড ছাড়াও আরও কিছু দেখেন। সম্মুখের আলেয়ার চেয়ে—অন্তরের আধ্যাত্মিক দীপ্তি তাঁদের বেশী। সুন্দরের আকর্ষণের চেয়ে সত্যের আকর্ষণই বড়!

বিকারের হেতু থাক্‌বেই। অথচ তোমাকে নির্ব্বিকার হতে হবে, কেননা বিকারের সংসারেই তো চল্‌তে হচ্ছে তোমায়। কাজেই চিন্তা করে দেখ, মূলেই তোমাকে সংযম কর্‌তে হবে, অন্তর্মুখী হতে হবে। বিকার তোমাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না দুটো অবস্থায়। এক যদি তুমি অন্ধ হয়ে একা একধারে গিয়ে কুণো হয়ে বসে থাক; কিম্বা আত্ম-শক্তিতে বিকারের বস্তুকে যদি রূপান্তরিত করে ফেল। কিন্তু আবার এ-ও বলি, জীবনভরা মানুষ কি এমন কুণো হয়েই থাক্‌তে পারে? তারপর এ জীবনে না হয় 'নন্‌কো-পারেশন্'ই চলল—কিন্তু পূর্ব্বের সংস্কার কি বিন্দুমাত্রও ক্রিয়া কর্‌বে না তোমার ওপর? তা হলেই বুঝা গেল—সংসারে চল্‌তে হলে সকলের সঙ্গে মিলে-মিশেই চল্‌তে হবে। ভাল-মন্দ, সু কু জগতে থাক্‌বেই, কিন্তু কাউকে অবজ্ঞা না করে—আত্ম-মহিমায় তোমাকে এ জগতে থেকেই সু-কু'র ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে হবে।

এ কথা ঠিক, ইন্দ্রিয় আমাদের অধীন, আমরা ইন্দ্রিয়ের অধীন নই। না বুঝে হয়ত—আমি যা চাই না, তাই এনে ইন্দ্রিয় আমার কাছে হাজির কর্‌ছে। কিন্তু যাদের নিয়ে আমার ঘরকন্না, তারা কি কোনদিনও বুঝ্‌তে পার্‌বে না—আমার অন্তর কি চায়? মন যুগিয়ে চলাই যদি অধীনস্থের কর্ত্তব্য হয়—তা হলে আজ যারা আমার বাধা, তারাই কি আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হবে না শেষে? শত্রু-মিত্র বলে জগতে ছাপমারা কেউ নাই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণার ওপরই সব নির্ভর করে।

নিছক্ মন্দ জগতে কেউ নয়—কাজেই ভালোর দিকটা উজ্জ্বল করে মন্দকে স্তিমিত করা খুব সহজ। যাদের স্থির ধীর-নির্ব্বিকার বলা হয়, তাঁরা মানুষের সেই উজ্জ্বল দিকটাই বড় করে দেখেন। সত্যকে প্রাণ দিয়ে সবাই ভালবাসে, আজ হয়ত যাকে আমি খারাপ বলে একটু নেক্-নজরে দেখ্‌ছি, কালে সে-ই যখন আত্মোপলব্ধির সন্ধান পাবে, তখন সে-ই আবার শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে পড়্‌বে। আমার কাছে একজন মন্দ কামনা কর্‌লেও আমি যদি তার অভীষ্ট পূরণ না করি, তা হলে সে যখন আত্মার মহিমায় নিজের মন্দ নিজেই ধর্‌তে পার্‌বে, কৃতজ্ঞতায় তখন সে আমার কাছে অবনত না হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে কি? শাশ্বত আত্মসত্যে অটল থাকাই হল সব চেয়ে বড় কথা!

জীবনের একটা দিক্ আছে, সে-দিক্‌টা চাঁদের অপরার্দ্ধের মতন, বাহ্যদৃষ্টিতে যেন বাস্তব-জীবনের তুলনায় স্তিমিত। কিন্তু বল্‌তে গেলে সে দিক্‌টাই আমাদের জীবনের আসল দিক। যাঁর জীবনে সেই অব্যক্ত সত্য একবার প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তিনি কি আর মায়ায় ভুল্‌তে পারেন?

ব্যক্ত আর কতটুকু? সবই অব্যক্ত। কাজেই আমরা বাস্তবজগতে যা দেখ্‌ছি—এই দেখাই চরম নয়। ব্যবহারিক জীবনে তুচ্ছ ঘটনাকেই আমরা বড় করে তুলি—কিন্তু গুহাহিত সত্যের কাছে তো এ সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ—নগণ্য!

"বিশ্বাস করে যদি ঠক্‌তেও হয়, তা-ও ভাল"—এ কথাটার একটা গূঢ় অর্থ আছে! সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের কথা—বাস্তব-জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা বড় দুষ্কর হয়ে পড়ে; কিন্তু তাঁরা সত্যানুভূতির অটল সিংহাসন হতে যে বাণী প্রচার করেন, তা কখনো মিথ্যা নয়। এক একজন মহাপুরুষের বাণী হয়ত কত যুগ-যুগান্তর পরে মানুষের প্রাণে উজ্জ্বল প্রেরণারূপে ফুটে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে কোন কিছু দিয়েই আবৃত করে রাখ্‌তে পারা যায় না। ভাল-মন্দ সবকে আমি সত্য-স্বরূপ বলে জান্‌ছি—হয়ত এ অনুভবের সঙ্গে বাস্তবক্ষেত্রে অনেক জায়গায় অসামঞ্জস্য হচ্ছে—কিন্তু চরমে তো এ বিরোধ থাকছে না।

বস্তুবিশেষের আকর্ষণ-শক্তি আছে মানি, কিন্তু আত্ম-শক্তির কাছে কোনটাই প্রবল নয়। নির্ব্বিকার যাঁরা, তাঁরা এই আত্ম-শক্তিরই সন্ধান পেয়েছেন। কাজেই কাউকেই অবজ্ঞা না করে, পরের সঙ্গে বিরোধ না ঘটিয়ে নিজের মাঝেই আমরা মুক্তির সন্ধান পেতে পারি!

মাখন জলে ডোবে না। আত্মাকে কোন বিকার স্পর্শও করতে পারে না—এ অনুভবে যিনি সিদ্ধ, তাঁর পক্ষে বিকারের জগতে থাক্‌তেও তো কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এও ঠিক, সাধনায় সিদ্ধ না হলে নিজকে বিকারের হাত হতে রক্ষা করাও সঙ্কট।

চিত্তকে উদার করা চাই, সরল করা চাই—কেউ যেন তোমার বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে। মন্দকে, কুৎসিৎকে তুমি মন্দভাবে না দেখ্‌লেই তো হল। এতে কি তোমার হার—না জিৎ? তুমি যাকে ভাল বলে বিশ্বাস কর, তোমার কল্যাণীয় বিশ্বাস প্রভাবে তার ভিতরেও ভাল হবার চেষ্টা জাগ্রত হবে। প্রত্যেককে স্বরূপ উপলব্ধির সাহায্য করাই কি সব চেয়ে বড় সাহায্য নয়?

সব সময় সকল দিক লক্ষ্য পড়ে না মানুষের। আজ যাতে মজে আছি, এক মুহূর্ত্তে সে আসক্তির নিরসন হতে পারে, এর চেয়ে বড় একটা তাৎপর্য্য যদি জীবনে পাই। আজ যে মন্দ সে-ই আবার ভাল—কাজেই মনুষ্যত্বের ওপর বিপুল বিশ্বাস দ্বারা মানুষকে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই তো সব চেয়ে বড় হিত!

বিশ্বাস কর না কর, কিছুতেই টল্‌বে না—এরূপ ভাব থাকা চাই। গভীর শ্রদ্ধা না থাক্‌লে, আত্মোপলব্ধির অক্ষয় কবচে নিজকে ঘিরে না রাখ্‌তে পার্‌লে—বাহিরের আঘাতে অনেক ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যিনি বিশ্বাসকে অটল রাখ্‌তে পেরেছেন, তিনিই জয়ী হয়েছেন।

অব্যক্ত-জীবনের সন্ধান যিনি পেয়েছেন, তাঁর প্রধান কর্ত্তব্যই হল, ইহতৎপর লোকদের আশ্বাস দেওয়া, ভরসা দেওয়া। মন্দ আর মানুষের কতটুকু?—তার মাঝে মহত্ত্বের ভাগই বেশী। তাই কোন এক শুভক্ষণে যদি মন্দের এতটুকু আবরণ খসে যায়—তখন দেখি, এই মানুষই দেবতা হয়ে যায়।

সত্যিকার জীবনটা চাপা পড়ে আছে—একবার তার উৎস খুলে গেলে কোথায় থাকে দৈন্য আর কোথায় থাকে অসম্পূর্ণতা! সবই পূর্ণ—সবই স্বচ্ছ! মানুষ কত অন্যায়, কত ত্রুটী করে, কিন্তু একবার সত্যের আলোক হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লে এত

টুকু স্মৃতিও তো আর আবিল করতে পারে না মনকে। কাজেই এই বাস্তবজীবনের ওপরও প্রত্যেকের একটা মহৎ-জীবন আছে!

আজ না বুঝুক, একদিন বুঝবে—মহৎ জীবনের আস্বাদন পেতে অন্তরে অন্তরে প্রতি আত্মাই ব্যাকুল। যত কিছু চঞ্চলতা অস্থিরতা, জীবনের সেই নিস্তরঙ্গ-স্তব্ধ দিকটা অনুভব হচ্ছে না বলেই। জীবনে মানুষ যত ভুল-ত্রুটী করে—সত্যের আলোকে এক নিমিষে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেতে পারে। মনুষ্যত্বের ওপর বিপুল বিশ্বাস থাকা চাই, তবেই মানুষ সহিষ্ণুশীল ধৈর্য্যযুক্ত হতে পারে।

এ জগতের সংস্কার যে অস্থি-মজ্জায় জড়িত, জগৎকে তো ভুলতে পারব না কিছুতেই। তবে সংস্কারের উন্নতি হতে পারে এই মাত্র। এই তো তত্ত্ব। আস্বাদনের অবশ্য অনেক তারতম্য আছে। ক্ষতি কি, তুমি না হয় ভালকেও ভালভাবে দেখলে—মন্দকেও ভালভাবে দেখলে!

শান্তি চায়, আনন্দ চায় সবাই। প্রত্যেককে বিকৃত করে ঘেঁটে দেখাতে তো কোন লাভ নাই—বরঞ্চ অশান্তিই বাড়ে তাতে।

থাক্ না, জগতে যে যেভাবে আছে—তোমার উদার দৃষ্টি দিয়ে তুমি সকলকে মহৎভাবে ভাব। চিত্তের সম্প্রসাদই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়ে থাকে তোমার, তা হলে তোমাকে এই ভাগবত দৃষ্টি অর্জ্জন করতে হবেই হবে।

সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎকে যে দরদ নিয়ে, যে উদার দৃষ্টি নিয়ে দেখেন, তুমি যদি তার এক কণাও পেয়ে থাক, তা হলে তোমার মাঝেও একটা সহজ সরল নিরপেক্ষ ভাব এসে পড়বে। মন্দকে দেখলে তখন আর নাসিকা কুঞ্চিত করতে হবে না তোমায়। তখন দেখবে, বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ না করেও তোমার নিরুপদ্রবেই দিন চল্‌ছে! বিকারের জগতে এসেও নির্বিকার থাকার সহজ একটা উপায়ই হল—সকলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা।

এ কথা ঠিক, ভগবান্ কাউকে নিছক্ মন্দ করে সৃষ্টি করেন নি—তির্য্যক্‌ভাবনা দ্বারা, অবজ্ঞার দৃষ্টি দ্বারা মানুষকে আমরাই অসরল কুটিল করে তুলি। মানুষকে উঁচুতেও তুলি ভাবনা দ্বারা, আবার নীচেও নামাই ভাবনা দ্বারা। কাজেই ভাবে গলদ না থাকলে এত ভয়ের এত আশঙ্কার জগতে তেমন কিছুই নাই।

নূতন কিছু করতে হবে না শুধু জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র প্রেরণাময় দিকটাকে উজ্জ্বল করে অনুভবের মাঝে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। যা কিছু দেখবে শুনবে, আত্মশক্তিদ্বারা, আত্মজ্যোতিঃদ্বারা সবকে রূপান্তরিত করে ফেলবে। তোমাকে যদি তুমি বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত দেখতে পাও—তাহলে বিকার হবে কাকে দেখে? নিজকে নিজে ভালবাসব, এর মাঝে মোহই বা কি, আশঙ্কাই বা কি? সবই সুন্দর—সবই মঙ্গল!

ভাল-মন্দ, সু কু সবের মাঝে নিজকে অনুস্যূত দেখলেই অবজ্ঞার ভাব আস্‌তে পারে না। সরতে হবে না—এ জগতে থেকেই বেদান্তের ভাবনা দ্বারা সব জঞ্জাল থেকে অনায়াসে মুক্তি পেতে পার তুমি! ইচ্ছা করে কেউ বাদ সাধতে আসে না—তুমি যেমন ভাব পোষণ কর, প্রতিদানে তেমনি ভাব পাও!

বিক্ষেপ কিম্বা বিকার জগতে থাকবেই; কিন্তু এর মাঝে থেকেও তুমি নির্বিকার আনন্দের আস্বাদন পেতে পার। তবে কিনা প্রতিকারের উপায়টা ভিতরে—বাহিরে নয়। চিত্তকে নির্ম্মল এবং প্রসন্ন রাখতে হবে—এই হল আসল কথা।

সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ভাবনা করতে আরম্ভ কর।

হয়ত তোমার মাঝে বিকার নাই, অথচ আশে-পাশে যারা আছে, তাদের মন বিকারে পরিপূর্ণ—

তাহলে তুমি কি দেশ ছেড়ে পালাবে? সে ক্ষেত্রে কি করতে হবে তোমায়?—যে যেমন ভাবনা করে, তোমাকে ভাব্তে হবে তার উল্টো কায়দায়।

এমনি করে সুখে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, পুণ্যে মুদিতা, পাপে উপেক্ষার ভাব পোষণ করতে হবে।

তাহলেই শেষ পর্য্যন্ত এ-ই এসে দাঁড়ায়, তুমি যদি ভাল হতে চাও, কোন প্রতিবন্ধকই তোমায় আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। আর বাহিরের পারিপার্শ্বিকও যদি ভাল থাকে, তাহলে তো তোমার কপাল খুবই ভাল।

নিজকে নিয়েই সমস্যা, আবার নিজের মাঝেই সমাধান। জগতে শত্রুও আছে, মিত্রও আছে। একদিকে যেমন মানুষকে অশুভ শক্তি বিপথে চালিত করে, তেমনি শুভ-শক্তি আবার উন্নত পথেও নিয়ে যায়।—কাজেই বিকারের জগতে নির্ব্বিকার থাকা-টাও একেবারে অসম্ভব কিছু নয়!

যে দিকে শক্তির চর্চ্চা কর, সে-দিকেই শক্তি বৃদ্ধি হবে। এ জগতে থেকেই দানবও সাজ্তে পার, আবার দেবতাও সাজ্তে পার! তোমার ভাল-মন্দ সম্পূর্ণ তোমার ওপরই নির্ভর করে।

সকলকে নিয়ে উঠাতেই তো জীবনের যথার্থ সার্থকতা। আর তোমার ভিতর সত্যিকার শক্তি অর্জ্জিত হয়েছে তখনই—যখন দেখ্তে পাব, অপ-রের মাঝেও তোমার মহত্বের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়্ছে! বিধাতার সৃষ্টি সৌন্দর্য্যে, সুষমায় পরিপূর্ণ—একে বিকৃত করে দেখ্লে তোমারই ক্ষতি। এ কথা জেনে রেখো, নিরর্থক জগতে কেউ নয়। অন্তর্দৃষ্টি যাদের খুলে গিয়েছে—তাঁরাই মহৎ—তাঁরাই নির্ব্বি-কার, তাঁরাই সর্ব্বত্র আত্মদর্শী।

সুবাতাস

—(*)—

শুন্তে পাই—"চারিদিকে নাকি সুবাতাস বইছে! এই ঠেলায় যা হবার হয়ে যাবে। তার-পর আবার—"

সত্যি, সুবাতাস বইছেই বটে। কত কলুষ কত ফাঁকি মনের গোপনে লুকিয়ে ছিল, সবি বিলকুল উজাড়—এক রুদ্র ঝঞ্ঝার সব ওলটপালট করে দিয়ে গিয়েছে! উপরন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ঐক্য দেখা যাচ্ছে, এইটাকেই তো সর্ব্বোত্তম সুখের অগ্রদূত বল্তে আমার ইচ্ছা হয়! আমরা এক না হলে আনন্দ পাব কেন?

সে কেমন এক?—সবাই মিলে এক, আবার যার যার নিজের জীবনেও এক—স্বপ্রতিষ্ঠ; এ নইলে খাঁটী ঐক্য হয় কি? অন্তরে বাহিরে আজ একেরই বিজয়দুন্দুভি বাজ্ছে। সাম্য জেগেছে, ঐক্য কি আর আস্বে না? শক্তিরই বা দেরী কিসের?

জীবনের অবান্তর লক্ষ্য বিচিত্র হলই বা! তোমার আমার প্রাণের ঠাকুর যে এক বই দুই নন! তাঁর মুখের পানে চেয়ে তাঁর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে আম-রাও যে সবাই একই ধনের মালিক তাই! তাঁর

প্রতি প্রাণঢালা প্রেমই যে আমাদের মাঝে সাম্য এনে দিয়েছে!

প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে—পরস্পরের মুখোজ্জ্বল করা—কে কাকে কেমন করে সুখে রাখ্‌তে পার! আর তো একা খেয়ে সুখ নাই ভাই! প্রাণে প্রাণে সুবাতাস বইছে যে!—ঘুমন্ত মনের গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগেনি কি? সবার মুখে সবাই হাসি ফোটাতে পার্‌লে হাসির আলোতেই তাঁর সংসারের প্রয়োজন বুঝে প্রাণেও গরজ জাগাতে পার্‌ব। জোর করে ঠেলে-গুঁতিয়ে মন বোঝাতে হবে কেন? আমাদের হৃদয়ে আর ঠাকুরের হৃদয়ে আমরাই আমাদের আনাগোনার সেতু।

জীবনটাকে এমনি করে সবার সঙ্গে ভাব কর্‌বার জন্য বিসর্জন দিতে না পার্‌লে বাঁচা সার্থক হয় না। আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর রসে সদা উদ্বেল হয়ে থাকে। আমাদের ভিতর দিয়ে আমাদের ঠাকুরকেই যেন সবাই পায়। কাজকর্ম্মের সংসার আপন তালে আপনি চলুক;—প্রাণে প্রাণে ঠাকুরময় হয়ে থাকা—এই তো চাই।

তারপর ঘরকন্নার সমস্যাতেও কি তাঁকে আমরা পাই না? প্রতি সমস্যায় আগেই আমার মনে হয়, আমার ঠাকুর এস্থলে কি কর্‌তেন? মন তো তাঁর ছবি সবি ধরে রেখেছে; অকপট প্রশ্নের একাগ্রতায় মন থেকেই বেরিয়ে আসে—তাঁর ভাব, তাঁর আদর্শ—সে এমন মনোমোহন অথচ এমন প্রবল প্রতাপান্বিত অব্যর্থ কাজ করে, যার কাছে জগতের যত দর্পী মনের আড়ম্বর অকিঞ্চিৎকর হয়ে যেতে বাধ্য!—সমস্ত সমস্যাজনিত অবসাদ ধূলো-পড়া সাপের মত মাথা নীচু করে থেকে তাঁর বিধানকে তাঁর নির্দ্দেশকে পথ ছেড়ে দিতে রাজী! যেদিন আমি তাঁকে ভাবি, সে দিন যে চল্‌তে-ফির্‌তে তুচ্ছ কাজে পর্য্যন্ত তাঁরই ইঙ্গিত পাই।

অবিশ্বাস, অজ্ঞান এই দুটাই যত সুখের প্রধান বাধা। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যখন তর্কে খুঁজে বেড়াবার বস্তু হয়, তখনি তাঁকে হারাই। বুদ্ধিকে স্তব্ধ করেও তিনি আছেন—তাঁর ইচ্ছা কত নিঃশব্দ-চরণে জীবনের কলরবের মাঝেও আপন কাজ সেরে চলেছে। এক অসংলক্ষ্যক্রম অলৌকিক কৌশলে জীবনের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিক্ষেপও তাঁর কলিনাশন দৃষ্টিতে আবিষ্ট হয়ে আছে; নিমিষে সকল কুহেলি কেটে যাবে—যদি আমরা একটীবার কায়মনঃপ্রাণে ফিরে দাঁড়াই।

ভুলে যাই, দেখেও দেখি না—অর্থাৎ অভিমান জেগে ওঠে বলেই আমরা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হই; সুবাতাস মলিন মনের ফাঁকাতে দিশে হারায়—আমরা ধরে রাখ্‌তে পারি কই?

আমরা উদার, আমরা মহৎ। কারু জীবন হতে বিচ্ছিন্ন জীবন নিয়ে আমরা থাকৃতে পার্‌ব না! সকল রকম বাধা-বৈচিত্র্য আমাদের জীবনে আস্‌বেই, আপন মহিমায় সে সকলকে স্বীকার করেও তাঁকে নিয়ে থাক্‌ব আমরা—এই তো ঔদার্য্য, এই তো ব্রহ্মবীর্য্য!

প্রাণের আগুন জ্বলে উঠেছে—আর তো তাঁকে লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব না—মত্ত ঝঞ্ঝার মত দেশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব—তারপর সবাই চরণচ্ছায়ায় একত্র হয়ে শান্ত হব! তখন আমরা সবার মাঝে, তিনি আমাদের মাঝে!—এই অমৃতহিল্লোলই আজ প্রাণের প্রাণে বইছে!.........

বসন্ত-সমাগমে

—):•:(—

বসন্তের অনাহুত প্রেমের উন্মত্ত সৌন্দর্য্যে আজ সকলেই পাগল, কিন্তু আমার জানি কেন মনে হচ্ছে, অজস্র সৌন্দর্য্যের সমারোহ যিনি ঘটিয়েছেন, তিনি না জানি কি এক প্রশান্ত স্তব্ধ অনুভূতিতে নীরব। বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে শিরায় উপশিরায় তীব্র উদ্দীপিত সুখানুভূতির ঢেউ বয়ে চল্‌ছে—কিন্তু এত প্রাচুর্য্য, এত সৌন্দর্য্যের মাঝেও যেন বিরহের আতপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছে না। সৌন্দর্য্যের নেশায় মোহিত হয়ে পড়্‌ছি বটে, কিন্তু প্রাণের হাহাকার যেমন তেমনই থেকে যাচ্ছে। নিয়ম নাই, বন্ধন নাই, অকস্মাৎ আজ বসন্তের যে অদৃশ্য মোহিনী-শক্তি সকলকে বিচলিত করে তুল্‌ছে, তাকে স্বীকার কর্‌ছি—কিন্তু এ যেন কেবল উগ্র আনন্দের আস্বাদনই মাত্র—এতে ঝাঁজ আছে, কিন্তু মন-প্রাণ চরিতার্থ হচ্ছে না। আকস্মিক সৌন্দর্য্যের বিপুল আয়োজনকে যেন আজ অন্তর বিশ্বাস করতে চাইছে না—সত্যিই এ যেন ঝঞ্ঝারই মত অকস্মাৎ প্রাচুর্য্যের সাময়িক প্লাবন মাত্র। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সদৃশ পলাশ বন, শুক পাখীর চঞ্চুর ন্যায় বক্র কিংশুক, মাঝে মাঝে কোকিলের কুহুরব—মনোমুগ্ধকর কত দৃশ্য কত সঙ্গীতের সুরই না মন-প্রাণকে উতলা করে তুলেছিল—কিন্তু কই এতেও তো প্রাণের অনির্ব্বাণ আকুলতার পিপাসা মিটল না! তাহলে এ অন্ধ সৌন্দর্য্য সম্ভোগে আমাদের লাভ? এ সৌন্দর্য্য যাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে, অন্তর আজ তারি তরে ব্যাকুল। ওগো! আমি আজ সৌন্দর্য্য চাই না—সত্যকে চাই!

সৌন্দর্য্য-মোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি আমি দেখ্‌তে চাই। উপভোগ করবার বাসনা নাই আমার—আমি শ্রদ্ধা কর্‌তে চাই, ভক্তি কর্‌তে চাই। বিশ্বের সৌন্দর্য্য আজ স্নেহময়ী জননীর ন্যায় নিঃস্বার্থ প্রেমে আমাদের পবিত্র করে তুলুক, তার মাঝে যেন মোহ না থাকে—ছলনা না থাকে! সে সৌন্দর্য্য আমাদের বিচলিত করে, স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তার অন্তর্নিগূঢ় সত্যের সহিত মিলন চাই—সে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নয়। যাকে কেন্দ্রস্থলে রেখে বিশ্বের সৌন্দর্য্য—আমি সেই কেন্দ্রস্থিত সৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপ আদিত্যবর্ণ পুরুষের সাক্ষাৎ চাই।

সৌন্দর্য্যের দরুণ তপস্যা কর্‌তে হয়। তপস্যাতেই খাঁটী রূপ ফুটে ওঠে। ভিতরের সৌন্দর্য্যেই আত্মারাম তুষ্ট। পার্ব্বতী যৌবনের চঞ্চল সৌন্দর্য্য দিয়ে মহাদেবকে ভুলাতে পার্‌লেন না। তাই বাইরের সৌন্দর্য্যকে ও রূপকে, "নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী"—পার্ব্বতী মনে মনে নিন্দা কর্‌লেন। তারপর পার্ব্বতী রূপকে সফল কর্‌লেন কি দিয়ে—

> ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
> সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

—তপস্যার দ্বারা, সমাধির দ্বারা সে রূপকে সফল কর্‌লেন। এই আত্মসংবৃত প্রেম, সৌন্দর্য্যই তো আসল—এতে তো বাহিরের সজ্জার কোন প্রয়োজন হয় না। এ সৌন্দর্য্যে মনকে স্থির করে—চঞ্চল করে না। আজ যদি বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখে তোমার মন টলে গিয়ে থাকে—তাহলে নিশ্চয়ই সে সৌন্দর্য্য সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করে নি। সৌন্দর্য্যকে ফুটিয়ে তুল্‌তেও

তপস্যার প্রয়োজন, আবার সে সৌন্দর্য্য যিনি উপভোগ করবেন, তাঁরও শ্মশানবাসী চির তপস্বী ভোলানাথের মত হওয়া প্রয়োজন। কামনাকে পুড়ে ছাই ভস্ম করে তিনি সর্ব্ব অঙ্গে তা মেখে বসে আছেন—আর ভিতরের সৌন্দর্য্যের অটল মহিমায় স্তব্ধ তিনি। আজ যে ভোলানাথের চরণেই আমার মন-প্রাণ লুটিয়ে পড়ছে। আমি আবিষ্ট হতে চাই না—মুগ্ধ হতে চাই না—আমি চাই সৌন্দর্য্যে পবিত্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে!

সৌন্দর্য্য দর্শনে চিত্তে সমাধি আসবে—চঞ্চলতা তো মনে স্থানই পাবে না। আচ্ছা, ঠিক করে বল তো দেখি—বসন্তের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখে তোমার ভিতরে কোনরূপ কামনা জেগেছে কিনা! কামনা মাত্রই তো অশান্তির বীজ—তাতে যে মনকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে। সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার তো শক্তিও চাই। আর শক্তি আয়ত্ত করতে হলেই তোমাকে সংযম করতে হবে। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দর্শনে উদ্ভাসমান যে পুলক, তাকে বিশ্বাস করো না—নব যৌবনে কল্পনাতে কত স্বপ্নই না দেখা যায়—সবকেই নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করে কি কেবল ঠকবেই তুমি!

আম্র-মুকুলের সুমধুর গন্ধে, ভ্রমরের শ্রুতিমধুর গুঞ্জনে, কোকিলের কুহু-রবে কেবল কি পঞ্চশরে বিদ্ধ হওয়ার চেয়ে আর কোন সার্থকতা নাই? বিধাতার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্যই কি আমাদের কেবল কামনা-বাণে বিদ্ধ করা? সৌন্দর্য্যের মাঝে আর কোন পবিত্র মঙ্গল প্রেরণা নাই? বসন্তের আর বিশেষ কোন সার্থকতা নাই? মানুষকে উগ্র কামনায় উন্মথিত করে তোলাই কি বসন্ত ঋতুর একমাত্র অমঙ্গল কামনা? সৌন্দর্য্য দেখে তো মানুষ স্তব্ধও হয়ে যেতে পারে!

কামনার নির্ব্বাণ হয় যাকে পেলে, আমার মনে হয়, সৌন্দর্য্যের মাঝেও তিনি আত্মগোপন করে স্তব্ধ হয়ে আছেন। তাঁকে পেলে বাইরের রূপের বাহারে আর মন টলে না। কামনার লোলুপ দৃষ্টিতে অন্ধ হয়ে থাকলে তো তাঁকে দেখা যাবে না। শান্ত শুদ্ধ শিবস্বরূপ আত্মাকে পেতে হলে, তপস্যা দ্বারা, সাধনা দ্বারা বাইরের উচ্ছ্বসিত যৌবনকে পরাস্ত করে, অন্তরকে স্বচ্ছ শুভ্র আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নিমগ্ন করে রাখতে হবে!

সবাই বলে—কোকিলের ডাকে, ফুলের গন্ধে, মৃদু-মন্দ বায়ুর স্পর্শে—কেবল নাকি বিরহই জেগে ওঠে। আমি বলি, এ বিরহ কার দরুণ? আর কেনই বা জাগছে! কামনার ইন্ধন যে জোগাবে, সেই কি তোমার প্রিয় জন? এর চেয়ে বড়-প্রিয় আর কেউ নেই? সৌন্দর্য্যকে ভালবাস, কিন্তু মোহিত হয়ে পড়ো না। সৌন্দর্য্যের বিকাশ হল কোথা থেকে—এর মূলতত্ত্বও তোমাকেই আবিষ্কার করতে হবে!

আবার বলি, পূর্ণ যৌবনের বেদনায় অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়েও কিন্তু তাঁকে তুষ্ট করতে পারলেন না। অতপস্বী যৌবনের মোহিনী মায়ায় শিব ভুললেন না। আমাদের অন্তরেও শিবস্বরূপ আত্মা বিরাজমান। তাকে কামনার উপহার দিয়ে কোন দিন তুষ্ট করতে পারবে না কিন্তু! কাজেই সৌন্দর্য্য উপভোগ কর ক্ষতি নাই—কিন্তু তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয় শোধন চাই! রূপ দেখে যখন কামনা-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে না—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তর্পণ হবে তখন!

কৈ, বসন্তের অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য তো তোমায় প্রশান্ত করছে না? তোমার মুখে তো সেই দিব্য-জ্যোতিঃ দেখা যাচ্ছে না। "তোমার শরীর কৃশ, মুখ পাণ্ডু বর্ণ, মুহুর্মুহুঃ শ্বাস উঠছে"—এ কি পবিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগের লক্ষণ? বুঝেছি—পাওনি, এখনও সেই সুন্দরের সঙ্গে মিলন

হয়নি তোমার! যাকে আঁকড়িয়ে ধরছ, তার মাঝেই মজে গিয়েছ তুমি। একবার নয়ন উন্মিলিত কর, আসল সৌন্দর্য্যের রাজ্যে যে এখনো এসে পৌঁছনি তুমি। এখনও আসল প্রেম আস্বাদন করনি! গোপী-প্রেমই যে আদর্শ তোমার!

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রিয়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥

কামের উদ্রেক হবে না, প্রেমে কামের সাম্য হবে! তাই তো বল্‌ছিলাম, সৌন্দর্য্য দেখে স্তব্ধ হয়ে যাবে—কামনার অস্ফুট আর্ত্তনাদ তো থাক্‌বেই না তোমার মাঝে।

শৈলসুতা গৌরী কৃচ্ছ্র তপস্যা দ্বারা যে লাবণ্য লাভ করেছিলেন—তার সঙ্গে তো মদনবাণে জর্জ্জর কামনার প্রতিমূর্ত্তির তুলনাই হতে পারে না। এ পবিত্র সৌন্দর্য্যে মদনের মোহ নাই,—মহাদেবের মন হরণ করার উগ্র কামনা নাই, আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি পূর্ণ। তপস্যার পর পার্ব্বতী যে সৌন্দর্য্য লাভ করলেন—তার মাঝে যৌবনের গর্ব্ব ছিল না—রূপ দেখিয়ে মন হরণ করার স্পর্দ্ধা ছিল না—আপনার পরিপূর্ণতায় তা আপনি অক্ষুব্ধ ছিল।

বসন্তকালে অজস্র সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হয় বটে, কিন্তু এ সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তে হলে বিবশ ভোগী সাজ্‌লে চল্‌বে না—আত্মবশ তপস্বী হতে হবে।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্‌ তামন্ববিন্দন্‌ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্‌॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা ৩।৬।২

দেশের ও দশের কিছু করার চেয়ে নিজের জন্ম কিছু করাই হল—সব চেয়ে বড় কিছু করা। মানুষ যদি নিজকে না পায়, পরকে সে দেবে কি?

* * *

নিজকে নীরবে দান করার চেয়ে বড় তপস্যা আর নাই। সকল সিদ্ধি এতেই হয়। এ যেন ঠিক টেলিগ্রামের যন্ত্রের মতই। যেমন সহস্র সহস্র মাইল দূর থেকে ঘা দিলেও ঠিক একই সময়ের মধ্যেই সবগুলিতে শব্দ হয়, এ-ও ঠিক তেমনি। তুমি নীরবেই আত্মদান কর, উৎসর্গের বেদনা ঠিক সময়ে ঈপ্সিত আত্মাকে স্পর্শ করবেই। আত্মদানের তপস্যা যেখানেই সিদ্ধ হউক না কেন, সেইখানেই স্বর্গের পারিজাতকে ফুটতে হবেই। আত্মোৎসর্গ ধর্ম্মের প্রাণ, ভক্তির মূল, প্রেমের সমাধি।

মাধুর্য্য প্রেমের রূপান্তর মাত্র—শুদ্ধ-প্রেম বিচ্ছেদ ভিন্ন অনুভূত হয় না।

* * *

যিনি স্বয়ং লীলাময়, তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না। তবু মানুষ চেষ্টা করে; সেও যে লীলাময়!

* * *

সময়ের ঘড়ি বাজাতে হয় ও দম দিতে হয়। হৃদয়ের ঘড়ি আপনি বাজে; নিয়ম-নিষ্ঠা উহার চাবি।

* * *

ঋষি আত্মনিষ্ঠ, ইহা তাঁহার প্রচ্যুতি। সঞ্চার স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

২২শ বর্ষ
২য় খণ্ড
চৈত্র—১৩৩৬
সমষ্টি সং ২৪০
ষষ্ঠ সংখ্যা

দোল

—(*)—

রসিক ভক্ত বলিতেছেন—দোল আনন্দের লীলা। বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—এই দোলা আনন্দের না বেদনার, জীবনের না মরণের! দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে, আবার উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে নীলাকাশে আদিত্যরূপী বিষ্ণুর দোললীলা—তাহাতেই এই ধরিত্রীর বুকে ষড়্ঋতুর আবর্ত্তন—ইহার মাঝে বসন্তের পুলক শিহরণ আছে, গ্রীষ্মের তপস্যা আছে, বর্ষার অশ্রুজল আছে, শরতের নীলস্নিগ্ধ করুণা আছে, হেমন্তের নিটোল পূর্ণতা আছে, শীতের সমাধি আছে। এই বিচিত্রের মূলে ওই দোলা দক্ষিণ হইতে বামে, পিঙ্গলা হইতে ইড়ায়, মরণ হইতে জীবনে; কোথায় মধ্যপথ—সম্যক্‌সম্বুদ্ধের আবিষ্কৃত মজ্‌ঝিম-পটি-পদা, যোগীর সুষুম্নামার্গ, বৈদিক ঋষির অমৃত পথ, বাঙ্গালী তান্ত্রিকের সহজ-যান! সব জড়াইয়া ইহাকে আনন্দ বলিব কি?

এই দোলা—ইহাকে আনন্দ বলিতে হয় বল, কিন্তু সাবধান হইয়া এই আনন্দের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিও। মনে করিও, তুমি শিবের মত সবটুকু নিয়াছ—তোমার জটাজালে চন্দ্রের অমৃতকলা, কিন্তু নীলকণ্ঠে গরলের জ্বালা। সে জ্বালা

কোনও কিছুর রূপান্তর নয়; অমৃত যেমন স্বরূপেই অমৃত, তেমনি এই গরল স্বরূপেই গরল। যদি অমৃত-গরলে সমান প্রীতি থাকে তো বলি, এসো রসিক, জীবন-মরণের আনন্দ-দোলায় দুলিতে থাক!

দোলে—দোলে—দেহ দোলে, প্রাণ দোলে, মন দোলে—এই বিশ্বসংসারটাই দোলে! নির্ব্বোধ বুদ্ধির মহাজন, তুমি এই দোলার মাঝে ধ্রুববিন্দুর নিশানা করিবে বলিয়া সহজদৃষ্টির সাম্‌নে দর্শনের পরকলা লাগাইতেছ? জাঁক করিয়া বলিতেছ, এই দোলাই মায়া—মিথ্যা, তুচ্ছ; সত্য সেই অবিচল কীলক? মূঢ়, জান না সত্যের চরম বিচারে মিথ্যাও সত্য হইয়া দেখা দেয়, তুচ্ছের মর্য্যাদা সকলকে ছাপাইয়া ওঠে; হয়ত বা মনে হয়, তোমার বুদ্ধির আবিষ্কৃত অবিচল কীলকটাই মায়া! জন্মমৃত্যুর দোলা হইতে মুক্তি পাইবে বলিয়া ওই কীলকের সন্ধানে ফিরিতেছ? যদি দেখ, তোমার সাধের কীলক হইতেই দোলায় গতিবেগ সঞ্চারিত হইতেছে—তাই কি ওই কীলকটাই অনন্ত গতিতে স্পন্দিত!

কে মায়া, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—দোলাই মায়া, না ধ্রুব কীলকই মায়া, না যে অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধি ওই দোলাতে আর কীলকে ভেদের ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিতেছে, সেই মায়া! একবার বলি সমস্ত সংসার মুছিয়া যাক্, সহজ সরল দৃষ্টিতে একবার জগতের পানে তাকাইয়া দেখি—বন্ধন মুক্তির বালাই মিথ্যা, সত্য-মিথ্যার বিচার মিথ্যা, জীবন-মরণের প্রহেলিকা মিথ্যা। যাহা হইবার তাহাই হইতেছে না, অনন্ত দোলায় সবাই দুলিতেছে, কালের কোথায়ও আদি নাই, কোথায়ও অন্ত নাই—বর্ত্তমানে সচকিত ক্ষণ-বিন্দুর পরম্পরাই সৃষ্টির রস। কোথায় ধ্রুবের সন্ধানে হাৎড়াইয়া বেড়াইতেছ, অন্ধ! এই যে চিরচঞ্চলা মায়াবিনীই ধ্রুবসত্তারূপিণী—স্থাবর আর জঙ্গম এক সত্য, এক কথা। জন্মান্তরের আবর্ত্তন একটা বিভীষিকা? কে বলিল? ওই তো আনন্দ-দোলার অন্তহীন গতিভঙ্গ! চৌরাশী লক্ষ জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মভারে কই আমার এই বর্ত্তমানের আনন্দটুকুকে তো পিষিয়া মারিতে পারিল না! অতীত যদি বিভীষিকা হইয়া থাকে তো তাহাকে বিস্মৃতির অতলজলে তলাইয়া দিবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে; তবে আর দুঃখ কোথায়? যদিই বা অনন্ত অতীতজন্মপরম্পরার স্মৃতি আজ আলোড়িত হইয়া উঠিত, দেখিতাম আমিই একা এই চক্রে বাঁধা নই, অনন্ত বিচিত্র জীবজগৎ প্রাণের প্রেরণায় আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, কোথায় নিঃসঙ্গ হাহাকারের বিভীষিকা? সবাই দোলে যে—অসীমের দোলমঞ্চে ওই যে জীবন দোলে, সুখ দোলে, দুঃখ দোলে!

আছে আছে—এই দৃষ্টি তোমার আমার অন্তস্তলে লুকাইয়া রহিয়াছে। চিরকাল রহিয়াছে, অমন ফাঁকি কথা বলিব না। বলি, কখনো সে দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে আবার কখনো নিবিয়া যায়—কখনো আলোক, কখনো আঁধার। যখন ওই প্রজ্ঞাচক্ষু ফোটে, আনন্দের আর কূলকিনারা থাকে না, মনে হয়, জগৎটাকে বুকে জড়াইয়া ধরি—আমার শক্তি জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে বজ্রনির্ঘোষে পরম সত্যকে ঘোষণা করুক। মনে হয়, এই আনন্দের অভিব্যক্তিই বুঝি চিরন্তনী! কিন্তু মিথ্যা আশা!—অধ্রুবের মাঝে ধ্রুবের সন্ধান বুদ্ধির কল্পিত একটা মরীচিকা মাত্র। পরমুহূর্ত্তেই দেখিব, আনন্দকে আবৃত করিয়াছে অপরিসীম বেদনা—আর্ত্ত জগতের দুঃখ-কলরবের প্রতিধ্বনিতে প্রাণ বিকল। জ্যোতিষ্মান্ সবিতা হইয়াও আমি এই কুয়াশাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছি না। এ কি ভয়ঙ্কর সত্য!—আমার সৃষ্ট মায়ায় আমি মুগ্ধ, আমার বুক হইতে কুজ্ঝটিকা জাগিয়া আমাকে আবৃত করিয়াছে, আমার শক্তির কাছে আমিই পরাস্ত! অন্তহীন আলোক আর

অন্তহীন অন্ধকার—দুই ই সত্য, সমজাগ্রৎ চিরন্তন সত্য। এই আলো-আঁধারে দোল খাওয়া, এই তো নিয়তি। সে নিয়তিকে ভয় করিয়া যদি ধ্রুববিন্দুর সাক্ষাতে ছুটিয়া যাও, বলিব—মূঢ়, মায়ার ফাঁদ হইতে বাঁচিবে মনে করিয়াছ ? ওই যে ধ্রুবকে লক্ষ্য করিয়াই অধ্রুবের লাস্যলীলা সুরু হইল, মায়াকে এড়াইতে গিয়াই মায়ার ফাঁদে পড়িয়া গেলে ! সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া একি পরম সত্যের রসায়ন ! বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যাক্; অথবা আপন খেয়ালমতে সত্য-মিথ্যার জাল বুনিয়া যাক্। বুঝিতে পারিতেছি না—আজ কাহাকে অভিনন্দন করিব। সংশয়ে, প্রতীতিতে, আনন্দে, বেদনায় চিত্ত দুলিতেছে—দুলুক্, দুলুক্ ! জয়যুক্ত হোক্ এই অন্তহীন দোললীলা।

মুক্তি-পিপাসী মন মিথ্যা কলরব করিয়া মরিতেছে—এইখানে শেষ, এইখানে শেষ ! কোথায়ও অশেষের শেষ নাই। অনন্ত বন্ধনই মুক্তির স্বরূপ ; আর মুক্তির পিপাসায় ছটফট্ করাটাই বন্ধনের নিদর্শন ! জ্ঞানী রসিক তাই মুচকি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "অয়মেব হি তে বন্ধো যৎ সমাধিমনুতিষ্ঠসি" —এই যে চিত্তকে সমাহিত করিবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছ—এইটাই তোমার বন্ধন। বাস্তবিক শেষ কোথায়ও নাই, কোনও সাধনেই শেষ খবর দেয় না। শেষের খবর পাইয়াছি বলিয়া মনকে ভুলাই, ওই একটা নেশা। নেশা নেশাই, তার আবার ভাল মন্দ কি ? ভাল মন্দের বিচার করি নিজের মৎলব অনুযায়ী—ওই তো বুদ্ধির আর এক নেশা। এমনি করিয়া ভুল দিয়া ভুল ঠেকাইয়াই জগতের কারবার চলিতেছে। যে দেখে, সে হাসিয়া মরে। আবার তার দেখাটাও চিরন্তন নয়। তাহার চক্ষু সহসা অন্ধ হইয়া যায়, আলোকের স্মৃতির বেদনায় তখন সে কাঁদিয়া মরে। সব ফাঁকির চরম ফাঁকি,—জ্ঞান আসিয়া অজ্ঞান বিনাশ করে ; খুব ভরসার কথা বটে। মানুষ মনে করে, এই বুঝি একটা কিছু পাইলাম ; কিন্তু দেখে না—ওই জ্ঞানের আলোর পেছনে কল টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছে অজ্ঞানের আঁধার—ওই বুঝি ফুৎকারে তোমার প্রদীপ নিভিয়া যায় ! কিছু সত্য নয়, কিছু মিথ্যা নয়—আলোকে আঁধারে শুধু দোল—দোদুল দোল !

এই আবর্ত্তনের মাঝে জাগিয়া ওঠে আত্মশক্তির স্পর্দ্ধা। কৈবল্যবাদী তাল ঠুকিয়া দাঁড়ায়। বলে, প্রকৃতি, তফাৎ ! তোমার আমার মাঝে এই বিবেকের বেড়া ; সাবধান, আমার কাছে ঘেঁষিও না—আমি স্বরাট্, আমি কেবল, আমি চৈতন্য-লীলার পরাকাষ্ঠা। আঁধারেও আমি আছি, আলোতেও আমি আছি—অতএব আমিই সত্য। আলো আঁধারের কোল হইতে ছিনাইয়া আনিয়া নির্ব্বিশেষ অহংএর প্রতিষ্ঠা কর। বল, সমস্ত Philosophyর এই **terra firma**। মনে হয়, নিরোধশক্তির কাছে প্রকৃতি বুঝি হার মানিল, দোলমঞ্চ হইতে একটি আরোহী বুঝি ঝাঁপাইয়া পড়িল—কোথায় কে জানে ? উল্লাসে চীৎকার করিয়া মানুষ বলিয়া উঠে—এই পাইয়াছি—মুক্তি, স্বারাজ্য, কৈবল্য ! আবার একদিন সে দেখিতে পায় কল্পনাতীত সুদীর্ঘ জ্যোতির্ময় সুষুপ্তি হইতে সেই কৈবল্যামোদী আত্মাই অনন্ত বন্ধনের মাঝে জাগিয়া উঠিয়াছে। কালের ছেদ কোথায় ? বন্ধন এক দিন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ মুক্তিই আবার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুক্তির কল্পনা সত্যের একদেশ মাত্র। আবার দেখি, বন্ধন হইতে মুক্তিতে, মুক্তি হইতে বন্ধনে অবিরাম দোল যাত্রা।

বলিহারি রসিকের কল্পনা ! অনন্তের কোলে চিরন্তন কিশোর-কিশোরীকে দোলাইয়া দিয়া বিভোর হইয়া তুমি চাহিয়া রহিয়াছ। ওই দুলিতেছে যুগল—ওদের চেন কি ? ওরা একটা কালো, একটা আলো যে কালো, সে বিশ্বের বিচিত্র বর্ণসুষমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে আত্মারাম। মনে হয়, তাহার সাধনা

বুঝি নির্ব্বেদের সাধনা, প্রলয়ের সাধনা; কিন্তু সেই কালোর বুক হইতেই আলোর ঝরণা ঝরিয়া পড়িতেছে, যে আলো বিশ্বের সকল বর্ণরাগকে গ্রাস করিয়া এমন শুভ্র শুচি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালোর বুকে আলো—আবার আলোর বুকে কালো—মানবের বুদ্ধিতে সত্যের এই চরম প্রকাশ। ভাষায় ইহাদের ফুটাইয়া তোলা সহজ, কিন্তু ভাবে ফুটাইতে গেলে, বৈপরীত্যের বেদনায় কণ্টকিত এই মুগ্ধ আনন্দকে জীর্ণ করিতে গেলে—মানবের সমস্ত চেতনা ব্যাপিয়া কি আন্দোলন, কি আলোড়ন, তাহা অনুভবিতা ছাড়া আর কে বুঝিবে? সান্ত্বনার ছলে না হয় বলিলাম, ওই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সত্যের পূর্ণপ্রকট রূপ; কিন্তু মনে রাখিও, ওই পূর্ণপ্রস্ফুট চেতনা, ওই পরিনিবিড় আনন্দ, ওই চিদানন্দের যুগল বিলাস—দুলিতেছে, দুলিতেছে—উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে, জীবন হইতে মরণে, বন্ধন হইতে মুক্তিতে। সে দোলার আর বিরাম নাই। তাহাকে আনন্দও বলিতে পারি না, নিরানন্দও বলিতে পারি না—বলিলে বলিতে পারি, সে দোলা বুঝি নির্নিরানন্দ!

অবাঙ্‌মানসগোচরকে বাক্যে ফুটাইবার এই ব্যর্থ প্রয়াস; স্পর্দ্ধিত বুদ্ধি আপনার অক্ষমতা বুঝিয়া নত হইয়া পড়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে অসীমের পানে চাহিয়া বলে, হে অসীম লীলাধার! তোমার কথা এইটুকু শুধু জানি—প্রেম সত্য।

আত্মন্যেব

জীবনের সকল সৌন্দর্য্য আত্মসমাধানে। বড় কঠিন কথা! শুধু নিজকে নিয়ে কি মানুষ থাকতে পারে? না, পারে না, তবে পারেও বটে। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও আত্মসমাহিত থকা যায়; তাই যদি না পারল, তবে বুঝতে হবে, জীবনকে পূর্ণরূপে সে উপলব্ধি করেনি।

জীবন মানেই একটা দোটানা। চিকিৎসা শাস্ত্রও বলে—বেঁচে থাকা মানেই মৃত্যুধর্ম্মী পরমাণুর লড়াইয়ে জিতে থাকা; রক্তের মাঝেও জীবনবিন্দু আর মৃত্যুবিন্দুতে অহরহ গ্রাসাগ্রাসি চল্‌ছে। যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইএ তুমি টিকে আছ, ততক্ষণ তুমি জীবন্ত।

এই লড়াই সব দিকে; ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মর্ম্মের পরতে পরতে। যুদ্ধ কোথায় নাই? চেষ্টার নির্ব্বাণ কোথায়? সব এষণা নিরুদ্ধ কর্‌লেও নিজকে টিকিয়ে রাখ্‌বার এষণা মরে না। চেষ্টা এবং লড়াই—এই হচ্ছে জীবনের তত্ত্ব।

কিন্তু শুধু তত্ত্বে প্রাণ পুরে না। রসগোল্লার তত্ত্ব জান্‌লেই রসগোল্লা আস্বাদন হয়ে যায় না। জান্‌লাম, এই এই উপাদানে এই বস্তু গঠিত; জান্‌লাম, জীবনে মৃত্যুতে লড়াই হচ্ছে জীবন। কিন্তু তারপরও একটা কথা আছে;—বুদ্ধিতে তত্ত্বধারণার পরও অনুভবের কথা আছে। চিত্তের একাগ্রতায় ধ্যান; ধ্যানের দেশবন্ধে ধারণা; ধারণার পর সমাধি। এই আত্মসমাধানই জীবনের চরম অনুভব, চরম রসাস্বাদন। এর চেয়ে বড় কথা আর হতে পারে না—আপ্তমুখে এক কথা মুহুর্মুহুঃ শুনি, ঐ একটী জিনিষ না কি জীবনে সব চেয়ে রসাল!

লড়াইএ নেমে যখন নিজকে ঠিক রাখ্‌তে পারিনি—তখনি বুঝ্‌তে হবে, ঐ সমাধানে ভুল হয়েছে। লড়াই করেই বেঁচে থাক্‌বে বটে—কিন্তু সে হচ্ছে উপাদানে উপাদানে, তত্ত্বে তত্ত্বে লড়াই- তুমি কিন্তু বিবিক্ত; নিজকে পৃথক রাখ্‌তেই হবে। আমারি সব অথচ আমি কিছু নই—এই বোধটুকুই আসল। এ বিবেকে বিশ্বপ্রেম একরত্তি কমে না—বরঞ্চ পাকা হয়, রস আরো জমে।

জগতের তত্ত্ব জান্‌লাম শুন্‌লাম—সে মিথ্যা মায়া; জীবনেরও তত্ত্ব পাচ্ছি—সে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই; কিন্তু এর পরও কর্ম্ম আছে—সে কর্ম্ম বুঝি কর্ম নয়; আবার অকর্ম্মও নয়, বিকর্ম্মও নয়। কর্ম্মের অতীত হল জীবনের মর্ম্মরহস্য—কর্ম্মের সংসার হতে অনুভবে নিজকে বিবিক্ত রাখাই সে নৈষ্কর্ম্ম্যের সাধনা। যদি একাধারে কর্ম্মী ও অকর্ম্মী হতে না পার—তবে ঠিক ঠিক আস্বাদন পাবে না, জীবনরহস্য আয়ত্ত হবে না।

জীবনের যা formal অংশ, তা প্রতি মুহূর্ত্তেই জান্‌ছ—তত্ত্ব চিরকালই জ্ঞেয়; কিন্তু জ্ঞাতা তুমি, দ্রষ্টা তুমি, আত্মসমাহিত তুমি। যে মুহূর্ত্তে নিজকে জান্‌ছ না, সেই মুহূর্ত্তেই সংসারে জড়িয়ে মর্‌ছ। আমারই সব, এই জেনে স্নিগ্ধ থাকো—সকল জ্বালা জঞ্জাল মাথায় করেও হাসিমুখে সংসার চালাও—কিন্তু ক্ষণেকের তরেও অন্যমনস্ক হয়ো না।

উপনিষদে একটী শ্লোকে এক সঙ্গে দুটী বিশেষণ আছে—আত্মসমাহিতেরই বিশেষণ ও দুটী; যে আত্মসমাহিত হতে চায়, তাকে হতে হবে—"সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।" সর্ব্বদা শুচি থাক্‌লেই সমনস্ক থাকা যায়। সমনস্ক—মন যার হাতে আছে, প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মচৈতন্যে যে সমুজ্জ্বল। কায়শুদ্ধি, আর মনঃ-শুদ্ধিরই রূপান্তর হচ্ছে আত্মসমাধান।

কথিত ভাষায় বলে "তাল সাম্‌লিয়ে ওঠা।" যে কোন রকম ব্যাপারেই যে সামাল দিতে পারে, তাল সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারে, সেই হল আত্ম-সমাহিত; অন্ততঃ আত্মসমাধিতে সক্ষম।

সকলেই অধিকারী—সকলের ভিতরেই তাল সাম্‌লিয়ে উঠ্‌বার ক্ষমতা আছে। বিশ্বাস করে জানা চাই, জেনে কাজে খাটানো চাই। সংসারের মাঝে ঠিক সংসারীর মতই নেমে পড়্‌ব, অথচ এমন একটী ক্ষমতা থাক্‌বে, ইচ্ছা কর্‌লে এই মুহূর্ত্তে যাতে সব নস্যাৎ করে দিতে পারি।

সুখের মোহ আর দুঃখের কাতরতায় এই তো বজ্র, এই তো আশ্বাস—এই আত্মসমাধান। সংসারের প্রয়োজনে যেখানে যেমন ভাবেই নেমে আস্‌তে হোক্ না কেন, যে তোমার সব চেয়ে মমতার ধন, তোমার হৃদয়রস আস্বাদন করাচ্ছ যাকে, তাকে ভুলো না। আত্মসমাহিত থেকে তুমি যাই কর, যাই দেখ—অসুন্দর অপ্রীতিকর ঠেক্‌বে না কিছুই।

আসলে তোমার ভাবেরই রূপান্তর দেখ্‌ছ জগন্ময়। আপাতদৃশ্য সুখ-দুঃখ যে কিছু অবস্থাই তোমাকে উদ্ভ্রান্ত করে, তারই সমাধান আত্মায়। সংসার কর্‌তে কর্‌তেও একদিকে ধ্যানস্থ হয়ে যাও। চিত্তের যখন ব্যাপ্তি ঘটে, এ না করে যে পার না তুমি। সব অবস্থাতেই মাথা ঠিক রাখা—সে শক্তি আত্মসমাধান থেকেই আসে।

কি চাই, এইটী যদি বেশ তলিয়ে বুঝ্‌তে থাক, তবেই কামনার আকুলিবিকুলি স্তব্ধ হয়ে যাবে—কেউ ঠকাতে আস্‌বে না। স্তব্ধ চিত্তের একটা আকর্ষণ আছে, চঞ্চল চিত্তের জন্য তার প্রাণ কাঁদে। সে কাঁদা দুঃখ নয়, সে এক অদ্ভুত সানন্দ বেদনা। এই পরচিত্তানুভবের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য কর্‌বার ক্ষমতা কারো হয় না। সমাহিতের চরণে চঞ্চলা লুটিয়ে না পড়ে পারে না।

জগৎ শুদ্ধ সবাই শুধু আশ্রয় চাচ্ছে—কোথা গেলে সুখ হয়; কেমন করে জ্বালা মেটে। সে বস্তু সমাধানে—সবাই যে ক্ষেত্রে এক হয়ে আছে—

তোমার হৃদয়ের ঐ কেন্দ্রে নিজের ব্যথা পরের ব্যথায় তফাৎ নাই। চোখ না বুজেও ধ্যান করা চাই—বাহির তো আলম্বন মাত্র—আসল উদ্দীপনা হচ্ছে এই যে, তোমাতেই তোমার সমাধান।

কাজ-কর্ম্মের হট্টগোলে যখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য যেন ইচ্ছা করেই সমস্ত ভুলে যাবার ক্ষমতা—এইটা না হলে ব্যালান্স্ ঠিক থাকে না। ভাবে কর্ম্মে ব্যালান্স্ ঠিক রাখাটাই বিবেক। যে কোন অবস্থাকে ধীর চিত্তে গ্রহণ কর্‌বার প্রস্তুতিই বিবেক। সমাহিতই বিবিক্ত।

একটা উদ্দাম শক্তির অনুভব—জীবনটা তারই প্রবাহ। কিছুতেই পরাহত নয় সে—জ্ঞানে প্রশান্তিতে সর্ব্বতঃসক্ষম। শক্তিমান্ অনুভবে পূর্ণ আত্মাই বিশ্ববরেণ্য—বিশ্ব তাঁরই ভাবস্পন্দনের লীলাকৌশলে তালে তালে স্পন্দিত। বুকের মাঝে থেকে থেকে এই অদ্ভুত রহস্যকে প্রত্যক্ষ করা—এই তো জগতে জগন্নাথ দর্শন। নিজের মাঝেই সকল কিছু পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে—ভিতরের দিকে স্পষ্ট করে তাকাতে গিয়ে বাইরের চোখ খুলে যাবে—এই তো আত্মসমাধান।

সমাধি কারো একচেটীয়া নয়। পরমুখাপেক্ষী দীনহীন সঙ্কোচ রেখো না প্রাণে—কারো ভরসায় নিজের কাজ ফেলে রেখো না—জীবনে যতটুকু পেয়েছ, ততটুকু নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মশক্তি যাচাই কর—কি পাওনি সে ভ্রান্তি ভুলে যাও। বিশ্বাস হোক্—শক্তি আমারো আছে।

অজ্ঞাতে তন্ময় হওয়া—তাকেই বলে জড়সমাধি। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সমাধান জগতের প্রয়োজনেই এসে যাচ্ছে। জীবনের সে অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তগুলোকে ধরে রাখ—আত্মশক্তির কেন্দ্র খুঁজে বের কর—ওই তো সত্য! তোমার খুসীতে তোমার মনের খেলা চালাতে না পার যদি, তবে মহিমা কি?

দুর্ব্বলতা প্রতীকারের যত প্রকার উপায় আছে, তার মাঝে আত্মগৌরবের অনুভব 'সব্‌সে সেরা। যারি কিছু না কিছু গৌরব কর্‌বার আছে, সেই নিতান্ত দুর্ব্বল নয়। সমাধানে আত্মগৌরবের সন্ধান মিলে। মুখের কথায় দুনিয়াদারীতে যখন কোন মতেই পার পাচ্ছি না, প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত আত্মগৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে—নিন্দাস্তুতি ভুলে গিয়ে—দেখ্‌ছি, যে কোন সমস্যারই মীমাংসা হাতে এসে পড়েছে।

আঘাতে মানুষ সত্যের সাক্ষাৎ পায়। সত্য কি?—এক কথায় তার নিজের মাঝেই সব আছে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত আর কিছু নয়—অন্তর্মুখী হবার প্রেরণা মাত্র। "ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন" কথাটির মাঝে আত্মসমাধানেরই সূত্র পাই। অর্থাৎ কিছুতেই বিশ্বাস হারাব না।

বহির্জীবনটাকে চিরকাল জগৎপ্রয়োজনের লক্ষ্যে সঁপে রাখ্‌তে হবে। জগতের সঙ্গে দলাই-মলাই হবার জন্য বাইরের জীবনটা। কিন্তু যে অমৃত উঠ্‌বে, তা অন্তরে। নিরুপমা সে সৌন্দর্য্যপ্রতিমা—অস্থির অবজ্ঞাত সংশয়ে তার পূজা হয় না। জগৎপ্রয়োজনে জীবনটা সঁপে দিয়ে তোমাকে নিয়ে অন্তরে অন্তরে একা একা তুমি থাক—অলক্ষিতে জগৎ তোমার আপন হয়ে যাবে। সমাহিতের প্রভাবই এই, সে অপরকেও সমাহিত করে।

আবার বলি—জীবনের সকল সৌন্দর্য্য সমাধানে—নিখিল পূর্ণতা সমাধানে। শান্তির নির্ঝর নিজের বুকে খুঁজে পাব—এই হল চরম মীমাংসা।

ভোলানাথ দেবাদিদেব জগদ্বরেণ্য এই সমাধানের গুণেই। তবু দুঃখ বল্‌তে ভোলানাথের এখনো এই একটী মাত্র দুঃখ যে, আমরাও কেন সমাহিত হচ্ছি না—কেন নিজ নিজ জীবনের তাল সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছি না? বুঝি তাঁর দুঃখ দূর করবার ক্ষমতা আমাদেরো আছে—জীবনে আর যদি কিছু না পেয়ে থাকি, এই গৌরব তো কর্‌তে পারি!

—*—

স্তব্ধতা

—*‡()‡*—

কলরবের আর অন্ত নাই। সমাধিনিমগ্ন শিবের লতাগৃহদ্বারে প্রকোষ্ঠার্পিতবেত্র নন্দীর মত বৈরাগী মন ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী বিন্যস্ত করিয়া হাঁকিয়া উঠে—"মা চাপলয়!" উল্লাসমুখর প্রমোদকানন অমনি চিত্রার্পিতের মত প্রশান্ত নিস্তব্ধ হইয়া যায়।

সমাধির দ্বাররক্ষী এই স্তব্ধতা। ইহা উদ্বুদ্ধ আত্মশক্তিরই পরিচয়। অবনতমস্তকে ইহার শাসন মানিয়া লই, কিন্তু ইহাকে ভালবাসি কি না বলিতে পারি না। এ কথাও বলিতে চাহি না, ইহা স্বভাবের ব্যতিক্রম। স্বভাবের মাঝে সম্ভোগের দিকটাই চিনিয়া রাখিব, আর বিপ্রলম্ভের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইব, এমন পক্ষপাতিতাকে সত্যনিষ্ঠা বলিতে পারি না। তাই এই যে আপাতকঠোর বৈরাগ্যের সাধনা, এই যে বিপ্রলম্ভের বেদনা, ইহাকে আমি স্বভাবের ব্যতিক্রম বলিয়া লাঞ্ছিত করিতে চাহি না। জানি, এই বৈরাগ্যের বুকে অনুরাগ স্নিগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠে; এই বিপ্রলম্ভের বুকেই করুণ বিলাপের রাগিণীতে অমর প্রেম গুঞ্জরিয়া ওঠে; তাই বৈরাগীর এই রূঢ়তাকে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করি। কিন্তু প্রাণ বলে, নন্দী, তুমি কর্ত্তব্য পালন করিতেছ মাত্র, তুমি ধন্য; কিন্তু সমাধিনিশ্চল শিবের অন্তর হইতে যে রসের মন্দাকিনী ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহার সন্ধান পাইয়াছ কি না, তাহা বলিতে পারি না।

"মা চাপলয়!"—সত্য কথা বটে, কঠিন কথা বটে; কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। মহাযোগেশ্বরের যোগবিঘ্নকারিণী ছলনার মূর্ত্তি আমি নই, সেই বৈরাগীরই অপ্রমেয় দুরবগাহ প্রেমে উন্মাদিনী আমি। আমি তার অনির্ব্বচনীয়া মায়া; আমি বলি, "মা চাপলয়"—এই কথাই শেষ কথা নয়। নন্দী, তুমি স্বেচ্ছায় গৃহদ্বারে বন্দী; তুমি লীলার সহায়; তুমি ধন্য। মুখকে তুমি মূক করিয়াছ, বুককে মূক করিতে পার নাই। সে স্পর্দ্ধাও তোমার নাই; নতুবা বসন্তপুষ্পাভরণে শোভমানা গিরিবালিকাকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে না!

কলরবকে আমিই কি ভালবাসি? কলরবে যাহাদের উল্লাস, তাহারাই কি তাহাকে ভালবাসে? দেহ, ইন্দ্রিয় মন শ্রান্ত শিথিল হইয়া সুষুপ্তির বুকে এলাইয়া পড়িতে চাহে নাকি?......তবুও বলি, নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে কোলাহলকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না। জানি, তাহারও রূপান্তর আছে। সে রূপান্তর তাহার স্বরূপকে বিরূপ করিয়া নয়, তাহারই মাঝে অপরূপ ব্যঞ্জনার আবিষ্কারে সে রূপান্তর। হে রুদ্র, হে মহাকাল, ওই রূপান্তরের সঙ্কেতই তোমার নিকট হইতে শিখিয়া লইব বলিয়া তোমার দুয়ারে আজ আমি ভিখারী।

মুখর চটুল আনন্দ—একক জীবনের সাধনায় ইহার অভিঘাত সহ্য করা কঠিন, তাই আত্মস্বার্থের দিকে চাহিয়া ইহার কণ্ঠ নিপীড়ন করি। কিন্তু একাকিত্বের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া জগতের দিকে চাহিয়া দেখ, মুখর-চটুল আনন্দ ছাড়া আর কি দেখিতে পাইবে? যে দেখে, সে স্তব্ধ; যাহাকে দেখে, সে চটুল। কাহার বুকে কে রহিয়াছে, তাহা জানি না। চটুলতার অভিঘাতে নাড়ীমণ্ডলী শ্রান্ত; তাই সহজেই বলি, স্তব্ধতার বুকে আনন্দ। কিন্তু এই কি সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য? চটুলতার বুকে স্তব্ধতাকে আবিষ্কার করাও কি শিবত্বের পরিচয় নয়? অতি কঠিন কথা, স্বীকার করি, কিন্তু কঠিনকে আয়ত্ত

করিতে যে উল্লাস অনুভব করে না, সাধনার স্পর্দ্ধা বহন করা তার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

এই তো সমস্যা। কাহাকে রাখিয়া কাহাকে দেখিব? যদি বলি, জগতের এই উচ্ছল কলস্রোতে ভাসিয়া যাই না কেন, লীলাচপলা গৌরীর কর-কমলতাড়িত কন্দুকের মত সুখ-দুঃখ-বেদনায় আবর্ত্তিত হই না কেন! ভীরু ইন্দ্রিয়গ্রাম আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে, বলিবে, এ দুরন্তপনা সহিতে পারিব না, মুহূর্ত্তে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইব যে! যদি বলি, বৈরাগী শিবের অনুত্তরঙ্গ সাগরবৎ মরণ-গহন স্তব্ধতার মাঝে তলাইয়া যাই, ফুৎকারে যেমন প্রদীপ নিভিয়া যায় তেমনি করিয়া নিভিয়া যাই, অজানিত আশ-ঙ্কায় হৃদয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। যদি বলি, মধ্য পথ ধরিয়া চলিব। জানি, সে পথেও তৃপ্তি নাই—ওই যে পৃথক্‌জনের কলরবের পথ। খণ্ডসত্যের ইষ্টক দিয়া এমনি করিয়া মিথ্যার কারাপ্রাচীর রচনা করা হইয়াছে—কোথায় দিশা, কোথায় পথ! প্রশান্তির পথের রটনায় যাহারা মুখর হইয়া ওঠে, কলরব তাড়াইবার অভিমানে তাহারাই কি আরো কলরব ডাকিয়া আনে না?

বিকল হইয়া ভাবি, কি চায় মানবের প্রাণ? আপন মনে সমস্যা গড়িয়া তুলিয়া আপন মনেই তার সমাধান করিতেছে; আপন মনগড়া শান্তির মাঝে ঢলিয়া পড়িয়া অশান্তির দুঃস্বপ্নে থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। এইখানে সব কিছুর ইতি হইল, এই বলিয়া সে স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে চায়; কিন্তু পারে কি? আজীবন তাহাকে কেবলই বৈপরীত্যের বেদনা বহন করিয়া চলিতে হয় না কি? এই বেদনাকেই সে তাড়াইতে চাহে, অথচ নিয়ত দেখে, আনন্দ-আয়োজনের চরম প্রান্তে এই বেদনারই মূক উচ্ছ্বাস!

জানি, ভুল বলা ছাড়া উপায় নাই, তবুও দুটা ভুল বলিবার প্রলোভনকে সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমার এই ভুলের বোঝায় ভোলানাথের ভুলের ঝুলি বড় বেশী ভারী হইয়া উঠিবে না। এই গোলোকধাঁধার মাঝে একটী পথ বুঝি আছে। আলোর কাঙ্গালীপনা ছাড়িতে হইবে। অন্ধকারকে, মরণকে, নিরানন্দকে, নিঃসঙ্কোচে বুকে তুলিয়া লইতে হইবে। বুদ্ধির আছে একের প্রতি নিষ্ঠা, অচল প্রতিষ্ঠায় বিশ্রামের ঝোঁক; তাহার অস্তিত্বের ওই অবলম্বনটুকুই সরাইয়া লইতে হইবে। থাকিবে কি?—কি থাকিবে, তাহা বলিতে পারি না; জগতের ভাষায় বলিতে সে এক সীমাহীন অন্ধকারের পারাবার—নাস্তির কঠিন সমগ্ররূপ। ওই বিভীষণা করালিনী মূর্ত্তিকে যদি বুকে তুলিয়া লইতে পার, তবে বুঝি জীবনে একটা অভিনবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায়। কিন্তু না, আগে হইতেই সাবধান করিয়া রাখি—চাহিবার মত একটা কিছুও রাখিও না—ওই কামনাই হইবে বুদ্ধির আশ্রয়। বুদ্ধিকে নিরাশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে অতলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সকল তর্ক, সকল যুক্তি ভাসিয়া যাইবে, বৈপরীত্যের দুঃসহ বেদনায় মস্তকের করোটী বিদীর্ণপ্রায় হইয়া যাইবে—তবুও স্থির থাকিতে হইবে, শূন্য বক্ষে প্রলয়ের আসন রচনা করিতে হইবে। নাস্তিত্বের নিপীড়নে অস্তিত্বের সমস্ত রস নিঙ্‌ড়াইয়া ঝাড়িয়া পড়িলে, তার পরেও যদি তুমি থাক, তাহা হইলে—

বলিতে পারি না, তাহা হইলে কি! জগতের দিকে চাহিয়া দেখিব, ওই সেই ভুবনমোহিনী মায়া—তেমনি হাসিতেছে, চপল কটাক্ষে তেমনি মুনির মানসে বিভ্রম ঘটাইতেছে। কিন্তু ওই চটুলতার বুকে কি গভীর স্তব্ধতা! দ্রষ্টা শিহরিয়া ওঠেন—আতঙ্কে নয়, আনন্দে নয়, চেতনার তীব্র স্ফুরণে; অন্ধকারের বুকে আত্মপ্রতিরূপ দেখিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া যান; আর সেই স্তব্ধতারই এক-প্রান্ত সচকিত করিয়া ভাঙিয়া পড়ে মুখর, চটুল আনন্দ!

তখন দেখি কর্ম্মের স্ফুরণ! আদি নাই, অন্ত নাই—স্তব্ধতাকে বেড়িয়া বেড়িয়া আবর্ত্তিত হইতেছে কর্ম্মের রসচক্র! সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম, পাপ পুণ্য, শান্তি-অশান্তি, বন্ধন মোক্ষ—সব হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। উল্লাসে কি?—উল্লাস স্বার্থপরের কথা, আনন্দলোলুপ ক্ষীণজীবীর কথা। বেদনায় কি?—বেদনা শঙ্কাতুরের কথা, মরণ-বিহ্বল দীনপ্রাণের কথা। এ রসচক্রের আবর্ত্তনকে আয়ত্ত করিবার জন্য, দোহাই, বুদ্ধিকে ডাকিও না। শুধু একটা ভুল কথা বলিয়া ফেলি—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাক।

ভ্রম সংশোধন

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ—যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, সংসারে থাকিয়াই তাঁহারা সংসার জয় করিয়াছেন। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জনক রাজা। কিন্তু মনকে সাম্যে স্থিত করিবার দরুণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দরুণ নাকি বার বৎসর হেঁটমুণ্ড হইয়া জনক রাজাকে কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল। কাজেই সংসারে থাকিয়াও সংসারের সমস্ত প্রলোভন হইতে নিজকে নির্লিপ্ত রাখিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সংসারে থাকিয়া সবই হইতে পারে, বন-জঙ্গলে গেলেই সাধনার একটা গূঢ় রহস্য বিশেষ করিয়া প্রকট হয় না—কিন্তু সংসারের বিচিত্র কোলাহলের মাঝে মনটাকে স্থির রাখা সহজ কথা নয়। সাংখ্যের কৈবল্য-সাধনাই চরম সাধনা নয়, কিন্তু যেখানে প্রকৃতির মোহিনী মায়ায় নিজকে অটল-অচঞ্চল রাখিতে সমর্থ না হই, সেখানে বিবিক্ত-সাধনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বৈ কি? সাধনা দ্বারা গৃহকে কলুষ-নির্ম্মুক্ত করিতে পারিলে একদিন গৃহত্যাগের বাসনা মনে উদয়ই হইবে না। তখন ঋষিদের মত ঘর সংসার করিয়াও অনায়াসে ব্রহ্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারিবে।

সংসার কর আপত্তি নাই—কিন্তু ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা প্রতিদিন যে মনের ময়লা জমিয়া ওঠে তাহাকে পরিষ্কার করিয়া ফেল! সাবধান হইতে বলি—ঘোর-সংসারীদের, কেননা তারা বিমূঢ়, জীবনের এক-দিক্‌কার ভোগের আস্বাদনেই তাহারা উন্মত্ত—এর চেয়ে বড় সার্থকতাও যে মানব-জীবনে রহিয়াছে তাহা ভুলেও একবার তাহাদের মনে উদিত হয় না। আর কিছু না, এই ভুলটা ভাঙ্গিবার দরুণই তাহাদের একবার সচেতন হইতে বলি।

আমরা প্রায়ই নজীর দিয়া থাকি—কৈ আগে তো মুনি ঋষিরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন না—তবুও তো তাঁহারা কত বড় জ্ঞানী, কত বড় দার্শনিক হইয়া ছিলেন। এই যুক্তিটা যদি নিজের দুর্ব্বল মনকে support করিবার দরুণই বলা না হইয়া থাকে, অর্থাৎ একদিকে সংসারী সাজিয়াও যদি অন্য দিকে ব্রহ্মচিন্তার হোমানল ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে

থাকে, তবেই বুঝিব খাঁটী। কিন্তু আগেকার মুনি-ঋষিদের নজীর দেখাইয়া যদি নিজেদের সুবিধার পথটাই প্রশস্ত করিয়া লওয়া হয়—তাহা হইলেই প্রবঞ্চনা করা হইল। যাজ্ঞবল্ক্যও তো সংসার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় spirit কয়জনার আছে? যে সংসারকে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন—সেই সংসারের মায়া মুহূর্ত্তের মাঝে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি আত্মানুসন্ধানে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। আমাদের মাঝে এইরূপ আত্মার বল আছে? প্রয়োজন হইলে আমরা সমস্তের মায়া জলাঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? এই যে হঠাৎ যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি সংসারকে দ্বিধাহীন চিত্তে ত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেন, ইহা কি একদিনের সাধনাতেই? দৈনন্দিন জীবনেও কি সেই সাধনা-স্রোত পূর্ব্বাপর চলে নাই?

গীতার বাণীর সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের ধারা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। সংসারে থাকিয়াও তাঁহারা নির্লিপ্ত। কিন্তু তাঁহারা নির্লিপ্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া, ইহাই আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এক কথায় তাহার উত্তর—তাঁহাদের মন সাম্যে স্থিত ছিল—সংসারের চিন্তাই একমাত্র চিন্তা ছিল না তাঁহাদের। কাজেই আসল কথা হইল মনকে নিয়া—ঘর-বাড়ী ছাড়া নিয়া নয়। পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র ভাল মন্দ প্রভাব হইতে নিজকে অব্যাহত রাখিতে পারিলে তো ভালই, মোট কথা তোমার মন যেন কোন দিক দিয়া চঞ্চল হওয়ার সুযোগ না পায়—ইহার প্রতিই তোমার দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ঘর-সংসারছাড়াদের প্রতিই বা কাহারো এত বিদ্বেষ, এত অবজ্ঞা থাকিবে কেন? কেহ সবল আছে কাজেই শত্রুর মাঝে থাকিয়াও নির্বিঘ্নে আত্ম-সাধনায় নিমগ্ন থাকিতে পারিয়াছে, ইহা তো ভালই—ইহা আত্মশক্তিরই নিদর্শন—কিন্তু যাহারা অক্ষম তাহাদের প্রতিই বা অন্যায় কটাক্ষ থাকিবে কেন? আত্মোপলব্ধির দরুণ যে যে পথই অবলম্বন করুক না—তাহাতে নিন্দার কি থাকিতে পারে? বিচার করিতে হইবে উদ্দেশ্য নিয়া—পথের পার্থক্যে তো কিছু আসে যায় না! সংসারে থাকিয়াই সব হইতে পারে—বেশ তো নিজের জীবন দিয়া নীরবে তুমি তা-ই প্রতিপন্ন করিয়া যাও না। এমন করিয়াই তো আবার ঋষির সংসার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, সংসারে তো বেশ আনন্দেই আছি—তবে আর এর প্রতি নির্দ্দয় হওয়া কেন? ঋষির তুল্য কথাই বটে! কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি, এ আনন্দ কিসের—আর কত দিনই বা ইহার স্থায়িত্ব। আনন্দ—সে যে এক অদ্ভুত আবেগ, ইহা শরীরের শক্তি বর্দ্ধন করে, মানুষকে সংযমের পথে লইয়া যায়। কিন্তু দিনের পর দিন যে আনন্দের বিহ্বলতায় সাধারণতঃ বিমূঢ় হইয়া আছে মানুষ, তাহাই কি সেই উপনষদের আনন্দ? আনন্দে কোন দিন আসক্তি থাকে? বরঞ্চ আনন্দে মানুষ সব ত্যাগ করিবার ক্ষমতা শক্তি লাভ করে। তখন সর্ব্বত্র সম-দর্শন। আনন্দে যদি তোমার ভেদ-দৃষ্টি মনের কৌটিল্যই অপসৃত না হইল, তাহা হইলে তুমি কি আনন্দ পাইয়াছ! এই ক্ষণস্থায়ী সুখের ওপরই এত প্রবল বিশ্বাস?

সংসারে আছে সবাই, কিন্তু সংসার করিতে হয় কি করিয়া তাহা কেউ জানে না। তাহা না হইলে এত অবনতি, পদে পদে এত ব্যভিচারই বা ঘটিবে কেন? আমরা আছি সিদ্ধের positionএ—কিন্তু সাধনাই যে সিদ্ধির মূল, সেই সাধনার সঙ্গেই আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। এক কথায় বলিতে গেলে ভাবটা গিয়া এই দাঁড়ায়—আমরা সবই চাই, অথচ কোন কিছুর দরুণ মূল্য দিতে পারিব না!

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ"—ইহা খুবই বড় কথা। কিন্তু বন্ধনকে স্বীকার করিয়া

যদি মুক্তির স্বাদ লাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে সবই বৃথা। মুক্তির পিপাসাকে চিরজাগ্রত করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত না হইলে বন্ধনের মাঝে পড়িয়া নিজেরই অকল্যাণ। "সংসারকে কেন ছাড়িতে হইবে—এইখানে বসিয়াই সমস্ত লাভ করিব"—ইহা কিন্তু ঋষিরই কথা; কিন্তু সাধনবিহীন হইয়া ঋষিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা চলে না!

আমরা ঠিক জায়গাতেই আছি, কিন্তু বড় বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া আছি। ইহাতেই আমাদের উর্দ্ধ-দিকে গতি হইতেছে না—ক্রমশঃ কেবল নীচের দিকেই পতন হইতেছে। এই পতন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেকেরই সাধনার প্রয়োজন। সাধন-ভজনটা কেবল সাধুদের দরুণই নয়, সংসারীর পক্ষে সাধনার আরও বেশী প্রয়োজন। আমরা এখানেই মস্ত বড় ভুল করে বসে আছি।

কথাপ্রসঙ্গে

—(*)—

একটী কথা আছে—"নিজকে বিলাইয়া দেওয়া।" —ভাবুকতার চরম কথা। কথাটা খুবই অস্পষ্ট, অথচ পরম রসাল। ভাব ঢলঢল অবস্থায় আপনিই মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে—"বিশ্বে নিজকে বিলাইয়া দিব, সকলকে বুকে তুলিয়া লইব।"

মনে হয় যেন গলিয়া পড়ার কথা। কিন্তু তা নয়; যথেষ্ট ধারণা করিবার শক্তি বা বস্তু মজুত না থাকিলে কেহ অমন করিয়া বিলাইয়া দিতে পারে না। যে অন্তরের খবর না লইয়া মুখেই বিলাইয়া দিবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সে তো ফতুর হইল বলিয়া, তার ভাবের নেশা ছুটিতে বিলম্ব নাই!

সকল মহাপুরুষই বলিয়া থাকেন, "ভাব চেপে রাখ।" আত্মপ্রচারে ব্যস্ত না হইয়া 'গুপ্তা কুলবধূরিব' হইয়া অবস্থান করা প্রকৃত ভাবের দস্তুর। যথেষ্ট পরিমাণ 'আত্মনি শ্রদ্ধা' না থাকিলেই ছড়াইবার ব্যস্ততা আসে, তোষামোদীতে মন টলে। ভাব ছড়ায় কিছুটা বাক্যে। "নাপৃষ্টো কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ" নিয়মটী পালন করিয়া চলিলে অনেক সময় ভাব চাপা যায়। অবশ্য এ সবই ভাবের বহিরঙ্গ রূপ। অন্তরঙ্গ ভাবে দোনামনা নাই।

ছড়াইবার পূর্ব্বে গুটাইবার প্রয়োজন আছে। যে পরিমাণ বিলাইব সেই পরিমাণ আত্মস্থ হইবার ক্ষমতা যদি না রাখি, তবে ভাবে অভাব ঘটাইবে। ঐ পর্য্যন্তই সার হইবে—অভিমানের প্রেত আসিয়া বুকে বাসা বাঁধিবে। সাধক ভাবুকদের সর্ব্বদা আত্ম-সম্বরণ চাই।

শাস্ত্রে "অধিকারী বিচারে"র কথা আছে।—যার পেটে যতটুকু সহিবে, তাকে ততটুকুই দিতে হইবে। পেটের খবর রাখাটা বড় কম কথা নয়। একমাত্র মা ছাড়া ছেলের পেটের খবর আর কারো রাখিবার ক্ষমতা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আর এক ওস্তাদ আছেন—গুরুদেব; শিষ্যের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর নখাগ্রে। যে মানুষ চিনে, সে অধিকারী বিচারে সমর্থ। অধিকারী বিচারের মূলে অপরিসীম দরদ

রহিয়াছে। উহা যার তার কর্ম নয়। তিনি আমাদের খাঁটী চাহিদা চেনেন, আমাদের চেয়ে বেশী জানেন; তাই তিনি গুরু।

গুরু তো পূর্ণ—নিজকে বিলাইয়া দিবার দরুণ সর্ব্বদা প্রেরণা অনুভব করিতেছেন। আর নিঃশেষে নিজকে শিষ্যের মধ্যে বিলাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁর মুক্তি নাই। তাঁর কন্ম বলিতেও ঐ, বন্ধন বলিতেও ঐ। এ বন্ধন কাটিয়া দেয় শিষ্যে। কিন্তু অধিকারী অনধিকারী কত শিষ্যই তো জুটে। সহস্র সহস্রের মধ্যে "কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে;" তারও সহস্র সহস্রের মাঝে হয়ত বা একজনের মুখ চাহিয়া গুরু একদিন বলিবার আশা রাখেন—"অয়ং মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

যিনি বিলাইবার বস্তুতে হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া কেবল যোগ্য গ্রহীতার মুখ চাহিয়া পল গুণিয়া গুণিয়া দিন কাটাইতেছেন, তাঁর অন্তরের বেদনা কল্পনা করিতে পার?

ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে যিনি ওলট্‌ পালট্ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু দেন না—প্রতীক্ষায় জেগে জেগে রাত্রি কাটানই তাঁর দস্তুর। শুধু কি খেয়াল এ?

এইখানেই পূর্ণ ক্ষমতার কথা। জগৎশুদ্ধ সকলেই নিজকে বিলাইয়া দিবার জন্য পাগল—বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, আত্মজ্ঞাপনের হুড়াহুড়ি লাগিয়াই আছে; হয়ত ঘরের কোণে যে ঘোর স্বার্থপর, দশকে দেখাইবার জন্য সভাস্থলে সেও একবার রুমাল ঝাড়িয়া বদান্য হইবার চেষ্টা করে। নিজকে বিলাবার তির্য্যক্‌ আর সরল অশেষ রকম চেষ্টাতেই সংসার ভর্ত্তি। কিন্তু গুরু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি ভাব চাপিতে জানেন। অধিকারী বিচারের অধিকারী তিনিই—যিনি সবার সব দাঁতের খবর জানিয়াও বাইরে জড়বৎ আছেন। শুধু কি বাইরে?—অন্তরেও এক চিন্ময় রূপ বহুস্থিত মৃন্ময়ের ছায়া বড় হইয়া উঠে না। সব জানেন, তবুও জানেন না—ভাব চাপিবার ক্ষমতার মূলে এই রহস্য।

"গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং"—ছেলেবেলায় শ্রীগুরুর দক্ষিণামূর্ত্তির স্তব করিতে গিয়া ওই কথাটা কেবল আওড়াইয়াই গিয়াছি, মনে ছাপ পড়ে নাই, হয়ত অকালে ছাপ পড়িয়া আধ্যাত্মিক অজীর্ণ-উদরাময় ঘটুক, ইহা তাঁহারই ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আজ বুঝিতেছি শ্রীগুরুর ঐ সরল বিশেষণটীতে কি গভীর গুরুত্ব! জীবনে পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—হাঁ তিনি মৌন ব্যাখ্যাতাই বটেন। সবার বেলা যিনি বকিয়া বকিয়া হয়রাণ, কারো কারো প্রতি তিনি আবার অসীম নীরব কেন, তাহা বুঝিতে আর দ্বিধা নাই।

কথাচ্ছলে বলি—নিজকে তিনি বিলাইয়া দিতেছেন অবশ্য, কিন্তু কোন দিন অনুবর্ত্তীর স্বাচ্ছন্দ্যকে খর্ব্ব করিয়া নয়। "দক্ষিণ" কথাটীর একটী বড় সুন্দর অর্থ সেদিন একখানা বৌদ্ধ পুরাণে পাইলাম, লেখক বলিতেছেন—"দক্ষিণ" মানে "পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী"; সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে—"অথচ তিনি কুটিল ছিলেন না।" এর সাক্ষ্য পাই গুরুচরিত্রে। শিষ্যকে আয়ত্ত করিয়া ফেলাই তাঁর কাজ—নিজকে বিলাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা জাগিয়া আছেন, অথচ পরের স্বাচ্ছন্দ্য অতিক্রম করিতেছেন না। এই পরচ্ছন্দানুবর্ত্তন ক্ষমতা একমাত্র শ্রীগুরুদেবেই পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোন দিন জোর করিয়া কিছু করান নাই—বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন "যা ভাল বোঝ কর।" অথচ জোর কি আমার উপর তাঁর কম ছিল? "যা ভাল বোঝ কর" কথাটা অভিমানের কুটিল কথা নয়, সত্যি তিনি প্রাণের দরদের সহিত সরল ভাবেই বলিতেন। তিনি পরিপূর্ণ ভাবুক ছিলেন, অথচ নিজকে চাপিয়া রাখিতেন। তিনি সর্ব্বদা যেন আমারই ছন্দের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, অথচ মনে একটুও

ক্ষোভ বা কুটিলতা ছিল না। এই ঠিক শক্তির পরিচয়। নিজকে বিলাইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু এমনি আত্মস্থ থাকিয়া।

শ্রীগুরুর এই গুণ আমাদের মাঝেও সংক্রামিত হওয়া প্রয়োজন। নিজকে বিলাইয়া দিবার আনন্দে মাতামাতিটাই যেন সার না হয়। আনন্দে আমরা উচ্ছ্বসিত হই, কিন্তু গুরু দর্পণে প্রতিবোধিত ক্ষণে দেখিতে পাই, আনন্দে স্তব্ধ হওয়াই সনাতন ধারা।

উপনিষদেও আছে—ভারী সুন্দর একটী বিশেষণ—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" চিত্তের পরিপূর্ণ আনন্দোজ্জলতাতেও সাধককে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইবে—নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত, নিঃস্তব্ধ নিশীথে সুষুপ্ত বৃক্ষটীর মত। চরিত্রের এই একটা দিক না থাকিলে ঠিক নিজকে বিলাইয়া দেওয়া হয় না। সচরাচর আমরা যখন আনন্দে গলিয়া পড়ি, তখন দেখি, ছেলেরা আমাদের "পাইয়া বসে।" কিন্তু পাইয়া বসা আর পাওয়াতে যে কি তফাৎ, তাহা শ্রীগুরুচরিত্র স্মরণে আনিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি। ভয় এবং ভালবাসা যুগপৎ—যাহাকে বলে শ্রদ্ধা; নিজকে যেমন খুসী ছড়াও, কিন্তু ঐ দুটী ভাবের আলম্বন হইতে হইবে। আনন্দে কেবল কুসুমকোমল করিবে নয়, বজ্রকঠোরও করিবে।

অভিমান ছুটিয়া গেল, বিশ্বের প্রতি আনত হইলাম বা মাথা নত করিলাম।—আত্মবিসর্জনের নমুনা দেখা দিল। কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাসে পরের মন বুঝিবার যোগ্য সতর্ক মনটী যদি হারাইয়া ফেলি, তবে হিতে বিপরীত হইবে। আত্মমিশ্রণ এমন গভীর ভাবে হওয়া চাই—যাহার প্রভাবে অপরের মাঝেও বিস্মিত স্তব্ধ অন্তর্মুখী ভাব জাগিয়া উঠে। মোট কথা, এক সুরে বাজিয়া ওঠা—সত্যি যদি মিলিতে চাও, বিশ্বে এবং ব্যক্তিতে কোন অনাত্মীয়তার অন্তরাল রাখিলে চলিবে না।

পরিপূর্ণ শক্তিপ্রতিষ্ঠার পর ভাবসঞ্চার আপনা-আপনি হইয়া থাকে। সে যেন সূর্য্যের আলোর মত ছড়াইয়া পড়ে। সে আলো ঘুমন্ত প্রাতে একবার চোখে লাগে; তারপর যতই জীবনবেলা চড়িতে থাকে, ধীরে ধীরে এমন ভাবে সর্ব্বাঙ্গে মিশিয়া যায়, যখন সে আছে বলিয়া বিশেষ জ্ঞান হয় না, অথচ নির্ব্বিশেষে সকলের সব কাজ তারি তেজে অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে থাকে। তিনি চুপ করিয়া থাকিয়া আমাদের দেখেন, আর অলক্ষ্যে মনের সংশয় আপনা-আপনিই ছিন্ন হইতে থাকে।

খাঁটী ভাবের এই প্রভাবিত করিবার ক্ষমতাকে জয়যুক্ত করিতে হইলে প্রত্যেকক্ষণে চিত্তকে সংস্কারমুক্ত করিতে হইবে। একটী লক্ষ্যে মনকে একাগ্র করিয়া তারপর আশে-পাশের সমস্ত জগৎকে যদি ভুলিয়াও যাই, তাহাতে ক্ষতি হইবে না—একনিষ্ঠ ভাবের প্রভাবে কাজের সংসার আপনি গুছাইয়া আসিবে। নিজকে দিতে গিয়া দেওয়াটাই প্রকৃতপক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে—প্রতি ঘটনার মধ্যে ত্যাগের অবকাশই খুঁজিয়া পাইব, ভোগের নয়। এই তো জীবন একসুরে বাজিয়া উঠিল—এখন গাহিয়া যাওয়াই কাজ, শ্রোতা আপনি জুটিবে।

ভাব তো দিশেহারা করিতে চাহিবেই, পাগল করিতেই সে আসে! কিন্তু কেন্দ্রচ্যুত না হইয়া বেশ জানিয়া-শুনিয়া পাগলামী করিতে হইবে। শুধু আত্মতৃপ্তিকে চরম ভাবিয়া আপন আনন্দে আপনি মত্ত হইয়া পড়িতে লজ্জাবোধ হইবে, এই সমনস্কতাটুকু চাই।

নিজের বলিয়া তাঁর কিছু নাই—কিছু কোনদিন রাখেনও না; তবু গুরুদেবকে দেখি, কি আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদৃষ্টি, কি অদ্ভুত আত্মসম্বরণ-ক্ষমতা! আনন্দে উধাও করিয়া দিতেছেন, তবু ধারণা সুদৃঢ় আছে; সংসারের শুভ হয় যে সব শৃঙ্খলা হইতে, তাহার এক-চুল নড়চড় নাই। ভাব শুধু মনের ময়লা কাটাইয়া চলিবে— সুদৃঢ় চারিত্র্যবলে কাজের সংসার গুছাইতে

ভুলিও না, ইহাই তাঁহার আশ্বাস—প্রাণ ভরিয়া পান কর কিন্তু গলিয়া পড়িও না।

আসল কথা হইল ধারণার ক্ষমতা—এ বিশ্বে ভাবের অভাব কোথায়? জ্যোৎস্নামাধুরীর মত না জানি কার সে স্নিগ্ধ মন আমাদের ব্যস্ত মনের উপর অবিরাম ঝরিয়া পড়িতেছে! শক্তিবিন্দু অনলে অনিলে জলে-নভস্তলে দশোদিশি পূর্ণ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে—শুধু চায় ধারণার আশ্রয়, শুধু চায় আগ্রহব্যাকুল হৃদয়ের সমর্পণ। তুমি কেন সে শক্তিকে আপন নিতে পারিতেছ না—তাই ত তোমার উপর তার রাগ! ত্যাগমহিমায় আনত-বিনীত স্বীচিকীর্ষু মনটুকুই সে চাহিতেছে—শক্তিতে শক্তিতে ভরিয়া দিবে বলিয়া। সে কি দিতে কম করে?—আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি কই?……

যিনি নীরবে হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, পাইয়াছি ভাবিয়া কোলাহল করিয়া আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া না যাই যেন। ভাবের আনাগোনা নীরব নিথর—অপ্রমেয়; এই তার গৌরব। সকলের সঙ্গে মিশিতে হইবে—তার মানে এই নয় যে, আত্ম-সাধনা ভুলিয়া যাইবে। মিলন তো হইয়াই আছে ও তো আপনি হয়—কাজ শুধু আঁধার খেদানো। হয়ত তোমাকে লইয়া কোলাহল চলিবে; তুমি কোলাহলের চেয়ে গভীর—ইহা বুঝাইবার জন্যই জগতের যত কোলাহল। সর্ব্বদা উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলিবে—উদ্দেশ্য ভুল হইলে সকল কারবার পণ্ড হইবে।

ভাব আমার খেয়াল-খুসীর বস্তু নয়। কাহাকেও কিছু দিব—এ অহঙ্কার শোভা পায় না। আত্মমিশ্রণ, আত্মসম্বরণ পাশাপাশি চলিবে; আত্মসমর্পণ সকল দর্পকে স্নিগ্ধ শান্ত রাখিবে। তবেই হৃদয় শক্তিধারণার যোগ্য হইল। তাঁহার কাজ তিনিই করিতেছেন—এ জীবন শুধু নিমিত্ত।

কর্ম্ম করিতে করিতে ভাব—ইহা আসলের প্রতি বিধান। সনাতন ধর্ম্ম বলে, ভাবামূর্তে ভাবময় উপচিয়া পড়িতেছেন, তাই জগতে কর্ম্মের লীলা। অষ্টাদশ অধ্যায় ভাবকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আত্মশক্তির অনুরণনে যখন সব্যসাচীর প্রতি রোমকূপ পর্য্যন্ত বিশ্বরূপের বিভাস ধারণায় সমর্থ হইল, তার পরেই আসিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিপাতের পালা। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন আগে ভাবের মর্ম্ম বুঝাইয়া তবে কর্ম্মে নামাইলেন - নতুবা কর্ম্মে সব্যসাচীকে বাঁধিত, সব্যসাচী স্বধর্ম্মচ্যুত হইতেন। আগে কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতেন, তবে কর্ম্মে নামিলেন। ভাবুকতায় এলাইয়া পড়িয়াছিলেন, ভাব তাঁহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিল - তিনি তাঁর ইচ্ছায় কর্ম্মপ্রবৃত্ত হইলেন। এমনি করিয়া ভাবের দীক্ষা লইয়া কর্ম্মে নামিতে হইবে। কিছু পাইবার লোভে নয়—নিঃশেষে নিজকে দিতে!

যতক্ষণ পাইবার লোভ আছে, ততক্ষণ নিজকে বিলানো হয় না। সংশয় সঞ্চারধর্ম্মী নয়—আত্ম-প্রতিষ্ঠাই অব্যর্থসঞ্চারী। সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন হইয়া যাইবে, তবে তো দিবার অধিকার—ইহার পূর্ব্বে কেবল মায়া কাটাও, অবিরত চিত্তের আবেগচঞ্চলতা দূর কর। নিষ্কাম না হইলে আপ্তকাম হওয়া যায় না, এই রহস্যময় কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবার জন্যই কামকর্ম্ম ত্যাগ কর।

ভাষায় ব্যবহারে আচারে নিজকে বিলাইবার অহঙ্কার উগ্র হইয়া উঠে—ইহা ভাব জীর্ণ না করারই প্রমাণ। ক্ষুধা যুবায় পরে; আগে দেখি ভাবুময়ের স্তব্ধ প্রশান্ত ধ্যানস্থ মুর্ত্তি। তিনি তো দিতেছেন—দিতেই তো আসিয়াছিলেন—আজও যে দিবার জন্যই বসিয়া আছেন—কিন্তু কই, একটু তো দিশা পাই না, কখন তিনি দেন, কেমন করিয়া দেন!

বলিতে বসিয়াছিলাম তাঁহারই কথা। কেমন করিয়া যে আত্মপ্রচারে নিষ্ঠা ঘুলাইয়া গেল, ধরিতে পারিলাম না। কিন্তু যাহাই বলি, যাহাই করি—তাঁহাকে তো ভুলিতে পারি না। কত মতে দুরদুরা-

স্তরে অপলক্ষ্যে মন ছিটকাইয়া পড়িতেছে, অপসিদ্ধান্তে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতেছে—কিন্তু না, তবু তো তাঁহার প্রভাব যায় না—তাঁর দেওয়া ফুরায় না।

এই ঠিক দেওয়া। আমার সর্ব্বস্ব নিয়া তাঁর সর্ব্বস্ব দিতেছেন; দেওয়া নেওয়া তাঁর নিকট এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি দিতে পারিতেছি না, তাই তাঁর সর্ব্বস্ব পাইয়াও পাওয়া হইল না! আমার ভ্রান্তি ঘুচুক—তাঁহার দেওয়াকে আমি বিশ্বাস করি। সত্যি সত্যি দিবার বস্তু তিনিই দিতেছেন—আমি তো কিছু নই।

এই ভাবটীতে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে নিজকে বিলানো যায় না। আর মনে কর কি শেষ পর্য্যন্ত একা একা চোর হইয়া বসিয়া থাকিতে কেহ পারিবে?—অসম্ভব! তাঁর অব্যর্থ আত্মদানপ্রভাব যাহাকে ছুঁইয়াছে, তার আর মুক্তি নাই। সত্য ভাবকে অস্বীকার করে, এমন জানোয়ারটী পর্য্যন্ত দুনিয়ায় নাই। ভাবে সবাই এক। যে যাই বলু, যদি কেহ সত্য কিছু পাইয়া থাক, তাহা বিলাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু তার আগেই হাতের কাজগুলি এলোমেলো হইয়া না যায়—তার দরুণই শাস্ত্রবন্ধন।—আসলে এ বন্ধন নয়—মুক্তির লক্ষ্যে সংকেত মাত্র। বাঁধিবার পালাই আমার—নিজের ছুটী নিজে নিতে গেলে সেটা মানায় না। আসল চাবি তাঁরই হাতে।

কত জন্ম জন্মের বাঁধন পড়িয়া গিয়াছে জীবনে—সংস্কারে মোহে অজ্ঞানে এককে আর বানাইয়া ফেলিয়াছে—প্রাণের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া সব ভস্মসাৎ হউক। আত্মদানের প্রেরণায় কাম প্রেমে রূপান্তরিত হয়, ক্রোধ তেজে, মোহ সৌন্দর্য্যরসে উদ্বেল হইয়া সকল সঙ্কীর্ণতা ঘুচায়; নিজকে বিলাইয়া জীবন ধন্য হয়। নিঃশেষে এ জগতে নিজকে দিয়া যাওয়াই মুক্তি! জগতের বস্তু জগতেই থাকিবে—আমি-আমার দুদিনের ধাপ্পাবাজী মাত্র। জীবনের চরম নিয়তিই হইল এই যে, সে নিজকে দান করিবে।

আত্মপ্রচারের উদ্দাম ব্যস্ততাকে সহজ আত্মানুভূতির প্রেরণায় ফুটাইয়া তোল। এতটুকু আসক্তি এতটুকু মোহ মনের কোণে থাকিলে চলিবে না। জীবন সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মীভূত হইয়া যাইবে—তখন আত্মদান স্বভাব, আলো তখন আলোই করিবে—আর অমাবস্যার ভয় নাই; উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতম অনুভূতিতে মিলাইয়া যাইতে থাকিবে।

জগতের যা কিছু মহৎ, যত কিছু পূর্ণতা, যত কিছু তৃপ্তি—সবি আত্মদানের ফল। আজ জগতের উন্নতি বলিয়া যে যা করিতেছ, তাহা আত্মোন্নতিই মাত্র। আত্মোন্নতি ব্যাপারটাই আত্মত্যাগের অচল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ত্যাগী হই, সেইখানেই বড় হইয়া যাই, বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার গৌরবে প্রাণ পূরিয়া ওঠে। প্রাণের নিগূঢ়তম প্রেরণাই এই যে, তুমি ত্যাগী হইবে—তুমি নিজকে বিলাইবে।

আত্মত্যাগমহিমার পরাজয় নাই কোথাও—সর্ব্বত্যাগী হইয়াও রাজার রাজা। এত দীপ্তি, এত সৌন্দর্য্য, এত পুলক, এত বাণী তোমার মাঝেই ছিল;—যে মুহূর্ত্তে তুমি স্বার্থের আগল খুলিয়া দাঁড়াইলে, অমনি জীবন নূতন ব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে দেখিতেছ, ত্যাগভূত জীবন—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"—ঐ যে সব গৌরবময় আদর্শ দিকে দিকে। তাঁহাদের জীবনের বহিঃপ্রকাশে আড়ম্বরটুকুকেই শুধু লোভীর মত ফাঁকি দিয়া ফলাইতে চাহিও না;—তলাইয়া বোঝ, এই বিপুল আত্মপ্রকাশের মূলে কি অসীম আত্মসম্বরণ ক্ষমতা! সকল কামনা হইতে নিজকে গুটাইয়া আনিয়াছেন—তবেই তপস্যাপরায়ণ জীবনের বহিরুৎসারণ সার্থক হইয়াছে। কারো দিকে চাহিও না—আপন অন্তরে তলাইয়া গিয়া খোঁজ, তুমি কতটুকু দিতে পার, তোমার প্রাণ কি বলে।

ঠিক প্রাণে প্রাণে যে কথাটী বলে, তাহা যদি একবার শুনিতে, চিরন্তন পুলকে পুলকিত হইয়া উঠিতে, চিত্তের সকল জড়তা ঘুচিয়া যাইত। দিতে যে কত আনন্দ, তাহা ধারণা করিবার দরুণ নিজকে প্রস্তুত করা—ইহাই সাধনা। দিবার বস্তু সত্যই তো অসাধনের ধন—কিন্তু দিবার শৈলী সাধনসাপেক্ষ। ফলের লোভে চেষ্টাকে উগ্র করিয়া তোলাকে সাধনা বলে না। চাই অন্তর্দেবতার ইঙ্গিতে একনিষ্ঠ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, সুসমঞ্জস মধুময় জীবনের অনুভব—সব্বার সুর ধরিতে পারা—জীবনে জীবনে ঐক্যতানবাদন! ফল কি হইবে না হইবে, সে হিসাব কে রাখে!

জানিয়াছ, নিজকে না বিলাইয়া মানুষ পারে না। দেখিতেছ, ত্যাগমহিমায় মর্ত্ত্যে অমরাবতীর সৃষ্টি। কিন্তু উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিলে চলিবে না। আত্ম-সাধনা কামাই দিলে চলিবে না। নিজকে দিতে হইবে—নিজকে ধরিয়া রাখিতেও হইবে। অপ্রশান্ত জীবন দ্বন্দ্ববিলসিত—ইহাকে জীর্ণ না করা পর্য্যন্ত অদ্বৈতানন্দ ফোটে না। ভেদজ্ঞান থাকিলে কি বিলানো হয়? আবার অভেদজ্ঞান যখন আসে, তখন দেওয়াই কি আর নেওয়াই কি! সবি আছে—শুধু প্রশান্ত হও; প্রাণের কথাটী শোনাইবার প্রতীক্ষায় ধ্যান ধরিয়া থাক। একদিন সে শুভক্ষণ আসিবে, যখন জীবন আপন সুরে আপনি বাজিবে—স্বতোনির্ঝর প্রেমপ্রবাহে জগৎ ভাসিয়া যাইবে। মনের কোণে এতটুকু কৃপণতাও থাকিবে না—সত্যই তুমি নিজকে দিয়া ধন্য হইবে।

শেষ কথা—কথা কওয়া মানুষের স্বভাব, নিজকে দেওয়া জীবনের নিয়তি; কিন্তু তোমাকে বলি—কথাপ্রসঙ্গে মজিও না, মজাইতে চাহিও না; যাঁহার কথা তাঁহাকে ধরিয়া থাক, কথায় কথায় তাঁহাকে পাও।—দিবার জন্য ভাবনা কি?

হোলি-খেলা

হোলি-খেলা রঙীন্ ফুলে ফুলে—
তাই তো আজি দখিন হাওয়ায় অমন করে দুলে।
আনন্দে আজ দুল্ছে যেন সবার চিত্তদোলা—
এই তো হোলি-খেলা।
বেদনাতে রঙীন্ হল অশোক-ফুলের বন!
(তারা) পায়নি কি সে ধন?
পুলকে আজ উঠ্‌ল কেঁপে বিশ্ববাসীর প্রাণ!
(এই তো) হোলি-খেলার গান!

অবতারের মূল প্রয়োজন

—(*)—

প্রেমে একদিকে মানুষকে কোমল করে, আবার অন্য দিকে জগতের অসংখ্য নির্য্যাতন সহ্য কর্‌বার মত শক্তিও প্রদান করে। কাজেই প্রেমিকের ভিতর যথেষ্ট বলও সঞ্চিত হয়। একদিকে যদিও প্রেমিক ভাবে গদগদ, কিন্তু আসল লক্ষ্য থেকে কোনদিন ভ্রমেও বিচ্যুত নন। বিহ্বলতার মাঝেও যিনি অন্তরে অন্তরে সদাজাগ্রত, তাঁকেই বলি আসল প্রেমিক। তিনি প্রেম স্বীকার করেন, প্রেমে যে মানুষকে বিহ্বল করে তা-ও স্বীকার করেন—কিন্তু যা-ই স্বীকার করেন না কেন, সজ্ঞানে—বেভুলা হয়ে, কিম্বা আবেশে পড়ে নয়। প্রাকৃত জনের সঙ্গে আসল প্রেমিকের এই পার্থক্য। একই ভালবাসা জগতের ছোট-বড় সবার মাঝেই রয়েছে, কিন্তু ভালবাসার তত্ত্ব সবাই জানে না বলেই এই ভালবাসা হতেই হয়ত দিন দিন পতন হতে থাকে। এই যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনিবার্য্য আকর্ষণ—এ কি কেবল বস্তু-পিণ্ডকে উপলক্ষ্য করেই?—না এর মাঝে আরও মহৎ উপাদান আছে, যার অদৃশ্য বলেই মানুষ মানুষকে ভালবাসে—এইটাই ভেবে দেখ্‌বার বিষয়।

প্রথমেই রসের দিকে মন না দিয়ে যদি তত্ত্বানুশীলনে মনটাকে ব্যাপৃত করি, তাহলেই বোধ হয় সবদিকে কল্যাণ হয়। অধিকাংশেরই পল্লবগ্রাহী মন কিনা, তাই উপরভাসা অর্থেই তাদের তুষ্টি। মোট কথা, কোন কিছুই তলিয়ে দেখ্‌বার ধৈর্য্য, শক্তি যেন আমাদের লোপ পেয়ে গেছে।

গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জীবন নিয়ে কতজন কতভাবেই না ব্যাখ্যা করেছেন—কিন্তু জীবনকে তলিয়ে বুঝ্‌বার মত প্রজ্ঞাদৃষ্টি কয়জনার আছে? গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর কথা মনে হলেই সাধারণতঃ অনেকের মনেই কেবল খোল-করতাল নিয়ে উন্মত্ত হয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তন করার কথাটাই আগে উদিত হয়, কিন্তু দর্শনের সেরা কথা যে আত্মানুভব, তাই যে মহাপ্রভুর জীবনের আসল উদ্দেশ্য ছিল, এ কথা আমরা জানি কয়জনা?—আর যদিও জেনে থাকি তা আমাদের অবচেতনাতেই নিরুদ্ধ হয়ে আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

> কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
> যুগধর্ম্ম কালের হৈল সেকালে মিলন॥
> দুই হেতু অবতরি লৈয়া ভক্তগণ।—
> আপনে আস্বাদে, প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

কাজেই মুখ্য উদ্দেশ্য কোন্‌টা, তা স্পষ্টই ব্যক্ত হল। সঙ্কীর্ত্তন করাটা দোষের কিছু নয়, কিন্তু এই সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভবের পিপাসাটাও যদি জাগ্রত থাকৃত, তাহলেই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে চল্‌ছি বলে গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে পার্‌তাম!

মহাপ্রভু জগতে প্রেম-মন্ত্র প্রচার করে গিয়েছিলেন বটে—কিন্তু সে মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি? একটা প্রবাদ আছে, মহাপ্রভুর নাকি ৩½ জন মাত্র অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিল। কথাটা একদিক দিয়ে খুবই খাঁটী। কেননা মহাপ্রভুর জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝ্‌বার মত লোক বিরলই হবার কথা। মহাপ্রভুর জীবনের emotional sideটা আমাদের কাছে যত স্পষ্ট, তাঁর জীবনের আসল philosophyর দিকটা তো তত উজ্জ্বল নয়। মহাপ্রভুকে প্রেমে গদগদ বলেই অনেকে জানে, কিন্তু তাঁর জীবনের ভিত্তিই যে দর্শনের চূড়ান্ত কথা—"আত্মানিং সিদ্ধির" ওপর, এ কথা তো কেউ তলিয়ে দেখি না।

অন্য জায়গায় মহাপ্রভুর অবতরণের মূলপ্রয়োজন ব্যক্ত করতে গিয়ে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়া বা,
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ,
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

"শ্রীরাধিকা যে প্রেমদ্বারা আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেছিলেন, সে প্রেমের মহিমাই বা কি প্রকার? আমার মাধুর্য্যই বা কিরূপ, এবং তার অনুভব হেতু শ্রীরাধিকার যে পরম সুখ, তা ই বা কিরূপ?—এই তিনটী বিষয়ের তত্ত্ব জানবার দরুণই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধাভাবসমন্বিত হয়ে শচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

যে তিনটী তত্ত্বের কথা বলা হল, এ কি কেবল মাত্র "ভাবুকতা" দ্বারাই জানতে পারা যায়? তীব্র অনুসন্ধিৎসা না থাকলে এর তত্ত্ব জানা সম্ভব?

ভালবাসি এই হল চরম কথা—কিন্তু কেন ভালবাসি, সে প্রশ্ন তো আমাদের মনে উদয়ই হয় না। কাজেই বলতে হবে, আমরা ভালবাসি কিন্তু ভালবাসার তত্ত্ব জানি না। এর পরিণামে যা হবার তা-ও হচ্ছে; প্রেমসাগরের অগাধ-জলে কেবল ডুবতেই আছি ডুবতেই আছি—এর দ্বারা জীবনের কোন উন্নতি হচ্ছে না!

আত্মার মাঝে সব রয়েছে, তাই মহাপ্রভু ভালবাসার নিদানও নিজের মাঝেই খুঁজে পেলেন। ভালবাসা কি, ভালবেসে কি সুখ উৎপন্ন হয়, তা তিনি নিজের আত্মাতেই উপলব্ধি করলেন—এর দরুণ বাহিরের কোন আশ্রয় অবলম্বন করতে হয়নি তাঁকে। কাজেই মহাপ্রভুর জীবন থেকে আমরা একটা নীরব সাধনার ইঙ্গিত পাই না কি? তিনি লোককে ভাবে পাগল করেছিলেন—তাঁর সময় নাম-সঙ্কীর্ত্তনে দেশ ভেসে গিয়েছিল—এ কথাই তাঁর জীবনের উজ্জ্বল বর্ণিতব্য নয়—এর চেয়ে বড় কথাই হল জীবনকে আস্বাদন তে হয় কি করে, নিজ জীবনে অসংখ্য প্রকারে ভাবে-ভাষায় তিনি তাই কীর্ত্তন করে গিয়েছেন। অন্তরঙ্গ ভাবে যাঁরা মহাপ্রভুর কথা বুঝতে পেরেছেন, আমার মনে হয় প্রেমে আত্মোপলব্ধির সন্ধান পেয়েই তাঁরা স্তম্ভিত!

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥"

তাই বলে বিহ্বলতাতেই মহাপ্রভুর দিন যায়নি—প্রেমের তত্ত্ব জানবার দরুণ চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাতে হয়েছে তাঁকে! আরও কত ভাব দেখা গিয়েছে মহাপ্রভুর জীবনে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজের মাঝে সমাধান পেলেন তবে ছাড়লেন! বিহ্বলতা তাঁকে আবিষ্ট করেছে, কিন্তু তার কাছে আত্ম-সমর্পণ তিনি করেন নি। বিশেষত্ব যদি থেকে থাকে তাহলে এখানেই রয়েছে!

জগৎকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সে ভালবাসায় নিজকে আস্বাদন করার আকুলতাটাই বেশী ছিল। বৈদান্তিকের মত বিরাট আমির উপলব্ধির দরুণই এত নিদারুণ আকুলতা ছিল তাঁর। ভালবাসতে গিয়ে তিনি নিজকে নিজের মাঝে আরও নিবিড় করে পেলেন। ভালবাসার পথ ধরে নিজকে পাওয়া খুব সহজ বলেই, জগৎকে তিনি অমন করে ভালবেসেছিলেন। নাম প্রচারের চেয়ে বড় একটা উদ্দেশ্য নিয়েই অবতরণ করেছিলেন; সে হচ্ছে—নিজকে প্রত্যেকের মাঝে পাওয়া—এরই নাম বিশ্বপ্রেম

নিজকে আস্বাদন করার দরুণ যে সুতীব্র আকুলতায় মহাপ্রভু দিবারাত্র দগ্ধ হয়েছিলেন—আমাদের মাঝে কি সে আকুলতা জেগেছে? তাহলে মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পন্থায় আমরা চলছি—এ কথা নিঃসন্দেহে কেমন করে বলি! শরীর ভুলে গিয়ে, খাওয়া-দাওয়া ভুলে গিয়ে দিবারাত্র আত্মোপলব্ধির দরুণ আমরা ব্যাকুল হতে পেরেছি! তাহলে আজ প্রত্যেকের জীবনকে উপলক্ষ্য করে—কত দর্শনের সৃষ্টি হত!

আত্মোপলব্ধির অনুসন্ধিৎসাকেও যদি ভাবুকতা বলি, তাহলে মহাপ্রভুর জীবনকে মস্ত বড় একটা ভাবুকতার জীবন বলা যেতে পারে। কিন্তু আবার এ-ও ভাবি, নিজকে না জানার দরুণ, কত মোহে, কত প্রলোভনে পড়ে আমাদের যে আত্ম-অবনতি ঘটছে! প্রত্যেকের মাঝে যদি নিজকে জানার, নিজকে পাওয়ার ভাবুকতা জাগ্রত হয়ে ওঠে, তাহলে বোধ হয় নিজের, দেশের, দশের সবের পক্ষেই কল্যাণ হবে!

উপনিষদে আছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

এ শুধু পুঁথির বচন নয়, মহাপ্রভুর জীবনে প্রত্যক্ষ তার পরিচয় পাই। ধনী দরিদ্র সবাইকে সমান প্রেমে তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন। আমরা বৈষ্ণব-পন্থী – অহোরাত্র কীর্ত্তনে বিভোর, কিন্তু আসল যে প্রেম, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হিংসাশূন্য সহানুভূতি, তা তো আমাদের মাঝে নাই। ভাবুকতা বল ক্ষতি নাই কিন্তু যে ভাবুকতায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মিলনসূত্রকে দৃঢ় করে—ছোট বড়র ভেদকে দূরীভূত করে, সে ভাবুকতাকে শ্রদ্ধা করি। অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখ্লে মহাপ্রভুর জীবনে এরূপ আরও কত কল্যাণকর মহান্ আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়!

যাঁর জীবনকে অবলম্বন করে আমরা আধ্যাত্মিক সকল রকম সমস্যার সমাধান পেতে পারি—তাঁর কাছ থেকে যে কেবল খোল-করতাল নিয়ে কীর্ত্তন করার আদর্শটাই পেয়েছি, একি আমাদের দুর্ভাগ্য নয়? ভাবুকতা করে অল্প তুষ্ট কারা?

মহাপ্রভুর জীবনের গূঢ় রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করে চল্তে পার্লে আমরা এতদিনে এক বীর্য্যবন্ত জাতিতে পরিণত হতে পার্তাম। ভাবুকতা বেড়েছে শুধু আমাদের বুদ্ধির দোষে। নিজকে আস্বাদন কর্বার প্রবল পিপাসা যদি প্রত্যেকের অন্তরেই উদিত হত—তাহলে এতদিনে আবার বৈদিক-যুগের ঋষিসমাজই প্রতিষ্ঠিত হত। প্রত্যেকে যদি অবিকৃত ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পার্ত, তাহলে বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা এই প্রাকৃত জগতেই প্রকট হত। এ তো অসম্ভব নয়—মহাপ্রভু আত্মবলে এই লীলাই দেখিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার মত বল বীর্য্য আমাদের নাই।

নিজকে সংযমের দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে তারপর মহাপ্রভু এত আস্বাদন, এত লীলা করে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁর লীলার অনুকরণ কর্তে গিয়ে, মূলে সংযমের প্রতি দৃষ্টি না রেখে, কেবল অবনতির পথেই দিন দিন অগ্রসর হচ্ছি। নিজের মাঝে সমস্ত তন্ন তন্ন করে না খুঁজে আমরা বহির্দৃষ্টিতে কেবল বাইরে বাইরেই সব হাৎড়িয়ে বেড়াচ্ছি। মহাপ্রভুর জীবন তো আমাদের কেন্দ্রে আত্মাভিমুখী হওয়ার প্রেরণাই বেশী করে দেয় বলে মনে করি। অথচ অনেকে বলেন, মহাপ্রভু "ভাবুকতা" করে দেশটাকে উৎসন্নের পথে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মহাপ্রভু আসলে যে ভাব নিয়ে এসেছিলেন এবং যার দরুণ জীবনব্যাপী সাধনা করে গিয়েছেন, তা যদি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে থাকি, তাহলে আর এরূপ দোষারোপ কিছুতেই কর্তে পার্ব না। আত্মানুসন্ধানকে মুখ্য আদর্শ না ধরে অন্য গৌণ আদর্শকে আমরা ধরে বসে আছি—এ আমাদেরই দুর্ভাগ্য!

নিজকে জানা আর নিজকে আস্বাদন করা—এর মাঝে তো কোন প্রভেদ নাই। কাজেই বৈদিক ঋষিদের মূল মন্ত্র যে "আত্মানং বিদ্ধি" এর সঙ্গে তো মহাপ্রভুর আস্বাদনের কোন পার্থক্যই দেখি না। মহাপ্রভুর জীবনের মূল মন্ত্র যা ছিল, তা যদি আমরা অনুসরণ করে চল্তে পার্তাম, তাহলে আমাদের জীবন রূপান্তরিত হয়ে যেত! কিন্তু সে আদর্শের ধার দিয়েও তো আমরা চলি না!

দৈনন্দিন-জীবনে আমরা আত্মানুসন্ধিৎসার ব্যাকুলতাকে কয়জনে জাগ্রত রেখে চল্‌তে পারি? জীবনে অনেক কিছুই করে যাচ্ছি—কিন্তু মত্ত হয়ে, অজ্ঞানতায় বিমূঢ় হয়ে। সর্ব্বদা আত্ম-চৈতন্য প্রদীপ্ত রেখে যিনি চল্‌তে পেরেছেন—তাঁর জীবন কি আদর্শ জীবন নয়? বাস্তবিকই যদি আমরা মহাপ্রভুর আদর্শ ধরে চল্‌তাম, তাহলে এ জগৎ অমরাবতীতে পরিণত হয়ে যেত এত দিনে। নির্ম্মল প্রেমের আস্বাদনে এতদিনে সবাই পবিত্রোজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত। নিজকে জানার চেয়ে বড় পাওয়া এবং বড় সার্থকতা জগতে আর কি থাকৃতে পারে? মহাপ্রভুর জীবনের এই মুখ্য আদর্শকে ধরে আমরা কয়জনে চল্‌ছি—বলুন তো দেখি?

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—বিহারীদার শরীর আজ অনেকটা ভাল, সুতরাং সকলেই 'খড়শালী' হ'তে বের হ'য়ে পড়লাম। খড়শালী গ্রাম হ'তে সেই ভীষণ শব্দায়মান হৃদয়কম্পিতকারী খরস্রোতা ঝরণার উপরিস্থিত পুলটী পার হ'য়ে, প্রায় মাইল খানেক এসে দু'টী পথের সঙ্গমস্থলে পৌঁছে ভুল করে, নীচের পথে না যেয়ে; আমি একলা উপরের পথে চলে যাই। নীচের পথটীতেই আমাদের যাওয়া উচিত—সেইটীই হনুমান চটীতে যাবার পথ। কিন্তু উপরের পথটি প্রশস্ত দেখায়, ভুলক্রমে উপরের পথ ধরে ক্রমশঃ ৩।৪ মাইল পথ অতিক্রম করার পর, সম্মুখে আর পথ না পেয়ে বুঝতে পারলাম—পথ ভুল করেছি। এটী পাকদণ্ডী পথ—পাহাড়ের স্তরে স্তরে যে সব আবাদী জমি আছে, সেই সব জমিতে যাবার জন্য। পথে একটি লোকও পেলাম না, যাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করি। কারণ এত ঠাণ্ডার দেশে এত সকালে কোন লোক জমির কাজে বা গরু মহিষাদি চরাতে বের হয় না।

আমি জানতাম, হনুমান চটীর পথটী যমুনা নদীর ধার দিয়েই গিয়েছে। সে পথে চলবার সময় যমুনা মাঈর একটানা শ্রুতিমধুর অনাহত নাদ সর্ব্বদাই প্রাণে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়। কিন্তু এখান হতে তার কোন সাড়াশব্দ না পাওয়ায়, পথ ভুল হ'য়েছে বেশ বুঝতে পারলাম। যে পথে এতদূর এসেছি, যদি আবার সেই পথেই ফিরে যাই, তা'হলে অনেক ঘুরতে হবে বলে, আমি ক্রমশঃ স্তরে স্তরে সজ্জিত আবাদী জমীর ভিতর দিয়েই খাড়া নীচে নামতে লাগলাম। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, খাড়াভাবে নীচে নাম্‌লেই, পথটি পাব; কেননা নদীর এপারেই যে পথ আছে, তা'তো জানাই আছে। সুতরাং সীধা নীচে নামতে লাগলাম। এটী পথ না হওয়ায় নানাপ্রকারি জঙ্গলা গাছে আবৃত থাকায়, কোন কোন স্থানে জোয়ার-ভুট্টার গাছের ভিতর দিয়েও উৎরাই করতে হল। কিন্তু উৎরাই করতে খুব কষ্ট হতে লাগলো—কাঁটা-গাছে শরীরের অনেক জায়গায় রক্তপাত হয়ে গেল। তবুও উদ্যমভ্রষ্ট না হয়ে খাড়াভাবে এক মাইলেরও বেশী

নামার পর, প্রকৃত পথটি পেয়ে, নিশ্চিন্ত-মনে ধীরে ধীরে চলে বেলা ১০ টার সময় **'হনুমান চটী'**তে যেয়ে পৌছি।

সঙ্গীয় অনেক লোকই আমার মত পথ ভুল করে,

হনুমান চটী ৪ মাইল

ও পথে রওনা হয়েছিল। তবে তাদের সঙ্গে পাহাড়ীদের দেখা হওয়ায় তারা বিশেষ কষ্ট পায় নাই। কিন্তু বৃন্দাবনের মাতাজীগণ কাল আমার মতই পথ ভুল করে, ৪ মাইল পথ অতিরিক্ত হেঁটে কষ্ট পেয়েছিলেন। দু'টী পথের সঙ্গমস্থলে কোন নিদর্শন না থাকায়, অনেক লোককেই এই ভাবে কষ্ট পেতে হয়। সুতরাং যারা এ পথে ফিরবেন, তারা যেন নীচের পথেই ফিরেন।

হনুমান-চটী অত্যধিক স্যাৎসেঁতে জায়গায় অবস্থিত—থাকার বিশেষ অসুবিধা। বৃন্দাবনের মাতাজীগণ কাল এখানে এসেছেন, এবং আমরা কাল না আসায় বিশেষ উৎকণ্ঠিতভাবে কাল যাপন করেছেন, এর উপর আবার তাদের সকলেরই বসন্ত হয়েছে। কয়েক দিন আগে তাদের সকলেরই জ্বর হয়েছিল—

পিশুর অত্যাচার

আজ জ্বর নাই, সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, শরীরে বসন্তের মত অসংখ্য ফুস্কুড়ী। আমরা চিন্তিত হলাম, কি করা যায়? অথচ এ পথে কারো তো বসন্ত হয় নাই জানি, তবে এদের হল কেন? অনেক অনুসন্ধানের পর বুঝলাম, **পিশু** নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জাতীয় বিষাক্ত পোকা স্যাৎসেঁতে জায়গায় বাস করে, সেই পোকা কাটলেই, ঐ প্রকার ফুস্কুড়ী বের হয়ে, ঘা হয়ে খুব কষ্ট হয়। এদেরও সেই পোকা কাটার জন্যই ঐ অবস্থা হ'য়েছে। এতে শরীরে বেদনা হ'য়ে অনেক সময় জ্বরও হয়—ঘাও হয়। এ বিষাক্ত ঘা শুকাতেও অনেক সময় লাগে। কাজেই স্যাৎসেঁতে জায়গায় সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রাখা উচিত—যাতে কোন পোকা কাটতে না পারে। আমাদের সেই অব্যর্থ মহৌষধ **কানাইয়া লতা** বা **কানচিরা লতা** জোগাড় করে লবণ দিয়ে চটকিয়ে, তার রস তাদের মালিশ করতে দিলাম। তাতে শরীরের সবগুলি ফুস্কুড়ী সেরে চলে গেল বটে, কিন্তু কয়েকজনের পায় পরে ঘা হয়েছিল। সে ঘা শুকাতে, অনেক কষ্ট পেতে

পিশুর মহৌষধ

হয়েছিল, বোধ হয় পরে আবার **পিশু** কাটার জন্যই এবং ঠিক মত ঔষধ ব্যবহার না করার জন্যই ঘা হয়েছিল। দ্বিপ্রহরে এখানেই থাকা গেল।

উক্ত কানাইয়া লতার আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। পাঠকদের জানিয়ে রাখি, যদি কাহারও কোন উপকারে লাগে। কোন প্রকার হাত-পা ফুললে বা বাতের ব্যথা হলে, উক্ত কানাইয়া লতা,

কানাইয়া লতার গুণ

ডগা, পাতা, শিকড় সহ তুলে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে, কাপড়ে পুঁছে নিয়ে, লবণ দিয়ে চটকালে যে রস বাহির হয়, সেই রস ব্যথিত-স্থানে তিন চার ঘণ্টা পর পর মালিশ করিলে ২।১ দিনের মধ্যেই উক্ত ফোলার ব্যথা আরোগ্য হয়; এমন কি ফোঁড়া বাগী পর্য্যন্ত বসে যায়। এ ছাড়া উক্ত ডগা পাতা শিকড় সহ তুলে, পরিষ্কার করে, পুরুষের হলে আদার সহিত এবং স্ত্রীলোকের হলে গোলমরিচের সহিত, সমভাবে ভালরূপ বেঁটে কার্ব্বাঙ্কলের উপর, কোন প্রকার বিষ-ফোঁড়ার উপর, শৃগাল, কুকুর, সর্পাঘাত, ভীমরুল, বোল্‌তা প্রভৃতি বিষাক্ত হিংস্র জন্তুর দংশিত স্থানের উপর প্রলেপ দিতে হয় এবং সর্পদংশিত লোককে উপরোক্ত নিয়মে আধতোলা মাত্রার সেবন করিয়ে দিলে সর্পাঘাতেও রোগী মরে না—**অতি আশ্চর্য্য মহৌষধ**। এ লতাটির পরিচয় পূর্ব্বেও দিয়েছি, তথাপি পুনরায় লিখ্‌ছি সকলেরই জেনে রাখা উচিত। সাধারণতঃ জলের ধারে স্যাৎসেঁতে জায়গায় অর্থাৎ ঠাণ্ডা জায়গায় উক্ত লতা হয়। গাছটি লতান এক-হাত দেড় হাত লম্বা; বাঁশের পাতার মত ২।৩ ইঞ্চি লম্বা পাতা, ডাঁটা গোল, পাতার গোড়াতে খুব ছোট্ট

নীলবর্ণের ফুল হয়। ডাঁটাটি ভেঙ্গে টিপলে আঠা আঠা রস বের হয়। পশ্চিম-বঙ্গে একে **কান-চিরা** গাছ বলে।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, আমাদের সঙ্গে পাগলীমার দলের তিনজন মা ছিলেন, যাদের টাকা না আসায়, আমরা দেবপ্রয়াগে ছেড়ে এসেছিলাম। আমরা আসার পর, পাগলী-মা দেবপ্রয়াগে আরও দু'দিন অপেক্ষা করার পরও টাকা না আসায়, আমাদের পাণ্ডার ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীযুত বাঁকেবিহারীলালের নিকট হ'তে দশটী টাকা কর্জ্জ নিয়ে যমুনোত্তরীর পথে বের হয়ে পড়েন। তারপর ধরাসু জংশন হতে পথ ভুল করে গঙ্গোত্তরীর পথে নাকুরী চটী পর্য্যন্ত যেয়ে, নাকুরী চটী হতে পাকদণ্ডীর পথে ভীষণ কঠিন চড়াই উৎরাই করে, সিমলী গঙ্গানী (এ পথে আমরা এসেছি) হয়ে আজ সকালে হনুমান চটীতে এসে আমাদের সঙ্গে মিলেন। তাঁরা যখন সেই ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ পাকদণ্ডী পথে নাকুরী হতে ১৪॥০ মাইল দূরবর্ত্তী সিমলী চটীর দিকে রওনা হন, সেদিন ৯ মাইল পথ অতিক্রম করবার পর, রাত্রি হওয়ায়, সেই জন-মানবশূন্য হিংস্র-জন্তুসমাকুল পার্ব্বত্য শিখরে উন্মুক্ত আকাশতলে ৩জন স্ত্রীলোক সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটিয়ে, খুবই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আজ তাঁরা আমাদের দেখে যে কি আনন্দই পেলেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁরা যমুনোত্রী দর্শনের জন্য রওনা হয়েছেন, আমরা তাঁদের পথের সমুদয় বিবরণ জানিয়ে দিয়ে রওনা করে দিলাম এবং পথে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করবো বলে দিলাম। তাঁরা আনন্দান্তঃকরণে রওনা হয়ে গেলেন।

আমরা দ্বিপ্রহরের আহারের পরই বিশ্রাম না করেই বের হয়ে পড়ি। দু' [illegible] পরই **রাণাগাঁও** চটী। রাণাগাও ১০ নং মাইল-ষ্টোনের নিকট হতে, ঝরণার পাশ দিয়ে একটু উপরে অবস্থিত—যাবার সময়ই এ সংবাদ পাঠকদের জানিয়েছি। ক্রমে আমরা

রাণাগাঁও
২ মাইল

পূর্ব্বকথিত মত কয়েকটি চড়াই উৎরাই (যাবার সময় যে পথ চড়াই ছিল, সেগুলি উৎরাই, উৎরাইগুলি চড়াই—সমস্ত পথই এইরূপ জেনে রাখবেন) শেষ করে, যমুনার উপরিস্থিত পুলটী পার হ'য়ে যমুনা নদীকে বাঁ হাতে রেখে ক্রমে ছোট ছোট চড়াই উৎরাই করে **ওজরী** বা **বজরী** চটীতে যেয়ে পৌছি। রাণাগাঁও হতে ৪॥০ মাইল। বিকেলে ৬॥০ মাইল, সকালে ৪ মাইল—মোট ১০॥০ হাঁট্‌লেও আমার কিন্তু ৫ মাইল বেশী হাঁটা হয়েছিল। যাবার দিন আমরা এখানে থেকে গেছি—পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে। এখানে আজও অনেক দুধ পেলাম—।/০ আনা সের, চিনি কিন্তু টাকায় /৮ তিন পোয়া, চাউল /১॥০ সের /২ সের।

ওজরী বা বজরী
৪॥০ মাইল

১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৬মে বৃহস্পতিবার—

সকালে ওজরী হতে বের হয়ে ক্রমোচ্চ পথে আধ মাইল চড়াই করেই খাড়া উৎরাই করতে লাগলাম। উৎরাইটী বেশ কঠিন—বিশেষ সাবধানের সহিত উৎরাই করতে হল। বৃষ্টির জন্য অনেক জায়গায় পাহাড় ধসে যাওয়ায় পথ লুপ্ত হয়ে গেছে—পাথরগুলি এলোমেলো ভাবে পড়ে অনবরত পায়ে ঠোক্কর লাগাচ্ছে—অতি সাবধানের সহিত উৎরাই করে যমুনার উপরিস্থিত পুলটী পার হয়েই **যমুনা** চটী—ওজরী বজরী চটী হতে দু' মাইল। যাবার দিন দুপুরে আমরা এখানে বাস করে গেছি। যমুনা চটী হতে ক্রমোচ্চ চড়াই পথে ১½ মাইল পথ অতিক্রম করবার পর **কোৎনোর** বা জগন্নাথ চটী। এ স্থানটী হনুমান চটীর মতই অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে। এখান হতে বের হয়ে ক্রমশঃ চড়াই উৎরাই করতে করতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে **গঙ্গানী** চটীতে যেয়ে পৌছি। যাবার দিন সকালে বিকেলে দু'বেলাতে এ পথটী

যমুনা চটী
মাইল

কোৎনোর বা জগন্নাথ চটী
১॥ মাইল

অতিক্রম করেছিলাম, কিন্তু আজ সকালবেলাই এ পথটা অতিক্রম করলাম, ৮½ মাইল পথ। স্থানটার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে আজ এখানেই থাকা স্থির করলাম।

গঙ্গানী
৫ মাইল

ধর্ম্মশালাটী টিহরী সরকারের। এখানে বাবা কালীকম্বলীবালার দু'টী সদাব্রতও পেলাম—তার মাঝে খোসাসহ ছোট মটরের ডাল ছিল। হিমালয়ে আর কোথাও ছোট মটরের ডাল দেখিনি। সদাব্রত দিল বটে, কিন্তু ঘী দিতে নারাজ, যষ্টিদেবতা প্রদর্শন মাত্রেই বিনাবাক্যব্যয়ে দিয়ে দিল—যাবার দিনের ঘটনা দোকানদারের বেশ মনে ছিল কাজেই এবার আর কোন গোল করে নাই। রাত্রে মুষলধারে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই—তবে বেশ শীত লেগেছে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ২৭মে শুক্রবার—প্রাতে উঠেই দেখি আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। রওনা হতে দেরী করলাম। দেখ্তে দেখ্তে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুষলধারে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে ভাসিয়ে দিতে লাগলো—বাধ্য হয়ে সকালে আর বের হলাম না। দ্বিপ্রহরের আহারের পর বেলা ৪টার সময় বের হয়ে, ১½ মাইল দূরে সিমলী চটীতে যেয়ে আড্ডা নিব স্থির করি। পথে বের হয়েই দেখি, অন্য একজন শেঠের ডাণ্ডীকাণ্ডী চলেছে—তবে সেরূপ বড় নয়—সঙ্গে নেপালী সিপাহী। দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে সিমলী চটীতে পৌছে দেখি—চটীর ঘরটী লোকে লোকারণ্য। কি করা যায়, অগত্যা প্রথম বারের সেই রন্ধনস্থল আলুবখরা গাছের নীচেই আড্ডা নিলাম। চিদানন্দদা ও বিহারীদা গঙ্গানী চটীতেই থাকলেন—তাঁরা ভেবেছিলেন কাল খুব সকালে বের হয়ে পথে আমাদের সঙ্গে এসে মিশ্‌বেন। এই **সিমলী** চটী হতেই খুব বড় পাকদণ্ডী চড়াই পার হয়ে, পরে পুনরায় উৎকট চড়াই করে নাকুরী চটীতে যেয়ে গঙ্গোত্তরী পথে মিলতে হবে। এইটি খুব বড় চড়াই-উৎরাই পাকদণ্ডী পথ। সিমলী চটী হতে নাকুরী চটী ১৪½ মাইল, সুতরাং কত বড় চড়াই উৎরাই, বুঝে নিন! যে নেপালী সিপাহিটীর সঙ্গে এলাম, খানিক বাদে তার কর্ত্তা এসে হাজির হ'ল। তাকে দেখে বাঙ্গালী বলেই মনে হওয়ায় তার সঙ্গে বাঙ্গলাতে কথা বললাম। তিনি বাঙ্গালী না হলেও বাংলা দেশের জলপাইগুড়িতে তিন পুরুষ হ'তে বাস কচ্ছেন, কাজেই বেশ ভাল বাংলা জানেন; বাঙ্গলা লিখ্‌তে-পড়তেও পারেন, চালচলনও বাঙ্গালীর মত, বয়স অল্প ২০।২২ বৎসর হবে, নাম বদরী নারায়ণ দাগা। জলপাইগুড়ি ও কলিকাতায় দোকান আছে। তিনি তাঁর অতি বৃদ্ধা ঠাকুরমাতাকে তীর্থপ্রদর্শন মানসে গ্রীষ্মের বন্ধের সময় সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তা ছাড়া এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন—রেজাল্ট্ এখনও বের হয় নাই। তীর্থভ্রমণ জনিত পুণ্যের জোরে যদি পরীক্ষায় পাশ হওয়া হওয়া যায়, এও যেন একটি কারণ! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কয়দিন এক সঙ্গে ছিলাম, খুব আনন্দেই কাটিয়েছি।

সিমলী চটী
২ মাইল

গ্রীষ্মের বন্ধের সময় বাংলার ছাত্রবৃন্দ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানা জায়গায় চেঞ্জে যেয়ে থাকেন। তাঁরা যদি এদিক ওদিক চেঞ্জে না যেয়ে প্রত্যেক বৎসর হিমালয়ের যে কোন প্রান্তে দু'টী মাস প্রকৃতির কোলে খেলা-ধূলো করতে আসেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তারা "ক্ষয়ের" হাত হলে মুক্ত হয়ে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ শরীরকে আবার স্বর্ণবর্ণ ও সজীব করে তুলতে পারেন। হিমালয়ের প্রত্যেক কন্দরেই নানা প্রকার চিত্তগ্রাহী প্রাকৃতিক দৃশ্য বিদ্যমান। নিত্য নূতন নূতন স্থানে থেকে থেকে নিত্য নূতন নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্‌লে, যেমন একদিকে চিত্ত নির্ম্মল হয়ে নানা প্রকার প্রাকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়, তেমনি অন্যদিকে নিত্য পাহাড় চড়াই-উৎরাই করতে

করতে রীতিমত পরিশ্রমের ফলে, অজীর্ণাদি নানা প্রকার রোগ হতে মুক্ত হ'য়ে আবার তারা বিরস ভীতিযুক্ত বদন গোলাপী আভায় উজ্জ্বল করতঃ এক স্বর্গের শিশুরূপে পরিণত হতে পারে। দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য দেশে প্রতিদিন হোটেল চার্জ্জ ৮।১০৲ টাকা করে দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যেই তারা যত টাকা নষ্ট করে আবার বাংলার কোলে ফিরে আসেন, হিমালয়ের পথে প্রত্যেক দিন এক টাকা করে খরচ করে, একটু বিবেচনা মত স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি লক্ষ্য করে চল্লে, ঐ টাকাতেই দু'টী মাস অনায়াসেই কাটায়ে পূর্ণস্বাস্থ্য নিয়ে হাস্তে হাস্তে ফিরে আস্তে পারেন। তবে এর জন্য কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া দরকার বটে!—সঙ্গীরও বিশেষ আবশ্যক। আমি জানিনা, হিমালয়ের মত অত পবিত্র পাথর-চুয়ান কাকচক্ষুর মত পরিষ্কার নির্ম্মল জল, অমন নির্ম্মল বায়ু পৃথিবীর আর কোন দেশেও আছে কিনা! আমি অনুরোধ কচ্ছি, প্রত্যেক বৎসর যাদের সুবিধা আছে অর্থাৎ যারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ২।১ মাস এদিক-সেদিক ঘুরে থাকেন, তারা যেন স্বর্গভূমি হিমালয়ের কোলে এসে দু'টী মাস কাটিয়ে যান। অবশ্য দার্জ্জিলিং, সিমলার মত সৌখীনতার স্থান এখানে নাই, কিন্তু এখানে যে আনন্দ সর্ব্বদার জন্য বিরাজিত, সে আনন্দ সারা জীবন দার্জ্জিলিং-বাসীর ভাগ্যে জোটে কিনা বিবেচ্য! কেবল ছাত্রদেরই অনুরোধ কচ্ছি না, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদেরও বিশেষভাবে অনুরোধ কচ্ছি।

সিমলী চটী যমুনোত্তরী হতে ২৪॥০ মাইল। এটী জংশন বিশেষ—এই পথেই আমরা যমুনোত্রী গিয়েছিলাম। এখান হতে অন্য পথে উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী যেতে হবে। এখান হতে উত্তরকাশী ২০॥০ মাইল, কিন্তু ১০॥০ মাইলের পূর্ব্বে কোন চটী নাই। ১০॥০ মাইলেও যে চটী আছে, তাও অতি খারাপ, কাজেই কাল তার পরের চটী নাকুরীতে (১৪॥০ মাইল) যেয়ে থাক্তে হবে।

এখানে একটি খুব ভাল এবং বড় ঝরণা আছে—যাবার সময় পাঠকদের জানিয়েছি। আজ দেখ্তে পেলাম, তার পার্শ্বে অনেক 'পুদিনা' জন্মে আছে। বড়মা, ছোটমা চাটনীর জন্য অনেকগুলি পুদিনা তুলে নিলেন। কলিকাতায় যে পুদিনা বিক্রি হয়, হিমালয়ের পুদিনা তার চেয়ে অনেক সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত—বোধ হয় উপকারিতা হিসাবেও বেশী ফলপ্রদ। দেবপ্রয়াগে পাণ্ডার ভ্রাতুস্পুত্র বাঁকেবিহারীলালজী আমাদের শুকনো পুদিনা দিয়েছিলেন, তা' অনেকদিন চাটনীর কাজে লেগেছিল।

নন্দগাঁও

এই সিমলী চটীর অনতিদূরে **নন্দগাঁও** অবস্থিত। অনেক যাত্রী নন্দগাঁও যেয়েও আড্ডা নেয়। পূর্ব্বে এই সিমলী চটী ছিল না, তখন সকল যাত্রীকেই নন্দগাঁও যেয়ে থাকতে হ'ত। গ্রামটী সমৃদ্ধিশালী ও বেশ বড়।

আলুবখ্‌র গাছের নীচে, শুয়ে শুয়ে পাতার আড়াল হতে আকাশের তারা গুণবার সময়, পবনদেবও সুমধুর বসন্তের বায়ু সঞ্চালনে কোন্ সময় যে ঘুমের কোলে এলিয়ে দিয়েছিলেন—জানি না! কিন্তু রাত দুটোর সময় প্রবল জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় অমন সুখের নিদ্রাটি ভেঙ্গে যেয়ে খানিকক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজার পর, ভিজে কাপড়াদি সহ অনেক চেষ্টা করে, দোকানদারের যাত্রীদের থাকার ঘরটীতে ঢুকলাম—যদিও ঘরটী লোক লোকারণ্য ছিল। ঢুকবার সময় অন্যান্য লোকগুলি যথেষ্ট আপত্তি করলেও কিন্তু কারও কথা গ্রাহ্য না করে, ঘরের ভিতর ঢুকে জায়গা করে নিলাম। নতুবা যাব কোথায়? কিন্তু তাতেও কোন সুখ হল না—ঘরের ভিতরও বেশ জল পড়ে—জামা-কাপড়াদি ভিজে কাদা হয়ে গেল। এর চাইতে গঙ্গানী চটীতে থাকাই বরং সুবিধা ছিল। আমরা মনে করেছিলাম, দেড় মাইল পথ এগিয়ে থাকি, সকাল বেলা চড়াই করতে বেশ সুবিধা হবে। কিন্তু রাত দু'টো হ'তে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে সুখটা উল্টো হয়ে গেল!

২৪ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—আজ আমাদের খুব বড় চড়াই করে যেতে হবে। এত বড় লম্বা চড়াই উৎরাই আজ পর্য্যন্ত আর করতে হয় নাই। রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ভিজে-কাকের মত ফুলে গেছি, অধিকন্তু ঘুমাতে না পারায় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার জন্য সকলেরই শরীর খুব দুর্ব্বল হয়েছে। তা সত্বেও অতি ভোরে কাদামাখান ভিজা-কাপড়গুলি গাঁঠরি বেঁধে ঘাড়ে ফেলে বের হয়ে পড়্‌লাম। তবে এদিকটায় শীত বেশী নয়—ঠিক বাংলার বসন্তকালের মত। নতুবা কাল বৃষ্টিতে যে কি অবস্থা হতো কে জানে ?

তখনও আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। আমাদের সমুদয় জিনিষই তো ভিজে, সুতরাং বৃষ্টি হলেই বা নূতন কি ভিজবে বা নূতন রকম আর কি কষ্ট হবে ?—ভেবে বের হ'য়ে পড়্‌লাম। অত্যধিক নিবিড় বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্রমে ৬ মাইল চড়াই করে বেলা ৯ টার সময় পর্ব্বতের শিখর দেশে পৌছে, পাগলীমার বর্ণিত তাঁদের যাবার সময়ের রাত্রিকার আবাসস্থল (যেখানে তাঁরা তিনজন মাত্র স্ত্রীলোক রাত কাটিয়েছিলেন) দেখলাম। পর্ব্বতের শিখর-দেশ হ'তে চারিদিকের দৃশ্য কি সুন্দর ! কি হৃদয়া-কর্ষক ! কি শান্তিপ্রদ ! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির মধুর-লীলা দেখ্‌তে লাগ-লাম। হৃদয়ে এক অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ বইতে লাগলো। পরিশ্রম সার্থক হল ! শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রাণ-ভরে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলাম !

তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, এবং নিবিড় বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ ব'লে রোদের তাপে ক্লিষ্ট হ'তে হয় নাই। উৎরাই করতে লাগলাম। শিখর-দেশ হতে ৪॥০ মাইল উৎকট উৎরাই করে বেলা ১০॥০ টার সময় **সিঙ্গোট** চটীতে পৌছি। চটীটি খুব খারাপ, কোনরূপে কাজ চালান গোছের। শুধু কিছু আমদানীর একটি পন্থা করে রেখেছে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য-শূন্য ! পার্শ্বেই প্রকাণ্ড ঝরণা—তাতে অনেক বড় বড় টেংরামাছ আপন মনে হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে। তখন আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—আবার অন্যদিকে অনেকক্ষণ হ'ল বাদল কেটে যেয়ে, প্রচণ্ড রৌদ্রের কিরণে প্রাণ আইঢাই কচ্ছে। সুতরাং এ হেন খারাপ চটীতেই দ্বিপ্রহরের আহারের ব্যবস্থায় লাগ্‌তে হল। খাওয়া-দাওয়ার পরই আবার উৎকট উৎরাই করতে লাগ্‌লাম। ৪ মাইল উৎকট উৎরাই করার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই **নাকুরী** চটীতে একজন ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে আশ্রয় নিলাম। **ধরাসু জংশন** হতে যে পথটী গঙ্গোত্তরীর দিকে গিয়েছে, আমরা সেই পথের **নাকুরী জংশন** এসে পৌছেছি। পাগলীমার দল, ধরাসু জংশন হতে পথ ভুল ক'রে, এই নাকুরী চটী হতেই এই উৎকট চড়াই উৎরাইটী পার হ'য়ে যমুনোত্রী গিয়েছে।

সিঙ্গোট চটী ১০॥০ মাইল

নাকুরী জংশন ৪ মাইল

ব্রহ্মচারিজীর আশ্রমটী ভাগিরথী গঙ্গার পশ্চিম-পারেই ভারী সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। আশ্রমটিও অতি মনোরম—আখরোট, আলুবখরা, কলা, পেয়ারা, আম, চালিতা, লোকাট, লেবু, কমলা, বড় এলাচি, বেদানা প্রভৃতি ফলের গাছ, এবং গোলাপ, করবী প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলের গাছে পরিশোভিত। একটি ঝরণাও পাহাড় হ'তে নালা কেটে এনে, পাইপ সংযুক্ত করে, আশ্রমের পাশ দিয়েই বইয়ে দিয়েছে—এতে আশ্রমটির সৌন্দর্য্য অনেক বেড়েছে। ফল, ফুল, জল, লতা-পাতায় পরিশোভিত পর্ব্বতের কোলে এমন সুন্দর আশ্রম হিমালয়ে আর দেখি নাই। নানাপ্রকার পক্ষীও যেন এ হেন মনোমুগ্ধকর সুন্দর স্থানে আশ্রয় নিয়ে, আপন আপন আনন্দের ধ্বনিতে চারিদিক মাতিয়ে তুলছে। আজ এখানে

"বৌ কথা কও" পাখীর ও কোকিলের সুমধুর ধ্বনি শুনতে পেলাম। বাংলার দাঁড়কাক, পাতিকাক, শালিখও কয়েকটী দেখা গেল। টিহরী হ'তে বের হ'য়ে পথে আর কোথাও, "বৌ কথা কও" পাখী, কোকিল, কাক, শালিখ প্রভৃতি দেখি নাই।

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী গিরি মহাশয় ১৪ বৎসর হ'ল আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর শিষ্য সদানন্দ গিরি মহাশয় বর্ত্তমানে আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক। আশ্রমসংলগ্ন একটি শিবালয় ও দোতালা-ধর্ম্মশালাটিরও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। অর্থাভাবে ধর্ম্মশালাটি নষ্ট হবার জোগাড় হয়েছে। আমরা তাঁর আশ্রমস্থিত দোতালা-ধর্ম্মশালার উপরের তলে আশ্রয় নিলাম। ব্রহ্মচারীজি অতি অমায়িক লোক এবং মিষ্টভাষী। তিনি কতকগুলি পাকা-আলুবখরা এনে আমাদের উপহার দিলেন। আজকের মত শান্তিতে পথে আর কোথাও থাকতে পারি নাই। আশ্রটিতে যেন সদাশান্তি বিরাজিত। ধরাসু জংশন হ'তে নাকুরী চটী ১২ মাইল—পথে তিন মাইল পূর্ব্বে অর্থাৎ ধরাসু হতে ৯ মাইল দূরে ডুণ্ডা নামে একটি চটী আছে। এই নাকুরী চটী হ'তে গঙ্গোত্তরী ৬২ মাইল পথ। এই নাকুরী চটীতে একটি মাত্র দোকান আছে। সেই দোকান হ'তে চাল আলু এনে রাত্রিবেলা আলুভাতে ভাত খাওয়া গেল। যমুনা নদীর ধার ছেড়ে আজ আমরা ভাগিরথী গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন বরাবর ভাগিরথী গঙ্গার ধারেই কিছুদিন অতিবাহিত করতে হবে।

ডুণ্ডা চটী
৯ মাইল

(ক্রমশঃ)

"ভিখারিণী মেয়ে"

ধনীর দুলালী কহে,—"কাঙ্গালিনী মেয়ে!
গলে মোর মোতিমালা, দেখ্ তুই চেয়ে;—
চারু অঙ্গে উছলিছে উজল ভূষণ—
আমি যেন নিখিলের অনন্ত যৌবন।
তোর তরে কেহ নাই,—মোর তরে সবে,
বৃথা জন্ম তোর বালা এ বিপুল ভবে!"

সন্ন্যাসিনী হাসি কহে, "মূর্খ বালিকা,
আমি দিছি বিলাইয়া মুকুতা-কণিকা;
মহাদরে তাই তুমি নিছ তুলি গলে।
মোর ত্যাগ সোণা হয়ে তব দেহে জ্বলে!
আমি কে দেখ না তুমি দেখে জগন্নাথ—
ভক্তিধন নিয়ে বোন করি প্রণিপাত।
সেই ধনে আমি ধনী, তুমি ভিখারিণী;
মণি-মুক্তা নাহি মোর তবু রাজরাণী।"—

কাজের নেশা

—*‡0‡*—

ভরপুর কাজের উপর কাটাতে পারলে মনটা খুব ভাল লাগে সেদিন। কাজকে ভয় করে জগতের কাছে ঋণী থেকে কখ্খনো সুখ পাইনি। ওপরবালা অনেকেই আছেন—হয়ত তাঁদের কাজ শুধু তাড়া দেওয়া; কিন্তু আপন খুসীতে কাজ বেছে না নিলে তাঁরা খুসী হতেন কি? তাই কাজ করেই এসেছি—করাতে হয়নি কোনদিন। আমার কত স্বাধীনতা, বসে থাকবার কত ফিকির—কিন্তু না, কাজ না হলে চলে না এক মুহূর্ত্ত—কাজ আমাকে ভালবাসে, আমাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না।

উপনিষদের সেই শ্লোকটী আমার খুব ভাল লাগে—কি প্রাণের জোর তার মাঝে—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ!"

—আমরা খেটে খাব, পুরোপুরি একশোটী বচ্ছর বেঁচে থাকব। সুন্দর সরল কথা—সহজ গর্ব্বের চূড়ামণি। কাজের সংসারে আছি আমরা—এতে আমাদের সঙ্কোচ নাই, ইহকালে পিছিয়ে থেকে পরকালের মুক্তি আমরা চাই না! যারা একথা বলেছিল, তাদের আমরা প্রাণ ভরে শ্রদ্ধা করি—যেন তাদের মতন হতে পারি। কর্ম্ম আমাদের বাঁধবে না, জীবন অন্ধকার করবে না—আমরা কাজের তত্ত্ব পেয়েছি, কাজ আমাদের চিরসাথী।

"ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"—

অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথা! লিপ্ত হই আমরাই, কাজ তো আমাদের লিপ্ত করতে চায় না। যার কোন কাজের বালাই নাই, কাজই তাকে খুঁজে বেড়ায়। আবার মন যখন খারাপ হয়—কাজে নামলে সব খোলাসা হয়ে যায়; কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি—একটুও মিথ্যা নয়। মনের আনন্দে কাজে নেমে পরখ্ করে দেখা কথা এ। কাজ আমাদের বাঁধে না, বরং মনের গোমর থেকে মুক্তি দেয়।

তোমরা কাজে হয়রাণ হও? বুঝি প্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ করনি কোথাও! তাদের কাজকেই বলি অনায়াস খেলা—নিজের মনটীকে যারা ভুলেছে! যেমন শিশুর জীবন।—সে কাজ করে না, অথচ বসেও থাকে না। আনন্দ তাকে মাথায় করে নেচে বেড়াচ্ছে! তার কামাই নাই, রেহাই নাই—সর্ব্বদাই খুসীর খেলায় বোঝাই সে! অমনি জীবন কি আমাদেরও হয় না?

কাজকে যে চাপ মনে কর্ব্বে, কাজ তাকে চেপে ধর্ব্বে—প্রকৃতির আইন এ। আবার চাপ না পড়্লে কেউ খাঁটী হয় না। হাজার হাজার বছরের চাপে কালো কয়লা, সেও হীরা হয়ে যায়; আর মানুষ তো মানুষ—তার যে অসাধ্য কি, তা তো ভেবেই পাই না।

কাজ থেকে যারা মুক্তি চাও, প্রেমের মন্দাকিনীতে তারা না'ও নি বুঝি! কাউকে ভালবেসে যে কাজ কর, পরকে খুসী করবার নিঃস্বার্থ গরজে আপন খুসীতে যে কাজ কর—সে কাজ কি শুধুই কাজ? না আরও কিছু? মনে পড়ে জীবনে ও অমৃত কখনো পেয়েছ? পাওনি? বিশ্বাস করব না! নৈলে আছ কি করে? তোমার জন্য কাজের বাঁধনে বাঁধা পড়ে কেউ যদি না খুসী হত, তোমার এই শরীরটা পর্য্যন্ত গড়ে উঠত না! মন তো দূরের কথা।

বসে বসে ভাবি, কবে তাঁর কাজের নেশায় পাগল করবে আমাকে! অষ্টপ্রহর কাজে কাজে শ্বাস ফেলবার অবসর পাব না—ঐ তো আমার চরম মুক্তি, জীবন্মুক্তি—মরে গিয়ে কাজকে হারিয়ে কোন্ মুক্তি, তার ভরসা বড় বিশেষ করি না! যা হবে, এইখানেই হোক না!

কাজে কাজে যেন আমাকে হারাই—কাজকে যেন না হারাই। একটুখানিক আত্মহারা কাজে কি যে—সুধা ঢেলে দেয় প্রাণে—কাজ ছেড়ে প্রাণ বাঁচে কখনো?

সেবা বলে কাকে, জান?—যে কাজ ভাল-বেসে করা হয়। সে কাজ মা-বাপ করেছেন, গুরুদেব কর্‌ছেন, স্বয়ং ভগবান্ চিরকাল কর্‌বেন। কাজকে বঞ্চিত রেখে আয়েসের লোভকে কখনো মুক্তিপিপাসা বল্‌ব না।

কর্ম্মযোগ বলে তাকেই—যে কাজে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে, মনে প্রাণে ঐক্য আনে। কাজে যখন মন মিশে না, তখনি তো তাঁ থেকে বিযুক্ত হও, কর্ম্মক্ষেত্রে যোগভ্রষ্ট হও। দায়ে পড়ে নয়, প্রাণের টানে লেগে থাক—লেগে থাক! একেই বলে, কর্ম্মযোগ—আত্মার সঙ্গে লেগে থাকা, সব চেয়ে আপনার জনকে মনে রাখা।

জীবন্মৃত কাজ নয়—জীবন্মুক্ত কাজ! মরার মত মুখ বুজে ঘানিটানা বলদের মত কাজ নয় উৎসাহে আনন্দে জলজ্যান্ত কাজ! খাওয়া-শোওয়া, পেট-কোরাস্তে লড়ে মরা—ও তো মরার কাজ। মুক্তির কাজ, আনন্দের কাজ—তাতে স্বার্থের বাঁধন নাই। আত্মসুখের গলা টিপ্‌তে বলি না—বলি শুধু পরের দুঃখ-টাও বোঝ—সবার সঙ্গে সমানে দাঁড়াও, ব্যথার ভাগ নাও, চোখের জল মুছিয়ে দাও!

কাজ আছেই আছে!—যেহেতু তুমি আছ! তুমিই তো ভগবানের মস্ত বড় কাজের নিশানা।—কাজের নেশা তাঁকে শুদ্ধ মাতাল করে রেখেছে, তুমি আমি কোন্ ছার!

কাজ কর, কাজ কর—প্রাণ ভরে কাজ কর! ভয় পেয়ো না! কাজের নেশা তাঁর খুসীর বাঁধন—মেনে নিলেই আর ল্যাঠা থাকে না!

—*—

"যৎ কিঞ্চ"

—:*:—

নিজের মনটাকেই জগন্ময় রূপান্তরিত দেখিতে পাই। কথাটা সত্য না মিথ্যা বুঝিতে পারি না। কোন প্রমাণ হয়ত নাই তবু উড়াইয়া দেওয়া চলে না এমন ব্যাপারও জগতে যথেষ্ট আছে। মনটী যেদিন ভাল থাকে, সেদিন প্রকৃতি যেন অনুকূল হইয়াই ধরা দিলেন; আবার মন যেদিন উদ্‌ভ্রান্ত বা কুচিন্তায় আবদ্ধ, সেদিন যেন কোথাও আর আনন্দের কিছু দেখিতে পাই না—প্রকৃতি সেদিন যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিবার পাঠ গ্রহণ করেন।

আর কিছু না পাইলেও এই ব্যাপার হইতে আমাদের মনের যে একটা শক্তি আছে এবং সে শক্তি অব্যর্থ, এ সত্যের প্রমাণ পাই। বস্তুতঃই

মনের পরিবর্ত্তনে জগতের কি ঘটে না ঘটে, সে বিচার ছাড়িয়া দিলেও, মনটাকে জগতে আরোপিত করিয়া ইচ্ছামত সুখ-দুঃখের উপর নেতৃত্ব করিবার একটা অধিকার আমরা অনুভব করি। এই শক্তিকে সৃষ্টির অঙ্কুর বলিতে পারি। সর্ব্বস্রষ্টার শক্তি আমাতেও মনরূপে নামিয়া আসিয়াছে। এই মন লইয়াই মানুষের যত কারবার—জগতের যত বৈশিষ্ট্য, যত সৌন্দর্য্য, যা কিছু মহিমা, এই মনের অনুশীলনেই আমাদের জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

বলিতে পারি, সুখ-দুঃখ যাহাই অনুভবকে খণ্ডিত করে, তাহা এই মনেরই সৃষ্টিমাত্র। মনকে বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা অনির্ব্বাচ্য—তার সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা কহা চলে না, তাকে লইয়া সংসারের কাজ হিসাব-দুরুস্ত ভাবে চলিতে পারে না। বস্তুজগতের চরম সূক্ষ্ম বস্তুটাই যেন মন; তাহার পর আমাদের ধারণা অচল। আমাদের স্বভাবতঃ দখলী স্বত্ব জগতের যে অংশে, তাহা মনেরই অধিকারে। যাহা মনে রাখিতে পারি না, যাহা মনে থাকে না, যাহা মনের অগম্য—ইহসংসারে তাহাকে বাদ দিয়াই আমরা চলিতেছি, হাজারকরা ৯৯৯ জন চলিতেছে।

সাধারণতঃ এই মনই 'আমি' বলিয়া প্রখ্যাত। প্রত্যেক personality এই মনেরই কেন্দ্রবিশেষ। জীবনে অনেক কিছুই ঘটে, যাহা মনকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, তবু মনের বাহিরে আমাদের হাত নাই। ব্যক্তিগত জীবনের সত্তা বলিতে মনকেই ধরা যায়। চরিত্র গঠন, আত্মোন্নতি, জগদ্ধিত ইত্যাদি যাবতীয় নীতিমূলক এষণা, সমস্তেরই একমাত্র কর্ম্মস্থলী হইল মন।

মনকে সমস্ত জীবনের সারসত্তাও (essence) বলা চলে—যেহেতু জীবনের ভাল-মন্দ সমস্ত ঘটনা তাহারই রূপান্তরের উপর নির্ভর করে, যেহেতু মন ভাল থাকিলেই সব ভাল থাকে এবং মন খারাপ হইলেই সব খারাপ হয়। সত্যি সত্যি কি হয় তাহা জানি না হয়ত—অন্ততঃ জীবনে আমরা দেখিতে পাই এইরূপই।

জীবনের যে অংশটুকু মনের অধিকারে—অর্থাৎ জীবনের যে রূপান্তরগুলি মনের রূপান্তরের উপর নির্ভর করে; এবং যে অংশটুকু (তাহাকে 'টুকু' বলা চলে না, হয়ত তাহা অনেক—অনেকখানিই) মনের বাহিরে—এতদুভয়কে লইয়া একটী পূর্ণ জীবন অথবা personalityর একটী পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। ব্যষ্টি আমি-র এই দুইটী উপাদান। জীবনের খানিকটা ভাগ আমার হাতে, খানিকটা জানিনা কাহার হাতে। স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার জীবনের যা কিছু সবি আমার ইচ্ছার অধীন নয়। যেটুকু অধীনে আছে, অন্ততঃ ইচ্ছা করিলে সাধন-সহায়ে অধীন করিতে পারি, সেইটুকুকেই বলিব মন। আর যাহা তাহার অনধীন, তাহার বিষয়ে আমি নীরব। অনধিকারচর্চ্চা বিচারের ধর্ম্ম নয়।

জীবনের আদর্শকে মন দিয়াই ধরিয়া রাখিয়াছি, আবার প্রারব্ধ কর্মসঞ্চয়কে মন দ্বারাই উপভোগ করিতেছি। মনের মধ্যে যাহা খেলে, তাহা লইয়াই কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে। যাবতীয় কর্ম্মের বীজ ইচ্ছা বা বাসনারূপে মন হইতে উদ্ভূত হইতেছে।

শুনিয়াছি, প্রকৃত আত্মা অখণ্ড বিরাট্—অখিল চিন্ময়প্রবাহের অধিষ্ঠান। সুতরাং আমি-আমি রূপে কল্পিত আত্মার এই যে খণ্ডিতাভিমান মুহুর্মুহুঃ জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহাই মন। কাজেই মন হইল আত্মার আভাস। মনই আত্মার শক্তি, আমার শক্তি।

আত্মা আর আমিতে আপাত-পৃথক্ বুদ্ধি মনের হাত দিয়াই আমরা পাইতেছি। নিজকে নিজে জানিতেছি এই মন দিয়া। কথায় বলে—পশুর মন নাই, অর্থাৎ সে নিজকে জানে না। কিন্তু তাহারা চলে-ফিরে। অতএব নিজকে না জানিয়াও

চলা-ফিরার অব্যাহত থাকে, আমাদের জীবনেও যথেষ্ট অংশ আমাদের না জানাতেই চলিতেছে। সুতরাং চলা ফিরা ক্ষমতাটাই চৈতন্য নয়—হয়ত বা চৈতন্যাভাস।

কিন্তু মন কি চেতন না অচেতন—ইহা ধারণা করাই মুস্কিল। যাহাকে জানা যাইতেছে, তাহাও মনের গম্য, আবার যে জানিতেছে, সে-ও তো মন। যুগপৎ চেতনাচেতন আত্মার আভাসরূপে মনকে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

মনকে বশে আনিতে হইবে—ইহার মানে হইল, এই জীবনের ঘটনাবিপর্যায়ে বিকীরিত শক্তিপুঞ্জকে খুসীমত একত্র জুটাইতে হইবে। "মন হইলে মানুষ কী না পারে?"—কথাটার মধ্যে আত্মশক্তি-জাগরণেরই সূত্র পাই।

সুতরাং স্বরূপতঃ মন যাহাই হউক না কেন, এই জীবনের সব চেয়ে আপন (আত্মগত) বস্তুটাই হইল মন। আমার পার্সন্যালিটী লইয়া জগতের কতটুকু পরিবর্ত্তন আমি ঘটাইতে পারি, তাহার মানমন্দির হইল মন। যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ আমি আছি, আমার কর্ত্তব্য আছে, আমার সু-কু সুখ-দুঃখ বিচার-বিবেচনা ত্যাগ-ভোগ ইত্যাদি যাবতীয় দ্বন্দ্ব সবই আছে। অদ্বৈতস্বরূপ থাকুন আর নাই থাকুন, আমার এই দ্বন্দ্ববিলসিত সত্তাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বন্দ্ব লইয়াই সংসারে চলিতে হইবে। সমস্ত দ্বন্দ্বের ঘনবিগ্রহ হইল মন।

সমস্ত দ্বন্দ্বের দর্পণ হইল মন—আবার মনের দর্পণ হইল দৃশ্য জগৎ। তাই মন যখন যেমন হইতেছে, বাহিরের জগৎকে সেইরূপ প্রতিভাত করিতেছে; তেমনি, জগৎপ্রবাহ যে খাতে বহিতেছে, মনকেও সেইদিকে টানিতেছে। উভয়ে মিলিয়া একটী আবর্ত্তন—আমরা মন দিয়া জগৎ গড়ি আবার জগৎও মনকে গড়ে।

অনুভবে দুই-ই এক। যাহাকে নিজের বাহিরে মনে করি, তাহা হৃদয়-মাঝারে—ইহাই জীবনবেদ। মন একটী ছায়া—জগৎরূপে আমারই ছায়া। কিন্তু অনুভবে সব কাজ চলে না। কাজের সংসারে নামিলেই দ্বন্দ্ববিগ্রহ আমি-রূপ মনকে এবং নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জগৎকে পরস্পরাপেক্ষ রাখিয়া চলিতে হয়।

আমিই মন, এ কথাও বলা চলে না; আবার আমার মন যে আমা-ছাড়া স্বতন্ত্র সত্তা, তাহাও বলা চলে না। ক্ষেত্রবিশেষে আমিই মন, কোথাও বা মনই আমাতে। এ মায়ার পার কে পাইয়াছে? মনও মায়া, জগৎও মায়া—দুয়ে মিলিয়া লুকোচুরী-খেলা চলিতেছে, বুঝি বা দেখিতেছি মাত্র আমি!

মায়া বলিলেই একটী বস্তুকে এক হিসাবে স্বীকার আর এক হিসাবে অস্বীকার—দুই-ই এক সঙ্গে করা হইল। মনের স্বরূপ জানিতে গিয়া এইরূপ ফাঁপড়ে পড়িতে হয়।

কাজের জগতে মুখ বুজিয়া কাজ করিয়াই যাইতে হইবে। "স্বরূপতঃ আমি ব্রহ্ম" বলিবামাত্রই তো আর জীবত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে না। সুতরাং সেই অখণ্ড আত্মস্বরূপের সহিত একটা আপোসে নিষ্পত্তি করিয়া মনকে সব কাজের সেরা কাজী বলিয়া ধরিয়া লইয়াই আমরা কাজের সংসারে নামিলাম। তত্ত্ব-বিচার আপাততঃ মুলতবী থাকুক।.........

আমার সব চেয়ে আপনার জন হইল মন। সংসারের সব কাজ তাহাকে দিয়াই করাইয়া লইতে হইবে। তাকে তুষ্ট রাখিতে হইবে, অথচ ঠিক পথে চালাইয়াও লইতে হইবে। মনকে রস দিতে হইবে, মনকে শান্তি দিতে হইবে, মনকে আপন হইতে আরো আপন করিয়া জগতে আমারই মহিমাকে অক্ষুন্ন গৌরবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মোট কথা, মনকে তৃপ্ত রাখিলে তোমার সব কাজ নির্ব্বিবাদে হাঁসিল হইবে, অন্যথায় নহে। মনকে রাগাইয়া-খোঁচাইয়া হাত-ছাড়া করিলে তোমারই বিপদ্। তুমি তাহাকে ছাড়িতে

পারিবে না কোন মতেই—যতদিন না সে তোমার হাতে আসিবে।

মন একটা শক্তিমন্ত জানোয়ার—সে আমাদের সংসারের একটী অবশ্য-পোষ্য বস্তু। তাহাকে হাতে রাখিতে পারিলে আমরা যা-খুসী-তা করিতে পারি।—মানুষ যদি মানুষ হইতে চায়, মনরূপ শক্তিকেন্দ্রটী তাহাকে আয়ত্ত করিতেই হইবে। ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ জগতের-গ্রাহ্য বা বিশ্ববরেণ্য হইতে পারে নাই। কত আকারে কত প্রকারে এই মনকে লই-য়াই মানুষ সংসারের চিত্র-বিচিত্র ছবি আঁকিতেছে।

জীবনে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াই দেখিতে পাইলাম—মন আমার আশ্রিত, আমি নহিলে মনের চলে না; আবার মন নহিলে আমারই বা চলে কই? আশ্রিতকে ছাড়িতে পারি না; তাহার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আশ্রয় যাহাকে দিয়াছি, অবশ্যই তাহাকে সুখেও রাখিব।

মনকে সুখে রাখিতে হইলেই দেখি, ত্যাগী হইতে হয়, ভোগে উদ্দাম হওয়ার অপমান তাহাকে ব্যথিত করে। শরীর যেমন খোরাক ব্যতীত অচল, মনেরও তেমনি মনের মতন খোরাক চাই। শুদ্ধ-শান্ত-হৃদয়ের পবিত্র অবদান তাহার নির্ম্মল খোরাক। প্রাণে প্রাণে সে চায়—সুখ-শান্তি, পবিত্রতা, শক্তি, আনন্দ ভালবাসা। মনকে সুখী রাখিতে গিয়া আমি সুখী হই, তাহাকে সাজাইতে গিয়া আমি সুন্দর হইয়া উঠি। বস্তুতঃ আমি যাহা কিছু দিই, সবই সে দ্বিগুণ করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দেয়। মনকে যে দুঃখ দেয়, সে সুখ পায় না।

মন কখনো বসিয়া থাকে না, সে সর্ব্বদাই আমার কাজ করিতেছে। আমার কাজ শুধু চালাইয়া লওয়া—তাহাও কিছুদূর পর্য্যন্ত, যতদিন তাহার মাথা ঠিক না হয়; তাহার মাথা ঠিক হইলে, অর্থাৎ সে শুদ্ধ শান্ত হইলে তারপর আপন বেগেই ঈপ্সিত পথে চলিতে থাকিবে—আমার কাজ হইবে তখন শুধু দেখিয়া যাওয়া, দেখিয়া আনন্দ পাওয়া। বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ের সুগুপ্ত-ভাণ্ডারের চাবি তখন তার হাতে দেওয়া চলিবে। সুঅভ্যাস নাকি মনকে এইরূপ হিসাব-দুরুস্ত অথচ দরদী করিয়া তোলে।

মনকে যদি তাহার মনের মত খোরাক না দাও, সে তোমার ঘর-সংসার এলোমেলো করিয়া দিবে, তোমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। তোমার শান্তিতে তাহার শান্তি, তোমার অশান্তিতে তাহার বেদনা। সে প্রতিনিয়ত তোমার পথ চাহিয়া থাকে।

চুপ করিয়া মনের খেলা দেখিতে কি সুন্দর! কত বিচিত্র তার লীলা-ভঙ্গী! জীবন-ভ'র দেখিয়া চলিয়াছি, তবু শেষ নাই। জীবনের অসীম চঞ্চলতা, ঘটনার অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গিমা—সকলকেই রূপ দিতেছে মন। সৃষ্টির উপাদানও সে, সৃষ্টির শক্তিও সে।—আমি আর কি করিতেছি?—মহাশক্তিতে সে শক্তি সমর্পণ করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারিতেছি! আদান-প্রদান আর ভাববিনিময় মনেরই—কিন্তু লোকে রটিতেছে কৃতিত্ব আমারই। আমি কোন কিছু নই, সবই তো তার—তবু তো আমারই নাম, আমারই রূপ!

ভক্ত যদি ভক্তি করিয়া মনটী তাহার ইষ্টদেবকে দেয়, তবেই নাকি আত্মসমর্পণ করা হয়। মনটী দিলেই যদি আমাকে দেওয়া হইল, তবে মানুষ মিছে কেন 'আমি—আমি' করিয়া মরে? মনই যদি আমার সর্ব্বস্ব হইল, তবে আমি কি ভাসিয়া আসিলাম? মন-বিহীন নির্গুণ নিঃস্ব নিরবয়ব আমার থাকা না-থাকা কি সমান নয়? বাস্তবিকই যথার্থ আমার বলিয়া তবে তো কিছুই নাই! তাই কি বলে—"মনটী যদি তাঁহাকে দিয়া দিলাম, তবেই তো আর আমার বলিতে কিছুই রহিল না—সবই দিলাম!"

যে আমার সর্ব্বস্ব, এ হেন যে মন, তাহাকে ছোট করা আর বড় করা—এ নাকি আমারই

কাজ! যত পাপ পুণ্যের দাগ নাকি মনের গায়েই লাগে! তবে আমি আছি কি করিতে? আবার না থাকিলেও যে চলে না! মনটীকে লইয়া মহা-মুস্কিলেই পড়া গিয়াছে। অদ্ভুত বস্তুটাকে কি-ভাবে কোথায় রাখিলে তাহার কদর ঠিক ঠিক বোঝা হইবে, তাহা স্থির করিতে করিতেই কত জন্মজন্মান্তর কাটিয়া গেল। শুনিয়াছি, মনের মুক্তিতেই নাকি জীবন্মুক্তি।

মন একটী অভিনব রহস্যপিণ্ড। জীবনে ইহার সাক্ষাৎ পায় সকলেই, কিন্তু ইহার অন্ত পায় না হয়ত কেহই। যে পায়, সে সচ্চিদানন্দসাগরে অর্থাৎ বিশ্বাসে, জ্ঞানে, আর পূর্ণতায় ডগমগ হইয়া আপ-নাতে আপনি হারায়। অনাদি অনন্ত কাল হইতে স্পন্দমান জড়-চেতনের মুহুর্মুহুঃ সমাধান এই মনে। ইহার দেশ নাই, কাল নাই, আধার নাই; অর্থাৎ পাইতে গেলে থাকে না। মন নিজেই নিজের আধার—নিজকে ব্যাপিয়া নিজকে লইয়া সে আছে।

মন আর মায়া এক বস্তু। প্রাকৃতিক নিয়মে চিরবদ্ধ জড় জীবনের মাঝে মনই মুক্তচৈতন্যের আভাস আনিয়া দেয়। মন দিয়াই মন পাই।

জগতে মন নাই কোথায়? মন যখন লীন, তখন নাকি জগৎ নাই। আমাতে লীন হইতে যে পারে, নিশ্চয় সে আমা হইতেই উদ্‌ভূত। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" কথাটীর স্থলে "আমি সত্য, মন মিথ্যা" কথাটী বসাইলে কেমন লাগে? হয়ত আসলেই মন নাই—একমাত্র আমিই আছি। সে কখন? যখন আমি সমাহিত। আত্মচ্যুত আমার পক্ষে মনই তো একমাত্র অন্ধের যষ্ঠি! বাস্তবিক আমি যতক্ষণ আছি, সে ততক্ষণ আছেই আছে—কেননা আমারি সে!

এই নাছোড়বান্দা অদ্ভুত চীজ্‌টাকে লইয়া আমি কোথায় যাইব? আমি আমাতেই রহিলাম।—দেখি সে কি করে! থাকিতে পারি না—টলিয়া পড়িতে হয়; মনে ভর করিয়াই জগতে নামিয়া আসিতে হয়। নামিয়া দেখি, যেমন ভাব তেমনি লাভ; আমার মনই জগতের রূপ ধরিয়াছে।

জীবন ভরিয়া কি অপূর্ব্ব লুকোচুরী-খেলা চলি-তেছে! কারো সঙ্গে কারো মিল নাই—তবু সবাই একত্র থাকে, কখনো এক হইয়াই থাকে। এক, দুই, আমি, সে—সবই আমার মন; আমি নাই কোথাও, মনই আছে! জগৎটা মনেরই রূপান্তর বলিতে আপত্তি খুঁজিয়া পাই না।

কি জানি কি!—বড় অদ্ভুত এ খেলা! শুধু এই জানি—একটী মহামূল্য বস্তু আমার অধিকারে আছে যেটী চিরকালই আমার, যদি আমার কামনা দিয়া তাহাকে আমি বাঁধিয়া না রাখি;—সেটী আমার মন, আমার শক্তি!

মনকে নিজের মাঝে অনুভব করাই তার প্রতি সদ্‌ব্যবহার। মনকে শান্ত করা তাহার উপায়। আবোল-তাবোল ভুলাইয়া মন্ত্র জপ করিতে দেয় সাধক; বৃত্তিহীন করিয়া আত্মস্থ করে যোগী; 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' রূপে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে সম্মোহিত করিয়া ফেলে জ্ঞানী—জ্ঞানীর মন আর জ্ঞানী এক আত্মা; সাজি ভরিয়া কুড়াইয়া আনিয়া অঞ্জলি দেয় ভক্ত; রন্ধ্রে রন্ধ্রে শক্তির উচ্ছ্বাস ফুটাইয়া তোলে ক্ষ্যাপা;—নিত্য সিদ্ধ চিরকিশোর বস্তুটীকে প্রকট করিবার ইত্যাদি কত সাধ্য-সাধনাই যে আছে, তার ইয়ত্তা নাই! সকলের কেন্দ্র মন, সকলের লক্ষ্য মন; আপন আপন মনকে সাধক যখন পাওয়ার মত পাইল, তখন আর জগতে অপ্রাপ্ত রহিল না কিছু! তাই তো বলি, মনই জগৎ—আর আত্মা জগন্নাথ! দুইজন মুখোমুখি বসিয়াছেন—যেন কেহ কাহাকেও চিনেন না! পরস্পর পরিচয়ের চেষ্টায় অফুরন্ত কাব্যস্রোত বহিয়া যাইতেছে!

আমা হইতে মন, মন হইতে জগৎ—উদ্দামবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিয়াছি। মনোমেধ-যজ্ঞ কবে সম্পূর্ণ

হইবে জানি না ! জানি, সকল রাজ্য বিজয় করিয়া একদিন সে অমর-গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে, আমার মুকুট তাহার মাথায় পরাইয়া দিয়া আমি আড়াল হইব। সংসারের সকল ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিব, দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, আমার চেয়ে বড় কেহ যদি আমার থাকে, তাহার চরণে যুক্ত হইব। কত আশা, কত আশঙ্কা পদে পদে—জানি, সে ফিরিবেই ফিরিবে, জগৎ জিনিয়া আনিবে, তবু যে ভয় বাসি—এ আমার স্নিগ্ধ প্রতীক্ষা ! আমি তাহাকেই ভালবাসি—সে আমার সর্ব্বস্ব—সেও আমাকেই চায় !

মনকে আত্মায় বিশ্রাম লাভ করাইতে পারিলেই তাহার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হইল। অন্ততঃ ইচ্ছা করিলেই মনকে নিজের মাঝে গুটাইয়া আনিবার ক্ষমতা জন্মিলেই হইল। মন আত্মস্থ হইলেই জীবন পূর্ণ—তখন 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ'—তখন শুধু পান কর আর দান কর।

শেষ কথা, মনের অন্ত পাই আর না পাই—মনের প্রতি আমারো কর্ত্তব্য আছে। শুধু আমার মনের প্রতিই নয়, জগতের সবার মনের প্রতিই আমার কর্ত্তব্য আছে। সবাই মিলিয়া এক হইয়া আছে—মনে মনে। কর্ত্তব্য আর কিছু নয়—নিজের মনকে স্বস্তি দেওয়া, আর পরের মনকে আশীর্ব্বাদ দিয়া অমৃত করা। নিজের মনটী পূর্ণ কর—সকলের মনে উপচিয়া পড়—অমৃতে আনন্দে দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত হও।

নিজের মনকে দখল করা প্রথম কাজ। জগতের সব মন মিলিয়া এক তত্ত্ব। একটী মন যে হাতে পোষ মানিয়াছে, আর সব কয়টী মন তাহাকে আপন জন বলিয়া চিনিবে। কেবল অধিকার বাড়াইয়া চল—কোথাও সঙ্কোচ রাখিও না। ধ্যানতন্ময় তুমিই জগন্ময়—তাই হইল বিশ্বের বিরাট্ মন।

পুরাণে সমুদ্রমন্থনের কথা আছে। সমুদ্র নাকি মনেরই রূপক : মনকে মথন করিলেই নাকি অমৃতের উদ্ভব হয়। কামকে বলে মনসিজ, মন্মথ ; মনকে মথিয়া কামের উদ্ভব. সেই কামকে মথিয়া হয় প্রেমের প্রকাশ। যেমন করিয়াই হউক মনের সমস্ত গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে—তাহাকে এক রসের রসিক করিতে হইবে।

মনকে মথন করিলে যাহা জাগে, তাহা দেহে-মনে-আত্মায় এক সুর বাজাইয়া তোলে। আসলে মন একেরই সাধক—এক বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত অনেক লইয়া লুফালুফি করে। কিন্তু প্রাণের জ্বালা যায় না—আত্মা মনকে নিয়ত নিজের দিকে আকর্ষণ করেন।

কারো ভয়ে নয়, ভরসায় নয়, জগতের কোন লাভ-লোভের মুখ চাহিয়া নয়, কোন দায়ে ঠেকিয়া নয়, কোন আকর্ষণে নয়—একান্ত প্রাণের প্রাণে একবার মনকে শুধাইয়া দেখ দেখি, সে কি চায় ? ঠিক সে যা চায়, তাই দাও—কাঁদিও না, ভয় পাইও না—অসঙ্কোচে তাহার প্রাণের কথাটী তাহাকে বলিতে দাও !

গুরুর কাছে শিষ্য তাই করে—সে তার মনের মনকে লুটাইয়া দিয়া আপন ক্ষুধা ব্যক্ত করে, মন দিয়া গুরু তাহা শোনেন, ধারণা করেন, ধ্যানতদ্‌গত আপনার মন্থিত সুধা দিয়া শিষ্যের মন গড়িয়া তোলেন। এই কৃষ্ণার্জ্জুনের অভিনয় চিরকাল ধরিয়া চলিতেছে—প্রতি মনে মনে চলিতেছে ! প্রপন্ন মনকে আত্মমন্ত্র শুনাইয়া তাহাতে দৈবশক্তির সঞ্চার—সাধনার এ অনাদি প্রবাহ অনন্ত কুরুক্ষেত্রে বহিতেছে !

মনোজয়—আত্মদান—নিমিত্ত মাত্র জীবন লইয়া ফিরিয়া আসা ! তখন আর কুহেলিকা নাই, ক্লৈব্য নাই, অনার্য্যজুষ্ট হৃদয় দৌর্ব্বল্য নাই—মোহের বিনাশ, ধ্রুবাস্মৃতিতে অনন্ত জীবনব্যাপী আত্মানুভবের জাগরণ—অপ্রমত্ত-জীবনের কর্ম্মযোগ, প্রতি কর্ম্মে হৃদয়েশ্বরের লীলাস্বাদন—এই তো মনের চরম শিক্ষা,

পরম স্বস্তি। ইহার পর কর্ত্তব্য নাই—অর্থাৎ ডিউটীর দায় নাই, শুধু লীলা আছে! পূর্ণ মনের পূর্ণাঙ্গ ভাবে-কর্ম্মে উদঞ্চন—পূর্ণের আদান, পূর্ণের প্রদান—কে কার হিসাব রাখে!

মনকে সেই উদার মাধুর্য্যের সন্ধান দাও। সকলের মনে মনে সে তার ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করুক। এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলিতেছে যে শক্তিতে, সেই শক্তির প্রতীক্ এই মন—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লব্ধ সত্য—অনাদিসিদ্ধ অনুভব—অনন্তপ্রবাহা লীলাস্রোত—নিত্য-প্রস্ফুরৎ শ্রীবিলাস!

* * *

সত্যি বটে, মনই জগৎ! ভাবিতেছি, কবে তাহাকে হাতে পাইব?

হয়ত পাইতেছি। তবু তো জানি না; নিজকে পাইয়াও তো চিনি না। "তবু" আর "কিন্তু" কিছুতেই যায় না। ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। 'যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' তাহাই আমার মন কিনা, ইহা বুঝিতে চাই—নতুবা আমার ঈশিত্বের ব্যাপ্তি হয় কই?

—"কস্যচিৎ বুভুৎসোঃ।"

পরশ

ক্লান্তিহরা পরশ আজি মৃদুল সমীরণে
ও পারের ঐ বাণী এনে ঢেলে দিলে প্রাণে!
শীতল হল অঙ্গ আমার ব্যথা গেলেম ভুলে;
আবার যেন নূতন হয়ে এলেম লোকের মেলে।
অমন করে নিতি নিতি মধুর পরশ পেলে,
ভুল্‌তে কি গো পারি কোথাও তুচ্ছ কথার ছলে!
সময় যখন হবে আমার কাজের বোঝা ফেলে,
উদাস হয়ে বস্‌ব গিয়ে অশোক-ছায়ের তলে।
ঝগ্‌ড়া করা কুটিল মনের থাক্‌বে না আর স্মৃতি,
অবাধ প্রাণে সবার সনে মিলন হবে নিতি!

ইতস্ততঃ

"হবে না, হবে না—আমাদ্বারা কিছুই হল না"—এই কথা যারা দিনরাত ভাবে, তাদের খুব একটা অনধিকারচর্চ্চা হচ্ছে। আমি বলি—প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত এ দুর্ভাবনার পার নাই। দুর্ভাবনার প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু নয়—খানিক সুভাবনা।

প্রথম কথা—তোমার গুরুনির্ভর হয়নি। দ্বিতীয় কথা—মনে মনে নিজ জীবনের সীমারেখা কল্পনা করে ফেলাটা একদিক দিয়ে বিজ্ঞতার আড়ম্বর হয়েছে, আর একদিক দিয়ে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় কথা—স্বার্থপরতা; শুধু তোমার দুঃখে ব্যথিত হবার তোমার কি অধিকার? আরও এক কথা, হয়ত বা কিছু হত, হয়ত বা তিনি কর্‌তে এসেছিলেন কিছু, কিন্তু তোমার বিরস চিত্তের বিকট ভেট্‌কী দেখে সেই আত্মারাম পুরুষেরও খাঁচা ছেড়ে পালাবার ইচ্ছা হয়েছে; কেননা তোমার মুখ যদি হাসি-হাসি না দেখে তো কে তোমার সঙ্গে কাজ কর্‌তে চাইবে বল!

জোর করে আনন্দ করা যায় না অবশ্য—আনন্দ আপন খেয়ালের মানুষ। তবু বলি—আনন্দ জোরেরই পরিচয়। মানুষ যখন জোর্‌সে উত্তরঙ্গ জীবন-প্রবাহ পাড়ি দিয়ে চলে যেতে থাকে, তখন দেখি ঐ আনন্দই সম্বল। আনন্দ অতি সাদাসিধা সোজা-কথার ব্যক্তি—হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে টেনে আন্‌লেই আর তার রাগ থাকে না, অতীত ব্যথা সব ভুলে যায়।

যখন নিজকে নিয়ে খুঁত্‌কে থাক, সব চেয়ে মারাত্মক অপব্যয় তখনি কর! যা ছিল তাও হারায় মানুষ এমনি করেই। আর যা কর্‌বার নয় তাই করে যা যথার্থতই কর্‌বার তাতে বিমুখ থাকা একেই বলে। হয়ত এমন অদ্ভুত আব্‌দার ধরে বসেছ, যা সহজে পুর্‌বার নয়। কেন—ভাগ্যদেবতার কাছে এ ভিক্ষা কেন? ক্ষমতা থাকে আদায় কর না! বসে বসে নাকের জলে চোখের জলে একসা হলে, একে তো সম্মান নষ্ট, মেলা সময়েরও অপব্যয়। এ সব অন্যায্য অন্তর্জ্বালা কামনার আকুলিবিকুলি ছাড়া আর কিছু নয়—এই কথা একশোবার মুখের উপর বল্‌ছি।

চাইব না কিছু এবং যা চাইব তা পাবই—যেখানেই ব্যতিক্রম, সেখানেই স্বভাবের ব্যভিচার। বিশ্ব-সংসারটাকে একচেটীয়া করে নিতে হলে যে নিজের ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীকেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ধ্বস্ত করা দরকার—এ কথা মনে থাকে কই! ভেবে যদি সুখ পেতে, সে ছিল ভাল; কিন্তু যেখানে জলে মর্‌ছ আর ঘরের লক্ষ্মী পরে লুটে নিচ্ছে বসে বসে দেখ্‌ছ কিছু কর্‌তে পার্‌ছ না—এ ঘোর দুর্ব্বলতার শাস্তি দাসত্ব ছাড়া আর কি হতে পারে?

মুগ্ধ-নয়নে যাদের দিকে তাকিয়ে থেকে তুলনা-মূলক আলোচনায় নিজকে হীন ভাব্‌ছ, প্রকারান্তরে মাথা নীচু করে তাদের প্রভুত্ব নির্ব্বিবাদে মেনেই নেওয়া হচ্ছে। দুর্ব্বল সবারই কৃপাপাত্র; আর নিজকে যে দুর্ব্বল করেছে বা কর্‌ছে, তার মত হত-ভাগ্য তো দুনিয়ায় নাই! আপন অধিকারে নিজ নিজ স্বভাবের রাজা হয়ে থাক্‌তে পার্‌তে, কিন্তু ধার-করা ভাবের কাঙ্গালী হয়ে আছ। নিজ সম্বন্ধে হীন-ভাবনাই পর্‌গাছা সবল করে বুঝ্‌তে পার না?

হয়ত বল্‌বে—আত্মচিন্তা কর্‌ছি। দোহাই বাবা, অমন আত্মচিন্তার প্রয়োজন নাই। বরং একটু

নিশ্চিন্ত হতে শেখ। একটু ভুলে যাবার অভ্যাস কর। অধ্যাত্ম-সংসারের যারা আনাড়ী, ওরকম অদ্ভুত আত্মচিন্তা তাদেরই কাজ। নিজকে সর্ব্বদা উজ্জ্বল ভাববে, তবেই উজ্জ্বল যে হয়েই আছ, এইটী বুঝ্‌তে পারবে। হীন ভাবাটা ভীরুর কাজ—গতানুগতিকতার পায়ে উপলব্ধ স্বভাবকে বলি দিয়ে দিন দিন আত্ম-হত্যা করছে তারা। এদের টেনে তুলতে গেলেও ক্ষতি। কেননা উন্নতি হলেও হয়ত বিশ্বাস করবার ক্ষমতা নাই এদের।

জীবনটাকে নিজের উদ্ভট খেয়াল-মাফিক অকালে আসরে নামানোয় কি কাব্য আছে জানি না। সুনি-পুণ হাতে কত কিছু হচ্ছিল, অত্যাশার উত্তেজনায় সে সবকে এলোমেলো করা, ব্যস্ততার উত্তাপে ঝলসে দেওয়া—অধৈর্য্য অর্ব্বাচীন বুদ্ধির কাজ নয় কি? তাড়াহুড়া করে কোন ভাল কাজ হয় না—কেবল উপকরণেরই অপব্যয়।

তুমি কি জান ছাই, তোমার দ্বারা কি হতে পারে? আশ্চর্য্য কিছুর প্রতীক্ষা না করে আছ কোন্ সুখে! নিজের ভাগ্য জেনে ফেলাটাই সকল জ্ঞানের সেরা জ্ঞান ঐহিক সংসারে—কিন্তু তারপরও ওপারে যে কত কিছু আছে, তা কি তুমি অবিশ্বাস কর? নিজেরই ক্ষতি—পেয়েও পেলে না। কত আশ্চর্য্য লীলা হয়ে যাচ্ছে বা যেতো, দেখেও দেখ্‌ছ না—ইচ্ছা করে চোখ বুজে বসে বসে কপাল চাপড়াচ্ছ!

আত্মভাবের ভাবুক হও—নিজের স্বভাবকে চেন, নিজের নিয়তি সানন্দে স্বীকার কর। তবেই তুমি রাজা হলে। ভাবনায় ভেবে মরো না। ওতে কত যে অকল্যাণ!—শুধু কি তোমার? তোমার বিষ-ণ্ণতা সকলকেই অবসন্ন করে যে! সবার সঙ্গে সবার নাড়ীতে নাড়ীতে সম্পর্ক আছে—এ কথা ভুলে যাও কেন ভাই!

যেখানেই যেমন ভাবে ঠেকে পড় না কেন—ভাব, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। একনিষ্ঠের চিরসহায় তিনি। এই মুহূর্ত্তেই যদি অকপট হয়ে ভাব্‌তে পার তোমার দ্বারা কিছু হবেই হবে—নিশ্চয় হবে! হতে বাধ্য। ভাবনার তারতম্যেই মানুষকে ছোট বড় করে। আসলে কেউ ছোট কেউ বড় নয়। "সর্ব্বং সর্ব্বং ভবতি"—সবার সব অধিকার আছে। রাখ্‌তে জানলে হয়। শক্তি জাগানো আর কিছু নয়—শুধু চাই অকপট বিশ্বাস, কিছুতেই না দমবার ভাব।

হয়ত ভাব, জন্মান্তরীণ সংস্কারের হাতের পুতুল তুমি—কখনো নয়! সেটা কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত। হয়ত সংস্কারের প্রভাব থেকে তুমি এক্ষুণি মুক্ত হতে পারতে কিন্তু ঐ যে তোমার ভাবনা, এ ভাবনার একটা অব্যর্থ শক্তি আছে—তোমার ভাব নাই যে সংস্কারের মেয়াদ বাড়িয়ে চলতে পারে, সে দিকটা খেয়ালে রাখ কি? যে শক্তিতে মুহূর্ত্তে সব গ্লানি ভস্মসাৎ করতে পারতে, সেই শক্তি গ্লানি বহন করবার কাজে অপব্যবহার করছ—শক্তির সাহচর্য্যে ঐ গ্লানির কল্পনাই বাস্তব হয়ে উঠে জীবনকে আবর্জনায় বোঝাই করছে।

যেমন ভাবে ভেসে চলছ—অমনি করে হবে না! ফিরে দাঁড়াতে হবে—সমস্ত হীন ভাবনার সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল—"রণং দেহি!"—আর তাদের সাধ্য কি যে সামনে দাঁড়ায়! সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া চাই—একটুও খুঁৎখুঁতি না রেখে! আসল কথা—শক্তি, তোমারই শক্তি—তুমি যেদিকে খাটাবে, সেদিকেই সে খাটবে। ভাঙ্‌তে সময় লাগে না—গড়াটাই বাহাদুরী। ভাবনায় ভেঙ্গে পড়ো না—বরঞ্চ গড়ে তোল!

দেখ, সত্যি কিনা, বলতে বলতে প্রাণের আগুন জ্বলে উঠ্‌ল কিনা! এ কারবারে চাই শুধু ভাবনার সততা—কিছুই তো হাতছাড়া হতে পারে না। যা পাওনি, তা তুচ্ছ; যা পেয়েছ, তাই অনন্ত। বিশ্বাস করতে পারলেই দেখ্‌বে অফুরন্ত শক্তির যোগান পাচ্ছ! প্রাণের স্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে সংসারে নেমে এসো—ছাই-মুঠো ধরলেও তখন সোনা হয়ে যাবে।

কাণে কাণে দুটো কথা বলি—গড়ে তোলা, এ যে তোমারও কাজ; তুমি তোমাকে হীন ভাব্‌তে পার, কিন্তু তিনি তো তোমাকে হীন ভাবেন নি। কেন বৃথা ইতস্ততঃ করছ ভাই! ওতে যে ঋষিঋণ বেড়ে চলে, সংঘ দুর্ব্বল হয়—বোঝ না?

দেবপূজা

—:*:—

"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—দেবতা হয়ে দেবপূজা করবে। শাস্ত্রের এই এক অপরূপ নির্দেশ। প্রথম দৃষ্টেই মনে হয়, সে কি কথা, দেবতাই যদি হতে পারব, তবে আর দেবতা পূজা করব কেন? পূজার উদ্দেশ্যই হল এই যে, আপনার যা কিছু সমস্ত দেবোদ্দেশ্যে অর্পণ করে তাঁর শক্তি আমার মাঝে আকর্ষণ করা। আমি যদি তা পেয়েই গেলাম, তবে আর পূজা করতে যাব কেন?

একটু প্রণিধান করলেই বোঝা যায়, এই ধরণের কথার মাঝে দেবতা হতে যে আমি পৃথক্ অথবা ছোট, এইরূপ একটা ধারণা নিবদ্ধ রয়েছে। আমি ছোট, তুমি বড় অতএব তোমার মনস্তুষ্টি করে যেমন ভাবে হোক্ আমার ইষ্টসিদ্ধি করা চাই—এমনি একটা মনোভাব সাধারণ মানুষের ভিতর থাকতে পারে; কিন্তু পূজার উদ্দেশ্য যে তা নয়, তা ঐ একটা কথায় প্রমাণ হয়। পূজা বলতে পূজ্য-পূজকের শক্তির বেশী-কম বুঝালেও এমন একটা দিক রয়েছে যেদিক থেকে পূজকও জোর করে বলতে পারে—হাঁ, আমিও সেই দেবত্বের আসনে উন্নীত হতে পারি। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এমনি একটা জোর নিয়েই যাগ-যজ্ঞ, পূজাদি সম্পন্ন করতেন। দেবোদ্দেশ্যে যাগ করে দেবত্ব লাভ হত, এই মর্ত্ত্যে থেকেও অমরত্ব লাভ তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বৈদিক যুগে ঋষির সরল অথচ উদ্দীপনাময় প্রার্থনার মাঝে দেবতার সঙ্গে এমন একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করে মানুষ অসীম শক্তি ও আনন্দ লাভ করত।

হিন্দুর পূজা-পদ্ধতির প্রথমেই রয়েছে ভূতশুদ্ধির কথা। আপনাকে এক এক করে ক্রমশঃ দেবতার অধিষ্ঠান যে পদ্মে সেখানে নিয়ে তবে তাঁর পূজারম্ভ। কাজেই এখানেও শুনি সেই "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" একই বাণী। বাহ্যিক সমস্ত ব্যাপারে যে মনটা সতত লিপ্ত থেকে নিজকে সার্দ্ধত্রিহস্ত দেহের মাঝেই গণ্ডীবদ্ধ বলে জানছে আপনার আসন কোথায় তা খেয়াল রাখছে না, এই পূজা পার্ব্বণ কালে তার মাঝে ব্যাপ্তির সাড়া আসে। আর সন্ধ্যা-পূজা হিন্দুর ত্রিসন্ধ্যার নিত্য কর্ম্ম। কাজেই যতই সে আপনাকে ভুলে থাক্ —সমস্ত বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটে দিশেহারা হয়ে যতই না ব্যাকুল হোক্, সন্ধ্যার আসনে এসে বসে আবার তার আত্মস্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়—ঊর্দ্ধলোকের সন্ধান পেয়ে, সেই আপনার নিতান্ত নিরালায় পরম প্রিয়ের সংস্পর্শে নূতন জীবন নিয়ে আবার আর এক সন্ধ্যার কর্ম্মে আবার সে আত্মনিয়োগ করে। হিন্দুর ত্রিসন্ধ্যা তাই শুধু কেবল শাস্ত্রের নির্ম্মম শাসনরূপে ঘাড়ের বোঝা দায়সারা কাজ নয়; নিঃসহায় ও শ্রান্তক্লান্ত মনের মধুর বিশ্রাম ও সঞ্জীবতার নিদান হচ্ছে তার একমাত্র উপাসনা। ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা, স্ত্রী পুত্র কেউই এই দেহটার এলাকা ভিন্ন মনের অন্তস্তলে গিয়ে বিরামের একান্ত আশ্রয় বা পরম নির্ভরের স্থল হতে পারে না—চরম অভয়বাণী শুনতে হলে চাই

এই অন্তরের নিগূঢ় দেশে পরমপ্রিয়ের সানন্দ উদ্বোধন। সে কোথায় গিয়ে পাব?—এই উপাসনায় বসে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ জগৎময় ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী আকর্ষণই প্রবল করে নিয়ে শান্তি বা আরামের প্রলোভনে শুধু ঘুরিয়ে মারে, শেষে শান্তি তো দেয় না! তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করে সংযমের সুষমামণ্ডিত হৃদয়ে সেই উপাসনার বিধান।

দৈনন্দিন কর্ম্মের সর্ব্বপ্রথমে, গত দিবসের সমস্ত কালিমাজড়িত দুঃখ-রজনীর অবসানে যখন জ্ঞানের প্রথম আভাসে চক্ষু মেলে, তখন হিন্দুর কণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিত হয় তা এই —

> অহং দেবো ন চান্যোস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
> সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

যে নামেই অভিহিত হই না কেন, যে যেখানে যেমন ব্যবহারই করুক না কেন, আমি তাতে ভুলব না—টল্‌ব না! সারাদিনে বা জীবনে একথা অমি ভুল্‌ব না যে আমি "দেবতা"। স্থির-ধীর সেই দেবত্বের আসন থেকে এই জগৎকে দেখে আমি আমার জীবনটি সার্থক করে তুল্‌ব। দৈনন্দিন জীবনের কত সুখ-দুঃখ লাভালাভ, নিন্দা-প্রশংসা এসে হয়ত আমার মনকে দুর্ব্বল করে পরিণামে শোকের ভাগী করতে চাইবে, কিন্তু একথা ভুল্‌লে তো চল্‌বে না যে —আমি সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মরূপে অন্তর্লীন রয়েছি, কাজেই শোকের ভাগী হব কি করে, সর্ব্বত্র সেই দৃষ্টি নিয়ে দ্বন্দ্বাতীত হয়ে যে শুধু সচ্চিদানন্দরূপে নিত্যমুক্ত হয়ে স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি!

ভোর বেলায় যা পড়া যায়, যা বলা যায়, সমস্ত দিনে সেই কথাটাই সুরে সুরে যেন সহস্র কর্ম্মের মাঝেও মহানন্দে হৃদয় পূরে দেয়। প্রভাতের পাখীর কাকলির সাথে সাথে এই যে বাণী হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয়, সমস্ত দিন্ ও'রে তার রেশ চলতে থাকে। আর কত জোরের কথা সে! সমস্ত ভীরুতা, কাপুরুষতা দূর করে দিয়ে যেন শক্তির উৎস থেকে দেবতা মানুষের কণ্ঠে এই বাণী তাঁর আশীর্ব্বাদরূপে আলোর সাথে পাঠিয়ে দেন!

প্রভাতে বা অক্ষত জীবনে সমস্ত প্রকার শৌচ ও আচারাদি পালন করে হৃদয়কে এমন শুদ্ধ-প্রশান্ত করা যায়, তখন তা নিয়ে বলা চলে, হাঁ আমি দেবত্বের দাবী রাখব না কেন? পূরাকালে মানুষমাত্রেরই লক্ষ্য নির্দ্ধারিত ছিল—মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্ব। এই জীবনেই প্রথম মানুষ হতে হবে— তারপরে দেবত্ব অর্জ্জন করে ক্রমশঃ ঈশ্বরত্ব বা সমস্ত লোকের প্রভু হতে হবে, তাতেও সীমাবদ্ধ না হয়ে শেষে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বর্ত্তমানে শুধু মানুষ হওয়ার চেষ্টাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যগুলি আর জীবনে ফুটবে কি করে? তাঁদের যেমন বিস্তৃত লক্ষ্য ছিল, জীবনটাও তেমনি নানা প্রকার সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। তাই দেবতা হয়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যত্ব স্থাপন করে প্রেমের দাবীতে তাঁরা দেবতাকে মর্ত্ত্যে নাগিয়ে বর নিতে পার্‌তেন। দেবতা বল্‌তেই এক একটা বিশিষ্ট ভাবের শুদ্ধ সত্তা। সাধকের সংযমে কেন্দ্রীকৃত মন (concentrated mind) দিয়ে সেই সত্তাকে ধ্যান দ্বারা রূপায়িত করা বা তাঁদের কাছ থেকে বর গ্রহণ করা—এখন এটা আমাদের কাছে উপকথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা দুর্ব্বল, আমাদের কেবলই অভাব ইত্যাদি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়ে কি করে যে সমষ্টি দেশের প্রায় সমষ্টি মনের বিরাট হাহাকারে আমরা অলক্ষ্মী বা দুর্ভাগ্যকে দেশের মাঝে মূর্ত্তিমতী করে তুলেছি, তা ভেবে কেউই আশ্চর্য্য হয় না! আমার জীবনব্যাপী সাধনায় যদি অশুভকে আকর্ষণ করতে পারি—শুভকেই বা কেন পারব না? নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, লক্ষ্মী কোনও দিন দুর্ব্বলের কাছে

থাকেন না প্রভৃতি অতি সতেজ বাণী আমাদেরই— আর আমরাই কি সেই বাণীতে উদ্বুদ্ধ না হয়ে সমস্ত অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেব? কেন? প্রাণপণ শক্তির আকর্ষণে দেবতাকে স্থূল একটী দেহ মাত্রে নামিয়ে আন্লাম, তাঁর কৃপা সূক্ষ্মভাবে মূর্ত্তি ধরে সমগ্র দেশে কেন শুভ ফল দিবে না? আমরা যদি সাধনা করি—'দেবো ভূত্বা' দেবের যজনা করি, তবে অবশ্য তা সম্ভব হবে। আর যদি না করে যেমন চল্ছে চলুক বলে তমোগ্রস্ত হয়ে নানা অনাচার-ব্যভিচারে জীবনে অহরহঃ পশুভাবকে বরণ করি, তাহলে "দেবো ভূত্বা" বাণী অসম্ভব উপকথায় পর্য্যবসিত হবে না কেন? দেবতা সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে সর্ব্ব-পাত্রেই যে রয়েছেন, তাঁর প্রকাশ না দেখ্‌লে তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সেই স্থির দিব্যচক্ষু লাভের সাধনা হয়েছে কি? তা হয় নি। তাই দুর্ব্বল বলেই পদে পদে সংশয়-অবিশ্বাস এসে সমস্ত শুভ-শক্তিকে ঢেকে রাখ্‌ছে। কেননা আমরা যদিও 'ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং' বাণীটী রক্ষা করতে পারি না, কিন্তু তাঁদের এটি ঠিক থাকে। বিশ্বাস করে আকুল হয়ে সাধনা করলে এই জীবনেই কি না ফুটতে পারে? চাই সত্য বস্তু পাওয়ার জন্ত এমনি প্রবল বিশ্বাসের আকর্ষণ। দেবতা যে রূপেই হোক্ আবির্ভূত না হয়ে যাবেন কোথায়!

ভুল বোঝা

—(*)—

একটা কথা আছে—"যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা।" কথাটা ঘোর হৃদয়হীনের কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে অপবিত্রতা না ঢুকিলে কোন পক্ষের মনই অমন অন্ধ হয় না। প্রবাদটীর সার মর্ম্ম—হয়ত আমি কাহাকেও ভুল বুঝিয়াছি, এবং বুঝিতেছি, আরও বুঝিব এমন দুর্ব্বুদ্ধির কবলিত হইয়া আছি। ইহা অন্ততঃ আত্ম-সম্মানেও বাধে না কি? তুমি মানুষকে ভুল বুঝিবে—সে দোষ মানুষের না তোমার বুদ্ধির! চুলচেরা বিচার করিলে অবশ্য "একহাতে তাল বাজে না" কিংবা "যা রটে, তা কতক বটে"; কিন্তু কোন মানুষকে study করিতে এই আপাতসিদ্ধান্ত বা অপসিদ্ধান্তগুলিতে ক্ষতি ছাড়া লাভের কিছু হয় না।

কাহাকেও ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে আত্মবিশ্বাসের অহঙ্কারকে কিঞ্চিৎ দমাইতে হইবে। যাহাকে বলে prejudice, তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া যা-তা ধারণা করিয়া বসা—এই অপচার হইতে হৃদয়কে মুক্ত রাখিতে হইবে। আর ঠিক নিরপেক্ষভাবে যে কাহাকেও বুঝিতে চায়, তাহার মধ্যে ঐ কলুষ থাকিতে পারে না। সংস্কার চিত্তের মালিন্য—উহা লইয়া স্বরূপ সাধনা হয় না। সংস্কার নিঃশেষে যাইতে পারে না—কিন্তু এটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, আমার ধারণার উপরেও আমার হাত থাকা দরকার—যা বুঝি তাই চরম নয়। সংস্কারেরও সংস্কার অসম্ভব নয়।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক আছে,

আক্ষরিক অনুবাদ দিতে গেলে যাদের হেঁয়ালী ব্যতীত আর কিছু মনে করা চলে না, সেই শ্লোকগুলি প্রত্যেক মানুষের বেলাতেও খাটে। এক জায়গায় আছে—"যে বলে, ব্রহ্মকে বুঝিয়াছি—সে বোঝে নাই; আর যে বোঝে নাই, সে-ই বুঝিয়াছে।"

তথাকথিত ব্রহ্ম লইয়া টানাপাড়া করার আগে মানুষের মাঝেই এইগুলি খাটাইয়া দেখা দরকার। বাস্তবিকই যে মানুষকে আমি বুঝিয়া ফেলিয়াছি মনে করি, তাহাকে নিশ্চয়ই বুঝি নাই। এ কথা যে কতদূর সত্য, তাহা যাঁরা মানুষ চরাইতেছেন, তাঁহারা বেশ বোঝেন।

মানুষ একটী অপূর্ব্ব চীজ। প্রায় ক্ষেত্রেই যাকে যা ভাবি, সে তা নয়। যেমন কাহাকেও বিশ্বাস নাই, তেমনি অবিশ্বাসও করিতে নাই। অন্ততঃ কাহারও সম্বন্ধে কোন positive ধারণার চেয়ে negative ধারণায় বিপদের আশঙ্কা কম।

ঠিক ঠিক কাহারও জীবনকে যদি বুঝিতে হয়, তার সম্বন্ধে চিত্তের সমাধি আনিতে হইবে—যোগদর্শনও এই কথাই বলে। কাহারো সম্বন্ধে কোন ধারণা হওয়া মানেই অপর সম্বন্ধে ধারণাকারীর চিত্তে বৃত্তি উৎপাদন। তাহাতে আর সমস্ত ক্ষতির কথা ছাড়িয়া দিলেও আত্মতৃপ্তি যে ব্যাহত হয় ইহা ধ্রুব। কাহাকেও খারাপ ভাল যাহাই ভাবি না কেন, চিত্তে দাগ পড়িবেই। এই দাগটাকেই চরম রাখিলেই ঠকিতে হইবে—অর্থাৎ সে মানুষকে ঠিক জানা হইবে না। কাহাকেও জানিতে হইলে তাহাকে ভুলিতে হইবে—অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে তোমার চিত্তের যত ধারণা, সমস্তকে অবদমিত চেতনায় রাখিতে হইবে। আরও কথা এই, ভাবনারও একটা জোর আছে; যাহাকে যাহা ভাবা যায়, সে তাহাই বনিয়া যায়। ভাব দ্বারা লাভ ক্ষতি দুই-ই ঘটানো যায়। কাজ কি ক্ষতি ঘটাইয়া? কেহ যদি মূলতঃ খারাপ হয়, তবু তোমার ভাল ভাবনা নষ্ট হইবে না—অর্থাৎ বিশ্বাস করিলে ঠকিবে না। বিশ্বাস কর আর না কর, অন্ততঃ অবিশ্বাস করিও না। তার খারাপত্বের মাঝেও একটা নাড়াচাড়া ঘটাইবার ক্ষমতা তোমার সদ্‌ভাবনাতে আছে।

যত মনোমালিন্য দেখি, সমস্তের মূলেই একের প্রতি অপরের ভুল ধারণা। যাহাদের সঙ্ঘ বাঁধিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের মধ্যে এই বিপদ আরও বেশী। পরস্পর ভুল বুঝিয়া কাহারও শান্তি হইতেছে না। অনিচ্ছাসত্ত্বে ভুল হইয়া যায় যাক্—কিন্তু জ্ঞাতসারে কেন মনকে সাক্ষ্য রাখিব না! মানুষের অন্তর ভালয় মন্দে যুগল হইয়া আছে;—যদি দেখিতেই চাই, তবে একদিকে দেখিলেই চরম হইবে না।

নিরপেক্ষ থাক, সে আলাদা কথা। কিন্তু নিরপেক্ষ থাকিলেও মনে মনে টেলিগ্রাম চলে। তখন একটা কিছু না ভাবিয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠে। ঐ তো বুদ্ধির পরীক্ষা।—যদি ঠিক ঠিক জানিতে হয়, তবে ঐখানে তফাৎ থাকিতে হইবে—'এই তো পাইলাম' মনে করিয়া ধরা পড়িয়া গেলে চলিবে না। চিত্ত যতক্ষণ ধারণামুক্ত থাকে, ততক্ষই ঠিক শান্ত। শান্ত চিত্তই সত্য ধারণায় সক্ষম। বৃত্তি জাগাইলেই সব এলোমেলো হইয়া গেল।

তারপর ভালবাসার কথা আনিলে তো সকল ল্যাঠাই চুকিয়া যায়।—কাহাকেও ভালবাসা মানেই তাহাকে ঠিক ঠিক জানা বা জানিতে চলা—এ কথা একটুও ভুল নয়। তুমি যাহাকে ভালবাস, আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তাহার সম্বন্ধে তোমার চিত্তের ভাল-মন্দ যে কোন ধারণাকেই তুমি চরম ভাবিতে পার না। তাহার সম্বন্ধে একটা আচম্কা সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতে গেলে হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে—ইহা সহস্র ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহার সবটুকু চাই, তার এতটুকু লইয়া অর্দ্ধপথে থমকিয়া দাঁড়াইব না—নিঃশেষে নিজের মাঝে টানিয়া আনিয়া তবে ছাড়িব—সে আর আমি এক! যে কোন মানুষ

সম্বন্ধে এমনি আশ্চর্য্য অনুভব যার আসে, সেই ঠিক মানুষকে বুঝিতে পারে।

একটী মানুষকে যে বুঝিয়াছে, সকল মানুষকে সে বুঝিবে; একজনকে খাঁটী ভালবাসায় যে জানিয়াছে পাইয়াছে, জগতের কেহই তার অজানা থাকিবে না। ব্রহ্মকে জানার কথা বলিতেছ? সবকে জানা আর ব্রহ্মকে জানায় তফাৎ কি? তথাকথিত ব্রহ্ম ধারণার চেয়ে মানুষ ধারণাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষেই ব্রহ্ম ধারণা—এই একটী কথা হইতেই সনাতন ধর্ম্মের গুরুবাদ, শক্তিসঞ্চারবাদ, অসাধনের ধনকে পাওয়া ইত্যাদি অনেক মহৎ মহৎ তত্ত্বই আসিয়া পড়ে। যাক্ সে সব—মোট কথা, কাহারও উপর কোন ধারণা করিতে নাই, করিলে তাহার ক্ষতি করা হয়—ভালবাসার মুণ্ডপাত হইয়া যায়। সব চেয়ে বড় ক্ষতি—ঠকিয়া যাইতে হয়। ইচ্ছা করিয়া কে ঠকিতে চাও? জানিতে যখন চাও, শেষ পর্য্যন্তই দেখ না কেন!

"যা ভেবেছ তা নয়"—মনকে এ কথাটী সর্ব্বদা শুনাইতে হইবে; যদি জগৎকে তলাইয়া বুঝিবার প্রয়োজন থাকে। আর যদি শুধু নিজকে নিয়া থাকিতে চাও—সে পথও আছে—শাস্ত্রেরই ব্রহ্ম-বিহার—মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা; ব্রহ্ম অর্থে বড়, ব্রহ্ম-বিহার অর্থে মনকে সর্ব্বদা বড় করিয়া রাখিতে হইবে; যে যা-ই থাকুক না কেন, তোমার চিত্তে যেন ঐ কয়টী ধারণার বাহিরে অন্য ধারণার ছাপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া না পড়ে।'

সব চেয়ে বেশী ভাবে মানুষ সাধারণতঃ পরের দোষ নিয়া—পরচর্চ্চার কি একটা সম্মোহনশক্তি আছে! কিন্তু তোমার-আমার জীবনে সব চেয়ে অদরকারী ঐ বস্তুটাই—ইহা তুমি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পার। বলিতে পারি—মৈত্রী, করুণা, মুদিতার চেয়ে উপেক্ষার আমাদের প্রয়োজন বেশী আছে। পরকে লইয়া, বিকৃত-ধারণায় মস্তিষ্ক ঘুলাইয়া শক্তির যে অপব্যয় ঘটে, উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা তাহার নিয়ন্ত্রণ চলিতে পারে। পরচর্চ্চায় প্রায় ক্ষেত্রেই দুষ্ট চিত্তের কণ্ডূতি নিবারণ ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। যখন ভাব দ্বারা ভাবিত করিবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর তোমার আমারও আছে জান, তখন মন্দটুকু ছাড়িয়া ভালটুকুই অন্ততঃ গ্রহণ কর—যদি সে ক্ষমতা আরো বাড়াইতে চাও! কিন্তু যে পরচর্চ্চায় মানুষকে আত্মাঙ্ক দুর্ব্বল করে, সে পরচর্চ্চা বাদ দিয়া উপেক্ষা দ্বারা নিজের শক্তি ও শান্তি অক্ষত রাখা যে সুসমীচীন, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে।

বুদ্ধি একটা জিনিষ, হৃদয় আর এক জিনিষ। অথচ দুইটাই মানুষের মাঝে গলাগলি হইয়া আছে। বুদ্ধির ডগা পর্য্যন্ত গিয়া হৃদয়ের নাগাল পাওয়া যায়। বুঝিয়া ফেলিয়াছি মনে করিয়া যে বোঝা, সেই বুঝকেই উপনিষদ্ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; কিন্তু অগ্র্যা-বুদ্ধিকে অনধিকারী বলেন নাই। অগ্র্যা-বুদ্ধিই হৃদয় দ্বার। মনের মায়ার পার পাইয়া, ছিন্ন-সংশয় stageএ পৌছাইয়া যখন মানুষ নিজের দিকে স্পষ্ট করিয়া তাকায়—তখন দেখে, ঐ যে হৃদয়-দ্বার খুলিল—ওখানে আর কাহারো অনধিকার নাই, কোথাও এতটুকুও ফাঁকি নাই। হৃদয় দিয়া পাইলেই সবটুকু পাওয়া যায়। মানব-জীবন সম্বন্ধে বাঁধি-গৎ আওড়াইয়া যাওয়া আর "অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ" নীতিবাগীশী ফলাইয়া চলা একটা অভিনব কিছু নয়; গতানুগতিক জড় বুদ্ধি মাত্রেই চিরকাল তাহা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে, জীবনকে হৃদয় দিয়া জানা, বোঝা এবং পাওয়া—এইগুলিই নূতন কাজ। হৃদয়হীন বুদ্ধি-বিজৃম্ভণ দুদিনের চটক মাত্র—কোন নিরপেক্ষ সত্যান্বেষী তাহাতে মুগ্ধ হইতে পারেন না। আর যে ভালবাসে, তার তো কথাই নাই; জগৎকে ভালবাসি মানেই জগতের কল্যাণীয় রূপ সর্ব্বদা অন্তরে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া নয়, প্রত্যক্ষ করাইয়া তবে ভালবাসার মুক্তি।—

কল্যাণ-স্বরূপ তাহাকে একদিন পৌঁছাইতেই হইবে—যে পর্য্যন্ত না পৌঁছাইবে, সে পর্য্যন্ত আমার কোন ধারণাকেই আমি চরম ভাবিয়া তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতে পারি না—চরমে না পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে পারি না। মানুষকে নিত্য নূতন রূপে দেখিতেছি—সে চির রহস্যময়—তাহার সম্বন্ধে মনের বাঁধন রাখিতে পারিব না!—প্রেমের বাঁধনে মনের মুক্তি ইহাকে বলিব কি?

অবিশ্বাস কথাটীর ব্যাখ্যা এই দিতে পারি—ভুল বোঝা, কুধারণা করা, কাহাকেও খারাপ ভাবিয়া নিজের মন খারাপ করা—ইত্যাদি। মনকে যত প্রকারে ছোট করিতে পারে অবিশ্বাসের কেবল তাহাই সন্ধান। প্রত্যেকটী কথা নিজের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিও। পরকে দুঃস্থ দেখিলে তোমার জ্বালা হইবে কেন? মমতা বা সহানুভূতি না জাগিয়া ঘৃণা আসিবে কেন? এ তো আগুন দিয়া আগুন নিবাইতে চাওয়া মাত্র। ভ্রান্ত মানুষ ভুল বুঝিয়া মানুষকে ভাল করিবার অছিলায় মন্দই করিতেছে, সুখ দিবার নামে ব্যথাই দিতেছে। মনে কর কি—প্রতীকারটা শুধু শুধু বাইরে বাইরেই হয়? প্রাণের যোগ নাই যাহাতে, সে ইচ্ছা যত শুভই হউক, ফল ধরিবে না; আকুলি-বিকুলিই সার হইবে—যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে না।

চায় সকলে ভাল জিনিষটাই, কিন্তু ভুল বুঝিয়াই মাটী করে। স্বপ্রতিষ্ঠ নিরুদ্বিগ্ন ভাব না আনিতে পারিলে পরের দুঃখে দুঃখী হইবার দুঃসাহসটী করিও না। পরের ভাবনায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া তোমারই অভিমানের বেলুন ফাঁপাইতেছ, কোন্ মুহূর্ত্তে চুপ্‌সিয়া যাইবে—সব আঁধার হইবে; কোথায় তখন হিতচেষ্টা, আর কোথায় তোমার গাঁটের পুঁজি! ভালবাসার চেষ্টা বাহিরে প্রমাণ করিতে গেলে এমনই হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালবাসা মানেই জগতের কল্যাণীয়তম রূপকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করা;—তাহার সঙ্গে ভুল বুঝিয়া আঁধারে ঢেলা ছুঁড়িয়া কাহারো মর্ম্ম-দুর্গ জয় করিবার দুশ্চেষ্টা এতটুকুও নাই। বৃথা ভুলের বোঝা বাড়াইও না—স্বপর্য্যাপ্ত হও; কাজের কাজ কর, যে কাজের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক আছে। শান্তি পাও আগে—কর্ত্তব্য-সংসারের সীমা এই পর্য্যন্তই। পরের ভাবনা ভাবিতে হয় না—সময় আসিলে স্বয়ং ভাবময়ই উহা ভাবান।

* * * *

বন্ধুমহলে মেলামেশার চরম আদর্শ লইয়া কত মাতামাতি করিয়াছি, কত অন্যায্য দাবী করিয়া বন্ধুদের ভুলের বোঝা বাড়াইয়াছি, সোজা মন বাঁকাইয়া দিয়াছি—কিছুতেই মনের ক্ষুধা মিটে নাই। কৃত্রিমতার ভিখারী সে নয়। সে যেন সকলের কাছে লুটাইয়া পড়িয়াও রাজার রাজা! কিন্তু সেওয়াইতে যাওয়া কেন?—সময়ে যে মানুষ আপনি সয়, এ কথাটী মনে থাকে না কেন? মিলন যে কিছুতেই মনের মত হয় না—এ ক্ষেত্রে আজ আমি এই কথাটাই বড় করিয়া ধরিয়াছি যে, আমারই মনটীকেই মনের মত করিয়া গড়িতে পারি নাই; মনের মত **করার** আগে মনের মত **হওয়ার** যে কত বেশী প্রয়োজন, এ কথা আজ প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি। সত্যি বলিতেছি, পরকে ভাল বুঝিয়া, মন্দ বুঝিয়া, ভুল বুঝিয়া—বুঝিবার শতেক কেরামতীতে কোন লাভ নাই; নিজকে ঠিক বুঝিলেই সব হয়। নিজের ভুলটী আগে ধরিতে পারিলেই মানুষ ঠিক কাজের কাজী হয়। এর আগে সে শুধু ভুলের বোঝা বহিয়া মরে—রসের আশ্রয় পায় না কোথাও।

অনেক ভুল ভাঙ্গিল। দিনের পর দিন ভাঙ্গিতেছে—আর একটী একটী করিয়া মনের গ্রন্থি টুটিতেছে। আরও কত ভুল ভাঙ্গিবে। অভিমানের মাথা নোয়াইয়া দাও। ভুলের সংসারে ভুলের বেচাকেনায় হার-জিৎ সবই সমান। আজ আমার কি আনন্দ—জগতের কারো জন্য আমার আর এতটুকুও

নাই; সব সঁপিয়া দিয়াছি তাঁর হাতে। তুমি-আমি কার কি করিতে পারি? কিসের অভিমান এ? কার জন্য জ্বলিয়া মরিবার অধিকার তোমার আছে ভাব? শুধু স্তব্ধ হইয়া দেখ—অতন্দ্রিত পুলকে চাহিয়া থাক! ভুল ভাঙ্গিবার কি সুন্দর ব্যবস্থা আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া আছে! তুমি তাহার মাঝে নিজকে ঢালিয়া দিতে পার—স্বাধিকারে প্রমত্ত হইবার এতটুকু অধিকারও তোমার নাই। ঋণ রাখিও না—মনে গিরো রাখাটাই সব চেয়ে মারাত্মক ঋণ। উহাতে অন্তর-বাহির শুষিয়া খায়। তুমি মুক্ত—চির নিষ্কিঞ্চনতাই তোমার গৌরব। যদি ঠিক ঠিক মানুষ চিনিতে চাও, জানিতে চাও, শেষ কথা পাইতে চাও, বোঝার বোঝা আর বাড়াইও না ভাই! জান, সবই ব্রহ্ম—অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্! সর্ব্বত্র জীবে-শিবে লুকোচুরী। ইহাই মজা!

যেদিন্ হইতে বুঝিবার অভিমান ছাড়িয়া দিলে—তুমি যে কি মুক্তিই পাইলে, তাহা বলিবার নয়। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিও, কত রূপান্তর তোমার ঘটিয়া গেল! নিজের ভিতরই দোষ রহিয়াছে বলিয়া পরের দোষ দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতে। উঃ—কি ঘোর দুর্ব্বলতা! কি প্রবল আত্মান্ধতা! আজ শুধু শান্ত নয়নে চাহিয়া আছ—প্রভাতের শুকতারাটীর মত অপলক প্রশান্তিতে। উগ্র উপেক্ষা আজ সংগ্রহ প্রতীক্ষায় রূপান্তর লইয়াছে, অবিশ্বাস আজ সরল বিশ্বাসের কোলে মাথা রাখিয়াছে—কি পবিত্র, কি নিরীহ, কি মর্ম্মস্পর্শী সে রূপান্তর! আজ বুঝিতেছি—পারে, মানুষ সবই পারে!—আমিই বৃথা ভুল বুঝিয়া জগৎকে এত কষ্ট দিয়াছি—সরল সত্যকে না বুঝিয়া কাঁদাইয়াছি!.........

—"ব্যথিত"

মুক্ত

বোঝার ভারে শ্রান্ত হিয়া
অবশ হয়ে আসে;—
বেদন পরকাশে!
তোমার কবে লগন হবে—
কও গো মোরে কও!—
বিরূপ কেন রও?
তোমার লাগি আঁধার জাগি,
প্রহর গুণি তায়—
চির প্রতীক্ষায়;
পথের পানে দিগ্‌বিদিকে
চাহি অকারণে—
ভাব্‌না শুধু মনে;
জীবন বোঝা চরণে কবে
নীরবে যাবে নামি?
মুক্ত হব আমি—ওগো মুক্ত হব আমি

বিদায়-মঙ্গল
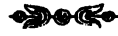
মহাকাল-সায়রে বৎসরের বুদ্বুদটী মিলাইয়া গেল—ক্ষুদ্র মানবকল্পনায় যতি পড়িল। আমার অল্পধনের ভাণ্ডার রিক্ত না পূর্ণ, একবার ভাবিয়া লইতে চাই। ভাবিতে বড় সুখ; বস্তুতঃ কোন লাভ তাহাতে হইবে না হয়ত, তবু ভাবিতেছি—কেননা ভাবা স্বভাব। শেষ দিনে ভাবিতে হয়। শুনিয়াছি, মৃত্যুকালে নাকি সমগ্র জীবনটার ভাবচিত্র মনের উপর দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া সহসা খেলিয়া যায়। এই যুগপৎ জ্ঞানকে ব্যাপ্ত অনুভব বলিতে পারি। সমগ্র জীবনকে যুগপৎ অনুভব করিলে কি ক্ষুদ্রতা থাকে? আমরা ক্ষুদ্রতা লইয়া অতীতকেও আজ অন্ধকার থাকিতে দিব না— ভবিষ্যতের নবীন বার্ত্তা মর্ম্মে পশিয়াছে;—বিহ্বল করিতে নয়, আর একটীবার জীবনকে পূর্ণরূপে ভাবিয়া লইতে। সমগ্র অতীতের পরিপূর্ণ অনুভবের সঞ্চয় লইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে বর্ত্তমানের মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের কর্ম্মগহনে উদার প্রাণে দুঃখবরণে ঝাঁপাইয়া পড়িব। আমাদের ভয় নাই, ভাবনা নাই; নিত্যকর্মানুষ্ঠানে শুদ্ধ চিত্ত, সুপরিস্রুত সলিলের ন্যায় জীবন্ত শক্তিধারা জীবন আমাদের—বৎসরের পর বৎসর লীন হইতেছে, পরিপূর্ণ মমতায় মহাকাল আমাদের হৃদয়োৎস্থষ্ট রসধারা পুলকে আনন্দে পান করিতেছেন।—আমাদের সমগ্র জীবন তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদিত হইক। শ্রীগুরুর দক্ষিণদৃষ্টি আমাদের ভব-প্রদক্ষিণের নায়ক হউক। যেন অন্তরের ইঙ্গিতে চলি—যেন ব্যথায় অন্ধ না হই, আঘাতে মুহ্যমান না হই! ওঁ স্বস্তি!

* * * *

শ্রদ্ধা ও তপস্যা কর্ম্মজীবনের ভিত্তি। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও দশের প্রতি শ্রদ্ধা। হয়ত এ উদার লক্ষ্য হইতে বহুবার আমরা বিচ্যুত হইয়াছি। কিন্তু পূর্ণ জীবনের অনুভবে হৃদয়ে যখন রিক্ততা রহিল না, তখন দেখিয়াছি, ক্ষতিকে ক্ষমা করিবার শক্তিও আমাদের প্রেমের আছে—আমরা কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে চাহি নাই। ক্ষণিকের স্খলনকে কাহারও জীবনের চিরন্তন বোঝা হইয়া উঠিতে দিব কেন? আমরা সবে মিলিয়া তাহার ভাগ লইব! প্রত্যেকে নিজের মমতামহৎ অনুভবকে জাগাইয়া তুলিয়া একবার সকলকে প্রাণে মনে পাইবার এই যে সন্ধিক্ষণ যায়—একবার নিজের প্রতি খাঁটা শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠুক—সর্ব্বব্যাপী তুমি—সকলের মাঝে তুমি—কাহাকে আজ অশ্রদ্ধা করিবে বল? অশ্রদ্ধা যে তোমারই অব্যাপ্তি। হৃদয়ে না পশিয়া দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলে, উহা যে তোমারই অভিমানের মূঢ়তা। মনের সকল গ্রন্থি এলাইয়া দাও—বিশ্ববরেণ্য হইয়া বসিয়া থাক, ক্ষণে ক্ষণে প্রতিজনে সেই কল্যাণীয় চিরসুন্দর শ্রদ্ধাপুলকিত আত্মমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর। অন্ধকার কোথাও নাই—কাহারও অস্তিত্ব জগতে বৃথা নয়—সব পূর্ণ, সবাই শ্রদ্ধার পাত্র, সবই সুন্দর। এই তো নিজকে দিবার সুযোগ—তপস্যার মাহেন্দ্রক্ষণ। দেশের কাজে দশের কাজে লাগিয়া যাইতে বাধা কি ভাই? যতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া হিসাব করিতেছিলে, তপস্যার প্রেরণা বুঝি ততক্ষণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। এই যে নামিয়া পড়িয়াছ, আর তো কোথাও অসম্পূর্ণতার ক্ষোভ নাই—উপকরণের প্রতি দোষারোপ করিয়া আত্ম-

শক্তিবিস্তারে কৃপণতা নাই। শ্রদ্ধায় তুমি নিজকে জাগাইয়াছ—দেশকে বুঝিয়াছ, দশকে দেখিতে পাইতেছ; এইবার তপস্যায় নিজকে দাও। অপূর্ণ জীবনপাত্র আত্মদানের গৌরবমদিরায় পূর্ণ কর—পান করিয়া শক্তির প্রেরণা শিরায় শিরায় মত্ত ঝঞ্ঝা বাজাইয়া তুলুক!—আমরা দেশের জন্য দশের জন্য ধর্ম্ম্য যুদ্ধে প্রয়াণ করিব। সে যুদ্ধের ক্ষেত্র কোথায়?—অন্তরে! সে যুদ্ধ কার সহিত?—অধর্ম্ম, অন্যায় ও দুর্ব্বলতার সহিত—নিজের সহিত!

* * * *

একটীবার ক্ষণেকের জন্য আত্মস্মরণ করিয়া লইলাম। আমার প্রতি শ্রদ্ধা আমার হৃদয়কে বিশ্বের প্রতি মমতায় পূর্ণ করিয়া তুলিল। কঠিন স্বার্থ প্রেমে দ্রব হইল, তখন তো ত্যাগস্বীকারে দুঃখ নাই—দুঃখ থাকিয়াও নাই। শ্রদ্ধামূলে তপস্যা ইহাকেই বলি। জীবনের যে জাগরণ নিঃস্বার্থ, তাহাই বিশ্বের পক্ষে রুচিকর রসায়ন—প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকে এই নিঃস্বার্থ ভাবই চায়। 'চাওয়া' প্রথম সুর; 'দেওয়া' দ্বিতীয় সুর। 'পাওয়া' উভয়ে সেতু রক্ষা করিতেছে। আমরা পরস্পরকে পাইতে চাই, নিজকেও দিতে চাই। কিসে বাধিতেছে, এতদিন বাধিয়াছে—আজ তাহাই একবার ভাবিয়া লইব। অটুট সঙ্কল্প রক্ষায় আত্মগৌরব রাখিতে চাই। এ আমার একার সঙ্কল্প নয়—দেশের, দশের, বিশ্বের। যাহা প্রাণ হইতে ধ্বনিত হইতেছে—বিনা চেষ্টায় বিনা সাধনায় পাওয়া সেই অসাধনের ধনকে নিয়া আমি একা থাকিতে পারি কি? এসো এসো ভাই সব, একটীবার ভাবিয়া লই; বেসামালকে সামাল দিবার অধিকার অর্জনে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হই। শেষ আসন্ন, জানি না কোথায় কাহাকে লইয়া চলিতেছে। যিনি লইয়া চলিয়াছেন, প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদী অভিপ্রায় হৃদয়ে বহিয়া চলিতে থাক ভাই যে যার পথে—একটীবার অতীত পানে চাহিয়া দেখ, কি তোমার গৌরবের ছিল, আর কি তোমাকে বাধা দিয়াছিল। বাধা চিরন্তন নয় কিন্তু ক্ষত হয়ত মিলায় নাই; তবু তাঁহার হাতের বেদনার দান এড়াইয়া মুক্তি চাহিও না ভাই—এই নিষ্কিঞ্চনতা তোমার স্বস্তির গৌরব, অস্বস্তিরও গৌরব হউক।

* * * *

পরের কথা ছাড়িয়া দাও। পরের প্রতিনিধি তুমিই আছ। সমাজের অকল্যাণের শাস্তি তোমারই প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বেদনাভরে বহন করিতে পার যদি, তোমার দ্বারাই সমাজ ঋণমুক্ত হইবে। তোমার জীবনকে তুমি পূর্ণরূপে খাটাইতে পারিলে তাহাতেই ধন্য হও—পরের সংস্কার করা একটা হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। সমস্ত উচ্ছ্বাস, সমস্ত আড়ম্বর সংযত করিয়া প্রত্যেককে নিজের কাজে লাগিতে হইবে—আজ বিদায় বেলায় এই সঙ্কল্পেরই প্রস্তুতি গাহিতে বসিয়াছি। দশকে আমি ভাবিব বটে, কিন্তু তাহার কেন্দ্র থাকিব আমি। সকল গ্লানি, সকল ক্ষতি নিজের বলিয়া গায়ে পাতিয়া প্রাণে মানিয়া মনে বহিয়া চলিতে হইবে—ভুলিলে চলিবে না যে একটী আত্মা যে সংসারে জাগিয়াছে, সে সংসারের অকল্যাণ সবার হইয়া তাহাকে বহিতে হইবে—নিজে বিবিক্ত দোষমুক্ত থাকিলেও গঞ্জনায় ভাগ লইবার বেলায় সবার অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে। দার্শনিকতার ভড়ং দিয়া হয়ত কখনো ভাবিয়াছ—"কিছুই তো আমার নয়।" দর্শনের এ ভ্রান্তিতে আগুন ধরাইয়া যাও। সব দায় তোমার—সব দোষ তোমার—একমাত্র তোমার প্রণতিতেই সকল ঔদ্ধত্য প্রশান্ত হইবে, সকল দোষ কাটিবে, সংসারে শৃঙ্খলা আসিবে। সমাজের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্যে অপ্রমাদই কর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়া লইবার, আবার একটীবার নিজকে ভাবিয়া লইবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আজ—ইহাকে শ্রদ্ধাভাবে স্বীকার কর। হয়ত হারিবে, হয়ত ঠকিবে ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিও না।

ঝাঁপাইয়া পড়াই কাজের কাজ—অন্তরাল হইতে ভাবের যোগান যিনি দিতেছেন, তাঁর কাছে রাত্রি-দিনের বৎসর-মাসের নূতন-পুরাতনের ভেদ নাই। তুমি তাঁহাকে ধর, তাঁহার কথা ভাব—অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে পাইতেছ এ অহঙ্কার ভুলিয়া একটীমাত্র নীরব চেষ্টায় মিলিয়াছে যে ভাগ্য, তাহাকেই চরম সার্থকতা মানিয়া ধন্য হও। তুমি পূর্ণ হইলেই সমাজ পূর্ণ হইবে—ভাষা হিসাবে ইহা ডগ্‌মা বটে, কিন্তু বড় মিষ্টিরিয়াস্ ডগ্‌মা—ইহাকে স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। তোমার শতেক চাপল্যে অচপল প্রভু তোমার স্বস্তি বিধান করুন। সমাজের প্রত্যেকের প্রতিনিধি হইয়া প্রত্যেকে বিশ্বপতির নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লও—অক্ষমকে ক্ষমা দ্বারা সক্ষম কর, নিজের অক্ষমতার শোধন কর—জ্ঞানে ও তপস্যায়। বর্ষবিদায় বেলায় আজ ইহাই আমাদের ভাবনাসূত্র যে, নিজের পথে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি। আমিই আমার সমাজের মাপকাঠি কি না, ইহা শতেক ঘটনায় তো বাজাইয়া দেখিলে, এবারে কাজে লাগিবার জন্য প্রস্তুত হও—আত্মশক্তি বিশ্বশক্তিতে পরিণীত হউক!

* * * *

আদর্শের অভাব আমাদের মোটেই ছিল না। আত্মদান-মহিমায় অনেক মহাজনই প্রাণে আকর্ষণ রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কথাও একবার ভাবিব। অন্তরে অন্তরে যাহা চাহিয়াছি, সকলই তো তাঁহাদের নিকট পাইয়াছিলাম; তবু আমরা সকল দিক দিয়া সফল হইতে পারিলাম না কেন? —আত্ম-শক্তির অভাবে। আদর্শকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই রহিয়াছে, কিন্তু সেদিক দিয়া আমরা পরিপূর্ণভাবে প্রয়াস পাই নাই। অতীত গ্লানি মুছিয়া যাউক, অভিনব সংকল্পের সঙ্গে নব ভবিষ্যতের পরিণয় ঘটাইতে এবার আত্ম-শক্তিকেই বরেণ্য বলিয়া ধরিব। তিনি আমাদের ভিতর প্রত্যেকের 'আমি' রূপেই জাগিতে চান। নতুবা লীলা পূর্ণ হয় হয় না। সকল বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিজকেই যেন সমাধানরূপে দাঁড় করাইতে পারি—ইহাই আমাদের আদর্শ। প্রাণ ভরিয়া আত্মহিত করিবার পালা এবার আসিয়াছে—আদেশ নির্দ্দেশ উপদেশের অভাব নাই কোনদিকে। এখনো প্রাণের আগুন জ্বলিয়া উঠে না কেন—আপন বেগে আপনি চলিতে শিখিলাম না কেন, ইহাই ভাবিতেছি। তিনি দূরে দাঁড়াইয়া সবি দেখিতেছেন—এ কথা মনে পড়িয়াছে। আর তো আলস্যে-অবহেলায় পশ্চাৎপদ থাকিতে পারি না। তাঁহার গৌরব রাখিতে হইবে। তিনি অফুরন্ত দিতেছেন, ধরিয়া রাখিয়া কাজে খাটানই আমাদের গৌরব। আদর্শ আমরা জানি, ঐ যে দেখিতে পাইতেছি, আজ তাহাকে ভালবাসিব—অর্থাৎ আত্মমিশ্রণে প্রস্তুত হইব। শক্তি তুমি দিয়াছ প্রভু—ধ্রুবাস্মৃতিতে আয়ত্ত রাখিতে পারি যেন।

* * * *

মনোমালিন্য আমাদের বাধা দিয়াছে। অসরলতা ইহার ভিত্তি ছিল। যারা স্বেচ্ছায় দেয় না, ভগবান্ তাহাদেরটা কাড়িয়া লন। ইহাকে দুর্ভাগ্য বলিব না। সঙ্ঘ-জীবনে সংহত মনোবৃত্তির প্রভাব কত প্রবল! প্রাণ কি বলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করি নাই—কেবল গতানুগতিকতার জের টানিয়া চলিয়াছি। তাই বুঝি কিছু পাইয়াও পাইতেছিলাম না। কত ভাবিয়াছি, তাই ত, কি হইল!—কিছুতেই মোহ ভাঙ্গে নাই। উহা আমারই মনের মালিন্য। উদার প্রকাশের স্থল না পাইয়া আপনাতে আপনি ঘুরিয়া মরিতেছে—ব্যথার আবর্ত্ত কেবল গভীর হইতেছে। একবার নিজকে ছড়াইয়া দিলাম—অপরকেও স্বীকার করিলাম, মনোমালিন্য ঘুচিয়া গিয়া আবার সেই নির্ম্মল প্রেরণায় প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্য! মানুষের উপর মানুষের প্রভাবে এমন মহিমাময়, তাহা তো জানিতাম না। সকল দিক হইতে শুধু মানুষকে

বুঝিবার প্রেরণাই আসিতেছে! আমরা যদি পরস্পরকে পরস্পর বুঝিতে চাহিতাম, অলক্ষ্যে হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া যাইত। যেমন করিয়া হউক, অভিমানের নিরসন, অবিশ্বাসের মূর্চ্ছা; আত্মশক্তির জাগরণ ও প্রেমের প্রকাশ! চরাচর এক আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল—আমি সবার ভাবের ভাবুক হইয়া উঠিলাম—ইহা অপেক্ষা বড় শুদ্ধি আর হইতে পারে না। এই মনকে সাফা করায় সকল কাজও সাফা হইয়া আসিতেছে। পরকে নিরুদ্বেগ করিতে গিয়া নিজের ভিতর পরিপূর্ণ প্রেমের আবেগ অনুভব করাই যেখানে প্রাণের কথা, সেখানে মনোমালিন্যের স্থান কোথায়? অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই—প্রাণে প্রাণে যোগসূত্ররূপ ঐ প্রেমের আলোটী জ্বলিতে থাকিলেই তিনি প্রাণ ভরিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। সবার সঙ্গে যোগ রাখিতে গিয়া নিজের ভিতর তাঁহার সহিত যোগ আবিষ্কৃত হইল কি করিয়া, বিস্মিত পুলকে তাহাই আজ ভাবিতেছি!

* * * *

নীরবে ভাব। অন্তরমন্দিরে ধ্যানস্থ হও। সকল কর্ম্মের চরম তোমার নিজের মাঝেই—এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিব। প্রাণ হইতে যদি না চাও, প্রাণের স্পর্শ পাইবে কি করিয়া? কে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ভাই?—তোমার কর্ম্মফল, তোমার ভ্রান্তি। তোমাকে তুমি মুক্ত কর—তোমার মাঝে সকলে পরিত্রাণ পাইবে। আত্মানুভবের পবিত্র ফল স্বরূপ স্নিগ্ধ আত্মপ্রকাশ—ইহার মধ্যে দুশ্চেষ্টার কারিগরী এতটুকুও নাই।—এমনি সরলভাবে দিতে পারিবে, যদি নিজের মাঝে নিজে সবল থাক। নানাদিক হইতে এই একটী শিক্ষা বারবার পাইয়াছি—কাহারো অধিকারকে স্বার্থপরের মত গ্রাস করিয়া কল্যাণ নাই; সকলকে সুযোগ দিতে হইবে—সকলেই নিজকে বাজাইয়া লউক, নিজ সামর্থ্য বুঝিয়া লউক। মুখে আজ আমি দেশের দশের জন্য মহাব্যস্ত, এরূপ যেন বোধ হইতেছে, কিন্তু অন্তরে দেখিতেছি, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিতেছি—আমি শুধু ভাবি, আমার কথা। আমার বাড়ী, আমার ভাই-বোন্, আমার গুরুজন—ইহাদের মধ্যে আমি কি পাইলাম, এবার আমার বাড়ীতে আমি নূতন কি করিলাম! প্রত্যেকে যদি নিজের বাড়ীটুকু সাজাইয়া তুলি, অলক্ষ্মী থাকে কোথায়? আমার উদ্‌বৃত্ত আনন্দই আমি সবাইকে দিব। উহা ভাগের কাজ নয়—তপস্যার রচা সদা-উদ্‌বৃত্ত মমতার ধন। পরকে বিলাইবার বস্তু উহাই। নিজকে খোয়াইয়া আত্মদান কে বলে?—পূর্ণ হইতে পূর্ণে প্রয়াণ। তাই বলি ভাই, তুমি তোমার কথা ভাব—নিজে পূর্ণ হও। ব্যস্ত হইতেছ বলিয়াই হয়ত কিছু হইতেছে না। সব কিছুই আপনা-আপনি হয়; তোমার কাজ শুধু ধ্যান ধরিয়া সম্মতি দেওয়া—তলাইয়া নিজকে বোঝা। ইহার বাহিরে যাহাই হইবে, তাহার শক্তি তোমার বাহুতে কার্য্যকালে কোন্ অদৃষ্টচর বিধাতা আপনা-আপনিই যোগাইয়া দিবে। আজ একটীবার প্রত্যেক প্রাণকে স্বসম্পূর্ণ হইতে বলিতেছি! আন্দোলন নয়, মত্ততা নয়, বক্তৃতামঞ্চে উঠিবার জন্য লাফালাফি নয়; বুকের কথা মুখে ফোটাইবার ক্ষণ আসুক, আপন জোরে কাড়িয়া লইবার লোক জুটুক—তোমার স্বস্তি শুধু নিভৃত ধ্যানে, পরিপূর্ণ আত্ম সমাধানে। হিসাব রাখিবার পালা তোমার নয়। তুমি শুধু সংগ্রহ কর—সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিবার যোগ্য হও। আসল কাজ যথাকালে আপনি আরম্ভ হইবে। তখন অতীত ভবিষ্যৎ থাকিবে না, দোনামনা থাকিবে না—তুমি বিস্মিত হইবে। সেই ক্ষণে তোমাকে তুমি দিবে। সে দেওয়া সহজ দেওয়া। এর আগে চাই শুধু অন্তর্নিলীন অপ্রমত্ত জাগরণ—কেহ যেন টের না পায়, এমন কি তুমিও যেন ভুলিয়া যাও যে, হাঁ, তুমি তাঁহারই কাজের যোগ্য হইবার জন্য ধ্যান করিতেছ বটে!—করিতেছ

তোমার সকল 'তুমি' তাঁহাতে লীন হইবে বলিয়া। বল দেখি ভাই, দিনান্তে, মাসান্তে, অথবা বৎসরান্তেই অন্ততঃ একটীবার এইরূপ ধ্যানে বসিতে পারিতেছ কি না?

* * * *

অতীতের যত অসংলগ্নতা, যত আবর্জনা, যত ক্ষোভ—সব ক্ষমা কর্ ভাই! কি চাহিয়াছিলাম, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। বুঝি বা বলা যায় না। তাই কি এত ব্যথা দিয়াছি তোদের? মুখে সরল হাসি দেখিতে কাহার না সাধ হয়? কর্ম্মে অশ্রান্তি, নিরলসতায় শান্তি—বিপর্য্যয়েও মমতা, স্থৈর্য্য, বীর্য্য অনুভব করিতে কে না চায়? আমাকে পাইয়া সবার প্রাণ ভরিয়া উঠুক, ইহা কে না চাহিতেছে? বুঝি বা অবদমিত প্রেমই সাময়িক দ্বন্দ্বের আকারে চোখে ধাঁদা লাগাইয়াছিল! তোরা একটীবার মরমে চাহিয়া ত্থাখ্—প্রত্যেকের নিজের প্রাণটী নাড়িয়া-চাড়িয়া ত্থাখ্—ঐ একই রহস্তে সবার মন বাঁধা রহে নাই কি? সকল ভুলিয়া গিয়া আজ শুধু দেখিতেছি, তোদের সঙ্গে আমার সহযোগ। সে সহযোগ চোখে-মুখে নয়, তাহাতে আড়াল থাকে; তাহা প্রমাণ করিয়া বুঝাইবার নয়। কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি, আমার কত জীবনের হারাধন সে—সে যে আমার তোরাই! এ জগৎকে ছাড়িয়া কোথাও আমি যাইতে পারি না। দিনের শেষে বিচারের তৌলে আমার অক্ষমতার দিকটাই ভারী হইয়া উঠিল—তবু আমি ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাই! আমার ক্ষমতার দৈন্য তোদের মমতার পণ্যে কিনিয়া নে ভাই! আমার যা আছে, সব আমি বিনা মূল্যে দিব! আজ শেষের দিনে নিজের কথা ভাবিতে বসিয়া চারিদিক হইতে ব্যথিত হৃদয় সজল নয়নের দল আমাকে বেড়িয়া ধরিয়াছে দেখিতে পাইলাম। জগৎকে ছাড়িয়া যাইব কোথায়? আত্মদানের প্রেরণা যদি এমনই সত্য হইয়া উঠে—তাহা তোদের মাঝেই সার্থক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি! এ বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা কাহারো আছে কি!

* * * *

বিদায়-বেলা আমার নয়। বিদায় কাল-বুদ্বুদের। আমি চিরন্তন। জগৎ চিরসাথী। এক গেল, অনেক আসিবে। আসলে রিক্ততা নাই। পূর্ণতা আপনি ফোটে। তবু নিজকে লইয়া ভাবিবার প্রয়োজন আছে। যে যে পরিস্থিতির কেন্দ্রে আছি, তাহার সকল দিক শক্তিতে, আনন্দে, প্রেমে, সেবায়, আত্মদানে, স্বসম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া তুলিতে পারিয়াছি কিনা, ক্ষুদ্র ব্যর্থতা সাময়িক সার্থকতার হীন ভাবনা দূরে রাখিয়া তাহা যদি ভাবিয়া লইতে পারি, তবে......তবে যে কি হইবে, তাহা বলিতে পারিলাম না, শুধু বুঝিতেছি, দেহে-মনে-প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া পাইতেছি, নব সৌভাগ্যে এবার তিনি আসিবেনই আসিবেন। ওরে ভাই, একটীবার নিজের দিকে ফিরিয়া তাকা—কারু উপর মন খারাপ করিয়া পিছাইয়া থাকিস্ না—সবটুকু প্রাণ দিয়া মনের আনন্দে নিজকে সাজাইয়া তোল্!—সবাই সাজিয়া উঠিবে, তাঁর চোখ জুড়াইবে! তাঁর সুখের চেয়ে বড় সুখ আমাদের আর কি আছে ভাই বলিতে পারিস্?

সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থান করিতেছেন।

আগামী ১৮ই বৈশাখ হইতে ২০শে বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অত্রত্য সারস্বত মঠের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগুরুর মঙ্গলময় অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসরণ করিয়া "আর্য্যদর্পণের" দ্বাবিংশ বর্ষ সমাপ্ত হইল। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ ২৩শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। শ্রীগুরুর কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহক দিগের আনুকূল্যে আমরা এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দেশের ও বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। আর্য্যদর্পণ যে ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আদরের সামগ্রী হইয়াছে, ইহা ভগবানেরই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল। নববর্ষের পত্রিকা বৈশাখের প্রথমভাগে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডারযোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ১লা বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের প্রথমভাগেই গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ২৯শে চৈত্রের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে তাঁহাদের কোন ক্ষতিই হয় না, কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকা-খানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা করি আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ—আর্য্যদর্পণ